শারদীয় ১৪২৯
দেশ

সূ চি প ত্র

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

উপন্যাস

সূচিপত্র

গল্প

কবিতা

সূ চি প ত্র

ক বি তা

ক বি তা

সূ চি প ত্র

ক বি তা

ক বি তা

সূচিপত্র

কবিতা

কবিতা

সূ চি প ত্র

ক বি তা

ক বি তা

সূচিপত্র

কবিতা

সূচিপত্র

কবিতা

কবিতা

সূচিপত্র

কবিতা

কবিতা

সূচিপত্র

কবিতা

কবিতা

সূচিপত্র

কবিতা

কবিতা

সূ চি প ত্র

ভ্র ম ণ

ব হু ব র্ণ চি ত্র

প্র চ্ছ দ

অমিতাভ চন্দ্র

অ ল ঙ্ক র ণ

সুব্রত চৌধুরী • অমিতাভ চন্দ্র
সায়ন চক্রবর্তী • অসীম হালদার
তারকনাথ মুখোপাধ্যায় • পিয়ালী বালা
কুনাল বর্মণ • সৌমেন দাস • বৈশালী সরকার
প্রসেনজিৎ নাথ • রৌদ্র মিত্র

সূচিপত্র

সম্পাদক সুমন সেনগুপ্ত

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিঃ সি পি-৪, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

জাতিসত্তার ভবিষ্যৎ এবং বাংলা সাহিত্য

সাহিত্যের অনেক ধারার মধ্যে দু'টি বিশেষ ধারা লক্ষ করা যায়। প্রথমত, ঐতিহ্যের অনুসারী হওয়া। তাকে লালন করা। প্রয়োজনে তার রক্ষণাবেক্ষণ। এবং পরিশীলিত উপায়ে নতুনতর মাধ্যমে তার উপস্থাপন। অন্যটি হল নিয়ত আধুনিকতার পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলা। এই দু'টি ধারা আপাতদৃষ্টিতে ভিন্নধর্মী এবং বিপ্রতীপ। আদতে কিন্তু এরা পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল। বাংলা সাহিত্যে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। এখানে এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটে চলেছে প্রথমাবধি। সাহিত্যের বহু স্থায়ী সৃষ্টি এবং কীর্তি যেমন সংরক্ষিত হয়েছে, তেমনই বহু নবীন লেখকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। বিগত কয়েক দশকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করে। এই যুগপৎ ধারা বাংলা সাহিত্যকে বহু গুণে সমৃদ্ধ করেছে। সেই সঙ্গে বৃহত্তর পাঠকসমাজের বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়ক হয়েছে। বিগত কয়েকটি বছরে, অতিমারির প্রকোপ এবং তৎপরবর্তী সময়ে নানা আর্থ-সামাজিক এবং অবশ্যই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে— সক্রিয়তা এবং কখনও অতিসক্রিয়তা বৃদ্ধিতে জীবনচর্যা দুর্বিষহ এক বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে। একবিংশ শতাব্দতে পৃথিবীবক্ষে দু'টি দেশের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং তজ্জনিত কারণে প্রাণহানি, মানুষের সর্বনাশ এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুলাংশে। প্রশ্ন উঠবে, প্রকৃতি তো আমাদের ওপরে চিরকাল, সর্ব সময়ে এমন বিরূপ হন না, তা হলে? সুসময়কে কি আমরা সব সময়ে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে যেতে পারি? পারলে তা কতখানি? প্রত্যাশা সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ হয়নি। যেমন শিল্পোদ্যোগে বাঙালি সর্বভারতীয় স্তরে বা বিশ্বপর্যায়ে পিছিয়ে, সন্দেহ নেই। এই মুহূর্তে লজ্জার কথা, যে-শিক্ষা এবং সংস্কৃতির গৌরব ছিল বাঙালি মননের শ্লাঘাস্বরূপ, অনতিঅতীতে সেই শিক্ষা এবং তার অনুষঙ্গকে ঘিরে অবাঞ্ছিত এবং অভূতপূর্ব দুরবস্থা ঘনিয়েছে। অন্যদিকে বাংলা ভাষা চর্চা করার মধ্যে যে-গৌরব, তাও প্রায় অস্তমিত হয়ে আসছে ক্রমশ, নানা কারণে। ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষারত অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী আজকাল মাতৃভাষার প্রতি বিমুখ। অথচ তারাই এই সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ। মাতৃভাষার প্রতি এই যে তাদের বীতস্পৃহ মনোভাব, এ অতীব আশঙ্কার বিষয়। সরলমতি এই সব কৈশোরক মন যেন আরও বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে, বাংলা ভাষার প্রতি তাদের অভিভাবকদের বীতরাগ অবহেলা এবং তাচ্ছিল্যের কারণে। বাংলা বলতে ও লিখতে না-পারার মধ্যে সন্তানের যেন এক বিরাট গৌরব— জাতিসত্তার নিরিখে যা মাথা হেঁট করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। বাংলা ভাষা মর্যাদাহীন হয়েছে তার স্বভূমে। তাই এ বড় সুখের সময় নয়। তবে কাউকে দোষারোপ করে কার্যসিদ্ধি হবে না। প্রয়োজন আত্মদর্শনের। সেই সঙ্গে একান্ত অনুসন্ধানের। সমসাময়িক সাহিত্য, বিশেষ করে শারদীয় অনুষঙ্গে রচিত সাহিত্যে যেন তার প্রতিফলন ঘটে— জগজ্জননীর কাছে এই প্রার্থনা।

রাজনীতি ও বুদ্ধিজীবিতা

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

বরং বুদ্ধির্ন সা বিদ্যা
বিদ্যায়া বুদ্ধিরুত্তমা
(বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি অনেক বড়)
পঞ্চতন্ত্র, অপরীক্ষিতকারকম্

একটা কথা না বললেই নয়। সেটা হল— বুদ্ধি যেখানে জীবিকা হয়ে ওঠে, সেই বুদ্ধিজীবিতা আসলে রাজনীতিরই পর্যায়-শব্দ। রাজনৈতিক মানুষের কাছে বিদ্যার তত মূল্য নেই, বরং বুদ্ধির মূল্য তাঁদের কাছে অনেক বেশি। এই দৃষ্টিতে ভাবলে সবচেয়ে বড় বুদ্ধিজীবী হচ্ছেন তিনি, যিনি সবচেয়ে সার্থক একজন রাজনীতিক। আমাদের এই বক্তব্যটার সবচেয়ে বেশি সমর্থন পাওয়া যাবে আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ *পঞ্চতন্ত্র*-তে। *পঞ্চতন্ত্র*-কে আমরা সকলেই নীতিশাস্ত্র বলে আখ্যাত করি, কিন্তু অনেকেই এটা জানেন না যে, প্রাচীনকালে নীতিশাস্ত্র বলতে রাজনীতি-শাস্ত্র বা অর্থশাস্ত্রই বোঝাত। আর অর্থশাস্ত্র বা রাজনীতির মূল কথাই হল বুদ্ধি, বুদ্ধিই রাজনীতিকে চালিত করে এবং সেই বুদ্ধিই রাজনীতিকের জীবিকা হয়ে ওঠে। অতএব বুদ্ধিজীবী মানে, যিনি প্রধানত রাজনীতি বেশি বোঝেন।

বাইরে থেকে *পঞ্চতন্ত্র*-র অথবা *কথামালা*-র গল্পগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে নীতিকথার উপদেশ বলে মনে হলেও আসলে নীতিশাস্ত্র বলতে যে-রাজনীতি বোঝায়, তার প্রমাণ *মহাভারত*-এই আছে— তৎসর্বং রাজশার্দূল নীতিশাস্ত্রে'ভিবর্ণিতম্। *পঞ্চতন্ত্র* যে আসলে বুদ্ধিজীবী রাজনীতিকেরই উপজীব্য গ্রন্থ, সেটা *পঞ্চতন্ত্র*-র কথারম্ভেই প্রকট হয়ে ওঠে। দক্ষিণ জনপদে মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তি তাঁর মূর্খ ছেলেদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য বিষ্ণুশর্মাকে তলব করে নিয়ে এসে সানুনয়ে বলেছিলেন—

'আপনি আমার ওপর করুণা করে আমার এই ছেলেগুলিকে অর্থশাস্ত্র পড়িয়ে দিন এমন করে, যাতে ওরা অল্প সময়ের মধ্যেই অন্যান্য সমবয়সিদের থেকে বেশি কুশল হয়ে ওঠে। আপনি এই অনুগ্রহটুকু করুন।'

উত্তরে বিষ্ণুশর্মা সগর্জনে বললেন, 'আপনার অভিলাষ-সিদ্ধির জন্য সরস্বতীকে নিয়ে খেলায় বসব আমি। আর লিখে রাখুন, আপনি লিখে রাখুন আজকের তারিখটা। ছ'মাসের মধ্যে যদি আপনার ছেলেদের আমি নয়শাস্ত্রে (নীতিশাস্ত্র) কুশল করে তুলতে না পারি, তা হলে আমার যেন পরলোকের পথ বন্ধ হয়ে যায়।'

রাজার এই প্রার্থনার উত্তর দেবার সময় বিষ্ণুশর্মা কিন্তু অর্থশাস্ত্র কথাটা উচ্চারণ

না করে বললেন— আমি ছ'মাসের মধ্যে এই ছেলেদের 'নীতিশাস্ত্রে' কুশল করে দেব এবং দ্বিতীয় বার আস্ফালনের সময় নীতিশাস্ত্র না বলে বললেন 'নয়শাস্ত্র'। আমরা এখানে জানতে চাই যে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্মা এখানে নীতিশাস্ত্র বা নয়শাস্ত্র ('নীতি' আর 'নয়' একই কথা) বলতে রাজার প্রার্থিত অর্থশাস্ত্রই বোঝাতে চেয়েছেন। কেননা নীতিশাস্ত্র বলতে আমরা যেমন ভাল-ভাল নীতিকথার সমাহার বুঝি, নীতি মানে তা নয়। নীতি মানে যে রাজনীতি শাস্ত্র অথবা অর্থশাস্ত্র, তা মহাভারতের পূর্বোক্ত শ্লোকেই পরিষ্কার বলা আছে— তৎসর্বং রাজশার্দূল নীতিশাস্ত্রে'ভিবর্ণিতম্। তার চেয়েও বড় প্রমাণ হল, কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-র পরে আর যত রাজনীতি-সংক্রান্ত প্রাচীন গ্রন্থ আছে, সেগুলোর প্রত্যেকটিতে রাজনীতি অর্থে নীতি-শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, নীতিসার, নীতিপ্রকাশিকা, নীতিবাক্যামৃত ইত্যাদি। আবার রাজনীতি-শাস্ত্র বোঝাতে অর্থশাস্ত্র বা অর্থবিদ্যা শব্দটিও যেহেতু কাব্য-সাহিত্যেও ব্যবহৃত হয়েছে—যচ্চার্থশাস্ত্রে নৃপশিষ্টজুষ্টে— তাই এই উপসংহারটাই ঠিক হবে যে, পঞ্চতন্ত্রের মতো গল্পসাহিত্যের কথামুখে একজন অর্থশাস্ত্র পড়াতে বলছেন, অন্যজন নীতিশাস্ত্র পড়াবেন বলে জানাচ্ছেন— আসলে দুটো একই কথা— এখানে রাজনীতির কথাই প্রধান ভাবে বলা হবে।

আর রাজনীতি মানেই বুদ্ধি, বিদ্যা নয়, বুদ্ধির খেলা। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রীয় রাজনীতিতেও প্রথম যেটা লাগে, সেটা কিন্তু বিদ্যাও নয়, জ্ঞানও নয়, এমনকি রাজনীতিবিদ্যাও নয়, রাজনীতি-শাস্ত্রও নয়, কেননা 'Political Science cannot make a politician out of a scientist any more than physiology can make an athelete out of a physiotherapist'। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তাই শুধু বুদ্ধিই লাগে, বিদ্যা নয়, আর বিদ্যা যদি একজন রাজনীতিকের থাকেই, তবে সে বিদ্যাও তাঁর রাজনীতির বুদ্ধিকেই শাণিত করে।

রাজনীতি শাস্ত্র নিয়ে যাঁরা কথা বলেছেন, সেই মনু, মহাভারত অথবা কৌটিল্য কিন্তু কখনও এমন স্পষ্ট ভাবে এটা বলবে না যে, দেখো, বিদ্যে, জ্ঞান এসব ফালতু কথা, আসল হল বুদ্ধি, বাস্তববোধ। সত্যি বলতে কী, বুদ্ধি কিংবা চতুরতা নিয়েও তাঁরা রা কাড়বেন না, কেননা বিদ্যে-জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, চতুর বুদ্ধির প্রয়োজন আছে, এমনটা স্পষ্ট করে বললে রাজনীতির মান থাকে না। *পঞ্চতন্ত্র*-র সুবিধে এই, *পঞ্চতন্ত্র* বালকের কাছে গল্প বলছে, তার মধ্যে কোনও 'প্রিটেনশন' নেই। *পঞ্চতন্ত্র*-র কথাকার এ-কথা বলতে লজ্জা পান না যে, তুমি যতই বিদ্বান হও, আর যতই বড় বংশের মানুষ হও, বুদ্ধি না থাকলে কোনও লাভ নেই— বিদ্যাবানপি কুলীনো'পি বুদ্ধিরহিতঃ কিং করোতি? এই বুদ্ধিটা যে প্রধানত দেশ-কালের বোধ, লোকব্যবহার, উপস্থিত বুদ্ধি এবং বাস্তব চেতনার ওপরেই নির্ভর করে সেটা পরিষ্কার জানিয়ে পঞ্চতন্ত্র বলে— যতই তুমি শাস্ত্রজ্ঞানী হও, তোমার যদি লোকব্যবহার জানা না থাকে তবে তুমি হাসির খোরাক ছাড়া আর কিছু নও— অপি শাস্ত্রেষু কুশলা লোকাচারবিবর্জিতাঃ। সর্বে তে হাস্যতাং যান্তি।

পঞ্চতন্ত্র থেকে একটা গল্প এখানে বলা দরকার, তাতে বুদ্ধি পরিষ্কার হবে। একটা জায়গায় বামুন ঘরের চার জন যুবা থাকত। তাদের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল একত্র থাকতে থাকতে। চার জন বন্ধুর মধ্যে তিন জন প্রচুর পড়াশোনা করে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করে বিদ্বান হয়েছিল বটে, কিন্তু বুদ্ধি যাকে বলে, সেটা তাদের ছিল না। আর চতুর্থ জন ছিল সার্থক বুদ্ধিমান, কিন্তু সে লেখা-পড়া কিংবা শাস্ত্রজ্ঞানের কাছ ঘেঁষত না। যাই হোক, একদিন সেই বন্ধুরা পরামর্শ করে ঠিক করল— সেই বিদ্যা দিয়ে কী হবে, যা দিয়ে বিদেশ-বিভুঁইতে গিয়ে রাজাদের সন্তুষ্ট করা যায় না, এবং রাজার তুষ্টি করে টাকাও যদি রোজগার না হয়, তাহলে কী হবে সে বিদ্যা দিয়ে— কো গুণো বিদ্যায়া যেন দেশান্তরং গত্বা ভূপতীন্ পরিতোষ্য অর্থোপার্জনা ন ক্রিয়তে। অতএব চলো আমরা অন্য দেশে যাই।

এই রকম ঠিক করে তারা পূর্বদেশে যাবার পথ ধরল। তারপর খানিক পরেই চার জনের মধ্যে যে বড়, সে বলল— দ্যাখো বন্ধুরা সব! আমাদের মধ্যে যে চতুর্থ, সে তো লেখাপড়া কিছু জানে না, শুধু বুদ্ধি আছে ওর। আর বিদ্যে ছাড়া শুধু বুদ্ধি দিয়ে তো আর রাজার অনুগ্রহ পাওয়া যায় না। আমি কিন্তু সাফ বলে দিচ্ছি, আমাদের উপার্জন থেকে ওকে আমরা কিন্তু ভাগ দেব না। কাজেই ও বাড়ি যাক। দ্বিতীয় জন তখন বলল— ও হে সুবুদ্ধি! তুমি বাড়ি যাও। তোমার তো বিদ্যে নেই, অতএব বাড়ি যাও। তৃতীয় জন কিঞ্চিৎ সদয়। সে বলল— যাঃ, এরকম করতে আছে? আমরা সেই ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছি। আর ও মানুষটা কত ভাল। আমরা যা আয় করব, ভাগাভাগি করে নেব— তদাগচ্ছতু অস্মদুপার্জিত-বিত্তস্য সংবিভাগো ভবিষ্যতি।

এই তৃতীয় ব্রাহ্মণপুত্র যথেষ্ট বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও তার অন্তত এই মহান উদারতাটুকু আছে যে, এতকালের সঙ্গীকে শুধু তার বিদ্যা নেই বলে তাড়িয়ে দিতে চায় না। সে 'সংবিভাগে' বিশ্বাস করে, সে অর্জিত ধনের অংশ দিয়েও এত কালের বন্ধুকে সঙ্গে রাখতে চায়। তবে *পঞ্চতন্ত্র*-র লোককথার অন্যতম এই নায়ক কিন্তু মহাভারতের বড় বড় বাণী দিয়ে তার 'সংবিভাজক' মানসের সমর্থন করল না। সে কথাটা বলল একেবারে লৌকিক উদাহরণ দিয়ে। সে বলল, কী হবে বলো সেই সম্পদ দিয়ে, কী হবে সেই ঐশ্বর্য-লক্ষ্মী দিয়ে যে-কিনা সতী-সাধ্বী স্ত্রীর মতো এক স্বামী বই আর জানে না, সম্পদ হওয়া উচিত গণিকার মতো। পথ-চলতি মানুষও তার সুবিধে পায়— কিংতয়া ক্রিয়তে লক্ষ্ম্যা যা বধূরিব কেবলা। সবচেয়ে বড় কথা, এই লোকটা আমার আপন, এই লোকটা আমার পর— এইভাবে যারা ভাবে, তাদের মন বড় ছোট হে, যে মানুষের মনটা উদার, সমস্ত পৃথিবীটাই তার পরিবার-স্বজন— উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।

এই বিখ্যাত নীতি-শ্লোকটি উচ্চারণ করে তৃতীয় ব্রাহ্মণ বলল— না না, ওসব হবে না, চতুর্থও চলুক আমাদের সঙ্গে। এবার চার বামুন পথ চলতে চলতে এক বনের মধ্যে এক জায়গায় প্রচুর হাড়গোড় দেখতে পেল এবং সেগুলি ছিল এক মৃত সিংহের হাড়গোড়। এক বামুন বলল— এই আমাদের বিদ্যা পরখ করার সময় এসেছে— অহো বিদ্যাপ্রত্যয়ঃ ক্রিয়তে। আমরা আমাদের বিদ্যার প্রভাবে এই সিংহকে জীবিত করব। আমি এর হাড়গুলো একত্র করে জুড়ে দিচ্ছি। বলেই সে মৃত-সিংহের এদিক-ওদিক পড়ে থাকা হাড়গুলো জুড়ে দিয়ে তার আকার নির্মাণ করে ফেলল।

দ্বিতীয় জন তার বিদ্যে ফলিয়ে সেই হাড়-গোড়ের ওপর সিংহের চামড়া মাংস এবং রক্তের সঞ্চার ঘটিয়ে দিল। তৃতীয় জন সেই অন্তিম বিদ্যা জানে, সে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে মৃত পশুর শরীর পেলে। সে প্রাণ দিতে যাচ্ছে, এই সময়, বিদ্যাহীন অথচ বুদ্ধিমান চতুর্থ ব্রাহ্মণ সুবুদ্ধি বলল— একটু রোসো ভাই। আমি যা দেখছি, তাতে এটা তো একটা সিংহ তৈরি হতে যাচ্ছে। এই সিংহ-শরীরে প্রাণ দিলে সে তার স্বাভাবিক বৃত্তিতে আমাদের সবাইকে তো খেয়ে ফেলবে।

সুবুদ্ধির কথা শুনে বিদ্বান তৃতীয় বলল— মূর্খ কোথাকার! বিদ্যাটা আমি শিখেছি, সেই বিদ্যেটা বিফল হতে দিই কী করে— নাহং বিদ্যায়া বিফলতাং করোমি। তৃতীয় জন কিছুতেই তার বিদ্যা দেখানোর চেষ্টাটা ছাড়ল না, তখন সুবুদ্ধি বলল— তাহলে দাঁড়াও একটু, আমি এই গাছটায় উঠে তোমার বিদ্যের প্রদর্শনী দেখি। সে গাছে উঠতেই তৃতীয় ব্রাহ্মণ তার বিদ্যে ফলিয়ে সিংহ-শরীরে প্রাণের সঞ্চার ঘটাল এবং সেই সিংহ জীবিত হওয়া মাত্রই এক লাফে তিন বামুনকেই মেরে ফেলল— তে ত্রয়োপি সিংহেনোত্থায় ব্যাপাদিতাঃ। চতুর্থ সুবুদ্ধি এবার একটু অপেক্ষা করতেই দেখল, ভরা পেটে সিংহ বনের ভিতর প্রবেশ করল, সেও তখন গাছ থেকে নেমে এদিক-ওদিক দেখে নিজের

বাড়িতে ফিরে গেল।

পঞ্চতন্ত্র-র কথাকার মন্তব্য করলেন— এরা হল সব মূর্খ-পণ্ডিত অথবা পণ্ডিত হয়েও মূর্খ। শাস্ত্রে জ্ঞান থাকলে কী হবে, বাস্তব এবং লোকাচারের জ্ঞান-বুদ্ধি না থাকলে বিদ্বান লোকও হাসির খোরাক হয়ে ওঠে। অতএব বিদ্যা নয়। বুদ্ধিই অনেক বড় জিনিস— বরং বুদ্ধির্ন সা বিদ্যা বিদ্যায়া বুদ্ধিরুত্তমাঃ।

আর এটাও তো সত্যি যে, একমাত্র একজন রাজনীতিকই পারেন এমন ঠান্ডা মাথায়, এমন নির্বিঘ্নভাবে, শুধু বুদ্ধি দিয়েই স্বকার্য সাধন করতে। বুদ্ধি যেখানে এইভাবে জীবন-জীবিকার ওষধি হয়ে ওঠে, বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধিজীবিতার পরিসরও কিন্তু এইখানেই।

এই যে বুদ্ধিকে ঐতিহ্যগত বিদ্যার চেয়ে বড় জায়গা দিয়ে দেওয়া হল, এই খানেই অর্থশাস্ত্রের প্রথম প্রতিপত্তি তৈরি হয়। ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান একটা শাস্ত্র হিসেবে অর্থশাস্ত্র অথবা রাজশাস্ত্রের পক্ষে এ-কথাটা স্পষ্টাস্পষ্টি বলা কঠিন যে, ভাই, বিদ্যা তেমন কিছু নয়, বুদ্ধিই বড়। অর্থশাস্ত্র তাই এখানে একটা পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করে, যার নাম উপায়। উপায় মানে কৌশল। অর্থশাস্ত্রীয় যুক্তিতে উপায় নিয়ে শত কথা শোনানোর আগেই পঞ্চতন্ত্র সিংহ আর শশকের বিখ্যাত গল্পটার সূত্রপাত করে বলে— বুদ্ধিমান লোকের অসাধ্য কিছু নেই, শক্তি-ক্ষমতা পরাক্রম নিয়ে যা করা যায় না, বুদ্ধি কৌশল, উপায় দিয়ে সেটা করা যায়— উপায়েন হি যৎ সাধ্যং তন্ন শক্যং পরাক্রমৈঃ। সত্যি বলতে কী, পরাক্রম বলপ্রয়োগ অথবা যুদ্ধও একটা অন্যতম উপায় বটে, কিন্তু সেই উপায়টাকে পঞ্চতন্ত্র এবং প্রাচীন রাজশাস্ত্রকারেরা সবচেয়ে অধম এবং শেষ উপায় বলে মনে করেন একই যুক্তিতে। বরং বুদ্ধি করে রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে যে কার্যসিদ্ধি করা যায়, সেটাকেই রাজনীতিতে শ্রেষ্ঠ বলে বলেছে মহাভারতের রাজধর্ম-পর্ব— উপায়বিজয়ং শ্রেষ্ঠমাহুঃ।

এই যে উপায়-বিজয়, যেখানে বুদ্ধি এবং কৌশলই প্রধান প্রকরণ, সেটা কিন্তু একজন রাজনীতিকের প্রধান অবলম্বন এবং সেই নিরিখে বুদ্ধিজীবিতা রাজনীতির অপর নাম হয়ে ওঠে। সুবুদ্ধি যেভাবে যে-বুদ্ধিতে শাস্ত্র-বিদ্যা এবং সিংহের হাত থেকে বাঁচল, রাজনীতির পরিভাষায় একেই বলে উপায়। উপায় মানে যদি বলি কৌশল, তাহলে কথাটা খুব সংকীর্ণ হয়ে যায়। রাজনীতির 'উপায়'গুলি অন্তঃরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র দুই ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। আর উপায় যে ব্যবহারিক জীবনেও প্রযোজ্য, সেটা বলা হয়েছে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকা মিতাক্ষরায়। বলা হয়েছে— সাম, দান, ভেদ, দণ্ড— এই চার রকমের উপায় রাজা-রাজ্য রাজনীতিতে যেমন প্রযোজ্য, তেমনই প্রযোজ্য সাধারণ জীবনে—অপি তু সকল-লোক-ব্যবহার-বিষয়াঃ।

সুবুদ্ধি বামুনটিকে তো দেখলেন— সারাটা সময় জুড়ে সে কোনও ঝগড়ার মধ্যে গেল না, কাউকে দুঃখও দিল না, এমনকি তাকে বিদ্যাহীন মূর্খ বলার পরেও সে কোনও প্রতিবাদ করেনি, আবার সিংহকে জীবিত করার আগে সে যে সৎ-পরামর্শ দিয়েছিল, সেটাতে তার বন্ধুরা কোনও পাত্তা না দিলেও সে তাদের বেশি বুঝিয়ে অযাচিত উপদেশও দিল না। সে শুধু সময়-মতো মিষ্টি কথা বলে সামনীতিতেই নিজেকে বাঁচিয়ে বাড়ি ফিরল।

এখানে এটাও জানাই যে, সামনীতি হল রাজনীতির একটা কৌশল যেটাকে আজকের গণতান্ত্রিক ভাবনায় বলা হয়— আলোচনার মাধ্যমেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যায়। ওপরের গল্পটা সরল একটি *পঞ্চতন্ত্র*-র কাহিনি, সেখানে শুধু এইটুকুই দেখানো হয়েছে যে, বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি বড় এবং সেটা সামান্য সামনীতির প্রয়োগেই কার্যসিদ্ধি হতে পারে। কিন্তু রাজনীতির বৃহৎ ক্ষেত্রে আর তিন উপায় আছে, যাতে রাজনীতিতে বুদ্ধিটাই সবচেয়ে জরুরি হয়ে পড়ে। ঠিক এইখানেই বলে রাখছি— এই সব রাজনৈতিক উপায়, যেমন দাননীতি, ভেদনীতি কিংবা দণ্ডনীতির প্রাথমিক প্রয়োগ, এগুলি কিন্তু যুধিষ্ঠির কিংবা রামচন্দ্র কোনও দিন প্রয়োগ করার সুযোগও পাননি, অথবা প্রয়োগ করার ক্ষমতাও তাঁদের ছিল না।

আসলে শত্রু যদি তেমন সাংঘাতিক হয়, ফর্মিডেবল হয়, তাহলে শুধু ভাল কথা বলে আলোচনার মাধ্যমেও সমস্যার সমাধান হয় না, আবার শুধু দণ্ড দিয়েও রাজনীতি হয় না। অথচ দুয়ের মধ্যে প্রথমটার উদাহরণ যুধিষ্ঠির আর দ্বিতীয়টার উদাহরণ রামচন্দ্র। একজন সারাজীবন ভাল কথা বলে গেলেন। আর একজন সমুদ্র টপকে লঙ্কায় গেলেন, যুদ্ধ করলেন, মারলেন রাবণকে সবংশে। এর মধ্যে রাজনীতি কোথায়? আসলে যুধিষ্ঠির কিংবা রামচন্দ্র—এরা দু'জনেই মহান এবং উচ্চস্তরের বড় মানুষ এবং ভাল মানুষ। কূটনীতি, রাজনীতি, কিংবা ডিপ্লোমেসি— এঁদের ভাবনার পরিসর নয়। ফলত সাম, দান, ভেদ, দণ্ড— এই চতুরুপায়, যা দিয়ে রাজনীতির আবর্ত তৈরি হয়, সেখানে বুদ্ধি, অর্থাৎ রাজনীতির কূটবুদ্ধি একেবারেই তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে।

উল্টো দিকে রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি যে কী হতে পারে তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হতে পারেন মহাভারতের দুর্যোধন এবং অন্য দিকে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, যাঁরা আপন পারিবারিক ঝামেলার মধ্যেও রাজনীতির কূটপ্রয়োগ করেছেন।

লক্ষণীয়, মহাভারতের 'ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠা প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ' এই শ্লোকটি *মনুসংহিতা*-তেও উল্লিখিত হয়েছে একই শব্দের উচ্চারণে এবং বলা হয়েছে যে, চরাচরের মধ্যে যাদের প্রাণ আছে, তারা শ্রেষ্ঠ এবং প্রাণীদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীরা শ্রেষ্ঠ— প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ। এখানে মেধাতিথির মতো বিজ্ঞ মনু-টীকাকার অবশ্য আহার-সংগ্রহের বুদ্ধি মাত্রকেই বুদ্ধিজীবিকার লক্ষণ বলে মানেননি। মেধাতিথি ধরেই নিয়েছেন যে প্রাণিমাত্রেই আহার-সংগ্রহ জীবন চালানোর বুদ্ধি থাকে। তাই প্রাণীদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী হল তারাই, যারা জীবনধারণের ব্যাপারে খানিক বুদ্ধি খাটাতে পারে, যারা খানিক নিজের ভাল-মন্দ, সুখ-অসুখ চিন্তা করতে পারে— এই যেমন পশুদের মধ্যে কুকুর শেয়ালেরা, তারা গরম লাগলে ছায়া খোঁজে, শীত লাগলে রোদ্দুর খোঁজে, অথচ যেখানে খাবার পাওয়া যায় না, সেখানে থাকেই না। অর্থাৎ শুধু জীবনধারণ মাত্র নয়, জীবনধারণের মধ্যে যারা নিজের সুখ-সাধনে খানিক পটু, তারাই বুদ্ধিজীবী— তে হি পটুতরং সুখমনুভবন্তি। তেষাং যে বুদ্ধ্যা জীবন্তি, হিতাহিতে বিচিন্বন্তি শ্বশৃগালাদয়ঃ।

আমরা আগেই বলেছিলাম, বুদ্ধির সঙ্গে জীবী শব্দটা জুড়ে দেবার ফলে ইন্টেলেকচুয়ালের বাংলাটায় খানিক অনিচ্ছাকৃত দোষ তৈরি হয়েছে। 'জীবী' শব্দের মধ্যে জীবিকা অথবা জীবনধারণের তাৎপর্য আছে বলেই প্রাচীনেরা বুদ্ধিজীবিতার মধ্যে বেঁচে থাকার সাধারণ জ্ঞান ছাড়া আর কিছু দেখতে পাননি। মনু-মহাভারতে বুদ্ধিজীবী বলতে যে এর থেকে বেশি কিছু বোঝানো হয়নি তার একটা inter-textual সমর্থন মিলবে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী-সপ্তশতির মধ্যে। এখানে সুরথ রাজা রাজ্য হারিয়ে বনে এসেছেন মন্ত্রী-সান্ত্রীদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে। আর সমাধি বৈশ্যও বনে এসেছেন সংসার-জীবনে বিপর্যস্ত হয়ে, স্ত্রী-পুত্রের গঞ্জনায় জর্জরিত হয়ে। বনের মধ্যে রাজা এবং বৈশ্যের দেখা হয়েছে এবং পারস্পরিক কথোপকথনের সময় তাঁরা উভয়েই নিজেদের একটা ঐকান্তিক ভাবনা খেয়াল করে নিজেরাই অবাক হচ্ছেন। রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়েও সুরথ রাজার মনে পড়ছে তাঁর হাতিশালে হাতির কথা, ঘোড়াশালে ঘোড়াগুলির কথা এবং রাজ্যপরিচালনার দায়ের কথা। আর সংসার থেকে বিতাড়িত হয়ে সমাধি-বৈশ্যের মনে পড়েছে স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-পরিজনের কথা।

মনের মধ্যে এইসব উথালপাথাল চলছে, অথচ কেন এমন হচ্ছে, সেটা বুঝতে না পেরে—কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে— সুরথ রাজা এবং সমাধি বৈশ্য পৌঁছলেন মেধস মুনির আশ্রমে। তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে আপন আপন মানসিক অবস্থা ব্যক্ত করলেন মুনির কাছে।

রাজা জানালেন, দেখুন মুনিবর, আমরা এটা বুঝতে পারছি যে, যারা আমাদের এত কষ্ট দিয়েছে কিংবা বিষয় ভোগ করার যে-সুখ আমাদের এত যন্ত্রণা বাড়িয়েছে, আমরা সেই দুঃখ-যন্ত্রণার কথা জেনেও আবারও তাদের কথাই ভেবে মরছি, এমনকি সেই সব অন্যায়কারী স্বজনদের ব্যাপারে আমাদের এখনও মায়া আছে যথেষ্ট। কী করব বলুন, আত্মজন, বন্ধুজন নির্গুণ হলেও তাদের প্রতি মায়া-মোহ চলে যায় না। কিন্তু আমাদের কেন এমনটা হচ্ছে, এটাই প্রশ্ন আমাদের। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের কিন্তু ভাল-মন্দ, হিত-অহিত পার্থক্য করার জ্ঞানটুকু ভালই আছে, কিন্তু তবুও আমাদের এই মোহ কেন? বরং যাদের এই ভাল-মন্দ, হিতাহিতের পার্থক্য করার জ্ঞান নেই, তাদের এই মোহটা হতে পারে, কিন্তু সেই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আমাদের কেন এমনটা হচ্ছে— তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি?

লক্ষণীয়, বুদ্ধি-শব্দের পরিবর্তে এখানে জ্ঞান-শব্দের ব্যবহার হচ্ছে, কিন্তু এর আগে বুদ্ধিজীবী শব্দে বুদ্ধির ক্ষেত্রে যে হিতাহিত বা ভাল-মন্দের জ্ঞানকে বুদ্ধি বলেই চিহ্নিত করেছিলেন মনু-টীকাকার মেধাতিথি, এখানে চণ্ডীতে সেই বুদ্ধিকে কিন্তু জ্ঞান বলা হচ্ছে। আর এই জ্ঞানের লক্ষণ পরিমাণ যেভাবে মেধস মুনি ব্যাখ্যা করেছেন, সেই জ্ঞানের সঙ্গে মনু-মহাভারত-মেধাতিথি কথিত বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধির কোনও তফাত নেই।

মেধস মুনি রাজা এবং বৈশ্যকে বললেন— সমস্ত প্রাণীরই রূপ-রস ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে জ্ঞান আছে। আর আপনারা যে ভাবছেন, শুধুমাত্র মানুষেরই ভাল-মন্দ পার্থক্য করার বোধ আছে, হ্যাঁ, মানুষের এই ভালমন্দের জ্ঞান আছে নিশ্চয়ই কিন্তু সেটা মেনে নিয়েও বলি যে, পশু-পাখি-মৃগ-মানুষ সকলেরই সে জ্ঞান একই রকম আছে—

জ্ঞানিনো মনুজা সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্বে পশু-পক্ষিমৃগাদয়ঃ।

মেধস মুনি আরও বুঝিয়ে বললেন— মহারাজ! আপনি যে জ্ঞানে নিজেকে জ্ঞানী বলে ভাবছেন সেই জ্ঞান যেমন পশুপাখির আছে, তেমনই পশুপাখির যে জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানই মানুষেরও আছে। আর এই জ্ঞান এমনই যে, সেখানে আপন-পর বোধ এবং মায়া সেটাও কাজ করে। আপনি পাখিদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তাদের এই জ্ঞান আছে যে, তারা নিজেরা না খেলে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়বে, কিন্তু এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও দেখুন, তারা নিজেরা না খেয়ে শাবকের মুখে খাদ্যকণা তুলে দিতে থাকে। সেখানে মানুষের জ্ঞানও একই রকম তারাও সন্তানের পালন-পোষণ করে, কাজেই মানুষের সঙ্গে পশুপাখির তফাত কোথায়?

আমরা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে ব্যবহৃত 'জ্ঞান' শব্দটির প্রয়োগ-পার্থক্য দেখিয়ে এটাই বোঝাতে চাইলাম যে, বুদ্ধিজীবী শব্দটি আমাদের প্রাচীনেরা কোনও ভাবেই 'ইন্টেলেকচুয়াল' বা 'ইন্টেলিজেন্ট' অর্থে ব্যবহার করেননি এবং এই তৎসম শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার করে আমাদের আধুনিক পণ্ডিতেরাও যে খুব বিচক্ষণের কাজ করেছেন, তাও নয়। বিশেষত Intellectual বা Intelligent শব্দ দু'টির অর্থবোধে যে জটিলতা আছে, সেটা বুঝলেও বুদ্ধিজীবীর অভিধা, ব্যঞ্জনা তত সযৌক্তিক হবে না। তবে তার আগে এটা বুঝে নেওয়া ভাল যে, আধুনিক কালে আমরা যাঁদের 'ইন্টেলেকচুয়াল' বা 'বুদ্ধিজীবী' বলে একটা মান্যতার মাত্রা তৈরি করছি, তাঁরা বস্তুত কেমন এবং কতটা বুদ্ধিজীবী সেটা ১৯৪৯ সালে এক নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের দুর্ভাবনা থেকে প্রমাণ হয়।

ফ্রিডরিশ অগাস্ট হায়েক ১৯৪৯ সালে *ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো ল রিভিউ* পত্রিকাতে 'The Intellectual and Socialism' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে, কত কাল আগে তিনি আজকের দিনের বুদ্ধিজীবীদের 'ইন্টেলেকচুয়াল' বলে চিনতে পেরেছিলেন। আমি বাংলায় তাঁর কথাগুলি লিখতে পারতাম, কিন্তু তাতে মূল কথাগুলির ধার চলে যাবে বলে তাঁর একটা বড় উদ্ধৃতি আপনারা ধৈর্য ধরে পড়ুন—

The term intellectuals, however, does not at once convey a true picture of the large class to which we refer and the fact that we have no better name by which to describe what we have called the second hand dealers in ideas is not the least of the reasons why their power is not better understood. Even persons who use the word intellectual mainly as a term of abuse are still inclined to withhold it from many who undoubtedly perform that characteristic function. This is neither that of the original thinker nor that of the scholar or expert in a particular field of thought. The typical intellectual need be neither: he need not possess special knowledge of anything in particular, nor need he even be particularly intelligent, to perform his role as intermediary in the spreading of ideas. What qualifies him for his job is the wide range of subjects on which he can readily talk and write, and a position or habits through which he becomes acquainted with new ideas sooner than those to whom he addresses himself.

Until one begins to list all the professions and activities which belong to this class, it is difficult to realize how numerous it is, how the scope for its activities constantly increases in modern society, and how dependent on it we all have become. The

class does not consist only of journalists, teachers, ministers, lecturers, publicists, radio commentators, writers of fiction, cartoonists, and artists—all of whom may be masters of the technique of conveying ideas but are usually amateurs so far as the substance of what they convey is concerned. The class also includes many professional men and technicians, such as scientists and doctors, who through their habitual intercourse with the printed word become carriers of new ideas outside their own fields and who, because of their expert knowledge on their own subjects, are listened to with respect on most others. There is little that the ordinary man of today learns about events or ideas except through the medium of this class; and outside our special fields of work we are in this respect almost all ordinary men, dependent for our information and instruction on those who make it their job to keep abreast of opinion. It is the intellectuals in this sense who decide what views and opinions are to reach us, which facts are important enough to be told to us and in what form and from what angle they are to be presented. Whether we shall ever learn of the results of the work of the expert and the original thinker depends mainly on their decision.

এফ. এ. হায়েক অর্থনীতিতে নোবেল পদের অংশীদার হলেও প্রথম জীবনে তিনি দুটো ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছিলেন আইন এবং রাজনীতি শাস্ত্রের ওপর কাজ করে। ফলত সমাজতত্ত্বেও তাঁর জ্ঞানগম্যি ছিল অসামান্য। সম্ভবত এমন বহুমুখী বিদ্যাবুদ্ধি ছিল বলেই বুদ্ধিজীবী ইন্টেলেকচুয়ালদের সম্বন্ধে এতটা গভীর মন্তব্য তিনি করতে পেরেছেন এবং সেই মন্তব্য এখনও প্রাসঙ্গিক। খেয়াল করে দেখবেন, বিষয়জ্ঞ না হওয়া সত্ত্বেও এখনকার বুদ্ধিজীবীরাও অনেকেই বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করেন। একজন শিক্ষক, একজন আইনজীবী অথবা একজন ডাক্তার-মাত্র হলেই হল, অথবা একজন নামকরা সাংবাদিক অথবা মন্ত্রী— তাঁরা সাধারণের চেয়ে অনেক অজানা বিষয়ও অধিগত করতে পারেন তাড়াতাড়ি এবং সেই বুদ্ধিটা আছে বলেই তাঁরা আপন বিশেষজ্ঞতার বিষয় ছাড়াও অন্য বিষয়েও ভাল রকম কথা বার্তা চালিয়ে যেতে পারেন আপন পরিশীলিত বুদ্ধির তীক্ষ্নতায়, আর সে তীক্ষ্নতা এমনও হতে পারে, যাতে সাধারণ মানুষ তাঁকে বিশেষজ্ঞ এবং বুদ্ধিজীবী বিদ্বান ভাবতে থাকে।

আমরা প্রাচীন শাস্ত্র-যুক্তি দেখিয়ে পূর্বে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে, সত্যিকারের বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে তর্কজীবী, বুদ্ধিজীবী ব্যক্তির পার্থক্য আছে। বস্তুত সে পার্থক্যটা যে ওদেশের 'ইন্টেলেকচুয়াল'-দের স্তরভেদেও বর্তমান, সে কথা যেমন নোবেলজয়ী হায়েকের কথা থেকে প্রমাণ হয়, তেমনই প্রমাণ হয় অন্যান্য গবেষকদের চেষ্টা থেকেও। লক্ষণীয়, বিদেশি গবেষকদেরও একটা অদ্ভুত প্রকীর্ণ অন্বেষণ ছিল, প্রকৃত 'ইন্টেলেকচুয়াল' কে, সেটা মনোগত ভাবে বুঝে নেবার।

সত্যি বলতে কী, সত্তরের দশকের গোড়ায় আমরা যখন 'নূতন যৌবনেরই দূত' হিসেবে আত্মপ্রেরিত হয়ে ঘুরছি, তখন 'ইন্টেলেকচুয়াল' বলতে তাঁদেরই চেনানো হত, যারা বিদিত-বেদিতব্য বিষয় নিয়ে এতটাই নিমজ্জিত যে, তাঁরা বেশ আত্মভোলা গোছের, মাথায় চিরুনি চলে না, স্নান-খাওয়ার বালাই নেই, তাঁরা কেউ কবি, কেউ আর্টিস্ট, কেউ রাজনৈতিক তাত্ত্বিকতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একজন 'এস্টাব্লিশমেন্ট' বিরোধী মানুষ। এইরম একটা ভাবনার নিরিখে যেদিন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো কবি কলেজ-স্কোয়্যারে গোলদিঘিতে স্নান করে গা না মুছে সেই ভেজা পাজামা-পাঞ্জাবিতেই কফি হাউসে এসে পৌঁছেছেন, তখন সেকালের তরুণ-তরুণীরা তাঁকেই প্রকৃত 'ইন্টেলেকচুয়াল' বলে মনে করেছিল। অর্থাৎ কিনা 'ইন্টেলেকচুয়াল হো তো অ্যায়সা'।

প্রশ্নটা কিন্তু কেউ তুলেওছিল। বলেছিল, আকণ্ঠ মদ খেয়ে সামলাতে পারেনি, ওকে প্রকৃতিস্থ করার জন্য কলেজ স্ট্রিটের অনুরাগীরা গোলদিঘির জলে চুবিয়ে কফি হাউসের গেটের সামনে ছেড়ে দিয়ে গেছে। এত বড় সত্য শক্তির পাঠক তরুণ-তরুণীরা মেনে নিতে পারেনি। একজন তো বলেই ফেলল, যে-মানুষটা এখনও লিখতে পারে— 'মালবিকা, তবু এখনও ভাল লাগে কিশোরীর মুখ' সেই কবিকেই এটা মানায়, শক্তিদা যতখানি কবি, ততখানি ইন্টেলেকচুয়াল— এই কবিতায় কবির যন্ত্রণা কতটা আছে বুঝিস! আমার বান্ধবী তরুণী বলল, কবিতাটা তুই বোধহয় একটু ভুল আওড়ালি, তবে কিনা ওই যন্ত্রণাটা আছে বলেই আমি শক্তির কাছে দাঁড়াতে ভয় পাই না, বরং ভাল লাগে দাঁড়াতে।

তাহলে কি এমন একটা প্রস্তাবনা করা যায় যে, এই রকম অগোছালো এলোমেলো, আত্মভোলা ভাব যাঁদের মধ্যে থাকে, তাঁরাই 'ইন্টেলেকচুয়াল'। তর্কযুক্তি দিয়ে বোধহয় ইন্টেলেকচুয়ালের এইরকম একটা লক্ষণ ধোপে টিকবে না। কারণ এরকম অগোছালো, এলোমেলো এবং আত্মভোলা মানুষ পৃথিবীতে অনেকেই আছেন, যাঁদের সঙ্গে শাণিত বুদ্ধিবৃত্তির কোনও সম্বন্ধই নেই। অস্বীকার করি না কথাটা। তবু উল্টো দিকে এটাও ঠিক যে, বুদ্ধিপ্রধান ইন্টেলেকচুয়ালদের থেকে হাজার গুণ বুদ্ধিসম্পন্ন অনেক সৃজনশীল মানুষেরও এই ভাব থাকে, যাঁদের মধ্যে এমন আত্মভোলা স্বভাব থাকে। আমার নিজের চোখে দেখা একটা ঘটনা বলি। তবে আমি ছাড়াও বহু লোক এটা জানে।

এটা সম্ভবত ১৯৬৮ সালের ঘটনা। কোনও এক সাংস্কৃতিক উৎসব উপলক্ষে আমরা দু-দফায় নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিলাম প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোসকে। মাস্টারমশাইরা ছিলেন, ফলে আমরা দু-একজন ছাত্র একেবারেই পিছন থেকে উঁকি দেওয়া কৌতূহলী। এখন এত মনেই নেই কিছু, তবে সেটা সংস্কৃত কলেজের একটা বড় প্রোগ্রাম ছিল। সত্যেন বোস ফ্রেঞ্চ জার্মানের চেয়ে সংস্কৃত ভাষা বেশি জানতেন। কালিদাস তাঁর অতি প্রিয় বিষয়। অথচ ইনি বিজ্ঞানী। তাঁকে নেমন্তন্ন করতে গিয়ে যেটা দেখেছিলাম, সেটা তাঁর সার্বিক সরলতা। তখন গরমের সময় ছিল। তিনি খালি গায়ে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন বালিশ বুকে নিয়ে। কাগজে আঁক কষছিলেন বিমনা ভঙ্গিতে, অথচ গভীর মনোযোগে এবং সেই অঙ্ক-কষা বিজ্ঞানীর প্রশস্ত পিঠের ওপর দু-দুখানা বেড়াল বসে আছে, একটা শান্তিতে ঘুমোচ্ছে, অন্যটা দু-পা সামনে রেখে বসে যেন চৌকি দিচ্ছে।

সংস্কৃত কলেজে যেদিন এলেন, সেদিন তিনি সঙ্গে এসরাজটাও নিয়ে এলেন। আমার অধ্যাপক-প্রতিম গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় স্টেজে বসে যখন গান ধরলেন, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে শ্রোতার আসনে বসেও সত্যেন বোস এসরাজের সঙ্গত করার চেষ্টা করলেন। আমরা সংস্কৃত কলেজের দোতলার ব্যালকনি থেকে এই দৃশ্য দেখেছি। জিজ্ঞাসা হয়, আমরা কি এই আত্মভোলা মানুষটিকে ইন্টেলেকচুয়াল বলব? কেউ কিন্তু এমনটাও বলেননি তাঁর সম্বন্ধে যে অর্থে সত্তর সাল থেকে একজন আর্টিস্ট কিংবা একজন আধুনিক কবিকে আমরা ইন্টেলেকচুয়াল বলতাম।

সত্যেন বসুকে আর কতখানি আত্মভোলা বলব, সেই তুলনায় জার্মানির যে-শহর বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল আপন বিষয়াবিষ্ট বিজ্ঞানী,

গণিতজ্ঞ স্থিতধী পণ্ডিতদের জন্য, সেই গোটিনজেন শহরের এক গণিতজ্ঞের কথা না বললেই নয়, নারায়ণ সান্যালের *বিশ্বাসঘাতক* বইটিতে এক জায়গায় এই সত্য ঘটনার উল্লেখ আছে, যেখানে বহু বিজ্ঞানী মানুষের বাইরের চেহারাটা আমাদের কল্পিত আত্মভোলা ইন্টেলেকচুয়ালদের মতো, আত্মভোলাদের পরিবেশ বোঝার জন্য সান্যাল মশায়ের বক্তব্যটা বিশদেই জানাচ্ছি আপনাদের। তিনি লিখছেন—

বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে ওই অনাড়ম্বর বিশ্ববিদ্যালয়টির একক দান অসামান্য। দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, জীববিদ্যা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার দিকপাল পণ্ডিতেরা এখান থেকেই জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকরশ্মি বিকিরণ করেছেন। তবু গোটিনজেন-এর খ্যাতি অঙ্কশাস্ত্র বিষয়েই। গত শতাব্দীতে কার্ল গাউস্ এবং ফেলিক্স ক্লীন ছিলেন এই জ্যোতির্ময়লোকের যুগ্মতারকা। এ-নালন্দার যুগ্ম-শীলভদ্র, অথবা এ-শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-অবনীন্দ্র। আমরা যে-সময়ের কথা বলছি তখন গোটিনজেন-এ তিন-তিনজন দিকপাল মনীষী ছিলেন এ-রাজ্যের ত্রিরত্ন। তাঁরা হলেন ডেভিড হিলবার্ট (1862-1943), ম্যাক্স বর্ন (1882-1970) আর জেমস ফ্রাঙ্ক (1882-1964)। শেষোক্ত দুজনেই ইহুদি এবং নোবেল লরিয়েট। হিলবার্ট ছিলেন বিশুদ্ধ গণিতের পণ্ডিত—অঙ্কশাস্ত্র ছাড়া এ দুনিয়ায় আর কিছু চিনতেন না তিনি। অপরপক্ষে ম্যাক্স বর্ন এর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। প্রায় লেঅনার্দোর মত। চিত্রশিল্প আর বেহালা বাজানোতে তাঁর এমন পারদর্শিতা ছিল যে, বিজ্ঞান চর্চা আদৌ না করে, ওই দুটি পথের যে কোনও একটায় সিধে হাঁটা ধরলেও তিনি নাকি বিশ্ববিশ্রুত হতে পারতেন। বাবা ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন ইহুদি। পুত্রকে কলেজে পাঠাবার সময় বলেছিলেন, কী নিয়ে জীবন কাটাবে তা স্থির করার আগে সবকয়টি পাঠ্যবিষয়কেই যাচাই করে দেখে নিও। পিতৃ-আজ্ঞা বর্ণে বর্ণে পালন করেছিলেন ম্যাক্স বর্ন। আইন, সাহিত্য, মনস্তত্ত্ব, রাজনৈতিক-অর্থনীতি এবং জ্যোতির্বিদ্যা—পরপর অনেকগুলি বিষয়েই পরীক্ষা দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত কোনও বিষয়েই দ্বিতীয় হতে পারলেন না! ফলে তিনি পিতাকে লিখে পাঠালেন: সব কয়টি বিষয়ই যাচাই করে দেখলাম। স্থির করেছি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সামগ্রিক চর্চা করব অতঃপর। এমন মানুষকে পদার্থবিজ্ঞানীরূপে চিহ্নিত করা যায় কিনা জানি না; কিন্তু সেটাই তাঁর পরিচয়।

জেমস ফ্রাঙ্কও ইহুদি। হামবুর্গে বাড়ি। অভিজাত পরিবারের সন্তান। আর সেই আভিজাত্য ছিল তাঁর রক্তে। কখনও কারও কাছে মাথা নত করেননি। ছাত্রদের তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, ছাত্রেরাও তাঁর জন্য প্রাণপাত করতে প্রস্তুত। গোটিনজেন-এ আসবার পরেই তিনি কতকগুলি যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বসলেন, যার একটির জন্য তাঁকে যেতে হল সুইডেনে—নোবেল প্রাইজ আনতে।

প্রতি বছরই বিভিন্ন দেশ থেকে বিজ্ঞানীরা আসেন গোটিনজেন-এ—দেখতে শুনতে জানতে এবং জানাতে। কোয়ান্টাম-থিওরির জনক ম্যাক্স প্লাঙ্ক (1858-1947), রেডিয়াম আবিষ্কারক মাদাম কুরি, আপেক্ষিকতাবাদী আইনস্টাইন, প্রোটন-উদ্ধারক রাদারফোর্ড, পরমাণু-সিদ্ধান্ত বাচস্পতি নীলস বোহ্‌র প্রভৃতি এসেছেন বারে বারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অধিকাংশই ছাত্রাবাসে থাকত না। তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত সারা শহরে। স্থানীয় বাসিন্দাদের পেইং-গেস্ট হিসাবে, একটি দুটি করে। তার ফলশ্রুতিটি মারাত্মক এবং কৌতুকবহ! বিংশ-শতাব্দীর মাঝামাঝি এক ধুরন্ধর সংখ্যাতত্ত্ববিদ কাগজে ছাপিয়ে দিলেন এক মারাত্মক স্ট্যাটিস্টিক্স: সারা পৃথিবীর প্রথমশ্রেণির বিজ্ঞানীদের অধিকাংশের শ্বশুরবাড়ি নাকি ওই ছোট্ট জনপদ গোটিনজেনে! হাটে হাঁড়ি ভাঙা হল আর কি! বোঝা গেল পেইং-গেস্টের দল শুধুমাত্র বিজ্ঞানচর্চাই করেননি এতকাল।

জার্মানির চতুর্দিকে কলকারখানা, কর্মব্যস্ততা—অথচ ওই শান্ত ছায়াঘেরা জনপদে যারা বাস করে তারা যেন গ্রহান্তরের মানুষ। সে-আমলের একজন গোটিনজেন-ছাত্রের স্মৃতিচারণ থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দেবার লোভ সামলাতে পারছি না:

"মাঝে মাঝে আমার মনে হত আমার আশেপাশের মানুষগুলো বুঝি পাগলাগারদের বাসিন্দা! একদিন, মনে আছে, সাইকেল চেপে কলেজ থেকে ফিরছি। এক বৃদ্ধ আমার চাকার তলায় পড়েন আর কি! কোনোক্রমে ব্রেক কষে আমি নেমে পড়ি। বেশ বাগিয়ে একটা ধমক দিতে যাব, দেখি তার আগেই বৃদ্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়লেন একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে। ধরে তুলতে গেলাম। আয় বাপ্! প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বসলেন আমাকে: আমি আছাড় খাই না খাই, তাতে তোমার কী হে ছোকরা? দিলে তো সব ভেস্তে?"

"কী ভেস্তে দিলাম আমি? পরে শুনেছিলাম তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। পথে চলতে চলতে মনে মনে আঁক কষতেন। আমি তাঁকে ধরে তুলতে যাওয়ায় তাঁর নাকি চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।"

এই যে বিশাল গণিতজ্ঞ পুরুষ, যিনি রাস্তায় পড়ে গেলেও তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাসূত্র বিঘ্নিত হয় না এবং তাঁকে রাস্তা থেকে ওঠাতে গেলে অন্যতর করস্পর্শে যাঁর মনঃস্থিরতা ব্যাহত হয়, ইন্টেলেকচুয়াল-এর সবচেয়ে বড় এবং তথাকথিত লক্ষণ তো এঁর সঙ্গেই মিলে যায়। অথচ এসব মানুষকে বোদ্ধারা পরম সমাদরে পাগল বলেছেন, বাস্তবতার বোধশূন্য অতিমানবও বলেছেন কেউ কেউ, কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল বলেননি।

আমার মধ্যবয়সে একদিন আট-ন'জনের এক অন্তরঙ্গ, অথচ পাঁচমিশেলি সমাবেশে এক পণ্ডিত বামপন্থী নেতা আমাকেই লক্ষ্য করে বলেছিলেন, হয়তো সামান্য তির্যকভাবেই বলেছিলেন, কিন্তু ভাল মনেই সুন্দর করে বলেছিলেন যে, আপনাদের দেবতাকুলে সবচেয়ে বড় ইন্টেলেকচুয়াল হলেন মহাদেব শিব। লোকটা চুলে ঝাঁকাড় দিয়ে জটা বেঁধে নিয়েছে, আবার সেই জটার ক্লিপটা হল তৃতীয়ার চাঁদ এক টুকরো। তাঁর গলায় কণ্ঠহার রুদ্রাক্ষ-মাত্র নয়, এমন একটি প্রাণী, যাকে দেখামাত্র লোকে লাফ কেটে পালায়— এক বিষধর সাপ— কুণ্ডলিত হয়ে আছে তাঁর গলায়— ফণিভূষণ। তাণ্ডব নাচার মতো পেটা শরীরে লজ্জাবস্ত্র একখানা বাঘছাল। আর তাঁর বাহনখানাকে দেখুন, শিবের ষাঁড়। ময়ূরও নয়, সিংহও নয়, জরদগব ষাঁড়। কোনও প্রসাধনের বালাই নেই, গায়ে ভস্ম মাখেন, নেশা-ভাঙও আছে, নাচের সঙ্গী ভূতের দল— ভাঙ খেয়ে বিভোর ভোলানাথ ভূতগণ সঙ্গে নাচিছে।

বেশ একটা যুতসই বিবরণ দিয়ে সেই তাত্ত্বিক নেতা বললেন, শিবের মতো এইরকম একটা অসামান্য ইন্টেলেকচুয়াল দ্বিতীয় দেখাতে পারবেন না আপনি। কোনও প্রথাসিদ্ধ বাঁধনের মধ্যে তিনি নেই এবং প্রথা মানেন না বলে কোনও লজ্জাও তাঁর মধ্যে নেই। দেবতাদের কোনও সাতে-পাঁচে তিনি থাকেন না, বরং অসুর-দানবদের তিনি অতিপ্রিয় পরম দেবতা। অথচ দেবতাদের যত crisis moment তৈরি হয়েছে, তেমন সব ক'টা জায়গায় তিনিই কিন্তু ত্রাতার ভূমিকার দেখা দেন— একেবারে Saviour God। বিশ্বের মধ্যে সমস্ত দেবতার বিপরীত এক পৃথক তত্ত্বামোদের মধ্যেই ভগবান শিবের অবস্থিতি, তিনি খাপছাড়া বেখেয়ালি, সমস্ত সম্পদের প্রভব হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভিখারি, অথচ এই রকম একটা উদ্ভট স্বভাব মানুষের একজন অসামান্যা প্রেমিকা আছে, যাঁর মতো লাস্যময়ী সুন্দরীও আর দ্বিতীয় নেই—সৌম্য সৌম্যতরাশেষ-সৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী। বলতে পারেন, ইন্টেলেকচুয়ালের সমস্ত গুণ এবং চেহারাই শিবের সঙ্গে মেলে, এমনকি

বিপরীতের প্রতি চরম অ্যাট্রাকশন পর্যন্ত।

সেই বামপন্থী নেতার এই অদ্ভুত মন্তব্যটা আমার বেশ লেগেছিল, তারপর এটাও ভেবে দেখেছি যে, সাধারণভাবে যেখানে একজন বড় বিদ্বান মানুষকেই, সে তিনি কবিই হোন অথবা প্রাবন্ধিক, তিনি চিত্রকরই হোন অথবা বিজ্ঞানী, যে-কোনও বিরাট নক্ষত্রোচিত মানুষকে আমরা ইন্টেলেকচুয়াল বলতে অভ্যস্ত হয়েছি পরবর্তী সময়ে, সেখানে সত্তর আশির বিংশীয় দশকে কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল-এর একটা খাপছাড়া পোশাক, কেশ-শ্মশ্রুর বিপ্রতীপ বিন্যাস, এমনকি কথাবার্তার অধিক্ষেপও একটু পৃথক— এমনই এক মনস্কল্পনা ছিল ইন্টেলেকচুয়াল সম্বন্ধে। ধরা যাক, বের্টোল্ট ব্রেশট, তিনি তো সচেতন ভাবেই নিজেকে পৃথক করেছিলেন এবং তাঁকেই এক সময় আমরা একজন ইন্টেলেকচুয়ালের চরম বলে মনে করতাম এবং এখনও করি। পল জনসন-এর *ইন্টেলেকচুয়ালস* গ্রন্থে তালিকায় রুশো শেলি মার্ক্স ইবসেন সকলেই ইন্টেলেকচুয়াল, কিন্তু ব্রেশট-এর প্রসঙ্গে তাঁর লেখনী—

> So some of his dress ideas derived from across the Atlantic. But others were distinctively European. The belted leather jerkin and cap had been favoured by the violent young men of the Cheka which Lenin created early in 1918. To this Brecht added his own invevtion, a leather tie and waistcoats with cloth sleeves. He wanted to look half student half workman and wholly smart. His new rig evoked varied comments. His enemies claimed he wore silk shirts under the proletarian leather gear. Carl Zuckmayer called him 'a cross between a truck-driver and a Jesuit seminarist.' He completed his personal style by devising a special way of combing his hair straight down over his forehead and by maintaining a perpetual three-day beard, never more, never less. These touches were to be widely imitated by young intellectuals thirty, forty, even fifty years later. They also copied his habit of wearing steel-rimmed 'austerity' spectacles.

আমরা আমাদের বিশ্বকবিকেও কিন্তু সেই অর্থে ইন্টেলেকচুয়াল বলার কোনও সুযোগ পাইনি, হয়তো বা কোনও লক্ষণও মেলে না সেখানে। তাঁর ব্যবহৃত বিরাট সেই 'অলোক সমান' আলখাল্লাটা যদি এ বিষয়ে প্রমাণলক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে বিদ্যাসাগরের চটি, মহাত্মা গান্ধীর টুপি, নেহরুর জহর-কোট, এমনকি আশুতোষ মুখার্জির গোঁফটাও ইন্টেলেকচুয়ালের লক্ষণ হয়ে দাঁড়াবে। সবচেয়ে বড় কথা রবীন্দ্রনাথ কোনও ভাবেই আত্মভোলা ছিলেন না, এমনকি উপর্যুক্ত কেউই আত্মভোলা নন এবং তাঁদেরও কেউ ইন্টেলেকচুয়াল বলেননি সে অর্থে। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের বিষয়-বুদ্ধি কিছু কম ছিল না এবং কত ধানে কত চাল হয়, সেই হিসেবনিকেশেও তাঁর কোনও আত্মভোলা ভাব প্রকট হয়নি কখনও। ফলে তাঁকে সেই অর্থে ইন্টেলেকচুয়াল বলা আরও কঠিন।

বরং ইন্টেলেকচুয়াল বলতে যেমন একটা পরিকল্পিত ধারণা আমরা পোষণ করতাম— কবি সাহিত্যিক এস্টাব্লিশমেন্ট-বিরোধী, চালচুলোর খবর না-রাখা এবং সর্বদাই বিদ্যার বিষয়ে চিন্ত্যমান, এঁদেরকে ইন্টেলেকচুয়াল বলে বোধহয় রবীন্দ্রনাথই চিনেছিলেন প্রথম। কেননা ইন্টেলেকচুয়াল বলতে যে-কল্পনা আমরা করতাম, সেই ভবিষ্যৎ বুঝেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ 'খাপছাড়া'র মতো এত অসাধারণ একটা কবিতা লিখে বলেছিলেন—

মন উড়ু উড়ু, চোখ ঢুলু ঢুলু
ম্লান মুখখানি
কাঁদুনিক—
আলুথালু ভাষা, ভাব এলোমেলো,
ছন্দটা নির্‌বাঁধুনিক।
পাঠকেরা বলে, "এ তো নয় সোজা,
বুঝি কি বুঝিনে যায় না সে বোঝা।"
কবি বলে, "তার কারণ, আমার
কবিতার ছাঁদ আধুনিক।"

আমরা বোধহয় এবার শেষ জায়গায় এসে পড়েছি এটাই বলার জন্য যে, সাজসজ্জার ব্যতিক্রম, বড় মানুষের নির্দিষ্ট প্রকারের অথবা অন্য রকম আচরণ, বিশেষ কোনও মুদ্রাদোষ, এমনকি তাঁর বিপরীত ব্যবহারও কোনও ভাবে একজন ইন্টেলেকচুয়াল-এর সংজ্ঞার্থ তৈরি করতে পারে না, সেই সংজ্ঞার্থ তৈরি করতে পারে একমাত্র তাঁর ইন্টেলেক্ট বা বুদ্ধিই।

বস্তুত মানুষের ভাবনার জগৎ এবং ব্যবহারিক জগৎ এতটাই পৃথক যে, একজন ইন্টেলেকচুয়াল হবার জন্য এখনও এক দিকে খুব রুচিসম্পন্নতার দেখনদারিতে মোৎজার্ট পছন্দ করা সঙ্গে সঙ্গে খানিক ফুকো-দেরিদার লেখাগুলো না বুঝে খামচা-খামচা পড়ে ফেলার দরকার হয় না। নয়তো বা ইন্টেলেকচুয়াল প্রমাণ করার জন্য একই ঘেমো পাঞ্জাবি পরে প্রতিনিয়ত বস্তিবাসীর পঙ্কোদ্ধার করার প্রয়োজন আছে নয়তো বা নারীমুক্তির বিষয় নিয়ে অযথা আচরণহীন মৌখিকতার আড়ম্বর তৈরি করতে হয়, অথবা অযথা রামায়ণ-মহাভারত, কিংবা না বুঝে মনু যাজ্ঞবল্ক্য ছেঁচে ফেলাটাও ইন্টেলেকচুয়াল-এর লক্ষণ হতে পারে না।

অথচ ঠিক এঁদেরই আমরা আজকাল ইন্টেলেকচুয়াল বলছি। স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে এঁরা অত্যন্ত অভিজাত এবং অধিগুণসম্পন্ন মানুষ— সর্বদাই স্বকল্পিত এক অভিমানমঞ্চে এঁরা বসে থাকেন, অনধিগতবিদ্য কতগুলি এমএ পাশের স্তাবকতাতে এঁরা এতটাই পুষ্ট হন যে, প্রায়ই স্ব-বিষয় অতিক্রম করে তাঁরা বেশির ভাগ সময়েই অন্যের বিষয়ে অপক্ক জ্ঞান বিতরণ করতে থাকেন এবং তা করেন এতটাই রুচিসম্পন্ন ভাবে আপাত-সংস্কারের যুক্তিতে, যাতে সেগুলি অত্যন্ত মুগ্ধবোধে সাধারণ্যে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষে এঁরা আজকাল সীতা-দ্রৌপদীর নিপীড়ন নিয়ে কূট তর্ক করেন, রামচন্দ্র এবং বুদ্ধের তুলনামূলক আলোচনায় প্রথম জনের সর্বনাশ করে অত্যন্ত মধুরতায় অন্যতরের উচ্চতা স্থাপন করেন। যদিও এঁরা দুই ভগবৎপ্রমাণ পুরুষের মূল চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য কিছুই জানেন না।

এই মানুষগুলি সম্ভবত এখন একটা বর্গ, যাঁদের সম্বন্ধে highbrow শব্দটা ব্যবহার করা হত বিংশ শতাব্দর কুড়ির দশকে। তাঁরা একই সঙ্গে 'refined and pretentious', কিন্তু অক্সফোর্ড ডিকশনারির ১৯৩৩-এর সংস্করণে এই 'highbrow' শব্দটার ভাব প্রথম অন্তর্ভুক্ত করে এই নাকউঁচু highbrow-দের ব্যাপারে intellectual কথাটাও প্রথম উচ্চারিত হল— 'A person of superior intellectual attainments or interests; always with derisive implication of conscious superiority to ordinary human standards'।

আমি এই ধরনের ইন্টেলেকচুয়াল অথবা আক্ষরিক বুদ্ধিজীবীদের শ্রীচরণে প্রণমান্তে নিবেদন করি— তাঁরা যেন উৎপক্ষ্ম দৃষ্টিপাতে তাঁদের তৃতীয় নয়ন থেকে অগ্ন্যুৎপাত করে আমার এই প্রবন্ধটিকে অলৌকিক ভস্মরাশিতে পরিণত না করেন।

এই ভয়টা আমার আছেই, কেননা সম্রাট হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট আমাদের ভয় ধরিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, এই সব রাজোচিত বুদ্ধিজীবীদের এই তো স্বভাব যে, তাঁরা মানুষের অমানুষী স্তুতিতে ভুলে নিজেদের ললাট চর্মের অন্তরালে শিব-মহেশ্বরের তৃতীয় নয়নটি অন্তরিত হয়ে আছে বলে মনে করেন— ত্বগন্তরিত-তৃতীয়-লোচনং স্বললাটমাশঙ্কন্তে।

অঙ্কন: রৌদ্র মিত্র

গেটি ইমেজেস

সোনা রয়েছে— এ খবর ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয়েছিল অভিযান। ক্লনডাইক গোল্ড রাশের দৃশ্য

ঊনবিংশ শতকে আমেরিকান অভিযাত্রা

চৈতালী মৈত্র

আমেরিকা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলতে আজ আমরা যে-বিপুলায়তন দেশটিকে বুঝি, একটি রাষ্ট্র হিসেবে তার পত্তনের সূচনা হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দর প্রথমার্ধে, বিশেষ সামাজিক ও ধর্মীয় মতান্তরের কারণে আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে আসা কয়েক জন মানুষের প্রচেষ্টায়। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকেই বলা হয় 'দ্য পিউরিটান সেটলমেন্ট'। এই সময়ের পর থেকেই ভালভাবে বেঁচে থাকবার তাগিদে তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে বহুমুখী জীবনগঠনের উদ্যোগ নেয়, যাতে নানা ধরনের শস্যক্ষেত্রে খাদ্য উৎপন্ন হয় ও তা বিনিময়ের নানা উৎস তৈরি হয়। আমেরিকার বিরাট প্রাকৃতিক পরিসরকে আয়ত্তাধীন করবার জন্য সদ্য এই দেশে আসা মানুষগুলি সংগ্রাম করেছে এবং এই সংগ্রাম চালিয়ে যাবার নিরন্তর চেষ্টা করেছে, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্য এই দেশটির প্রতিটি প্রান্তকে চেনার চেষ্টা করেছে।

এরপর থেকেই বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষের ঢল এসেছে আমেরিকায়। ঊনবিংশ শতাব্দর বেশির ভাগ সময় জুড়েই এসেছে অগুনতি মানুষ। এই দশকগুলিতে বহু মানুষের সমাগম হয়েছিল বহু দেশ থেকে, ফলে তৈরি হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিঘাত, ইউরোপের অভিবাসী অধ্যুষিত চরিত্র যা সামাজিক ভারসাম্যকে বিপন্ন করে তুলেছিল তা কখনও আমেরিকার বেলায় প্রযোজ্য হয়নি। বাড়ি ঘর ফেলে আসা মানুষগুলোকে ঊনবিংশ শতাব্দর আমেরিকা গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছিল।

এত বড় দেশটিকে 'যুক্তরাষ্ট্র' হিসেবে গড়বার একটি সচেতন পদক্ষেপ ছিল এই মহাদেশের ভৌগোলিক আয়তন নিশ্চিত করা এবং বর্ধিত করা। সেই কারণেই হয়েছিল তিনটি সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, ১৮০৩ সালে হয়েছিল 'লুইজ়িয়ানা পার্চেজ়'। তৃতীয় প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসনের নেতৃত্বে লুইজ়িয়ানা নামক ভূখণ্ড (যা একসময় ছিল ফরাসি কলোনি), আমেরিকার আয়ত্তাধীন হয়েছিল। অতি স্বল্প অর্থব্যয় হলেও এর ফলে আমেরিকার আয়তন হয়ে গেল প্রায় দ্বিগুণ। ১৮৫৩ সালে হয়েছিল 'গ্যাডসডেন পার্চেজ়' যার দ্বারা এই দেশের আয়তনে যোগ হল প্রায় তিরিশ হাজার বর্গ মাইল, এবং ১৮৫৭ সালের 'আলাস্কা পার্চেজ়' আমেরিকার

ভৌগোলিক উত্তরাধিকারকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে তুলেছিল। শুধুমাত্র বৃদ্ধি নয়, বিস্তারও হয়েছিল। ফলে এই সময়েই (ঊনবিংশ শতাব্দর মধ্যভাগের কিছু পূর্বে ও শেষভাগে) এই দেশে বসবাসকারী মানুষের কাছে ভ্রমণ হয়ে উঠেছিল অপরিহার্য। ১৮৮০ সালের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত— ক্লোজিং অফ দ্য ফ্রন্টিয়ার অভিপ্রয়াণকে বন্ধ করবার ব্যবস্থা করল। আমেরিকার সেনসাস ব্যুরো এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবার পর থেকেই শুরু হয়েছিল অকুণ্ঠ কর্পোরেটাইজ়েশন এবং আধুনিক অফিসভিত্তিক কর্ম-সংস্কৃতির প্রসার। তখন ভ্রমণের ধারণায় একটি পরিবর্তন এল। শুধুমাত্র প্রয়োজনে নয়, আমোদের জন্যও ভ্রমণ শুরু হল। উন্নত, শহরকেন্দ্রিক জীবনে এল নতুন অধ্যায়। বিখ্যাত 'গ্রেহাউন্ড ট্রাভেলস'-এর কার্যকলাপ এই অবস্থা থেকেই শুরু। এই সংস্থার বাসে চড়ে ছুটি কাটানো শুরু হয় বিংশ শতাব্দতে (১৯১৪) মিনেসোটা থেকে, কিন্তু তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল ১৮৯০-এর পর থেকেই।

র‍্যানডল্ফ বার্নস মার্সি

ঊনবিংশ শতাব্দর মধ্যভাগে যখন এই মহাদেশে ঘটে চলেছিল নানা ধরনের প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, তা তৎকালীন অর্থনীতির ঊর্ধ্বায়ন নিশ্চিত করেছিল, তখনও কিন্তু তুলনামূলকভাবে অভাবী মানুষগুলি চেষ্টা করেছিল তাদের জীবনযাত্রাকে উন্নততর করতে। পূর্বে উল্লিখিত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলি তাদের স্বাধীনচেতা হতে উৎসাহিত করেছিল, সেই মনোভাব থেকেই রচিত হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের ভ্রমণ সাহিত্য। এই ভ্রাম্যমাণ মানুষগুলি তাদের দীর্ঘমেয়াদি অভিজ্ঞতার ঝুলি ও হাজারও পাওয়া-না-পাওয়ার চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এসেও আমেরিকার নতুন উদীয়মান সংস্কৃতিতে ঠিক অনন্যপর হয়ে উঠতে পারেনি। তাই তারা দুই ধরনের ভ্রমণ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল— যা তাদের কৃষিগত এবং প্রযুক্তিগত অর্থনীতিকে আরও পোক্ত করে তুলতে পারবে।

আমেরিকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রথম হল, মাইলের পর মাইল বিস্তৃত বৃক্ষহীন তৃণভূমি, অর্থাৎ আমেরিকান প্রেরিজ়। প্রচুর পরিশ্রমের পর এই বিস্তীর্ণ এলাকাতে চাষবাস করা সম্ভব হয়েছিল। তার মাঝে বসতিও ওঠে। এই এলাকায়— পূর্ব থেকে পশ্চিমে (অর্থাৎ নিউ ইয়র্ক-এর দিক থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে) যাত্রা শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দর প্রথম ভাগে। এই ভ্রমণেরই একটি বিচিত্র কাহিনি মেলে র‍্যানডল্ফ বার্নস মার্সি রচিত *দ্য প্রেরি ট্রাভেলার*-এ। যদিও বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৯ সালে, লেখকের বর্ণিত অভিজ্ঞতা এর বেশ কয়েক দশক পূর্বের। আজকের বিশ্বায়িত আমেরিকার সামনে এ অভিজ্ঞতা অবিশ্বাস্য। বইটির আটটি অধ্যায়ের একটিতে আছে প্রচণ্ড জলাভাবের বর্ণনা। যাত্রীদের জল খরচ করতে হত অতি সাবধানে, বিশেষ করে পোষ্যদের জন্য। এই যাত্রাগুলিতে অনেকগুলি পোষ্য থাকত। তাদের জল খাওয়াতে হত ফোঁটায় ফোঁটায়— যা প্রায়ই নিজেদের পরনের অংশবিশেষ ভিজিয়ে নিয়ে নিংড়ে দেওয়া হত। প্রায়ই চলতে-চলতে সঙ্গে থাকা বিরাট লম্বা লাঠি (যেটি ছাড়া যাত্রা প্রায় অসম্ভব ছিল) জোর দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হত মাটির নীচে, স্বল্প জলের আশায়। চোরাবালিতে মৃত্যু হত অনেক শিশুযাত্রী ও ছোট পোষ্যদের (প্রেরির একটি অংশ হল মরুভূমি যা 'গ্রেট আমেরিকান ডেজ়ার্ট' বলে চিহ্নিত)। এই সমগ্র যাত্রায় আবহাওয়া থাকত 'মহাদেশীয় জলবায়ু'— অর্থাৎ দিনে গরম ও রাতে প্রচণ্ড ঠান্ডা। বরফপাত বা বৃষ্টির জলে ভিজিয়ে নেওয়া হত সঙ্গে থাকা কম্বলগুলি যাতে জল ধরে রাখা যায়। ক্লান্ত দিনের শেষে প্রচণ্ড ঠান্ডায় গায়ে চাপা দেবার জন্য প্রায় কিছুই থাকত না, গরম কাপড় থেকে নির্গত জল খেয়ে প্রায়ই অসুস্থতা লক্ষ করা যেত, প্রতিকারের উপায় ছিল না।

আরও রোমহর্ষক বিবরণ পাওয়া যায় জোসায়া গ্রেগ রচিত ভ্রমণকাহিনি *কমার্স অফ দ্য প্রেরিজ়* বইতেও। সেখানে ভ্রমণকাল ১৮২২। অতিমাত্রায় শ্রান্ত ও তৃষাতুর একদল পথিক এক ফোঁটা জলের জন্য দিশাহারা, দিকচক্রবালে মানুষের চিহ্নমাত্র নেই। কোনও রকমে চলতে চলতে দলের একজন দূরে একটি কালো বিন্দু দেখতে পেল, কিছুটা কাছে যেতে বুঝতে পারা গেল সেটি একটি মৃত মোষ। তখন যাত্রীরা মরিয়া— এই জন্তুটির পেটে থাকা জল খেতে তারা বাধ্য হয়েছিল। খাদ্য হয়েছিল এই মোষের মাংস। এই বই থেকে বোঝা যায় এত বিপদেও কতটা মাথা ঠান্ডা রেখে তাদের চলতে হত। তখন ঘোড়ায় টানা ঠেলাগাড়িতে যাত্রাও ছিল রাজসূয়। প্রথমেই যেত দলের কোনও পুরুষ— পালা করে প্রায় তার সঙ্গে-সঙ্গে একটি বড় শক্তিশালী কুকুর, তার পর অন্যান্য পোষ্যরা। সঙ্গে থাকত দলের জোয়ানরা। মহিলারা ও শিশুরা থাকত ঠেলাগাড়িতে। মাঝেমধ্যেই মেরে ফেলা হত অসুস্থ পোষ্যদের ও অকেজো ঘোড়াদের। মাংস ছাড়াও পশুরক্ত ব্যবহার হত তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। বোঝার উপর শাকের আঁটি ছিল আমেরিকার আদি বাসিন্দারা যেমন আপাচি (Apache), চেরোকি (Cherokee) আর স্যু (Sioux)। এদের ভাষা ভ্রমণরতরা বুঝত না, কিন্তু এই ধরনের কঠিন জীবনযাত্রায় এরা ছিল জন্মসূত্রে পটু। ফলে বচসাও যেমন হত, তেমন ক্ষেত্রবিশেষে উপকারও হত। অসুস্থ যাত্রী বা শিশুদের এরা অনায়াসে পার করে দিত খরস্রোতা নদী, জোগাড় করে দিত বনৌষধি। আবার শুরু হত পথচলা।

অতি ধীরে হলেও উন্নত হতে লাগল ভ্রমণের উপায়, ধরন ও ব্যবস্থা। জ্যারেড ডায়মন্ড তাঁর বিখ্যাত বই *গানস, জার্মস অ্যান্ড স্টিল*-এ দেখিয়েছেন, এই উত্তরণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এই শতাব্দর মধ্যভাগে লেখা হয়েছিল

প্রচুর ভ্রমণসাহিত্য। আমেরিকায় আসা ও থাকা সাধারণ মানুষের ভ্রমণবৈচিত্র এই আলোচনার পরিসর। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা বা প্রতীকমুহূর্ত রয়েছে। তেমনই একটি হল ১৮৪৮-এর গোল্ড রাশ। সোনা পাওয়ার ও রাতারাতি ধনী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে বহু মানুষ বেরিয়ে পড়েন— স্থলপথ ও জলপথ, দুটোতেই। গন্তব্য সান ফ্রান্সিসকো। তাদের আকাঙ্ক্ষার আখ্যান নানা ভাবে কাগজে কলমে থেকে গিয়েছে। এই ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে জন্ম নিয়েছিল হিংস্রতা, যার ভয়াবহ পরিণাম ছিল ক্যালিফোর্নিয়া জেনোসাইড, যা ক্রমে রাষ্ট্রধারা বিধিবদ্ধ হয়ে আছড়ে পড়েছিল ক্ষমতার দূরবর্তী প্রান্তে।

জন মার্শাল ছিলেন কাঠের কাজ জানা এক মানুষ, কাজ করতেন একটি কাঠের কারখানায়— অর্থাৎ ছুতোর মিস্ত্রি। তিনিই প্রথম এই কারখানার কাছে অবস্থিত নদী ক্লনডাইক (Klondike)-এ সোনার উপস্থিতির কথা বলেন। কিন্তু এ হেন খবরের ঘোষণা প্রয়োজন। সেই কাজটি করেন মন্টেরে-তে কর্মরত আমেরিকান, কূটনৈতিক ও ব্যবসায়ী টমাস লারকিন। মার্শাল খোনে কাজ করতেন সেই কাঠের কারখানাটি Sutter's Mill নামে খ্যাত ছিল, মালিক ছিলেন জন সাটার। জন্মসূত্রে ইউরোপের মানুষ, নিজের শ্রম ও বুদ্ধির দ্বারা এই কারখানা তৈরি করেছিলেন। কাজে পারদর্শিতার পরিচয় অবশ্যই ছিল কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল আদিবাসী মানুষগুলির প্রতি অবিচার ও শোষণ। তাদের পরিশ্রমের যোগ্য মর্যাদা দেওয়া ছিল দূর অস্ত্।

সোনা রয়েছে— এ খবর ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয়েছিল অভিযান, এই সংক্রান্ত ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি যন্ত্রণা ও বেঁচে থাকার তীব্র আকুতির দলিল। ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যুচেতনার মুখোমুখি হওয়ার আখ্যান। ঘোষণার পরের বছর অর্থাৎ ১৮৪৯-এর মাঝামাঝি, প্রায় পাঁচ হাজার যাত্রীসহ শতাধিক ঘোড়ায়-টানা গাড়ি চলতে থাকে, বর্তমান মানচিত্রের ইউটা থেকে স্যাক্রামেন্টো পর্যন্ত। এদের বলা হয় 'ফর্টি মাইনার্স'। বিনা পরিশ্রমে বিরাট ধনী হয়ে উঠবার অলীক স্বপ্নের ঘোরে, এই অচেনা ও অজানা রাস্তায় ভ্রমণকারী বহু মানুষ মারা যান, কিছু মারা যান কলেরায় (তখন সমগ্র আমেরিকাতেই এই অতিমারি ভয়াল হয়ে উঠেছিল), কিছু শুধুমাত্র খাদ্যাভাবে ও বেশ কিছু আমেরিকার আদিবাসীদের আক্রমণে। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়তে পারে, জে লি টমসন নির্দেশিত ও কুইন্সি জোনস সুরারোপিত সিনেমা *ম্যাকেনা'জ় গোল্ড*, যার নায়ক ছিলেন অভিনেতা গ্রেগরি পেক।

এই মানুষগুলির মধ্যেই ছিলেন ইলিনয়-প্রবাসী এক ব্যবসায়ী জেমস ফ্রেজ়ার রিড। তিনি একা একটি দল গঠন করে ১৮৪৬ সালের এপ্রিল মাসে সোনার সন্ধানে যাত্রা করেন। ১৮৪৫ সালে লান্সফোর্ড হেস্টিংস নামক এক আইনজীবীর লেখা একটি বই, *দি এমিগ্র্যান্টস গাইড টু ওরেগন অ্যান্ড ক্যালিফোর্নিয়া*, তাঁকে বিশেষ সহায়তা করেছিল। এই বইটিতে হেস্টিংস একটি আপাত সহজ রাস্তার হদিশ দেন (এই যাত্রাপথে সিয়েরা নেভাডার পাহাড়ি রাস্তা অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও বিপদসঙ্কুল ছিল)। এই নতুন হদিশটি আজও 'হেস্টিংস কাট-অফ' নামে চিহ্নিত। এবার জে. এফ. রিড-এর সৌজন্যে সাহসী হয়ে ওঠেন আরও বেশ কয়েকজন উৎসাহী মানুষ: মিজ়োরি-বাসী জর্জ এবং জেকব ডনার-ও এই যাত্রায় শামিল হয়েছিলেন। একই জায়গা থেকে বেশ কয়েকটি দলে প্রায় দু'শো মানুষ ক্যালিফোর্নিয়া যাত্রা করলেন। তাঁরা পৌঁছলেন ফোর্ট ব্রিজার নামক একটি ছোট জায়গায়, যেটি গ্রিন রিভার নামে কলোরাডো নদীর একটি শাখার কাছেই অবস্থিত।

এই জায়গাটি থেকে এঁরা দু'টি ভাগে যাত্রা করেন। প্রথম দলটি মোটামুটি নিরাপদে, নির্দিষ্ট সময়ে স্যাক্রামেন্টো পৌঁছে যায়। রিড-সহ অন্য যাত্রীরা হেস্টিংস-বর্ণিত সহজ রাস্তাটি নিতে গিয়ে বিপদে পড়েন। মরুভূমি পেরিয়ে, সিয়েরা নেভাডার পাহাড়ের সমতলে পৌঁছতে প্রায় একমাস লেগে যায়, তত দিনে দলের মানুষদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। অচিরেই তাঁরা প্রবল তুষারপাতে আটকে পড়েন একটি পাহাড়ি লেকের কাছে, যা আজ ডনার লেক নামে পরিচিত। প্রবল শীত ও খাদ্যাভাবে দলের বহু লোক মারা যান। ওই দলেরই একজন, জন মিয়র-এর ৩১ অক্টোবর, ১৮৪৬-এ লেখা চিঠিতে জানা যায় যে, কয়েক জন মানুষ অগ্রসর হয়েও পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন, চরম অভাবে প্রথমে মৃত পশুদের ও পরে মৃত সহযাত্রীদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন পর ১৮৪৭-এর ফেব্রুয়ারিতে যখন উদ্ধারকারীরা এই দুর্গম স্থানে পৌঁছন, তত দিনে মৃত্যু হয়েছে নব্বই জনের। আর এক সদস্য ছিলেন প্যাট্রিক ব্রিন, তাঁর লেখা ডায়েরিতে জানা যায় এই ঘটনার কথা, আরও জানা যায় যে, ওই আবহাওয়াতে পাইয়ুট (Paiute) আদিবাসীরা অত্যন্ত ক্ষিপ্র হয়ে বহু প্রাণনাশ করেছিল। এত অসুবিধার পরেও দলের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ স্যাক্রামেন্টো পৌঁছন। পৌঁছন অন্য প্রান্ত থেকে আরও অনেক মানুষ, কিন্তু ততদিনে এই 'সোনা'-কে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক চাপান-উতোর যার পরিণামস্বরূপ ক্যালিফোর্নিয়া আমেরিকার অন্তর্গত হয় ও ১৮৫০-এর পর ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সড়ক ও জলপথের প্রভূত উন্নতি হতে থাকে। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জ্যাকারি টেলর উঠে পড়ে লাগেন ক্যালিফোর্নিয়ার সাংবিধানিক ক্ষমতার জন্য, সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করেন পার্শ্ববর্তী মেক্সিকো এবং ইউটাকে ক্রীতদাসবর্জিত করার। ১৮৫০-এ তৈরি হয় ফিউজিটিভ স্লেভ অ্যাক্ট, যা নিয়ে শুরু হয় নতুন ধরনের বিতর্ক।

১৮৫৪ সাল থেকে কিন্তু আবার বহু মানুষ যাত্রা শুরু করেন। এবারে তাঁদের লক্ষ্য নতুন জায়গায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা। এঁদের মধ্যেই কয়েকজন মিলে তৈরি করেন ইমিগ্রেশন সোসাইটি, যেগুলি এই অগুনতি ভ্রাম্যমাণ মানুষদের স্থিতি দেবার চেষ্টা করে। নিশ্চিত ভাবেই পাল্টে যেতে থাকে আমেরিকার জনতাত্ত্বিক মানচিত্র। সোনার খোঁজ পাবার জন্য যে যাত্রার শুরু, তাতে এসে পড়ে অন্যান্য ধরনের জীবনমুখী প্রাধান্য। বহু কাহিনির মধ্যে এডউইন ব্রায়ান্ট রচিত *হোয়াট আই স ইন ক্যালিফোর্নিয়া* (১৮৪৮) বিশেষত্বের দাবি রাখে। এই দেশের বিখ্যাত কবি উইলিয়ম কালেন ব্রায়ান্ট-এর বংশধর এডউইন তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তটি সযত্নে লিখে গেছেন। ৩৮টি পরিচ্ছেদের বইটিতে নানা ধরনের পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক সম্পদ ও দৃশ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রাত্যহিক দিনলিপির এই দলিলটি থেকে আমরা জানতে পারি এত বছর আগেও এই দেশটির সামরিক বাহিনী গঠনের মধ্যে কতটা স্বচ্ছতা ছিল। এডউইন সংবাদপত্র দপ্তরের স্থায়ী চাকরি ছেড়ে দিয়ে, ছয় জনের একটি দল গঠন করে, নিউ হেলভেটিয়া থেকে স্যাক্রামেন্টো যাত্রা করেন। অতীব কষ্টসাধ্য এই যাত্রায় তাঁরা আতিথ্য লাভ করেন বেশ কয়েকটি র‍্যাঞ্চ বা র‍্যাঞ্চো-তে। এই র‍্যাঞ্চো হল বেশ বড় মাপের জমি। এগুলির সীমারেখা অনুযায়ী নির্ধারিত হত জমি-জরিপের হিসাব, স্পেন ও মেক্সিকোর এই নিয়ম পালনে বিশেষ ভূমিকা ছিল। বইটি থেকে জানা যায় এই বিরাট পরিসরগুলিতে গবাদি পশু পালনের কথা; জানা যায় প্রকৃতির অকৃপণ দান কেমন করে বছরের বিভিন্ন সময়ে প্রতিভাত হত এখানে। পোষ্যদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা যেত বন্য পশুদেরও— প্রায়ই ঘোড়াগুলি ভালুকের ভয়ে তাঁবুঘরে ঢুকে আসত! তাদের মধ্যে প্রচণ্ড ঠান্ডায় এসে পড়ত বুনো হরিণের দল। এই বিবিধ জীবজন্তুদের সঙ্গে, পূতিগন্ধ ও জঞ্জালের মধ্যেই বিশ্রাম নিতে হত র‍্যাঞ্চ-এ আশ্রিত মানুষগুলিকেও। বিবর্তনের নিয়মে, আজ আমেরিকার জীবনযাত্রার মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে র‍্যাঞ্চো ব্রেকফাস্ট, বিদেশের বহু জায়গায়, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে টিভিতে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'দ্য পায়োনিয়ার উওম্যান'-এর একটি পর্ব দেখলেই বোঝা যায়, এই ফ্রন্টিয়ার-জীবনযাত্রার ধরন ও সঙ্গে-সঙ্গে তার অপরিমেয় জীবনীশক্তি। এই র‍্যাঞ্চোর বিস্তীর্ণ পরিসরকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে

বহু জনপ্রিয় সিনেমা যেমন *দ্য হর্স হুইস্পারার*। এমন বহু র‍্যাঞ্চো-তে থাকত 'কাবাইয়াদা' (Caballada); এখানে ঘোড়া পরিবর্তন হত। স্প্যানিশ ভাষায় 'কাবাইয়ো' (Caballo) মানে ঘোড়া। এই সময়ে ঘোড়ার সাহায্য ছাড়া পথচলা ছিল অসম্ভব। তাই এই জায়গাগুলিতে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত ঘোড়াদের বিশ্রাম দিয়ে সতেজ ঘোড়া নিয়ে পথচলা অব্যাহত থাকত, কিন্তু ঘোড়া যদি বৃদ্ধ বা অসুস্থ হয়ে যেত, তখন তাদের মেরে ফেলা হত— তখন হিমঘরের উন্নত প্রযুক্তি ছিল না, তাই মৃত জানোয়ার প্রায়শই খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হত।

এডউইনের বইতে পাওয়া যায় 'মিশন বিল্ডিংস'-এর কথা, এগুলি ক্যাথলিক যাজকদের দ্বারা নির্মিত আবাসন, যেখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও ভ্রমণরত মানুষের আশ্রয় মিলত। ঘোড়া নিয়ে খরস্রোতা নদী পার হওয়া, খাদ্যাভাব মেনে নেওয়া, প্রায় খোলা আকাশের নীচে রাতের আশ্রয় নিতে বাধ্য হওয়ার মতো কষ্ট সহ্য করার পর, একটি পরিষ্কার শয্যা, কিছুটা আরামদায়ক তাপমাত্রা আর সাধারণ, কিন্তু বাড়িতে রান্না করা খাবার যে কতটা সুখের হত, তা সহজেই অনুমেয়।

সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে বোঝা যায় যে, আমেরিকায় বসবাস করতে আসা বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে ছিল (বলা ভাল, তৈরি হয়েছিল) একটি উদার মানসিকতা যা তাদের মননকে একটি নতুন, প্রতিস্পর্ধী চেতনায় উন্নীত করেছিল। এই অকুতোভয় অভিযাত্রিক মানুষগুলি এই প্রগতিশীল সময়েও (যা 'প্রগ্রেসিভ এরা' নামে চিহ্নিত) ছিলেন সন্ত্রস্ত। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে শুধুমাত্র এগিয়ে চলার জন্যও তাদের নিতে হয়েছিল ভিন্ন ধরনের আত্মরক্ষার পদক্ষেপ। এদের বহু কাহিনিই থেকে গেছে অবিস্মরণীয়। এসব জানা যায় বিক্ষিপ্ত কিছু ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে (যেমন চিঠি, ডায়েরি বা স্মৃতিচিহ্ন), যা থেকে একটি নিশ্চিত সমাজরেখা ও বিবর্তন লক্ষ করা যায়। যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই বসতি খুঁজে-চলা সাধারণ মানুষ, চারিদিকের সম্ভাব্য তথ্যগুলিকে চিন্তায় আরও শাণিত করে তোলার মতো ধী-শক্তি তাঁদের ছিল না। ছিল শুধু বেঁচে থাকার তাগিদ ও মুক্তচিন্তার সাময়িক অবকাশ। প্রদীপ্ত জীবনজিজ্ঞাসুদের দলে থাকত বিভিন্ন মানসিকতা ও কিছু অযৌক্তিকতাও, তাই দেখা যায় রাতের অন্ধকারে, শরীরে সীমাহীন ক্লান্তি নিয়েও দু-একটি ছত্র লেখা— যেমন অষ্টাদশবর্ষীয়া আজারিয়া স্মিথের পকেটে থাকত একটি ডায়েরি যাতে আছে নতুন একটি
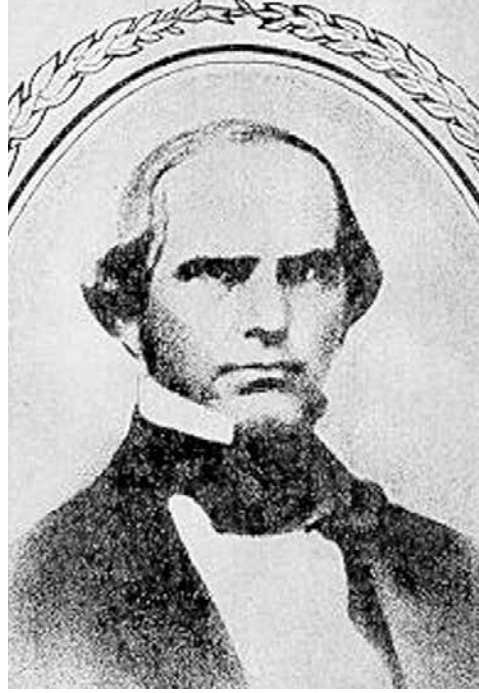
লান্সফোর্ড হেস্টিংস

রাস্তার নিরিখ, অন্য এক জন লিখে রেখে গেছেন কেমন করে বন্য ফল থেকে তাঁরা একটি রাম (Rum) জাতীয় পানীয় তৈরি করতেন, যার নাম কালিশে (Caliche)। প্রায়শই এই বিপদসঙ্কুল পথে দেখা যেত হিংস্র জন্তু, যেমন বিভার, শেয়াল, হায়েনা ছাড়াও বিষধর সাপ। মানুষের ইতিহাসে প্রয়োজনে শিকার করা শুনি, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দতে এই অবস্থায় 'শিকার'-এর মধ্য দিয়েও তৈরি হয়েছিল বন্ধুত্ব, সম্প্রদায় ও সুচেতনা সমৃদ্ধ দলগঠন যা পরে আমেরিকার রাষ্ট্রায়নকে একটি নিশ্চিত রূপরেখা দিয়েছিল।

আমেরিকার ইতিহাসে হোমস্টিড অ্যাক্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এই আইনটির সঠিক প্রণয়ন হয়েছিল ১৮৬২ সালে, সই করেছিলেন ষোড়শ প্রেসিডেন্ট, প্রবাদপ্রতিম এব্রাহাম লিঙ্কন। এই আইন আমেরিকায় বসবাসকারীদের নিজস্ব জমির সংজ্ঞার্থ দিয়েছিল, যে-কোনও প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক, যিনি কখনও আমেরিকার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেননি, অতিশয় অল্প মূল্যে ১৬০ একর জমির অধিকার/মালিকানা পেতেন। এই বিশাল জমিটিকে দেখাশোনা করে তাকে 'ফসলি' করে তোলা ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার সার্বিক চেষ্টা সত্ত্বেও কাজটি ছিল দুরূহ। কঠিন আবহাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে শস্যের ফলন যথোপযুক্ত হচ্ছিল না। তুলো, ভুট্টা ও গমের মতো শস্যের মূল্যবৃদ্ধি বহু মানুষকে (নিজ জমি রেখেও) পশ্চিমে যেতে বাধ্য করেছিল, এবং মেক্সিকোর যুদ্ধের পর (১৮৪৬-৪৮) মানুষের ঢল বেড়ে গিয়েছিল।

যাঁরা ১৬০ একর জমি জলের দরে পেলেন, তাঁরাও একভাবে শস্যের ফলন নিশ্চিত করতে পারলেন না। তাঁদের নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল— পোষ্যদের সঙ্গে বন্য জানোয়ারদের অবস্থান ও পোষ মানানোর অসুবিধা, অনুর্বর মাটি, জলাভাব প্রভৃতি কারণের জন্য আবার বহু মানুষকে 'ভ্রমণ' বেছে নিতে হল। কিন্তু ততদিনে রেলপথ, জলপথ ও সড়কপথের হয়েছে প্রভূত উন্নতি। ১৮৬৯ সালে সম্পূর্ণ হয়েছে এই দেশের দীর্ঘতম রেলপথ— ট্রান্সকন্টিনেন্টাল রেলরোড, পূর্ব থেকে পশ্চিমে ধাবিত এই ভ্রমণরেখার সঙ্গে যুক্ত যে-জীবনচেতনা, তা যখন এই সুবিশাল পরিসরে (যাকে আমেরিকান ফ্রন্টিয়ার বলা হয়) জনসংখ্যা ও গড়ে ওঠা আবাসনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেল তখন এই দেশের সেনসাস ব্যুরো থেকে ১৮৯০ সালে এল নিষেধাজ্ঞা, যা ক্লোজিং অফ দ্য ফ্রন্টিয়ার নামে চিহ্নিত।

এই প্রায় একশত বছরের ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি কি আমাদের শুধুমাত্র একটি দার্শনিক উপসংহারের দিকে ঠেলে দেয়? নাকি আমরা উজ্জীবিত হই আরও গভীর প্রশ্নে— মানুষ অন্যভূমে নিজের বসবাস স্থায়ী করতে চায় কোন কোন কারণে? যে মানুষগুলি নিজেদের বেঁচে থাকার তাগিদে একটি বিরাট মহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করতে বাধ্য হয়েছিল, সেই দেশটির রাষ্ট্র-নির্মাণের ইতিহাসে তারাই কিন্তু উপেক্ষিত ও অবহেলিত। প্রান্তিক অবস্থান, অবসাদ, অনটন, অস্বাস্থ্য ও ক্লিন্নতার মধ্যে থেকেও তাদের অবস্থানহীনতাই কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দর ঔপনিবেশিক আধুনিকতার চেনা ছকের বাইরে গিয়ে, জন্ম দিয়েছিল এক অন্যতর মানসবিশ্বকে। সেটাতে ছিল এক যুগোপযোগী এবং ভিন্ন পথগামী আধুনিকতা। তাই এই মানুষগুলির জীবনচর্চার আয়ুধ, আজকের নাগরিককে বহু জটিল প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়। মানবনীতি ও রাজনীতির পারস্পরিক অবস্থান একাধিক শতাব্দ ধরেই এই দেশে ছিল, সেই থেকে ক্রমশ উদ্ভূত হয়েছে এক বহুজনীন মমত্ববোধ, যা ভিন্ন থেকে ভিন্নতর অবস্থানের মধ্য দিয়ে গিয়ে তৈরি করতে পেরেছে নতুন বিশ্লেষণী পরিসর। সেই পরিসর থেকে লেখা হয় *দ্য ল অফ দ্য হার্ট*-এর মতো বই, লেখক স্যাম বি. জার্গাস। আমেরিকার নাগরিকদের মানসিকতার এক ভিন্নতর ও গণতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ববাদের দিশা দেন তিনি, যা গড়ে তুলতে পেরেছে একটি আকাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রবোধ।
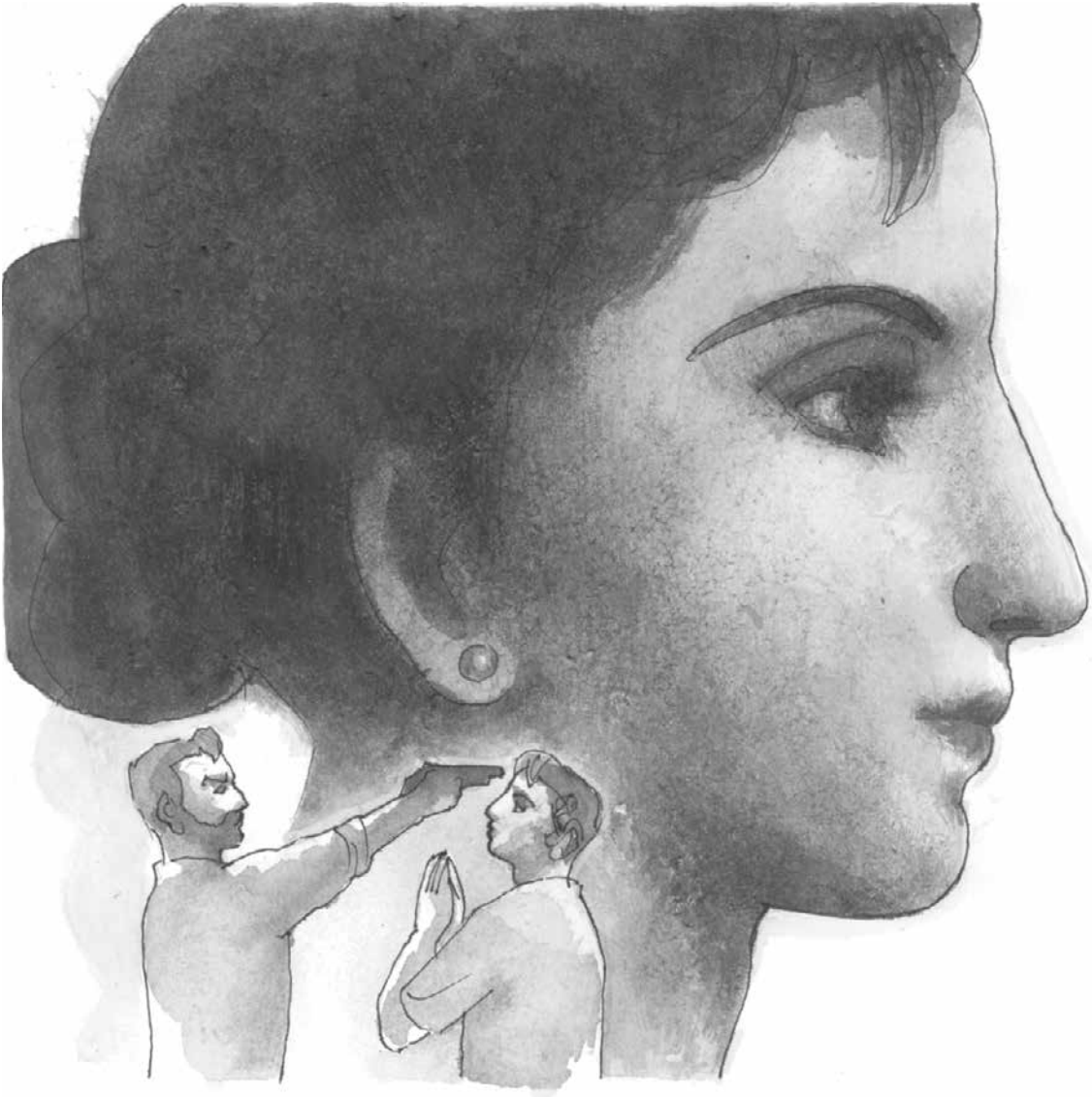
পিস্তল ও হরিপ্রিয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আরে! আপনার হাতে যে পিস্তল! সেটা যে আবার আমার দিকেই তাক করা! ব্যাপারটা কী মশাই? আপনি কী চাইছেন বলুন তো!

"এটা তো না-বুঝবার মতো জটিল ব্যাপার নয় মশাই! আমি আপনাকে খুন করতে চাইছি।"

"খু-খুন! সর্বনাশ! কিন্তু আমার মতো এক জন ছাপোষা মানুষকে খুন করে লাভ কী আপনার? আমার পকেটে সাকুল্যে একশো ত্রিশ টাকা আছে, মোবাইল ফোনটার দাম সাড়ে সাত হাজার টাকা, হাতঘড়ি মেরেকেটে তিনশো টাকার। আপনি চাইলে এগুলো হাসি মুখে দিয়ে দিতে পারি।"

"ছোঃ! ও সব পাতি জিনিস আমি ছুঁয়েও দেখতে চাই না।"

"আমিও তো তাই বলছি, পাতি মানুষের কাছে পাতি জিনিস ছাড়া আর কী-ই বা

থাকবে বলুন! কিন্তু আমাকে মারবার জন্য আপনাকে কেউ সুপারি দিয়েছে, এটাও বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার প্রাণটাও নিতান্তই তুচ্ছ বলেই আমার ধারণা। এমন গোমুখ্যু কেউ নেই, যে আমাকে মারবার জন্য সুপারি দিয়ে টাকা নষ্ট করবে। বাই দি বাই , আপনি লোক চিনতে ভুল করেননি তো!"

"না। আপনার নাম ভজন পাল, আপনি ফুড কর্পোরেশনের কেরানি। আপনি নেতাজি নগরে বৃন্দাবন দাসের বাড়িতে ভাড়া থাকেন। বাসায় আপনার বিধবা মা আর এক ছোট বোন আছে। ঠিক বলছি কি?"

"ওরে বাবা! আপনি তো দেখছি আমার নাড়িনক্ষত্র জানেন! না মশাই, আপনার তো তা হলে ভুল হয়নি! আমি ভজন পালই বটে, আমি নেতাজি নগরে বৃন্দাবন দাসের বাড়িতেই ভাড়া থাকি। বাসায় আমার মা আর ছোট বোন থাকে, সবই তো মিলে যাচ্ছে দেখছি! কিন্তু আমাকে মারবার দরকারটাই-বা কী আপনার! এমনিতেই তো আধমরা হয়ে আছি মশাই! এ তো মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে যাচ্ছে দাদা! একেই কি ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা বলে না!"

"আপনি নিজেকে যতটা নিরীহ ভাবেন, আপনি কি ততটাই নিরীহ?"

"আজ্ঞে, আমি তার চেয়েও নিরীহ। আমি একটা যাচ্ছেতাই রকমের প্রান্তিক লোক। শুনেছি পিস্তলের গুলির আজকাল অনেক দাম! দামি জিনিস আমাকে মেরে নষ্ট করবেন কেন?"

"আপনি ঠিকই বলেছেন। আজকাল পিস্তল বা গুলির ভীষণ দাম। তার ওপর এটা আবার অস্ট্রিয়ান পিস্তল গ্লক, দাম খুবই বেশি। গুলির দামও বেশ চড়া।"

"বাহ্, এ রকম পিস্তলের কথা শুনলে শ্রদ্ধা হয় মশাই! আজকাল কী যে হয়েছে, মুঙ্গের নাকি ভাগলপুরের সব দিশি, সাবস্ট্যান্ডার্ড বিচ্ছিরি ওয়ানশটার দিয়ে লোকে খুনখারাপি করছে! অতি নিম্নমানের জিনিস! আপনার পিস্তল দেখেই বোঝা যায় যে আপনি এলেবেলে লোক নন! মনে হয় আপনি বেশ রুচিশীল মানুষ।"

"কথাটা আপনি খুব একটা ভুল বলেননি। বরাবরই আমার নজর একটু উঁচুতে। বিদেশি সিগারেট, স্কচ-হুইস্কি, ইতালিয়ান জুতো, সুইস ঘড়ি, ফরাসি সুগন্ধ, ফ্ল্যাগশিপ মোবাইল ফোন... এ সবই আমার পছন্দ, বুঝলেন?"

"আপনাকে দেখলেই বোঝা যায় আপনি উঁচু থাকের লোক। আর উঁচু থাকের লোকদের আমি খুব পছন্দ করি। আমি যা হতে পারিনি, তা তাঁরা হয়ে দেখিয়েছেন তো! এই আপনার মতো মানুষ হলেন আমাদের কাছে একটা দৃষ্টান্তবিশেষ।"

"প্রাণের ভয়ে আপনি যে এখন অনেক কিছুই বলবেন, সেটা আমি বিলক্ষণ জানি। কিন্তু আসলে আপনার ক্লাসের লোকেরা আমার ক্লাসের লোকদের ঘেন্না করে।"

"মাইরি না! কালীর দিব্যি বলছি, আমি মোটেই ও রকম নই। আপনার ওপর আমার বেশ শ্রদ্ধা হচ্ছে। খুবই শ্রদ্ধা হচ্ছে। বাদামি টি শার্ট আর ঘন নীল জিন্সে আপনাকে দেখাচ্ছেও চমৎকার! এই ভেবে অবাক হচ্ছি যে, আপনি এখনও সিনেমায় চান্স পাননি কেন! পাওয়া উচিত ছিল।"

"তেল দেওয়ার চেষ্টা করছেন তো! চালিয়ে যেতে পারেন, তবে তাতে লাভ হবে না। কর্তব্য কর্তব্যই। আর আমাকে আমার কর্তব্য করতেই হবে। কিন্তু কথাটা আপনি খোশামোদ করার জন্য বললেও ভিতরে মাল আছে। কারণ আমি 'পুষ্পধনু' নামে একটা ছবিতে একটা নেগেটিভ রোলে এক বার চান্সও পেয়েছিলাম। লোকে আমার পারফরমেন্সের প্রশংসাও করেছিল। লেগে থাকতে পারলে এত দিনে নামডাক হয়ে যেতে পারত।"

"পারতই তো! আমি ফিল্ম ডিরেক্টর হলে আপনাকে হিরো বানিয়ে ছবি করতাম। ইন ফ্যাক্ট আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে শরৎবাবুর 'দত্তা' উপন্যাসের নরেনের চরিত্রে আপনাকে চমৎকার মানাত।"

"আরে নরেন-ফরেন না। ও সব ন্যাতানো হিরোর রোল আমার পছন্দ নয়। আমার পছন্দের রোল হল গব্বর সিং। নেগেটিভ রোল হলে কী হয়, দু'-দুটো বাঘা হিরোকে স্রেফ মার্জিনাল বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। বুঝলেন?"

"জলের মতো। আমি আপনার সঙ্গে এক মত, গব্বরই আসল হিরো।"

"এক মত না হয়ে এখন আপনার উপায় কী বলুন! তবে আমাকে খুশি করার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত আপনার কোনও লাভের আশা আমি দেখছি না। আমার কথার তো নড়চড় হতে পারে না মশাই।"

"না না, সে তো বটেই। আপনার কথার তো দাম থাকবেই। আমাদের মতো এলেবেলে তো আর নন। তবে কিনা কথা হল হাওয়া দিয়ে তৈরি! বললেই ফুস করে হাওয়ায় হাওয়া হয়ে যায়।"

"হাওয়া সম্পর্কে আপনার ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। হাওয়াকে হালকাপলকা জিনিস বলে ভাবেন নাকি? তা হলে আয়লা, আমফান, টর্নেডো, টাইফুনকে তো তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যেত! কথা হাওয়া দিয়েই তৈরি বটে, কিন্তু ওর জোরেই শ্রীকৃষ্ণ, জিশু, বুদ্ধদেব, সুভাষ বোস, গান্ধীজি সবাই মানুষকে উজ্জীবিত করে গেছেন।"

"আজ্ঞে, মুখ ফস্কে বলে ফেলেছি। তলিয়ে দেখলে আপনি যা বললেন তাই। আসলে এখন একটু নার্ভাস আছি তো। পিস্তলটা যে ভাবে আমার দিকে কটমট করে এক রোখা তাকিয়ে আছে, তাতে আমার বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে কিনা, তাই উল্টোপাল্টা বলে ফেলছি। এখন মনে হচ্ছে আপনি যা বলছেন, সেটাই ঠিক।"

"সেটাই তো হওয়ার কথা।"

"তা ইয়ে, সুপারিটা আপনাকে কে দিয়েছে, তা কি জানা যায়?"

"যায়। ইন ফ্যাক্ট সেটা জানবার অধিকারও আপনার আছে। যে-কোনও মানুষেরই শেষ ইচ্ছাকে আমাদের সম্মান জানানো উচিত।"

"ইয়ে, আপনি শেষ ইচ্ছের কথা বলায় আমার কেমন যেন পেটটা গুলিয়ে উঠে পটির মতো পাচ্ছে।"

"চালাকি করার চেষ্টা করবেন না। ভাবছেন আপনার পটি পেয়েছে বলে এখন আপনাকে আমি টয়লেটে যাওয়ার জন্য ছুটি দেব?"

"তা হলে স্যর, প্লিজ়, ওরকম ভাবে বলবেন না। শেষ ইচ্ছের কথা শুনলে কার না পটি পাবে বলুন!"

"হরিপ্রিয়া ঠিকই বলেছিল, আপনার মধ্যে পৌরুষের অভাব আছে।"

"হরিপ্রিয়াকে আমার অভিনন্দন জানিয়ে দেবেন স্যর, উনি একদম ঠিক বলেছেন। আমি ভীষণ রকম কাপুরুষ, ভয়ঙ্কর রকমের ডরপোক, বিচ্ছিরি রকমের নুতুপুতু এক জন মানুষ।"

"আশ্চর্য! হরিপ্রিয়া নামটা শুনেও আপনার মনে কোনও ঘণ্টি বেজে উঠল না! কোনও সুখস্মৃতি মলয় বাতাসের মতো বয়ে গেল না! কোনও ভাবাবেগ এসে হড়পা বানের মতো টেনে নিয়ে গেল না!"

"আজ্ঞে, মনে যে একদম পড়ছে না, তা নয়। নামটা শোনা-শোনাও লাগছে যেন। আর আপনি যা সব বলছেন ওগুলোও হচ্ছে বোধ হয়। আমি একটা পাগলা ঘণ্টির মতো কিছু শুনতে পাচ্ছি যেন, আর সুখস্মৃতি না কী বললেন যেন, সেটাও মলয় বাতাসের মতো বইছে বলেই মনে হচ্ছে, আর আবেগের হড়পা বানও কি আর টানছে না! খুব টানছে। তবে পরিস্থিতিটা এমন যে, আমি ওগুলো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।"

"তা হলে কি আপনি বলতে চান আপনি হরিপ্রিয়াকে ভুলে গেছেন! তাকে আপনার মনে নেই!"

"স্যর, সত্যি কথা বলতে কী, হরিপ্রিয়া কোন ছাড়, এখন আমার বাবার নামই মনে পড়ছে না। আপনি কি স্যর, কখনও পিস্তলের নলের সামনে দাঁড়িয়েছেন?"

"বহু বার। ইন ফ্যাক্ট আমি যে-জগতের লোক, সেখানে বন্দুক-পিস্তল হল খোলামকুচি। বুঝলেন?"

"যে আজ্ঞে। আপনি যে খুব উঁচু থাকের খেলোয়াড়, তা অনেক আগেই বুঝেছি স্যর।

আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে আপনাকে একটা প্রণাম করি।"

"খবরদার, ওই চেষ্টাও করবেন না!"

"তা হলে থাক স্যর।"

"এখন গুরুতর প্রশ্ন হল, আপনার হরিপ্রিয়াকে কেন মনে পড়ছে না! এটা তো মোটেই ভাল কথা নয়! সব জিনিসেরই একটা ম্যাথমেটিক্স আছে, একটা লজিক আছে, স্টেপ বাই স্টেপ একটা অ্যাপ্রোচ আছে। সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মতো। সম্পর্কও তো আসলে অঙ্কই! তাই নয় কি? আপনি কী বলেন?"

"আমিও তো তাই বলি। আপনার অঙ্কে কোথাও একটা ভুল হচ্ছে স্যর।"

"দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান! আপনি আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবেন না। আপনি কি বলতে চান আপনি দুলু বড়ালকেও চেনেন না! বললেও সেটা কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য হবে না, এই বলে রাখলুম। এ বার ঝেড়ে কাশুন তো মশাই ভজনবাবু। দুলু বড়াল নামে কাউকে কি মনে পড়ছে আপনার?"

"দাঁড়ান স্যর, দাঁড়ান। আমি ঘাবড়ে গেছি বটে এবং একটু স্মৃতিভ্রংশের মতোও হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু মনে হচ্ছে দুলু বড়ালকে আমি বোধ হয় চিনি।"

"এই তো, পথে এসেছেন! দুলু বড়ালকে আপনি কতটা চেনেন?"

"হুড়ো দেবেন না, স্যর। একটু কনসেনট্রেট করতে দিন প্লিজ়। এক জোড়া গোঁফ দেখতে পাচ্ছি, টুথব্রাশ গোঁফ, ঠিক বলছি স্যর?"

"ঠিকই বলেছেন, কিন্তু শুধু গোঁফটা মনে পড়লেই তো হবে না!"

"না স্যর, একটু সময় দিলে গোটাগুটি লোকটাই স্মৃতিপটে ভেসে উঠবে। এই তো মনে পড়েছে, সরু মতো সিড়িঙ্গে একটা মুখ, গালদুটো গর্তে ঢোকানো, কপাল চওড়া। হচ্ছে তো স্যর?"

"হচ্ছে, হচ্ছে। এ বার আরও একটু চেপে ভাবুন।"

"হ্যাঁ স্যর, চেপেই ভাবছি। তবে কিনা একটা জলজ্যান্ত পিস্তলের সামনে দাঁড়িয়ে কনসেনট্রেট করা ভারী কঠিন কাজ কিনা! তার ওপর পটির বেগটাও সামলাতে হচ্ছে তো! সেই সঙ্গে ইষ্টনাম জপ।"

"পারবেন, পারবেন। মানুষ চেষ্টা করলে কী না পারে!"

"তা তো ঠিকই স্যর। মানুষ এভারেস্টে ওঠে, বাঞ্জি জাম্পিং করে, সাঁতরে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়, হ্যামলেট বা ডাস ক্যাপিটাল লেখে, থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি আবিষ্কার করে।"

"তা হলে! আপনি সামান্য দুলু বড়ালকে মনে করতে পারবেন না?"

"মনে-মনে পোর্ট্রেটটা প্রায় এঁকে ফেলেছি স্যর। দুলু বড়ালের ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি আছে। হাড়েমাসে পোক্ত শরীর, সরু কিন্তু লোহার রডের মতো শক্ত। হচ্ছে কি স্যর?"

"বুলস আই। হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিলে গেছে। এ বার আরও একটু এগোন।"

"এই যে এগোচ্ছি। মনে পড়েছে স্যর, দুলু বড়াল এক জন গুন্ডা। না, না, শুধু গুন্ডা নয়, দুলু এক জন ডন। মস্তানদেরও মস্তান। ঠিক বলছি স্যর?"

"একদম ঠিক। দুলু বড়াল হল ডন। এ বার আরও একটু এগোন। আপনার প্রোগ্রেস

চমৎকার।”

“থ্যাঙ্ক ইউ স্যর। তখন বেকার ছিলাম স্যর, কাজকর্মের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছি, সেই সময়ে আমার ব্রজগোপাল মামা এক দিন এসে বললেন, ‘এক জন বড় মার্চেন্ট ইংরিজি নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন, তাঁর করেসপন্ডেন্সের জন্য এক জন ইংরিজি-জানা চালাকচতুর বিশ্বাসী লোক দরকার। তা তুই তো ইংরিজিতে অনেক নম্বর পেয়েছিলি, লেগে যা কাজটায়।’ তাই আমি পর দিনই গিয়ে দুলু বড়ালের সঙ্গে দেখা করি এবং কাজটা পেয়েও যাই।”

“হচ্ছে। এগোন।”

“বলতে নেই দুলু বড়াল আমার কাজে খুবই খুশি হলেন। কারণ, আমার বাবা সামান্য একটা লন্ড্রি চালাতেন, তবু কষ্ট করেও আমাকে একটা ভাল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়িয়েছিলেন। ফলে ইংরিজিতে আমি তেমন খারাপ নই। বুঝলেন তো!”

“বাহ্‌! এ তো রীতিমতো গৌরবেরই ব্যাপার।”

“ঠিক বলেছেন স্যর! এটা চাকরদের দেশ তো, তাই শুধু ইংলিশ জানলেই এ দেশে একটা হিল্লে হয়ে যায়। লোকে খাতির করে, থানার বড়বাবু চেয়ারে বসতে বলেন, লোকে ঘুরে তাকায়, কেউ-কেউ ভয়ও পায় বা সমীহ করে। তাই দুলু বড়ালের ওখানে আমার বেশ খাতির হল। ইংলিশের সঙ্গে আমি আবার কম্পিউটারও জানি বলে দুলুবাবু খুবই ইমপ্রেসড। এক দিন বললেন, ‘তুমি তো ইংরিজিতে ভাল, তা আমার মেয়েটাকে যদি একটু ইংলিশটায় সড়োগড়ো করে দাও।’”

“বাহ্‌, এই তো পথে এসে গেছেন! কেন যে এত ক্ষণ ভ্যানতারা করছিলেন! এ বার আগে বাড়ুন তো ভজনবাবু!”

“এই যে বাড়ছি স্যর। আমি পর দিন থেকেই হরিপ্রিয়াকে পড়াতে শুরু করলাম। তবে স্বস্তির সঙ্গে নয়।”

“কেন মশাই? অস্বস্তি কিসের?”

“পাছে হরিপ্রিয়ার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করে ফেলি, সেই ভয়ে ঘরের চার দিকে চারটে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো ছিল। শুধু তাই নয়, পড়ানোর সময় এক জন হাট্টাগাট্টা বাউন্সার আগাগোড়া দরজার কাছে একটা টুলে বসে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে পাহারা দিত। কোনও কথা বলত না।”

“তা হলে হরিপ্রিয়ার সঙ্গে আপনার রিলেশনটা হল কী করে?”

“রিলেশন! কী বলছেন স্যর? কিসের রিলেশন! কেমন রিলেশন! ভয়ে আমি মেয়েটার মুখের দিকে কখনও তাকাইনি পর্যন্ত! রিলেশনের প্রশ্ন উঠছে কেন? হরিপ্রিয়া দেখতে কেমন, তা পর্যন্ত আমার জানা নেই।”

“তা হলে তো মুশকিলে ফেললেন, হরিপ্রিয়াকে আপনি কি লক্ষও করেননি?”

“না না, আমি হরিপ্রিয়ার দু’খানা হাত দেখেছি বই কী! হাত দু’খানা কিন্তু বেশ সুন্দর, রোগা এবং পেলব। হাতে কয়েক গাছা সোনার চুড়ি ছিল, মনে আছে। হ্যাঁ, আর বাঁ হাতের অনামিকায় একটা আংটিও ছিল বটে, তাতে নীল রঙের একটা পাথর।”

“শুধু এটুকু থেকে কোনও ডিডাকশন তো সম্ভব নয়!”

“তবে পড়ানো শুরু করার মাস খানেক বাদে হরিপ্রিয়া একটা কাণ্ড করেছিল।”

“বটে! কী কাণ্ড বলুন তো!”

“এক দিন একটা খাতার পাতায় গোটা-গোটা অক্ষরে ইংরিজিতে লিখেছিল, ‘স্যর, ইউ আর কোয়াইট হ্যান্ডসাম।’ লিখে খাতার পাতাটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল।”

“বলেন কী মশাই! আমি তো এটাই শুনতে চাইছিলাম! তা আপনি তখন কী করলেন?”

“আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই বাউন্সারটার পকেটেও পিস্তল-টিস্তল কিছু একটা থাকত। খুবই অ্যাগ্রেসিভ অ্যাটিটিউড। তাই আমি কোনও রিস্ক নিইনি। অত্যন্ত শান্ত মুখে দুটো বানান কারেক্ট করে দিয়েছিলাম মাত্র। দুঃখের বিষয়, হরিপ্রিয়া ইংরিজিতে বেশ কাঁচা ছিল। সে কোয়াইট বানান লিখেছিল কুইট, আর হ্যান্ডসাম বানান লিখেছিল এইচ এ এন ডি এস এ এম।”

“শুধু বানান কারেক্ট করে দিলেন! জবাবে কি কিছু লেখা উচিত ছিল না আপনার?”

“স্যর, হরিপ্রিয়ার সামনে লাগাতার ঘাড় নিচু করে থাকতে হত বলে আমার ঘাড়ে স্পন্ডেলাইটিস হয়ে গিয়েছিল। আর আপনি এত ক্ষণে নিশ্চয়ই টের পেয়ে গেছেন যে আমার কারেজ ডেবিটের ঘরে!”

“আপনি হরিপ্রিয়াকে কখনও দেখেননি, এ কথা কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?”

“আমি নিজেকে বলতাম, ‘ওরে ভজন, ওর দিকে তাকালে তোর পাপ হবে।’ আর এ কথা কে না জানে যে, পাপের বেতন মৃত্যু! তবে হ্যাঁ, মানুষের তো নানা রকম অসতর্কতাও আছে, তাই না স্যর? তা সেরকমই কোনও অসতর্ক মুহূর্তে হয়তো হরিপ্রিয়ার মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল বা গালের সুন্দর ডৌল আবছা ভাবে এক ঝলক নজরে পড়ে গেছে, ঈশ্বর নিশ্চয়ই সেই জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন!”

“আমার মনে হয়, এক জন লাবণ্যময়ী, অ্যাট্রাকটিভ যুবতীর দিকে না-তাকানোটাই অপরাধ, আর এই অপরাধ ঈশ্বর কখনওই ক্ষমা করবেন না। কারণ, তিনি যেসব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন, তার দিকে না-তাকানোর মানে তাঁকেই অপমান করা। আপনার কি তাই মনে হয় না?”

“হয় স্যর। তবে ভাগ্যক্রমে ঈশ্বর পিস্তল ব্যবহার করেন না এবং তিনি আমাদের নানা পাপ এবং অন্যায় ক্ষমা করে দেন।”

“হ্যাঁ, ঈশ্বর একটু ওই রকমই অদ্ভুত আছেন বটে! এ বার আরও একটু এগোন। এর পর কী হয়েছিল?”

“সেটা খুব ইন্টারেস্টিং স্যর! বলব?”

“বলুন, আমি তো শুনতেই চাইছি।”

“কয়েক মাসের মধ্যেই হরিপ্রিয়া ইংরিজিতে বেশ সড়গড় হয়ে উঠেছিল। লিখত নির্ভুল, বলতও বেশ ভাল। আর হ্যাঁ স্যর, বলতে ভুল হয়ে যাচ্ছিল, হরিপ্রিয়ার কণ্ঠস্বরটিও ছিল বেশ রিনরিনে, রেশমের মতো।”

“দূর মশাই, গলার আওয়াজের সঙ্গে রেশমের তুলনা করা কি ঠিক হল? রেশমের মতো কণ্ঠস্বর কি হয়?”

“হয় না, না? তবে কিনা এ রকম অ্যাডভার্স সিচুয়েশনে এই সব উদ্ভট উপমা মাথায় আসা বিচিত্র নয়। আমার মাথা এখন নর্ম্যালি কাজ করছে বলে আমার মনে হয় না। পটির বেগটা এখনও আছে কিনা।”

“চুলোয় যাক আপনার পটি! আরও এগোতে থাকুন!”

“এই যে এগোচ্ছি। সেটা একটা বর্ষণমুখর সন্ধ্যা, বুঝলেন স্যর! সেদিন জলবেলুনের মতো বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছিল। সে কী বৃষ্টি স্যর! সৃষ্টিই ভেসে যাওয়ার জোগাড়। আপনি কি রবিবাবুর সেই গানটা শুনেছেন স্যর, ওই যে ‘এমন দিনে তারে বলা যায় এমন ঘনঘোর বরিষায়।’?”

“না মশাই, ও সব প্যানপ্যানে গান আমার তেমন পছন্দ নয়।”

“আজ্ঞে, সে তো বটেই, বীরপুরুষদের ও সব গান পছন্দ না হওয়ারই কথা। তবে সেদিন একটা বাংলা কবিতার ইংরিজি তর্জমা করতে-করতে হরিপ্রিয়া গুনগুন করে গানটা গাইছিল। কেন গাইছিল খোদায় মালুম, কিন্তু আমি তাতে প্রমাদ গুনছিলাম। কারণ ওই গানটার মধ্যে একটা থ্রেট ছিল।”

“থ্রেট! কিসের থ্রেট বলুন তো!”

“আজ্ঞে, ওই যে অমন রোম্যান্টিক সন্ধেবেলায় হরিপ্রিয়া আমাকে কিছু বলতে চাইছে, এটাই তো থ্রেট স্যর! হরিপ্রিয়া তো বলেই খালাস, কিন্তু তার হ্যাপা যে সামলাতে হবে আমাকে! তাই আমি গলাখাঁকারি দিয়ে হরিপ্রিয়াকে একটু সাবধান করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তা ফলবতী হল না। গানের সুর বজায় রেখেই তার মধ্যেই মেয়েটা তার মনের কথাগুলোও গুঁজে দিতে লাগল, ‘আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ...!’ আর আমি বিকট আতঙ্কে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলছিলাম, ‘তা হয় না, তা হয় না...’”

“হুঁ। তার পরই বোধ হয় একটা আনওয়ান্টেড ঘটনা ঘটেছিল!”

“এগজ্যাক্টলি স্যর। ওই জাম্বুবান

বাউন্সারটাকে হরিপ্রিয়া একটু আন্ডারএস্টিমেট করেছিল বোধ হয়। ভেবেছিল জাম্বুবানটা খেলাটা বুঝতে পারবে না। কিন্তু সবটা না-বুঝলেও বাউন্সারটা ‘ডাল মে যে কুছ কালা হ্যায়’, সেটা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল।”

“তার পর?”

“তার পর যা ঘটল, তা খানিকটা ইংরিজিতে যাকে বলে বিজ্ঞার। আমি কখনও তেমন জোরদার পেটাই খাইনি স্যর। ওই ছেলেবেলায় মায়ের হাতে চড়চাপড় বা বাবার হাতে সস্নেহ কানমলা বা টিচারদের কাছে একটুআধটু ঠোকনা, এই পর্যন্ত আমার দৌড়। প্রফেশনাল মারকুটেদের ধোলাই কেমন হয় সেই সম্পর্কে আইডিয়াই ছিল না কিনা। আপনার আছে কি স্যর?”

“আমার কথা ছেড়ে দিন। আমাদের জগৎটাই অন্য রকম। মার খেয়ে এবং মার দিয়ে তবে আমাদের বেঁচে থাকতে হয়। দিন নেই রাত নেই, যে কোনও সময়ে যে কোনও দিক থেকে, যে কারও অ্যাটাক আসতে পারে, এবং আসেও। ক্যালকুলেশনের একটু এ-দিক ও-দিক হলেই হয়ে গেল। আমাদের বেঁচে থাকাটাই হল সূক্ষ্ম হিসেবনিকেশ, সিক্সথ সেন্স, রিফ্লেক্স আর ভাগ্যের ওপর।”

“আপনি স্যর প্রাতঃস্মরণীয়। এ বার কি একটু পায়ের ধুলো নিতে পারি স্যর?”

“পাগল নাকি! ভিক্টিমকে ছ’ফুট দূরে রাখতেই আমি ভালবাসি।”

“তবে তাই হোক।”

“আগে বাড়ুন।”

“এই যে স্যর, বাড়ছি । হ্যাঁ, তার পর হল কী, হঠাৎ জাম্বুবানটা তার চেয়ার ছেড়ে উঠে নিঃশব্দে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। জ্বলন্ত চোখে চেয়ে আমাকে বলল, ‘কী লুল্লুভুল্লু হচ্ছে এ সব? অ্যাঁ! কী হচ্ছে?’ আমি আঁ-আঁ করে কিছু একটা বলবার বৃথা চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু কিছু কয়ে ওঠবার আগেই জাম্বুবানটা কী যেন একটা চালিয়ে দিল স্যর! একটা নাকে, একটা পেটে। তার পর আমার আর কিছু মনে নেই। চোখ অন্ধকার, মাথা ঝিমঝিম।

“আমি যত দূর জানি, লোকটা আপনাকে স্রেফ দুটো ঘুষি মেরেছিল, তার বেশি কিছুই নয়।”

“তাই হবে স্যর, তবে আমার মনে হয়েছিল কামানের গোলা। পরে শুনেছি আমাকে জলের ঝাপটা, অ্যান্টিসেপ্টিক, ব্যথার ইনজেকশন ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল এবং ওদের গাড়ি করেই আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়। এও শুনেছি, হরিপ্রিয়া প্রচণ্ড রেগে গিয়ে সেই জাম্বুবানকে চড়থাপ্পড় মারে এবং বাবার কাছে নালিশ করে দেয়। দুলুবাবু জাম্বুবানটাকে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে পাঠান। আর এইখানেই গল্পটার টার্নিং পয়েন্ট। আর এগোব কি স্যর?”

“নির্ভয়ে এগোন।”

“দিন চার-পাঁচ পরে এক দিন সেই জাম্বুবানটা এক সকালবেলায় এসে হাজির। মাথা নিচু, চোখে জল, মুখে অনুতাপ। তখন তাকে দেখে প্রায় চেনাই যাচ্ছিল না। প্রথমে আমার পায়ে ধরার চেষ্টা করেছিল, তাতে আমি ভড়কে যাই এবং চেঁচিয়ে উঠি। তার পর সে অবশ্য আমাকে আশ্বস্ত করে এবং কৃতকর্মের জন্য আন্তরিক ভাবে ক্ষমা চায়। সে আমাকে জানায় যে, তার নাম কালো মণ্ডল এবং সে দুলু বড়ালের এক জন বিশ্বস্ত অপারেটার। কী বলব স্যর, সেদিন সকালের ফটফটে আলোয় তাকে দেখে আমার বেশ এক জন ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছিল। কে জানে, হয়তো সকালের আলোরই ওরকম একটা গুণ আছে, ষন্ডাগুন্ডাকেও তেমন খারাপ লাগে না, পাষণ্ডকেও সাধুপুরুষ বলে মনে হয়। আমাদের বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগত এলে এখনও মিষ্টি খাওয়ানোর রেওয়াজ আছে স্যর। তাই কালো মণ্ডলকেও যথারীতি মিষ্টি বেড়ে দেওয়া হল এবং সে তা যত্ন করে খেয়েও ফেলল। তার পর সে গোপনে আমাকে কয়েকটা কথা বলেছিল স্যর।”

“কী কথা?”

“সে অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে আমাকে বলেছিল যে, সে হরিপ্রিয়াকে অনেক দিন আগে থেকেই ভালবাসে, কিন্তু মুখ ফুটে বলার সাহস ছিল না। সে জানত দুলু বড়াল তার এই বেয়াদবি সহ্য করবেন না। কিন্তু ভালবাসা আর কবে বিধিনিষেধ মেনেছে! সে এও বলল যে, হরিপ্রিয়াকে পাহারা দেওয়ার কাজটা সে নিজেই তার বসকে বলে নিজের কাঁধে নিয়েছিল। কারণ, আমাকে দেখে তার ভয় হয়েছিল হরিপ্রিয়াকে আমি পটিয়ে ফেলতে পারি। এ সব শুনে আমি যাকে বলে বিহ্বল হয়ে গেলাম। তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, হরিপ্রিয়ার দিকে আমি কখনও তাকিয়েও দেখিনি, কাজেই সে তার রোম্যান্টিক অভিযাত্রায় নিশ্চিন্তে আগু হতে পারে।”

“বললেন! বলতে পারলেন?”

“কেন স্যর, কিছু ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল নাকি?”

“মেয়েটা যে আপনাকে তার ভালবাসার কথা জানাল, খাতায় লিখে এবং গান গেয়ে, সেগুলোর কি কোনও দাম নেই নাকি? একটা মেয়েকে এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য, এত উপেক্ষা করাটা কি ঠিক হল মশাই?”

“এক জন ডনের মেয়ে, তার ওপর এক জন মস্তানের প্রেমিকা, এ রকম মেয়ে কি আমার পক্ষে যথেষ্ট বিপজ্জনক নয়? তবে আমার ভাগ্য ভালই বলতে হবে। ওই ঘটনার পরই আমি সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র পেয়ে যাই এবং হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। দুলুবাবুকে আমি ফোন করে চাকরির কথা জানাতেই উনি আমাকে ওঁর চাকরি থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। আমি বেঁচে গেলাম।”

“কই আর বাঁচলেন! আর-একটু পরেই তো আপনার লাশ এই ভাগাড়ে পড়ে থাকবে, মশা-মাছি উড়বে, পুলিশের ডোম এসে তুলে নিয়ে মর্গে চালান দেবে। ভগবান-টগবান মানেন নাকি? তা হলে আর পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি, ভগবানকে ইচ্ছে হলে ডাকতে পারেন। তবে ভগবানও কিন্তু আপনাকে বাঁচাতে পারবেন না, এই বলে রাখলাম। আমি মেয়েদের চোখের জল সহ্য করতে পারি না।”

“মেয়েদের চোখের জল! কোন মেয়ের চোখের জল স্যর? আমার সঙ্গে চোখের জলের সম্পর্ক কী?”

“চোখের জলই শুধু নয়, আরও খুলে বলতে গেলে সেই মেয়ে গত আট মাস যাবৎ যত চোখের জল ফেলেছে, তাতে একটা পুকুর হয়ে যায়।”

“না, না, এ রকম হওয়া তো মোটেই উচিত নয়! কিন্তু উনি চোখের জল ফেলছেনই-বা কেন?”

“দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, মেয়েটা আপনার মতো এক জন হৃদয়হীন পাষণ্ডের জন্য তার বৃথা অশ্রুমোচন করছে, এবং এক কাপুরুষের জন্য হা-হুতাশ। ভজনবাবু, হরিপ্রিয়া ভাল নেই। এক বার সুইসাইডও অ্যাটেম্পট করেছিল সে। সিলিং ফ্যানটা ভেঙে পড়ে যাওয়ায় বেঁচে যায়।”

“কিন্তু স্যর, হরিপ্রিয়ার যে কালো মণ্ডলের সঙ্গে অ্যাফেয়ার হওয়ার কথা!”

“আপনার মাথা। কালো মণ্ডল কি হরিপ্রিয়ার ক্লাস মশাই? হরিণের সঙ্গে কি হাতির জোড় হয়, নাকি ময়ূরের সঙ্গে মহিষের! তা ছাড়া তিনটে মার্ডার কেসে কালো মণ্ডল এখন জেলে। হয় তার ফাঁসি হবে, নয়তো কুড়ি বছরের জেল। যখন বেরোবে, যদি আদৌ বেরোয়, তখন তার বয়স হবে বাহান্ন বছর। আপনি তৈরি হোন, আমার পিস্তল ধৈর্য হারাচ্ছে, সে এই সব ভ্যানতারা পছন্দ করছে না। সে কাজের মানুষ, ভ্যাজরভ্যাজর পছন্দ করে না।”

“আপনার পিস্তলটার কী যেন নাম স্যর!”

“গ্লক। অস্ট্রিয়ায় তৈরি। কেন বলুন তো!”

“দিব্যি নাম স্যর, মরেও সুখ আছে। তবে গ্লকবাবুকে আমার বলতে ইচ্ছে করছে যে, আমার এখন কেমন যেন মরতে ইচ্ছে করছে না।”

“তা বললে তো হবে না। পিস্তল আর হরিপ্রিয়ার মধ্যে এক জনকে আপনার বেছে নিতে হবে। পনেরো সেকেন্ড সময় দিচ্ছি, ডিসাইড করে নিন, পিস্তল না হরিপ্রিয়া?”

“হরিপ্রিয়া, স্যর, হরিপ্রিয়া...”

অঙ্কন: সুব্রত চৌধুরী
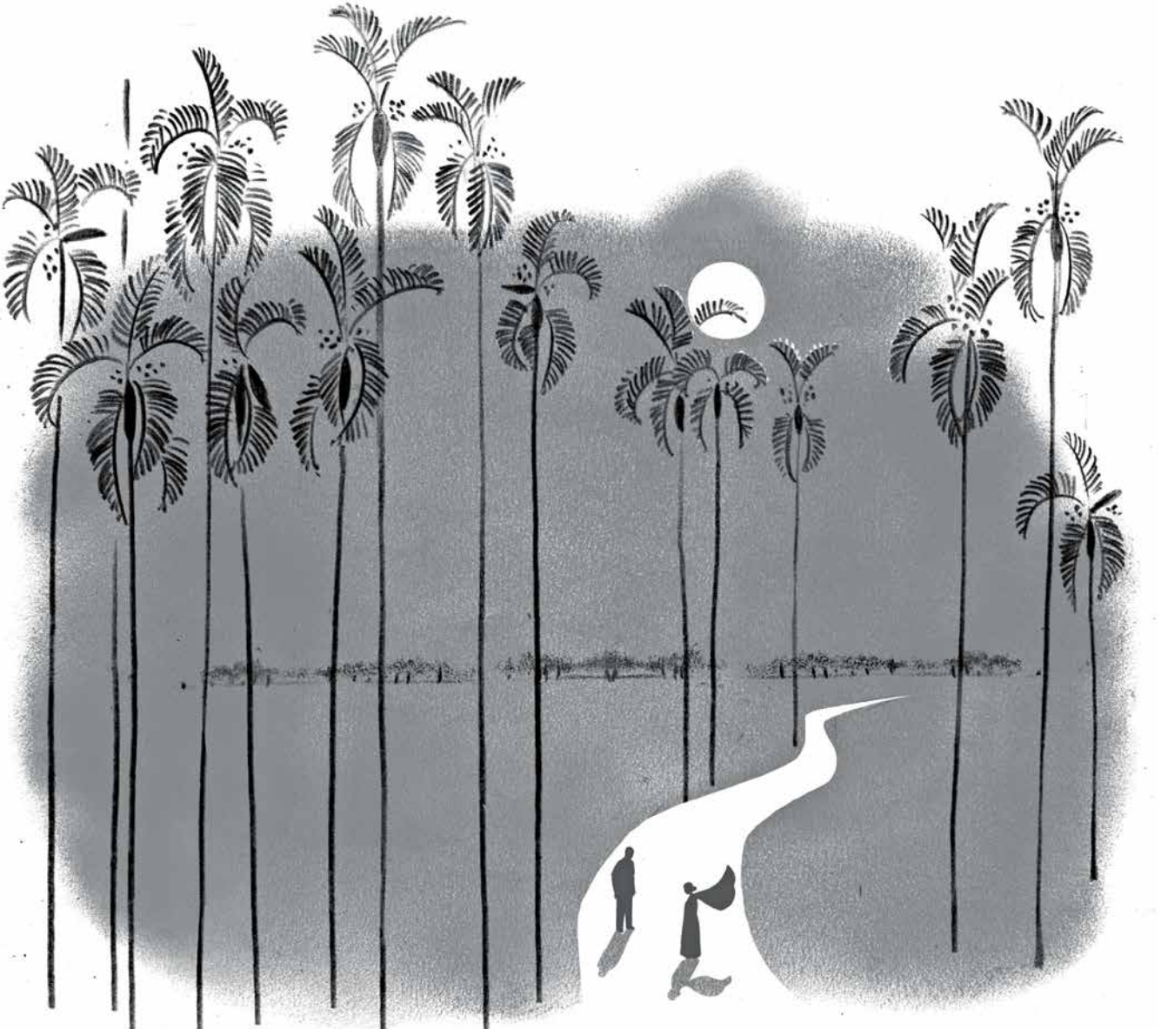
রেফারি

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

সত্যি করে বলো তো তুমি পুরুত না রেফারি? প্রায় গায়ের ওপর উঠে এসে কথাটা জিজ্ঞেস করল শিলা। এই মেয়েটাকে খুব ভয় পায় বিজন। ওদের পাশের বাড়িতেই থাকে। ওর বর জাহাজে চাকরি করে। ছ'-সাত মাস পরপর আসে। একটা ছেলে আছে শিলার। নাম শঙ্কু। ক্লাস ফাইভে পড়ে।

শিলা যেন কেমন। বিজনকে দেখলেই কেমন একটা চোখে তাকায়। আশপাশে কেউ না থাকলে আঁচল ফেলে দেয়! বাড়িতে মায়ের কাছে কারণে অকারণে এসে বসে থাকে।

ফাঁক পেলে বিজনকে একটু ছুঁয়ে দিয়ে যায়! কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, "তোমার দেশলাই ভেজা নাকি?"

এসব অশ্লীল কথা ভাল লাগে না বিজনের। চল্লিশ বছর বয়স হল ওর। চাকরি-বাকরি করে না। পুজো করে বেড়ায় বাড়ি বাড়ি। আর ফুটবল মাঠে রেফারিং করে। এর সঙ্গে আছে মায়ের পেনশন। তাতে চলে যায় কোনওমতে। কিন্তু বিজন বোঝে এভাবে চলবে না। মা মারা গেলে, পেনশন বন্ধ হয়ে গেলে ও মাঠে মারা পড়বে।

এই অঞ্চলের মাথা সুধাময় বাগচি বিজনকে পছন্দ করে। ওর বাড়িতে বিজন মাসিক পাঁচ হাজার টাকায় রোজ সকালে পুজো করতে যায়। সুধাময় বলেছে গঙ্গার পাড়ে পোড়ো বস্তি উঠিয়ে সেখানে যে রিসর্ট হবে, তাতে কেয়ারটেকারের কাজটা ওকেই দেবে!

কিন্তু বস্তি ওঠানোর ঝক্কি অনেক! বিশেষ করে টম আছে যে!

টম অজিতেশ মাইতি ওদের এই হায়েতপুরের নামকরা ছেলে। যেমন ভাল ফুটবল খেলে, তেমন মারকুটে। আবার কী একটা সংস্থাও যেন করে। তারা ওই পোড়ো বস্তির সমস্ত বাচ্চাদের পড়ায়। টম এই বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে টম আর সুধাময়ের মধ্যে একটা ঝামেলা ভাতের মতো ফুটছে।

বিজন এসবের থেকে দূরে থাকে। ও সামান্য মানুষ। ঝুটঝামেলা চিরকাল এড়িয়েই চলে। আর এড়িয়ে চলে বলেই তো টমের বড়দি রুবির সঙ্গে সম্পর্কটা নিয়ে ও এগোতে পারেনি। মায়ের আপত্তি মেনে ও সরে এসেছিল।

সে প্রায় পনেরো বছর আগের ব্যাপার! তার পর রুবির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল হাওড়ার দিকে। সেই বিয়ে টিকেছিল বছর পাঁচেক। তার পর ডিভোর্স হয়ে যায়। কী কারণে হয় কে জানে। তবে রুবি এক বছরের বাচ্চা নিয়ে ফিরে আসে ওদের হায়েতপুরে।

রুবির এখানে একটা লেডিস টেলারিং শপ আছে। তাতে চারটে মেয়ে কাজ করে। শুধু হায়েতপুর নয় আশপাশের অনেক জায়গা থেকে রুবির দোকানে জামাকাপড় বানাতে আসে মহিলারা!

ওর দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বিজন দেখে, চশমা চোখে গম্ভীর ভাবে বসে রয়েছে রুবি। চুলে একটু রুপোলি আভা। বয়স হলেও আজও রুবিকে দেখলে বুকের মধ্যে কেমন যে করে বিজনের! সেই স্কুলে পড়ার সময় রুবিকে দেখলে যেমন করত, ঠিক তেমন করে। মনে হয় বুকের মধ্যে কেউ যেন হাজার হাজার কাচের গুলি গড়িয়ে দিয়েছে!

মনে পড়ে একবার দুর্গাপুজোর ভিড়ে রুবির পার্স ছিনিয়ে নিয়ে পালানো একটা ছেলের পেছনে কেমন ভিড় ঠেলে দৌড়েছিল বিজন! শেষে গমকলের কাছে গিয়ে ধরে ফেলেছিল ছেলেটাকে। আর যা পিটিয়েছিল না!

ওই একবারই বিজন অমন করেছিল। তার পর আর কোনওদিন ওর মধ্যেকার সেই সাহসী মারকুটে ছেলেটা বেরোয়নি! চিরকাল নত হয়ে থেকেছে। এমনকি, হায়েতপুরের গঙ্গার পাশে যে-চার্চ আছে, সেখানে রুবির বিয়েতেও ওকে বন্ধুরা জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। রুবি ওর দিকে এক ঝলক তাকিয়েছিল। কোন ছেলে নিজের প্রাক্তন প্রেমিকার বিয়েতে যায়! সেই দৃষ্টির মধ্যে যে কী তীব্র ঘৃণা ছিল! ওদের সম্পর্ক থেকে বিজনের সরে আসা যে রুবি মানতে পারেনি।

সেই তখন আর আজকের দিন! রুবি যেন আর দেখতেই পায় না ওকে! বিজন কি কাচের তৈরি না হাওয়ার? ওকে কি চোখে দেখা যায় না! জীবনে মানুষ যখন সফল হতে পারে না তখন আস্তে আস্তে সে অদৃশ্য হতে থাকে। বিজনও কি তাই হচ্ছে!

এসব ভাবতে ভাবতেই আজ বাজার থেকে ফেরার পথে রবীন্দ্র সুইমিং ক্লাবের গলিতে ঢুকে পড়েছিল ও। আর সন্ধের এই অন্ধকার গলিতেই ওকে ধরেছে শিলা!

ক্লাবের টানা দেওয়ালের মাঝে একটা খাঁজ আছে আর সেই খাঁজের মধ্যেই শিলা ওকে প্রায় চেপে ধরেছে। বিজন যে কী করবে!

শিলা ফিসফিসে গলায় বলল, "তুমি এমন ম্যাদামারা কেন? আমার কী চাই বোঝো না? এত করে ডাকি, তাও আসো না কেন?"

বিজন নিজেকে যতটা সম্ভব সংকুচিত করে দাঁড়িয়ে আছে। শিলার গা থেকে পাউডারের গন্ধ আসছে। ভাল লাগছে না ওর। কেমন যেন গা গুলোচ্ছে!

শিলা আরও কাছে এগিয়ে এল! ওর বুকটা বিজনের বুক স্পর্শ করল এবার। শিলা একটা হাত দিয়ে ধরল ওর হাত। বলল, "আমি খুব খারাপ? নিজে থেকে আগ্রহ দেখাই বলে আমাকে সস্তা ভাবো?"

বিজন যে কী বলবে! এভাবে যে ও ভাবেনি। এত জটিল করে ভাবতে পারে না ও। শুধু নিজের ভাললাগা আর খারাপ লাগাটুকুই বোঝে। আর তো কিছু বোঝে না। সেখানে শিলা কীসব বলছে!

শিলা এবার খামচে ধরল জামাটা। বলল, "নিজেকে খুব বড় ভাবো না? নিজেকে তুমি..."

আচমকা গলির মুখ থেকে টর্চের আলো এসে পড়ল ওদের গায়ে। আর শুনল তিন-চারটে গলার হল্লা, "কে রে ওখানে? ওই শালা কী করছিস অন্ধকারে?"

শিলা ছিটকে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আর ভয়ে বিজন ওই দেওয়ালের গায়েই যেন আটকে গেল। ও দেখল চারটে ছেলে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। একজনের হাতে টর্চ আর অন্য তিনজন মোবাইল ফোনের আলো জ্বেলে রেখেছে।

"ও মাল, এ যে রেফারি! অন্ধকারে কী করছিলে কাকা? পেনাল্টি শট মারছিলে?" একটা ছেলে এসে সামনে দাঁড়িয়ে হাতে একটা অশ্লীল মুদ্রা করল।

শিলা বলল, "এই তোমরা কে?"

"আমরা কে? অন্ধকারে নোংরামো করা হচ্ছে আর বলছ আমরা কে? এই মাধো, রেকর্ড কর তো!"

মাধো নামে ছেলেটা মোবাইলের রেকর্ডিং অন করল।

বিজন বলল, "ভাই এসব কী করছ?"

"তোমার পুরকি বেড়েছে আর আমরা কী করছি! শালা এই ক্লিপ ভাইরাল করে দেব। অন্ধকারে নোংরামো বের করছি বাঞ্চোত!"

বিজন কী করবে বুঝতে পারল না। ওর হাত-পা কাঁপছে। এইসব ছেলেপিলে সাংঘাতিক নিষ্ঠুর হয়। সামান্য কিছুতেই যা খুশি তাই করতে পারে। বিজনের দিশাহারা লাগল। এবার কী করবে? এরা কি টাকা চায়! ওর কাছে মেরেকেটে পঞ্চাশ টাকা আছে। তাতে কি হবে?

একটা ছেলে এসে এবার কলার ধরল বিজনের। বাচ্চা ছেলে। বয়স বড়জোর উনিশ কি কুড়ি। কিন্তু এই টর্চের আলোয় দেখা গেল তার মুখে কেমন একটা হিংস্র উল্লাস। যেন ভয়ঙ্কর কোনও কাণ্ড ধরে ফেলেছে।

"বল বাঞ্চোত কী করছিলি অন্ধকারে! বল!" ছেলেটা বিজনকে দেওয়ালে চেপে ধরল। দলে থাকলে বিড়ালও যে বাঘ হয়ে ওঠে, এটা জানে বিজন। ওর ভয় হচ্ছে গলিতে আরও লোক জমা হয়ে গেলে কী হবে!

"ভাই কিছু করিনি তো। প্লিজ় এমন কোরো না!" বিজন কোনওমতে বলল।

"শালা!" ছেলেটা ঠাস করে চড় মারল বিজনের গালে! বিজনের মনে হল গালে কেউ যেন লোহার পাত ঘষে দিয়েছে।

"আজ শালা তোমাদের..." ছেলেটা আবার হাত তুলল। কিন্তু মারার আগেই গলির অন্য প্রান্ত থেকে একটা আওয়াজ এল, "কে রে ওখানে? কী করছিস! কে?"

বিজন দেখল ছেলেগুলো থমকে গিয়েছে। দেখল, ওদের দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে টম। আর ওর পিছনেই রুবি!

দুই

সুধাময়ের বাড়িটা বিশাল। লোহার গেট দিয়ে ঢুকে একদিকে বড় বাগান। বাগানের

পাশে পুকুর। আর পুকুরের উল্টোদিকে মন্দির। সেখানেই রোজ সকালে পুজো করে বিজন। ওকে সাহায্য করে বাড়িরই একটা ছেলে। গোপাল। সাহায্য মানে প্রসাদের ফল কেটে দেওয়া। বাগান থেকে ফুল তুলে দেওয়া! এই আর কী।

আজ পুজোর পরে গোপাল বলল, "বিজনদা, তোমরা রেফারিরা ভাল প্লেয়ারদের গার্ড করে খেলাও, না?"

"হ্যাঁ তো," বিজন বলল, "বিউটিফুল গেম হল ফুটবল। তার বিউটি ধরে রাখে ভাল প্লেয়াররাই। তাই তাদের গার্ড দেওয়া দরকার। পেলেকে যেভাবে ছেষট্টির ওয়ার্ল্ড কাপে মারা হয়েছিল, মারাদোনাকে যেভাবে বিরাশির ওয়ার্ল্ড কাপে উত্যক্ত করা হয়েছিল, তাতে ফুটবলেরই ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু ছিয়াশিতে যেই কড়া হল রেফারিরা, অমনি ফুল ফুটল মাঠে!"

গোপাল বলল, "তোমার একটা মোবাইল থাকলে এখনকার কত ম্যাচ তুমি দেখতে পেতে! তুমি যে কী বিজনদা! আজকালকার দিনে তোমার নাকি মোবাইল নেই! তুমি এক পিস আইটেম।"

বিজন কথা না বলে হাসল শুধু। তার পর প্রসাদের বারকোশটা নিয়ে উঠল।

মন্দির থেকে সোজা ওকে যেতে হয় সুধাময়ের অফিসে। বাড়ির নীচের তলায় সেটা। সেখানে সবাইকে প্রসাদ দিয়ে ও যায় দোতলায়। সুধাময়ের মা, স্ত্রী আর দুই মেয়ে থাকে সেখানে। সঙ্গে কাজের লোকজনও রয়েছে। তাদেরও প্রসাদ দেয়। তার পর বারকোশটা ঠাকুরঘরে রেখে দিয়ে পুকুরে হাত-পা ধুয়ে ওর ছুটি হয়।

সুধাময়ের স্ত্রীকে বউদি বলে ডাকে বিজন। খুবই শান্ত আর ভাল মহিলা। স্বামীর ভয়ে কিছুটা তটস্থও যেন। তা বউদির আর দোষ কী! হায়েতপুরের বেশির ভাগ মানুষই সুধাময়ের ভয়ে তটস্থ! তার ওপর সুধাময় নাকি সামনের বছর বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়াবে। একবার এমএলএ হয়ে গেলে তো হাতে মাথা কাটবে মানুষজনের। বিজন মনে মনে ভাবে এমন একটা দাবাখাবা মানুষ যদি ও হতে পারত! তা হলে এমন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জীবন কাটাতে হত না। কিন্তু পাশাপাশি এটাও বোঝে যে, ওর মধ্যে সেই বারুদ নেই। নাকি আছে? কিন্তু সেটা ভেজা! আর আবার শিলার কথা মনে পড়ে গেল ওর।

ওঃ, সেদিন সন্ধেবেলা টম না এলে যে কী বিপত্তি হত! টম এসে ছেলেগুলোকে সামলেছিল। ওদের মোবাইলের ভিডিয়ো দাঁড়িয়ে থেকে মুছিয়েছিল। তার পর যাওয়ার আগে বলেছিল, "আমি জানি তুমি কিছু করোনি বিজনদা। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।"

বিজন অসহায়ের মতো দেখেছিল, কিছু না বললেও ওই আবছায়ার মধ্যেও রুবির চোখে কেমন একটা ঘৃণা! যেন বিজন নর্দমা থেকে সারা গায়ে নোংরা মেখে উঠে এসেছে।

তার পর থেকে মাঝে মাঝেই রুবির ওই দৃষ্টিটা দেখতে পাচ্ছে বিজন। আচ্ছা, সেই দৃষ্টিতে কি শুধু ঘৃণাই ছিল, কষ্ট কি ছিল না একটুও!

বারকোশটা নিয়ে সুধাময়ের বড় অফিসে গিয়ে ঢুকল বিজন। আর ঢুকেই থমকে গেল। দেখল, টম দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সুধাময়ের মুখচোখ লাল। কপালের শিরা ফুলে উঠেছে।

টম বলল, "আপনাকে ভাল ভাবেই বলছি জেঠু, পোড়ো বস্তিতে হাত দেবেন না। গরিব মানুষজন থাকে ওখানে। অধিকাংশই জেলে সম্প্রদায়ের। কিছু মাঝিও রয়েছে। নদীতেই ওদের রুজি রোজগার। ওদের পেটে লাথ মারবেন, তা আমি হতে দেব না।"

সুধাময় বলল, "ওদের তো আমি নতুন জায়গা দেব। তোর এত কথা বলার কী!"

"নতুন জায়গা! সে তো বেলপুকুরের ভেতরে! নদী থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূর! সেখান থেকে এসে নদীতে কাজ করবে! পলিটিকাল কানেকশন আছে বলেই কি যা খুশি তাই করবেন? আমরা হতে দেব না।"

"কত লাগবে তোর? বস্তি অবধি পাকা রাস্তা আছে। নদীর অমন বাঁক। কী সিনিক বিউটি! রিসর্ট হলে কর্মসংস্থান হবে। ওই কুড়ি তিরিশ ঘরের জন্য কত লোকের রুজি আটকে দিবি জানিস?"

"গড়পোঁতার দিকে করুন," টম বলল, "ওখানকার বিউটি আরও বেশি! জায়গাও অনেক!"

"আরে পাঁঠা!" সুধাময় দাঁড়িয়ে উঠল, "ওদিকে কমিউনিকেশন নেই! ভাঙা বাঁধের রাস্তা শুধু। ফালতু কথা বলিস কেন? যা বলছি শোন। কত নিবি বল। ঝামেলা করিস না।"

"সবাই কি আর চোর-জোচ্চোর হয় জেঠু! যা বললাম মনে রাখবেন। বেকার ঝামেলা বাড়াবেন না," টম আর না দাঁড়িয়ে হুড়মুড় করে প্রায় বিজনকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সুধাময় দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "শুয়োরের বাচ্চা ফুটবল নিয়ে থাকলে ভাল করত। কিন্তু না, পিপীলিকার পাখা হয়েছে! এবার মরবে।"

তিন

আজ ইস্টবেঙ্গল আর ভ্রাতৃসংঘের খেলা ছিল। অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির দায়িত্ব ছিল বিজনের। খেলা সেরে টেন্টেই ভেজিটেবল স্যুপ আর হাফ রুটি খেয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। সেখান থেকে বাসে করে বালিগঞ্জ স্টেশনে এসে, ট্রেনে করে হায়েতপুরে আসতে আসতে রাত আটটা বেজে গিয়েছে।

স্টেশনে নেমে কালিদার চায়ের দোকানে একটু দাঁড়ায় বিজন। আজও দাঁড়াল। চারদিকে লোডশেডিং হয়ে আছে। আশপাশে লোকজনও কম।

বিজন এক ভাঁড় চা নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার গো কালিদা? সব এমন ফাঁকা কেন?"

কালিদা বলল, "আর বোলো না। দুপুরে খুব মারামারি হয়েছে। কলকাতা থেকে প্র্যাকটিস সেরে টম এসে স্টেশনে নেমেছিল আড়াইটে নাগাদ। ওই বটতলার কাছে সুধাদার ছেলেপিলেরা ওয়েট করছিল। ব্যস, ওকে ধরে ফেলে। তুলে নিয়ে গিয়েছিল পাম্প হাউজের পিছনে। ওদিকে পোড়ো বস্তির দুটো ছেলে দেখে ফেলে নিজেদের ছেলেপিলেদের খবর দেয়! তার পর যা মারামারি হয়েছে, ভাবতে পারবে না! সেই সত্তর সালের পরে এমন ক্যালাকেলি এই অঞ্চলে আর হয়নি। সুধাদার চারটে ছেলে হাসপাতালে ভর্তি। টম নাকি একাই দুটোকে মেরে নাক-মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে। পুলিশ এসেছিল। তবে কাউকে ধরেনি। দু'দিক থেকেই চাপ আছে তো! তার পর থেকেই গোটা এলাকাটা টেন্সড হয়ে আছে।"

চা শেষ করে আর দাঁড়াল না বিজন। এত কিছু হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে!

এখান থেকে সর্দার পাড়ার ভেতর দিয়ে ওদের বাড়ি হেঁটে পনেরো মিনিটের মতো। সামনেই পূর্ণিমা। চাঁদ বাড়ছে। আকাশ উপচে আলো এসে নামছে মফস্সলের আনাচে-কানাচে। পিন্টাদের সারিসারি সুপুরিগাছগুলোকে এই জ্যোৎস্নার মধ্যে কী অদ্ভুত যে লাগছে! কংক্রিটের আঁকাবাঁকা পথ সাদা ফটফট করছে। আশপাশের ঝোপ থেকে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। মাধবীলতা কি?

বিজনের মনে হচ্ছে এই চরাচরে যেন কেউ নেই! গাছগাছালির মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে ও-ই একমাত্র পথিক। ঠিক যেন ওর নিজের জীবন।

ওর মনে হল, রিসর্টটা কি হবে না? সুধাময় বলেছিল ওকে একটা কাজ দেবে ওখানে। হাজার পনেরো মতো মাইনে পাবে। রিসর্টটা হলে ভাল হয়। কিন্তু টম যা করছে তাতে যে কী হবে!

বিজনের নিজের এই মনোভাবটা নিজেরই কেমন যেন লাগল। ও কি লোভী হয়ে গিয়েছে! পোড়ো বস্তির লোকজনের কী হবে না ভেবে ও নিজের দিকটাই দেখছে! মা ওকে বলে নিজের দিকটা দেখতে। কালীদা বলে। এমনকি, কলকাতা মাঠে যে ক'জন বন্ধু আছে তারাও বলে। কিন্তু বিজনের যে মনে পড়ে যায় ছোটবেলার সেই সকালটার কথা!

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান ছিল ওদের স্কুলে। হেডস্যার বলেছিলেন, "আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে/ আসে নাহি কেহ অবনী পরে/ সকলের তরে সকলে আমরা/ প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।"

সেই দিন হাওয়া দিচ্ছিল খুব। বর্ষার মেঘ ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল নীল আকাশ। তার আলোয় ও দেখেছিল ছোট্ট রুবি মেয়েদের লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাওয়ায় উড়ছে ওর চুল, আকাশি শাড়ির ছোট্ট আঁচল। সেই ক্লাস ফাইভের বিজনের মনে হয়েছিল, স্যারের কথাগুলোই ঠিক। শুধু নিজের কথা ভাবাটা সত্যি মানুষের মতো কাজ নয়। ওকে অনেক ভাল মানুষ হতে হবে, ওকে সৎ মানুষ হতে হবে। রুবি যেন ওকে চিরকাল ভাল মানুষ বলে জানে।

রুবির কথা ভাবতে ভাবতেই আচমকা রুবি চলে এল ওর সামনে। ডান দিকে চিরদাদের বাড়ির লোহার গেট খুলে রুবি এসে দাঁড়াল রাস্তায়। বিজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল।

এই জ্যোৎস্না, বাতাসে জড়িয়ে থাকা মাধবীলতার গন্ধ, এই নরম হাওয়া, কতদিন পরে যে পৃথিবীতে ফিরে এল! বিজন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে হল আজও কোনও উৎসব!

রুবি নিজেকে সামলে নিল দ্রুত। তার পর মাথা নামিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল একটাও কথা না বলে।

বিজনের ইচ্ছে হল কিছু বলে। কিন্তু পারল না। শুধু দেখল, জ্যোৎস্নার মধ্যে মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে রুবি। গোলাপি তাঁতের শাড়িতে ওকেও যেন মাধবীলতা ফুলের মতোই লাগছে!

বিজন ভাবল, রুবির চোখে আজ কেমন দৃষ্টি ছিল? ঘৃণার না কষ্টের?

চার

বিজনের বাড়িয়ে দেওয়া বারকোশ থেকে একটা শসা আর সন্দেশ তুলে নিয়ে সুধাময় পাশে বসে থাকা ওর ডান হাত, মলয়কে বলল, "তুই শিওর তো?"

মলয় বলল, "দাদা আমি খবর নিয়েছি। আজকে ম্যাচ আছে ওর। সাড়ে চারটেয় শুরু হয়ে সাড়ে ছ'টার মধ্যে শেষ হবে। মোহনবাগান মাঠে ম্যাচ। সাধারণত খেলা শেষ হওয়ার একঘণ্টা পরে ও বেরোয়।"

"ও খেলবে তো?"

মলয় বলল, "ওদের ভাইটাল ম্যাচ। জিতলেই লিগের থার্ড পজ়িশনে উঠে যাবে! ওদের কোচ টমকে নামাবেই। ওর মতো স্ট্রাইকার কি এখন আছে নাকি! সামনের বছরেই বড় দলে খেলবে।"

"সামনের বছর!" সুধাময় বাঁকা ভাবে হাসল, "তোরা আশপাশে ফিল্ডিং লাগাবি। কিন্তু সোয়া ছটার পরে। ম্যাচ ওরকম সময় শেষ হবে। তার পর সাতটা নাগাদ যেই টেন্ট থেকে বেরোবে অমনি তুলে নিবি। সোজা ফারাক্কার ওদিকে নিয়ে যাবি। সেখানে মেরে নদীর পাশে কোথাও ফেলে দিবি। শুধু তোদের মোবাইলগুলো যেন এই হায়েতপুরেই থাকে। আর ওর মোবাইলটাও, ওকে তোলার পর, ওর থেকে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিবি। বুঝেছিস?"

মলয় উত্তেজিত ভাবে মাথা নাড়ল, "একদম শেষ দাদা?"

"তোর টাকা চাই, না চাই না?" সুধাময় চোয়াল শক্ত করল, "আমি দুই খোকা খেয়ে বসে আছি। মালটাকে সরাতেই হবে। ফালতু ক্যাচাল বাঁধাবি না। আজ রাতেই কাজ সারবি। আমি বলে রাখব, দুটো গাড়ি তুলে নিবি ভুবনের গারাজ থেকে। নাম্বার প্লেট পালটানো থাকবে। কোনও চিন্তা নেই। এখন বেরিয়ে যা।"

বারকোশটা সবার সামনে ঘুরিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল বিজন। ওরা কী সাবলীল ভাবে এসব কথা বলল! তাও ওর সামনে! ও কি সত্যি অদৃশ্য, নাকি ওকে আর মানুষ বলেই ধরে না কেউ!

বিজনের হাত কাঁপছে। বারকোশটাকে প্রচণ্ড ভারী মনে হচ্ছে! আজ টমকে ওরা মারবে? আজ তো সত্যিই ম্যাচ আছে। টমদের ক্লাব রুপোলি শিবিরের সঙ্গে সত্যম এফসি-র। আর শুধু তাই নয় আজকের ম্যাচে রেফারি তো বিজন নিজে!

পাঁচ

ঘড়ি দেখল বিজন। আর দু'মিনিট বাকি আছে। ও সঙ্গের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি দু'জনকে ইশারা করে ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে মাঠের দিকে হাঁটা দিল।

আজ হাওয়া দিচ্ছে বেশ। সঙ্গে নরম রোদ! এসব ভাল লাগে বিজনের। কিন্তু আজ তত ভাল লাগছে না। বরং টেনশন হচ্ছে খুব! প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে। সুধাময়ের খুনিরা কি এখনই এসে গিয়েছে? নাকি সময় মতো আসবে!

চোয়াল শক্ত করল বিজন। দেখল দুই দল মাঠে নামছে। সত্যম এফসি-র প্লেয়াররা নীল হলুদ জার্সি পরে আছে। আর রুপোলি শিবির পরেছে সাদা। খেলার ফলাফল এখনও পর্যন্ত এক-এক চলছে। টম যথেষ্ট ভাল খেলছে। সত্যম এফসি-র ডিফেন্স টমকে আটকাতে হিমশিম খাচ্ছে। সেকেন্ড হাফে খেলা যে হাড্ডাহাড্ডি হবে, সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

মাঠে নামার আগে সুহাস নামে অ্যাসিসট্যান্ট রেফারিটি ওকে বলছিল, "বিজন, সেকেন্ড হাফ কিন্তু টাফ হবে। রুপোলির মাঝমাঠের ওই নাটা ছেলেটা, দেবাশিস, কিন্তু হেব্বি কনুই চালাচ্ছে। দেখো।"

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচটায় সেকেন্ড হাফ শুরু হয়ে গেল। সত্যম এফসি-র কিপো নামে বিদেশি ছেলেটো বলটা ব্যাক পাস দিয়ে আচমকা দৌড় শুরু করল সামনে দিকে। আর পেছনে ঠেলা বলটা সত্যম এফসি-র লম্বামতো রাইট হাফ জয়নাল ওই কিপোকে লক্ষ করেই চিপ করে দিল।

বিজন দেখল, বলটা উঁচু হয়ে গিয়ে পড়ছে কিপোর পায়ে। আর তখনই দেবাশিস গিয়ে লাফিয়ে পড়ল ওর ওপর। তাও একদম বুটের স্টাড তুলে! পাটা গিয়ে লাগল কিপোর পেটে। ওঁক করে শব্দ করে কিপো পড়ে গেল মাটিতে।

বিদেশে হলে নির্ঘাত লাল কার্ড। কিন্তু এটা বিদেশ নয়। তার ওপর সাংঘাতিক টেনশনের ম্যাচ। দু'জনকেই জিততে হবে। ফলে এখানে লাল কার্ড দেখিয়ে দিলে বিপদ আছে। এই সব ম্যাচে গ্যালারি ভর্তি দর্শক হয় না। কিন্তু যারা আসে তারা জান কবুল টাইপ।

কিপো মাঠে পড়ে আছে। সত্যম এফসি-র কিছু ছেলে গিয়ে দেবাশিসকে ঘিরে ধরেছে। রুপোলি শিবিরের কয়েকজন ছেলেও গিয়ে জড়ো হয়েছে। সামান্য ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে। সত্যম এফসি-র ক্যাপটেন শঙ্কর এসে বিজনকে বলল, "পরিষ্কার লাল। এভাবে মারছে তখন থেকে! আপনি দেখছেন না?"

বিজন কোনও উত্তর না দিয়ে হলুদ কার্ড বের করে এগিয়ে গেল। তার পর ভিড়ের মধ্য থেকে দেবাশিসকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে হলুদ কার্ড দেখাল।

"বাঃ! আপনি কেমন রেফ?" শঙ্কর পাশে এসে হাত পা ছুড়ে অঙ্গভঙ্গি করল।

"লেটস প্লে!" বিজন কথাই বাড়াল না।

কিন্তু শঙ্কর পাশে পাশে হাঁটতে লাগল, "অমন স্টাড দেখিয়ে ফাউল! ক্লিন রেড কার্ড! দিলেন না! এই জন্য আমাদের এখানে ফুটবলের এই হাল। আপনাদের মতো ফালতু মাল থাকলে এই হবে।"

আচমকা টম এসে দাঁড়াল শঙ্করের সামনে, তার পর কথা নেই বার্তা নেই, 'চোপ শালা' বলে ঠাস করে থাপ্পড় মারল একটা।

শঙ্করের কতটা লাগল কে জানে, কিন্তু 'ও মাগো' বলে পড়ে গেল। সত্যম এফসি-র খেলোয়াড়রা এসে টমের ওপর লাফিয়ে পড়ল এবার। রুপোলি শিবিরের ছেলেরাও এসে গোলমালে যোগ দিল। মাঠের মধ্যে নিমেষে খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেল।

মিনিট পাঁচ-সাতেক পরে শান্ত হল সব। বিজন আর দ্বিধা করল না। সোজা পকেট থেকে লাল কার্ড বের করে দেখিয়ে দিল টমকে, তার পর হাত দিয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে বলল।

টম অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে। তার

পর মাথা নেড়ে জার্সি খুলে মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল।

রুপোলি শিবিরের দর্শকরা আর কর্মকর্তারা সাইড লাইন থেকে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে গালাগালি করতে শুরু করল। দু'-একজন তো মাঠে ঢুকে বিজনকে ধাক্কাও দিল। বলল, "চোট্টা শালা! টাকা খেয়েছে!"

শেষে চারজন পুলিশ আর অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারিরা এসে বিজনকে বাঁচাল।

খেলার মাঠে এমন হয়। এসব মনে নিলে হয় না। বিজন সময় নিল একটু। তার পর ঘড়ি দেখল একবার। সময় কতটা নষ্ট হল দেখা দরকার। প্রায় পৌনে ছটা বাজে। চোয়াল শক্ত করল বিজন। তার পর বাঁশি বাজিয়ে খেলা শুরু করে দিল আবার।

ছয়

আজ পূর্ণিমা। বাড়ির সামনের ছোট্ট বাগানটায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল বিজন। ন'টা বাজে। মা নেমন্তন্ন বাড়িতে গিয়েছে। বাড়িতে ও এখন একা। তাই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে একটু। হাওয়া এসে জড়িয়ে যাচ্ছে শরীরে। আঃ! ও চোখ বন্ধ করল।

গেটে এবার শব্দ হল একটা। মা কি ফিরল! চোখ খুলল বিজন। আর সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন করে উঠল ওর বুকের ভেতরটা। মনে হল কেউ যেন হাজার হাজার কাচের গুলি গড়িয়ে দিয়েছে শরীরে। ও দেখল, ওদের ছোট্ট জং ধরা গেট পার করে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে রুবি।

কী বলবে বুঝতে পারল না বিজন।

রুবি চোখ থেকে চশমাটা খুলল। তার পর বলল, "ভাই সেফ আছে। আমায় ফোন করেছিল। সবটা বলেছে। তোমায় কী বলে যে ধন্যবাদ দেব! মানে কী যে বলব বুঝতে পারছি না..."

বিজন মাথা নিচু করল।

সকালে সুধাময়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ও প্রথমেই গিয়েছিল রুবিদের বাড়িতে। সেখানে টম বা রুবি কেউ ছিল না। তার পর গিয়েছিল রুবির দোকানে। বৃহস্পতিবার বলে দোকানও বন্ধ ছিল। বৃহস্পতিবার দোকান বন্ধ থাকে এখানে। সেই কারণেই কি মাল কিনতে কলকাতায় গিয়েছিল রুবি!

কী যে অস্থির লেগেছিল বিজনের। এবার কী করবে? মাঠেই তো দেখা হবে তা হলে। তার মধ্যে যদি কিছু হয়ে যায়!

মাঠে গিয়ে রুপোলি শিবিরের ড্রেসিং রুমে যাওয়ার কথা ভেবেছিল বিজন। কিন্তু বুঝেছিল, এমন হাই টেনশন ম্যাচে সেটা ঠিক হবে না। তা হলে কী করবে ও!

ম্যাচ প্রথম থেকেই টান টান ছিল উত্তেজনায়। বিজন সুযোগই পাচ্ছিল না টমের সঙ্গে কথা বলার। কী যে অস্বস্তি লাগছিল বিজনের। শেষে সুযোগ এল হাফ টাইমের বাঁশি বাজানোর পর। টম নিজেই এগিয়ে এসেছিল বলতে যে, অ্যাডেড টাইম কম দিয়েছে বিজন। আর তখনই ফাঁকা মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেছিল বিজন। পুজোর প্রসাদ। সুধাময়ের প্ল্যান। মলয়কে দায়িত্ব দেওয়া। সোয়া ছ'টায় এসে মাঠের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে ওরা— সবটা বলেছিল।

বিজন বলেছিল, "হাফ টাইমে পালা টম। যেখানে পারিস লুকিয়ে পড়!"

"কোচ শান্তিদা ছাড়বে না। ভাইটাল ম্যাচ। এসব বললে বিশ্বাসও করবে না! বিজনদা, কী হবে?" টমের গলা কাঁপছিল।

বিজন চোয়াল চেপে ড্রেসিংরুমের দিকে হাঁটতে হাঁটতে দ্রুত চিন্তা করেছিল। তার পর বলেছিল, "সেকেন্ড হাফ শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই একটা বাজে ফাউল করিস তো! আমায় একটা চান্স দিস!"

হাওয়ায় চুল এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল রুবির মুখে। রুবি সেটা সরিয়ে কানের পেছনে দিয়ে বলল, "লাল কার্ড দেখার পরেই মাঠ থেকে বেরিয়ে ও ক্লাবের একজনের বাইক নিয়ে চলে গিয়েছে কলকাতা থেকে দূরে। বেশ কিছুদিন এদিকে আসবে না। ও বলেছে, তুমি কীভাবে ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছ। আমি কী বলে তোমায় ধন্যবাদ দেব বিজন! আমি যে কী বলি! আমি জানি তুমি কেন এমন করেছ। আমি জানি তুমি আমায়... আজও..." রুবির গলা বুজে এল।

বিজন ভাবল রুবির হাতটা একটু ধরবে। ভাবল বলবে, সেদিন অন্ধকার গলিতে ও কিছু করেনি। বলবে, টম রুবির ভাই, ওকে কি মারতে দিতে পারে! মানুষ হয়ে আর-একজন মানুষের পাশে দাঁড়াবে না! আমরা যে প্রত্যেকে পরের জন্য! সেই ছোটবেলায় রুবিকে ভালবেসেছিল বলেই তো সারা জীবন ধরে ভাল মানুষ হওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছে বিজন!

কিন্তু আজ আর কিছুই বলল না। শুধু হাসল সামান্য। ক্লান্তির হাসি। এই জীবনে আর কাউকেই কিছু বলার নেই বিজনের। ও দেখল, রুবি দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। চরাচর জুড়ে এই অপার জ্যোৎস্নায় যেন ফুটে আছে মাধবীলতার গুচ্ছ।

বিজন ভাবল, প্রেমিকের কাজ ও করেনি। করেছে রেফারির কাজ। ভাল প্লেয়ারকে গার্ড করে খেলানোই তো রেফারির ধর্ম। সেটুকুই পালন করেছে মাত্র। যেটা ওর কাজ, তার জন্য প্রশংসা আশা করে না ও। কে কী বলল, ভাল রেফারির কি তা শুনলে চলে!

অঙ্কন: সায়ন চক্রবর্তী

মুনলাইট সোনাটা

নন্দিতা বাগচী

ডাওহিলের পৈতৃক বাড়িটায় একাই থাকেন আর্থার গোল্ডস্মিথ। স্ত্রী ক্যারল গত হয়েছেন বছর খানেক হল। একমাত্র সন্তান লরেন্স থাকে পন্ডিচেরিতে। একটা ফাইভ স্টার হোটেলের ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজার সে। লরেন্স বিয়ে করেছে তামিল মেয়ে প্রশান্তিকে। বছর তিনেকের মেয়ে নিশ্‌কাকে নিয়ে সুখের সংসার তাদের।

আর্থার গোল্ডস্মিথের পূর্বপুরুষেরা হয়তো সোনার কারিগর ছিলেন, কিন্তু আর্থার সাহেবের অন্য নেশা। উনি হিমালয়ান ম্যাস্টিফ কুকুর পোষেন এবং প্রজনন করান। এই টিবেটান কুকুরগুলো বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির। তাই আর্থার সাহেব তাদের সংখ্যা বাড়াতে উৎসাহী। তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টার কথা স্থানীয় মানুষজনকে গালভরে বলেও থাকেন তিনি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা একটু আলাদা। একটা হিমালয়ান ম্যাস্টিফের দাম পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা। তাই এটা একটা লাভজনক ব্যবসা তাঁর।

বাড়িটা একটা একটেরে টেব্‌লটপের ওপরে। চারিদিকে ঢেউ খেলানো সবুজ পাহাড়। উত্তরে ঘুম ছাড়িয়ে দার্জিলিং। তার পর কাঞ্চনজঙ্ঘায় গিয়ে আছড়ে পড়ে দু'চোখ। দক্ষিণে গিদ্দা পাহাড়। আরও দক্ষিণে শিলিগুড়ি। পূর্বে সিটিং ছাড়িয়ে, সেবক ছাড়িয়ে, চালসা ছাড়িয়ে তরাইয়ের বনভূমি। আর পশ্চিমে মিরিকের পরেই শুরু হয়ে যায় নেপালের সীমারেখা। ওদিকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত জুড়ে ভুটান ও সিকিমের রাজত্ব। তাই এই অঞ্চলগুলোতে তিব্বতি প্রভাব বেশি। সে মানুষই হোক, তাদের খাদ্যাভাসই হোক কিংবা অন্য কোনও প্রাণীর অনুপ্রবেশ।

এই অঞ্চলটাকে নিজের হাতের তালুর মতো চেনেন আর্থার। শুধু তাঁর নয়, তাঁর বাবারও জন্ম এখানেই। সেই কবে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার কর্মী হিসেবে এসেছিলেন তাঁর ঠাকুরদাদা! তাঁর চোখের সামনেই নাকি গড়ে উঠেছিল দার্জিলিং-কার্শিয়াং-কালিম্পং। তার আগে তো এ অঞ্চল ছিল সিকিমের অধীনে।

বাংলোটার উত্তরমুখী ঝুল-বারান্দায় বসে নানা কথা ভাবছেন আর্থার। এই বারান্দাটা

একেবারে খাদের ওপরে। কী করে যে সেই যুগে কাঠের পিলারের ওপরে তৈরি করা হয়েছিল কে জানে! দূরে ধবধবে সাদা শরীর মেলে শুয়ে আছে মদালসা কাঞ্চনজঙ্ঘা। শেষ বিকেলের আলোয় ক্ষণে ক্ষণেই রেঙে উঠছে সে। যেন কোনও কিশোরীর শরীরে ছোঁয়া লেগেছে এক সদ্য যুবার।

আর্থার সাহেবের পরিচারক পদম এসে চায়ের ট্রে নামিয়ে রেখে গেছে। বেতের টেব্‌লটার ওপর শোভা পাচ্ছে টিকোজি দিয়ে ঢেকে রাখা টি-পট ও বোন চায়নার কাপ-প্লেট। এক কাপ চা পান করা হয়ে গেছে তাঁর। কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা বারান্দাটায় বসে নিসর্গের শোভা দেখছেন তিনি। যেদিকে দু'চোখ যায় শুধু সবুজের ঢেউ। গাঢ় সবুজ, শ্যাওলা সবুজ, পেস্তা সবুজ। এই সারি সারি, লম্বা লম্বা পাইন গাছগুলো দেখেও আশ মেটে না তাঁর। টিকোজির ঢাকনা খুলে টি-পটটা থেকে আরও এক কাপ চা ঢেলে নিলেন আর্থার। তাঁর পছন্দের চা। কার্শিয়াংয়েরই এক চা বাগানের সেকেন্ড ফ্লাশ। হালকা কমলা তার রং। স্বাদে-গন্ধে-মাদকতায় মাতিয়ে রাখে তাঁকে সারাটা দিন। তবে সূর্য ডোবার পর আর চা পান করেন না আর্থার।

আজ ক'দিন হল স্ত্রী ক্যারলের কথা মনে পড়ছে খুব। আসলে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীটা এগিয়ে আসছে বলেই হয়তো। কী সুন্দরই না দেখতে ছিলেন তিনি! তাঁর বাবার শরীরে ছিল খাঁটি ব্রিটিশ রক্ত, আর মা ছিলেন নিখাদ নেপালি। এই দুই জাতির জিন মিলে কী কাণ্ডটাই না ঘটিয়েছিল ক্যারলের শরীরে! হলদেটে ফর্সা গায়ের রং, লালচে চুল, নীল চোখের তারা আর পাহাড়ি লাবণ্যে মাখা মুখশ্রী। যেন একেবারে আলাদা একটা প্রজাতি। তা, স্কুলে পড়ার সময়ে এই ক্যারল জনসনেরই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন আর্থার গোল্ডস্মিথ। আর কী চমৎকার পিয়ানো বাজাতেন ক্যারল! পিয়ানো তো আর্থারও বাজাতেন। তবে ক্যারলের ধারেকাছে ছিল না সে রিসাইটল। নেহাত মায়ের তাড়নায় শিখতে যেতে হত। সেখানেই তো সাক্ষাৎ ক্যারলের সঙ্গে। তা ছাড়া ডাওহিলের দুটো পাশাপাশি স্কুলে পড়ার জন্য রোজই মোলাকাত হয়ে যেত দু'জনের। পরবর্তীকালে গার্লস স্কুলের মিউজ়িক টিচার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ক্যারল।

তবে আর্থার সাহেব কখনও পরের গোলামি করেননি। এক কালে তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন এ অঞ্চলের প্রভু। তাই সেই প্রভুত্বের দামামা আজও বেজে চলেছে আর্থারের ধমনিতে। নানারকমের স্বাধীন ব্যবসা করেছেন তিনি। কখনও টি ব্রোকার, কখনও রোড কন্ট্রাক্টর, কখনও-বা অন্য কিছু। কিন্তু ষাট পেরিয়ে যাওয়ার পর ছুটোছুটি ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাই বছর সাতেক হল এই হিমালয়ান ম্যাস্টিফ ব্রিডিং শুরু করেছেন।

বাংলোটার পেছনে অনেকটা সমতলভূমি পড়ে ছিল বহু কাল ধরে। আশপাশে পাইনগাছের ঘেরাটোপের মাঝে এক আগাছার জঙ্গল। এমনিতেই এই অঞ্চলটাকে ভূতের ডেরা বলে থাকেন স্থানীয় মানুষ। একটা স্কন্ধকাটা ছেলে নাকি ঘুরে বেড়ায় জঙ্গল জঙ্গলে। জ্যান্ত মানুষ দেখলেই ঘাড় মটকে দেয়। ওদিকে ফরেস্ট অফিসের আশপাশেও নাকি ধূসর রঙা গাউন পরা এক মেমসাহেবের ভূত ঘুরে বেড়ায়। আর একা মানুষ দেখলেই তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে খাদের ধারে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। তাই এদিকটায় বড় একটা কেউ আসেন না। আর্থার সেই জঙ্গলটা পরিষ্কার করিয়ে একটা মস্ত বড় লোহার খাঁচা তৈরি করেছেন। গ্লাস ফাইবারের শক্তপোক্ত ছাদ। গেটে ডবল তালা। এমনিতে কুকুরগুলো খুব প্রভুভক্ত। কিন্তু বহিরাগতদের দেখলে তাদের শৌর্য-বীর্য বেড়ে যায়। তাদের চৌহদ্দি-ছাড়া না করা পর্যন্ত শান্তি নেই।

এই কুকুরগুলোর চেহারাও অদ্ভুত। গাঢ় বাদামি আর সোনালি রঙের ঘন রোমে ভরা বড়সড় শরীর। দেখলেই আতঙ্ক হয়। নেকড়ে বা চিতাবাঘ মেরে ফেলতে ওস্তাদ। হাতির দলকেও অনায়াসে তাড়িয়ে দিতে পারে। তাই পাহারাদার হিসেবে এক নম্বর চাহিদা তাদের। চাষের জমি থেকে বন্যজন্তু তাড়ানোর জন্য, খামারবাড়ির শস্য রক্ষা করার জন্য কিংবা পশু-খামারের জীবজন্তুর সুরক্ষার জন্য তাদের তুলনা হয় না। তাই ধনী জোতদারেরা এবং পশু-খামারের মালিকরা কিনে থাকেন এই প্রজাতির কুকুর।

তিনটে ফিমেল আর দুটো মেল দিয়ে শুরু করেছিলেন আর্থার। লোলা, গিগি আর নোভা, তিন জনেই বহুগর্ভা। ওদিকে বীজ জোগান দেয় বলিষ্ঠ ডিউক আর রকি। প্রতি বছর শীতের শুরুতে সাত-আটটা বাচ্চা হয় ওদের। তাই বছরে বারো থেকে পনেরো লক্ষ টাকা রোজগার আর্থার সাহেবের। আর অন্য কোনও ব্যবসা করার প্রয়োজন হয় না তাঁর। দুর্লভ নামে একজন নেপালি ট্রেনার আসে রোজ। বাচ্চাগুলোকে ট্রেনিং দেয়। নইলে জংলি কুকুর কিনতে চান না ক্রেতারা।

ফিমেল কুকুরগুলোর ছ'-সাত মাস বয়স হলেই তাদের বিক্রি করে দেন আর্থার। তত দিনে তারা ট্রেনড হয়ে যায়। না হলে আবার আর-এক কীর্তি। আট-দশ মাস বয়সেই তারা পূর্ণ যুবতী। আর তখনই তাদের বাবা-কাকাদের ছোঁক-ছোঁকানি শুরু হয়ে যায়। ক্রেতারা অনেক সময় মেয়ে কুকুরগুলোকে ভেটেরেনারি ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে বন্ধ্যাত্বকরণ করান। কিন্তু সেটা তাঁদের মর্জি। তবে আর্থার ভাবছেন এর পরের ঋতুর বাচ্চাগুলো থেকে দুটো ফিমেল ডগ রেখে দেবেন। লোলা, গিগি আর নোভা তিন জনেরই বয়স হয়ে যাচ্ছে। আজকাল সিজ়ন টাইমে ডিউক আর রকিকে কাছে ঘেঁষতে দিতে চায় না।

চা-পান পর্ব শেষ করে লেদার জ্যাকেটটা পরে নিলেন আর্থার। পায়ে শক্তপোক্ত স্নিকার্স। মাথায় হ্যাট। হাতে একটা ওয়াকিং স্টিক। এই শেষ বিকেলে তিনি হাঁটতে বেরোন। ডাওহিল থেকে নেমে দক্ষিণের গিদ্দা পাহাড় পর্যন্ত যান রোজ। সম্প্রতি একটা ফাইভ স্টার হোটেল তৈরি হয়েছে সেখানে। সেখানকার ম্যানেজার সুদর্শন বসু তাঁর অসমবয়সি বন্ধু। আসলে সেখানে একটা টি-বার আছে। চমৎকার চা পাওয়া যায় ওই টি-বারে। সঙ্গে স্বর্গীয় স্বাদের পেস্ট্রি।

রাস্তাটার এক পাশে পাহাড় আর তার ওপরে আকাশছোঁয়া পাইন ট্রি-এর সারি। অন্য পাশে খাদের গায়ে পিলার লাগিয়ে অনেকগুলো ছোট ছোট বাড়ি। বাড়িগুলোর বারান্দায় সারি দিয়ে বসে আছে নানা বয়সি শিশু। পরনে রংবেরঙের উলের সোয়েটার। নাক বোঁচা, খুদে খুদে চোখের বাচ্চাগুলোর নাক দিয়ে শিকনি গড়াচ্ছে। সেই শিকনি হাতের পিঠ দিয়ে মুছে তারা অ্যাটেনশন পজ়িশনে দাঁড়াল। আর্থার সাহেবকে স্যালুট করে সমস্বরে বলল, "সালাম সাহাব।"

আর্থার হেসে তাঁর জ্যাকেটের পকেট থেকে ছোট ছোট প্যাকেট বের করলেন। বিস্কিট, লেবু লজেন্স আর ইয়াকের দুধের ছুরপিগুলো দেখে চোখগুলো চকচক করে ওঠে ওদের। একটা অপেক্ষাকৃত বড় ছেলের হাতে প্যাকেটগুলো দিয়ে আর্থার বললেন, "বাঁটকে খানা।"

"জি সাহাব," চোখ দুটো প্রায় বুজে ফেলে বলল ছেলেটা।

সুদর্শন বসুর সঙ্গে আড্ডা মেরে, চা-পেস্ট্রি খেয়ে যখন ফেরার পথ ধরলেন আর্থার, তখন পথে অন্ধকার নেমেছে। তবে পাইন গাছগুলোর মাথায় মাথায় তখনও সোনালি আভা। যেন তন্বী, দীর্ঘাঙ্গী কন্যারা সদ্য বিউটি পার্লার থেকে ফিরেছে। মাথার চুলগুলোকে হাইলাইট করেছে সোনালি রং দিয়ে। মাথাটা উঁচু করে আকাশছোঁয়া গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আর্থার। সম্প্রতি একটা জার্নালে পড়েছেন এই সুন্দর পাইন গাছগুলো নাকি রক্তচোষা বাদুড়ের মতো পাহাড়ের মাটি থেকে জল শুষে নিচ্ছে। যার ফলে পাহাড়ে ধস নামছে ঘন ঘন।

বাংলোয় ফিরে এসে আর্থার দেখলেন, ক্ষেম এসে কুকুরগুলোকে রাতের খাবার দিচ্ছে। সকালবেলায় ডগফুড দিলেও

সন্ধেবেলায় ওদের ডিমসেদ্ধ, ছানা, ফল, শাক-সব্জি খেতে দেয় ক্ষেম। এ ছাড়া সপ্তাহে এক বার তাদের পরিষ্কার করে ব্রাশ করে দেয় সে। আর্থার সাহেব, দুর্লভ, ক্ষেম আর পদমের সব নির্দেশ মেনে চলে ওরা। কিন্তু বাইরের লোক দেখলেই হিংস্র হয়ে ওঠে। এমনকি, গাছের পাতা পড়ার আওয়াজ হলেও খেঁকিয়ে ওঠে। তাই মানুষজন তো দূরের কথা, ছোটখাটো বন্যজন্তুও আর্থার সাহেবের বাংলো মাড়ায় না। এখন বর্ষাকালের শুরু। এই সময়ে ওরা তেমন মেলামেশা করে না। শরতের শুরুতে ওদের মেটিং সিজ়ন। আর গত ঋতুর বাচ্চাগুলো সব বিক্রি হয়ে গেছে। তাই এখন ওরা পাঁচ জনই আছে খাঁচায়। রাত বাড়লে ওদের খাঁচা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেই কাজটা করে পদম। আর্থার সাহেবের ডিনার খাওয়া হয়ে গেলে শেরপা বস্তিতে নিজের বাড়িতে চলে যাওয়ার আগে ওদের ছেড়ে দিয়ে যায় সে। ওরা খানিকক্ষণ বাইরে ঘোরাঘুরি করে। তার পর ঘুমোতে যাওয়ার আগে ওদের ড্রয়িংরুমে ঢুকিয়ে দেন আর্থার। ওরা যে যার গদিতে গিয়ে শুয়ে পড়ে। এ নিয়মের অন্যথা হয় না কখনও। বাইরে ছাড়া থাকলে সারা রাত ভৌ ভৌ করে ওরা। আর্থার তো ঘুমোতেই পারেন না, প্রতিবেশীরাও অভিযোগ করেন।

তবে ব্যালকনির ছিটকিনিটা তোলেন না আর্থার। রাতবিরেতে ওদের পেট কামড়াতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা, তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে কিংবা অন্য কোনও বিপদ হলে ভৌ ভৌ করে লোক জড়ো করতে পারে ওরা। এমনকি, পদমের বস্তিতে গিয়ে তাকেও ডেকে আনতে পারে। ওরাই তো তাঁর রক্ষক। ওদের ভরসাতেই তো এই একা থাকা। কিন্তু বাচ্চা বিয়োনোর পর লোলা, গিগি আর নোভাকে আর ঘরে ঢোকান না আর্থার। বাচ্চাগুলো বড় কুঁই কুঁই করে। তখন ওরা থাকে কাঠের তৈরি বড় কেনেলটায়।

মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের বাংলোটা দেখছেন আর্থার। আলো-ছায়ায় মেশা কিয়ারসকিউরোধর্মী একটা ল্যান্ডস্কেপ যেন। পাহাড়ে আঁধার নেমেছে। জোনাকির মতো মিটমিট করছে ঘুম আর দার্জিলিংয়ের আলোগুলো। পাইন গাছগুলো বৃষ্টিভেজা সবুজ রং মেখে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে সারিবদ্ধভাবে। তারই মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে তাঁর ধবধবে সাদা কাঠের বাংলোটা। বড় বড় কাচের জানলা-দরজা, লাল টুকটুকে টিনের চাল। বারান্দায় ঝুলছে সাদা অর্কিডের টবগুলো। সারা চত্বরটা জুড়েই তাদের বাড়বাড়ন্ত। কেউ টবে অধিষ্ঠিত, কেউ-বা চড়ে বসেছে পাইন গাছের কাণ্ডে। তাদের দোদুল্যমান শরীরে কার যেন হাতছানি। ক্যারলের ভারী পছন্দ ছিল এই হোয়াইট অর্কিড।

ক্ষেম চলে যাওয়ার পর বাংলোর ভেতরে ঢুকে গেলেন আর্থার। হাত-মুখ ধুয়ে, বাইরের কাপড়-জামা বদলে একটা খাকি শর্টস আর টি-শার্ট পরে নিলেন। বিটোভেনের ‘মুনলাইট সোনাটা’র সিডিটা চালিয়ে দিলেন লো ভলিউমে। তার পর ফায়ার প্লেসের সামনের রকিং চেয়ারটায় বসে দোল খেতে লাগলেন। চোখ দুটো বুজে।

আর্থার সাহেবের টিবেটান ম্যাস্টিফগুলোর মতো পদমও ভারী প্রভুভক্ত। তাঁর এই অভিব্যক্তিগুলো বড় চেনা তার। তাই সে আবার ট্রে সাজায়। কাটগ্লাসের বেঁটে-মোটা হুইস্কির গ্লাস, আইস বাকেট ভর্তি বরফের টুকরো, বরফ তোলার চিমটে রাখে। গ্লাসটা রাখার আগে হরিণের চামড়ার শ্যামোয়া কাপড় দিয়ে আর-একবার মুছে নেয়। এ সব তাকে শিখিয়েছিলেন ক্যারল ম্যাডাম। তিনটে ছোট ছোট প্লেটে রাখে রোস্টেড কাজু বাদাম, ছোট ছোট টুকরো করা চিজ় আর কিছু পটেটো চিপস। তার পর ট্রে-টা নিয়ে রাখে রকিং চেয়ারের পাশের টিপয়টার ওপরে। ড্রয়িং রুমের একপাশে একটা লিকার ক্যাবিনেট, যার পেছনের দেওয়ালটা আয়না দিয়ে মোড়া আর পাশের দেওয়াল দুটোয় স্বচ্ছ কাচ। দরজাটাও দুটো লম্বা স্বচ্ছ কাচ দিয়ে তৈরি। দুটো পেতলের হাতল রোজ পালিশ করার ফলে সোনার মতো চকচক করে। হাতল দুটো ধরে পদম জিজ্ঞেস করল, সিঙ্গল মল্ট লাউ সাহাব?

“হাঁ,” ছোট্ট জবাব। রোজই এক জবাব, তবুও প্রশ্নটা করে পদম। এটাই নিয়ম। অনুমতি না নিয়ে কোনও কাজ করতে শেখেনি সে। এক পেগ হুইস্কি মেপে আর্থার সাহেবের গ্লাসে ঢেলে দেয় সে। তার পর চিমটে দিয়ে বরফ তুলে গ্লাসটা ভরে দেয়। সোডা বা জল মেশানো পছন্দ নয় তাঁর। এটুকু করে দিয়ে প্যান্ট্রিতে চলে যায় পদম। ঘণ্টা খানেক পরেই ডিনার সাজিয়ে দিতে হবে।

তিন পেগ হুইস্কির পর শরীরটা বেশ হালকা লাগে আর্থারের। বিটোভেনের ‘মুনলাইট সোনাটা’ও বিভোর করে রেখেছে তাঁকে। রিচার্ড ক্লেডারম্যানের হাতে সত্যিই জাদু আছে। একটা ঘোরের মধ্যে হঠাৎ আর্থার দেখলেন, ক্যারল বসে আছেন পিয়ানোর সামনের লম্বাটে টুলটার ওপরে। পরনে একটা ধূসর রঙের গাউন। দুলে দুলে পিয়ানো বাজাচ্ছেন তিনি। পিয়ানোর ওপরে রাখা মেট্রোনমের লম্বা কাঁটাটা একবার এদিক, একবার ওদিক দুলছে। টিক-টিক-টিক-টিক একটা আওয়াজ হচ্ছে তাল রাখার জন্য।

আর্থার চমৎকৃত। রকিং চেয়ারটা থেকে উঠে পিয়ানোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। ক্যারলের হাত দুটো ধরে তাঁকে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন। তার পর তাঁর গালে-গলায় চুমু খেতে খেতে বললেন, তুমি কি তবে সত্যিই ফিরে এলে ক্যারল?

ক্যারল তাঁর মৃণাল বাহু দু’টি দিয়ে আর্থার সাহেবের গলাটা জড়িয়ে ধরে তাঁর ঠোঁট দুটোকে চেপে ধরলেন নিজের ঠোঁট জোড়া দিয়ে। তার পর অস্থিরভাবে বললেন, “তোমাকে ছাড়া কি আমি থাকতে পারি আর্থার? তাই তোমাকে নিতে এসেছি।”

“কোথায়?” এক ঝটকায় ক্যারলকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বললেন আর্থার।

“আরে আরে, ছাড়বে তো! পড়ে যাব যে!” খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন ক্যারল।

তাঁকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে আর্থার বললেন, “ঠিক আছে, নামিয়ে দিলাম। এবার বলো।”

“বলছি বাবা বলছি, একটু শ্বাস নিতে দেবে তো!” হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন ক্যারল।

আর্থার বললেন, “তুমি খুব নটি ক্যারল। চিরদিনই ফোরপ্লেতে ওস্তাদ। আজ আর ছাড়ছি না তোমাকে। কতদিন উপোস করে আছি বলো তো? শিগগিরি বলে ফেলো কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে?”

“কোথায় আবার? আমি যেখানে থাকি সেখানে।”

“কেমন জায়গা সেটা?”

“দারুণ সুন্দর। চারিদিকে রংবেরঙের ফুলে ভরা গাছ। ঝরনা। চাঁদের আলোয় বসে এঞ্জেলরা গান গায়। আর জানো, রোজই সেখানে পূর্ণিমা।

“আমাদের কার্শিয়াংয়ের চেয়েও সুন্দর?”

“অনেক বেশি সুন্দর, তুলনাই হয় না। এসো আমার সঙ্গে।”

“চলো,” বলে ক্যারলের হাতটা ধরলেন আর্থার। এগিয়ে চললেন ঝুলন্ত বারান্দাটার দিকে।

পদম ড্রয়িংরুমে এসে বলল, “ডিনার লাগা দিয়ে সাহাব।”

কিন্তু সাহেবের দিকে তাকিয়ে তার চক্ষু চড়কগাছ। ঝুলন্ত বারান্দার কাঠের রেলিংটার ওপরে ঝুঁকে কী করছেন তিনি? ছুটে গিয়ে তাঁর টি-শার্টটা ধরে টেনে এনে তাঁকে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল পদম। ড্রয়িংরুমের বারান্দামুখী মস্ত দরজাটায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। তার পর রাগতভাবে বলল, “ডাইনিং রুমমে আইয়ে। খানা খাইয়ে,” আর নিজের মনে ফিসফিসিয়ে বলল, “ম্যাডাম চলে যানে কে বাদ রোজ জাদা পি লেতে হ্যাঁয়। অওর চড় যাতা হ্যায়।”

পদম তাঁকে ওই ভাবে টেনে-হিঁচড়ে ঘরে ঢোকানোয় একটু অপদস্থ বোধ করছেন আর্থার। ড্রিঙ্ক তো তিনি রোজই করেন। আজ এমন বেসামাল হয়ে গেলেন কেন? ফায়ার প্লেসের ম্যান্টেলপিসটার ওপরে আর্থার ও ক্যারলের বিয়ের সময়কার একটা ছবি রাখা

আছে। আর্থারের পরনে কালো স্যুট, সাদা শার্ট, কালো বো-টাই। আর ক্যারলের পরনে একটা সাদা লেসের মস্ত ঘেরওয়ালা গাউন। তাঁর মুখটা ঢাকা সাদা-স্বচ্ছ ভেল দিয়ে। হাতে সাদা অর্কিডের বোকে। ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন আর্থার। দু'চোখের কোণে চিকচিক করছে নোনাজল। নাকটা টেনে আর্থার বললেন, কেন এমন করে কষ্ট দিচ্ছ আমাকে? তার চেয়ে তোমার কাছেই নিয়ে চলো।

পদমের ডাকাডাকিতে ডাইনিং রুমে গেলেন আর্থার। কত যত্ন করে তাঁর পছন্দের খাবারগুলো তৈরি করে সে। আজ বানিয়েছে ম্যাশড পটেটো, সতে করা ভেজিটেবলস আর রোস্টেড পর্ক রিব। সঙ্গে ব্রেড অ্যান্ড বাটার পুডিং। কিন্তু আর্থারের মুখে কিছুই রোচে না আজ। বিকেলের খাওয়া পেস্ট্রিটাই এখনও হজম হয়নি মনে হচ্ছে। তার ওপরে হুইস্কির সঙ্গে বেশ কিছু কাজুবাদাম আর চিজ় খেয়ে ফেলেছেন। তাই পদমকে বললেন, ভুখ নেহি হ্যায়। তুম খা লো ইয়ে সব খানা।

পদম একটু আশ্চর্য হলেও টেব্‌লটা পরিষ্কার করে ফেলে। ভাবে, হয়তো সত্যিই খিদে নেই সাহেবের আজ। হুইস্কির সঙ্গে অত স্ন্যাক্স খেলে কি আর পেটে জায়গা থাকে? তাই খাবারগুলো প্যাক করে রেখে দিল বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আগের দিনের বাসি খাবার পরদিন আর খান না সাহেব। যথারীতি রাত ন'টা নাগাদ ভিডিয়ো কল এল পন্ডিচেরি থেকে। ছেলে লরেন্সের সঙ্গে দু'-চারটে কথা বলতে না বলতেই নিশ্‌কা হাজির হল তার টেডি বেয়ারটাকে কোলে নিয়ে। হাত নেড়ে বলল, হাই গ্র্যান্ডপা। আর্থারও হাত নেড়ে বললেন, হাই মাই সুইট হার্ট। রাত হয়ে গেছে বলে গ্র্যান্ডপাকে গুডনাইট বলে সে ঘুমোতে চলে গেল। লরেন্সের সঙ্গেও বেশি কিছু কথা হল না আজ। রোজ রাতেই কথা হয় তার সঙ্গে। তাই নতুন করে বলার কিছু ছিলও না। রকি, ডিউক, লোলা, গিগি আর নোভাকে তালা খুলে খাঁচা থেকে বের করে দিল পদম। ঘরের ভেতর থেকেই তাদের হম্বিতম্বি শুনতে পাচ্ছেন আর্থার। নিশ্চিন্ত লাগে তাঁর। ক্যারল চলে যাওয়ার পর থেকে বড় একা লাগে। ভয়ও করে। ওদের এই হাঁকডাকগুলোই ভরসা দেয় তাঁকে। মনে হয়, যে-কোনও বিপদ থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ওরা।

মাঝে মাঝে ভাবেন পদমকে বলবেন, রাতটা এখানেই থেকে যেতে। কিন্তু কোথায় যেন বাধে। সাহেবকে ভিতু ভাববে না তো ছেলেটা? তা ছাড়া তার নিজস্ব জীবন আছে। হয়তো রাতে বাড়ি গিয়ে ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে বসে রাকসি পান করে সে। তার শারীরিক চাহিদাও তো আছে। যুবতী বৌকে বাড়িতে ফেলে রেখে বুড়ো সাহেবের চৌকিদারি করতে কি ভাল লাগবে তার?

পদম বাড়ি চলে গেছে। রাত দশটা নাগাদ দরজাটা খুলে একটা শিস দিলেন আর্থার। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়ে গেল তাঁর পঞ্চরত্ন। তাদের উমনো ঝুমনো রোমশ শরীর নিয়ে, ল্যাজ নাড়াতে নাড়াতে। লক্ষ্মী ছেলেমেয়ের মতো যে যার জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল তারা। আর্থারও তাদের গুডনাইট বলে নিজের শোওয়ার ঘরে চলে গেলেন। দাঁত ব্রাশ করে, নাইট স্যুট পরে শুয়ে পড়লেন। হুইস্কির বিক্রিয়ায় ঘুমের কোনও অসুবিধে হয় না তাঁর। শোওয়ার পর মিনিট দশেকের মধ্যেই নাক ডাকতে শুরু করেন। কিন্তু মাঝরাত নাগাদ আজ ঘুমটা ভেঙে গেল আর্থারের। মনে হল কেউ যেন পিয়ানো বাজাচ্ছে ড্রয়িংরুমে। মনের ভুল ভেবে কানে বালিশটা চেপে শুয়ে থাকেন তিনি। কিন্তু তবুও সেই সুরেলা আওয়াজ তাঁর শোওয়ার ঘর পর্যন্ত চলে আসছে। হ্যাঁ, ওই তো শুনতে পাচ্ছেন 'মুনলাইট সোনাটা'-র মধুর ধ্বনি। পায়ে স্লিপারটা গলিয়ে ড্রয়িংরুমের দিকে এগিয়ে যান তিনি। আওয়াজটা স্পষ্টতর হচ্ছে এখন। লাইট জ্বালানোর জন্য সুইচবোর্ডে হাত দিয়েও হাতটা সরিয়ে নেন তিনি। কাচের জানলা-দরজা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে পিয়ানোটার ওপরে। আজ সম্ভবত পূর্ণিমা। ঝকঝক করছে বৃষ্টিধোয়া প্রকৃতি। কুয়াশার নামগন্ধ নেই।

চাঁদের আলোয় চোখ দুটো সয়ে যাওয়ার পর চমকে ওঠেন আর্থার। ওই তো ক্যারল এসেছেন আবার। ধূসর রঙের গাউন পরে, একমনে বাজিয়ে চলেছেন 'মুনলাইট সোনাটা'।

আর্থার এগিয়ে যান পিয়ানোটার দিকে। তাঁর পায়ের আওয়াজ পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্যারল। একটা ডানা ঝাপটানির আওয়াজ শুনতে পেলেন কি আর্থার? আর্থারকে জড়িয়ে ধরে ক্যারল বললেন, তোমাকে নিতে এলাম আর্থার। আজ সন্ধেবেলায় খুব মন খারাপ করছিলে তুমি। এমন বিরহের কোনও মানে হয়? আর্থার অবাক হয়ে দেখলেন, ঝুল-বারান্দার দিকের দরজাটা হাট করে খোলা। আবারও একটা ডানা ঝাপটানির আওয়াজ শুনতে পেলেন তিনি। আর মুহূর্তের মধ্যে তাঁর হাত দুটোও ডানা হয়ে গেল। সেই ডানা দুটো মেলে ক্যারলের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনিও। ঝুল-বারান্দার নীচের সেই অতল খাদে। এক নতুন রাজ্যের সন্ধানে। যেখানে দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, বিরহ নেই। যেখানে ফুলে ফুলে ভরে থাকে গাছগুলো। কুলকুল করে বয়ে চলে ঝর্না। এঞ্জেলরা গান গায় সারা দিন, সারা রাত। আর চাঁদের আলোয় ভেসে যায় চরাচর।

অঙ্কন: পিয়ালি বালা

নোঙর

বাসুদেব মালাকর

মায়ের জন্য একপাতা প্রেশারের ওষুধ কিনতে এসেছিলাম। দোকানের সামনে কেয়াবৌদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বেশি দেখাসাক্ষাৎ হয় না ওর সঙ্গে। ওদের পরিবারটি একটু আলাদা ধরনের, কেউ বিনা দরকারে বাইরে হট্ট হট্ট করে বেড়াতে পছন্দ করে না, কারও বাড়িতে তেমন যাতায়াতও নেই। আমাদের বাড়ির চারটে বাড়ির পরেই বাড়ি। ওর বিয়েতে আমি নিতবর হয়ে গিয়েছিলাম। তখন আমার এগারো বছর বয়স।

আগে কেয়াবৌদি ছিপছিপে ছিল, এখন বেশ মুটিয়ে গিয়েছে, কিন্তু মুখশ্রীটুকু প্রায় একই আছে! আমাকে একটু তফাতে ডেকে নিয়ে নিচু গলায়, প্রায় ফিসফিস করে বলল, "তোর কথাই ভাবছিলাম ক'দিন ধরে— একটা উপকার করে দিতে পারবি?"

বললাম, "কী উপকার?"

বৌদি বলল, "কাল দুপুরে বাড়িতে আসিস, তখন বলব।"

বললাম, "একটু আভাস তো দাও!"

বৌদি বলল, "রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে সব বলা যায় না। তবু শোন, ব্যাপারটা শানুকে নিয়ে। অবশ্যই আসিস কাল," বলে, একটা টোটো থামিয়ে, উঠে চলে গেল।

শানু ওর মেয়ের নাম। এবার টুয়েলভে উঠেছে। দেখতে মায়ের চেয়েও সুন্দরী, লেখাপড়ায়ও ভাল। নম্র ভদ্র। হুজুগে বারমুখো নাচুনি টাইপ নয়। সেই শানুর বিষয়ে কী কথা থাকতে পারে, যা রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বলতে হয়! কী জানি, আজকাল বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো যা কাণ্ড করছে! কিন্তু শানুকে কোনও ভাবেই সেই গোত্রে ফেলা যায় না! অবশ্য মানুষকে ওপর থেকে দেখে বোঝা মুশকিল। কেয়াবৌদির কথাগুলো মাথার ভিতরে আটকে রইল।

পরদিন দুপুরে গিয়ে যা শুনলাম, তত বেশি গুরুতর কিছু নয়। কিছুদিন যাবৎ একটা ছেলে শানুকে খুব বিরক্ত করছে। ওদের স্কুলের একটু আগে সাড়ে দশটা থেকে দলবল-সহ বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। শানুকে প্রোপোজ় করেছিল এক দিন। শানু পাত্তা দেয়নি বলে এখন শাসাচ্ছে! শানুর দিকে আজেবাজে মন্তব্য ছুড়ে দিচ্ছে, এক দিন পথ আটকে হাত ধরে টেনেছিল! শানু ভয়ে স্কুলেই যেতে চাইছে না! খুব চিন্তায় আছি রে! সামনে ওর ফাইনাল একজ়াম।"

"শানুকে ডাকো, চেহারার ডেসক্রিপশনটা শুনে নিই।"

"না না, শানু বলেছে কাউকে না বলতে! তোর দাদার কানে গেলে রক্ষে থাকবে না! উল্টে মেয়ের দোষ দেবে! বলবে, শানু ইনডালজেন্স না দিলে... তুই তো জানিস এ বাড়ির ধরন!"

"আমাকে কী করতে হবে?"

"তুই ওদের একটু কড়কে দিতে পারবি?

"পুলিশে জানাচ্ছ না কেন?"

“না রে, তা সম্ভব নয়। শানুকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করবে, পেপারে খবর হবে। তুই যদি একটু ঠেকাতে পারিস, দেখ।”

“ঠিক আছে। তুমি ভেবো না।”

রাস্তায় বেরিয়ে মনে হল, এরা কী ভাবে আমাকে? মাস্তান? আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে, তাদের সঙ্গে আড্ডা দিই বলে আমাকে লুম্পেনদের সঙ্গেও পাঙ্গা নিতে হবে? ইউনিভার্সিটি শেষ করে প্রায় ছ’বছর বেকার বসে আছি। চাকরির চেষ্টা করে করে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি। কত জায়গায় ইন্টারভিউ দিলাম, কেউ খবর দিল না। বি এড নেই বলে মাস্টারির পরীক্ষায়ও বসতে পারিনি। বেকার ছেলে মানেই কি বনের মোষ তাড়ানোর ঠিকাদার! রাগ মেশানো একটু অভিমান হল কেয়াবৌদির ওপরে!

অবশ্য কেয়াবৌদির দোষ নেই। একসময় তো বিস্তর মারপিট করেছি! এলাকায় সেটা অজানা নয়। কলেজে পড়ার সময় ইউনিয়ন করতাম। তখন ঝুটঝামেলায় জড়াইনি যে, তা তো নয়! তখন মাঝে মাঝে একটু টাফ হতেই হত! কিন্তু এই বেকার-জীবন, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তা, ক্রমবর্ধমান বয়স আমার সে আগুন নিভিয়ে দিয়েছে। কেয়াবৌদি সেই দিনগুলোর কথাই মনে রেখেছে। ওর তেমন দোষ নেই। একটু হাসিও পেল। আমার আড্ডার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু যে ক’জন— সেই কলেজ-জীবন থেকে— তারা শুনলে অবশ্য বলবে, ‘অনেক দিন হাতের সুখ করিনি। চল, কালকেই ক্যালাই সবক’টাকে।’

মা হাজার আটেক টাকা পেনশন পায়, দাদা মাঝারি ধরনের একটা সরকারি চাকরি করে। তাতেই আমার অন্ন জুটছে। বৌদি মাঝে মাঝেই মিষ্টি করে কথা শোনায়। সে দিন বলেছে, “জানো তো, আজকাল টিউশনির বাজার খুব ভাল! আমার এক বান্ধবী টিউশনি করে মাসে...”

এখন শুনতে পাচ্ছি, দাদা কলকাতার কাছাকাছি ফ্ল্যাট কেনার চেষ্টা করছে। আমি এখন প্রায়ই ভাবি, আর ক’দিন পরেই আকাশ হবে আমার মাথার ওপরের ছাদ, ঘাস হবে পিঠের নীচের বিছানা।

আমার প্রাইমারি স্কুলের বন্ধু গুলে এখন এলাকায় বেশ নাম করেছে। এক মাঝারি দাদার শেল্টারে আছে। একটা ছোট দল গড়ে তার হয়ে কাজ করে। অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা নেই। শুনতে পাই, গুলে এলাকায় বেশি থাকে না। এ সব ওরই কাজ। ভদ্রলোক দিয়ে এ সব হয় না।

অনেক চেষ্টা করে গুলেকে ধরতে পারলাম। সন্ধেবেলায় স্টেশনের ওভারব্রিজের নীচে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল। কাছে গিয়ে বললাম, “কেমন আছিস? এখানে কী করছিস?”

“এক জনের আসার কথা আছে। কী খবর তোর?”

“গুলে, একটা ব্যাপারে একটু হেল্প চাই তোর!”

“কী রকম ব্যাপার?”

সংক্ষেপে সব বলতে ও বলল, “মালকড়ি পাওয়া যাবে কিছু?”

“না রে, সমাজসেবা। পারবি?”

গুলে আমাকে দেখল ভাল করে। তার পর বলল, “ও সব আমার কাজ নয়। তার জন্য অন্য লোক আছে।”

আপাতত শানুকে নজরে রাখা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। বাড়াবাড়ি কিছু হলে বড়জোর বন্ধুদের সাহায্য। চলে আসছিলাম, গুলে ডেকে বলল, “ছুঁচোমারা কেস! ঠিক আছে, দুটো ছেলে দেব। কবে কখন লাগবে, গোবিন্দর দোকানে জানিয়ে দিস।”

“ঠিক আছে, দরকার হলে বলব। তোর নম্বরটা দে।”

“না, নম্বর পাবি না। গোবিন্দকে খবর দিলেই আমি পেয়ে যাব।”

শানুর স্কুলের সামনে সেই দলটা যথারীতি হাজির। এমনিতে এরা খুব ভিতু হয়। প্রতিবাদ করা হয় না বলেই এদের এত সাহস। কাছেই থানা। মাঝে মাঝে স্কুল শুরু ও শেষের সময়টুকুতে একটা পুলিশের গাড়ি টহল দিলেও এটা বন্ধ হয়। কিন্তু কে ভাবে এদের নিয়ে? পেটে বিদ্যে নেই, পকেটে টাকা নেই, বাড়িতে নিজের মতো একটা আলাদা ঘরও নেই সকলের। থাকার ভিতরে মা-বাবাকে ব্লাকমেল করে কেনা একটা সেকেন্ডহ্যান্ড বাইক, একটা সেলফোন, এই তো সম্পদ! নিজের যোগ্যতায় একটি মেয়ের ভালবাসা অর্জন করার মতো ক্ষমতা নেই। তাই জোর করে তা দখল করার দুরভিসন্ধি!

সকাল দশটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট। দলে দলে মেয়েরা পায়ে হেঁটে, সাইকেল নিয়ে স্কুলে ঢুকছে। সমর, তপন বিধান ও আমি—চার জন স্কুল-গেটের উল্টোদিকে, জগন্নাথের বইখাতার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ওই ছেলেগুলোর নিত্যদিনের রুটিনও যথারীতি চলছে। আমরা শানুর জন্য অপেক্ষা করছি।

ভিড়ের জন্য শানুর রিকশাটা স্কুল-গেট থেকে একটু দূরে থামল, দেখতে পেলাম। রিকশা থেকে নেমে একটু এগোতেই একটা ছেলে শানুর দিকে এগিয়ে গেল। রোগা চোয়াড়ে চেহারা, গাল বসা মুখ, পাছায় মাংস নেই, জিনসের প্যান্টটা প্রায় কুঁচকির কাছে নেমে এসেছে। একটা সস্তার টি-শার্ট গুঁজে পরা। সে শানুর পথ আটকে হাতে একটা কাগজ গুঁজে দিতে চাইছে! শানু বিব্রতমুখে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইছে, ছেলেটা গাদি খেলার কায়দায় তাকে আটকে সুর করে বলছে, ‘প্যারভরি খত লিখা হুঁ ম্যায়, পঢ়ো তো জারা সহি...’

বাকি ছেলেগুলো খ্যা খ্যা করে হাসছে! নিত্যকে বললাম, “চল, এগোই!”

নিত্যর চেহারাটা বিশাল, রেগুলার জিমে যায়। ওর পিছনে আমরা তিন জন। নিত্যর পিছনে আমাকে দেখে শানু একটু ভরসা পেয়ে বলল, “দ্যাখো না না কাকু...”

নিত্য খপ করে ছেলেটার কলার চেপে ধরে গালে একটা থাপ্পড় কষাতেই বাকিগুলো দৌড় লাগাল!

তাদের ভিতরে এক জন, বয়স বছর ষোলো-সতেরোর মতো, পালানোর সময় বিধানের হাতে ধরা পড়ে গেল! মুখটা এখনও কচি এবং সুশ্রী, ঠোঁটের ওপরে হালকা গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে, দুটো বড় বড় চোখে জলের আভাস স্পষ্ট— এটা পুরোপুরি বখে যায়নি বলেই মনে হল। বিধান বলল, “দুটোকে থানায় নিয়ে যাই, চল!”

থানার কথা শুনেই সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, “থানায় নেবেন না, দাদা। আপনাদের পায়ে পড়ি!”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “তোর নাম কী?”

“ইন্দ্র, ইন্দ্রদীপ মজুমদার।”

“বাড়ি কোথায়?”

“সরডাঙায়।”

“এত দূর থেকে বাঁদরামি করতে এসেছিস!”

“আজই প্রথম এসেছিলাম কুন্তলের সঙ্গে। বাঁদরামি করতে আসিনি। কুন্তল বলেছিল, ফেরার সময় ওর পুরনো একটা মোবাইল দেবে।”

“তোর মোবাইল নেই?”

“না। দিদি কিনে দিতে পারেনি।”

“কী করবি মোবাইল দিয়ে?”

“অনলাইন ক্লাস করতে পারি না।”

“তোর বাড়িতে কে কে আছেন?”

“আমি, দিদি, মা আর দাদু।”

“তোর বাবার নাম কী?”

শুনে ইন্দ্র একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। তার পর বলল, “বাবা নেই, দাদুর নাম শিবনাথ মজুমদার।”

নামটা শুনেই ঝাঁকুনি খেলাম! শিবনাথ মজুমদারের নাতি গার্লস স্কুলের সামনে ইভটিজারদের দলে জুটেছে! একদা শিবনাথ মজুমদারের নামে ভয়ে-ভক্তিতে এলাকা আড়ষ্ট হয়ে থাকত! নানারকম মিথ তৈরি হয়েছিল ওই নামটি ঘিরে। ওঁরা নাকি জোতদার, ঘুষখোর, সুদখোরদের মুন্ডু দিয়ে ফুটবল খেলতেন গভীর রাতে! একটি কিশোরপুত্র-সহ স্ত্রীকে ফেলে রেখে রাত্রির বৃন্ত থেকে ফুটন্ত সকাল ছিঁড়ে আনার জন্য তাঁরা বের হয়েছিলেন দলে দলে! শিবনাথ তাঁদেরই এক জন। সেই শিবনাথের নাতি...

একটা তীব্র কৌতূহল জেগে উঠল। এই আপাত বিসমীকরণের উৎসটা কেমন, জানার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে তাড়িয়ে বেড়াতে লাগল।

দুই

ইন্দ্রর কথা মনে পড়ছিল ক'দিন ধরে। যদিও সে দিন ওকে মারিনি, অন্য একটা পাপীকে মেরেছিলাম শুধু। কিন্তু অতগুলো মেয়ের সামনে ইন্দ্রর কলার ধরে টেনেহিঁচড়ে সরিয়ে এনেছিলাম। এই বয়সে আবেগ, আত্মশ্লাঘাবোধ খুব প্রবল হয়, ঘাড় শক্ত হয়ে ওঠে। সেই ঘাড়ে হাত দিয়ে... নাহ্, এটা মেরামত করা দরকার। কিন্তু কী ভাবে করব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। ওদের বাড়ি চলে যাব? হুট করে অচেনা অজানা একটা বাড়িতে যাওয়ার কী কারণ দেখাব?

ক'দিন পরে কেয়াবৌদির কাছে গেলাম। শানু এখন নির্বিঘ্নে স্কুলে যাচ্ছে। মন দিয়ে পড়াশোনা করছে। পরীক্ষায় নিশ্চয়ই ভাল রেজ়াল্ট করবে। কিন্তু একেবারে নিখরচায় এটা হবে, তা কি হয়? কেয়াবৌদি খুব আপ্যায়ন করে বসাল। চা করে নিয়ে এল। আমি যে-জন্য এসেছি, সেই জিনিসটা কী ভাবে চাইব, তাই ভাবছিলাম মনে মনে।

কেয়াবৌদি সামনে এসে বসলে বললাম, "বৌদি, একটা জিনিস দেবে?"

"বল না, অত ভনিতা করছিস কেন? সাধ্যের ভিতরে হলে নিশ্চয়ই পাবি।"

"তোমার কাছে ব্যবহার করো না, এমন পুরনো একটা সেলফোন হবে?"

"কেন, তোর ফোন নেই?"

"আছে। সেটাও সব সময় রিচার্জ করা হয় না। তবু আর-একটা দরকার।"

"তোর দাদা একটা কিনেছে গত মাসে। পুরনোটা আছে। কিন্তু তোকে পুরনো ফোন দিতে বাধো বাধো ঠেকছে! তোকে যে নতুন একটা কিনে দেব..." বৌদি একটা নিশ্বাস গোপন করে বলল, "তোর দাদা বাড়ি এলে বলে দেখব। ভিতরে যদি দরকারি কিছু থাকে, বের করে..."

সরডাঙা আমাদের বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়। হাঁটা পথে আধঘণ্টা লাগতে পারে। বাঁ দিকে রত্না খাল, এখন তেমন স্রোত নেই। একটা মাছধরার পাটার ওপরে একটা কোঁচবক বসে আছে। ডান দিকে সব্জির খেত। তার পরেই শ্মশান। আজকাল আর ডেডবডি আসে না তেমন। লোকের হাতে পয়সা হয়েছে, বডি নিয়ে নিমতলা বা রতনবাবুর ঘাটে চলে যায়। এক ঘণ্টার ভিতরেই মানব-জীবন ফিনিশ! ডোম বিশু মল্লিক তা-ও ঘাট আগলে আছে। একটা চালাঘরে কিছু কাঠ, পাটকাঠি, পেল্লাই সাইজ়ের একটা দাঁড়িপাল্লা। অনাথ চক্রবর্তীও নামাবলি গায়ে দিয়ে কাছেপিঠেই থাকে। শবের কণ্ঠার ওপরে চাল-কলার পিণ্ড রেখে যাত্রামঙ্গল পাঠ করে শেষবারের মতো—ওঁ কৃত্বা তু দুষ্কৃতং কর্ম জানতাব্যপ্যজানতা। মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চমাগতম॥ ধর্মাধর্মসমাযুক্তং...দাহয়েং সর্বগাত্রানি দিব্যানলোকানস গচ্ছতু॥ শ্মশান ছাড়িয়ে একটা ইটভাটা। তার পরে একটা বড় বিল। লোকে বলে, কাঁকন বিল। তার তীরে রাস্তার পাশটায় ঘন আগাছার জঙ্গল। এবার আর মিনিট দশেক হাঁটলেই সরডাঙা।

ইন্দ্রকে বাড়িতে পাবো কি না, পেলেও সে দিনের ওই ঘটনার পরে কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে, ভাবতে ভাবতে হাঁটছিলাম। শিবনাথ মজুমদারকে দেখিনি কখনও। শুনেছি, এখন নাকি কথা-টথা তেমন বলেন না। পুলিশের অত্যাচারে প্রায় পঙ্গু। উনি যদি জিজ্ঞেস করেন কেন এসেছি, কী উত্তর দেব?

থেমে থেমে একটা গুড়ুম গুড়ুম শব্দ কানে আসছিল। টিনের চালে নারকেল পড়লে যেমন শব্দ হয়, তেমনই। একটা লোককে জিজ্ঞেস করতে দেখিয়ে দিল, ওই সুপুরিগাছওয়ালা বাড়ি।

বাড়িতে ঢুকে থতমত খেয়ে গেলাম। মলিন, শ্রীহীন একটা বাড়ি। বাড়ি বলতে খানিকটা ছাদ, খানিকটা টিনের ছাউনি দেওয়া গোটা তিনেক ঘর। চারদিকে অনটনের ছাপ। একটু ইতস্তত করে ডাকলাম, "ইন্দ্র! ইন্দ্র বাড়ি আছ?"

একটা ঘড়ঘড়ে কণ্ঠস্বরে কে যেন চিৎকার করে উঠল, "কে তুমি? পুলিশ? সাবধান, কাছে আসবে না!"

শুনে হকচকিয়ে গেলাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না।

একটু মেয়ে, ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স হতে পারে, ফরসা রং, একটা জংলা ছাপা শাড়ি পরা, বেরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কাকে খুঁজছেন?"

"ইন্দ্রর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাইছিলাম। বাড়িতে আছে?"

"আমি ইন্দ্রর দিদি। ও একটা রিফিল কিনতে দোকানে গেছে। আপনি একটু বসুন, এখুনি এসে পড়বে," বলে বারান্দায় একটা মোড়া দেখিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল, "ইন্দ্রকে কী ভাবে চেনেন? আপনি কি ওর বন্ধু?"

ইন্দ্র আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। এমন অসমবয়সি বন্ধু হতে পারে? মেয়েটি কি তা বুঝতে পারেনি? একটু হেসে বললাম, "এক দিন বাজারে আলাপ হয়েছিল। আমি শতদল। অভিরামপুরে থাকি।"

মেয়েটি বলল, "আমার নাম তনুশ্রী।"

তনুশ্রী খুব চাপা স্বভাবের, বোঝা গেল। তবু নিতান্ত বেহায়ার মতো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কিছু কথা জানা হল। খানিকটা দূরে একটা জুনিয়র হাই স্কুলে প্যারাটিচার। তার বেতনেই ওদের সংসার চলে। মায়ের আর দাদুর ওষুধ, ইন্দ্রর পড়াশোনা, খাইখরচা, রান্নার গ্যাস, বিদ্যুতের বিল— সব ও-ই দেয়। আমারও তো সেই দশা! দাদার আশ্রয়ে পরগাছার মতো সেঁটে আছি!

ইন্দ্র এসে আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। একটু আতঙ্ক মেশানো বিস্ময়ে তাকিয়ে বলল, "আপনি!" তার চোখে নীরব মিনতি ফুটে উঠল, যার অর্থ দিদিকে কিছু বলবেন না!

সেই দিন থেকে তনুশ্রী যেন টানতে লাগল! কী এক অজানা আকর্ষণে সে আমাকে টানতেই থাকে! সারা পৃথিবী জুড়ে একটা অকারণ মনখারাপের হাওয়া বয়ে যায়। আড্ডা দিতেও ভাল লাগে না আর। প্রায়ই নির্লজ্জের মতো যাই তনুর কাছে। আমি তো অনিকেত, নোঙরহীন স্রোতে-ভাসা নৌকো। এই মেয়েটিও প্রায় তাই—পিছনে এক টালমাটাল নীরক্ত অতীত, সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। ও-ই তো আমার বন্ধু।

একটু দূরে, একটা টিনের চালার নীচে শিবনাথ মজুমদার গুড়ুম গুড়ুম করে বোমা ফাটান! পুরো উন্মাদ অবস্থা। ভীষণ হিংস্র স্বভাব হয়েছে! শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়। একমাত্র তনু ছাড়া কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেন না। কাউকে ভয় পান না। মান্য করেন না। নখ দিয়ে মেঝেয় গর্ত খুঁড়ে প্রস্রাব করে মাটি গুলে দলা পাকিয়ে, শুকিয়ে টিনের চালে ছুড়ে চিৎকার করেন, "ওই শোনো, শোষণের কারাগার ভাঙার শব্দ!" শিকল খুলে দিয়েও দেখা গিয়েছে, রাস্তার বেচাল লোকজনকে আক্রমণ করেন, তারাও খুব মারে! তনুর বাবা মারা যেতে পাগলামিটা বেড়েছে। অগত্যা...

সন্ধের একটু আগে যখন ওদের বাড়িতে ঢুকছি, ইন্দ্র তখন টিউশন নিতে যাচ্ছে। তনুকে জিজ্ঞেস করলাম, "ও কার কাছে পড়ে?"

"আশুবাবু ফিজ়িক্সটা দেখিয়ে দেন। ইংলিশেও উইক। কেমিস্ট্রিতেও খামতি আছে।"

"তা হলে তো খুব সমস্যা!"

"কী করব, ভাল কোচিং সেন্টারে দিতে গেলে যা খরচ..."

"দোষ না ধরলে একটা কথা বলব? ইংরেজিটা যদি আমি দেখিয়ে দিই... টাকা লাগবে না, শুধু আমাদের বাড়ি যেতে হবে ওকে।"

তনু কোনও উত্তর দিল না। মুখটা ফেরানো, আবছা অন্ধকারে তা দেখতে পেলাম না।

এলাকার নামী কেমিস্ট্রির স্যার ফণীবাবু টিউশনি করেন। এক বার ওঁর ছেলে সজল বাইকে মারাত্মক অ্যাকসিডেন্ট করলে, আমরা সব বন্ধুরা মিলে রক্ত দিয়েছিলাম। মনে কৃতজ্ঞতাবোধ, দয়া থাকলে কি একটা দুঃস্থ ছেলেকে একটু কম পয়সায় পড়াবেন না উনি? কাল এক বার যাচাই করে দেখতে হবে।

তনু বলল, "এখানে দাঁড়িয়ে কথা বললে মশা উড়িয়ে নিয়ে যাবে! ঘরে চলুন।"

বললাম, “না। আজ থাক।”

তনু বলল, “কেন এসেছিলেন, বললেন না তো!”

আমি নিজেও এর উত্তর জানি না। প্রায়ই ভাবি, ইন্দ্রই হল তনুর হাতের শেষ তাস। ওর পায়ের তলার মাটি শক্ত না হলে তনুর মুক্তি নেই। সারা জীবন ওকে এই অন্ধকূপে বসবাস করতে হবে। এক দিন বুড়ি হয়ে যাবে, নোঙরবিহীন নৌকোর মতো তখন তার ভাসমান জীবন।

তিন

ইন্দ্রর স্কুল খুলে গিয়ে অফলাইন ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন আর মোবাইলের দরকার নেই। কেয়াবৌদিকে সেটা জানিয়ে দিতে হবে। সে দিন ওটা চাওয়ার পরে নিজেকেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছিল! কাউকে কিছু দিতে না পারি, কিন্তু পুরনো জিনিস দিয়ে অপমান করব কেন! ইস, আমি কি পরোপকারের নেশায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম তখন?

সকালবেলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছিলাম, কার একটা সাইকেল চড়ে ইন্দ্র এসে হাজির হল। কোনও ভূমিকা না করেই বলল, “শতদলদা, গত রাতে দাদু মারা গেছে!”

প্রায়-অচেনা অজানা এক জন মানুষের মৃত্যুসংবাদে প্রবল শোক জাগতে পারে না। আমারও জাগল না। প্রথমেই মনে হল, তনুর পা থেকে একটা শিকল খুলে পড়ল! ওকে দাদুর ভরণপোষণ, দেখভাল, সেবা দুশ্চিন্তা করতে হবে না আর। এটাও মুক্তির এক ভগ্নাংশ। তার পর, শিবনাথবাবুর ওই জীবন্মৃত, চেতনাহীন, মনুষ্যেতর জীবন থেকেও মুক্তি— কম কী! ইন্দ্রকে বললাম, “তুমি যাও, আমি লোকজন নিয়ে আসছি।”

শিবনাথবাবু ধর্মাচার, পুজোআচ্ছা, পারলৌকিকতায় বিশ্বাস করতেন না। তবুও তনু যথাসাধ্য নমো নমো করে করেছে সব কিছু। সন্ধেবেলা একটু জলমিষ্টি খেয়ে ওদের বাড়ি থেকে বের হচ্ছিলাম, তনু আমার সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত এল। সারা দিনের ক্লান্তিতে মুখটা শুকনো। এ ক’দিনের আ-তেলা চুলে চিরুনি বুলিয়ে নেওয়ার ফুরসত পায়নি, একরাশ জলজ শেওলার ভিতরে মুখটা নীল শালুকের মতো ফুটে আছে। ঝুপসি আঁধার নেমেছে। একটু একটু হাওয়া বইছে। শীত আসছে। দাদুর মৃত্যুতে তনু কি একটু ভারমুক্ত হল, নাকি পাগল, অচেতন হলেও একটি জীবন্ত মানুষের অভাবে সে আরও বিপন্ন হল? ঘাড় ঘুরিয়ে মুখের ওপরে ঝুঁকে ওর মুখটা দেখার চেষ্টা করলাম।

তনু বলল, “একটা কথা বলার ছিল!”

আমি উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম! তনু একটু ইতস্তত করে বলল, “কেউ সময়ে-অসময়ে এসে খোঁজখবর নিলে আমাদের ভাল লাগে, একটু সাহস পাই। কিন্তু তার পিছনে যদি কারও কোনও প্রত্যাশা বা অন্য রকম অনুভূতি জাগে, তাতে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা নেই আমার! আমি তো মেয়ে, আমার ইনস্টিংকট বলছে, তেমন একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে কোথাও! আমার ভুলও হতে পারে। আমি খুব অসহায়। সংসারের এই বাঁধন কেটে কোথাও যেতে পারব না। কেউ যেন আমাকে ভুল না বোঝে।”

একটা ইট এসে যেন বুকে লাগল! আমরা কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। অন্ধকার আমাদের সহায় হয়েছিল।

ইন্দ্র টেস্ট পরীক্ষায় ভাল রেজ়াল্ট করেছে। ফার্স্ট ডিভিশন তো পাবেই, স্টারও পাবে মনে হয়। বললাম, “ইন্দ্র কি আর আমার কাছে পড়তে যাবে না তা হলে?”

“আমি কি তাই বললাম! শুধু বলেছি, কেউ অসম্ভব কোনও কিছু ভাবলে কষ্ট পাবে। আমি তো কোনও সাহায্য করতে পারব না।”

পরদিন আড্ডা দিয়ে বাড়ি এসে দেখি, পিওন একটা রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়ে গেছে! বৌদি সই করে নিয়েছে। বাদামি খামের চিঠি। ওপরে বেগুনি কালিতে ওআইজিএস ছাপ! বাঁ দিকের কোণে একটা সরকারি ডিপার্টমেন্টের নাম। মনে পড়ল, ওই ডিপার্টমেন্টের একটা পরীক্ষায় রিটন ও ভাইবা দিয়েছিলাম। সে-ও তো তিন বছর আগেকার কথা! এত দিন পরে আবার তারা চিঠি দিল কেন? তাদের তো আমার কাছে কোনও টাকাকড়ি পাওনা নেই! জানি না, কী আছে ওর ভেতরে। প্রথমেই তনুর কথা মনে পড়ল। ভাবলাম, যা-ই লেখা থাকুক, বিশেষ বন্ধু হিসেবে তনুই ওটা প্রথম খুলবে।

পড়ন্ত বিকেলে ওর কাছেই যাচ্ছিলাম। আজ আর আমার মনে কোনও সঙ্কোচ নেই, সোজাসুজিই তনুর চোখের দিকে তাকাতে পারব। মনের ভেতরে যদি কিছু জন্ম নিয়েও থাকে এত দিনে, তনু তো সেটা মুছে দিয়েছে। তবে আর কিসের সঙ্কোচ? এক জন মানুষ আর-এক জন মানুষের কাছে সহজ হয়ে যেতে পারে না?

বড় সুন্দর লাগছে আজ বিকেলের কাঁকনবিলকে। ও পারে একটা খেজুর গাছের আড়ালে সূর্য ডুবছে। দুটো পানকৌড়ি তখনও মাছের আশায় জলের ওপরে ঘুরছে। বাঁ দিকের ভাট বৈঁচি কালকাসুন্দে হাতিশুঁড় শেয়াকুলের জঙ্গলের ভেতরে, জলের খুব কাছে কেউ বসে আছে। দূর থেকে মনে হল, একটি মেয়ে। হলুদ রঙের শাড়ি পরা, দু’হাঁটুর ওপরে মুখটা রেখে চুপচাপ বসে আছে। মনটা কু গেয়ে উঠল! এই প্রায়ান্ধকারে বসে আরও নির্জনতার অপেক্ষা করছে? ডুবে মরতে চায় নাকি? আমার ভিতরে সেই বনের মোষ তাড়ানোর বাতিকটা আবার জেগে উঠল!

ঢালু পাড় বেয়ে প্রায় দৌড়ে কাছে গিয়ে চমকে উঠলাম! তনু, তনু এখানে কী করছে! আমাকে দেখে একটু হেসে পাশে বসতে বলল। তখনও আমার বিস্ময় কাটেনি! বললাম, “এই অবেলায় এখানে কী?”

“ভাল লাগে, তাই মাঝে মাঝে আসি।”

“এটা মোটেই ভাল লাগার মতো সময় বা জায়গা নয়! পাশেই শ্মশান, সে খেয়াল আছে?”

“তবে নিশ্চয়ই কোনও মতলব আছে!” বলে তনু আঁচলের আড়াল থেকে একটা পিস্তল বের করল! পুরনো, কাদামাটি মাখা, জং ধরা একটা ভারী পিস্তল!

আমি চমকে উঠলাম! তনুর হাতে পিস্তল! কী করবে ওটা নিয়ে?

তনু খুব বিষণ্ণস্বরে বলল, “এটার টানে পড়েই দাদু একদিন বৌ-ছেলে ভুলে ঘর ছেড়েছিল। বাবা তখন নাইনে পড়ে। আর পড়া হয়নি তার পরে। ঠাকুমা বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। সামান্য বিদ্যেয় বাবা ভাল কাজকর্ম জোটাতে পারেনি। জেলের কয়েদির ছেলে বলে কাজ দেয়নি কেউ। তার পর রোগে অপুষ্টিতে অকালে মরে গেছে। পুলিশ বার বার হেনস্তা করেছে। এটার জন্যই আমাদের জীবন তছনছ হয়ে গেছে! আমরা অনাথ হয়ে আগাছার মতো বেঁচে আছি! আজ দাদুর ঘরের মেঝের গর্ত মেরামত করতে গিয়ে পেয়েছি। এটাকে বিসর্জন দিতেই আজ এসেছিলাম এখানে,” তনুর গলা ভারী হয়ে উঠল শেষদিকে।

আবার ঢালু পাড় বেয়ে রাস্তায় উঠছি দু’জনে। নামা সহজ, ওঠা কঠিন। তনু এক সময় হাতটা বাড়িয়ে দিল। রাস্তায় উঠেও সেই ভাবে হাত ধরেই বলল, “সে দিন যা বলেছিলাম, সেটা মনের কথা নয়। ওটা বলতে বুক ভেঙে যাচ্ছিল! কিন্তু আমি তো কোনও দিন মুক্তি পাব না! স্বপ্ন দেখার অধিকারও নেই আমার!” শেষদিকে ওর গলা বুজে গেল।

আমি পকেট থেকে খামটা বের করে ওর হাতে দিয়ে বললাম, “এটা কাল এসেছে। তুমি প্রথম খুলবে বলে এনেছি। তনু অন্ধকারে কিছু পড়তে পারল না। বলল, “চলো, বাড়ি গিয়ে দেখব।”

আমরা জানি না, কী লেখা আছে ওতে। যা-ই থাক, আমার জলে-ভাসা জীবনের নোঙরখানি যে এই কাঁকনবিলের তীরে প্রোথিত হয়ে গেল, তনু তা নিশ্চয় বুঝবে। আমরা এগোতে লাগলাম।

অঙ্কন: সৌমেন দাস
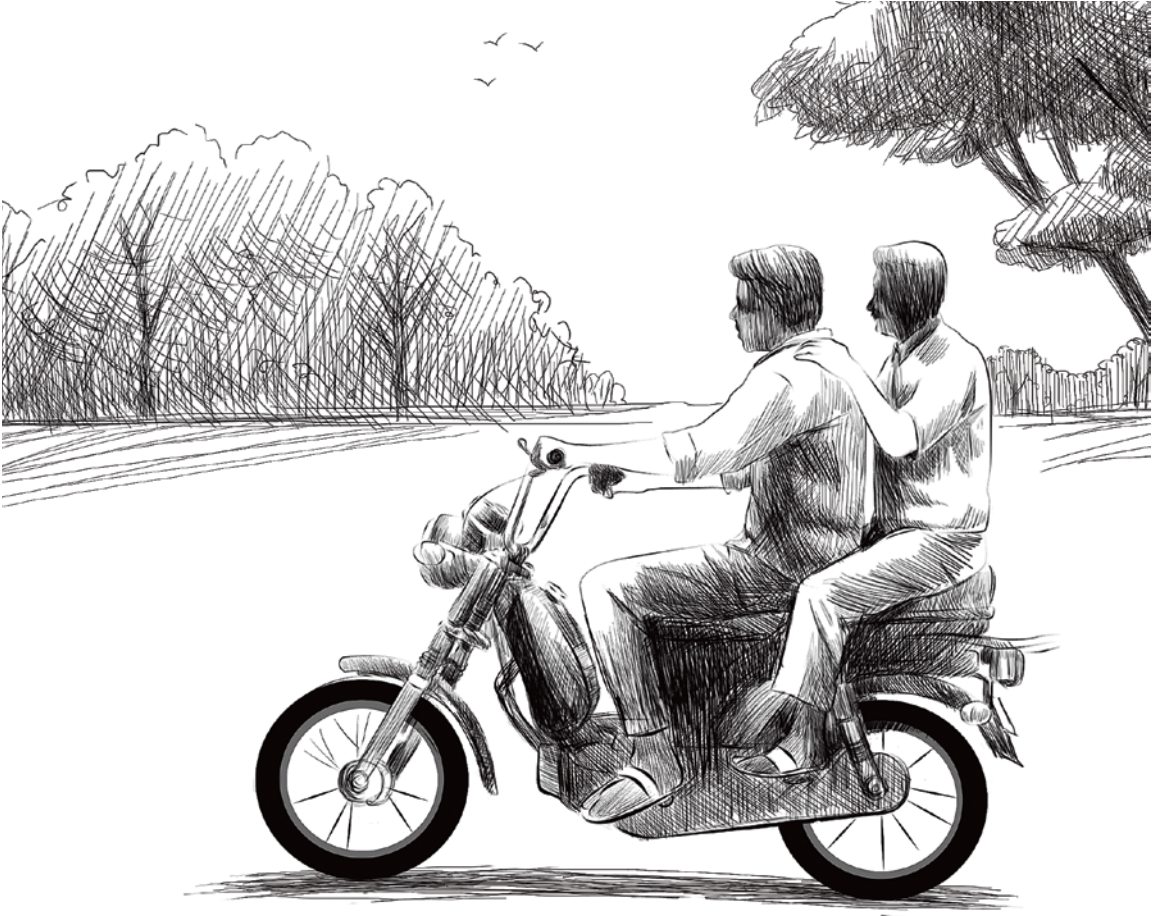
অনুপমের বাসন্তী খাম

অভিনন্দন সরকার

অনুপম চমকে উঠল। সে কি ঠিক শুনছে?

এ তো পানাপুকুর সাঁতরে অলিম্পিকে সোনা জেতার মতো কেস... গুলতি দিয়ে আম পেড়ে কেউ পরমবীর চক্র পায়?

অনুপম অবশ্য এ সবের কিছুই করেনি। সে গত পাঁচ বছর তার মনিব বিশ্বনাথ ঘোষের সঙ্গে ছায়ার মতো সেঁটে থেকেছে শুধু। তাতেই এই!

ক্যাশ কাউন্টারের চাবি পাঞ্জাবির পকেটে পুরে স্নেহ ভরা চোখে অনুপমের দিকে তাকালেন বিশ্বনাথ ঘোষ, "কথাটা ভেবে দেখ। আমি বুড়ো মানুষ। আজ আছি, কাল নেই।"

অনুপমের মনে হল, সে খুশিতে পাগল হয়ে যাবে। খুব ছোটবেলা রূপকথার বইয়ে এমন ঘটনা লেখা থাকত। রাখাল ছেলের অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গে পেয়ে যাওয়ার গল্প। সেই গল্প কি তার জীবনে সত্যি হতে চলেছে!

বিষয়টা অনেকটা সেই রকমই।

তার মনিব বিশ্বনাথ ঘোষ কয়েক মুহূর্ত আগে নিজের মেয়ে বিপাশার সঙ্গে অনুপমের বিয়ের প্রস্তাব রেখেছেন। এ তো গেল রাজকন্যার প্রসঙ্গ, এর সঙ্গে অর্ধেক রাজত্বও আছে। এই 'আদর্শ মেডিক্যাল হল', রমরম করে চলা ওষুধের দোকানের মালিকানার অংশীদারি পর্যন্ত তিনি দিতে চাইছেন অনুপমকে!

বিশ্বনাথ ঘোষ এবার বক্তৃতা দেওয়ার ঢঙে বললেন, "চিরকাল আমি মেনে এসেছি, অর্থ, প্রতিপত্তি এসবের অনেক ওপরে নৈতিক চরিত্রের স্থান। বিপাশার জন্যও তেমনই জীবনসঙ্গী চাইছি অনুপম। তাই তোমাকে..."

কথা শেষ করতে পারলেন না, আবেগে বিশ্বনাথ ঘোষের গলা ধরে এল।

বিশ্বনাথ ঘোষ যে-কথাগুলো বললেন তা মিথ্যে। শুধু মিথ্যে নয়, ডাহা মিথ্যে। স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি ওষুধের দোকানের মামুলি এক জন কর্মচারীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতেনও না। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি ঘোরালো। তাঁর একমাত্র মেয়ে বিপাশা তাঁকে বিরাট প্যাঁচে ফেলে দিয়েছে। মেয়ে এমন এক কেলেঙ্কারি বাধিয়ে বসেছে যে, এই জনমে তার আর বিয়ে হয় কি না, তা নিয়েই এখন সন্দেহ।

এমনই এক বিপর্যস্ত বিকেলে দাবা খেলতে খেলতে বন্ধু পার্থসারথি গুহ তাঁকে

বলেছিলেন, "কিছু কায়দা কখনও পুরনো হয় না বিশু। বিপাশা বেপথে গেছে এ কথা ঠিক, তার জন্য হয়তো ভাল ঘরের সম্বন্ধ আর পাওয়া যাবে না, এটাও ঠিক। তেমনই এমন ছেলেরও অভাব নেই, যারা বিপাশাকে বিয়ে করতে এক পায়ে খাড়া! বুঝলে কিছু?"

বিশ্বনাথ বোঝেননি। জিজ্ঞাসু চোখে বন্ধুর দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি। পার্থসারথি বলেছিলেন, "লাইফটা গিভ অ্যান্ড টেক, বুঝলে বিশু। ধরো, এমন একটা ছেলে, যার তিন কুলে কেউ নেই, অথচ অনেস্ট, হার্ড ওয়ার্কিং... এই ধরনের ছেলে কিন্তু আমাদের পারপাস সার্ভ করতে পারে। তার দরকার আশ্রয়, অর্থ, সিকিওরিটি। এদিকে আমাদের দরকার বিপাশার জন্য একজন বশংবদ হাজ়ব্যান্ড আর তোমার বিজ়নেসে একটা সাপোর্টিং হ্যান্ড। আরে, এত টাকাপয়সা করেছ, মেয়ের একটা বিয়ে না দিলে, বছর ঘুরে নাতি-নাতনি না এলে তো বারো ভূতে লুটে খাবে সব।"

অন্ধকার গুহার শেষে যেন এক বিন্দু আলো দেখেছিলেন বিশ্বনাথ, তিনি বিহ্বল স্বরে বলেছিলেন, "পার্থ, এমন ছেলেও আছে বলছ?"

যাদের পুরো নাম পার্থসারথি, লোকমুখে তাদের ডাকনাম হয়ে যায় পার্থ। এতে তাদের নামের অর্থ পালটে যায়, কিন্তু ক্ষুরধার বুদ্ধিতে মরচে পড়ে না এতটুকু। দুই বন্ধুর কথোপকথনের মাঝে জৌলুসহীন এক সন্ধে নামছিল বিশ্বনাথ ঘোষের দালানবাড়ির দাওয়ায়। টাউন থেকে ওষুধের ডেলিভারি এসেছে, ম্যাটাডোর আনলোড করছিল অনুপম। সেই দিকে আড়চোখে চেয়ে পার্থসারথি বলেছিলেন, "আছে বিশু, আছে। চোখ খুলে দ্যাখো, তোমার আশপাশেই আছে।"

দুই

রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথটা বিশ্বনাথ ঘোষ অনুপমের মোপেড-এর পিছনে সওয়ার হয়ে ফেরেন। দু'হাতে সিটের পিছনের হাতল ধরে থাকেন, মনিবসুলভ দূরত্ব বজায় রাখেন কর্মচারীর সঙ্গে। আজ প্রায় গোটা পথটাই তিনি নরম করে হাত রেখে দিলেন অনুপমের কাঁধে।

রাতটা অবশ্য প্রায় নির্ঘুম কাটল তাঁর। গত বছরখানেক ধরে যা চলছে, তাতে নির্ঝঞ্ঝাট ঘুম আসার কথাও নয়।

অনেক সাধ করে মেয়েকে শহরের কলেজে পাঠিয়েছিলেন বিশ্বনাথ। সেখানে গিয়ে মেয়ে নিজের সর্বনাশ বাধিয়ে এসেছে। বিশ্বনাথ যখন ব্যাপারটা জানতে পারলেন, তত দিনে বিপাশা দু'মাসের প্রেগনেন্ট। পার্থসারথি তাঁকে না সামলালে সেদিনই মেয়েকে কেটে দু'টুকরো করে গঙ্গায় দিয়ে আসতেন বিশ্বনাথ।

নিজের মেয়ে, কত দিনই-বা রাগ করে থাকা যায়! সময় নষ্ট না করে বাড়ি থেকে অনেক দূরের এক নার্সিং হোমে নিয়ে গেলেন মেয়েকে। পাপের চিহ্ন একেবারে পরিষ্কার করিয়ে আনলেন বিশ্বনাথ। কাজ হয়েছিল কায়েমি টাইপের, একেবারে গোপনে। তার পরেও কী করে যেন বিপাশার অ্যাবরশনের খবর চাউর হয়ে গেল। বর্ধিষ্ণু গ্রাম, প্রায় সবাই সবাইকে চেনে, টি টি পড়ে গেল চারদিকে—বড়লোকের মেয়ের পল্লবিত কেচ্ছা।

পার্থসারথি সেই সময় বলেছিলেন, "কয়েকদিন একদম চুপচাপ থাকো। বছর ঘুরতে না ঘুরতে সব থিতিয়ে যাবে। পাবলিক মেমরি, বুঝলে, ভেরি শর্ট।"

কিছু সময় তাই ঘাপটি মেরে রইলেন বিশ্বনাথ। তার পর ধীরে ধীরে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ দেখতে লাগলেন।

বাবার অগাধ টাকা আর মেয়ের চোখ ধাঁধানো রূপ, কম্বিনেশন হিসেবে দুর্দান্ত। অনেক পাত্রপক্ষেরই বিপাশাকে এক কথায় পছন্দ হয়ে গেল। ফ্যাসাদ বাধল এর পরই, কথা পাকা হয় কি না-হয়, কারা যেন পাত্রপক্ষের কাছে দায়িত্ব নিয়ে বিপাশা আর তার আগের প্রেমিকের ঘনিষ্ঠ সব ছবি পাঠাতে লাগল। শুধু তাই নয়, যত্ন করে পাঠানো হচ্ছে অ্যাবরশন সংক্রান্ত কাগজপত্রও!

এক পাত্রের বাবা তো দোকান বয়ে এসে যা-তা অপমান করে গেলেন বিশ্বনাথকে। অন্য ছেলের সঙ্গে বিপাশার ঘনিষ্ঠ ছবি ছুড়ে দিলেন বিশ্বনাথের মুখে।

সমস্যা বাড়ছে ঘরেও। বিপাশা কথাবার্তা বন্ধ করেছে। ঘর অন্ধকার করে বসে থাকছে সারা দিন। বাধ্য হয়ে টাউনে নিয়ে গিয়ে এবার মনের ডাক্তার দেখাতে হল বিশ্বনাথকে। মনের ডাক্তার বললেন, "ওষুধ দিচ্ছি বটে, তবে শুধু ওষুধে কাজ হবে না। এনগেজমেন্ট চাই, নতুন করে পড়াশোনা, নতুন কোনও হবি। বিয়ে দিতে পারলে তো খুবই ভাল। বিয়ে যে শুধু সমস্যার জন্ম দেয় তাই নয়, এই সব ছোটখাটো অবসাদ, মানসিক সমস্যা বিয়ের পর কেটে যেতেও আকছার দেখেছি।"

এই কথা বলে মনের ডাক্তার পেশাদারি হাসি হেসেছিলেন।

মনের ডাক্তার হেসেই খালাস, সেই হাসি দেখে রক্তচাপ আরও বেড়ে গেছিল বিশ্বনাথের। আজ শেষমেশ অনুপমের কাছে তিনি প্রসঙ্গ পাড়লেন বটে, তবে মন সায় দিচ্ছে না। বাড়িতে আশ্রিত একটা ছেলে হবে বিশ্বনাথ ঘোষের জামাই! এর পরেও চোখে ঘুম আসে?

ঘুম অবশ্য সেই রাতে অনুপমেরও হল না। বছর পাঁচেক আগে যেদিন পুষ্যি হয়ে এই বাড়িতে পা রেখেছিল অনুপম, বিপাশা তখন ক্লাস নাইন কি টেন। বারান্দায় অন্য মেয়েদের সঙ্গে খেলা করছিল বিপাশা। তার রূপের আলোয় উঠোন ভরে ছিল। কার দিকে আঙুল তুলে যেন কিশোরী বিপাশা চেঁচিয়ে উঠেছিল, "স্ট্যাচু!"

তাতে কার কী হয়েছিল জানা নেই, তবে অনুপমের ধারণা, সেদিনই সে একটা পাথরের মূর্তি হয়ে গেছিল। সেই মূর্তি ঘিরে বিপাশা নামের একটা দুর্দান্ত ভাললাগা প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়ায়, কখনও স্বপ্ন হয়ে বসে তার চোখের পাতায়, ফের উড়ে যায়।

পায়া ভাঙা তক্তপোশে শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করল সে। ঘোষবাড়ির একতলার এই স্যাঁতসেঁতে ঘরে থাকতে তার একটুও অসুবিধে হয় না। তবে বিপাশা দিদিমণি কি আর বিয়ের পরে এই ঘরে থাকতে আসবে? স্টেশন বাজারে মস্ত বড় ফ্ল্যাট কিনেছে বিশ্বনাথ ঘোষ, ওই ফ্ল্যাটবাড়িতেই সম্ভবত উঠে যেতে হবে তাদের। তবে অনুপম জানে, আর ঈশ্বর জানেন, বিপাশাকে সে শুধু বিপাশার জন্যই ভালবাসে, বিশ্বনাথ ঘোষ যদি জাঁদরেল পয়সাওয়ালা না হয়ে বাজারের স্ট্যান্ডে রিকশা টানত, তবুও বিপাশাকে এ ভাবেই ভালবাসত অনুপম।

নির্ঘুম রাতের ভোর হল। ঘুলঘুলি দিয়ে আলো এল স্যাঁতসেঁতে ঘরে। উঠে গিয়ে অনুপম নিজের ট্রাঙ্ক খুলল। জামাকাপড় সরিয়ে টেনে বের করল একটা বাসন্তী রঙের খাম। খামের মধ্যে বিপাশা আর তার প্রেমিকের ঘনিষ্ঠ ছবি।

আছে আর একটা ছবিও— হলুদ পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে বিপাশা, পাগলপারা ঘন চুলের ঢাল সামলাতে হিমশিম... তার পিছনে নীল সমুদ্র, বিপাশার মুখে সহস্র ওয়াটের সুখ উথলে উঠছে। এটা অনুপমের প্রিয় ছবি। বিপাশা দিদিমণি যে সমুদ্র কী ভালবাসে, সেবার ড্রাগিস্ট ইউনিয়নের পিকনিকে জুনপুট গিয়েও দেখেছিল অনুপম— নীল জলরাশির সামনে দাঁড়ালেই কেমন একটা বিহ্বল ভাব ফুটে ওঠে তার চোখেমুখে।

বিয়ের পর জোড়ে তো কোথাও যেতে হয়... খুব সুন্দর একটা সমুদ্র-সৈকতে অনুপম নিয়ে যাবে বিপাশা দিদিমণিকে। তার জমানো পয়সার প্রায় পুরোটাই হয়তো তাতে উড়ে যাবে, তা যাক।

এর পরের কাগজটা সেই নার্সিং হোমের।

একটা অভদ্র লোক এসে অপমান করে গেছিল বিশ্বনাথ ঘোষকে। মনিব একবার ইশারা করলেই লোকটার সঙ্গে সেদিন একহাত লড়ে যেত অনুপম। সেই লোকেরই ফেলে যাওয়া কাগজ আর ছবি, অনুপম নিজের কাছে রেখে দিয়েছে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল অনুপমের। কেন

বিপাশা দিদিমণি এত ভালবাসল ছেলেটাকে? নিজের সবটুকু উজাড় করে দিল এ ভাবে! আর সেই ছেলেই-বা কী? বিপাশা দিদিমণির মতো এমন মেয়েকে কেউ ছেড়ে যায়? অনুপমের বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। পৃথিবীতে ভাল লোকদেরই ভগবান এত কষ্ট দেয় কেন?

তিন

বিপাশা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অনুপম অনেকক্ষণ আগে একটা প্রশ্ন করেছে, বিপাশা উত্তর দেয়নি। অনুপম বুঝতে পারছে না বিপাশা দিদিমণি তার প্রশ্নটা শুনতে পেয়েছে কি না!

বিপাশার মন ভাল নেই। রোহন যে এইভাবে তাকে ঠকাবে, তা সে ভাবতেও পারেনি। অথচ প্রথম প্রথম কত ভালবাসার অভিনয়, কত সোহাগ, পরস্পরকে চোখে হারানো কত না দিনরাত্রি।

সেই রোহন কী অদ্ভুত রকম পালটে গেল বিপাশা প্রেগনেন্ট হওয়ার পরে। কী জঘন্য ভাষায় কথা বলেছিল!

ঘটনা হল, প্রেমটা জমিয়ে করলেও বিপাশা ঠিক করিৎকর্মা টাইপের মেয়ে নয়। কলেজের বান্ধবীদেরও কিছু জানিয়ে উঠতে পারেনি। বাবার কাছে এসেই কেঁদে পড়তে হয়েছিল তাকে।

বাবা নিজের সোর্স লাগিয়ে তাকে বিপদ থেকে বের করেছে। কিন্তু অ্যাবরশন টেবিলের সেই যন্ত্রণা, সেই নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার গ্লানি তো আর বাবা ভাগ করে নিতে পারেনি।

বাবার মুখ চেয়েই হয়তো-বা নতুন করে জীবন শুরু করত বিপাশা, কিন্তু কারা যে লুকিয়ে থেকে বিয়েতে ভাংচি দিচ্ছে বারবার...

সম্বন্ধগুলোর মধ্যে সেরা ছিল রাজর্ষি। ব্যাঙ্কের অফিসার, বিপাশাকে দেখামাত্র ছেলে চন্দ্রাহত। বাড়ির সকলেও খুব ইমপ্রেসড। কিন্তু পাকা দিন ঠিক করবেন বলে তাঁরাও কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেলেন! বিপাশার ধারণা, রাজর্ষির পরিবারের কাছেও গোপনে তার অতীত সম্পর্ক আর অ্যাবরশনের খবর এত দিনে পৌঁছে গেছে।

অথচ রাজর্ষিকে মনে ধরেছিল বিপাশার। এমন ছেলেকে পাশে পেলে রোহনকেও একটা জুতসই জবাব দেওয়া যেত। দ্যাখ, তোর চেয়ে বেটার ডিশ বেছে নিতে পারে এই বিপাশা ঘোষ।

বিপাশা হতাশভাবে মুখ ঘুরিয়ে অনুপমের দিকে তাকাল, "কী বলছিলে যেন? আবার বলবে প্লিজ়?"

"ইয়ে, মানে বিপাশা দিদিমণি, জানি আমি আপনার যোগ্য নই, কিন্তু বিশ্বাস করুন, নিজের সবটুকু দিয়ে আপনাকে ভাল রাখার চেষ্টা করব। মোট কথা আপনার চোখে আর কোনও দিন জল আসবে না দিদিমণি। কিন্তু আপনার অমতে এই বিয়ে আমি করতে চাই না। তাই কর্তাবাবুকে না জানিয়েই আপনার মত জানতে এসেছি। আপনি রাজি তো?"

কথা শেষ করে অনুপম কুণ্ঠিত ভাবে বিপাশার দিকে তাকাল।

বিপাশাও অনুপমকে দেখছিল, বিশেষত্বহীন চেহারা। ঢোলা টেরিকটের প্যান্টের উপর একটা আটপৌরে হাওয়াই শার্ট, সেই শার্টে জায়গায় জায়গায় ঘাম শুকিয়ে যাওয়া সাদাটে দাগ। রোদে ঘুরে ঘুরে গায়ের রং তামাটে... ঝকঝকে স্মার্ট, জিম-চর্চিত রোহন, অসম্ভব বুদ্ধিদীপ্ত রাজর্ষি পেরিয়ে তার কপালে এই লোকের ঘর করা নাচছিল!

বিপাশার গা জ্বলে গেল। হাতি পাঁকে পড়লে তাকে চামচিকে লাথি মারে এ কথা বিপাশা জানত, কিন্তু পাঁকে পড়া হাতির চারপাশে ঘুরে চামচিকে নরম নরম কথা বললে, সেটা যে আরও অসহ্য ব্যাপার হয়, তা সে আজ বুঝল।

কিন্তু বিপাশার উপায়ই-বা কী? নতুন করে পড়াশোনা শুরুর মুরোদ তার নেই, বাড়ি থেকে পালিয়েই-বা যাবে কোথায়? এক গ্রাম লোকের তির্যক দৃষ্টি বয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে এই লোকটাকে মেনে নেওয়া সামান্য হলেও বেটার অপশন। পুরুষদেরই তো পৃথিবী। একলা নারী নিজের কলঙ্ক, নিজের গ্লানি ধুতে পারবে না। তাকে পুরুষের বউ হয়ে উঠতে হবে... হতে হবে পুরুষের সন্তানের মা, তবেই শাপমুক্তি।

দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বিপাশা বলল, "যা হচ্ছে আমার মত নিয়েই হচ্ছে অনুপম, আমার কোনও আপত্তি নেই।"

লাজুক হেসে অনুপম বলল, "আমি তা হলে এখন আসি দিদিমণি?"

মিষ্টি করে হাসার অভিনয় করল বিপাশাও, অস্বাভাবিক কোমল স্বরে বলল, "ডাকটা এবার পাল্টালে হয় অনুপম। বিয়ে করা বউকেও কি দিদিমণি বলে ডাকবে?"

ঠিক তিন মাস সতেরো দিন পর বিয়ে হয়ে গেল বিপাশার।

পাত্রের নাম রাজর্ষি বসু, সাঁইথিয়ার দিকে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অফিসার। হাসিখুশি, সৌম্যদর্শন... চমৎকার ছেলে।

এই বিয়ে অনেক আগেই হয়ে যেত, নেহাত রাজর্ষির এক অসুস্থ জেঠতুতো দাদার জীবনমরণ অবস্থা উপস্থিত হয়, সেই নিয়ে তার পরিবারের সবাই চিন্তায় অস্থির, বিয়ের কথা কি আর তখন কারও মাথায় থাকে?

সেই সমস্যা কিছুটা সামলে নিয়ে রাজর্ষির বাবা ফোন করেছেন বিশ্বনাথ ঘোষকে। বিনীতভাবে জানতে চেয়েছেন বিপাশার জন্য যোগ্য কোনও পাত্র তিনি খুঁজে পেয়েছেন কি না, না হলে যেন রাজর্ষির ব্যাপারটি তিনি নতুন করে বিবেচনা করে দেখেন।

বিশ্বনাথ ঘোষ এতটাই অবাক হলেন যে, তাৎক্ষণিক ভাবে তাঁর মুখে কোনও কথা জোগাল না। তিনি সে ভাবে কোনও সদুত্তরও দিয়ে উঠতে পারলেন না ভদ্রলোককে।

ঘটনা শুনে বিকেলে দাবার আড্ডায় হাঁ হাঁ করে উঠলেন পার্থসারথি। বন্ধুকে মৃদু তিরস্কার করে তিনি বললেন, "করেছ কী হে? এমন পাত্র নিয়ে আবার দোনোমনা করছ? এখনই রাজি হয়ে যাও। কে আবার কোথা থেকে কাঠি করে দেয়।"

বিশ্বনাথ ঘোষ মৃদু স্বরে বললেন, "অনুপমের সঙ্গে কথাবার্তা যে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে, পার্থ... "

পার্থসারথি বাঁকা হেসে বললেন, "লাইফটাও দাবার বোর্ডের মতো, বিশু। খেলা ফুরোলে রাজা, মন্ত্রী, বোড়ে সব এক বাক্সে ঠাঁই পায়, কিন্তু খেলা যতক্ষণ চলছে ততক্ষণ বোড়ে আর মন্ত্রীর পার্থক্য তো থাকেই, তাই না? সেই পার্থক্য না বোঝার মতো গাধা তো তুমি নও, এত বড় ব্যবসা চালাচ্ছ..."

মনের গহিনে সম্ভবত এই কথাগুলিই শুনতে চাইছিলেন বিশ্বনাথ ঘোষ, সেই রাতেই তিনি মেয়ের কাছে কথা পাড়লেন। বিপাশার মুখে যেন দীর্ঘদিন পরে একটা হারিয়ে যাওয়া ঝলমলে আলো দেখতে পেলেন বিশ্বনাথ। কোনও এক বিচিত্র কারণে তাঁর মনে হল মনোবিদের সাহায্য ছাড়াই হয়তো মেয়ে এবার অবসাদ কাটিয়ে বেরিয়ে আসবে।

পরদিনই রাজর্ষিদের বাড়িতে ফোন করে তদবির শুরু করে দিলেন। পারলে মেয়েকে সেই দিনই তিনি বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দেন।

অনুপমের মুখোমুখি হলেন বিয়ের কথা অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার পরে। এক রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে প্রসঙ্গ তুললেন তিনি। অনুপম মোপেড চালাচ্ছে শুনশান হয়ে আসা মফস্‌সলি পথ দিয়ে, বিশ্বনাথ ঘোষের হাত সিটের পিছনের হ্যান্ডেল ধরা। তিনি বসেছেন সাবধানে, ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে। আরও সাবধানি স্বরে তিনি বললেন, "তোর দিদিমণির একটা সম্বন্ধ এসেছে, বুঝলি?"

বিশ্বনাথের মনে হল অনুপমের হাত কেঁপে গেল সামান্য, তবে সে সামলে নিল অল্পতেই। বিশ্বনাথ ঘোষ গলা ঝাড়া দিয়ে বললেন, "তুই তো নিজেও চাইবি তোর বিপাশা দিদিমণি ভাল থাকুক, তাই না? ছেলে দুর্দান্ত। তেমনই তার ফ্যামিলি। পড়াশোনা কত দূর জানিস? বলছি শোন... "

বাকি পথ তিনি হবু জামাইয়ের গুণকীর্তন করতে করতে বাড়ি ফিরলেন। উৎসাহের আতিশয্যে লক্ষ করলেন না যে, মোপেড চালক একটি কথাও বলেনি।

বাড়ি ফিরে থমথমে মুখে অনুপম মোপেড

গ্যারাজে রাখছিল, বিশ্বনাথ একটু কিন্তু কিন্তু করে বললেন, “একটা কথা ভাবছিলাম, এত খাটাখাটনি করিস, সব দিকে ছোটাছুটি তো কম যায় না। পরের মাস থেকে তোর মাইনেটা ভাবছি দু'হাজার টাকা বাড়িয়ে দেব। কী, ঠিক আছে?”

এই কথা শুনে অনুপম চোখ তুলে মনিবের দিকে তাকাল। বিশ্বনাথ ঘোষ ঝানু ব্যবসায়ী, সচরাচর কোনও কর্মচারীকে চোখ রাঙিয়ে ছাড়া কথা বলেন না, কিন্তু অনুপমের সেই দৃষ্টির সামনে তিনি একরকম স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কথা না বাড়িয়ে দোতলায় উঠে যাচ্ছেন বিশ্বনাথ। চোরের মতো হাঁটা। সিঁড়িতে পায়ের সামান্য শব্দ পর্যন্ত হচ্ছে না।

চার

আজ বিপাশার বিয়ে।

ঘোষবাড়ির মাঝামাঝি বিস্তীর্ণ ফাঁকা উঠোনে বিয়ের মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে। একমাত্র মেয়ের বিয়েতে কার্পণ্য করেননি বিশ্বনাথ ঘোষ, প্রায় পুরো গ্রামেরই নেমন্তন্ন আজ এ বাড়িতে। রংবেরঙের নিয়ন আলো আর হ্যালোজেনের রোশনাইতে ভেসে যাচ্ছে চারদিক। প্যান্ডেলের গায়ে হাজার ফুলের কারুকাজ।

উঠোনের কোণে চালতা গাছের নীচে জমাট বাঁধা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে অনুপম দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা বাসন্তী রঙের খাম। মণ্ডপের আলো পড়ে তার চোখ চকচক করছে।

সন্ধে নিবিড় হয়ে আসছে, লোকসমাগম বাড়ছে বিয়েবাড়িতে।

অনুপম আর দেরি করল না। দ্রুত পায়ে হেঁটে কোনও দিকে না তাকিয়ে সে উঠোন টপকে পূর্ব দিকের ঘরটায় এসে ঢুকল।

রাজর্ষি ততক্ষণে বর-আসনে বেশ জমিয়ে বসেছে। বন্ধুবান্ধবদের একটা দল ঘিরে আছে তাকে। লঘু হাসিঠাট্টা চলছে পুরোদমে।

অনুপম তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, “নমস্কার রাজর্ষিদা।”

রাজর্ষি চোখ তুলে চাইল। তার সামনে একটা হাবাগোবা মার্কা লোক দাঁড়ানো। লোকটার মুখ অসম্ভব বিবর্ণ দেখাচ্ছে, দৃষ্টি ঘোলাটে, বেশবাস ঈষৎ অবিন্যস্ত, বিয়েবাড়িতে বেমানান।

রাজর্ষি তবু হাসল, “নমস্কার,” তার পর চোখ সরু করে বলল, “আপনি... মানে... বিপাশার বাবার মেডিক্যাল স্টোরের...”

অনুপম বলল, হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। নিন। এটা রাখুন।”

রাজর্ষি হাত বাড়িয়ে খামটা নিল।

উপহার দিয়ে অনুপম নিচু গলায় কিছু একটা বলল। রাজর্ষি শুনতে পেল না। এমন বিকট শব্দে ট্রাম্পেট বাজাচ্ছে ব্যান্ডপার্টির ছেলেগুলো!

অনুপম তখন তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল।

কথা শেষ হওয়ামাত্র পিছন ফিরল সে, কয়েক সেকেন্ডেই বিয়েবাড়ির ভিড়ে মিশে গেল অনুপম। রাজর্ষি বিস্মিতভাবে অনুপমের চলে যাওয়াটা দেখল কিছুক্ষণ... তার পর বাসন্তী খামের মুখ খুলল।

প্রচণ্ড ব্যস্ত বিশ্বনাথ বিয়ের প্রস্তুতি তদারকি করছিলেন। অনুপম তাঁর হাতে মেডিসিন স্টোরের চাবির গোছা দিল। বিশ্বনাথ ঘোষ চকিতে অনুপমের চোখে চোখ রাখলেন। অনুপমের চোখ হাসছে, তার ঠোঁটের কোণেও বিদ্যুতের মতো হাসির রেখা। পাঁচ বছর এই ছেলে তাঁর ছায়াসঙ্গী... একটি কথাও বলতে হল না, বিশ্বনাথ বুঝে গেলেন অনুপম এই মুহূর্তে ঘোষবাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

অনুপম ভেবেছিল আর কোথাও দাঁড়াবে না, কিন্তু তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। বাগানের পাশের ঘরের জানলা দিয়ে বিপাশাকে দেখা যাচ্ছে। খুশিতে উচ্ছল হয়ে খোশগল্প করছে, তাকে ঘিরে আছে ঘরভর্তি মেয়ের দল।

নববধূবেশে তাকে রাজেশ্বরীর মতো দেখাচ্ছে। ভালবাসার নারী এমন অপূর্ব করে সাজলে তার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। একটা অজানা কষ্ট হতে থাকে, সুখের মতো ব্যথা। চোখ ফিরিয়ে নিল অনুপম, তার পর একবারও না থেমে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গেল।

অনুপমের চলে যাওয়ার ব্যাপারটা জানতে পেরে উৎকণ্ঠা দেখালেন পার্থসারথি, “এই ক্লাসটা কিন্তু বেসিকালি বেইমান হয় বিশু, দোকানের স্টক চেক না করে ছেড়ে দিয়ে ভাল কাজ করোনি। দাও, ওর ঘরের চাবিটা একবার দাও দেখি।”

ঘরে ঢুকতেই একটা পোড়া গন্ধ নাকে ঝাপটা মারল পার্থসারথির। ঘরে বেশ কিছু কাগজপত্র পোড়ানো হয়েছে, মেঝেতে পড়ে রয়েছে কালো ছাই। পুরো ঘর চোখ বুলিয়ে পার্থসারথি নিশ্চিত হলেন যে, এই ছেলে কিছু নিয়ে যেতে পারেনি। কিন্তু এত বড় মেডিসিনের ব্যবসা, বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে ছেড়ে চলে যাবি? মেঝের ছাই বুট জুতো দিয়ে পিষে দিলেন পার্থসারথি, অস্ফুটে বললেন, “নেমকহারাম।”

অনুপম যে ঘোষবাড়ি থেকে কিছুই নিয়ে আসেনি, এ কথা ঠিক নয়। ওষুধের স্টক নিয়ে বসলে দেখা যেত বেশ কয়েক ফাইল কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধের হিসেব মিলছে না।

রাত নিঝুম। শুনশান হাইওয়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে যাচ্ছে একটা বাস। বাসের শেষের দিকের একটা সিটে এলিয়ে আছে রোগা শরীরটা। তার হাতে একটি মেয়ের ছবি। মেয়ের পরনে হলুদ পোশাক, পিছনে সমুদ্র, খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে তার হাসিমুখ।

কেন বাসে উঠেছে তা অনুপম জানে না। এই বাস কোথায় যাবে, তাও তার অজানা। আসলে তার বিশেষ কোথাও যাওয়ার নেই। সে শুধু অনেক দূরে চলে যেতে চাইছে।

অনুপমের মনে হচ্ছে যে-কোনও সময় সে গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবে। ঘোষবাড়ি থেকে সে একেবারে খালি হাতে আসেনি, প্রচুর কড়া ঘুমের ওষুধ ছাড়াও তার সবচেয়ে প্রিয় এই ছবিটাও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

সব ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে মায়া রাখা ভাল কথা নয়। প্রেমিকের সঙ্গে বিপাশা দিদিমণির ছবিগুলো আর অ্যাবরশনের কাগজ পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছে অনুপম। তবু হাতে ধরে তার প্রিয় ছবিটা সে নষ্ট করতে পারেনি। ঘোষবাড়ি থেকে এই ছবিটুকু ছাড়া আর কিছু পাওয়ার যোগ্যতা তার ছিলই না কোনও দিন। এই ছবিটুকুই তার কাছে আস্ত একটা বিপাশা দিদিমণি।

অনুপম তার হাত বাড়িয়ে দিল জানলার বাইরের অন্ধকারে। প্রবল হাওয়ায় ফরফর উড়ছে ছবিটা। ছেড়ে দিলেই হয়। তবু ছেড়ে দিতেই-বা পারছে কই? প্রাণপণে আঁকড়ে আছে ছবিটাকে।

বেশিক্ষণ তাকে কষ্ট করতে হল না। একসময় সারা পৃথিবীর সমস্ত ঘুম উপুড় হয়ে নেমে এল তার চোখে, মুঠো আলগা হয়ে এল। অনুপমের বুকের আকাশ থেকে তারা খসে পড়ল একটা, হাইওয়ের অন্ধকারে কোথায় যে হারিয়ে গেলেন তার বিপাশা দিদিমণি!

বাসরঘরে বাসন্তী খাম বের করে নতুন বউকে দেখাল রাজর্ষি, “দারুণ গিফট! থ্রি নাইটস স্টে, তাও আবার গোয়ার হোয়াইট স্যান্ড সি রিসর্টে! তোমার বাবা নিজের স্টাফদের কত স্যালারি দেন গো? এত দামি গিফট! ভাবছি হানিমুনটা গোয়াতেই সেরে আসি,” রাজর্ষি হাসিমুখে বলল, “আমাকে আবার তিনি বলে গেলেন, আমাদের বিপাশা দিদিমণির সমুদ্র খুব পছন্দ, তাই ...”

বিপাশা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “ওর কথা বাদ দাও, ও একটা পাগল।”

মুখে এই কথা বললেও বিপাশা বুঝল অজান্তেই তার চোখে জল এসে গেছে। সে খুব সাবধানে চোখ মুছল, কাজল বাঁচিয়ে।

রাজর্ষি গা করল না। কাঁদুক, একটু পরে থেমে যাবে। এই সময় মেয়েরা এক বার হাসে, এক বার কাঁদে, কান্না থামলে আবার হাসে... আর এ সবই তারা করে তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে।

বিয়ের দিন মেয়েদের কান্নাকে গুরুত্ব দিতে নেই।

অঙ্কন: অসীম হালদার

কুমার

সুবর্ণ বসু

গল্প শুরু হচ্ছে জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন সকালে। মিত্তিরবাড়ির গিন্নি সুখময়ী দেবী ভোরবেলা থেকে পুজো পাঠানোর তোড়জোড় করছেন। পাশের পাড়ায় চাটুজ্জেদের বাড়ি জগদ্ধাত্রী পুজো হয়। বহু বছরের পুরনো পুজো। ওপার বাংলা থেকে চলে আসছে। দেশভাগের সময় সেখানকার ভিটের ঠাকুরদালানের মাটি নিয়ে এসেছিলেন চাটুজ্জেদের পূর্বপুরুষরা। সেখানকার মাটি এখনকার বাড়ির ঠাকুরদালান তৈরির সময় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেখানেই জগদ্ধাত্রী পুজো হয়। আশপাশের তিন-চারটে পাড়ার প্রায় সব বাড়ি থেকেই লোকজন চাটুজ্জেদের বাড়ি পুজো দিতে আসেন।

ভোরে উঠে স্নান সেরে পুজো পাঠানোর বন্দোবস্ত করেছেন সুখময়ী। কিন্তু পাঠাতে গিয়েই বাধা পেলেন। বড়বউ বাপের বাড়ি, মেজোবউ জোড়া হয়েছেন। এবার কাকে দিয়ে পুজো পাঠাবেন? কাজের লোককে দিয়ে তো আর পুজো পাঠানো যায় না। অগত্যা

হাঁকডাক করে চিলেকোঠা থেকে ডেকে পাঠালেন ছোটছেলে কুঞ্জকে। সে বেচারা রাত করে ঘুমোয়। বেলা আটটার আগে ওঠে না। সাতটার সময় সে ধড়মড় করে উঠে নীচে নেমে শুনল, তাকে চাটুজ্জেদের বাড়ি পুজো দিতে যেতে হবে। তাই ঘুম ভেঙেও শান্তি নেই। চান করে কাচা জামাকাপড় পরে পনেরো মিনিটের মধ্যে তৈরিও হতে হবে, মায়ের হুকুম। সে হাই চাপতে চাপতে দাঁত মেজে বাথরুমের দিকে চলল। বাদ-প্রতিবাদ তার ধাতে নেই। কিন্তু চাটুজ্জেবাড়ি শুনে মনটা একটু চিনচিন করে উঠল। ও বাড়ি যেতে তার পা ওঠে না। এক পুরুষকণ্ঠের তীব্র বিষোদ্গার কানে ঝনঝন করে ওঠে। পাঁচ বছর কতটুকুই বা সময়! যে কষ্ট আমৃত্যু মানুষের পিছু ছাড়ে না, পাঁচ বছরে তার একটুও ফিকে হয় কি! কিন্তু উপায় নেই। যেতে হবে। মনের খচখচানি ঝেড়ে তৈরি হয় কুঞ্জ। কী আর হবে! যাবে, গিয়ে পুজোর জিনিসপত্র দেবে আর চলে আসবে। সে একটা জলের দাগের মতো মানুষ। নেই হয়ে বাঁচা সে অভ্যেস করে ফেলেছে অনেক দিন।

এই মিত্তিরবাড়ির ছোটছেলে কুঞ্জ এক আশ্চর্য মানুষ। ওরকম সুন্দর সুপুরুষ অথচ মুখচোরা একাবোকা লোক এলাকায় আর দ্বিতীয়টি নেই। ভাল নাম কুমারজিৎ। সে নামটা চেহারার সঙ্গে মিললেও, স্বভাবপ্রকৃতি অনুযায়ী ছোট্ট ডাকনাম কুঞ্জটাই মানানসই। মিত্তিরবাড়ির কর্তার বয়স সত্তরের ওপর। তাঁর তিন ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বড় আর মেজো ছেলের বিয়ে হয়ে ছেলেমেয়েও হয়ে গেছে। কিন্তু কুঞ্জ বিয়ে থা করেনি। আর বিয়ে করবে বলে মনেও হয় না। তার এ বছর পঁয়ত্রিশ পূর্ণ হল। সে শিল্পী। ছবি আঁকে, মূর্তি গড়ে। চিলেকোঠার ঘরটাই তার স্টুডিয়ো। সেখানেই একপাশে পাতা তক্তপোশে সে ঘুমোয়। খাওয়াদাওয়া ছাড়া বাড়ির সঙ্গে তার বিশেষ সংস্রব নেই। বড় দাদার এক ছেলে এক মেয়ে, মেজো দাদার এক ছেলে। ভাইপো-ভাইঝিরা কুঞ্জর বেশ ন্যাওটা। বাচ্চারা কুঞ্জকে এবং কুঞ্জও বাচ্চাদের খুব পছন্দ করে। কিন্তু সমবয়সি সমাগমে কুঞ্জ আড়াল খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন উঠবে, সুন্দর সুপুরুষ যখন, বিয়ে করেনি কেন? উত্তরে বলতে হবে, গল্পের চরিত্র সম্বন্ধে এরকম প্রশ্ন আলটপকা করে ফেলা যায়, তাতে ট্যাক্স লাগে না, কিন্তু বিবাহযোগ্যা মেয়ের বাপ-মায়েরা জানেন, পাত্রের চেহারাছবি হাওয়ার নাড়ু ছাড়া কিছু নয়। মেয়েদের যা-ই হোক না কেন, ছেলেদের ক্ষেত্রে বিয়ের বাজারে রূপের চেয়ে রুপোর দাম, মানে রোজগারের মূল্য অনেকটাই বেশি। সেখানেই শ্রীমান কুমারজিৎ পাশমার্ক তুলতে পারেনি। না হলে মেঘা চাটুজ্জে তো ছিলই!

মুখ ফসকে নামটা যখন বেরিয়েই গেল, তখন তার সম্বন্ধে দু'লাইন বলেও নিতে হয়। লম্বা ফরসা দোহারা চেহারা, কাটা কাটা মুখচোখ দেখে কুঞ্জর প্রেমে পড়া মেয়ের অভাব ছিল না এলাকায়। তা মেয়েরা ও রকম প্রেমে পড়েই থাকে। আয়-উন্নতি-টাকাপয়সা না দেখেই পড়ে। তার পর বয়োধর্ম অনুযায়ী প্রেম চালিয়ে যায় যত দিন না বাড়ি থেকে শাঁসালো পাত্র ধরে আনা হচ্ছে। তার পর সময়মতো আগাছা-টাগাছা ঝেড়ে ফেলে ভাল গাছে নৌকো বেঁধে ফেলে। মেয়েরা বোকা নয়। তারা জানে প্রেম করলেই যে বিয়ে করতে হবে, তার কোনও মানে নেই। আইবুড়ো বেলার খেলার পুতুল নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া চলে না। তবে মেঘা সে রকম ছিল না। সে কৈশোর থেকেই তার কুঞ্জদার দখল নিয়ে রেখেছিল। বেনোজল বড় একটা আসতে দেয়নি কুঞ্জর ধারেকাছে। তারা বিশেষ দেখাসাক্ষাৎ করত না। তাদের সম্পর্কের কথা চার দিকে ঢি-ঢি ফেলে দেয়নি। কুঞ্জরও একটা নাচার নির্ভরতা তৈরি হয়ে গেছিল মেঘার ওপর। কানাঘুষো ছিল, ওদের বিয়ে হবে। তবে বাধা ছিল। বাধা না বলে বাবা বললেও ভুল হয় না। মেঘার বাবা। হরিণ চাটুজ্জে। আসল নাম হরীন্দ্রনাথ, লোকমুখে হরিণ। তিনি ছবি-আঁকিয়ে ব্যাটাছেলে পছন্দ করতেন না, তাঁর কাছে কুঞ্জ বেকারই। সূক্ষ্ম আপত্তি আরও একটু ছিল। কুঞ্জরা ব্রাহ্মণ নয়। অ্যাঁ, কী বললেন? জাতপাত কেউ মানে না? ব্রাহ্মণ কায়স্থ মাহিষ্য তিলি বারুজীবী বলে আজকাল কিছু হয় না? সে আপনি আলোকপ্রাপ্ত মানুষ, আপনার ব্যাপার আলাদা। কিন্তু রোববারের কাগজে 'পাত্র চাই পাত্রী চাই'-এর বিজ্ঞাপনগুলো সে-কথা বলছে না মশাই।

যাক সে কথা, মেঘা কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই ভালবেসেছিল কুঞ্জকে। সে জানত, কুঞ্জর দুমুঠো জুটলে তারও এক মুঠো জুটবে। তার আর কুঞ্জর মাঝে কোনও বাধাই সে আসতে দেবে না। তার বয়স যখন সাতাশ পেরোল তখন সে নিজেই বাড়িতে তার ভালবাসার কথা জানিয়েছিল। হরিণ চাটুজ্জে খুবই নিমরাজি হয়ে বলেছিলেন, "কে? মিত্তিরদের কুঞ্জ? ভাল নাম বোধ হয় কুমারজিৎ না কী যেন! তা সে ছেলেকে একবার বাড়িতে ডাক, কথা বলে দেখি। যেতে আসতে চোখে পড়ে বটে, কিন্তু তেমন চেনা জানা তো হয়নি।"

মেঘা কথাটা জানিয়েছিল কুঞ্জকে। লাজুক অমিশুক কুঞ্জ কিছুতেই রাজি হয়নি প্রথমটায়। তাকে রাজি করাতে খুবই বেগ পেতে হয়েছিল মেঘাকে। সেদিন হাজার বোঝানোর পরও যাওয়ার সময় কাঁচুমাচু কুঞ্জ মেঘাকে বলেছিল, "যেতেই হবে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে? তার চেয়ে আমার মা-কে বরং বলি তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে একবার..."

তিতিবিরক্ত মেঘা বলেছিল, "আজ যদি ঠিক সাতটায় তুমি আমাদের বাড়ি না যাও কুঞ্জদা, এই তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা।"

না। কথার খেলাপ করেনি কুঞ্জ। সেদিন ঠিক সময়েই চাটুজ্জেবাড়ির গেট ঠেলে ঢুকেছিল সে। উঠোন পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই তার কানে ভেসে এসেছিল হরিণ চাটুজ্জের ঝাঁঝালো গলা।

"আরও আশকারা দাও, আশকারা দিয়ে দিয়ে মাথায় তোলো মেয়েকে! দেখেছ তো কী করে বসে আছে।"

মৃদু কিন্তু স্পষ্ট শোনা যায় মেঘার মায়ের গলাও, "আস্তে কথা বলো। ছেলেটার আসার সময় হয়ে গেছে। কী এমন খারাপ পছন্দ করেছে মেয়েটা! ভাল বাড়ির ছেলে। অমন রূপবান..."

সাপের মতো হিসহিস করে ওঠেন হরিণ চাটুজ্জে, "রূপ ধুয়ে জল খাবে কি? গণ্ডমূর্খ মেয়েছেলের কথা শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়! গালভরা নাম, কুমারজিৎ! ও দিকে দামড়া ছেলে, এক পয়সা রোজগার নেই। বাপের হোটেলে চারবেলা খায় আর ছবি এঁকে গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মাকাল ফল একটা! দু'দিনে তোমার মেয়ে বুঝে যাবে কত ধানে কত চাল! তখন এই হরিণ চাটুজ্জের পায়ে এসেই পড়তে হবে, এই জেনে রাখবে!"

যুক্তি দিতে চেষ্টা করেছিলেন মেঘার মা, "তোমার মেয়েরও তো বয়স কম হল না। তা ছাড়া মেয়ে বিয়ের পর বেশি দূরে চলে যাবে না, কাছাকাছি থাকবে, এই বা কম কী!"

"বাজে কথা বোলো না তো! বামুনের মেয়ে জাত খুইয়ে কায়েতের ছেলেকে বিয়ে করবে, দশজন আত্মীয়কুটুমের কাছে আমার মাথা হেঁট হবে, জ্ঞাতিরা আড়ালে মুখ চাপা দিয়ে হাসবে, এসব বুঝি কিছু নয়! এটা কি কলকাতা শহর পেয়েছ? তুমি দেখছ মেয়ে কাছাকাছি থাকবে, ব্যস! সব দুঃখ হরিপালে! এই যদি আমাদের বিক্রমপুরের খাসতালুকে ঘটত না, ওই ভ্যাগাবন্ড ছেলেটার লাশ ভাসত ধলেশ্বরী নদীতে।"

"তোমার মুখে কি কিছুই আটকায় না! ছেলেটা যে যে কোনও সময় এসে পড়বে যদি শুনতে পায়..." কাতর গলায় বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন মেঘার মা।

কিন্তু ততক্ষণে যা শোনার শোনা হয়েই গেছিল। আর পা ওঠেনি কুঞ্জর। না, লাশ হয়ে ধলেশ্বরীতে ভেসে ওঠার ভয়ে নয়, মাকাল ফল কথাটা বড্ড মনে লেগেছিল
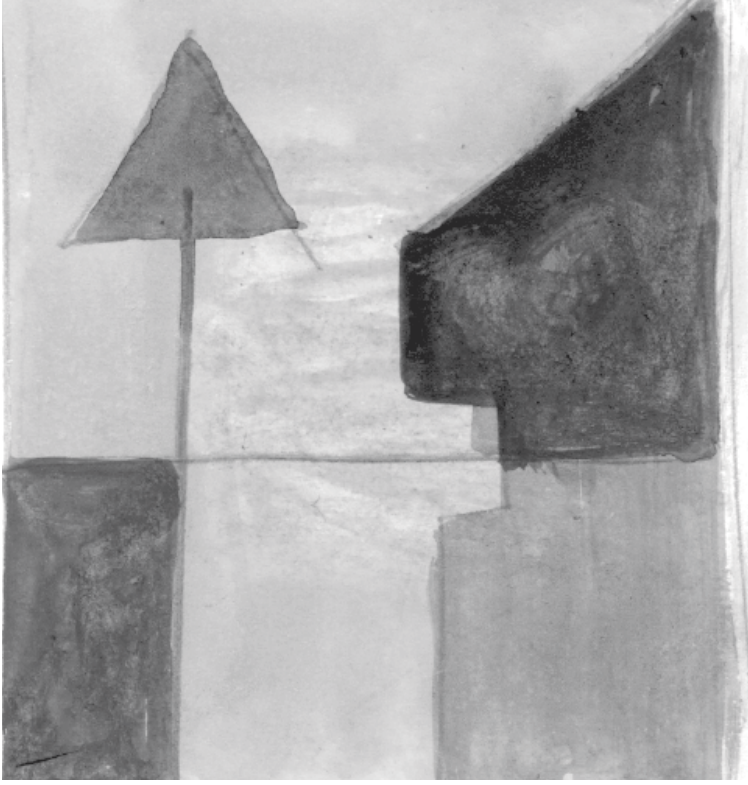
তার। পায়ে পায়ে পিছিয়ে এসে বাড়ি চলে এসেছিল সে। সারারাত ঘুমোতে পারেনি। কানে বাজছিল হরিণ চাটুজ্জের কথাগুলো। বারবার বিছানা থেকে উঠে চোখে মুখে জল দিচ্ছিল। শেষ রাতে আর ঘুমনোর চেষ্টা করেনি। ছাদের আলসের ধারে দাঁড়িয়ে চোখ রেখেছিল তারাভরা আকাশের বুকে। মনে হয়েছিল একটা তারা সেজে আকাশে লুকিয়ে পড়লে কেমন হয়। মিত্তিরবাড়ির বিশাল ছাদের পাঁচিল ডেকেছিল তাদের ওপর দাঁড়িয়ে শূন্যে শরীর ভাসিয়ে দিতে। শেষ অবধি পারেনি কুঞ্জ। চিরতরে পালিয়ে যেতে ধক লাগে। তা কুঞ্জর কোনও দিনই নেই।

কথাগুলো শুনতে হয়েছিল মেঘার কাছেই। পরের দিন বাজার যাওয়ার পথে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছিল মেঘা। চাপা গলায় বলেছিল, "পুরনো ইস্কুলবাড়ির বাগানে এসো। অপেক্ষা করছি।"

মেঘার চোখদুটো লাল। চুলগুলো যেন হাওয়ায় ফণা ধরে আছে। মুখ চোখ শুকনো।

দেখা করেছিল কুঞ্জ। মেঘা বলেছিল, "কাল গেলে না যে?"

"না, সন্ধে থেকে একটু মাথা ধরেছিল, শরীরটা ভাল লাগছিল না..."

"মিথ্যুক! তুমি সিঁড়ি দিয়ে উঠেও পালিয়ে এসেছ... আমাদের বাড়ির মালতী দেখেছে..."

কুঞ্জ চুপ করে নিজের পায়ের নখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

"বাবার কথাগুলোই তোমার কাছে বড় হল? আমি কিছু না?"

কুঞ্জ নিরুত্তর।

"কাল যদি এক বার বাবার সামনে দাঁড়াতে, আমি এক কাপড়ে তোমার সঙ্গে বেরিয়ে আসতেও রাজি ছিলাম। কিন্তু তুমি ভেতরেই ঢুকলে না!"

এ বার কুঞ্জ মুখ খোলে। নিষ্প্রাণ গলায় বলে, "তোমার বাবা খুব কষ্ট পেতেন। বাবাকে কষ্ট দিয়ে তুমি কি সুখী হতে পারতে? পরে মনে হত, আবেগের বশে ভুল করে ফেলেছ..."

কেঁদে ফেলেছিল মেঘা। বলেছিল, "আমারই ভুল কুঞ্জদা। আমারই ভুল। আমার বোঝা উচিত ছিল যাকে তাকে রাজার পার্ট দেওয়া যায় না। হয়তো আমার ভালবাসাতেই কিছু খামতি আছে। ভাল থেকো কুঞ্জদা, আমি আর তোমাকে কোনও দিন বিরক্ত করব না।"

বলে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছিল সেখান থেকে।

সে বছরেই অগ্রহায়ণে বিয়ে হয়ে গেছিল মেঘার। পাত্র সরকারি ইঞ্জিনিয়র। কুলীন ব্রাহ্মণ।

ছোট এলাকায় সবাই সবার খবর জানে। জানতে না চাইলেও জেনে ফেলা যায়। হাটেবাজারে পাড়ার রকে গুঞ্জন ওঠে। সেখান থেকেই কানে আসে। সেভাবেই কুঞ্জ জানে যে, এ বছরই বৈশাখে মা হয়েছে মেঘা।

আজ জগদ্ধাত্রী পুজোয় পুজোর ঝুড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে হতে কুঞ্জর মনে হল, এ বছর বাপের বাড়ির পুজোয় মেঘা নিশ্চয়ই তার শিশুপুত্রটিকে নিয়ে আসবে। তার সঙ্গে দেখা হবে কি? কে জানে! সে শুধু জানে, সে একটা নেই হয়ে যাওয়া মানুষ।

দুই

একটা বেতের ঝুড়িতে পাঁচ রকম ফল, মিষ্টির বাক্স, ধূপের প্যাকেট, একটা ঘি ভর্তি মাটির প্রদীপ, একটা মোটা জবার গোড়ের মালা, একটা তাঁতের শাড়ি আর একশো এক টাকা দক্ষিণা নিয়ে কুমারজিৎ যখন চাটুজ্জেবাড়ি ঢুকল, তখন আটটা বাজতে মিনিট দশেক দেরি।

সেখানে তখন গমগমে পরিবেশ। হাঁকডাক, পুজোর জোগাড়যন্ত্র চলছে। ধূপ ধুনো গুগ্গুলের গন্ধে চার দিক ম ম। একজন লাল কাপড় পরা ছোকরা পুরুত একধারে বসে বিরক্তিকর ঘ্যানঘেনে গলায় কিছু একটা পড়ে চলেছে। পড়ার কথা চণ্ডী, কিন্তু ঠাকুরমশাইয়ের পাঠ শুনে তা বোঝার উপায় নেই। সে অঁ-অঁ করে যা পড়ছে, তা চণ্ডী, গীতা, বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, আবোল তাবোল, হ য ব র ল যা খুশি হতে পারে। দেখলেই মনে হয়, হারামজাদা রকে বসে বিড়ি ফুঁকছিল, তাকে চড়চাপাটি মেরে ধরে আনা হয়েছে কার্যোদ্ধারের জন্য। পৈতের মহিমাই আলাদা। প্রধান পুরুত অতটা গয়ংগচ্ছ নন। তাঁর মন্ত্রপাঠ তাও বোঝা যাচ্ছে। তিনি বেশ আবেগ দিয়ে গলা কাঁপিয়ে পুজো করছেন। চারধারে বাড়ির মেয়ে বউরা বসে আছে। বেশির ভাগের লাল কিংবা লালপেড়ে অফহোয়াইট শাড়ি। ঠাকুরদালানের নীচটায় বাড়ির কয়েকজন পুরুষ মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছেন। হরিণ চাটুজ্জেও আছেন কি? কে জানে! কুঞ্জ সবাইকে দেখল না। তার সবাইকে দেখতে ভাল লাগে না। সে আজকাল সব কিছু থেকে চোখ প্রত্যাহার করে নেওয়া অভ্যেস করেছে।

কুঞ্জ একমনে ঠাকুরদালানের উপরকার পুজোটাকে শিল্পীর চোখে দেখে। সমস্ত রঙের মাঝে দেবী জগদ্ধাত্রী। সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়া, চতুর্ভুজা, নাগযজ্ঞোপবীতিনী, আয়তনয়না, স্মিতহাস্যময়ী। লাল রং সোনালি পাড়ের বেনারসি। তার উপর রুপোলি জরির আনারসি সাজ। গলায় হলুদ, কমলা গাঁদা, লাল জবা, সবুজ অপরাজিতা আর সবুজ বিল্বপত্রের মালা। দেখে বড় ভাল লাগে কুঞ্জর। মন থেকে হাত দুটো জোড় হয়ে আসতে চায়। কিন্তু হাতে ধরা বড় বেতের ঝুড়িটার জন্য আটকে যায়।

ততক্ষণে তাকে দেখেছেন চাটুজ্জে গিন্নি। বাকিরাও। রোদে রাঙা উঠোন পেরিয়ে কুঞ্জর মতো একজন কান্তিমান পুরুষ হেঁটে আসছে, কেউ দেখবে না, তা কি হয়! চাটুজ্জে গিন্নি

ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে ঠাকুরদালান থেকেই চেঁচিয়ে বললেন, "অ্যাই মণি, কুঞ্জর হাত থেকে ঝুড়িটা নিয়ে আয় না।"

মণি এল, সঙ্গে আরও চুনি-পান্নাও ছুটে এল। সব মেঘারই খুড়তুতো বোন। সবাই মুখ চেনা। কুঞ্জর হাত থেকে ঝুড়ি সবাই নিতে চায়। মেয়েদের দোষ নেই। কুমারজিৎ মিত্রকে দেখে পঁয়ত্রিশ মনে হয় না। সে বিয়ে করতে চাইলে আজও ইচ্ছুক পাত্রীর অভাব হবে না। মেয়েরাই ধরাধরি করে ঝুড়িটা নিয়ে গেল। হাত খালি হতে খেয়াল হল কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়ের হাতে তোয়ালে মোড়া একটা ছোট্ট বাচ্চা। ভারী মিষ্টি। টুকটুকে ফর্সা। গোল গোল হাত পা। পুঁতি পুঁতি ঝকঝকে চোখে সেও কুঞ্জকেই দেখছে। কুঞ্জ একটু হাসল। কী কাণ্ড! বাচ্চাটাও দাঁতবিহীন মাড়ি বের করে চোখ কুঁচকে তাকে হাসি ফেরত দিল। কুঞ্জ বাচ্চা খুবই ভালবাসে। অভ্যেস বশে সে হাত বাড়াল বাচ্চাটার দিকে। বাচ্চাটাও কেমন দু'হাত বাড়িয়ে ছটফট করে উঠল। খুব সাবধানে কুঞ্জ তাকে কোলে নিল। নানা মুখভঙ্গি করে বাচ্চাটাকে আদর জানাল। কানে এল, যে-মেয়েটির কোলে বাচ্চাটি ছিল, সে বলছে, "সবার কাছে যায় না। কেউ কোলে নিতে চাইলে কাঁদে। তোমায় বোধ হয় চেনা লেগেছে। মেঘাদির ছেলে।"

অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল কুঞ্জর বুক থেকে। সে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে অস্ফুটে বলে, "লক্ষ্মীবাবু, সোনাবাবু, আমি তোমার একটা মামু হই..."

মেঘা যে কখন বেড়াল-পায়ে পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে, বাচ্চাটাকে আদর করতে মশগুল কুঞ্জর তা খেয়াল হয়নি। চমক ভাঙল মেঘার চাপা গলায় একটা হিসহিসে মন্তব্য শুনে, "কাপুরুষ কোথাকার। তোমার সাহস থাকলে তুমি এর মামা নয়, বাবা হতে।"

ডায়ালগটা নতুন কিছু নয়। বহু বিবাহিতা মেয়েই তার সন্তানকে টেনে পুরনো প্রেমিককে কথাটা বলে। অনেক সময় সেই পুরনো ব্যর্থ প্রেমিকের বন্ধুবান্ধবরাও এমন কথা বলে তাকে আওয়াজ দেয়। কিন্তু এমন খোঁটা আজ কুঞ্জকে স্পর্শ করল না। সে মুগ্ধ হয়ে মেঘার শিশুপুত্রটিকে দেখেই গেল। অপলক মুগ্ধতায়। আলতো করে নাক ছোঁয়াল তার গালে। বেবি ক্রিম বেবি পাউডারের এক আশ্চর্য মায়াময় গন্ধে তার হৃদয় কানায় কানায় ভরে গেল। কোনও অপূর্ণতার বোধই যেন আর রইল না।

খানিক পরে বাচ্চাটার খাওয়ার সময় হয়েছে বলে মেঘা বাচ্চাটাকে নিয়ে চলে গেল। ও দিকে পুজোরও এখন একটু বিরতি। সপ্তমীর পুজো শেষ হয়েছে, অষ্টমী পুজোর জোগাড় চলছে। চাটুজ্জে গিন্নি উঠে এসেছেন কুঞ্জর কাছে।

"মা এলেন না, কুঞ্জ?"

"আসবেন, একটু বেলার দিকে। সকালে একটু কাজ পড়ে গেছিল..."

"আচ্ছা, আচ্ছা, বাড়ির সবাইকে নিয়ে রাত্তিরে এসো কিন্তু, প্রসাদ খেয়ে যেয়ো..."

এ রকমই দু'চারটে গতানুগতিক কথা পেরিয়ে ফেরে কুঞ্জ।

উঠোন পেরিয়ে সদরের কাছে এসেও কী যেন এক টানে পিছন ফেরে। চাটুজ্জে বাড়ির ভেতর তাকায়। যদি আর এক বার দেখা যায় ছোট্টটাকে! নাঃ দেখা গেল না।

বাড়ি ফিরেও তার ছটফটানি গেল না। বাচ্চাটা যেন তাকে জাদু করেছে। বারবার বাচ্চাটাকে দেখতে ইচ্ছে করছে, তার গাল শুঁকতে ইচ্ছে করছে, আদর করতে ইচ্ছে করছে। জোর করে ছবি আঁকা, বই পড়া, মোবাইলে সিনেমা দেখায় মন বসাতে চাইল। কিন্তু বেশিক্ষণ কোনও কাজই ভাল লাগল না।

চাটুজ্জেদের বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজোয় এলাকার প্রায় সবারই নেমন্তন্ন থাকে। রাত্তিরে উঠোনের মাথায় শামিয়ানা টাঙিয়ে তার তলায় টানা টেবিল-বেঞ্চি পেতে খাওয়ানো হয়। গাওয়া ঘিয়ের গন্ধওয়ালা খিচুড়ি, বেগুনি, আলুরদম, ছানার ডালনা, পায়েস, চাটনি, পাঁপড়, বোঁদে, রসগোল্লা। অনেকেই যায়। অনেকে যায়ও না। যারা যায় না, তাদের মধ্যে মিত্তিররাও পড়ে। বাড়িসুদ্ধু সবাই মিলে গিয়ে পাত পেড়ে খেতে বসতে চক্ষুলজ্জায় আটকায়। এ ব্যাপারে কুঞ্জর বাবা আর দুই দাদা একমত। কুঞ্জর মতামতের তেমন কোনও দাম নেই। অবশ্য কুঞ্জর যে খুব মতামত আছে তাও নয়। গেলেও হয়, না গেলেও হয়।

তবে আজ কেন যেন চাটুজ্জে বাড়ি আর এক বার যেতে খুব ইচ্ছে করছিল কুঞ্জর। তা সে ইচ্ছেটুকুই সার। ইচ্ছের হাত ধরে কবেই বা কাজ করে উঠতে পেরেছে সে।

সারাদিনটা বড্ড উচাটনের মধ্যে কাটল। এমনিতেই জগদ্ধাত্রী পুজোটা কেমন সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো মনে হয় কুঞ্জর। সমস্ত আলো নিয়ে দুগ্গা ঠাকুর চলে যাওয়ার পর তাও অমাবস্যার অন্ধকার কাটানোর জন্য কালীপুজোর রোশনাইটা থাকে। তার পরই যেন ঠিক সিপিয়া রঙের হেমন্ত পড়ে যায়। শীত শীত অন্ধকার। ঠান্ডা বিষণ্ণতা। সারা দুপুর ঝুম হয়ে বসে থেকে ঘুঘুর ডাক শুনতে ইচ্ছে করে। বেলা ছোট হয়ে আসে। চারটে বাজলেই আকাশ ঘোর ঘোর। এই সময় বেঁচে থাকা সামান্য একটু আলো আর বাজনা নিয়ে জগদ্ধাত্রী পুজোটা হয়। তাও এ তো আর চন্দননগর নয়, এক দিনেই পুজো শেষ। পরের দিনই ভাসান।

এবারে জগদ্ধাত্রী পুজো পড়েছিল শনিবার। নভেম্বরের ১৩। এ বছরের মতো বড় পুজো শেষ। ছোট পুজো অবশ্য আছে। এক ভাইকে দিয়ে পুজোর মরসুম শুরু, আর এক ভাইকে দিয়ে শেষ। আগে বিশ্বকর্মা পুজো দিয়ে পুজোর মরসুম শুরু হত। এখন গণেশপুজো দিয়ে হয়। সেই গণেশ ঠাকুরের দাদার পুজোটি এখনও বাকি। ১৭ তারিখ, সামনের বুধবারই কার্তিক সংক্রান্তি।

নানা ভাবনাচিন্তার মধ্য দিয়ে দিন কাটল। রাত্তিরে খাবার টেবিলে ভাল করে খেতেও পারল না কুঞ্জ। বরাদ্দ রুটি তিনটে খানিক নাড়াচাড়া করে উঠে পড়ল। বাড়ির সবসময়ের লোক যদুদাকে বলে রাখল, "রাত্তিরে মেন গেট বন্ধ কোরো না, আমি একটু হাঁটতে বেরোব। শরীরটা ঠিক নেই। খিদে হচ্ছে না। আমার রুটিগুলোও তখনই ভুলুয়াকে দিয়ে আসব।"

যদুদা পুরনো লোক। উদ্বিগ্ন গলায় বলল, "চাদর আর মাফলারটা নিয়ে বেরিয়ো ছোটবাবু। রাত্তিরের দিকটায় খুব হিম পড়ছে আজকাল।"

যথাসময়ে বেরোল কুঞ্জ। রাত দশটা বেজে গেছে। রাস্তাঘাট জনশূন্য। কেউ তাকে দেখতে পেল না। কুঞ্জ হাঁটতে লাগল। হাওয়ায় শীতের ছোঁয়া। শীতও করছে, ভালও লাগছে। খানিকটা হেঁটে যদি শরীরটা একটু হালকা লাগে।

তিন

মাঝে দিনকয়েক কিছু ঘটল না। হেমন্তর মরচেরঙা দিন যেমন কেটে যায়, তেমনই গেল। ঘটনা ঘটল তার পর। কার্তিকপুজোর ঠিক আগের দিন, সকালে সদর দরজা খুলে বাড়ির রোয়াকে জল দিতে গিয়ে পাড়া মাথায় তুললেন মিত্তিরগিন্নি। তাঁর বাড়িতে কেউ কার্তিক ঠাকুর ফেলে গেছে। কিন্তু এ কেমন কার্তিক!

বাড়ির কাজকর্ম বেশির ভাগ যদুদাই করে। ঠিকে ঝি-ও আছে। কিন্তু সকালে উঠে গাছকোমর করে শাড়ি পরে উঠোন আর সদর নিজে হাতে না ধুলে মিত্তিরগিন্নির হয় না। এ তাঁর বহু বছরের অভ্যেস। এই দিন তাঁর চিৎকারে পাড়াসুদ্ধু লোক জড়ো হল এবং ফেলে যাওয়া সেই কার্তিককে দেখে অবাক হয়ে গেল। না, সরু গোঁফ আর বাবরি চুলওয়ালা, হাতে তির ধনুক আর ময়ূরের পিঠে বসা বীরপুঙ্গব দেবসেনাপতি তো এ নয়। এ তো একটা ছোট্ট গাব্দুগুব্দু বাচ্চা ছেলে! টলটলে চোখ, হাসি মুখে সদ্য ওঠা দুটি দাঁত দেখা যাচ্ছে। খালি গা, কোমরে ভারী সোনালি ঘুনসি বাঁধা। পরনে ছোট্ট কপনি। এক হাতে ছোট ছোট খেলনা তির ধনুক। অন্য হাতে একটা ময়ূরের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছে। মাথায় ছোট্ট পাগড়ি। দেখলেই কোলে তুলে নিতে ইচ্ছে করে। এমন আশ্চর্য কার্তিক কেউ কখনও দেখেনি তো! অনেকে শুনেছে

চুঁচড়ো-বাঁশবেড়ে-কালনায় নাকি খোকা কার্তিক পুজো হয়। সে কি এই রকম? কে জানে! কেউ ঠিক মনে করে বলতে পারল না।

মায়ের চিৎকার শুনে বেরিয়ে এল কুঞ্জ। অবাক হয়ে দেখল অতিথিকে। তারপর মা কে বলল, "এবার কী হবে মা?"

মিত্তিরগিন্নি খরখরে গলায় বললেন, "কী আর হবে? পুজো করতে হবে তিন বছর। তোর চান হয়েছে? তা হলে ঠাকুরকে ঘরে তুলে আমায় উদ্ধার কর! আমার ঝাঁটাবালতির হাত।"

সেদিন একটু আগে ঘুম ভাঙায় কুঞ্জর চান হয়ে গিয়েছিল। সে কার্তিক ঠাকুরকে কোলে করে তুলে নিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

মিত্তিরগিন্নি গজগজ করতে লাগলেন, "যে বাড়িতে গত দশ বচ্ছর নতুন কারও বে হয়নি, সে বাড়িতে কাত্তিক ফেলিস কোন আক্কেলে! বড় ছেলের ছেলে মেয়ে আছে, মেজো ছেলেরও ছেলে হয়েছে তিন বচ্ছর হল... ছোটটা নিজেই আইবুড়ো কাত্তিক... কার ছেলে হবে যে, কাত্তিক ফেললি অলপ্পেয়ে মুখপোড়ার দল!"

ঠাকুরঘরে ঠাকুরকে বসিয়ে রেখে চুপচাপ চিলেকোঠার ঘরে ঢুকে পড়ে কুঞ্জ। সে জানে, দাদারা অফিস বেরিয়ে গেলেই ফের তার ডাক পড়বে। পুজোর দোকান-বাজার, ফুল মালা, দশকর্মার জিনিস, পুরোহিত জোগাড়— এ সব কে আর করবে! কুঞ্জ আছে না! ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো!

চানটান করে মিত্তিরগিন্নি ডেকে পাঠালেন ছোট ছেলেকে। ঠাকুরের ক্যাশবাক্স থেকে বেরোল দুটো পাঁচশো টাকার নোট। পাঁজি দেখে কার্তিকপুজোর ফর্দ লিখে দিলেন ছোটছেলেকে। সমস্ত দোকান বাজার সেরে মধুসূদন পুরুতকে খবর দিয়ে সে বাড়ি ফিরে এসে দেখে ঠাকুরের তোলা উনুন ধরানো হয়েছে। তার আনা ফল কুটবেন মিত্তিরগিন্নি। সঙ্গে লুচি-সুজি দিয়ে ভোগের ব্যবস্থাও হচ্ছে। মিত্তিরগিন্নি যতই চটুন, পুজো আচ্চার ব্যাপারে তিনি পান থেকে চুন খসতে দেবেন না।

বেশ জমিয়েই পুজো হল। পাড়ার বাড়ি বাড়ি ফল-মিষ্টি, লুচি-সুজির ভোগও বিতরণ হল। লোকজন হাসিঠাট্টা করল বটে, তবে প্রসাদ বেশ তৃপ্তি করেই খেল। কেউ তেমন খেয়াল না করলেও রহস্য থেকে গেল একটু। এ ধরনের ঘটনায় কার্তিক যারা ফেলে, তারা এসে সে কথা স্বীকার করে মূর্তির দামটি পকেটস্থ করে যায়। এ ক্ষেত্রে কেউই সে রকম দাবি করতে এল না। পকেট থেকে আরও টাকাপয়সা না বেরোলে তো কারও আপত্তির কিছু নেই, ফলে ঘটনাটা ধামাচাপা পড়ে গেল।

কার্তিক পুজোর রাত্তিরে যখন মিত্তির বাড়ির সবাই ঘুমে অচৈতন্য, ঠাকুরঘরের দরজা খোলার মৃদু শব্দ হল। সামান্য খুট করে আওয়াজ।

দিনসাতেক আগে ঠিক এ রকম ভাবেই, মধ্যরাতে মৃদু টোকা পড়েছিল রাখাল কুমোরের ঘরে। রাখাল কুমোর তখন সারা দিনের কাজকর্মের পর খাওয়া দাওয়া সেরে শোওয়ার তোড়জোড় করছে। সে রাত অবধি জেগে কাজ করে। শুতে দেরি হয়। মধ্যরাতে আসা আগন্তুকের সে তথ্য অজানা নয়।

প্রৌঢ় রাখাল ভাবে এত রাতে আবার কে এল! সে গলা খাঁকারি দিয়ে সাড়া নেয়, "কে?"

চাপা গলায় উত্তর আসে, "দরজা খোলো। চোরডাকাত নই।"

চোর ডাকাত নেবে এমন কিছু তার ঘরে আজ নেইও। গতকালই জগদ্ধাত্রী ঠাকুর বিক্রির কাঁচা টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়েছে রাখাল। সে উঠে গিয়ে দরজা খুলল।

রাস্তার লাইটপোস্টের আলোর উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকায় আগন্তুকের মুখ দেখা গেল না। সে দরজার পিছনে হাত বাড়িয়ে সদরের উপরকার ল্যাম্পটা জ্বালল। আগন্তুককে চিনতে পারল সে। এমন সুন্দর মুখ এ তল্লাটে খুব বেশি ছেলের নেই। মিত্তিরবাড়ির ছোট ছেলে কুমারজিৎ। সবাই কুঞ্জ বলে ডাকে। মাঝে মাঝেই তার কাছে মূর্তি তৈরির কায়দাকানুন শিখতে আসত। তবে এবার এল বহু দিন পরে। সে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকে এল কুঞ্জ।

"কী ব্যাপার কুঞ্জদাদা? এত দিন পর? এত রাতে?"

ফিসফিস করে কুঞ্জ বলেছিল, "দরকার আছে। তোমার কাছে এখন টানা কয়েক দিন আসব। এ রকমই রাত্তিরে। তোমার উঠোনে বসে একটা মূর্তি তৈরি করব। খড় মাটি কাঠামো আর যা যা দরকার তুমি ব্যবস্থা করে রাখবে। আমি গড়ব। কিন্তু কাকপক্ষীতেও যেন টের না পায়।"

পরের দিন থেকে শুরু হয়েছিল কুঞ্জর নৈশাহারের পর হাঁটতে বেরনো। এবং রাখাল কুমোরের বাড়ি এসে রাত জেগে কয়েক ঘণ্টা করে কাজ করে যাওয়া। রাখাল কুমোর মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে তার নির্মাণ দেখত। টুকটাক প্রশ্নও করত। প্রথমে তার মনে হয়েছিল গোপাল ঠাকুর তৈরি করছে কুঞ্জ। কিন্তু গায়ের গৌরবর্ণ, ছোট্ট তির ধনুক আর ময়ূর তৈরি হওয়ার পর রাখালের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। সে বলেছিল, "কালনা না চুঁচড়োয় খোকা কার্তিক, পুজো হয় শুনেছি। এ যেন ঠিক তেমন ধারা জিনিস বানালে গো কুঞ্জদাদা!"

কার্তিক সংক্রান্তির ঠিক দু'দিন আগে নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছিল কুঞ্জর। দু'চোখ ভরে দেখে মোহিত হয়ে গেছিল রাখাল কুমোরও। সে বলেছিল, "জাতকুমোরের কান কাটতে পারো তুমি কুঞ্জদাদা। তোমার হাতে অদ্ভুত মায়া আছে। চোখ ফেরানো যায় না।"

কুঞ্জ ম্লান হেসেছিল। তার পর একটা পাঁচশো টাকার নোট রাখাল কুমোরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল, "তুমি না থাকলে হত না রাখালদা। এ বার আর একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। কাল ভোররাতে এই ঠাকুরকে বসিয়ে দিয়ে আসবে আমাদের বাড়ির দরজায়। দেখো আলো ফোটার আগেই কোরো। কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও কিছু টের না পায়।"

হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল রাখাল কুমোর, "সে কী গো কুঞ্জদাদা! নিজের বাড়িতে নিজেই কার্তিক ফেলবে তুমি? এমনধারা কেউ করে নাকি! কী আশ্চয্যি কাণ্ড তোমার..."

উত্তেজনায় রাখাল কুমোরের গলা সামান্য উঁচু হয়েছিল। চোখ বড় বড় করে ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে তাকে চুপ করতে বলল কুঞ্জ। তার পর বলল, "উপায় নেই গো! নিজে হাতে করে কার্তিক ঠাকুর নিয়ে বাড়ি ঢুকলে হাজারো টিটকিরি শুনতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। এতটা করলে, এই উপকারটুকুও আমার করে দাও রাখালদা।"

রাজি হয়েছিল রাখাল কুমোর।

আজ কার্তিক সংক্রান্তির গভীর রাতে চুপিচুপি ঠাকুরঘরে ছোট্ট কুমারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে কুমারজিৎ। জানলা দিয়ে আসছে উজ্জ্বল চাঁদের আলো। কুঞ্জ পা টিপে টিপে ঠাকুরের আসনের কাছে আসে। কার্তিক ঠাকুরকে তার আসন থেকে তুলে কোলে নেয়, তার গালে নাক ঠেকায়। বুক ভরে শ্বাস নেয়। প্রাচীন ঠাকুরঘরে জমে থাকা ধূপ-ধুনো বেলপাতার গন্ধ ছাপিয়ে বেবি ক্রিম বেবি পাউডারের অলৌকিক গন্ধে হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায় কুঞ্জর।

সে ফিসফিস করে বলে, "তুমি আমায় কী বলে ডাকবে, তাতে কী এসে যায়! এই যে তোমায় কোলে নিয়ে আদর করতে পারলুম এই তো আমার অনেক গো!"

তার গলা ধরে আসে। গলায় জমে থাকা কষ্ট-কষ্ট এক আনন্দ চোখ ছাপিয়ে তার গাল ভিজিয়ে দেয়। সে আদরে আদরে ভরিয়ে দেয় সেই দেবশিশুকে। গালে গাল ঠেকিয়ে কত কথা বলে। কত কথার মানে হয়, কত কথার হয় না। তবু সে বলে যায়। ছোট্ট ঠাকুর হাসিমুখে মন দিয়ে সব কথা শোনে তার। আকাশে আজ ত্রয়োদশীর চাঁদ। পূর্ণ হতে সামান্য কিছু বাকি। এই ভাল। পূর্ণ হলেই ক্ষইতে শুরু করে। অল্প ভাঙা চাঁদের আলোয় দেখা যায়, কুমারের আদর জলবিন্দু হয়ে কার্তিকের গালে লেগে আছে।

অঙ্কন: প্রসেনজিৎ নাথ

অখিল মাইতির সুখ

অম্লানকুসুম চক্রবর্তী

পাঁচ বছর পরে হাউ ডু ইউ উইশ টু প্লেস ইওরসেল্ফ, মিস্টার মাইতি? মানে বলতে চাইছি, হাফ এ ডিকেড ডাউন দ্য লাইন কিভাবে দেখতে চান নিজেকে?

অখিল মাইতি চেয়ে থাকেন। মাথার উপরে একটা এয়ার কন্ডিশনার লাগানো। কোনার দিকে একটা সবুজ লাইট জ্বলছে। ইলেকট্রনিক ঘড়ির মতো একটা ছোট্ট স্ক্রিন লাগানো পাশে। তাতে হালকা সবুজ রঙে ভেসে উঠেছে ১৮ ডিগ্রি। কফিটা ঠান্ডা হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি। সেভাবে খেতেই পারলেন না। সামনে তিন জন লোক বসে। মাঝখানে যিনি, তিনি একটা টাই পরে রয়েছেন। নীল রঙের সুট। স্বচ্ছ টেবিলটার

উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ওঁর জুতোটা ঝলকাচ্ছে। ধর্মতলায় মেট্রো স্টেশনের গায়ে, গ্র্যান্ড হোটেলটার তলায় বাহারি নামের যে-দোকানগুলো আছে, সেখানে কাচের দেওয়ালের পিছনে দেখেছিলেন এমন জুতো রাখা আছে সারি সারি। যে-দামটা উঁকি মারছিল, তা অখিলের এক মাসের মাইনেকে টক্কর দেয়। ফলে সাহসে কুলোয়নি। দেখেছিলেন, রিকশায় বসা লোক যেভাবে পাশ দিয়ে হুশ করে বেরিয়ে যাওয়া আউডি গাড়িকে দেখে।

নীল সুটের পাশেই যিনি বসে আছেন, তাঁর টকটকে লাল জামা। জামার উপরে অনেকগুলো সাদা ফুল। মানে ফুলের ছাপ। অখিল জানেন, এ ধরনের জামাকে বলে ফ্লোরাল প্রিন্ট। ফ্লোরাল প্রিন্টের মুখে ফ্রেঞ্চ কাট। ভদ্রলোক দাড়িতে হাত বুলোচ্ছেন। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। পকেট থেকে উঁচিয়ে রয়েছে মাইল্ডস সিগারেটের কুড়িটার বাক্স। একদম ডানদিকে বসে এক মহিলা। মহিলা না বলে মেয়ে বলাই ভাল। একটা টাইট কালো জামা। নীল জিনস। জামার উপরের একটা বোতাম খোলা। চোখের পাতার উপরে কিছু লাগানো আছে নির্ঘাৎ। পাতা ফেললেই চকচক করছে। ঠোঁটে গাঢ় খয়েরি রঙের লিপস্টিক। ভেজা ভেজা। মাঝেমধ্যেই একটা ঠোঁট দিয়ে অন্যটাকে পালিশ করছে। আপাতত ফেসবুক করছে মনে হয়। স্ক্রিনে স্ক্রল করতে করতে হঠাৎ 'চার বটল ভদকা, কাম মেরা রোজকা' বেজে উঠতেই 'ওহ শিট' বলে গানটা বন্ধ করে দিল। লাল জামা থাম্বস আপ দেখিয়ে বললেন, "চিল্ ইয়ার।" তারপরেই অখিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইয়েস প্লিজ়।"

এই তিনজনের পেছনের দেওয়ালে ফিট করা দুটো চল্লিশ ইঞ্চির পাতলা স্ক্রিনের টেলিভিশন। চল্লিশের বেশিও হতে পারে। একটা পর্দায় দেখা যাচ্ছে মহাকাশে অনেক তারার মধ্যে দিয়ে বুলেটের মতো এগিয়ে

চলেছে টেককিং-এর লোগো। টেককিং মানে নিশ্চয়ই টেকনোলজির কিং। এই কোম্পানির নাম। বাবা লোকনাথের মাথার চারদিক থেকে যেমন দ্যুতি বেরোয়, মানে ছবিতে যেমন দেখা যায় আর কি, ঠিক তেমন আলোর রিং বেরোচ্ছে টেককিং-এর লোগো থেকে। পাশের স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে, একটা ল্যাপটপ খুলে যাচ্ছে নিজে নিজেই। তারপর ওটার পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে আসছে নানা ধরনের চার্ট। এসকিউএল, ডট নেট, জাভা—এমন কয়েকটা শব্দ স্ক্রিনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছোটাছুটি করছে। পৃথিবী ঘুরছে, একটা একটা করে দেশ ম্যাপ থেকে বেরিয়ে এসে বড় হচ্ছে আর সেখানকার লোকের হাসিমুখ দেখিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার পরের দেশ আসছে। যে-ঘরটায় বসে আছেন ওঁরা সবাই, তার চারদিকে কাচের দেওয়াল। সোদপুরে অখিল মাইতির ভাড়াবাড়ির পাশে, ক্লাবের পিছনে যে-মাঠটা আছে, তার চেয়েও বড় একটা জায়গায় বহু লোক ল্যাপটপে মাথা গুঁজে কাজ করে চলেছে। অনেকেরই মুখের সামনে হাত চাপা দেওয়া। হাসছে নাকি? কাজ করার সময় কি এত হাসি পায়?

চৈতালির কাছে বহুবার ‘একটা স্মার্টফোন কেনারও মুরোদ নেই’ শুনতে শুনতে শেষ পর্যন্ত একটা ফোন নিতেই হয়েছিল অখিল মাইতিকে। সম্মানরক্ষায়। কাচঢাকা গাড়িতে প্রিয়জনদের দেহ স্ট্রেচারে করে ঢুকিয়ে দেওয়ার মতো পরম মায়ায় পুরনো বোতাম চেপা ফোনটাকে আলমারির লকারে ঠেলে দিয়েছিলেন অখিল। বাহান্ন বছর বয়সে স্মার্টফোন এল। আগরওয়াল ফ্যাশন-এর একই গদিতে বসা রাজদীপ ফোনটা কেড়ে নিয়ে বলল, “ফাটাফাটি অখিলদা। দশটা মিনিট দিন। ফোনটাকে একটু মানুষ করে দিই।” ফেরত দেওয়ার সময় বলল, “মন্ত্র গুঁজে দিয়েছি। এবারে কল পাবেন। কলের পর কল। আগরওয়ালকে লাথ মারা জাস্ট আর কয়েকটা দিনের অপেক্ষা অখিলদা।” ফোনের স্ক্রিনে আঙুল নাচাতে নাচাতে বলছিল, “এটা হল গিয়ে হোয়্যাটসঅ্যাপ, এটা হল ক্যারম খেলার অ্যাপ, এটা দিয়ে ফোন রিচার্জ করা যাবে আর এই অ্যাপটা দিয়ে চাকরি পাওয়া যায়। আপনার বেসিক ডিটেল ভরে সেট করে দিয়েছি। বুঝলেন কিছু?” ফোন হাতে পেয়ে সেটাকে আরও ভারী লাগতে থাকে অখিলের। অ্যাপ গুঁজে দিলে কি ফোনের ওজন বেড়ে যায়?

কলের মানে রাজদীপের থেকেই বুঝেছিলেন অখিল মাইতি। মাসছয়েক আগে তাজা ছেলেটা যখন আগরওয়াল ফ্যাশনে ঢুকল, বড়বাজারের তস্য গলির মধ্যে স্যাঁতস্যাঁতে সেই দোকানে অখিলকে দেখে বলেছিল, “পঞ্চাশ পেরিয়েও শাড়ি ভাঁজ করতে লজ্জা করে না অখিলদা?” উনত্রিশ বছরের কর্মচারী অখিল শূন্যচোখে চেয়েছিলেন। রাজদীপ বলেছিল, “ছোট থেকে বড় হতে গেলে চেঞ্জ করতে লাগে। আমার একুশ। বাইশের মধ্যে ছাড়ব।” বড়বাজার থেকে শপিং মলের চল্লিশ হাজার স্কোয়ার ফিট আউটলেটের স্টোর ম্যানেজার হওয়ার ইচ্ছেকুসুম শুনিয়েছিল রাজদীপ। বলেছিল, “মাসে সাড়ে পাঁচ হাজার থেকে এক লক্ষ—ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারলে মাত্র দশ বারো বছর।” তারপর বলল, “প্রার্থনা করুন, যেন আপনার মতো না হতে পারি অখিলদা।”

এই কথাটা নতুন নয় অখিলের কাছে। চৈতালি যেমন বলে, এমন বর যেন না হয় কারও। জীবনে কোনওরকমের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই! বলত, কী বলবে ছেলে? বাবা বড়বাজারের এক গদির কেরানি? সেটা শুনলে কান লাল হয়ে যাবে না তোমার? ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে পারেননি অখিল। সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না। বাড়িতে ক্যালেন্ডারের মতো পাতলা টিভি কিনতে পারেননি। বাথরুমের দরজা আধভেজা করে, হাঁটু মুড়ে বসে যখন চৈতালি কাপড় আছড়ায়, সেই শব্দ অখিলের বুকে এসে ধাক্কা মারে। দু’লাইন ইংরিজি বলতে গিয়ে ক্লাস নাইনের ছেলে যখন তোতলায়, শব্দ খুঁজে না পেয়ে দেওয়ালের দিকে তাকায়, বিড়বিড় করে, অখিলের নিজের ছোটবেলার কথা মনে হয়। উনত্রিশ বছর চাকরি করেও নিজের কিংবা পাশের লোকদের অবস্থা বদলাতে পারলেন না একটুও।

বিএ পাশ করে যখন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছিলেন, এক বন্ধুর কাকার সূত্রে কাজ জুটেছিল আগরওয়াল ফ্যাশনে। কৃতজ্ঞতাবোধ গলা টিপে ধরায় গত তিন দশক এই দোকানের বাইরে আর কিছু ভাবতে পারেননি অখিল। ফলে চাকরি জোটার প্রথম দিনে যা করতেন, আজও তাই করেন। সকাল সাড়ে নটায় শাটার উঠিয়ে দোকান খোলেন, গদিটদিগুলো, সামনে বসার বেঞ্চিগুলো ঝেড়ে রাখেন। খদ্দের এলে শাড়ি দেখান। কাস্টমারের পছন্দ হলে সেটা ছুড়ে ক্যাশে দিয়ে দেন। ভাঁজ করে অন্যগুলো আবার প্লাস্টিকে পুরে রাখেন। ক্যাশবাক্সের সামনে মালিক ছাড়া আর কারও বসার অনুমতি নেই। আগে মালিকের বাবা বসতেন। ময়াঙ্ক আগরওয়াল। এখন ওঁর ছেলে বসেন। রজনীশ। দোকানের ব্যবসা বাড়ায় রাজদীপ বলে ছেলেটাকে চাকরি দিয়েছেন রজনীশজি। রাজদীপকে কাজে ঢোকানোর পরে উনি বলেছিলেন, “বান্দেকো ইউজ় করো। ইয়ং লড়কা। বয়স বাড়ছে তোমার।” অখিল অবশ্য নিজের কাজের চাপের সিকিভাগও রাজদীপের উপরে চাপাননি। ভয় পেয়েছিলেন। বাতিল হয়ে যাওয়ার ভয়। এতে সুবিধা হয়েছে রাজদীপেরই।

মাসের আট-ন তারিখে সাত হাজার তিনশো টাকা মালিকের থেকে গুনে নেওয়ার সময় নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে অখিল মাইতির। ঘেন্না হয়। মাইনে পাওয়ার দিন যখন বাড়ি ঢোকেন, মাথাটা আরও হেঁট হয়ে যায়। সংসার খরচের সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা আলমারির ভিতরে ঝুলতে থাকা ব্যাগে ঢোকানোর সময় বুঝতে পারেন, ব্যাগটা হাসছে। হাসে না, দাঁত ক্যালায়। চৈতালি বলে, আলমারি আর লক করতে হবে না গো। তোমার ওই টাকা চোরেও নেবে না। অখিল মাইতি শোনেন। শোনা ছাড়া ওঁর তো কিছু করারও নেই আর।

স্মার্টফোন ‘মানুষ’ হওয়ায় মাসখানেক পরে অখিল মাইতির কাছে একটা ফোন আসে। নম্বরটা চিনতেন না। অচেনা নম্বর থেকে যে-ফোনগুলো পান, মিষ্টিগলার মহিলারা ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে যে-উচ্ছ্বাসে কথা বলা শুরু করেন, অখিলের মাইনে শোনার পরে তাঁরাই কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে যান। সেরকমই কিছু একটা হবে ভেবে অখিল ফোনটা তুললেন।

“মিস্টার মাইতি, নয়না ফ্রম টেককিং ইন্টারন্যাশনাল। আর ইউ লুকিং ফর এ চেঞ্জ?”

অখিলদার ভুরু কুঁচকোতে দেখে রাজদীপ ভুরু উঁচিয়ে তাকায়। গদির সামনে রাখা চেয়ারে দু’জন কাস্টমার বসে। মেলে রাখা আছে দশ-বারোটা কাঞ্জিভরম। অখিল রাজদীপকে ফোনটা দিয়ে বলেন, “কী বলছে ভাই দেখো তো?” রাজদীপ ফোনটা কানে নিয়েই ঝটিতি ফিরিয়ে দেয় অখিলকে। বলে, “শাঁখ বাজাও অখিলদা, শাঁখ। বাইরে গিয়ে কথা বলো এক্ষুনি। যা বলবে, হ্যাঁ বলবে। প্লিজ় যাও অখিলদা। আমি খদ্দের সামলাচ্ছি।”

অখিল মাইতি বাইরে যান। গাড়ির কর্কশ শব্দ। ‘এই হাটকে, হাটকে’ বলে ভ্যানওয়ালার চিৎকার। পায়ের ঠিক পাশে কোথা থেকে যেন উড়ে এল পানের পিক। অখিল কানের মধ্যে চেপে ধরেন স্মার্টফোন।

“মিস্টার মাইতি, শুনতে পাচ্ছেন, লুকিং ফর এ চেঞ্জ রাইট? চাকরি খুঁজছেন তো?”

এতদিনের গদিযাপন অখিল মাইতিকে চেঞ্জের মানে শিখিয়েছে বড় নোটের খুচরো দেওয়া। বাংলাটা না বললে হয়তো এই

প্রশ্নের অর্থ তাঁর নাগালের বাইরেই থেকে যেত।

রেষারেষি করতে থাকা বাসের হর্নের মতো চিৎকার করে ওঠেন অখিল। "হ্যাঁ, ম্যাডাম হ্যাঁ। আমি চেঞ্জ চাই। লুকিং, লুকিং। চাকরি চাই। আপনি আমাকে চাকরি দেবেন?"

ও প্রান্ত থেকে খলখল করে হাসির আওয়াজ শুনতে পান অখিল। নয়না বলে ওঠে, "থ্যাঙ্কস ফর ইওর এক্সাইটমেন্ট মিস্টার মাইতি। কত পার্সেন্ট হাইক আপনি আশা করেছেন? মানে সিটিসি-র ব্র্যাকেটটা নিয়ে একটা ওভারভিউ দিন প্লিজ়।"

এসব শব্দ অখিল শোনেননি কোনওদিন। ব্র্যাকেট, সিটিসি—এই কথাগুলো সাবটাইটেল ছাড়া ইংরিজি সিনেমার মতো লাগে। কথা খুঁজে বেড়াতে থাকেন।

ফোনের ওপারে ছিলেন যিনি, তিনি হয়তো এই নৈঃশব্দ্যের মানে বুঝেছিলেন। গোটা গোটা কথায় নয়নার থেকে শোনা গেল, "মাস গেলে ক'টাকা পান মিস্টার মাইতি?"

"সাত হাজার তিনশো টাকা পাই ম্যাডাম। কিন্তু নিয়ম করে মাসের আট তারিখ মাইনে হয়ে যায়। মালিক দেরি করেন না। ন' তারিখ ম্যাক্সিমাম।"

"অ্যাপ থেকে আপনার বেসিক ডিটেলগুলো পেয়েছি। আপনার তো উনত্রিশ বছরের ওয়র্ক এক্স, তাই না মিস্টার মাইতি? নট ইভেন এ ল্যাক। এক লাখও নয়।" তিন চার বার চিক চিক করে শব্দ শুনতে পান অখিল। "তা কত পার্সেন্ট হাইক আশা করছেন আপনি?"

"খুব ভাল লাগছে ম্যাডাম। আসলে কী জানেন তো, এমন ফোন আমি এই প্রথম পেলাম। থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। আপনারা আমায় ভাল মনে করে যা দেবেন আমি খুশি।"

নয়নার দ্বিতীয় রাউন্ডের হাসি শোনা যায় এবারে। অখিলের কাছে আওয়াজটা জলতরঙ্গের মতো লাগে।

"এটা একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি মিস্টার মাইতি। একুশটা দেশে আমাদের বিজনেস আছে। টু পয়েন্ট ফাইভ পার অ্যানাম ব্র্যাকেট, আপনার রোলের জন্য। ওকে? মানে মাসের শেষে আপনি ২০ হাজার সামথিং টাকা পাবেন। আর হ্যাঁ, স্যালারি আগের মাসের আঠাশ তারিখে হয়, বুঝলেন? আপনি বললেন না, মালিক দেরি করেন না। সো সুইট।"

এ কি দৈববাণী? মাসে কুড়ি হাজার! কুড়িকে বারো দিয়ে গুণ দিলে দু লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা হয়। তাই মনে হয় আড়াই লক্ষ বলল। ওটাকেই বুঝি ব্র্যাকেট বলে। অখিল লাফিয়ে ওঠেন। বলেন, "সত্যি বলছেন ম্যাডাম?"

"নিশ্চয়ই মিস্টার মাইতি। কিন্তু আপনি তো একবারও জিজ্ঞেস করলেন না কাজটা কী। হি হি। এক্সাইটেড হয়ে ভুলে গেছেন আই গেস।"

জিভ কাটলেন অখিল। দেখেছ কাণ্ড!

"খুব ভুল হয়ে গিয়েছে ম্যাডাম। একেবারে মাথায় আসেনি। ক্যাশবাক্সে বসা ছাড়া আমি দোকানের সবধরনের কাজই পারি। তিরিশ বছর হতে চলল। মালিকের খুব বিশ্বাস আমার উপরে, জানেন? কাপড়ের দোকান। কিন্তু কোনওদিন একটা সুতোরও এদিক ওদিক হয়নি।"

"এটা টেককিং মিস্টার মাইতি। শাড়ির দোকান নয়। বিজ়নেস ইনটেলিজেন্স বলে আমাদের একটা উইং আছে, মানে ডিপার্টমেন্ট। দফতর আর কি। সেখানে আপনাকে অ্যাসোসিয়েট হিসেবে আমরা ভাবছি।"

"কী করতে হবে ম্যাডাম?"

"কাল, মানে শুক্রবার সকাল এগারোটায় চলে আসুন আমাদের অফিসে ফর দ্য ফাইনাল রাউন্ড অফ ইন্টারভিউ। ঠিকানাটা টেক্সট করে দিচ্ছি। সেক্টর ফাইভ। বাই।"

ফের খলখল হাসির সঙ্গে ফোনটা কেটে যায়। রাস্তার এদিক থেকেই উল্টোদিকের বজরংবলীর মন্দিরের উদ্দেশে প্রণাম ঠোকেন অখিল। একজন ভ্যানওয়ালা ব্রেক চাপতে চাপতে বলে, "শালা অন্ধা হ্যায় কেয়া?"

দুই

রাজদীপের সামনে ফোনের পুরো কথোপকথন যখন বমি করলেন অখিল, ও ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল। বলেছিল, "বিজ়নেস ইনটেলিজেন্স?" তাও বলল, "প্লিজ় যান অখিলদা। আপনি হয়তো রোলটা বুঝতে পারেননি ঠিক। এমনি এমনি তো ফোন করবে না আপনাকে। বিরাট কোম্পানি।" ফোনে গুগল দেখে মিলিয়ন, ডলার, টার্নওভার এমন কয়েকটা শব্দ বলছিল রাজদীপ। টেককিং সম্পর্কে ও গড়গড় করে বলে যাচ্ছিল অনেক কিছু, অখিলের মনে আছে এটুকুই।

বাড়ি ফিরলেন। আলমারি খুললেন। ব্যাগটাকে দেখলেন। ন'মাসের পোয়াতি মেয়ের মতো চেহারা হয়ে যাবে আর ক'দিন পরেই। দুশো টাকার গোটা বান্ডিল গুঁজে দেবেন। দ্যাখ কেমন লাগে। অখিলের মনের ভিতরে তাজা বাতাস বয়। ভগবান এতদিন পরে মুখ তুলে চাইলেন। সবই হয়তো স্মার্টফোনের কৃপা। বুকপকেট থেকে ফোনটা বের করে একবার চুমু খান। রাজদীপকে খাওয়াতে হবে একদিন। বিশ্বকবি তাঁর জায়গায় থাকলে হয়তো লিখতেন, কলেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।

ঘুম আসতে চায় না। অখিল সারারাত চেয়ে থাকেন। কালকের কথা ভাবেন। কী প্রশ্ন করবে ইন্টারভিউতে? পাশ করে গেলে কি চিঠি দিয়ে দেবে তক্ষুনি? যদি পরের দিনই ডিউটি জয়েন করতে বলে, ছেড়ে দেবেন তো রজনীশজি? নতুন ডেবিট কার্ড দেবে। আঠাশ তারিখে পাখির মতো ডেকে উঠবে মোবাইল। মেসেজ আসবে। অ্যাকাউন্ট ক্রেডিটেড উইথ, নয়নার কথামতো, কুড়ি হাজার সামথিং। আর ভাউচার সই করে গুনে গুনে পয়সা নিতে হবে না। আচ্ছা, কী কাজ দেবে ওরা? যাকগে যাক, উনত্রিশ বছর ঘানি টানছেন। যা দেবে করে দেবেন ঠিক। চৈতালিকে কিচ্ছু বলার দরকার নেই এখন। বিয়ের পরে প্রথম সারপ্রাইজ় হয়তো এটাই হবে। জয় জগন্নাথ।

দিন এল। পাটভাঙা জামা আর প্যান্ট আলমারি থেকে বের করলেন বহু দিন পর। চৈতালি বলল, ঢং। বলল, "ভাব দেখে মনে হয় দোকানের মালিক।" বাড়ি থেকে বেরোলেন ঠিক আটটায়। যেমন বেরোন প্রতিদিন। রজনীশজিকে ফোন করে বললেন শরীর খারাপের কথা। মিথ্যে বললেন। এমন করে ছুটি নেননি কোনওদিন। রাজদীপ হোয়াটসঅ্যাপ করে একটা বুড়ো আঙুল পাঠাল। অখিল এখন জানেন, এটাকে বলে থামস আপ। মানে শুভেচ্ছা। যে-বাসগুলো দেখে বড়লোকের আহ্লাদ ভাবতেন এতদিন, তেমনই একটা এসি বাস নিলেন আজ। কী আরাম! কুড়ি হাজার হলে জীবনটা হয়তো এমনই হবে। পনেরো তলা অফিসের রিসেপশনের মেয়েটা নাম শুনেই বলল, "ওয়েলকাম স্যার।" লিফট পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল, "ইলেভেন্থ ফ্লোর। অল দ্য ভেরি বেস্ট।"

লিফটটা যখন একটার পর একটা তলা উপরে উঠছিল, নিজেকে ঈগলের মতো লাগছিল অখিল মাইতির। সুদিন দেখার জন্য, ডানা মেলার জন্য বাহান্ন বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। ইন্টারভিউয়ের শেষে বাবু, নিয়ে নিন না প্লিজ় বললে কি খুব খারাপ শোনাবে? দরজা খুলল। আরও একটা বিরাট রিসেপশন। যে-মেয়েটা বসে আছে, দেখেই বলল, "মিস্টার মাইতি?" অখিল অবাক হন। এমনি এমনি কি একুশটা দেশে এরা ব্যবসা করে? মেয়েটা বলল, "প্লিজ় ওয়েট।" রিসেপশনে বসলেন অখিল। যে-লোকগুলো খুব দামি জামা কাপড় পরে,

গলায় বারকোড লাগানো কার্ড ঝুলিয়ে ঘোরাঘুরি করছে, কফি মেশিনের তলায় কাপ রাখছে, তাদের কেউ কেউ অবাক হয়ে দেখছে অখিলকে। বালুচরীর পাশে কটন শাড়ি কি এমনই দেখায়? যাক গে যাক। কুচিন্তা মাথায় আসতে একদম দেবেন না অখিল। কুড়ি হাজার হলে এমন কিনতে বাধা কোথায়?

পাঁচ মিনিট পরে যে-ঘরে নিয়ে যাওয়া হল অখিলকে, সেখানে তাঁকে বসতে বলার পরে কফি দেওয়া হল। সামনের তিনজন পালা করে জিজ্ঞেস করলেন পিভোট টেবল জানেন কি না, ইকনমিক ডেলি পড়েন কি না, দুনিয়াজোড়া কনজ়িউমার ইনসাইটস নিয়ে অখিল মাইতির বক্তব্য কী, বিজ়নেস ইনটেলিজেন্স সম্পর্কে তিনি কী বোঝেন, প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ নিয়ে বেসিক জ্ঞান তাঁর কতটা, পাঁচ বছর পর নিজেকে কোথায় দেখতে চান ইত্যাদি ইত্যাদি। শাড়ি ভাঁজ করার সময় তিনি কনজ়িউমার বিহেভিয়ার যতটা শিখেছেন তা সম্বল করে বিদেশে টেকিকিংয়ের সফটওয়্যার ডেমো দিতে পারবেন কি না জানতে চাওয়া হল। জাভা বলতে কী মনে আসে, কিবোর্ড না দ্বীপপুঞ্জ, প্রশ্ন এল। কালো জামার মেয়েটা এই প্রশ্নটা করে লাল জামার উপরে ঢলে পড়ল হাসতে হাসতে। অখিল মাইতি গোটা সময়টা চেয়ে ছিলেন। শুধু চেয়েই ছিলেন। "ইউ মে গো নাউ," বলার পরে ফ্রেঞ্চ কাট বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ ফর কামিং মিস্টার মাইতি। একটা উত্তরও আপনার জানার কথা নয়। আমরা আপনাকে শিখিয়ে নেব। আমাদের এইচ আর আপনার সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করবে।" এটা বলে তিনজনেই থামস আপ দেখাল।

অখিল বেরিয়ে যাওয়ার পরে ওই কাচের ঘরের মধ্যে স্রোতের মতো লোক আসতে শুরু করল। যে যার ওয়র্কস্টেশন ছেড়ে হাসতে হাসতে, গড়াতে গড়াতে লাল জামা, ফ্রেঞ্চ কাট আর কালো জামার কাছে জমতে থাকল। গুপি বাঘার মতো সবাই এ ওর হাতে তালি মারল। বলল, জোকারটা এক্সেলেন্ট। বলল, "কোথাকার ইম্পোর্টেড মাল?" বলল, "এভরি ফ্রাইডে এমন এক পিস ক্লাউন চাই, বিফোর দ্য উইকএন্ড পার্টি বিগিনস্।" ফ্রেঞ্চকাট বলল, "লাইভ করেছিলাম তোমাদের সবার ওয়র্কস্টেশনে। পিকচার কোয়ালিটি ঠিকঠাক ছিল তো? সাউন্ড?" সবাই বলল, "ফাটাফাটি বস।" নয়না বলল, "মুরগিটা কেমন জোগাড় করেছিলাম বললে না তো? কুড়ি হাজার বলাতেই লালা ঝরছিল। হাউ চিপ! প্রথমবার 'ফান অ্যাট ওয়র্ক' করলাম একটা হটকে থিম নিয়ে, ইউ মাস্ট অ্যাপ্রিশিয়েট মোর, গাইজ়!"

চাবুক খাওয়ার মতো জ্বালা করছিল অখিলের। মলম লাগাচ্ছিলেন নিজেই। ভাবছিলেন, বিরাট কোম্পানির ইন্টারভিউ হয়তো এমনই হয়। ভাবছিলেন, ফ্রেঞ্চ কাট স্যার তো বললেন, এইচআর যোগাযোগ করে নেবে ঠিক। মিথ্যে বলবে কেন। এত বড় কোম্পানি। ডলার, মিলিয়ন, চল্লিশ ইঞ্চির টিভি..।

বাসস্ট্যান্ডে একটা লোক ওয়াশিংটন আপেল নিয়ে বসেছে। তাকালেন। বাড়ির রুটের একটা এসি বাস আসছে। হাত বাড়ালেই সুখ থামবে। ভাবতে শুরু করলেন অখিল মাইতি।

অঙ্কন: তারকনাথ মুখোপাধ্যায়

আশীর্বাদ

জয় গোস্বামী

'জনসমুদ্রে জেগেছে জোয়ার,
হৃদয়ে আমার চড়া
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার?'
'ঘোড়সওয়ার' (১৯৩৫), বিষ্ণু দে

গঞ্জে রেখেছি প্রাণ
হাটে মন পড়ে থাকে
বিক্রিব্যবসা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে
মাপে সতর্ক চোখ
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে হাঁকি
কোথায় খরিদ্দার?

গঞ্জে রেখেছি প্রাণ
হাটে মনচলাচল—
ব্যাপারীরা আসে আমার কাছেই
দর কত? দর কত?
চোরাবালি আমি কোন প্রান্তরে বলি
চিরসাহিত্য দাও

আকাশ নিয়ে কী পাব?
কী বনে ওষধি? ছাগ—
ফিরে চলবার উপায় না রেখে
এত পথ ভেঙে এলে?
চোরাবালি আমি আলোঝাঁক দেখে আজও
ছুটেছি পতঙ্গ

তুমি যত পথ ভাঙো
আমি তত গড়ে তুলি
গলি ও রাস্তা, যানবাহনের
উপযোগী পাকা সড়ক
চোরাবালি আমি তারা দেখে দেখে বুঝি
আমার এ সৌভাগ্য

কী অসাধারণ জয়
হস্তরেখায় আমার
লিখিত ছিল তা না জেনেই আমি—
কত ঘুরে বেড়ালাম
চোরাবালি, পাই উজ্জ্বল জনপদে
বিদেশের নজরানা

পরমুহূর্তে আমায়
আলোকবৃত্ত ঘিরল
সুস্মিত মুখে উত্তর বলি
অনুরাগীদের প্রশ্নে
চোরাবালি, দেখি কীভাবে হঠাৎ পেয়েছি
জগৎসিংহাসন—

রটনারা পিছু হটে
থামে ভুল গুঞ্জন
আমার কথারা সশ্রদ্ধভাবে
লাভ করে বিশ্বাস
চোরাবালি, আমি জন-অরণ্যে বসেও
ভুলি না রেওয়াজ, সাধনা
গঞ্জে রাখি না প্রাণ
হাটে আমি যাই না
গঞ্জ ও হাট আমাকে নিয়েই
আজ গৌরব করে
চোরাবালি, আমি বড় তাজ্জব হয়ে
হাতে নিই সম্মান

সম্মান ঘরে রেখে
বার্তার কাছে আসি
বার্তা যে আনে শত অক্ষর
সুর বসাবার কীর্তন
চোরাবালি, দেখি দূরদিগন্ত থেকে
আসছে ঘোড়সওয়ার

আমার জন্য আনে
নতুন রাজমুকুট
ব্যবসা উধাও। ব্যাপারী তো হাওয়া!
বদলে এখন দিগন্ত থেকে এ কারা আবির্ভূতা?
শুভ্রা শুক্লা রত্না সরস্বতী

চোরাবালি, আমি মাথায় নিচ্ছি তাঁদের
সোনার আশীর্বাদ

আমি সেই বাইসন

(উৎসর্গ: স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব)

সু বো ধ স র কা র

আমি আলতামিরার বাইসন, ভরা জ্যোৎস্নায়
আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারতে এসো না
আমার খিদে পেয়েছে, আমি কি ক্যাকটাস খাব?
বুদ্ধ পূর্ণিমা দিয়ে আমার পেট ভরবে না।

আমি ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমকে বলেছিলাম
আমার ভেতরে একটা চে গ্যেভারা আছে
মৃত্যুর পরে তাঁর খিদে বেড়ে গেছে দ্বিগুণ
রাখি পূর্ণিমা দিয়ে আমার পেট ভরে না।

আমি তমসো মা জ্যোতির্গময়কে বলেছিলাম
আমার ভেতরে একটা কানু মুর্মু আছে
স্বাধীনতার সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি
কিন্তু মাঘী পূর্ণিমা দিয়ে আমার পেট ভরবে না।

আমি পাবলো নেরুদাকে বলেছিলাম
আমার কিডনিতে ‘টুনাইট আই ক্যান রাইট’ নামে
কবিতা আছে, বিনয় বাদল দীনেশ পড়ে শোনায়
শুধু দোল পূর্ণিমা দিয়ে কবিতা লেখা যায় না।

আমি বন্দে মাতরম-কে বলেছিলাম
আমাকে যদি খেতে দিতে না পার, ডাকলে কেন?
আমি গান্ধী এবং কার্ল মার্ক্স-কে বলেছিলাম
কুইট ইন্ডিয়া, এখনও সময় আছে, চলে যাও।

ভারতবর্ষ ইয়ার্কি মারার কলেজ ক্যান্টিন নয়
কোন কোন বাড়ির নীচে শিবলিঙ্গ আছে জেনে কী হবে
আমাদের দুঃখে না আছে শিব না আছে লিঙ্গ
ওঁ শিবায়, খেতে দাও, না হলে পার্লামেন্ট উড়িয়ে দেব।

ওই দূর রণবহাল থেকে

সুধীর দত্ত

এই যে হাড়মাসরক্ত, তুমি বলো: কপট মানব এক,
পরম ভাষার দিকে
বাঁকিয়ে চেয়েছ দিতে আমাদের পার্থিবতাগুলি।
আমি তো মাটি ও জল, হাওয়া থেকে অগ্নিতন্তু চয়ন
করি, গিঁট-গুটলি;
কামাতুর এবং আশিক
ছাদ থেকে ওড়াই ঘুড়ি, সুতো ছাড়ি, টান দিই, লটকাই
বিদ্যুৎ, যেন
শব্দস্পৃষ্ট হয় ভাতঘুম।
শালিনদী বরাবর ওই দূর রণবহাল থেকে
তুমি কি সত্যিই দেখতে পাও—
দেবতার ঘুম ভাঙল? আড়মোড়া? দক্ষিণায়ন শেষ
হল?
সে মানুষ কখনওই ছিল না?
সকলেই এই ভাবে, যা নয় তা-ই দ্যাখে,
ছোট্ট ফ্রেমে যা আঁটে না, বিহ্বল, কখনও পিছন
ফিরি, সামনে তাকাই।
এই যে মুনিয়া পাখি মাঝে মাঝে কাঁধে এসে বসে, আর
বলে যায়,
কী ভাবে ভাঙচুর করো, কেঁপে উঠি, এরকম নরম
আঙুলে!
অথচ কর্কট এসে ফুসফুস ফুটো করে আজ্ঞাচক্রে
ছানাপোনা পেড়েছে বৌয়ের।
এখন বাবা-মা ওর, সেই এক সনাতন আসক্ত বরাহ
যেন,
সারা গায়ে পাঁকের হলুদ গন্ধ, দিব্যি আছি, কন্দ খাই,
মুনিগণ যা নিশা দেখেন।
চা করি, বাসন মাজি, ওষুধ খাওয়াই আর ঘরদোর
লেপামোছা করি।
মাঝরাতে ঘুম ভাঙে, জেগে জেগে দেখি—
স্নানকলে যাওয়ার আগে ওষুধ খাওয়ার জন্য কারও
তাড়া, গজগজ নেই!
প্যান্ডোরার গর্তমুখে চাবিটি আপনি ঘোরে, গোটানো
পুঁথির মতো কল্পনাপ্রবণ
দেবতা প্রেক্ষেপ খান, অ্যালজোলাম? দীর্ঘ শীতঘুমে
মৎস্যেন্দ্রনাথের মতো তাঁরও কি স্মৃতিভ্রংশ হয়?

যত বড় যোদ্ধা তত বড় প্রেমিক

শ্যামলকান্তি দাশ

লোকটা খুব বড় ধরনের যোদ্ধা ছিল। এত বড় যে
ইতিহাসে তার শৌর্যের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।
বিশ্বাস না হলে বাংলার ইতিহাস খুলে দেখতে হবে।
অত বড় যোদ্ধা, কিন্তু লোকটার গুণকীর্তন গাইবার জন্য
কোনও চাটুকার কিংবা বিদূষক ছিল না। অত বড় যোদ্ধৃপুরুষ,
কিন্তু কেন জানি না, রাষ্ট্র তাকে সর্বদা হ্যাটা করেছে,
তার গরিমা থেকে বারবার আমাদের নজর ঘুরিয়ে দিয়েছে।

যত বড় যোদ্ধা তত বড় প্রেমিক। লোকটা যেমন বলীয়ান
যোদ্ধা ছিল তেমনই ছিল মহীয়ান প্রেমিক।
কত স্ত্রীলোকের প্রেমে যে সে হাবুডুবু খেয়েছে তার হিসেব নেই,
কিন্তু মেয়েপটানো বিদ্যা ঠিকমতো রপ্ত করতে পারেনি বলে
কোনও প্রণয়সম্পর্কই শেষপর্যন্ত দানা বাঁধল না।
তার প্রেমের ফল্গুধারা শুকিয়ে বাষ্প হয়ে গেল।

মৃত্যুর সঙ্গে গল্প করতে করতে লোকটা ফট করে মরে গেল।
মাত্র একুশ দিন গত হয়েছে, এরই মধ্যে সমাজ
তাকে অধঃপতিত মানুষ আখ্যা দিয়েছে। বীরগাথা থেকে
তার নাম কেটে দেওয়ার ছক তৈরি হচ্ছে। এই হয়তো সভ্যতার সঙ্কট।

যুদ্ধক্ষেত্রের ঘুটঘুটে অন্ধকারে লোকটা একটা বাজপোড়া
গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। একটি পরিত্যক্ত দুর্গ আর
কয়েকটি ময়ূর ছাড়া তাকে এখন দেখবার কেউ নেই।

বিপন্নতা

গৌতম ঘোষদস্তিদার

বারবার লেখাটিকে কাটি, যেন ব্লেড মারি, তীক্ষ্ণ আর ঝকঝকে,
মর্মভেদ করি তার, এফোঁড়-ওফোঁড়, আজ এই দীর্ঘতর রাতে।
লেখার কাটাকুটি থেকে অনর্গল হিমরক্ত ছড়ায় রাতের টেবিলে,
রক্তধারা ক্রমশই কলঙ্কচিহ্ন হয়ে ফুটে ওঠে কাগজের স্তব্ধতায়।
মাঝরাতে প্রায়শই লেখার পরিচর্যা করি, সংস্কার বা সংশোধন,
কাতর লেখার টানে উদ্বিগ্ন রাত জাগি, জ্বর দেখি, জলপট্টি দিই।
লেখা হাঁসফাঁস করে, তার কপালে ফুটে ওঠে রুপালি স্বেদবিন্দু,
চকিতেই ওষ্ঠাধরে মুছে দিই জলকণা, লেখার চোখ বুজে আসে।
শাপগ্রস্তের মতো এলোমেলো লেখার আকুল পরিচর্যা করে যাই,
কবেকার প্রাচীন ভাষায় জটিল তর্জমা করি ঘোর বিস্মৃতির পদ।
রাতের আড়ালে লেখা বেভুল শীৎকার করে নিঃস্ব রমণীর মতো,
অচিরেই তার সব ভ্রমবিভ্রম এলিয়ে পড়ে মধ্যরাত্রির আচ্ছন্নতায়।
গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে বুঝি, চারপাশ ক্রমাগত দোলে,
ভাবধারা মেনে নেয়, তার আর আশামাত্র নেই এমন কালরাতে।
অন্ধকার রাত্রির দিকে ফিরে বিপন্ন লেখাও অন্যত্র আশ্রয় খোঁজে,
অলীক আশা ভুলে সে তখন বিভ্রমের আড়াল চায় অন্তিম প্রহরে।
জটিলতর কাটাকুটির অন্তরালে লেখাও অবশেষে মলিনতর হাসে,
সে ঠিকই বুঝে যায়, বাকি দিনগুলিও অমুদ্রিতই কেটে যাবে তার।
বিপন্ন, নিথর, বেভুল ও কাতর লেখাটি তবে আজ আড়ালেই থাক,
তার আর মুখ দেখানোর কোনও মানে নেই ইন্দ্রের মায়াবী সভায়।
টেলিফোনের আমন্ত্রণে শারদীয় সংখ্যার জন্য কবিতা পাঠালাম।

কবি

যশোধরা রায়চৌধুরী

কবিতার মতো দেখতে কবিতা লিখেছি
দিনশেষে ঘরে এসে পেনকিলার খেয়ে বসেছি গুছিয়ে
পরিকল্পনা ছিল স্বপ্নের বাসে চেপে ভ্রমণে বেরুতে
চেয়েছি অনেকদিন ধরে
হয়নি শুধু খুচরোর অভাবে

কবিতার মতো দেখতে কবিতা লিখেছি
খোলামাথা ট্রাকে চেপে নিরুদ্দেশে যাব না কখনও
আদিগন্ত ঘাসে শুয়ে তারা গুনব না
তবুও তো আলো এসে পড়ে এ গরাদকুঠুরিতে

কবিতার মতো দেখতে কবিতা লিখেছি
তবু তো কৃত্রিম বুদ্ধি এসে এসে বলে দেয় পরবর্তী শব্দ-সাজেশন

এদিকে স্টেশন থেকে ভিড় ট্রেনে ছিপছিপে তরুণী
কবিতা উঠেছে, কাঁধে ভারী ব্যাগ, ধারে কেনা বাংলা বইগুলি
ফুলভারে নত গাছ একা একা যেন
ওই দিকে ক্রমাগত মুছে যাচ্ছে স্লেট
সংবাদ পরিক্রমা স্ক্রোলিং ওপর থেকে নীচে
পাঠসহায়িকা ছাড়া পড়া যাচ্ছে না কোনও কিছু
কাল থেকে ব্ল্যাকবোর্ডে নব নব আঁচড় কাটার অধিকার
কারা পাবে? কারা?

ত্রিশ সেকেন্ডের রিলে কবিতা পড়ার পর বিখ্যাত হয়ে যাবে তারা!

গদ্দার

অ নি তা অ গ্নি হো ত্রী

গুমান সিং-এর ছোটবেলার গ্রাম আর টালির বাড়ি যেখানে ছিল
সেটা এখন ফোর লেন হাইওয়ে
উর্বশীর ত্বকের মতো মসৃণ আবার বাঙ্কারের পাঁচিলের মতো মজবুত
সেখানে এয়ার ফোর্সের প্লেন নামবে
প্লেন থেকে নামবেন মুলুকের মালিক

গুমান সিং অনেক দূর থেকে দেখতে এসেছে ভিড়ের পিছনে লুকিয়ে
সে চোখ বুজলে দাদি-কে দেখতে পায়
দাদি পাথরের জাঁতায় গম পিষছে
গমের ক্ষীরে একটু জায়ফল দিলে কেমন ম-ম গন্ধ হত

ওইখানে মা গুমানের ভাইকে কোলে নিয়ে কলা খাওয়াচ্ছে চটকে
ভাই এখন শহরে।
বাতিল বন্দুক নিয়ে ব্যাঙ্ক পাহারা দেয়।
ব্যাঙ্ক লুটেরা সবাই ফেরার।

তার বন্ধু ইমতিয়াজ়কে মা ওখানে মালপো ভেজে দিচ্ছিল, ম্যাট্রিকের বছর, টালির বারান্দায়—

ওই যেখানে প্লেনের চাকা হাইওয়ে ছুঁল,

গম গম তালিয়াঁ তালিয়াঁ শব্দে ভরে গেল আকাশমণ্ডল

আর ব্যান্ড বেজে উঠল আজাদির।

ইমতিয়াজ় অনেক দিন হল জেলে,
জামিন চাইবার উকিলই পায় না,

গদ্দার।

মুলুকের মালিক বেরিয়ে এলেন।
প্লেনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দেখলেন, একরাশ ময়লা পোশাক, আকাচা চুল-দাড়ি, ভ্যাপসা খিদের ভাপ উঠছে জমায়েত থেকে।
মাঝখানে অনেকটা জমি ছেড়ে বেরিয়ার।
প্যারামিলিটারির পাহারা।

‘ওই লোকগুলো কারা,’ বললেন মহানুভব।

‘ওরা আপনারই জাঁহাপনা, আপনার অনুগত।
আপনাকে দেখবে বলে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে।
সবার বডি সার্চ হয়ে গেছে।
আপত্তিকর কিছু নেই।’
অনেক পিছনে দাঁড়িয়ে গুমান সিং দেখছিল,
একটা গ্রাম, এক নয়ানজুলি, ধানখেত, আমবাগানের মধ্যে একটা এয়ার ফোর্সের প্লেন।
সাচ্চা বন্দুক নিয়ে একসার প্যারামিলিটারি।
গ্রামের বদলে একটা ফোর লেন হাইওয়ে ।

গুমান সিং ভাবছিল, আমি কি সত্যিই অনুগত?
আমি গদ্দার?

কালী কলকাত্তাওয়ালি

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

কালী কলকাত্তাওয়ালি, আমার দু'চোখে কঙ্কালী
শরীর জুড়ে মেলছে ডানা, স্টোনচিপ্‌স-ইট-বালি...

প্রথম যোগে ব্রহ্মচর্য, দ্বিতীয়ে সন্ন্যাস
তৃতীয়ে ধ্যান, ধ্যানের ভিতর ফুল ফোটাচ্ছে মালি...

জবার কোলে জুঁই হেসেছে, বাদল গেছে টুটি
চুম্বনে-চুম্বনে গোলাপ আবার ফুটি ফুটি
লীলায় তুমি লীলাময়ী, গালের টোলে গালি...

খাওয়াচ্ছে বিষমদ মানুষকে, মারছে দিবানিশি
কারণসুধার মর্ম তোরা বুঝবি না উজবুক;
ঔদ্ধত্যের মাথায় তোদের অ্যালকোহলই ঢালি...

আদ্যাশক্তি, মহামায়া, আধারস্বরূপিণী
সর্বনাশের দয়ায় সর্বমঙ্গলাকে চিনি
যশোদা গর্ভসম্ভূতা, নন্দগোপগৃহে
রক্তঘামের অন্ন আমার চুবিয়ে দিলেন ঘিয়ে
তৃপ্তি ব্যক্তিগত কিন্তু খিদে তো এজমালি...

ডাকছে পাখি, 'চোখ গেল,' তুই কী করবি চোখ খুলে
ভাসছে জলে নৌকা, আগুন লেগেছে মাস্তুলে
শূন্য হয়ে যাবার আগে রংমশাল তো জ্বালি

থাকুক সুখের মঞ্জরিতে যতেক শরৎশশী
আমায় দিয়ো অনন্ত সেই কৃষ্ণা-চতুর্দশী
অন্ধকারকে দেব একুশ টাকার আলোর ডালি...
জয় কালী, জয় কালী!

রূপান্ন
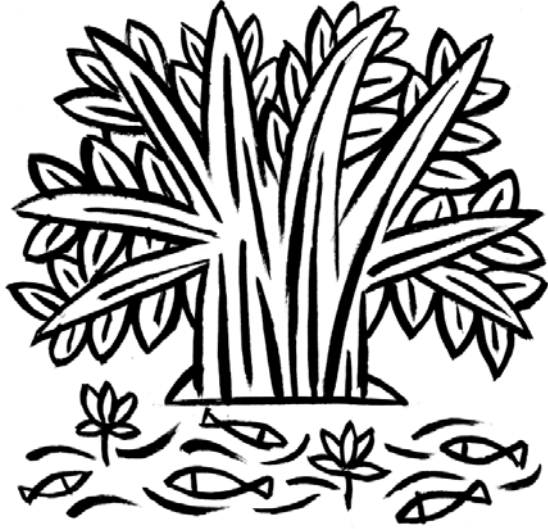
শ্বেতা চক্রবর্তী

রূপাদিঘির ওপার জুড়ে বিশাল বটের গাছ,
নদীর জলে পদ্ম, তার নীচের সারি মাছ,
ঘাই মারছে, হৃদয়ে কার বিপুলা আঁধার,
ঝুরি নামে, দুঃখ যেন কঠিন অন্ধকার।

সোনা বউটি ওদিক দিয়ে যাচ্ছে আর যাচ্ছে,
একটি কিশোর ঝুরি বেঁধে এমন করে দুলছে!
কিশোর মাত্র, সোনাবউ তো নিতল যুবতী,
দক্ষিণে চায়, উত্তরে চায়, যার যে রকম গতি!

শনশনশন হাওয়ায় ওড়ে ঝুরির দোলনা,
কাঠঠোকরা মাথা কুটছে, শরীর ভাল না!
তবুও কাজ, তবুও কাজ, তবুও যেন কী,
সোনাবউয়ের বুকের নীচে দুধ-পাকানো ঘি!

তরঙ্গ তার উছলে ওঠে, স্বামী তো নেয় না,
বটের ঝুরির দোলনা থেকে এসেছে বায়না,
না বুঝে সেই কিশোর তাকায়, গাছের নীচে কে?
রূপাদিঘির সবটা জুড়ে সোনা ফলেছে!

মান বলে এক শব্দ আছে, টানলে অভিমান,
বউয়ের শাড়ির আঁচল বোঝে কার কতটা প্রাণ,
পানপাতাটি সরে যাচ্ছে, শুভদৃষ্টি যে...
যুবতী আর কিশোর দোলে বাঁশির বিরহে!

প্রিয় তরুণ কবিকে

সু ম ন গু ণ

শব্দের উদ্বৃত্ত শক্তি তোমার আরাধ্য, তাই প্রতিটি লেখায়
প্রত্নব্যঞ্জনের স্বর অভূতপূর্ব হয়ে ওঠে।
ব্যক্তিগতভাবে তুমি শিষ্ট ও স্বাধীন, চারপাশে
বন্ধু পরিজন নিয়ে নির্বাচিত সংসদ, গ্রামের
চেনা রাস্তা, মাঠ, প্রিয় কুয়োতলা, প্রতিবেশিনীর
হাসি, আর দূর থেকে
রোমাঞ্চসঞ্চিত ভাষা লক্ষ করে
উদ্ভাসিত জীবন তোমার।

তোমার লেখার মধ্যে অনর্থ ও অতিরেক পাশাপাশি থাকে।
পরিমাণমতো নয়। ওজন ইচ্ছে করে, পরিশ্রম করে
বিপর্যস্ত করো। যাতে, যে-শব্দে আসক্তি আছে তাকে
নষ্ট করা যায়, তার গা থেকে সবটুকু
আলো ও পালিশ তুলে দণ্ডিতের মতো
দাঁড় করিয়ে রাখা যায় পাঠকের চোখের সামনে।

এবং সংগ্রহ করো, খুঁটে খুঁটে তুলে আনো সব
অবৈধ, অসংযত, বিস্ফোরক গুপ্তলিপিমালা।

পাঠান্তে, দগ্ধ আর উদ্ভিন্ন, পাঠক
সাধ্যমতো অসন্তুষ্ট হয়।

দেশ

সে ব ন্তী ঘো ষ

এই যে ঘুমঘোরে দেখছি
কাদার তালের ভিতর লুকিয়েছে বর্ষা
আর ভরসাহারা তুমি পাখির কলতান ভুলে
রথ চালিয়েছ ধ্বজার
উড়ছে জয়ধ্বনি, দলিত মর্ত পাতাল
শিহরিত আভূমি বিন্ধ্যাচল
কেরামতির ফুলে ওঠা পালে
তোমার নাবিক মশলা বেচে থানে থানে
এই শোকহীন আধো জাগ্রত দেশে
কেউ নেই যে বলে শঙ্কার চোরাস্রোতে ডোবে দ্বীপ
নতমস্তকে বীর নিজেকেই বেচে গেছে সস্তা বাজারে
এই যে জাগরণহীন আশ্বাসে
ভোরের বালিশ আঁকড়ানো তুমি,
ফুল চোর ধরতে পারনি কোনও দিন
দ্যাখো রক্ষক এসে আগামাথা ন্যাড়া করে
গাছ লুটে নিয়ে গেল অনায়াসে
পুনর্বার ভিখিরি হবে বলে বড় সাধ দেখি যে তোমার
ভোরের দুঃস্বপ্ন বলে পাশ ফিরে ঘুমোও আবার।

প্রবেশক

চৈ তা লী চ ট্টো পা ধ্যা য়

শুকনো তাকিয়েছিলাম। সে-চাহনি মানুষেরা ফিরিয়ে দিয়েছে, খসখসে।
কামিনী গাছের নীচে দাঁড়িয়েছি, গন্ধে কিছু কাম জাগেনি।
এখন ঘর বলতে ঘর, মায়া বলতে,
দু'বেলা টিপ পরা ভিন্ন অন্য কোনও ছলনা খাটে না।
মন যদি-বা উঁচুনিচু হয়, দেহ খুব জড়ভরত।
আষাঢ়ে বৃষ্টি থেকে উপকারিতা ঝরে পড়ে,
যন্ত্রের মতো ভাত রান্নার জল ধরে রাখি।
শুকিয়ে তো গেছিলাম, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিল।
দিনগুলো রাতগুলো কাঠের মতন হয়ে এল সবে—
আহ্!
খালি গলায় তুমি সূচনাসঙ্গীত গাইলে,
কত দিন পর আমি কাপড়চোপড়সুদ্ধ ভিজে উঠলাম

তারাপথ ধরে

বিকাশ নায়ক

রাত্রিকে বলেছি ভীমপলাশির মতো শান্ত সুরে
আড়াল করেছ যদি ধরে রাখো কান্নার মহিমা
বাতাসে আঘাত লেগে কী ভাবে উল্কারা যায় পুড়ে
ভুলে যায় ভেসে থাকা আলোটির কতটুকু সীমা

ভুলে যাওয়া আর ভুলে ভরা এই জীবনের পাশে
কখনও কখনও একটি ভোরশিশু এসে ধরবে হাত
কখনও কখনও হাত কেঁপে উঠবে অজানা সন্ত্রাসে
তারাদের পথ ধরে সেভাবে ঘনায় হয়তো রাত

তবে কি সম্পূর্ণ জানি? জেনেছি কি পথ কোন পথে?
কিছুটা সংশয় এসে এগিয়ে গিয়েছে পাশাপাশি
দেখিয়ে গিয়েছে কাকে পাওয়া যায় প্রতিটি সঙ্কটে
কেউ কেউ চলে যেতে যেতে বলে যায়, ‘আজ আসি’

সবাই আসে না, যারা চলে যেতে পারে তারা পারে
সবাই পারে না ছিঁড়ে ফেলে যেতে মোহমুগ্ধজাল
কোনও একটি মেঘ ঠিক বসে থাকবে বিকেলের ধারে
গোধূলি-আলোটি যাকে করে তুলবে আরক্তপ্রবাল

এই কি নিয়ম? নাকি অনিয়মে ঘটে যাচ্ছে সব?
এখনও রয়েছে দেখছি আকাশের দিকে দৃষ্টি কার
সকাল বিজয় আর অন্ধকার যদি পরাভব
ভীমপলাশির রাত্রি তারাপথে ছড়াবে গান্ধার।

বনবিহারী আশ্রম

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

আমাদের মাস্টারমশাই আর চোখে দেখতে পান না,
সারা দিন ঘন অন্ধকারে বসে থাকেন।
এই মহাঘোর কখনও বুঝিনি আমরা।
স্মৃতির যাত্রাপথে আলোর শৈশব, চন্দ্র-সূর্য
নিকটে ঘণ্টা পড়ে, ভাঙা চক ঘষে
তিনি মেঝেতে আঁকেন গতি, সময়, পৃথিবী;
পৃথিবী পেরিয়ে মহাকাশ!
দুপুরে আশ্রমে তাঁকে খাবার দিয়ে যায় কেউ।
আবার ঘণ্টা পড়ে। আবার দুপুর, খেতে-খেতে গলা ভাত,
কাপড়ে-চোপড়ে মল হয়ে যায়।
আবর্জনার মতো ভয়ে এক কোণে
‘তাঁর’ শব্দের চন্দ্রবিন্দু খুঁজে পান তিনি!
সারা বিকেল জানালা গরাদে
লালা ঝরে, উন্মাদের ভাষা স্পষ্ট হয় না।
আসে ক্রোধ, ক্রোধের কেশরে মৃত্যু।
মাঝি হে— সন্ধ্যা-সমুদ্রে এখন কত জল?
ভূ-পর্যটনে বেরিয়েছে মানুষ।
ওই পৃথিবী থেকে দূরে অন্তরীক্ষে
একলা পাগল, হাতে বেত নেই,
দেখি মাঠ, স্কুল, বনবিহারী আশ্রম
মাথায় জোনাকি ভরে হাসছেন, কাঁদছেন,

আমাদের চিরচতুর, ব্যর্থজীবনে শূন্য দুয়ার,
রেখে যাচ্ছেন ঈশ্বরের পদছাপ।

কোলাজ

দ্বিজেন আচার্য

আমার দুঃখের কোলাজে অসমাপ্ত গান, পাখির নিশ্বাস,
ভাঙা তানপুরা, ছিন্নপত্র আর ধূসর অ্যালবাম। বাইরে ফাগুন
আর ভেতরে শ্রাবণ। কুয়াশায় অবলুপ্ত ফুলের বাগান।
চরাচরে, কোথাও কিছু নেই। বৃক্ষেরা নির্বাক দাঁড়িয়ে।
বাতাসে মৃত্যুর ঘ্রাণ। দুঃস্বপ্নের রাত। অরণ্যে বিষাদ...

একটা দুঃখী নদী ময়ালের মতো আমার দুঃখের কোলাজে।
একেবেঁকে চলেছে সাগর সন্ধানে। সাগর যে আর নেই—
মরুভূমি হয়ে গেছে, তা সে জানে না। কারও সংকেতের
অপেক্ষায় জল্লাদ দাঁড়িয়ে। হাড়িকাঠে উৎকণ্ঠিত দেহ
মৃত্যুর প্রহর গুনছে। একটা ভিনদেশি পাখি শিস দিতে দিতে
নীল দিগন্তে...

এই অশালীন পরিবেশে ক্রমশ অস্বস্তি বাড়ছে...
আমি অতৃপ্ত আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি...

আমার দুঃখের কোলাজে এখন একটা রঙিন প্রজাপতি।
তার চঞ্চল ডানায় অরণ্যের ঘ্রাণ। ভাঙা তানপুরা আবার
বেজে উঠেছে। জেগে উঠছে ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম...

শিশু ও দৈত্যের গল্প

নিবেদিতা আচার্য

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় বাচ্চাটা মুখ বাড়িয়েছিল জানলায়।
দৈত্যটার কাঠামো আরও বেড়ে চলেছে।

ওর দাঁতের ফাঁকে, গোটাদেশ, তেকোনা মাটি।

দেশটার নীচে জল, ওপরে সবুজ রেঞ্জ।
দৈত্যটা তেকোনা দেশে কামড় বসাচ্ছিল, ওর দাঁত মাটির গভীরে।
তোমরা তখন বড়াপানিতে, বুড়িটার মাছ ধরা দেখছ।
বুড়িটা মাছ ধরে ছুড়ে দিচ্ছিল ঘন জমাট শান্তির ভেতর।
দৈত্যটা তেকোনা দেশের লিভিং রুমে ঢুকে পড়েছে, ওর কামড়ে
মাটি দু'টুকরো ভাঙা, ওকে আটকাতে পারে এমন কেউ নেই।
আমি ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া শরীর। দেয়াল পিঠ, দূরে ফ্ল্যাশব্যাকে
ফ্র্যাঙ্কোর ফ্যাসিস্ত বাহিনী তাড়া করছে বেঞ্জামানি আর্কেডকে।

হাওয়া ক্লান্ত ধ্বস্ত। তোমরা বড়াপানিতে। দৈত্যের হাসি পরোয়াহীন।
ঠিক সাড়ে পাঁচটায় বাচ্চাটার মুখ জানলায়। বলেছিল,
ইরেজার আছে, পেনসিলে আঁকা দৈত্য মুছে যাবে, বলেছিল,
দ্যাখো উড়ে যাওয়া পাখির ছায়া, দ্যাখো ঘাস, দ্যাখো
চাঙ্গাহাত ভুলে নিচ্ছে ঝরাপাতাদের। তোমরা বড়াপানি থেকে
ফেরার ট্রেন ধরেছিলে। মাটি জোড়া লাগছিল।
জোড় লাগা মাটির ওপর চাঙ্গা হাতেরা দুলছিল।
গান গাইছিল মার্চের জঙ্গল, আর পাতা উড়ছিল।

ঠান্ডা জুড়িয়ে যাওয়া ভোরে তোমরা ফেরার ট্রেন ধরেছিলে।
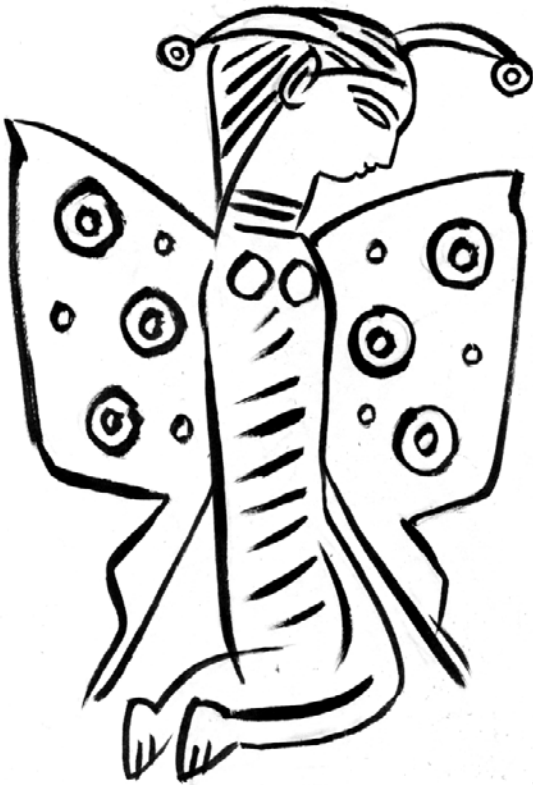
জনপ্রিয় আলোকসজ্জা

গোলাম রসুল

আমরা এখানে এসেছি সঙ্গে রুটি নেই লাঠি নেই নৌকা নেই
শুধু অরণ্যের প্রতীকে সূর্যকে সোনার লেবুর মতো কামড়ানো

আমার বিষণ্ণতার দায় চাপিয়ো না মেঘের ওপরে যা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় আকাশের ওই প্রাচীন জাতিগুলোকে

দীর্ঘতম মৃত্যু
জীবনের প্রাচীন ক্যাপ্টেন
এখন আমরা শরীরের ইন্দ্রিয়সচেতন জাতিগুলোর সামনে বক্তৃতা দিচ্ছি
প্রবল বৃষ্টি নামার জন্য প্রাচীন সভ্যতা জমাট মেঘের মতো মাথার ওপর
আর সেই মেঘ ভাঙা আকস্মিক বৃষ্টিতে ডুবে যাচ্ছে আমাদের অপরিকল্পিত সময়ের জাহাজ

এমন ছিল সব বিদ্যুৎ চমকানো জয়
বিদ্যুৎসহ সমগ্র আকাশকে ঠেলে চালিয়ে নিয়ে গেছি
আর আকাশে দেখা দিয়েছে আবার নতুন নতুন উপকূল
ব্রহ্মাণ্ডের তারা দল
এবং একটি মেয়ে
আমি স্বপ্ন দেখছি মৃত্যুর পর কিছুক্ষণ আমার আঙুল একটি অতুলনীয় স্থানে

জীবন জনপ্রিয় আলোকসজ্জা
আমার ইন্দ্রিয়গুলো আর আমি ভাড়া করা
আমি আমার স্বৈরাচারী শাসক

ভারতমাতা সরণি

গৌতম কুমার ভাদুড়ি

রোদের দিকে মুখ করে বসে আছেন দেবী ও দেবতারা
মাননীয় লোকনাথও উপবিষ্ট স্বীয় ভদ্রাসনে
মহারাজপথ থেকে দু'মিনিট উঁকি দিলে এইসব কাণ্ডের কারখানা।
উইমেনস পার্লারের নিষেধাজ্ঞা কোনও দিনই ছিল না এখানে, তাই
সুদর্শনা দেবীদেরও স্তবনীয় দেবতার খুব কাছে বসে
গাত্রের মার্জনা করা অশালীন বিবেচিত নয়।
কোটিকল্পবর্ষ যাঁরা চক্ষুদান করেছেন অলকায় থেকে
চক্ষুলাভ অপেক্ষায় ধূলিময় রোদে তাঁরা আসন্ধ্যা আসীন
সুধীর পালের ভাঙা চালাঘর ঘিরে।
মফস্‌সল শহরের উপকণ্ঠে সংবৎসর এই দৃশ্য মোছে না কখনও।

এই দৃশ্যে মজিবুলও আছে। দূর দূর গ্রাম থেকে
মাটি খুঁজে নিয়ে আসা উনিশের মজিবুল হক।
পেমেন্টের অপেক্ষায় বসে থাকে রোজ, আর দেখে দেখে
শিখে যায় সব। ছবি আঁকা শিখেছিল একদিন, সাধ ছিল বহু
এখন সমস্ত ভুলে মাটি খুঁজে নিয়ে আসা কুমোরের ঘরে।
প্রণোদিত শিল্পী নিজে জড়িপাড়ে কার্তিকের সাজ করে দেয়
তুলি হাতে বসে থাকা তারই কাছ থেকে—গ্লিমারের টাচ নিয়ে
সমবেত ঈশ্বরীরা উঠে যাচ্ছে হুডখোলা ট্রাকে।

ফলো মি

চিরপ্রশান্ত বাগচী

রাজপুত্র হলেও বুদ্ধের সঙ্গে কখনও কখনও আমার সাক্ষাৎ হয়। জিজ্ঞেস করি, আপনার পিতাশ্রী ম ম-সহ রাজসুখভোগের এত সবুজ সংকেত দেওয়া সত্ত্বেও, কী করে এড়িয়ে গেলেন এ-সব?
তিনি বলেন, ফলো মি।

বামিয়ানে আপনার দীর্ঘ দীর্ঘতর প্রস্তরমূর্তি ডিনামাইটে গুঁড়িয়ে দিল এক জঙ্গিগোষ্ঠী।
এতদ্বিষয়ে আপনার কোনও বার্তা নেই?
সারা জীবন হিংসার বিরুদ্ধে আর মানবতার পক্ষে কথা বলে, শেষকালে আপনিই হিংসা-ক্রোধ-ধর্মান্ধতার শিকার?
তিনি বলেন, ফলো মি।

ঘটনা এই যে, আপনার দাঁতেরও মন্দির আছে জেনে চরম বিস্ময়ে আমি ক্যান্ডি পৌঁছে যাই গতকাল।
সেখান থেকে আবার অনেক অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে ভারত থেকে প্রস্থানোদ্যত হিউয়েন সাঙকে ছুটে গিয়ে অনুরোধ করি,
আবার চিন কেন স্যার, এখানেই থাকুন।
কিন্তু তিনি সবিনয়ে আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরেন।

সকালে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াই।
সেখানে আমি নেই। পরিবর্তে অলৌকিক এক কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হয়, ফলো মি।

অশ্বমেধ

সোমব্রত সরকার

ওখানে ওই ক্ষীণপ্রভা রঙের একটু আশায় আশায়
মুখিয়ে আছে। তাকেই তোমার ডেকে এনে দিব্যচোখের
গহনপাঠ দিতে হবে। পলক ছোঁয়া পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে
নতুন কোনও আত্মকথায় প্রকাশ পাবে শিবের গীতি। গৌরীরানি
যত্ন করে সাজিয়ে রাখে গৃহস্থালি। নকশা কেটে ধৈর্য তোলা
বাতাস লাগা ভালবাসা মনের ভেতর সৃজনমায়া বয়ে আনে
কতরকম সুকৌশলে সামনে আসে বাংলাভাষা। গদ্য লিখে
নড়িয়ে দেবে মনোযোগের বেলাভূমি? কায়দাকানুন ভাবতে গিয়ে
গুলিয়ে ফেলি কথোপকথন। খুঁজে বেড়াই রক্তমেঘে আমার মাটির
ধাবমান বিবেকজোড়া। ঘোড়া ছোটে অশ্বমেধের
লোকালয়ের প্রান্তে এসে ধরতে পারি আমায় কেন খবর পাঠাও
কে প্রার্থী কে শরণার্থী এমন যখন সূক্ষ্মবিচার
তোমায় কেন মানব বলো গাঁয়ের মোড়ল? চটির তলায়
পথ পেরনো রৌদ্রচিহ্ন, প্রাণতরঙ্গ কত কিছুই জমিয়ে রাখি
এসব নিয়ে করব আমি সম্প্রসারণ। দুটো একটা পর্বগাথা বলতে পারি
যখন খুশি চলে এসো। আলিঙ্গনে ঝুঁকি থাকায় আঙুল ধরে
স্তব্ধ করি দেবকল্প। লাজুক হেসে চলে গেলেও বৃষ্টি আসার
আগে আগে পৌঁছে যেয়ো। দুলছে আমার ক্যালেন্ডারে
জগৎপারের নিবিড় তারিখ। তোমার আমার ধ্যানপ্রবাহ।

কোজাগরী

তীর্থঙ্কর দাশ পুরকায়স্থ

অনন্ত রাত্রিতে লক্ষ্মী-পূর্ণিমার চাঁদ
জেগে থাকে যখন সংবাদ
লেখা হয় অন্ধকুঠুরিতে।

একদিন মুখ-ঢাকা বিজলি বাতির আলোটিতে
আধপেটা খেয়ে রোজ অক্ষর সাজাত
শশীবাবু, জিতেন মাহাতো।

সেভাবে সংবাদ লেখা হবে, যেমন অতীতে
লেখা হত, অন্ধকারে গভীর নিশীথে,
দীপ ধরে থাকে একা আলো-বর্ণ চাঁদ,
শালপাতায় লেখা হবে আনন্দ-সংবাদ।

ঝুল-কালি ঠেলে লক্ষ্মী-পূর্ণিমার আলো
বলে 'লেখো, ভাল আছি, লেখো, থেকো ভাল,'
পৃথিবীর মুখে আলো ধরে থাকে রাতের ঈশ্বরী
সরিয়ে আলতো হাতে মলিন খড়খড়ি।

সমাধি পেরিয়ে কিছুক্ষণ

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

চেনা নদী চেনা ঘর আলোর সংসার
সব ছেড়ে আবার ফিরেছি সে মাটির কাছে
এ মাটি সে মাটি শরীর জুড়নো স্তব্ধতার পর
জবা গাছের কাছাকাছি এ কার নাভিমূল...
প্রথম জন্ম পরিচয় দিতে হবে তাকে
খানিক লাল মাটি সঙ্গে এনো, মিশিয়ে দিয়ো
রুক্ষ কিছু সময় নরমের কাছে। এই নিয়ে শুরু
হোক জল ঝরা জ্যোৎস্না। ডুবে আছি সমাধির
কাছে, বারুইপুর লোকাল পেরোল পার্ক সার্কাস
দরজার কাছে প্রতিদিন রড ধরে দাঁড়াই, পৌঁছই
কবরের ধারে, সময় সময় খানিকটা সময়
ফিরছি সে আলোর কাছেই। মানুষের সুরে
মানুষেরই গোপন ছায়াছবিতে। বিরোধাভাসে
শুধু জল লিখি, বৈষ্ণব আখড়া হয়ে ওঠে
বাড়ির উঠোন। মহোৎসব জুড়ে জুড়ে অন্ধকার
পা ফেলে কে যেন চলে গেল, আর তো দেখিনি
তাকে। বট পাতা ভেজানো আছে পোড়ামাটির
জালায়, স্কেলিটন বেরিয়ে গেছে, শুকিয়ে নিয়েছি
রং তুলিতে সে মুখ এঁকে নেব শুধু, চলে যাওয়া
নয়, ফিরে আসার ছবি

মহাজাগতিক

গৌতম মুখোপাধ্যায়

অত তাড়াতাড়ি নেই, ধীরে ধীরে এসে
দরজা খুলে দাও।
ধীর পদক্ষেপে সব অনুসন্ধানের পর
একটু এগিয়ে দরজা খুলে দাও।
দেখবে ওপাশে অন্ধকার আকাশ
কয়েকটি নক্ষত্র আর খণ্ডচাঁদ নিয়ে
অপেক্ষা করছে।
ওই আলো-আঁধারের সাগরে
তুমি ঝাঁপ দেবে জানি
ধীরে সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে যাবে
মহাজাগতিক ঝড়ের দিকে
তার পর সব লন্ডভন্ড!
আমরা কেউ কাউকে আর দেখতে পাব না
কোনওদিন, আমাদের শেষ খাওয়াদাওয়ার
অংশগুলো টেবিলেই পড়ে থাকবে চিরকাল

বরং দেরি করে যাও, ধীরে যাও
আমরা কিছুক্ষণ আমাদের মতো থাকি

বঙ্কিম কাহিনির নাট্যরূপ

শিবাশিস মুখোপাধ্যায়

মর্নিং ওয়াক ছেড়ে টাকা দিয়ে যারা ঢোকে জিমে,
এ সি মেশিনের ছন্দে যারা মোছে কপালের ঘাম,
তারা বুঝবে না এই তিন মাস প্রচণ্ড বঙ্কিমে
ডুবে থেকে মঞ্চে উঠে আমরা কী অবাক হলাম!

তাঁর ভাষা অলৌকিক, আমরা তাকে মুখে মুখে বলে
রক্তমাংসে তুলে আনি বাংলার ঘুমন্ত ইতিহাস;
দেবী চৌধুরাণী যেই মঞ্চে আসে প্রফুল্লর বদলে
পিন পড়লে শোনা যায়, দর্শকের বন্ধ নিশ্বাস!

দর্শকই আসলে ধারা, তার জীবন যত দূর যাবে,
এ কাহিনি তত দূর ভেসে যাবে ঢেউয়ে দুলে দুলে,
চরিত্র ও অভিনেতা মিলেমিশে কোমল রেখাবে
মাঝে মাঝে তার জীবনে বেজে উঠবে অচেনা আঙুলে।

জীবন বিরাট মঞ্চ, সেখানে সকলে অভিনেতা
বাঁকে বাঁকে গুপ্তধন, ঝড়ঝঞ্ঝা, নানা লাভক্ষতি;
লাঠি, তরোয়াল হাতে কেউ তার ভাগ্যের বিজেতা,
কাউকে হাতের আংটি ভুলিয়েছে নিষ্ঠুর নিয়তি!

জয়ধ্বনি জেগে আছে, আমরা তার গলা শুনে চিনি;
মহাজীবনের মঞ্চে বয়ে চলে বঙ্কিম-কাহিনি!

দৈবী অক্ষর বলো...

ম ণি দী পা বি শ্বা স কী র্ত নি য়া

রাগে অন্ধ চশমা মুচড়ে দিয়েছে হাত
শুকনো কুয়োর চোখে তাকিয়েছি আমিও
দেখেছি মেঘ নেই, ধুলো ঘনাচ্ছে চারদিকে
ভাতের বাসনে ছাই... ধোঁয়া বেরোচ্ছে চশমা থেকে
আমি কি ভেঙে যাব হাহাকার?
পেট্রোলভেজা রাস্তা আমি কি ছুটে যাব আগুনরেখা?
সায়ার খড়খড়ে রক্তের দাগে হারিয়ে ফেলব
ছন্দ ও মিল দেওয়া অল্প বয়স
সরু কোমর ও ধবধবে ফ্রিল
ব্যর্থ পাণ্ডুলিপি শোনো, ফেরত আসা কবিতার ভুল
আজ যদি না নাও আমাকে জবান কবুল
না জড়াও বাতিল লেখাদের ছেঁড়া জিভে
তারার ফাটলে এই স্তূপ স্তূপ কাগজের টাটকা ফুল
ছেটানো ভাতের দানায় আমায় না কুড়িয়ে তোলো
উনুনপাড়ে ভাঙা হরফের লিপি ধরে ধরে
বুকভর্তি পোড়া অন্নঘ্রাণ বলো কোথায় দাঁড়াব
নষ্ট সংসার ও উচ্ছন্ন প্রেমের ভেতর
নেমে আসা দৈবী অক্ষর বলো
ভাঙা এই হাত, বলো বলো
মোচড়ানো ডানা আমি কোথায় বাড়াব...

পিতা

অ নি র্বা ণ ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

দৃশ্য, বদলে গেছে...
সদ্য রক্তস্নাত যুযুধান দুই ঠোঁট, আপাতত গেঁথে আছে স্ট্র্যাটেজিক প্রণয় চুম্বনে।
একাত্ম মিথুন মূর্তি!
যদিও কিছু আগেই আকাশ থেকে চকিতে নেমে এসেছিল
ক্ষুধার্ত ইগলের ঝাঁক... নারীর পেট ফালা করে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে এক-একটা রক্তাক্ত ভ্রূণ।

এখন, সব শান্ত...

ভাঙা বাড়ি, চার্চ, কংক্রিট-ডেব্রি ঠেলে একে একে মাথা তুলছে পিয়ানোর জীবিত রিড।
একটা প্রবল নিঃসঙ্গ রবিন, কাঁপা স্বরে শিস দিয়ে চলেছে কোথাও...
হয়তো ওর গা থেকে উপড়ে গেছে এক গোছা তাজা রং-পালক...
অথবা ঝলসে দগদগে নরম নীলচে বুক।

প্রতিবার এমনই তো হয় ...

তবে, এবারও ঠিক হয়ে যাবে।
ঠিক,
        হয়ে যায়... দৃশ্য, বদলে গেলে।

হে রাষ্ট্রনেতা,
কেন যে আপনি এবারেও পিতা হয়ে উঠতে পারলেন না...
অন্তত ওই ধ্বংস মুহূর্তগুলোয় !

মনসিজ

অর্পিতা কুণ্ডু

না না আস্থা, চিরআস্থা তুমি,
এমন ভ্রূকুটি আর কোরো না আমার আবেদনে
তোমার পতঙ্গসম লোভ হই, ক্ষুধা হই
মারণের হই সুকৌশল...
না না আস্থা, শতআস্থা তুমি, নির্ণীত মন্থনে বাঁধা জল

দীপ যায়, অস্ত যায় রাগিণী প্রহর
আমার অদম্য স্রোতে স্তব্ধ চরাচর শোনে
তিলমাত্র, কণামাত্র ক্লেদ কোথাও রাখিনি আমি স্বয়ম্ভু সমীরে
দ্যাখো, শতক বসন্ত তীরে তুমি এসে দাঁড়িয়েছ, শ্বেত
স্খলনের, ছলনের সে-বেশভূষায় নিরেট পৃথিবী তার
বীণা থেকে মূল তারগুলি খুলে খুলে ফেলে!
জানকীর সেই রথ, সেই তো আমার কবে থেকে...
জোছনা-তিমিরে অবিচল গেঁথে রাখি মীন রত্নরাজি
ও চঞ্চল, এখনও হয়নি শেষ প্রহর তোমার,
এখনও সে ভাঙা বরমালা ভেসে যায় উজান গঙ্গায়!

না না আস্থা, শুভআস্থা তুমি,
সুমুখে আগুন রেখো, এই শ্বাস
অগ্নিময়, দীপ্তিময়, জ্বালাময় কোরো অবিরল...

শেষের কবিতার শুরু

পায়েল সেনগুপ্ত

পরতে পরতে পরাগরেণু যখন ফুল হয়ে ওঠে
বুকের ভিতর অসহ্য ডানা ঝাপটায় এক পাখি
দূরে তখন হয়তো কোনও মাটির কুলুঙ্গিতে জ্বলছে প্রদীপ
উত্তপ্ত কপালে জলপট্টির শীতলতার মতো মায়ের হাত
আড়াল করে রাখে এলোমেলো নিভন্ত শিখার উষ্ণতা
এবং আজন্ম ক্ষতবিক্ষত একটি শিশুহৃদয়...
অস্থির দাপাদাপি যখন ছিঁড়ে ফেলছে হৃৎপিণ্ড
তুমি সেই পাখির ঠোঁটে রেখে দাও সামগানের স্বরলিপি
পৃথিবীর দূরতম বন্দরে বৃদ্ধ খেলেন মৃত মাছের সঙ্গে
শিকারি পাখির চোখে ধরা পড়ে জলের অসহায়তা
গভীর অরণ্যে হরিণশিশু আশ্রয় খোঁজে নিশ্চিন্ত ওমের
সভ্যতার ক্ষতস্থান আড়াল করতে আকুল পৃথিবী
রক্তের উন্মাদনায় শরণাগতর বার্তা পাঠায় ক্রমাগত
আমাদের হলোকস্ট ছিল না, আছে শিকড় বিচ্ছিন্নতা
অস্থির পাখির ঠোঁট কুরে কুরে খায় তার যন্ত্রণা
উদাসীন পৃথিবী আজও তৈরি করেনি তার সান্ত্বনা
শুধু জ্বরের সময় সব কবিতা শেষ হয়ে গেলে
ভিতরের দাপাদাপির কাছে নতমস্তকে আশ্রয় নিতে হয়
হাত পুড়ে গেলেও নিভন্ত প্রদীপ বাঁচাও যেভাবে
সেভাবেই কি একদিন আমাকে বড় করেছিলে তুমি, মা?

সন্ধের ক্ষতের ভিতর

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

শব্দহীন সেইসব সমুদ্রের পাশে
সে লিখে রেখেছিল প্রিয় পাথরের নাম,

যে-পাথরের গায়ে শোনা যেত নক্ষত্রের গান
পড়া যেত দৃষ্টির জন্মকথা
আর আরও কিছু অজানা লিপি,
যার পাঠোদ্ধার সে করে রেখেছিল
বালি আর স্তব্ধতার আকাশে

তার বইয়ের ঘরে হামেশাই দেখা যেত—

পাখির ডানা ঝাপটানোর উল্লাস
গাছেদের নিবিড় আদানপ্রদান
পোকামাকড়ের শান্তিপ্রস্তাব

সে, তার ছায়া
অনেকক্ষণ বসে থাকত একটি চেয়ারে,
আর পাথরের পাল্টে যেতে থাকা রঙে
বেজে উঠত পৃথিবীর প্রাচ্যগতি

প্রোগ্রেড

এখন সন্ধের ক্ষতের ভিতর
জেগে থাকে চোখ

এখন নিঃশব্দ ঢেউয়ের নীচে
অপেক্ষায় নক্ষত্রের জ্বলন্ত অক্ষর

ঈশ্বর সমীপেষু

যশোবন্ত বসু

আমার গৃহেও এবার কিছু উন্নয়ন হোক, হে ঈশ্বর। যে-জায়গাটি অন্ধকার সেখানে এক রূপবান বাতিস্তম্ভ বসিয়ে দিন। বিষণ্ণ উঠোনে বসান ঝকঝকে টালি, সারিবদ্ধ মরসুমি ফুল। ভাঙাচোরা দুঃখকষ্ট, ঝগড়াঝাঁটি ও মলিন দেওয়াল উড়িয়ে একখানা মুক্তমঞ্চ বানান। তার একপ্রান্তে রাখুন সুদৃশ্য ক্যাকটাস, অন্যদিকে এলইডি টিভি। দুপুরের উচাটন আর বিকেলের মনখারাপের মতো মামুলি ছাইপাঁশ মুছে একটি হস্তশিল্প প্রদর্শনী করা যেতে পারে, যার শুরুতে থাকবে কালজয়ী বাংলা গান আর শেষকালে আদিবাসী নৃত্য ও বস্ত্র-বিতরণ।

হে মহানুভব, আমার যা-কিছু ব্যক্তিগত আবছায়া অকিঞ্চিৎকর, সবেতেই আপনার কৃপাদৃষ্টি পড়ুক। মর্মে বাজুক উৎসবের রিংটোন, চরাচরে জেগে থাক আপনার প্রবল স্মিত উদ্ভাস।

সংগ্রহ

মেঘ বসু

ভোরবেলা উঠে, রান্নাঘর খোলা দেখে বুঝি:
লেখা এসে, চুপচাপ ঠান্ডা ভাত খেয়ে
কলতলা ধরে চলে গেছে!

বর্ষার নরম মাটি থেকে, তার
কোমল পায়ের ছাপ তুলে এনে
আদরে সাজিয়ে রাখি।

যে শব্দ উচ্চারিত নয়

অদিতি বসুরায়

যত চিঠি তোমাকে লিখেছি,
তার কোনও শব্দ উচ্চারিত হয়নি কখনও।

ঠোঁটের কয়েক ইঞ্চি নীচে, যে লাল ত্রিভুজটিকে
হৃৎপিণ্ড নামে ডাকো—
তা থেকে অবিরাম নির্গত রক্তস্রোত,
তোমাকে 'ভালবাসি' বলে।
এদিকে আমার অঞ্জলি অপারক করতল—
এদিকে আমার আজন্ম অন্ধ চোখ—
তুমি জানোইনি!
বোঝোনি,
প্রতি সন্ধের সমস্ত শঙ্খধ্বনিতে কী করুণ তোমাকে ডেকেছি—
তুমি অবিশ্বাস থেকে ভেবেছ,
এও এক মিথ্যে ছায়াবাজি—?
অন্তর্যামী জানেন, যেভাবে চেয়েছি তাতে সমগ্র পেলেও
কিছু বাকি রয়ে যাবে।

মানুষের কথা

ঋত্বিক ত্রিপাঠী

১.
সমূহ তত্ত্বকথাশেষে সন্ধে নামছে নিষ্পাপ, কাছে দূরে
পৃথিবীর সমস্ত বাগান সমস্ত হেঁশেলে ছড়িয়ে বিশ্লেষণ, সুবর্ণ পাদটীকা
কেউ আর কিছু বলছে না। শুনছেও না। শুধু নীরবতার উৎসব
সমান্তরালে দাঁড়িয়ে বৃক্ষ, নির্বাক ঘরবাড়ি, অভ্রংলিহ প্রাচীর...
উপমেয় উপমানে অলঙ্কৃত হয়ে আছে নিয়তি, দিনলিপি

শোক আর শ্লোক এড়িয়ে কবে আর সামাজিক ছিল মানুষ!

২.
বেঁচে থাকার আনন্দে বিসর্জন সেরে বাড়ি ফিরে আসে একলা মানুষ
বাড়িতে প্রতিবেশী। তাদের সম্বল দ্বিরুক্তি, শ্লেষ, ব্যাজস্তুতি...
নিকটবর্তী হয় দিগন্ত, দেশ, নিশ্চেতন রাতের আশীর্বাদধন্য ঘুমন্ততারা
কৃতজ্ঞতার মাঠে মুখোমুখি, পক্ষ বিপক্ষ এক, সব আপাত
ছায়া পায় শরীর। ক্রমে ক্রমে জাগে আনন্দ, এষণা, সংবিৎ

রাতশেষে ফুরিয়ে আসে নাট্য অঙ্ক, অলখটানের অসূয়া
উদ্ভাস ও উল্লাসের ইতি, শুরু হয় আবার ধ্রুপদী সালোকসংশ্লেষ

বস্তুত, সময়ের দ্বিধা নিয়েই মানুষ থেকেছে মানুষের পাশে।

পুরাতনী গান

দেবাশিস তেওয়ারী

[“Twilight and evening bell,
And after that the dark !
And may there be no sadness
Of farewell when I embark.” — Alfred Tennyson]

প্রসন্নতার তীরে উঁকি দেওয়া ঝাউবন
কপটতাহীন। পদব্রজে হেঁটে যায় বেলা
উন্মুক্ত রোদের থেকে নিয়েছে সে পারানির কড়ি
শেষ নৌকা এসে ভেড়ে সন্ধ্যানদীতীরে।
ফসল ফলানো খেতে সংসারের স্বল্প বোধোদয়
নিয়ম না মেনে— শুধু চেয়ে দেখে
অযুত নক্ষত্র থেকে ঝরে পড়া পুরাতনী গান
কীভাবে কণ্ঠে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে সন্ন্যাসী আবার।

চামর

শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তী

স্বগতোক্তির পর আর কিছু থাকে না অব্যক্ত
নিজেকেই হাত ধরে আরোগ্যপথের কথা বলি
বিষ ঝরে যায় চোখ থেকে। নীল বিষময় নীল
সন্ধ্যারতির পর নেমে আসে চামর তোমার
দৃষ্টিপ্রদীপ জেগে ওঠে। জেগে ওঠে অশুভ দানব
মাতঙ্গী সেজে ওঠে যূপকাষ্ঠে বন্দি সৈনিক।
চামর দোলাও কবি। আমাকে ধূম্র হতে দাও
রোমের গোরস্থানে আঁকা ম্যুরাল সংঘাত ষড়ভা
অজন্তা গুহাভরা পদ্মপাণির অবলোকিতেশ্বর
মন্ত্রোচ্চারণে আরোগ্যপথের কথা বলি
চামর দুলছে ওই। একা-একা পঙ্‌ক্তি বলে চলি
অসহ আগুনে জ্বলে উঠছে শরীর। প্রেম
আসে না কলোসিয়ামে অস্ত্রচালনার ব্রতকথায়
ক্ষতবিক্ষত বাহু। এ বাহু ফেরাবে কামিনী কি?
অগ্নিদগ্ধ ছাই দুই হাতে তুলে নিল তরুণ এক কবি
লুপ্ত ভাষার সরোবরে ডুব দিয়ে তাঁর মিটেছে জ্বলন
সন্ধ্যারতির বিগ্রহে যত্নে সুপ্তসুর সাজিয়ে রাখেন অশ্বঘোষ
চামর দুলছে ওই। অক্ষয় ক্রোধে।

ত্রিসীমানা

মানসকুমার চিনি

চাঁদ এসে ঢেকে দেয় জামরুল বাগান
অলীক আত্মা দেখেছে অন্তর্ভেদী ভাস্কর্য
শোকার্ত ছায়া ফিরে এসে শরীরে
ধুলো থেকে তুলে নাও পথের অভিজ্ঞতা
শান্ত নৌকো পারাপার করো।
ভিক্ষাপুত্র মাদল বাজায় শেষরাতে
তোমাকে দগ্ধ করে অন্ধ চাঁদ
কিছু বাউলের উদাসী গান
মগ্নচৈতন্যে এ-গ্রামে ঢুকেছে দিব্যজ্ঞানে
ত্রিসীমানায় পড়ে নক্ষত্রের হাড়
চন্দ্রাহত আলো জমা হয়ে থাকে।
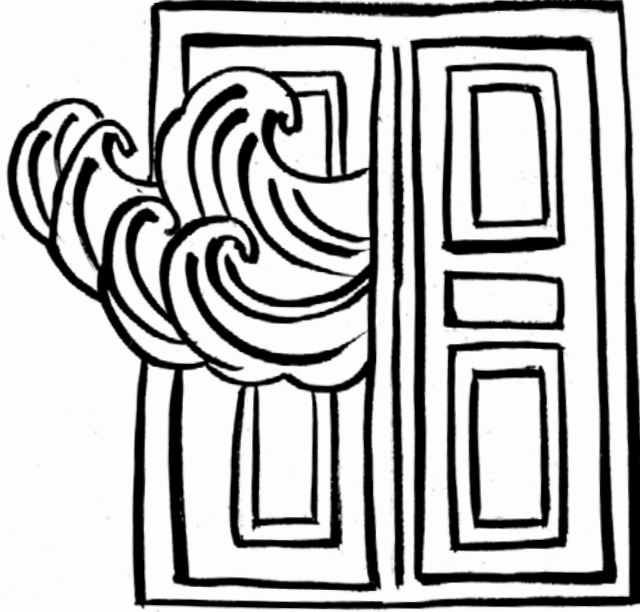
বন্ধ ঘরের হাওয়া

অগ্নি রায়

কাঠের গায়ে লেখা ধুলোর কথকতা
অচেনা গন্ধে রাত বিধুর হয়,
দেওয়ালে হলুদ ফ্রেম জলের ঘুমে ডুবে
তামাদি দেরাজ সব স্মৃতিতে খায়।

এখানে নোনতা স্বাদ সরল ব্যাকুলতা
নিয়তি ছড় টানে বারান্দায়,
ট্রাঙ্কে জমা ছিল তোমার দেশভাগ
সীমানা টপকে যায় উই-কথায়।

বন্ধ দরোজার ওপারে মহাকাল
অট্টহাসি করে, সে চপেটাঘাত,
আমার কাজ বাকি, পর্দা জানে নাকি?
শূন্যতায় নামে মহাপ্রপাত।

অনেক বর্ষা সয়ে এ ঘর দৈবাৎ
ভিতর থেকে আজ মেঘ সরায়,
প্রেতের মতো শুধু বাতাসে কেঁপে ওঠে
মায়ের বাসন ধ্বনি, রূপকথায়।

নতুন রান্নায় পুরনো আয়োজন
টমেটো লাল বুকে পাবদা ঘ্রাণ,
মশলা স্মৃতি নিয়ে তবুও ছুটে যায়
ফ্রিজের হৃদয় খোঁড়া বেদনা যান

পারাপার গাথা

কালোবরণ পাড়ই

যেখানে বাতাস খেলে হৃদয়ের অনুকূলে,
আঁকা হয় নদী;
কিশোর কিশোরীরা সিগালের ডানা
ঢেউয়ের খোঁজে মাতোয়ারা ঝরনা কলস্বনা
পাথরে গড়িয়ে জল সমতলে ভাসে;
উঠে আসে গ্রাম বনবীথি গাছের তলায়
সবুজান্ত খেতজমি নিয়ে;
হাতের ছোঁয়ায় হাত, প্রাণ উড়িয়ে যায়
ছলাৎছলের পাশে হেঁটে যেতে ইচ্ছে করে খুব
প্রান্তরের শেষে একটি বাঁধ জেগে থাকে
পাড়ের মহিমা লেখে পারাপার গাথা
পোশাক উড়েছে উড়ুক উতল হাওয়ায়
বিষণ্ণ মুখ কে রয়েছ, দ্যাখো,
কত হৃদয় নেচে যাচ্ছে স্রোতের নির্মাণে
খেলাধুলার আমন্ত্রণে জেগে উঠেছে মৃত্যুমুখী মাঠ,
নির্মল আনন্দের হইচই রব।

পয়ারের দেশ

তৈমুর খান

প্রাচীন পয়ারের দেশে জন্ম হল আমার
বাল্মীকি-কাশীদাসী থেকে শ্রীমদ্ভাগবতে পথ হেঁটে চলেছেন বাবা
আমি হরীতকী বনের ফাঁকে ফাঁকে ছুটছি
যদিও প্রচুর আমলকী বটফল শিরীষপাতা ঝরে গেছে
দেখতে দেখতে বেহুলাকেও ভেসে যেতে দেখি

দু'পাশে জলের ঢেউ নাচে
নির্জন বসে আছে তরুর ছায়ায়
হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কার শাড়ি?
এই অবেলায় পাক খায় গ্রীষ্মের করুণ প্রহর

প্রাচীন গমখেতে দাঁড়িয়ে আছে আদিম নর-নারী
বুকে শস্যের ভার, চোখে চোখে চলাচল করে কথা
ঠোঁটে সঞ্চিত মধু, মধুর পসরা
শরীরে পয়ার লেগে আছে, পয়ারে পয়ারে মুগ্ধতা

সুর উঠে আসে, আমরা সুরের বাহু ছুঁয়ে কাঁকন বাজাই
পুলক ছড়িয়ে পড়ে, কোথাও কম্পন হয়
রূপকথা থেকে অরূপ কথায় কখনও আলো পড়ে

জ্যোৎস্নায় উড়ে যায় হাঁস
পাহাড়ি ঝরনায় পা ডুবিয়ে সকাল হাসে
কুয়াশায় গড়াগড়ি খায় ভবিষ্যৎ
উচ্চার নিরুচ্চার মিলে পয়ারে পয়ারে বাঁধে ঘর

নিজের সঙ্গে একা

কিঙ্কি চট্টোপাধ্যায়

তোমাকে চুম্বন করি হে প্রিয় বন্ধু আমার!
অদেখা আসনখানি পেতে দাও হৃদয় মাঝারে
তুমি জানো শুধু তুমিই জানো নগ্ন আমাকে।
গোপন গভীর দুঃখগুলি নির্জনে ভাবি, কেউ তা জানে না, জানি না কেমন করে ইদানীং
মুখোশ পাল্টে পাল্টে সামাজিক মেলামেশা হয়।
সামাজিক ত্রুটিগুলো সংশোধন করে দাও তুমি।
দেখাও আঙুল দিয়ে কোনটা অভিনয়ের মেকি হাসি আর কোনটা নিছক ভদ্রতা— প্রাণহীন অনুভূতিহীন। টেনে তোলো হতাশায় ভেঙে পড়া থেকে।
জীবনে জীবন জুড়ে প্রেম হয় আর আমাকে রমণ সুখ দাও তুমি একান্ত গোপনে। গোপনে আদর দাও।
নিরিবিলি আশ্লেষে জড়াও তুমি, শুরু করি গল্পগাছা,
রোমন্থন। স্মৃতির চুলে বিলি কেটে কেটে, কেটে কেটে মুছে দাও অবসাদ একাকিত্ব বিরহ বেদনা।
যুক্তি দিয়ে শোধ করো যাবতীয় দেনা।

লেনাদেনা শেষ হলে— আহা!
শরীরের ছায়ার মতন মিলাবে তখনই
আমি জানি। এই হল সারসত্য।
শুধু চুম্বনখানি খুলে রেখে নূপুরের মতো
নগ্ন পদে চলে যাবে তুমি
একান্তে, দিন শেষে আমারই সঙ্গে

যে পথ বাউল

হিন্দোল ভট্টাচার্য

বাঁশি কি জানে না তার সুরে কত আলো?
যেন সাড়া দিয়ে ওঠো ঘুম।
জন্ম জন্ম অন্ধকার আগুনের মধ্যে লাফ দিয়ে
পরজন্মে হবে কি প্রদীপ?
বিরহে বেজেছ তুমি জল...
বিপদসীমার খুব কাছাকাছি মন,
পাড় ভেঙে যেতে পারে। ডুবুডুবু উঠোন সামলাও।
দু'পাশে অশনি ডাক, পোড়া নদীখাত,
মানুষের ফেলে রেখে যাওয়া কিছু চটি ও আদর
এত অন্ধকার, তবু একটি পথ ঘাসের উপরে
পায়ে পায়ে তৈরি হয়,
পথের কোথাও কোনও দায় নেই পর্যটন ছাড়া।
রাস্তার সমস্ত ঋণ পড়ে থাকে ধুলোর ভিতর...

আমাদের পথ নেই, রাস্তাঘাট আছে...
বাঁশি বাজে শোনো,
যে পথ বাউল তার শুরু আর শেষ নেই কোনও...
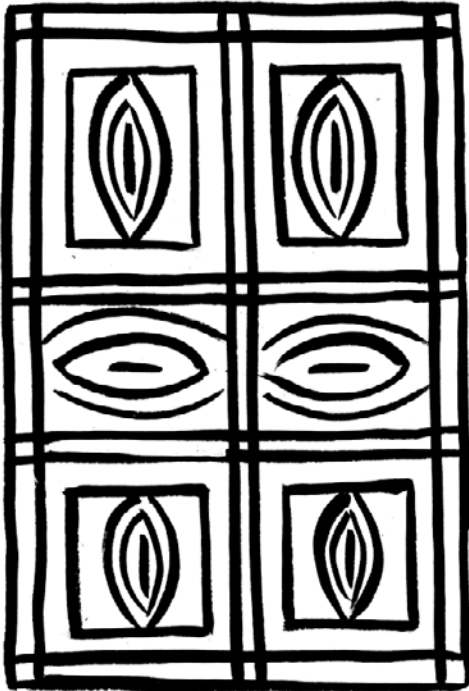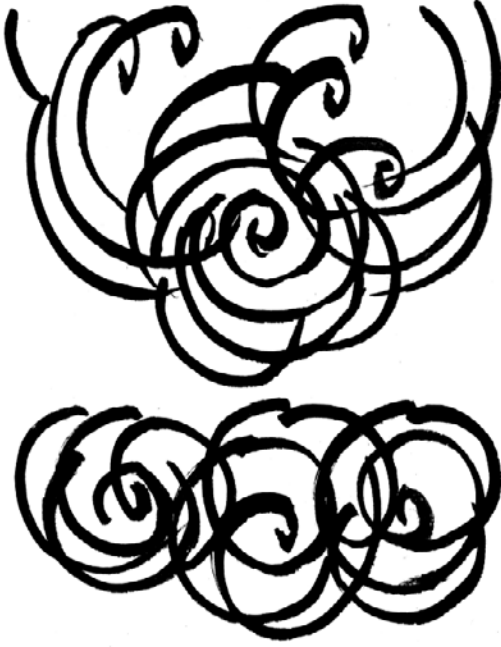
বাঙ্ময়

পা প ড়ি গ ঙ্গো পা ধ্যা য়

শব্দ নয়, দু'টি শব্দের মধ্যবর্তী শূন্যতা
ভাবায় আমাকে।
ফাঁকা স্থানের না-লেখা শব্দের অর্থ
খুঁজতে থাকি।
খুঁজি নীরবতার মানে।

একটিও শব্দ লেখা হয়নি,
এমন সব বুক পেতে রাখা
সাদা পাতার অন্তরে
রয়ে গেছে এক-ব্রহ্মাণ্ড রহস্য,
একদিন লেখা হবে বলে।

নতুন খাতার সাদা পাতা খুলে
বসে থাকি প্রতীক্ষায়,
ওর হৃদয়ের কথাগুলো
ফুটে উঠবে বলে।

মায়া

ঈ শি তা ভা দু ড়ী

এত যে যাব যাব করি,
যাওয়ার আগে ভূকম্প হবে নাকি
কয়েক সেকেন্ডও অন্তত?
বিষণ্ণ এসরাজে বাজবে না বুক?

এত যে ভাবি চলে গেলেই হয়,
অন্তিম মুহূর্তে হবে না মায়া
খুঁটে-খাওয়া চড়ুইটির জন্যে?
পড়বে না শূন্য দীর্ঘশ্বাস
দেয়ালে টাঙানো মধুবনি চিত্রের
দিকে তাকিয়ে?

এত যে যেতে চাই,
দরজার কাছে গিয়ে
পড়বে না মনে শ্রাবণের মেঘ?
আর, বৃষ্টিভেজা অর্জুন গাছটিকে?

অঙ্কন: সুব্রত চৌধুরী

উনকি

সমরেশ মজুমদার

এখানে বিকেল ফুরোলেই চটপট অন্ধকার হয়ে যায়। ক'দিন আগেই সারা দিন ধরে একটানা জল ঝরিয়ে বৃষ্টি পড়া থেমে গেছে। এখন চিটপিটে গরম শুরু হয়ে গিয়েছে। তরাই-এর এই চা-বাগান এলাকায়। তার পর ভুটান পাহাড় থেকে মেঘ হলে জল আসে প্রতিবছর। অদ্ভুত ব্যাপার, একটা নিয়ম মেনে যেন আসে তারা। সন্ধ্যায় অন্ধকার ভাল জমে গেলেই এখানে বিদ্যুৎ জানান দেয়। তার পর রাত দশটা নাগাদ সেই যে বৃষ্টি পড়া শুরু হয়, তা একটানা পড়ে থেমে যায় সূর্য ওঠার আগে। ফলে সকালটা বড় মোলায়েম মনে হয়।

এখন স্কুল বন্ধ। স্কুলের একমাত্র শিক্ষক বঙ্কিমবাবু অসুস্থ, শিলিগুড়িতে গিয়েছিলেন শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খেতে। দু'দিন থেকে ফিরে আসার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। চা-বাগানের ডাক্তারবাবু তাঁকে দশ দিন বিশ্রাম নিতে বলেছেন। বঙ্কিমবাবু স্কুল বন্ধ রেখেছেন বটে, কিন্তু যেসব ছাত্র পড়াশোনায় ভাল তাদের বাড়িতে ডেকে সকালবেলা পড়াশোনায় সাহায্য করেন।

তখন হাইওয়েটা আদৌ চওড়া ছিল না। অবশ্য হাইওয়ে হলেও গাড়ি যেত খুব কম। সারা দিনে হাতে গোনা বাস যাতায়াত করত। এই তল্লাটে প্রাইভেট গাড়ির সংখ্যা ছিল বেশ কম। লরি আর মিলিটারির গাড়িই বেশি দেখা যেত।

চা-বাগানের মুখেই ছিল বাবুদের কোয়ার্টার্স। জনা আটেক বাবু সপরিবার সেই সব কোয়ার্টার্সে হাত-পা ছড়িয়ে আরামে থাকতে পারতেন। কোয়ার্টার্সগুলোর সামনে ছিল লম্বা মাঠ। তার পরেই ওই হাইওয়ে। হাইওয়ের দু'ধারে বড় বড় শাল সেগুন অথবা ইউক্যালিপ্টাস গাছের সারি যা বেশ স্বাস্থ্যবান হয়ে গিয়েছিল।

সকাল ন'টায় ওরা একে একে জড়ো হয়ে হাইওয়ে ধরল। জায়গাটা এত নির্জন, কোনও গাড়ি যখন এই পথে আসে, তখন দূর থেকেই তার ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসে। পিচ ছেড়ে মাটির রাস্তায় নেমে যেতে কোনও অসুবিধে হয় না।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল। এরা জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি অথবা আলিপুরদুয়ারের স্কুলে সবে ভর্তি হয়েছে। ওদের মধ্যে চার জন কোনও না-কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে। স্কুল ছুটি হলেই চা-বাগানের বাড়িতে চলে আসে। শুধু এক জন বাড়িতে থেকেই সাত মাইল দূরের বাজারহাটের স্কুলে পড়তে যায়। পরিচিত মুখ বলে বাসের ভাড়া চায় না।

এবার ওদের ছুটি মাসখানেকের। প্রচুর হোমওয়ার্ক করে নিয়ে যেতে হবে। ফলে দুপুরে বাড়িতে বন্দি হয়ে থাকতে হচ্ছে। হোমওয়ার্ক তাড়াতাড়ি শেষ করলে তবে মুক্তি। পথে সেই খালটা পড়ল। বড়রা বলে খাল, কিন্তু সাধারণ মানুষ ওই জলের ধারাকে নদীই বলে থাকে। বড় নদী থেকে একটা কুড়ি ফুট জলের ধারা মাটি কেটে রাস্তার এপাশে এসে চা-বাগানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাস্তা যেখানে কাটা হয়েছিল সেখানে একটা সিমেন্টের পাকাপোক্ত সাঁকো তৈরি করা হয়েছে, যার ওপর দিয়ে বাস বা গাড়ি দিব্যি চলে যায়। সাঁকো পার হলেই যে-এলাকা তাকে হাট বলে সবাই।

কিন্তু সপ্তাহের দু'দিন ওই হাট থাকে জনশূন্য। শুধু রবিবার ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত এলাকাটা গমগম করে। শুধু স্থানীয় মানুষ নয়, আশপাশের তিরিশ-চল্লিশ কিলোমিটার অবধি যত চা-বাগান অথবা জনবসতি আছে তার বাসিন্দারা চলে আসে কেনাকাটা করতে। উপচে পড়া ভিড়, মাইকে বেজে চলা গান, বিক্রেতাদের হাঁকাহাকিতে এলাকাটা গমগম করে।

কিন্তু সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে হাটের এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়ে থাকে। যেহেতু দোকানগুলো অস্থায়ী, রবিবারের সকালে ছাউনি তৈরি হয়, সন্ধের মুখে সেটা তুলে নিয়ে চলে যায় বিক্রেতারা।

ওরা শূন্য হাট পেরিয়ে খানিকটা হেঁটে পিচের রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকের মাটির রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে যে-বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল, সেখানে একটা লাল ফুল আঁকা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে জিজ্ঞেস করার আগে বাড়ির ভিতর থেকে মাস্টারমশাইকে ধরে ধরে নিয়ে এল ওঁর ছেলে এবং অচেনা এক জন। খুব সাবধানে গাড়িতে বসিয়ে দেওয়া হল মাস্টারমশাইকে। ওরা কোনও কথা বলার সুযোগ পেল না। তার আগেই গাড়িটা চলে গেল আলিপুরদুয়ারের দিকে।

বাড়ি থেকে আর যাঁরা বেরিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের কথায় ওরা জানতে পারল, আজ ভোর রাত্রে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন মাস্টারমশাই। আলিপুরদুয়ারের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হবে। এখন ডাক্তার আর ভগবানই ভরসা।

মন খারাপ হয়ে গেল ওদের। সেই চার-পাঁচ বছর বয়স থেকে ওরা মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়াশোনা করে আসছে। সেই মানুষটার যদি আজ কিছু হয়ে যায়! চুপচাপ ওরা ফিরে এল চা-বাগানে।

দুপুরের একটু পরে খোকনের গলা শুনতে পেল অতীন। বাড়ির সামনে এসে চেঁচিয়ে তাকে ডাকছে। বাবা এখন অফিসে, মা রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়েছেন। দ্রুত দরজা খুলে বাইরে এল অতীন, "কী রে?"

কাছে এসে খোকন বলল, "মাস্টারমশাই ভাল আছেন?"

শুনে আনন্দ হল। অতীন জিজ্ঞেস করল, "তুই জানলি কী করে?"

"কাকা এইমাত্র আলিপুরদুয়ার থেকে ফিরেছে। খবর পেয়ে কাকা হাসপাতালে গিয়েছিল। ডাক্তার বলেছেন, কোনও ভয় নেই," বলল খোকন।

"যাক বাবা। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম," অতীন বলল।

"আমি তো ভগবানকে বারবার ডাকছিলাম, যাতে উনি মাস্টারমশাইকে তাড়াতাড়ি ভাল করে দেন। ভগবান কথা শুনেছেন।"

"সবাইকে খবরটা দিয়েছিস?"

"না, তোকেই প্রথম দিলাম।"

"ডাক, সবাইকে ডেকে নিয়ে আয়।"

একটু বাদে ছ'জন একত্রিত হল। প্রত্যেকেই বলতে লাগল, যদি ওরা এখন আলিপুরদুয়ারে যেতে পারত, তা হলে খুব ভাল হত। কিন্তু বাড়ি থেকে তাদের ছাড়বে না। তা ছাড়া ফেরার সময় বাস পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। হঠাৎ অতীন বলল, "তার চেয়ে আয়, ফুটবল খেলি।"

মাস্টারমশাইয়ের জন্যে সকাল থেকেই মন ভারী হয়েছিল, এখন খবরটা পেয়ে একটু হালকা হল। তাই অতীনের প্রস্তাব ভাল লাগল বাকিদের। খোকন দৌড়ে চলে গেল বাতাবি লেবু নিয়ে আসতে। বড় সাইজের ডাঁসা বাতাবি লেবু লাথি সহ্য করে চমৎকার ফুটবলের কাজ করতে পারে। দলে ওরা ছ'জন। কোন তিন জন একদিকে দাঁড়াবে তা যেন কথা না বলেই ঠিক করা ছিল। দু'পাশে খুঁটি পুঁতে গোলপোস্ট বহু দিন ধরেই পুঁতে রাখা আছে। শুধু একটাই সমস্যা, খেলার সময় বল মাঝমাঠ দিয়ে নিয়ে গেলে গতি আটকে যায়। মাঠের মাঝখানে একটা বেশ বড় কৃষ্ণচূড়া গাছ রয়েছে, ওই গাছটাকে কেটে ফেললে স্বচ্ছন্দে মাঠটা পরিষ্কার হয়ে যায়। বল নিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় কোনও বাধার মুখোমুখি হতে হয় না। কিন্তু অত বড় গাছকে বড়দের অনুমতি ছাড়া কেটে ফেলা যায় না। বড়দের প্রবল আপত্তিতেই সেটা সম্ভব হয়নি। ওই গাছের নীচে কালীপুজোর প্যান্ডেল বাঁধা হয়। তা ছাড়া কৃষ্ণচূড়ার ফুল অনেকেরই খুব প্রিয় ফুল।

এখন রোদের চেহারা পাল্টেছে। তেজ কমেছে সূর্যের। ওরা তাই স্বচ্ছন্দে খেলতে লাগল। শুরুতেই গোলে দাঁড়ানো দীপু গোল খেয়ে গেল। বল কুড়িয়ে এনে অতীন তাকে ধমকাল, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলটাকে গোলে ঢুকতে দেখলি? ধরলি না কেন?"

"আর হবে না," দীপু বলল, "হলে বলিস।"

আবার খেলা শুরু হল। এরই মধ্যে দু'-তিন জন বাচ্চা মাঠের ধারে এসে দাঁড়িয়ে জুলজুল করে খেলা দেখছে। তাদের একটু তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা রোগা, অতিরোগা মেয়ে। তার পিঠে একটি শিশুকে বেঁধে এনেছে কাপড়ে। এই ছেলেগুলো আর মেয়েটি এসেছে সিকি মাইল দূরের কুলি বস্তি থেকে। বাবু পাড়া আর কুলি বস্তির মাঝখানে একটা পাহাড়ি নদী আছে যার ওপর সম্প্রতি কাঠের সাঁকো তৈরি হয়েছে।

হাফ টাইমের সময় কিশোর প্রস্তাবটা দিল, "ওই তিন জনের দু'জনকে যদি আমরা দলে নিয়ে নিই, তা হলে খেলাটা জমবে, বুঝলি?"

মাঝমাঠের গাছের পাশে বসে ওরা ছেলেগুলোকে দেখল। দীপু জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ, দু'জনকে নেওয়া যায়। এক জন বাদে।"

অতীন বলল, "বড় দু'জনকেই ডাক। আজ ওরা গোলেই খেলুক।"

কিন্তু হাত নেড়ে কাছে আসার ইশারা করলে তিনটে ছেলেই দৌড়ে চলে এল। অতীন জিজ্ঞেস করল, "এই, তোদের নাম কী?"

"মাংরা।"

"বুধিয়া।"

"শুকরা।"

তিন জন তিনটে নাম বলে হাসল। এদের দু'জনের কয়েকটা দাঁত পড়ে গেছে।

অতীন বলল, "শোন, দু'জনকে আজ খেলাই। শুকরা, তুই আজ বাইরে যা। যদি দরকার হয় পরে তোকে ডাকব।"

ছেলেটা ঠোঁট কামড়াল। তার পর এক দৌড়ে মাঠ ছেড়ে শুধু বাইরে গেল না, নিমেষে চোখের আড়ালে চলে গেল।

খেলা শুরু হল। মাংরা আর বুধিয়া খুব জোরে দৌড়তে পারে, কিন্তু লক্ষ্য ঠিক রেখে বল পাঠাতে পারছে না। একটু একটু করে ওরা চেষ্টা করছিল ঠিকঠাক খেলতে। মাঠের বাইরে সেই মেয়েটি একা দাঁড়িয়ে। তার পিঠে বাঁধা শিশু ঘুমে নেতিয়ে রয়েছে।

পৃথিবী থেকে রোদ্দুর চলে গেলে ছায়া ঘনাল।

খেলা শেষ। এর মধ্যে দু'-দুবার বাতাবি লেবুর বল পাল্টাতে হয়েছে। লাথি খেয়ে খেয়ে ওগুলোর চেহারা বদলে গিয়েছিল। অতীন মদেশিয়া ছেলে দুটোকে বলল, "কাল যদি তোরা খেলতে চাস তাড়াতাড়ি চলে আসিস।"

ছেলে দুটো খুব খুশি হয়ে দৌড়ে চলে গেল।

মাঠের ধারে তখনও সেই মেয়েটি ঘুমন্ত শিশুকে পিঠে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে। দীপু সেটা দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলল, "এই মেয়েটা! এখনও দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা, বাড়ি যা।"

এবার একটু সচল হল মেয়েটি। তার পর ঘুরে কুলি লাইনে যাওয়ার পথ ধরল। যেতে যেতে কয়েকবার মাঠের দিকে তাকাচ্ছিল সে।

সেটা লক্ষ করে অতীন বলল, "ওই মেয়েটা বোধহয় খেলতে চায়।"

"পাগল নাকি!" দীপু বলল, "মেয়ে হয়ে ফুটবল খেলবে নাকি? দেখেছিস তো পিঠে ভাই-বোন কাউকে বেঁধে এনেছে। সেটাকে নিয়ে খেলবে নাকি?"

কথাগুলো শুনে বাকিরা হো হো করে হেসে উঠল।

সন্ধের অন্ধকার গাছেদের মাথা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে মাটিতে নেমে আসতেই সাইকেলের অনেকগুলো ঘণ্টা শোনা গেল। ওগুলো আসছিল খানিকটা দূরের চা-বাগানের ভেতরকার রাস্তা থেকে। ওরা জানে, ওগুলো হল সাইকেলের ঘণ্টার আওয়াজ। চা-বাগানের অফিস বা কারখানার কাজ শেষ করে, ছুটির সময় যাঁরা বাড়িতে ফিরে আসছেন তাঁরা ছেলেদের বাবা বা জ্যাঠা। ওরা আর দাঁড়াল না। দ্রুত যে যার বাড়ির দিকে দৌড়ল। সেই খেলতে যাওয়ার প্রথম দিন থেকেই ওদের বলা হয়েছিল অন্ধকার হওয়ার আগেই যে যার বাড়িতে যেন ফিরে যায়। ছুটির সময় চা-বাগানের বাড়িতে এলে ভাল খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে সারা দিন যে-স্বাধীনতা পাওয়া যায়, তা শেষ হয় সূর্য ডোবার সময়ে, সন্ধে ছ'টায়। তার পর আর বাড়ি থেকে বের হওয়ার অনুমতি নেই।

খোকনের মামা কোচবিহার থেকে একটা চার নম্বর সাইজের মোটা রবারের বল এনে দিলেন। সেটা নিয়ে বিকেল সাড়ে চারটের সময় যখন ওরা খেলতে এল, তখন বুধুয়া আর শুকরা ওদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

এটা অবশ্য স্বাভাবিক ব্যাপার। এক দিন খেলেই ওদের খেলার নেশা ধরে গেছে। কিন্তু ছেলেরা অবাক হল, কালকের সেই মেয়েটা আজও মাঠের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তার পিঠে কালকের মতোই শিশু বাঁধা। জুলজুল করে সে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ খোকন বলল, "এই দেখ, মেয়েটার কপালে কিছু একটা আছে!"

ওরা তাকাল। ভাল করে দেখে ভুরুর ওপর উঁচু হয়ে থাকা ফোড়া জাতীয় কিছু চোখে পড়ল অতীনের। কিন্তু সেটা যে ঠিক কী, তা এতদূর থেকে বোঝা সম্ভব হচ্ছিল না। তবে ডান চোখের কিছুটা ছোট হয়ে গেছে ওই ফোড়ার চাপে।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, "মেয়েটার চোখে কিছু একটা হয়েছে, কী হয়েছে বল তো?"

খোকন বলল, "আমি তো আগে ওকে দেখিনি। যদি ফোড়া হয়, তাহলে ওটা খুব মারাত্মক ফোড়া। এই বুধুয়া, শোন! এদিকে আয়।"

বুধুয়া নামে ছেলেটা তার বন্ধু মাংরার সঙ্গে দাঁড়িয়ে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল খেলা শুরুর জন্যে। ডাক শুনে এগিয়ে এল।

খোকন তাকে জিজ্ঞেস করল, "ওই মেয়েটার চোখের ওপর কী হয়েছে রে?"

বুধুয়া মুখ ফিরিয়ে মেয়েটাকে দেখল। তার পর হেসে বলল, "ওটা অনেকদিন ধরে ওর কপালে আছে। একটু একটু করে বড় হচ্ছে। ব্যথা নেই। শুধু ওই চোখে ভাল করে দেখতে পায় না, কিন্তু অন্য চোখে সব কিছু ভালভাবে দেখে।"

শুনতে শুনতে অতীনের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "ডাক্তার দেখিয়েছে তো!"

প্রশ্নটা বুধুয়াকে করল মাংরা। শুনে মাথা নাড়ল বুধুয়া, "আমি জানি না।"

খেলা শুরু হল। কিন্তু আজ খেলা যেন জমছিল না। হাফটাইমের সময় অতীন দেখল, বালিকা সেই একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে শিশুকে পিঠে নিয়ে। কিছু না ভেবে সে হাত নেড়ে বালিকাকে কাছে ডাকল।

কিন্তু দু'বার হাত নাড়ার পর যেই দীপু চিৎকার করে বলল, "এই, ইধার আ," অমনি বালিকা পেছন ফিরে দৌড়ে চলে যেতে লাগল যেদিকে গত সন্ধ্যায় সে গিয়েছিল।

হতাশ হয়ে দীপু বলল, "যাহ্, চলে গেল।"

অতীন মাংরাকে জিজ্ঞেস করল, "ওকে ওর বাবা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে?"

মাথা নাড়ল মাংরা, "আমি জানি না।"

"তুই জানিস?" বুধুয়ার দিকে তাকাল অতীন।

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে না বলল বুধুয়া।

এর পরে ওদের খেলাটা শুরু হল বটে কিন্তু কোথাও যেন তাল কেটে গেল। আজ খেলা জমল না। অতীন লক্ষ করেছিল, দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হওয়ার পরে বালিকা পায়ে পায়ে ফিরে এসেছিল তার জায়গায়, যেখানে সে আগে দাঁড়িয়ে ছিল। খেলা শেষ হওয়ার পর দুটো মদেশিয়া ছেলের পেছন পেছন বালিকা তার বাসায় চলে গেল।

আজ তাড়াতাড়ি খেলা শেষ হয়ে যাওয়ায় গাছের মাথায় ছায়া ঘনায়নি। ওরা ছ'জন মুখোমুখি বসেছিল। খোকন বলল, "আমি বাজি রেখে বলতে পারি ওই মেয়েটার কোনও চিকিৎসা হচ্ছে না।"

"কী করে বলছিস?" দীপু জিজ্ঞেস করল।

"চা-বাগানের হাসপাতালে চোখের ওপর কি অপারেশন হয়? তোরা বল!"

"না, হয় না। সাধারণ অসুখের ওষুধ পাওয়া যায় ওখানে, সামান্য জটিল হলে হয় জলপাইগুড়ি অথবা শিলিগুড়ির হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে যেতে হয়। বিস্তর ঝামেলা বলে গরিব শ্রমিকদের পরিবারের অসুস্থ রোগীকে বাড়িতেই ফেলে রাখতে হয়। চা-বাগানের হাসপাতাল থেকে যা ওষুধ দেয় তাই খাইয়ে আশায় বুক বাঁধতে হয়। আর সেই কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ফল খারাপ হয়।"

এই মেয়েটার চিকিৎসা নিশ্চয়ই হচ্ছে না। কিন্তু এক চোখে ভাল করে না দেখতে পাওয়া সত্ত্বেও ও রোজ ফুটবল খেলা দেখতে আসে কেন, তা বুঝতে পারছিল না অতীনরা। এর আগে ওকে তাদের চোখে পড়েনি। তা ছাড়া আসে যখন, একটা শিশুকে পিঠে বেঁধে নিয়ে আসে, শিশুটা ওর ভাই অথবা বোন নিশ্চয়ই।

আজকের খেলা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়ায় বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়েছিল বুধুয়া আর মাংরা। কিশোর তাদের কাছে ডাকল। জিজ্ঞেস করল, "এই, ওই মেয়েটার চোখের ওপরে কী হয়েছে রে? জানিস তোরা?"

দু'জনেই নিঃশব্দে মাথা নেড়ে না বলল।

"তোদের এক জন ছুটে গিয়ে ওকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়।" পকেট থেকে একটা লজেন্স বের করে দেখাল কিশোর, "বলবি লজেন্স দেব।"

ছেলে দুটো নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে তাকাল। তার পর বুধুয়া দৌড়ে চলে গেল মেয়েটার কাছে। ওরা দেখল, বুধুয়া হাত নেড়ে যত কথা বলছে, ততই মেয়েটা নিঃশব্দে মাথা নেড়ে যাচ্ছে। বুধুয়া যখন নাছোড়বান্দা, তখন মেয়েটা পেছন ফিরে দৌড়তে শুরু করল। চোখের নিমেষে সে দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে বুধুয়া ফিরে এসে বলল, "চলে গেল!"

অতীন জিজ্ঞেস করল, "কী বলল?"

"শুধু না না না বলল।"

মাংরা আর বুধুয়া বাড়ি চলে গেলে খোকন বলল, "খুব ভয় পেয়ে গেছে মেয়েটা। আচ্ছা, আস্তে আস্তে ওর চোখ একদম বুজে যাবে?"

দীপু বলল, "ফোড়া যত বড় হবে, ততই ও দেখতে পাবে না।"

কিশোর বলল, "ওর বাবার পক্ষে নিশ্চয়ই চিকিৎসা করানো সম্ভব নয়। আচ্ছা, আমরা ডাক্তারবাবুকে বলতে পারি না কিছু করার জন্যে?"

"আমরা বললে শুনবে কেন?" মাংরা জিজ্ঞেস করল।

অতীন বলল, "ডাক্তারবাবুকে বলে কোনও লাভ হবে না। বাবা কাল মাকে বলছিল ডাক্তারবাবুর পেটে কিছু হয়েছে। চিকিৎসার জন্যে শিলিগুড়িতে চলে যাবেন কিছুদিনের জন্যে। কম্‌কাকু দায়িত্বে থাকবেন। ওঁকেই বলতে হবে।"

সবাই একমত হল।

চা-বাগানের হাসপাতালটা অনেকটা ভেতরে, অফিসের উল্টো দিকে। পরের দিন সকালে ওরা ছ'জন পায়ে পায়ে চলে এল হাসপাতালে। আসার আগে কেউ বাড়িতে জানিয়ে আসেনি। কারণ, ওরা জানত, জানতে পারলে বাড়ির সবাই আপত্তি করবেন, আসতে দেবেন না। এক জন শ্রমিকের মেয়ের চিকিৎসার জন্যে তারা উদ্যোগী হলে ওঁরা নানা প্রশ্ন করবেন।

কম্‌কাকুর বয়স পঞ্চাশের এপাশে। কোয়ার্টার্সে তাঁর মা ছাড়া আর কেউ নেই। চা-বাগানের সবাই জানে পয়সার অভাবে পড়াশোনা করতে পারেননি বলে কম্‌কাকু ডাক্তার হতে পারেননি। অথচ চা-বাগানের কর্মচারীদের অসুখবিসুখে ওষুধ তিনিই দিয়ে থাকেন। ডাক্তারবাবু শুধু সই করে দেন।

ওদের দেখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা কম্‌কাকু হেসে বললেন, "কী ব্যাপার, হঠাৎ দলবেঁধে হাসপাতালে চলে এসেছ! কার কী হয়েছে?"

দীপু অতীনকে বলল, "তুই বল।"

অতীন বলল, "কাকু, আমরা যখন বিকেলে ফুটবল খেলি তখন একটা বাচ্চা মদেশিয়া মেয়ে দূরে দাঁড়িয়ে খেলা দেখে। ওই মেয়েটার চোখের ওপরে একটা বড় ফোড়া আছে। শুনলাম, ওটা একটু একটু করে বড় হচ্ছে। ওর বাবা এই বাগানে কাজ করে। ওকে কি ওর বাবা চিকিৎসার জন্যে আপনাদের কাছে এনেছিল?"

কম্‌কাকু চোখ ছোট করলেন, "নাম কী?"

"নাম তো জানি না," খোকন জবাব দিল।

"তা হলে... আচ্ছা, বয়স কত?"

"ছয়-সাত।"

"ও।"

"ওর পিঠে একটা বাচ্চা বাঁধা থাকে। কয়েক দিন ধরে তো তাই দেখছি," দীপু বলল।

"ও হো! তাই বলো," কম্‌কাকু হাসলেন, "চিনি। ওর বাবা ওকে কয়েকবার এনেছিল। ওই মেয়েটির নাম উনকি।"

"উনকি?" অতীন অবাক হল।

"হ্যাঁ। ওর জন্মের আগে দুই সন্তান মারা গিয়েছিল বলে বাবা-মা নাম রেখেছিল উনকি। উনকি মানে তো জানো, ভগবানের সন্তান। ওঁর মেয়ে। কিন্তু উনকির জন্যে তোমরা এসেছ কেন?"

অতীন বলল, "আমরা যখন ফুটবল খেলি তখন উনকি পিঠে বাচ্চাটাকে বেঁধে দূরে দাঁড়িয়ে দেখে। আমাদের মনে হল ক'দিন পরে মেয়েটা আর-একটা চোখে দেখতে পাবে না। তাই আপনার কাছে এসেছি যদি ওর চিকিৎসা হয়।"

কম্‌কাকু মাথা নাড়লেন, "এখানে আমাদের পক্ষে ওর চিকিৎসা করার কোনও উপায় নেই। ওকে নিয়ে যেতে হবে জলপাইগুড়ি অথবা শিলিগুড়ির হাসপাতালে। অবশ্য যদি কলকাতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত, তা হলে সবচেয়ে ভাল হত। কিন্তু সেই সব করতে যে-টাকার প্রয়োজন হবে, তা খরচ করার ক্ষমতা ওর বাবার নেই। তাই ওর চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়নি।"

"বড়সাহেবকে বললে হয় না?" খোকন জিজ্ঞেস করল।

কম্‌কাকু হেসে মাথা নাড়তে গিয়েও থেমে গেলেন। কারণ, ঠিক তখনই এই চা-বাগানের বড়সাহেব একজনকে কিছু বলতে বলতে এদিক দিয়ে যেতে যেতে ওদের দেখে থমকে গেলেন। তার পর দিক পাল্টে চলে এলেন হাসপাতালের সামনে, "কী ব্যাপার? এনি প্রবলেম? এরা কারা?" বড়সাহেবকে দেখেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত কচলাচ্ছিলেন কম্‌কাকু। বললেন, "এরা এই চা-বাগানের স্টাফদের ছেলে। সবাই খুব ভাল ছাত্র।"

"এখানে কি আপনি ওদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছেন?" বড়সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

"না স্যার। ওরা এক জনের চিকিৎসার জন্যে অনুরোধ নিয়ে এসেছে।"

"অ্যাঁ! নতুন ব্যাপার। কার চিকিৎসা দরকার?"

"একটা বাচ্চা মেয়ের। ওর কপালে একটা বড় ফোঁড়া হয়েছে, কিন্তু এটা না ফেটে চোখ বন্ধ করে দিচ্ছে।"

"কোথায় থাকে?"

"কুলি লাইনে। ওর বাবা শনিচর এই বাগানে কাজ করে। কিন্তু মেয়ের চিকিৎসা করানোর ক্ষমতা শনিচরের নেই। ওর চিকিৎসার জন্যে জলপাইগুড়ি অথবা শিলিগুড়িতে নিয়ে যেতে হবে। সেটা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।"

"অ। তা এরা কেন এসেছে? কী সাহায্য করবে এরা?"

"এখনও বলেনি। এইমাত্র এসেছে।"

কম্‌কাকুর কথা শুনে বড়সাহেব ছেলেদের দিকে তাকালেন, "তোমরা ওই মেয়েটাকে কত দিন ধরে চেনো?"

কিশোর বলল, "চিনি, ও আমাদের খেলা দেখতে আসে।"

"কী নাম মেয়েটার?"

"উনকি," অতীন জবাব দিল।

"উনকি? এই শব্দের মানে কী?" কপালে ভাঁজ পড়ল বড়সাহেবের।

কম্‌কাকু উনকি কথার অর্থ ব্যাখ্যা করে বললেন।

একটু ভেবে বড়সাহেব বললেন, "ডেকে পাঠাও মেয়েটার বাবাকে," কথাগুলো বলে বড়সাহেব ফিরে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেদের দিকে তাকালেন, "গুড। আমি তোমাদের এই কাজকে সম্মান জানাচ্ছি। গুড, ভেরি গুড। আমি মেয়েটার বাবার সঙ্গে কথা বলে কী করা যায় তা ঠিক করছি," বড়সাহেব চলে গেলেন।

বড়সাহেব চলে গেলে কম্‌কাকু বললেন, "তোমরা যে-জন্যে এসেছ সেই কাজটা মনে হচ্ছে হয়ে যাবে।"

ছেলেরা বড়সাহেবের কথা শুনে খুশি হয়েই ছিল। এবার মাথা নেড়ে বাড়ির দিকে ফিরে চলল। খোকন বলল, "ভাগ্যিস ডাক্তারবাবু ছিলেন না, থাকলে হয়তো বড়সাহেব কথাগুলো জানতেই পারতেন না।"

ওরা মাথা নাড়ল।

বিকেলের খেলা শুরুর আগে বুধুয়া এক জন রোগা মাঝবয়সি মদেশিয়া প্রৌঢ়কে নিয়ে এসে বলল, "এ হল উনকির বাবা। তোমাদের সঙ্গে কথা বলবে।"

প্রৌঢ়, যার নাম শনিচর, সে হাতজোড় করল, "আপনাদের আমি কী বলে ধন্যবাদ জানাব জানি না। আমার তো ক্ষমতা ছিল না। আপনারা বলেছেন বলেই বড়সাহেব কাল সকালে আমাদের জলপাইগুড়িতে

পাঠাচ্ছেন উনকির চিকিৎসার জন্য।"

শোনামাত্র খুশি হয়ে হাততালি দিল ছেলেরা। দীপু বলল, "আমি ভাবতেই পারিনি বড়সাহেব আমাদের মতো ছোট ছেলেদের কথা শুনে ওই মেয়েটার উপকার করবেন।"

শনিচর খুব অবাক হয়ে ওদের দেখছিল। যখন এই চা-বাগানের কেউ তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি, তখন এই বাচ্চা ছেলেগুলো উনকির চিকিৎসার কথা বড়সাহেবকে বলেছে। তার মনে হচ্ছিল, ভগবান বলে কেউ নিশ্চয়ই আছেন, নইলে এইরকম ঘটনা কী করে ঘটবে!

শনিচর ফিরে গেলে ওরা খেলা শুরু করেছিল। আজ খেলতে খুব ভাল লাগছিল। খেলতে খেলতে ওরা সবাই মাঠের বাইরেটা দেখছিল। যেখানে রোজ বাচ্চাটাকে পিঠে নিয়ে উনকি দাঁড়িয়ে থাকত, সেখানে আজ দু'-তিনটে বাচ্চা দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে। উনকি আজ আসেনি। হয়তো কাল জলপাইগুড়িতে যেতে হবে বলে আজ তাকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হয়নি। এখানকার হাইওয়ে থেকে বাসে উঠে এক ঘণ্টা যাওয়ার পর তিস্তা নদী পড়বে। সেখানে নৌকোর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। নৌকো যাত্রীদের যেখানে নামিয়ে দেয় সেখান থেকে ওপারের ঘাট পর্যন্ত হেঁটে যেতে হয় বেশির ভাগ সময়। তবে বর্ষার সময় ওই ঘাট পর্যন্ত নৌকো যায়। ছেলেদের বেশির ভাগই বাবা-মায়ের সঙ্গে ওই পথে জলপাইগুড়িতে গিয়ে বেড়িয়ে এসেছে কয়েকবার। ও-পারে পৌঁছনোর পর কত দূর গেলে হাসপাতালে পৌঁছনো যাবে, তার কোনও ধারণা ওদের নেই।

পরের দিন খেলতে খেলতে ওরা দেখল, যে-জায়গায় উনকি এসে রোজ দাঁড়াত, সেখানে কেউ আসেনি। খেলার শেষে মাঠের মাঝখানে বসে দীপু বলল, "এতক্ষণে নিশ্চয়ই উনকির কপাল থেকে ফোড়াটা ডাক্তার কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। মা বলছিল খুব বড় অপারেশন হবে। তাই অজ্ঞান করে করা হবে। জ্ঞান এখনও ফেরেনি বোধহয়।"

কেউ জানে না কী হচ্ছে জলপাইগুড়ির হাসপাতালে। হঠাৎ কিশোর বলল, "আচ্ছা, অপারেশনের পর উনকির জ্ঞান যদি ফিরে না আসে?"

প্রশ্নটা শোনামাত্র সবাই হকচকিয়ে গেল। এটা তো তারা কেউ ভাবেনি। দীপু বলল, "কী উল্টোপাল্টা ভাবছিস। এই, আমি বাড়ি যাচ্ছি।"

বন্ধুরা কিছু বলার আগেই দীপু হনহনিয়ে তার বাড়ির দিকে চলে গেল।

পরের দিন বুধুয়া খেলতে আসামাত্র ওরা জিজ্ঞেস করল, উনকির কী খবর। যেহেতু উনকির বাড়ি উল্টোদিকের লাইনে, তাই ওর কোনও খবর জানা নেই ওদের। অতীন বলল, "আজ খেলতে একটুও ইচ্ছে করছে না। উনকির বাড়িতে গিয়ে খবর নিয়ে এলে কেমন হয়। যাবি?"

সঙ্গে সঙ্গে সবাই রাজি হয়ে গেল। বুধুয়া আর মাংরা ওদের পথ চিনিয়ে নিয়ে গেল নদীর পার হয়ে। নদীর এপাশের কুলি লাইনগুলোয় ওদের কখনও আসা হয়নি। এত কাছে, তবু নয়। অভিভাবকরা কেউ নিষেধ করেনি, কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পরই না-যাওয়ার যে অভ্যেস তৈরি হয়েছিল, সেটাই এত দিন চলে আসছিল। ছোট ছোট ঘর, বাচ্চারা খালি গায়ে চিৎকার করে খেলছে। দেখলেই বোঝা যায়, এখানে যারা থাকে তাদের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল নয়।

মাংরা এগিয়ে গিয়ে একটা ঘরের সামনে দাঁড়ানো মহিলাকে কিছু বললে মহিলা ওদের দিকে তাকালেন। এর মধ্যে বেশ কিছু শিশু এবং বাচ্চা ছেলেমেয়ে ভিড় জমিয়ে কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে। অতীন কয়েক পা এগিয়ে মহিলাকে হিন্দিতে বলার চেষ্টা করল, "উনকি কি এই বাড়িতে থাকে?"

মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বললেন মহিলা, তার পর প্রশ্ন করলেন, "কী হয়েছে?"

"উনকি কি জলপাইগুড়ি থেকে ফিরে এসেছে?" আবার প্রশ্ন করল অতীন। মাথা নাড়লেন মহিলা, "না, আমাকে কেউ কোনও খবর দেয়নি। আমি ওর মা, অথচ আমি কিছুই জানি না," বলতে বলতে আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন মহিলা।

ভিড় বাড়ছিল। কেউ কিছু বলতে পারছিল না। দীপু বলল, "এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোনও লাভ নেই, এখানে কোনও খবর পাওয়া যাবে না। এক কাজ কর, চল, কম্‌কাকুর কাছে যাই। উনি নিশ্চয়ই সব জানেন।"

কথাটা মনে ধরল এবার।

এখন সন্ধে হব হব। ওরা নদী পার হয়ে বাড়ির কাছাকাছি হতেই সাইকেলগুলোকে দেখতে পেল। চা-বাগানের অফিস ছুটি হয়ে গেছে। সবাই বাড়ি ফিরছে। সবার শেষে আসছেন কম্‌কাকু। তাঁকে দেখে খোকন চেঁচিয়ে ডাকল, "কম্‌কাকু।"

ডাকটা শুনে সাইকেলে ব্রেক চেপে দাঁড়িয়ে গেলেন কম্‌কাকু। ওরা কাছে এলে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে। কী ব্যাপার?"

"উনকির মা কিছু জানে না, মেয়ের কোনও খবর পায়নি। আপনি কি জানেন ডাক্তার কী বলেছেন?" জিজ্ঞেস করল অতীন।

"হ্যাঁ। ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে নেওয়া হয়েছে। কাল সকালে ওর অপারেশন হবে। ডাক্তার বলেছেন ভয়ের কিছু নেই। আমি ওর মাকে খবরটা একটু আগে পাঠিয়েছি। এখনই পেয়ে যাবেন," কথাগুলো বলে কম্‌কাকু সাইকেল চালিয়ে চলে যেতে যেতে বললেন, "ওর খুব উপকার করেছিস তোরা।"

কম্‌কাকু চোখের আড়ালে চলে গেলে কিশোর বলল, "আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। উপকার করলে যে এত আনন্দ লাগে তা আগে জানতাম না।"

শুনে বাকিরা মাথা নাড়ল, ঠিক ঠিক।

তিনদিন পরে বুধুয়া খেলতে এসে জানাল উনকিকে নিয়ে তার বাবা ফিরে এসেছে।

"কেমন আছে ও?"

"তা জানি না। ওর বাবা তো কিছুই বলল না।"

কিন্তু পরের দিন ওর বাবা নিজে এসে আবার অনেক ধন্যবাদ দিল সবাইকে। তার কাছ থেকে ওরা জানল ডাক্তার এখন ওকে ঘরে থাকতে বলেছেন। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা থাকবে। দশ দিন পরে আবার হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারকে দেখাতে হবে। উনকির বাবা আরও জানাল, ওদের জন্যেই বড়সাহেব দয়া করে কাজ না-করা সত্ত্বেও মাইনে না-কাটার হুকুম দিয়েছেন।

উনকির বাবা শনিচর জানাল, "ডাক্তার মেয়েকে ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন, এই ক'দিন চোখের ওপর থেকে ব্যান্ডেজ খোলা যাবে না।"

এই খবর শুনে ছেলেরা খুশি হল। উনকির বাবা চলে গেলে অতীন বলল, "আমার একটা কথা খুব মনে হচ্ছে রে। এই যে মেয়েটার অপারেশন হল, তা তো ওর বাবা খরচ করে করাতে পারতেন না। বড়সাহেব সাহায্য করেছেন বলে ওই মেয়েটা স্বাভাবিক ভাবে দেখতে পাবে। এই জন্য বড়সাহেবকে ধন্যবাদ জানানো উচিত।"

সবাই চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। চা-বাগানের ম্যানেজারেরা কাজের বাইরে স্টাফদের সঙ্গে কথা বলেন না। তাদের কোয়ার্টার্সে সামাজিক কারণে যাওয়া-আসা করেন না। অতীনের বাবা এবং তাঁর সহকর্মী ম্যানেজারদের সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলেন। যেদিন ওরা হাসপাতালে গিয়ে কম্‌কাকুর সঙ্গে কথা বলার সময় বড়সাহেবের মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিল, সেদিন বাড়ি ফিরে ওরা ওদের বাবা-মাকে খবরটা জানায়নি। জানলে তাঁরা খুব বিরক্ত হতেন। ভয় ছিল, কম্‌কাকু হয়তো বলে দেবেন কেন ছেলেরা হাসপাতালে এসেছিল। কিন্তু এই কথা কম্‌কাকু কাউকে বলেননি।

তাই ওরা বলাবলি করছিল, বড়সাহেব নিশ্চয়ই দেখা করবেন না। উল্টে বিরক্ত হয়ে কটু কথা বলবেন। তার চেয়ে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা যদি জানাতেই হয়, তা হলে তা কম্‌কাকুকেই জানানো উচিত।

কম্‌কাকু বাড়িতে ফেরেন সন্ধে হব হব সময়ে, অন্য স্টাফরা বাড়ি ফিরে আসার পরে সেই সময়ে বাড়ির অল্পবয়সিদের বাইরে থাকা প্রায় নিয়মবিরুদ্ধ। তাই ওরা তার আগেই যে যার বাসায় ফিরে যায়।

কিন্তু আজ নিয়ম ভাঙল ওরা। কম্‌কাকুকে দেখে ওরা একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। দীপু বলল, "কাকু, উনকির বাবা এসে বলল ওর অপারেশন ভাল হয়েছে। আবার দশ দিন পরে ওরা জলপাইগুড়িতে যাবে ডাক্তার দেখাতে। এই উপকারটা আপনি আমাদের কথায় করে দিয়েছেন। আমরা আপনার কথা কোনও দিন ভুলব না।"

"আরে দূর! তোরাই তো দল বেঁধে উনকির উপকার করার জন্যে এলি। আচ্ছা, উনকিকে তোরা কতদিন ধরে চিনিস?" কম্‌কাকু জিজ্ঞেস করলেন।

"এই তো কিছুদিন," অতীন বলল, "আমরা আগে ওকে কখনও দেখিনি। একটা বাচ্চাকে পিঠে বেঁধে নিয়ে এসে দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের খেলা দেখত, কোনও দিন কথা বলেনি।"

"বাহ্। খুব ভাল করেছিস তোরা," কম্‌কাকু কথাগুলো বলতে বলতে রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়ালেন।

বাগানের ভেতর থেকে একটা গাড়ি আসছে। গাড়িটা যেন ওদের দেখেই দাঁড়িয়ে গেল। ওরা দেখল গাড়ি চালাচ্ছেন স্বয়ং বড়সাহেব, "আবার তোমরা! এবার তোমাদের প্রবলেম কী?" ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। বড়সাহেব এই বিশাল চা-বাগানের সর্বময় কর্তা। তাঁর মুখের ওপর কথা বলতে স্টাফরাও সাহস পায় না।

কম্‌কাকু বললেন, "ওই মদেশিয়া বাচ্চা মেয়েটির অপারেশন ভাল ভাবে হয়ে গেছে বলে এরা ধন্যবাদ জানাতে এসেছে।"

"আই সি!" বড়সাহেবের কপালে ভাঁজ পড়ল, "কিন্তু মদেশিয়া বাচ্চা মেয়ের জন্যে এরা এত চিন্তা করছে কেন? ইন্টারেস্ট কী?"

জবাব দিতে পারলেন না কম্‌কাকু, তাই দেখে সাহস করে মুখ খুলল অতীন, "ওই মেয়েটা রোজ লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের খেলা দেখত। দূর থেকে আমরা দেখতাম ওর চোখের ওপর একটা বড় ফোঁড়া আরও বড় হয়ে চোখ ঢেকে দিচ্ছে। ওর বাবার ক্ষমতা নেই মেয়ের চিকিৎসা করানোর, তাই আমরা এসে ওঁকে বলেছিলাম কিছু একটা করার জন্যে।"

"আচ্ছা, তোমার নাম কী?"

"অতীন, অতীন বসু।"

মাথা নাড়লেন বড়সাহেব, "গুড, মেয়েটা নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে। তোমরা যা করার তা যথেষ্ট করেছ। নাউ, ফরগেট ইট। মন দিয়ে পড়াশোনা করো," গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন বড়সাহেব।

কম্‌কাকু বড় শ্বাস শব্দ করে ফেলে বললেন, "হল তো। তোরা আর এই নিয়ে মাথা ঘামাস না। বড়সাহেব মুখে বললেন না কিন্তু বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে, তোদের এই ব্যাপারে আর মাথা না ঘামানোই উচিত। যা, বাড়ি যা।"

কম্‌কাকু চলে গেলে সবাই অতীনকে নিয়ে আফসোস করতে লাগল। বড়সাহেব জিজ্ঞেস করায় নাম না বলে উপায় ছিল না, কিন্তু তিনি যদি অতীনের বাবাকে ডেকে ছেলের ব্যাপারে সর্তক করে দেন, তা হলে যে কী হবে তা ভেবে পাচ্ছিল না ওরা। হয়তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে খেলতে যাওয়াই বারণ হয়ে যাবে। শুধু অতীন কেন, ওর বাবা অন্য ছেলেদের অভিভাবকদের কানেও কথাটা তুলে দেবেন। তার পর শুরু হয়ে যাবে শাসন। ওরা যে যার বাড়িতে ফিরে গেল।

কিন্তু পরের দিন অফিস থেকে ফিরে এসেও বাবা ডেকে শাসন করলেন না দেখে অতীন অবাক হল।

ছুটি শেষ হয়ে আসছে। এবার যে যার স্কুলে চলে যাবে। তাই সকলের বেশ মন খারাপ। এর পরের বড় ছুটি চারমাস পরে। তার আগে চা-বাগানের বাড়িতে আসা যাবে না। দু'-তিন দিনের ছুটিতে তাদের বাড়িতে আসতে দেওয়া হয় না। অথচ কতটুকুই বা রাস্তা, বড়জোর দু'-তিন ঘণ্টা।

কিন্তু মন খারাপ সবচেয়ে বেশি কার্তিকের। ওর বাবার ক্ষমতা নেই বলে দূরের স্কুলে যেতে পারেনি, সাত মাইল দূরের বাজারহাটে বিনা পয়সায় যাতায়াত করে। কোনও দিন বাসে যদি অচেনা নতুন কন্ডাক্টর থাকে, তা হলে তাকে কটু কথা শুনতে হয়। তখন মন খারাপ হয়ে যায় কার্তিকের। তার বন্ধুরা, যাদের সে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখে আসছে, তারা শহরের বড় স্কুলে পড়ে। কারণ, তাদের ক্ষমতা আছে সেখানে পয়সা খরচ করে থাকার। তার বাবা খুব সামান্য চাকরি করে। এই চা-বাগানে কাঠের কাজ করে। ওরা থাকে একটু দূরে চা-বাগানের গায়ে তৈরি করা কতগুলো কোয়ার্টার্সের একটায়। যত দিন বাবার চাকরি থাকার, তত দিন ওখানে থাকতে পারবে কার্তিকরা।

এই যে বন্ধুরা চলে যাবে, তা ভাবতেই খারাপ লাগে কার্তিকের। কিন্তু কিছুই করার নেই তার। বাসভাড়া দিতে বাধ্য হলে তাকে বাজারহাটের স্কুলে পড়তে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। অতি সামান্য আয়ের চাকরি করে বাবার পক্ষে তার পড়ার জন্য খরচ চালানো সম্ভব নয়। তার আরও দুই ভাই এখানকার পাঠশালায় পড়ে। ওরা একটু বড় হলে কোথায় গিয়ে পড়বে, তা কেউ জানে না।

ডাক্তারবাবু খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর স্ত্রী এবং শালা চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় নিয়ে গেলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। বাঁচানো গেল না তাঁকে। খবরটা চা-বাগানে ছড়িয়ে পড়লে সবাই দুঃখিত হল, কিন্তু শোকে ভেঙে পড়ল না। কম্পাউন্ডারবাবুর ওপর ডাক্তারবাবু বেঁচে থাকতেই বেশ চাপ ছিল, মারা যাওয়ার খবরটা প্রচারিত হওয়ার পর সেটা যেন আরও বেড়ে গেল। সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। কোম্পানির হেডঅফিস থেকে নতুন ডাক্তার নিয়োগ করা হল প্রায় দেড়মাস পরে।

নতুন ডাক্তার এলেন সপরিবার। এক মেয়ে এবং স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। মেয়েটি হোস্টেলে থাকবে। যত দিন হোস্টেল না পাচ্ছে তত দিন চা-বাগানের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে, যাতে পিছিয়ে না পড়ে।

নতুন ডাক্তারের কথাবার্তা ব্যবহার সকলের ভাল লাগল। কম্‌কাকুও ভদ্রলোকের প্রশংসা করলেন খুব। যেহেতু চা-বাগানের এদিকে, বাবুদের কোয়ার্টার্সের সামনে কোনও দোকানপাট নেই, লোকজনও যাতায়াত করে না, তাই জায়গাটা খুব শান্ত হয়ে থাকে। এখন অতীন আর তার বন্ধুরা এখানে নেই। মাঠে কারও হইহই চেঁচামেচি শোনা যায় না। তাই এমন শান্ত এলাকায় মেয়েকে ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা দিতে আপত্তি করেননি নতুন ডাক্তারের স্ত্রী।

এর আগে কোনও দিন গাছে চড়েনি নতুন ডাক্তারের মেয়ে সুজাতা। ক'দিন ধরে গাছটাকে দেখতে দেখতে শেষ পর্যন্ত আজ চেষ্টা করল। গোড়ার দিকের ডাল ধরে ওপরে উঠে আসতে একটু শক্তির প্রয়োজন হল বটে, কিন্তু ওপরের ডালে উঠে তার মন খুব ভাল হয়ে গেল। অনেকটা দূর পর্যন্ত সে দেখতে পাচ্ছে। দুটো পাখি কাছাকাছি ডালে বসে ভয়ে ভয়ে তাকে লক্ষ করছিল। সুজাতা ধমক দিতেই তারা হুড়মুড়িয়ে ডানা মেলে পালিয়ে গেল।

সুজাতা চারপাশে তাকাল। হাইওয়েটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, একটা হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরা ছেলে যেতে যেতে তার দিকে বেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। বোধহয় তাকে এখানে আশা করেনি।

সুজাতা চোখ ফেরাল। ছেলেটার নিশ্চয় ভাল জামা বেশি নেই, তাই ওই গেঞ্জি পরেই বাইরে বেরিয়েছে। সে নীচে নামার জন্যে পা বাড়াল, কিন্তু নীচের ডালটা পায়ের সামনে না থাকায় সে খুব ঘাবড়ে গেল। ওপরের ডাল থেকে নীচে নামবে কী করে? সুজাতা মুখ তুলে অন্য ডালগুলো দেখল। ওপরে ওঠার সময় বুঝতে পারেনি নীচের ডালের নাগাল পাওয়া মুশকিল হবে। এখন কী করা যাবে? চিৎকার করে লোকজন ডাকবে? কিন্তু এই নির্জন মাঠের আশপাশে কোনও

মানুষ দেখা যাচ্ছে না। সুজাতা মুখ ফিরিয়ে দেখল, হাইওয়ের ধারে সেই গেঞ্জি পরা ছেলেটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। মরিয়া হয়ে সে হাত নেড়ে ছেলেটাকে কাছে ডাকল। ছেলেটা কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না।

কার্তিক বেশ অবাক হল। হাফ প্যান্ট গেঞ্জি পরে সে সাধারণত এদিকে আসে না। বন্ধুরা যে যার পড়ার জায়গায় চলে যাওয়ার পরে সে এদিকে আসেও না। আজ তার মা নুন কিনে আনতে পাঠানোয় গেঞ্জি পরেই চলে এসেছে।

কার্তিক ভেবে পাচ্ছিল না ওই মেয়েটা কে? জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ওই মাঠেই সে বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলো করে বড় হয়েছে। কখনও ওই রকম মেয়েকে সে দেখেনি। মেয়েটা আবার হাত নাড়ল। তাকেই ডাকছে, কিন্তু কে? কার্তিক একটু ইতস্তত করে এগিয়ে গেল।

গাছের কাছে পৌঁছে ওপরে তাকাতেই সুজাতা বলল, "তুমি বাংলা বোঝো?"

নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল কার্তিক।

"তা হলে একটা সিঁড়ি নিয়ে এসো, আমি ওপর থেকে নামব।"

"আমি সিঁড়ি কোথায় পাব!" মিনমিনে গলায় বলল কার্তিক।

"তুমি তো এখানে থাকো, জানো না কার বাড়িতে মই আছে?"

মাথা নেড়ে কার্তিক জানাল সে জানে না।

"সর্বনাশ! তা হলে আমি কী করে নামব!" ভয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সুজাতা। তার পর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "এই হাঁদারাম, দাঁড়িয়ে দেখছ কী? ডাকো, সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো। আমি ডাক্তারবাবুর মেয়ে। তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ?"

"ওখান থেকে তো লাফ দিয়ে নীচে নেমে আসা যায়," কার্তিক বলল।

"ও! তুমি বাঙালি!" তার পর নীচের দিকে তাকিয়ে বলল, "এখান থেকে লাফ দিলে আমার পা ভেঙে যাবে।"

"কিছু হবে না। তুমি যে-ডালটার ওপর বসে আছ, সেটা দু'হাতে ধরে নীচে ঝুলে পড়ো, তার পর হাত দুটো ছেড়ে দাও," কার্তিক বলল।

"অসম্ভব!" মাথা নাড়ল সুজাতা।

"তা হলে তুমি ওখানেই বসে চিৎকার করো, আমি চললাম।"

"আরে, দাঁড়াও দাঁড়াও। উঃ ভগবান!" কোনওরকমে ডালটার ওপর বসে দুটো হাত দিয়ে সেটা আঁকড়ে ধরে দুটো পা নীচের দিকে নামিয়ে দিতেই কার্তিক চেঁচিয়ে বলল, "হাত ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।"

শরীরের ওজন দুই হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে পারল না সুজাতা। তার দেহ ওপর থেকে নীচে নেমে এল। দুটো পা মাটি ছোঁয়া মাত্র হাঁটু মুড়ে গেল, ঊর্ধ্বাঙ্গ উপুড় হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়তে পড়তে সে দুই হাত বাড়িয়ে মাটি ধরতেই যে-ঝাঁকুনি খেল সেটা তেমন তীব্র নয়। কোনওরকমে ধাক্কা সামলে সে একপাশে কাত হয়ে পড়ল। কার্তিক এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "লাগেনি তো?"

চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ থাকার পরে ধীরে ধীরে উঠে বসল সুজাতা। তার পর মাথা নেড়ে বলল, "লাগেনি," নিজের জামাকাপড়ের ধুলো ঝাড়তে লাগল সে।

একটু ইতস্তত করে কার্তিক জিজ্ঞেস করল, "তোমাকে তো আগে দেখিনি, কোন বাড়িতে এসেছ?"

"আমি ডাক্তারবাবুর মেয়ে।"

"ও! নতুন ডাক্তারবাবুর। আচ্ছা, চলি," পা বাড়াল কার্তিক।

"শোনো," গলা তুলে ডাকল সুজাতা, "তোমার নাম কী?"

"কার্তিক। কার্তিক দাস।"

"কী করো তুমি?"

"স্কুলে পড়ি। বাজারহাটের স্কুলে। তোমার নাম কী?"

"আমি সুজাতা।"

সুজাতা দেখল আর কথা না বলে কার্তিক হাইওয়ের দিকে চলে গেল। এই ক'দিন সে লক্ষ করেছে এই চা-বাগানে অনেক কর্মচারী থাকতে পারেন, কিন্তু তার বয়সি ছেলেমেয়ের দেখাই পাওয়া যায় না। অর্থাৎ তাদের বন্ধু হিসেবে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এই যে ছেলেটা যার নাম কার্তিক, তার পোশাক অথবা নাম থেকেই বোঝা যায় এরা কীরকম।

কিন্তু পরপর কয়েকদিন ঠিক ওই সময়ে মাঠে ঘোরাফেরাও করে সুজাতা, কিন্তু কার্তিকের দেখা পেল না সে।

পরের ছুটিতে বন্ধুরা যে যার বাড়িতে ফিরে এসে অবাক হয়ে শুনতে পেল কার্তিকের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যেসব বাস এই রুটে যাওয়া-আসা করে তারা বিনা ভাড়ায় ছাত্রছাত্রীদের বাসে যাতায়াত করতে দিতে রাজি নয়। তাছাড়া পড়াশোনা খুব খারাপ হচ্ছিল বলে স্কুলের শিক্ষকরা বেশ অসন্তুষ্ট হচ্ছিলেন। শেষপর্যন্ত ওর বাবা মামার দোকানে বসিয়ে দিলেন ওকে। কুলি লাইনের ভেতরে কার্তিকের মামার মুদির দোকান। তার খদ্দেরদের বেশির ভাগই চা-বাগানের শ্রমিকরা। তারা দুই আনার লবণ থেকে বড়জোর আটআনার তেল কিনে নিয়ে যায়। চা-বাগানের উল্টোদিকে হাইওয়ের থেকে একটু ভেতরে মামার টিনের ছাদ আর কাঠের দেওয়াল কোনওরকমে খাড়া হয়ে আছে। সব শুনে মামা বলল, "কোনও চিন্তা করবেন না। আমি ওকে কাজ শিখিয়ে নেব। পড়াশোনা করে কী হবে? চাকরি তো পাবে না, বরং দোকানদারিটা শিখতে পারলে অন্নের অভাব হবে না। ভেতরে আয় কাতু।" খুব কান্না পাচ্ছিল কার্তিকের। কিন্তু তার কিছু তো করার ছিল না।

ছুটিতে চা-বাগানের বাড়িতে ফিরে আসার দু'দিনের মাথায় ওরা এক হয়ে বিকেলে চাঁপা ফুলের গাছের নীচে বসে যখন গল্প করছে, তখনও তারা জানে না যে, কার্তিক আর খেলতে আসবে না। দোকান ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি সে পাবে না। তাকে কাজ শিখতে হবে। মুদিখানার সমস্ত জিনিসের দাম মুখস্থ রাখতে হবে।

কার্তিকের খোঁজ করতে ওরা বিকেলবেলায় চলে এল আধ মাইল দূরে, হাইওয়ের পাশে ওদের মুদির দোকানে। এসে দেখল পেছনে ওর মামা ক্যাশবাক্সের পেছনে বসে আছেন আর কার্তিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে কিছু প্যাকেট ভরে ফেলছে। আর তার সামনে কাউন্টারের এ পাশে কয়েকজন খদ্দের দাঁড়িয়ে আছে, যাদের অধিকাংশই চা-বাগানের শ্রমিক পরিবারের মানুষ। কাছে যেতেই তাদের ওপর নজর পড়ল কার্তিকের।

কার্তিক তার মামার দিকে তাকাল। মামা একটু গম্ভীর হল। কিন্তু পরে বোধহয় মন বদলাল, "যাও, বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে এসো। কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশি নয়। আর ওদের বলে দাও কাজের সময় যেন না আসে।"

হাসি ফুটল কার্তিকের মুখে। দ্রুত পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে সে চলে এল বন্ধুদের কাছে। আসামাত্র অতীন প্রশ্ন করল, "তোর ডিউটি কতক্ষণ?"

"ঠিক নেই," মাথা নাড়ল কার্তিক, "তোরা কবে এলি?"

দীপু বলল, "এই তো এলাম, কিন্তু তুই কি আর স্কুলে যাবি না?"

"আমি আর স্কুলে যাব না রে!" মাথা নিচু করল কার্তিক।

"সে কী! কেন?"

"রোজ বাস ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতা বাবার নেই।"

বন্ধুরা পরস্পরের দিকে তাকাল। জলপাইগুড়ি শিলিগুড়িতে নয়, সাতমাইল দূরের বাজারহাটে যাওয়ার বাস ভাড়া দিতে কেন অসুবিধে, তা তাদের মাথায় ঢুকছিল না। কিশোর জিজ্ঞেস করল, "তোর দোকানের কাজে ছুটি নেই?"

"ছুটি নিয়ে আমি কী করব?" তাকাল কার্তিক।

"মানে! সারা মাস ধরে কাজ করবি?" খোকন জিজ্ঞেস করল।

"আর কী করব! তোরা পড়তে চলে গেলে আমার খেলার তো কোনও সঙ্গী থাকবে না। চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে দোকানে থাকা ভাল।"

কার্তিকের কথা শেষ হওয়া মাত্র দোকানের ভেতর থেকে মামার

গলা ভেসে এল, “কাতু, পাঁচ মিনিট হয়ে গিয়েছে।”

“আমি যাই রে। কাল বিকেলে খেলতে যাওয়ার খুব চেষ্টা করব,” কথাগুলো বলেই সোজা চলে গেল কার্তিক।

বন্ধুরা গম্ভীর মুখে ফেরার পথ ধরল। খুব কষ্ট হচ্ছিল ওদের।

অতীন বলল, “একটা কাজ করলে কেমন হয়, চল আমরা হরনাথ দাদুর কাছে যাই। ওঁর তো দুটো রুটের বাস আছে, উনি যদি বলে দেন, তা হলে কার্তিকের কাছে কন্ডাক্টর বাসের ভাড়া নিশ্চয়ই চাইবে না। কী মনে হয় তোদের?”

বন্ধুরা প্রথমে বুঝতে পারছিল না কী করা উচিত। দীপু মাথা নেড়ে বলল, “কার্তিককে জিজ্ঞেস না করে যাওয়াটা ঠিক হবে না। এখন তো ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না, কাল এক বার এসে জিজ্ঞেস করব।”

বাকিরাও ওকে সমর্থন করায় অতীন কথাটা মেনে নিল।

ওরা যখন কোয়ার্টার্সের সামনের মাঠে ফিরে এল, তখন দেখল তাদের কাছাকাছি বয়সের একটি মেয়ে ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টার্সের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এইরকম চেহারার এবং বয়সের মেয়ে চা-বাগানে তো দূরের কথা, পাশের গঞ্জ এলাকাতেও ওরা দেখেনি।

অতীন জিজ্ঞেস করল, “কে রে!”

কেউ জবাব দিল না। কারণ, কেউ সুজাতাকে আগে কখনও দেখেনি।

কৌতূহলী হয়ে ওরা সুজাতার কাছে চলে এল। কিশোর জিজ্ঞেস করল, “তুমি কে? কোন বাড়িতে এসেছ?”

“আমি সুজাতা। আমার বাবা এই চা-বাগানের ডাক্তার। তাই এখানে এসেছি,” বেশ গম্ভীর মুখে কথাগুলো বলে সে জিজ্ঞেস করল সে, “তোমরা কারা?”

প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলল কিশোর, “আমরা এখানেই জন্মেছি, বড় হয়েছি। এখন শহরের স্কুলে পড়াশোনা করি। প্রত্যেকটা বড় ছুটিতে এখানে আসি।”

“ও।”

খোকন জিজ্ঞেস করল, “তুমি কোথায় পড়াশোনা কর?”

“আমি কোচবিহারে পড়তাম। বাবা এখানে চাকরি নিয়ে এসেছেন বলে আমাকে জলপাইগুড়ির সুনীতিবালা গার্লস স্কুলে ভর্তি করে দেবেন।”

এইসময় পেছনের কোয়ার্টার্সের সদর দরজা খুলে গেল। এক জন মহিলা দেখা দিয়ে বলল, “দিদি, মা তোমাকে ডাকছেন।”

শোনামাত্র ও দাঁড়াল না। খোকন হাঁটতে হাঁটতে বলল, “কোচবিহারের মেয়ে তো, তাই ওর মা বোধহয় আমাদের সঙ্গে কথা বলা পছন্দ করছে না।”

দীপু নিচু গলায় বলল, “তাতে আমাদের বয়েই গেল।”

এবার জলপাইগুড়ি থেকে আসার আগে একটা মোটা রবারের বল কিনেছিল অতীন। ঠাকুরমাকে অনেক অনুরোধ করে তবেই বলটা পেয়েছিল। সেই বল নিয়ে পরের দিন ওদের খেলা শুরু হয়ে গেল। বুধুয়া আর মাংরা ঠিক সময়ে চলে এসেছে। ওরা কীভাবে খবর পেল জিজ্ঞেস করলে বুধুয়া বলল, “তোমরা মুদির দোকানে গিয়েছিলে শুনে খবর নিতে গেলাম। কার্তিক বলল, কথাটা ঠিক।”

খেলা যখন কিছুক্ষণ গড়িয়েছে তখন প্রথমে দীপুর চোখে পড়ল, ঠিক যে-জায়গায় আগে এসে দাঁড়াত, সেখানেই উনকি দাঁড়িয়ে আছে। তার পিঠে আজও শিশু বাঁধা রয়েছে। কিন্তু ওর মুখের চেহারাটা যেন অন্যরকম দেখাচ্ছে। খেলা থামিয়ে সে কিশোরকে কথাটা বলতেই উনকি অন্য পাশে মুখ ঘোরাল।

কিশোর চাপা গলায় বলে উঠল, “এ কী রে, ওকে যে একদম অন্যরকম দেখাচ্ছে।”

খেলা থেমে গেল। মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সবাই উনকির মুখ লক্ষ করতে লাগল। দূরত্ব খানিকটা হওয়া সত্ত্বেও বোঝা গেল উনকি অস্বস্তিতে পড়েছে। একটু পরেই পিঠে শিশুকে নিয়েই দৌড়ে যে-দিক দিয়ে আসাযাওয়া করে সেদিকে চলে গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও ওকে ফিরে আসতে দেখল না ছেলেরাও।

এই সময় মাংরা শব্দ করে হাসল, “খুব লজ্জা পেয়েছে ও।”

অতীন জিজ্ঞেস করল, “কেন লজ্জা পেল, তা তুই জানিস?”

ওর কপালের ফোঁড়া অপারেশন করার পর চেহারাটা অন্যরকম হয়ে গেছে যে, সেই জন্যে লজ্জা পায়। সবাই জিজ্ঞেস করে, “এই, তুই উনকি তো?”

এবার সবাই সহজ হল। দীপু বলল, “আমরা যদি ওর জন্যে কম্কাকুর কাছে না যেতাম, তা হলে কী হত বল তো? এই সুন্দর মুখটা দেখতেই পাওয়া যেত না।”

খোকন ধমকের গলায় বলল, “কারও উপকার করে তার জন্যে গর্ব করা ঠিক নয়। সেদিন যদি হাসপাতালের সামনে বড়সাহেব না আসতেন অথবা এসেও যদি উনকিকে সাহায্য করার বদলে আমাদের ধমক দিয়ে চলে যেতেন, তা হলে ও ওই মুখটা কি ফিরে পেত? যা হওয়ার তা বড়সাহেবের জন্যেই হয়েছে। আমাদের কোনও কৃতিত্ব নেই। কী বলিস তোরা?”

বন্ধুরা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে তাকে সমর্থন করল।

পরের দিন উনকি আবার এল। সেই একই জায়গায় এসে দাঁড়াল শিশুকে পিঠে বেঁধে। দু’চোখ বড় করে ওদের খেলা দেখতে লাগল। হাফ টাইমের সময় দীপু বলল, “যাই বলিস, মেয়েটার মুখ খুব সুন্দর। শহরে থাকলে ওকে সিনেমার নায়িকা করে দিত।”

সবাই হেসে উঠল। দীপুরও মনে হল সে বোধহয় একটু বেশি বলেছে।

মাঠের একটা অংশ ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টার্সের কাছাকাছি। তাই বাড়ির সিঁড়িতে মায়ের সঙ্গে বসে দিব্যি খেলা দেখতে পারে সুজাতা। কেউ গোল দিলে হাততালি দেয়।

এবার খেলা শুরু হওয়ার তৃতীয় দিনে কার্তিক চলে এল। তার মামা তাকে দু’ঘণ্টার জন্যে ছুটি দিয়েছে। যেন অনেক দিন পরে ফুসফুস ভরে বাতাস নিতে পারল এমন খুশি ওর চোখমুখে। খেলা যখন শেষ হয়েছে, তখন ডাক্তারবাবুর বাড়ির কাজের মহিলা মাঠের মাঝখানে ঢুকে কার্তিককে বলল, “আপনাকে মা ডাকছেন। একটু আসুন।”

কথাটা সবাইকে খুব অবাক করল। আর ঘাবড়ে গেল কার্তিক, “আমাকে?”

“হ্যাঁ, ওই তো বসে আছেন,” বলে হনহনিয়ে ফিরে গেল মহিলা।

খোকন জিজ্ঞেস করল, “তোকে ডাকছে কেন? চিনিস?”

মাথা নেড়ে ‘না’ বলে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল কার্তিক।

বাড়িতে ঢোকার প্রধান দরজার সামনের সিঁড়িতে মায়ের পাশে বসে ছিল সুজাতা। কার্তিক সামনে গেলে সে উঠে দাঁড়াল, “মা, এর নাম কার্তিক।”

মধ্যবয়সিনী মহিলা সস্নেহে হাসলেন, “ও, তুমিই কার্তিক।”

“হ্যাঁ, আমাকে কেন ডেকেছেন?” কার্তিক জিজ্ঞেস করল।

“তুমি সেদিন আমার মেয়ের খুব উপকার করেছ। কী বলে তোমাকে ধন্যবাদ জানাব আমি জানি না। তোমার বাবা কি এই চা-বাগানে চাকরি করেন?” সুজাতার মা জিজ্ঞেস করলেন।

“হ্যাঁ,” মাথা নাড়ল কার্তিক।

“কোন কোয়ার্টার্সে থাকো তোমরা?”

“এখানে থাকি না, ওই ও-পাশের লাইনের কাছে আমরা থাকি।”

“তোমার বাবা এখানে কী কাজ করেন?”

“কাঠের কাজ,” তার পর বেশ জোর গলায় কার্তিক বলল, “আমি আমার মামার মুদির দোকানে কাজ শিখছি। আপনি কি আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন?”

“না না,” জোরে জোরে মাথা নাড়লেন ভদ্রমহিলা।

“তা হলে আমি যাচ্ছি,” পিছু ফিরে হেঁটে সে বন্ধুদের কাছে চলে

এল।

বন্ধুরা কৌতূহলী চোখে দূর থেকে এতক্ষণ দেখছিল, কার্তিক কাছে এসে দাঁড়ালে সবাই জিজ্ঞেস করল, "কেন ওরা ডেকে নিয়ে গেল? কী বলল ওরা?"

কার্তিক যতটা সম্ভব সংক্ষেপে সব কথা খুলে বলার পর ওই মেয়েটির গাছে আটকে পড়া, তার পরামর্শে লাফিয়ে নীচে নামার কথা সে বন্ধুদের জানাল। কিশোর বলল, "যাক গে, ওদের সঙ্গে মেলামেশা করার আমাদের কী দরকার!"

এই চা-বাগানের কর্মচারীরা দুর্গাপুজো করেন না। সেটা করার জন্যে যে-লোকবল এবং আর্থিক সঙ্গতি দরকার, তা তাঁদের নেই। কিন্তু তাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কালীপুজো করেন। দুর্গাপুজো হয় একটু দূরের গঞ্জে। সকাল বিকেল সেই পুজোমণ্ডপে ঠাকুরের সামনে বসে থাকে এরা। শুধু অষ্টমীর বিকেলটা তাদের সবচেয়ে খুশি হওয়ার সময়। সেদিন চা-বাগান থেকে একটা লরি দেওয়া হয়, যাতে স্টাফদের পরিবারের মহিলা-পুরুষরা বসে চল্লিশ মাইলের মধ্যে যত পুজো হয়, তার ঠাকুর দর্শন করে আসতে পারে। অতীনদের ছেলেবেলায় এই ভাবে ঠাকুর দেখা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু ওরা যত বড় হচ্ছে, তত ব্যাপারটা একঘেয়ে এবং আকর্ষণহীন বলে মনে হচ্ছে। তাই গাড়িতে না উঠে ওরা সাইকেল চালিয়ে বাজারহাটের দুর্গাপুজোর মেলায় বিকেল হতেই চলে যায়। অষ্টমীর বিকেল থেকেই সেখানে চমৎকার ভিড়। সাইকেলে রাস্তাটা পেরিয়ে আসতে খুব বেশি হলে এক ঘণ্টা লাগে। সারা বছরে এক বারই ওই দূরত্ব সাইকেলে যাতায়াত করতে খুব ভাল লাগে ওদের। শহর থেকে পুজোর সময় চা-বাগানে এলে এই ভাবে ঠাকুর দেখতে যেতে ওদের খুব ভাল লাগে। কিন্তু এই বছর ওরা পুজোর সময় সাইকেল করে বাইরে যাতে না যায়, তার জন্যে প্রায় প্রত্যেক বাড়ি থেকেই আপত্তি উঠেছে। তার কারণ, দীপু সাইকেলে বাজার থেকে ফেরার সময় একটা অ্যাকসিডেন্ট করেছে। পা ভেঙে গেছে ওর। বিশেষ করে রাত্রে বাজারহাট থেকে ফেরার সময়ে হাইওয়েতে গাড়িগুলো যে-গতিতে চলে, তাতে দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে যায়।

মন এটা মানতে চাইছিল না, কিন্তু তাদের এক বন্ধু পা ভেঙে বাড়িতে পড়ে থাকবে আর তারা প্রতিবছরের মতো পুজোয় আনন্দ করবে! সবাই একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল, এটা ঠিক নয়।

পুজোর সময় ওরা বিকেলে মাঠে বসে গল্প করে, বল খেলে না। আজও তাই করছিল, এই সময় দেখল, উনকির বাবা শনিচর হাইওয়ে থেকে নেমে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এলে ওরা উঠে দাঁড়াল, "কী খবর?"

"খবর ভাল নয় বাবু," হাত জোড় করে বলল শনিচর।

"কেন, কী হল?" অতীন জিজ্ঞেস করল।

কিশোর বলল, "তোমার মেয়ের মুখের চেহারা অপারেশনের পর তো একদম বদলে গিয়েছে। খবর তো ভাল হওয়া উচিত।"

"না বাবু। অপারেশনের ঘা শুকিয়ে যাওয়ার পর মনে হয়েছিল মেয়েটার মুখের চেহারা সত্যি খুব ভাল হয়ে গেল। কিন্তু ক'দিন থেকে মনে হচ্ছিল যেখানটায় ফোঁড়াটা হয়েছিল সেই জায়গাটা যেন একটু উঁচু উঁচু বলে মনে হচ্ছে। ভয় পেয়ে আমি ওকে নতুন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, আবার ওখানে আব গজাচ্ছে। আস্তে আস্তে ওটা বড় হবে। এবার জলপাইগুড়ির হাসপাতালে নিয়ে গেলে হবে না। যদি কিছু করার থাকে তাহলে শিলিগুড়ির হাসপাতালে হতে পারে," একনাগাড়ে কথাগুলো বলে শ্বাস টানল শনিচর।

দীপু বলল, "ওকে কি শিলিগুড়িতে নিয়ে যাবে?"

"কী করে নিয়ে যাব? আমার কাছে অত পয়সা কোথায়? বড়সাহেব মেয়েটাকে একবার দয়া করেছেন। বারবার কি দয়া চাইতে যাওয়া যায়?" লোকটি বিমর্ষ মুখে কথাগুলো বলল।

"তা হলে এখন কী করবে?" অতীন জিজ্ঞেস করল।

"ওর বিয়ে দিয়ে দেব," নিচু গলায় বলল শনিচর।

"সে কী! বিয়ে দেবে কেন?" ওদের মধ্যে দু'জন একসঙ্গে প্রশ্নটা করল।

"মেয়েদের এক বার বিয়ে হয়ে গেলে বাপ-মায়ের আর কোনও চিন্তা থাকে না। এখনই বিয়ে হলে পাত্রপক্ষ কিছুই টের পাবে না। জিজ্ঞেস করলে বলব, কপালে ফোঁড়া হয়েছিল, ডাক্তার কেটে বাদ দিয়েছে। আর মেয়েকে তো এখন খুব সুন্দরী বলে সবাই স্বীকার করে। তাই এখনই চেষ্টা করলে সহজেই বিয়ে হয়ে যাবে," শনিচর বলল।

"বুঝলাম। তুমি এসব বলতেই কি এখানে এসেছ?" অতীন জিজ্ঞাসা করলে, মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল শনিচর। তার পর পাশের পথ দিয়ে লাইনের দিকে চলে গেল।

খোকন বলল, "মেয়েটার কী হবে রে!"

ওরা খুব দুশ্চিন্তায় পড়ল। একটু ভেবে কিশোর বলল, "আমরা তো উনকির সঙ্গে কোনও দিন কথা বলিনি, আজ ওকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়?"

অতীন তাকাল, "কী জিজ্ঞেস করবি?"

"ওর বাবা যে বিয়ে দিতে চাইছে তাতে ওর মত আছে কি না?"

"যদি 'না' বলে।"

"তা হলে আমরা কমুকাকুর কাছে গিয়ে বলব, উনকিকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।"

"আর যদি 'হ্যাঁ' বলে?"

"তা হলে আর কী করা যাবে!"

খোকন বলল, "তা হলে আমরা পুলিশের কাছে যেতে পারি। ওর তো এখনও বিয়ের বয়স হয়নি। পুলিশ ওর বাবাকে ডেকে ধমক দিতে পারে।"

"আমরা এসব করলে বাড়িতে খবর এসে যাবে। তখন?"

"জানুক। আমরা তো কোনও অন্যায় করছি না, বরং অন্যায়ের প্রতিবাদ করছি। আমরা তো বড় হচ্ছি। তাই না?"

এটা যেন সবার মনের কথা, অতীন সামনের দিকে তাকাল। কোথাও উনকিকে দেখা গেল না। সে বলল, "চল, আমরাই গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করি।"

"সেটা কি ঠিক হবে? আমরা তো কুলি লাইনে যাই না। গেলে সবাই অবাক হয়ে তাকায়। তা ছাড়া উনকির বাবা-মা রাগ করতে পারে," কিশোর বলল।

"করুক। আমরা আমাদের কর্তব্য করব," অতীন গম্ভীর গলায় বলল।

ওরা পা বাড়াতেই মাংরা জিজ্ঞেস করল, "তা হলে আজ কি খেলা হবে না?"

দীপু বলল, "আমরা ফিরে এলে সময় থাকলে হবে। তোরা আমাদের সঙ্গে যাবি?"

মাংরা বুধুয়ার দিকে তাকাল। খোকন বলল, "না, ওদের নিস না। ওরা এখানেই থাকুক। আমরাই ঘুরে আসি।"

ছেলে দুটোকে অপেক্ষা করতে বলে সরু পায়ে চলা পথ দিয়ে ওরা নদীর দিকে যাচ্ছিল। সাঁকো পেরিয়ে কিছুটা দূরে যেতে হবে ওদের। কিন্তু সাঁকোর কাছে এসে ওরা থমকে দাঁড়াল। উনকি আসছে। পিঠে একটি শিশুকে কাপড় দিয়ে বেঁধে ঈষৎ ঝুঁকে সাঁকোর ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে।

অতীন কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী করবি? এখানেই ওর সঙ্গে কথা বলবি?"

সবাই বেশ ফাঁপরে পড়লেও খোকন বলল, "তাই বল।"

সাঁকো থেকে নেমে কয়েক পা হেঁটে ছেলেদের দেখতে পেল উনকি। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল সে। দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করল।

দীপু জিজ্ঞেস করল, "এখন কেমন আছিস উনকি? ভাল তো?"

একটুও নড়ল না মেয়েটা। জবাব দেওয়া দূরের কথা, তাকালও না।

"আমরা তোর সঙ্গে কথা বলতেই যাচ্ছিলাম," দীপুই কথা বলছিল।

কিন্তু এবারও উনকির মুখ থেকে শব্দ বের হল না।

একটু অপেক্ষা করে দীপু বলল, "তোর বাবা আমাদের কাছে এসেছিল। শুনলাম তোর বিয়ে দিতে চাইছে, তোর আপত্তি নেই তো?"

কোনও উত্তর দিল না উনকি, মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। একদম পাথরের মতো।

এবার অতীন জিজ্ঞেস করল, "কার সঙ্গে বিয়ে হবে তা কি ঠিক হয়েছে?"

এই প্রশ্নেরও জবাব এল না উনকির কাছ থেকে।

"তুমি তো বোবা নও, তা হলে কথা বলছ না কেন?" দীপু জিজ্ঞেস করল।

এবার মুখ তুলতেই উনকির বন্ধ চোখের পাতা থেকে জলের ফোঁটা বেরিয়ে আসতে লাগল। দু'পাশে মাথা নেড়েই ঘুরে দাঁড়াল সে। তার পর যতটা সম্ভব জোরে সাঁকো পেরিয়ে ওপারে চলে গেল।

খোকন বন্ধুদের দিকে তাকাল, "বুঝতে পারলি?"

অতীন বলল, "হ্যাঁ, চল, ফিরে যাই।"

ওরা মাঠের দিকে হেঁটে যেতে যেতে কথা বলছিল। যদি উনকির ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওর বাবা বিয়ে দিতে চায়, তা হলে তারা কী করতে পারে? উনকির বাবা শনিচর বলতেই পারে, মেয়ের বিয়ে দেওয়া তাদের পারিবারিক ব্যাপার। এ কথার উত্তরে ওরা কী বলবে? কিশোর জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, পুলিশকে বলা যায় না?"

"কে বলবে? আমরা? তা হলে বাড়িতে আমাদের কী হাল হবে ভেবে দেখ!"

অতীন বলল, "একটাই রাস্তা আছে।"

"কী?" সবাই তাকাল অতীনের দিকে।

"কম্‌কাকুর কাছে গিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই বড়সাহেবের কানে খবরটা তুলতে পারেন। বড়সাহেব বললে তো উনকির বাবা না বলতে পারবে না।"

কথাটা মনে ধরল সকলের। এখনই অফিস ছুটি হয়ে যাবে। ওরা কম্পাউন্ডারবাবুর ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করবে ঠিক করে মাঠের দিকে চলে এসে খুব অবাক হল। ইট সাজিয়ে তৈরি গোলপোস্টের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে নতুন ডাক্তারের মেয়েটা। তার দিকে তাক করে পেনাল্টি কাট মারছে বুধুয়া আর মাংরা। বুধুয়ার শট ধরতে গিয়ে হাতে ব্যথা পেল মেয়েটা।

দীপু বলল, "এ কী রে!"

ওদের দেখে বুধুয়া এগিয়ে এল, "আজ খেলা শুরু হবে?"

কিশোর বলল, "না রে, আজ আমাদের জরুরি কাজ আছে।"

বল হাতে নিয়ে সুজাতা এগিয়ে এল, "তোমরা তো খুব হিংসুটে।"

অতীন বলল, "তার মানে?"

"আমি ওদের সঙ্গে খেলছি বলে তোমাদের বোধহয় মানে লাগল, তাই খেলতে চাইছ না। ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি," ঝাঁজিয়ে বলল সুজাতা।

"তুমি তো খুব ঝগড়ুটে! একটা জরুরি কাজ করতে হবে বলে আজ আমরা খেলছি না। আর তুমি চমৎকার কল্পনা করলে!" অতীন বলল।

"তাই নাকি? তা হলে আমি সরি। ঠিক আছে, আজ আমি যাচ্ছি। তোমরা তোমাদের জরুরি কাজ করো। আমি বাড়ি যাচ্ছি," বলে চলে গেল সুজাতা।

খোকন ওর যাওয়া দেখতে দেখতে বলল, "খুব মেজাজ তো।"

অতীন বলল, "ওর মেজাজ নিয়ে ও নিজের বাড়িতে থাক, আমাদের কী!"

একটু পরে দীপু বলল, "যাই বলিস, এই ভাবে কথা বলতে এখানকার কোনও মেয়ে পারে না। ডাক্তারবাবুর একমাত্র মেয়ে তো!"

একটু পরে সাইকেলগুলো চা-বাগানের নুড়ি বিছানো রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে এসে কোয়ার্টার্সের পথ ধরল। ওদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যাঁরা সাইকেল চালাচ্ছিলেন, তাঁরা একটু অবাক হলেও মুখে কিছু বললেন না।

চাপা গলায় দীপু বলল, "বাবা নিশ্চয়ই মাকে বলবে।"

"আশ্চর্য! আমরা তো কোনও খারাপ কাজ করছি না। বলে বলুক," বেশ চড়া গলায় বলল অতীন।

সন্ধের ছায়া যখন বেশ ঘন হয়েছে, তখন কম্পাউন্ডারবাবুকে সাইকেল চালিয়ে আসতে দেখল ওরা। মাঝপথে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি সাইকেল থামালেন, কিন্তু নেমে দাঁড়ালেন না। বললেন, "কিছু বলবে?"

অতীন বলল, "উনকির কপালে যে-আব হয়েছিল সেটা অপারেশনের পরে কি আবার হতে পারে?"

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন কম্পাউন্ডারবাবু, "যে-চিকিৎসা, মানে যেভাবে অপারেশন করলে একেবারে গোড়া থেকে ওটাকে বাদ দেওয়া সম্ভব হত তা জলপাইগুড়িতে করা যায়নি।"

"তা হলে আবার ওর চোখ আবে ঢেকে যাবে?" দীপু জিজ্ঞেস করল।

"তার সম্ভাবনাই প্রবল।"

"কোথায় ওই অপারেশন হয়?" খোকন জিজ্ঞেস করল।

"কলকাতা হলে খুব ভাল হত। তবে শিলিগুড়িতেও ওই অপারেশন করা হচ্ছে। একথা আমি ওর বাবা শনিচরকে বলেছি।"

কিশোর বলল, "কিন্তু ওর বাবার তো শিলিগুড়িতে মেয়েকে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর ক্ষমতা নেই, আপনি তো জানেন।"

"জানি। কিন্তু আমি কী করতে পারি, বলো!"

"আপনি যদি বড়সাহেবকে ব্যাপারটা বলেন..."অতীন বলল।"

"বড়সাহেব একবার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন, বারংবার তিনি করবেন কেন? তা হলে তো চা-বাগানের প্রায় সকলেই ওঁকে সাহায্য করতে বলবে। সেটা সম্ভব নয়। আর আমি অনুরোধ করলে বিরক্ত হবেন।"

"শুনছি ওর বাবা ওকে বিদায় করার জন্যে বিয়ে দেবেন, "বেশ জোরে কথাগুলো বলল কিশোর।

"ভালই তো। বাবার সামর্থ্য নেই, শ্বশুরবাড়ির লোকজন যদি ওকে শিলিগুড়িতে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করায়, তা হলে ওর উপকার হবে। তোরা এ নিয়ে মাথা ঘামাস না, "সাইকেল চালিয়ে চলে গেলেন কম্পাউন্ডারবাবু।

স্কুল খুলে গেছে। যে যার পড়ার জায়গায় চলে গেলেও প্রত্যেকে ঠিক করেছিল, কার্তিকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। সেইমতো পোস্টকার্ডে মাঝে মাঝে চিঠি লিখত অতীন। সব সময় তার জবাব যে পেত তা নয়। কিন্তু কিছুদিন পরে কার্তিকের চিঠি এল। দুটো খবর দিয়েছে সে। প্রথম খবর হল, উনকির বিয়ে হয়ে গেল। পাত্র পলাশবাড়ি চা-বাগানে চাকরি করে। পাত্রীকে দেখে তার খুব পছন্দ হয়েছিল। শোনা যাচ্ছে বেশি টাকাপয়সা চায়নি বরপক্ষ। মেয়ে দেখে ভারী পছন্দ হয়েছিল তাদের। খবরটা পেয়ে কার্তিক দেখতে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু দোকান থেকে ছুটি না পাওয়ায় যেতে পারেনি। তবে খবর পেয়েছে বরের মাথার চুল খুব কম।

দ্বিতীয় খবর হল নতুন ডাক্তারবাবুর মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে, স্কুলের হোস্টেলে তাকে পাঠানো হয়নি। কার্তিক শুনেছে, আচমকা খুব ভাল সম্বন্ধ আসায় নতুন ডাক্তারবাবু পাত্রকে হাতছাড়া করতে চাননি। আগামী মাসের দু'তারিখে সুজাতার বিয়ে হবে। কার্তিক আরও জানিয়েছে, চা-বাগানের সব ম্যানেজার এবং বাবুদের মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করেছেন নতুন ডাক্তারবাবু। কিন্তু তিনি কার্তিকদের করেননি। হয়তো তারা একসঙ্গে থাকে না, সেটাই কারণ।

চিঠি পড়ে মন খারাপ হয়ে গেল অতীনের। কার্তিকের বাবা কাঠের মিস্ত্রির কাজ করলেও, সেটা নিয়ে তারা কখনও মাথা ঘামায়নি। কার্তিক তাদের বন্ধু, সেই কবে থেকে একসঙ্গে খেলাধুলো করছে, এর বাইরে কিছু ভাবেনি। নতুন ডাক্তারবাবুর যদি কাঠের মিস্ত্রির পরিবারকে নিমন্ত্রণ না করেন, তা হলে বুঝতে হবে তাঁর মন খুব সংকীর্ণ। সে কার্তিককে চিঠি লিখল, "তোদের সঙ্গে ওঠাবসা নেই বলে বোধহয় নেমন্তন্ন করেনি। মন খারাপ করিস না।"

দোকান ছেড়ে বাইরে ঘুরে যাওয়ার সুযোগ পায় না কার্তিক। তার মামা এখন যেন বাইরের কাজে একটু বেশি ব্যস্ত হয়ে গেছেন। ফলে সারা দিনে খুব কম সময় তিনি দোকানে এসে বসেন। সেটা দুপুরে। বড় জোর এক ঘণ্টা। সেই সময়ের মধ্যে কার্তিককে স্নান-খাওয়া সেরে দোকানে ফিরতে হয়। ফলে দোকান থেকে বেরিয়ে বাইরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না।

কিন্তু খবর পাচ্ছিল সে। তাদের দোকানে যেসব শ্রমিক কর্মচারী জিনিস কিনতে আসে, তারা তো চুপ করে থাকে না। তাদের কথায় কার্তিক জানতে পারল বেশ ধুমধাম করে মেয়ের বিয়ে দিলেন নতুন ডাক্তারবাবু। পরের দিন সকাল দশটায় নতুন বউকে নিয়ে জামাই নিজের বাড়ি যাবে। এই খবরটাও কার্তিকের কানে পৌঁছে গেল। তার মনে হল, এক বার শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে মেয়ে কখন বাপের বাড়িতে আসে, তা আগেভাগে জানা যায় না, তার চেয়ে সুজাতার যাওয়ার সময় ওর বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা হতে পারে। সে মরিয়া হয়ে মামার কাছে ঘণ্টা দুয়েকের ছুটি চাইল। কারণ হিসেবে বলল, দীপুর মা দেখা করতে বলেছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মামা ছুটি দিলেন।

সানাই বাজছে। বেদনার সুর। একটা গাড়ি ফুল দিয়ে সাজিয়ে বাড়ির সামনে রাখা আছে। কিছু কৌতূহলী মুখ ভিড় জমিয়েছে। কার্তিক বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে একটা কাঁঠাল গাছের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল। কাল রাত্রে মেয়েটার বিয়ে হয়েছে, আজ সে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। যে-বাড়িতে এতকাল ছিল, সেই বাড়ি চিরকালের মতো ছেড়ে চলে যেতে হবে আজ। কী নিয়ম! একটা ছেলেকে সুবিধে দিয়েছে সমাজ, কোনও মেয়েকে দেয়নি।

এই সময় কোয়ার্টার্সের ভেতর থেকে শাঁখের আওয়াজ ভেসে এল, তার পর কয়েকজন মহিলা সুজাতাকে যত্ন করে ধরে বাইরে গাড়ির কাছে নিয়ে এল। তাদের পেছন পেছন টোপর হাতে এল যে মানুষটা, তার বয়স বেশি নয়। তবে কার্তিকদের চেয়ে যথেষ্ট বড়। খুব সুন্দর লাগছে কি সুজাতাকে? কার্তিকের মনে হল মোটেই নয়। মাথায় মুকুট, গলায় মালা, গয়না, মুখে রং মাখা সুজাতার চেয়ে মাঠে খেলতে যাওয়া সুজাতাকে অনেক সুন্দরী মনে হত।

কেউ এক জন গাড়ির দরজা খুলে ধরলে, ডুকরে কেঁদে পাশের আত্মীয়াকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল সুজাতা। এখন সবাই ওকে শান্ত হতে বলছে। কিন্তু কান্নার শব্দ যেন আরও বেড়ে গেল তাতে। কার্তিকের মনে হল, এটা বেশ অদ্ভুত ব্যাপার। বিয়ের পরের দিন সবাইকে ছেড়ে বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে, তা কি জানত না সুজাতা? তা হলে এখন এত কান্নাকাটি করছে কেন?

সবাই বেশ যত্ন করে সুজাতাকে গাড়িতে তুলে দিল। দু'হাতে মুখ ঢেকে সুজাতা কেঁদেই চলেছে। যার সঙ্গে ওর বিয়ে

হয়েছিল সে গাড়িতে ওঠার আগে একটি মেয়ে ও-পাশের দরজা দিয়ে উঠে সুজাতার পাশে বসল। তার পাশে নতুন বর। দু'জন অভিভাবক ড্রাইভারের পাশে উঠে বসলে গাড়ি চালু হল। ধীরে ধীরে বিয়েবাড়ি ছেড়ে এগিয়ে আসছে গাড়ি। গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দেখছিল কার্তিক। এখন নিজেকে আড়াল করার কথা তার খেয়ালে থাকল না।

কার্তিক দেখল, গাড়ি চলতে শুরু করা মাত্র সুজাতা কান্না থামিয়ে হাত চোখের ওপর থেকে নামিয়েছে। নামিয়ে মাথা ঘুরিয়ে তাদের কোয়ার্টার্সের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নিকটজনদের দেখছে। তার ফলে গাড়ি যখন গাছের পাশ দিয়ে পিচের রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল, তখন সুজাতার নজর কার্তিকের ওপর পড়ল না। মাথায় মুকুট পরা সুজাতার মুখের একটা দিক দেখতে পেল কার্তিক।

ধীরে ধীরে হাইওয়েতে উঠে গতি বাড়িয়ে গাড়ি শেষ পর্যন্ত চোখের বাইরে চলে গেল। দ্রুত হেঁটে হাইওয়ের ধারে পৌঁছেও গাড়িটাকে দেখতে পেল না কার্তিক। হঠাৎ তার মনে হল, সে এখানে এই চা-বাগানে হয়তো চিরকাল থাকবে। অন্তত যত দিন ওই মুদির দোকান তাকে চালাতে হবে, তত দিন অন্য কোথাও যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই পথটাও থাকবে। আর ওদিকে তাকালেই তার মনে পড়বে, এই পথ দিয়ে সুজাতা চলে গেছে। বুকের ভেতরটা এখন অন্যরকম মনে হল।

পোস্ট অফিসে গিয়ে পোস্টকার্ড কিনে সে অতীনকে চিঠি লিখল, "ভাই অতীন, সুজাতার বিয়ে হয়ে গেছে। খুব ভাল বর হয়েছে। যদিও আমাকে নেমন্তন্ন করেনি। বেশি আলাপ নেই তো, তাই হয়তো করেনি..."

বারো বছর পার হওয়ার আগেই মোটামুটি রান্না শিখতে বাধ্য হয়েছিল উনকি। অপারেশনের পর যখন চা-বাগানের কম্পাউন্ডারবাবু জানিয়েছিলেন, ওর আগের আবের জায়গায় নতুন করে আব হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তখন মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল পরিবারের সবাই। তখনই উনকির বাবা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আর দেরি না-করে এখনই মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করবে। অপারেশনের পর মেয়েকে বেশ সুন্দরী দেখাচ্ছে। কাছাকাছি তো বটেই, দূরের চা-বাগান থেকেও বিয়ের প্রস্তাব আসছিল। সেই সঙ্গে কয়েকজন জানিয়েছিল, বিয়েতে তারা কোনও বরপণ চাইছে না। মেয়ের কথা তারা শুনেছে, ওরকম রূপসি মেয়েই তারা খুঁজছিল।

শেষ পর্যন্ত একটি সম্পন্ন পরিবারের অভিভাবকরা উনকিকে দেখতে এসে এত খুশি হল যে, সঙ্গে সঙ্গে বিয়েতে সম্মতি জানিয়ে গেল। যতটা সম্ভব ভালভাবে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল শনিচর। যে-তিন সপ্তাহ সময় বিয়ের আগে পাওয়া গিয়েছিল, সেই সময়ে রান্না শিখতে হয়েছিল উনকিকে। যতটা পারা যায় উনকির মা চেষ্টা করেছিল।

যতই মুখশ্রী সুন্দর হোক, শ্বশুরবাড়িতে দু'বেলা রান্নাঘরে এসে পরীক্ষা দিতে হচ্ছিল উনকিকে। তার কাঁচা হাতের রান্না পরিবারের অন্যদের তো দূরের কথা, তার স্বামীরই পছন্দ হচ্ছিল না। কিন্তু বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যে ঠিক আগের জায়গায় নতুন করে আব দেখা দিল। চমকে উঠল ওর স্বামী। বিয়ের আগে যখন তারা অপারেশনের সূক্ষ্ম দাগ দেখে প্রশ্ন করেছিল, তখন তাদের বলা হয়েছিল, ওটা সাধারণ ফোড়ার দাগ। এখন কথাটা যে মিথ্যে, তা আলিপুরদুয়ারের ডাক্তার স্পষ্ট বলে দিলেন। অপারেশন না-করে হোমিওপ্যাথের কাছে ওকে নিয়ে গেলেন শাশুড়ি। তিনি সব কথা শুনে ওষুধ দিয়ে বললেন, "যত দিন আব খসে না-পড়ছে, তত দিন মাছ মাংস ডিম, পেঁয়াজ অথবা রসুন না-খেতে।

কিন্তু ওষুধে কাজ হচ্ছে কি না বোঝা যাচ্ছিল না। ধীরে ধীরে উনকির চোখের ওপরের আব বড় হচ্ছিল, মাসখানেক পরে হোমিওপ্যাথ বললেন, "মনে হচ্ছে প্রথমবার অপারেশন করা হয়েছে বলে হোমিওপ্যাথি ওষুধ এখন কাজ করছে না। তাই আপনারা ওকে কোনও বড় অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান।"

যে-বড় ডাক্তারের নাম তিনি জানালেন, তাঁর চেম্বার শিলিগুড়িতে। এই সব ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে উনকির বর বউকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে চলে এল। অসুখ চেপে রেখে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ জানিয়ে সেই যে বউকে রেখে চলে গেল, আর ফিরে এল না।

মেয়ের বিয়ে দিতে যা ছিল, তা তো গিয়েছিলই, বাইরে ধারও হয়ে গিয়েছিল উনকির বাবার। কিন্তু মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া সম্ভব ছিল না, সংসারের যাবতীয় কাজ করার দায়িত্ব নিতে হল তাকে।

শুধু বিকেলের রোদ পড়ে এলে সে কলোনির একটি পরিচিত শিশুকে পিঠে বেঁধে বেড়াতে বেড়াতে হাইওয়ের পাশের খেলার মাঠের ধারে চলে যায়। কিন্তু মাঠ জনশূন্য। কেউ খেলছে না। যারা খেলে, তারা শহরে পড়তে গেছে।

এবার সরস্বতী পুজো এগিয়ে এসেছে। উঁচু ক্লাসে পড়ার চাপ থাকা সত্ত্বেও ওরা শেষ অবধি চা-বাগানে বাবা-মায়ের সঙ্গে থেকে যাবে বলে ঠিক করেছিল। এখন শীতকাল। এখানে সন্ধে নামার আগে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা চেপে বসে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিকেল সাড়ে চারটের সময় দিনের আলো হুড়মুড়িয়ে কমতে শুরু করে। সূর্যের আলো দেখা যায় ঘড়ির কাঁটা যখন সাতটা পেরিয়ে গেছে। বিকেল হলেই হিমে ভিজতে থাকে মাঠের ঘাস।

এখন ওরা ফুটবল খেলে না। সেই কারণে বুধুয়া অথবা মাংরা বিকেলে এদিকে আসে না। ওরা মাঠের মাঝখানে গোল হয়ে বসে গল্প করে। গল্পের বিষয় এখন একটাই। আর কিছুদিন পরেই ফাইনাল পরীক্ষা। রেজ়াল্ট ভাল হলে কলকাতায় পড়তে যাওয়ার ইচ্ছে সকলের। জলপাইগুড়িতে সাধারণ কলেজ আছে, কিন্তু মেডিক্যাল অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নেই। যেহেতু ওরা প্রত্যেকেই বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছে, তাই হয় ডাক্তার নয়তো ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার বাসনা রয়েছে।

অতীন বলল, "কথাটা কি তোরা ভেবেছিস?"

"কোন কথা?" কিশোর বলল, "এভাবে বললে কী জানতে চাইছিস বুঝব কী করে?"

"আমরা ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সুযোগ পেলে এই চা-বাগানে ছুটির সময় নিয়মিত আসা আর সম্ভব হবে না।"

দীপু তাকাল, "কেন?"

"পড়ার চাপ তো অনেক বেড়ে যাবে।"

কথাটা অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হল প্রত্যেকের কাছে। কলকাতা বিশাল শহর। ওরা যদি সবাই ওখানে পড়ার সুযোগ পায়, তা হলেও যে একই কলেজে পাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যদি খড়্গপুর বা অন্য জায়গায় হয়, তা হলে তো কোনও কথাই নেই। তার পর পাশ করে যখন চাকরি পাবে, তখন এক-এক জন কোথায় কোন শহরে চলে যাবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ এতদিনের বন্ধুত্ব, প্রতি বছর অন্তর আড়াই মাস ধরে চা-বাগানে এসে দেখা করার দিন শেষ হতে চলেছে।

ওরা যখন গম্ভীর মুখে এটা নিয়ে ভাবছে, তখন খোকন বলল, "আরে, ওই দেখ, ওর মুখ তো ছেলেবেলার মতো হয়ে গিয়েছে।"

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুরা মুখ ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকাতেই ওকে দেখতে পেল। মাঠের শেষে পিঠে শিশুকে বেঁধে উনকি দাঁড়িয়ে আছে। তার একটা চোখ এত দূর থেকে দেখাই যাচ্ছে না বলা যায়। একটা বিশাল আব তাকে আড়াল করেছে অনেকখানি। অন্য চোখে সে দেখছে এদিকে তাকিয়ে।

দীপু বলল, "ইস, আবটা ওর চোখটাকে একদম ঢেকে দিয়েছে।"

খোকন বলল, "অপারেশনের পর মুখটাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছিল! ভগবান এত নিষ্ঠুর কেন বল তো?"

ওরা মুখ ঘুরিয়ে নিলে অতীন বলল, "আচ্ছা, আমরা কিছুই করতে পারি না?"

“কী করতে পারি? আমাদের তো কিছু করার ক্ষমতা নেই,” দীপু বলল।

“সোজা বড়সাহেবের অফিসে গিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলবি?” অতীন জিজ্ঞেস করল।

“অসম্ভব। উনি হয়তো দেখাই করবেন না। করলেও আমাদের কথা শুনে এত বিরক্ত হবেন যে, বাড়িতে খবর পাঠাবেন। তখন কী হবে বুঝতে পারছিস?” বেশ জোরে মাথা নাড়ল দীপু।

দীপুর কথার সঙ্গে সবাই একমত হল। জেনেশুনে বিপদ ডেকে আনার কোনও মানে হয় না। কিশোর বলল, “একটা কাজ করলে হয়।”

সকলে তাকাল ওর দিকে। কিশোর বলল, “মাস্টারমশাই তো এখন সুস্থ আছেন, ওঁর কাছে গেলে কেমন হয়? মেয়েটার কথা ওঁকে খুলে বলে সাহায্য চাইলে কেমন হয়।”

খোকন বলল, “তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।”

“একথা বলছিস কেন?” রেগে গেল কিশোর।

“মাস্টারমশাইয়ের কী রকম ইনকাম তা আমরা আন্দাজ করতে পারি। ওঁর পক্ষে উনকিকে সাহায্য করা যে অসম্ভব ব্যাপার, তা কেন বুঝতে পারছিস না!” খোকন বলল।

অতীন মাথা নাড়ল, “না না মাস্টারমশাইকে বললে তিনি নিশ্চয়ই কোনও একটা উপায় বলতে পারেন, যাতে উনকির উপকার হয়।”

কথাটা সকলের পছন্দ হল।

বাড়িতেই ছিলেন মাস্টারমশাই। তিনটি বালককে ইংরেজি পড়াচ্ছিলেন তিনি। ছেলেদের দেখে বললেন, “এই সময় তোমরা!” তার পর বালকদের বললেন, “তোমরা একটু বাইরে গিয়ে বোসো। এরা চলে গেলেই আমরা পড়া আরম্ভ করব।”

ছেলেরা দ্রুত বেরিয়ে গেলে মাস্টারমশাই বললেন, “হ্যাঁ, এবার বলো, কী ব্যাপার?”

অতীনরা বেঞ্চিতে বসলে দীপু কথা বলল। উনকির চোখের ওপরের আবের ব্যাপারটা মোটামুটি বিস্তারিত বলল।

মাস্টারমশাইয়ের কপালে ভাঁজ পড়ল, “ওর কপালে আবার আব দেখা দিয়েছে?”

“হ্যাঁ,” দীপু বলল।

“চিকিৎসার অনেক খরচ বলে ওর শ্বশুরবাড়ির লোকজন ওকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। ওই আব যত দিন থাকবে, তত দিন ফেরত নেবে না,” অতীন বলল, “ওর বাবার কোনও আর্থিক সঙ্গতি নেই। মেয়েকে বড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করানো তার পক্ষে সম্ভব নয়।”

“বুঝলাম। তোমরা চাইছ মেয়েটা আবমুক্ত হোক। তাই তো?” মাস্টারমশাই বললেন।

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“কয়েকটা প্রশ্ন করছি। তোমরা রোজগার করো না, ওর বাবার যেমন আর্থিক ক্ষমতা নেই, তোমরাও তোমাদের বাবা-মায়ের কাছে সাহায্য কতটা পাবে জানি না। তা হলেও তোমরা ওকে সাহায্য করতে চাইছ। কেন চাইছ?”

ছেলেরা নিজেদের মুখ দেখল। শেষ পর্যন্ত খোকন বলল, “ওকে সাহায্য করার কেউ নেই বলে; হয়তো ওই আব আরও বেড়ে গেলে উনকি মারাই যাবে। তাই...”

মাস্টারমশাই বললেন, “বাঃ, শুনে খুব খুশি হলাম। তোমাদের মনে যে-চিন্তা এসেছে, তা অনেক বড়দেরও আসে না। বেশ, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।”

“আপনি আমাদের পথ দেখাবেন সেই ভরসায় এসেছি,” অতীন বলল।

“আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব। আমি চোখে দেখিনি, কিন্তু তোমাদের কথা শুনে বুঝতে পারছি, মেয়েটি খুবই অসুস্থ। জলপাইগুড়িতে ওর চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যাবে না। শিলিগুড়িতে না হলে ওকে নিয়ে যেতে হবে কলকাতায়। কিন্তু তার জন্যে তো প্রচুর খরচ হবে। ওর বাবার কথা ছেড়ে দাও, আমাদের একার পক্ষে ওই খরচ মেটানো সম্ভব নয়,” চিন্তিত গলায় বললেন মাস্টারমশাই।

এতক্ষণ এই বিষয়টি কারও মাথায় আসেনি। আগের বার বড়সাহেব সাহায্য করায় কাউকে টাকার চিন্তা করতে হয়নি। মেয়েটাকে বাঁচাতে টাকার দরকার, কিন্তু মনে ইচ্ছে আছে, টাকা নেই। খোকন কথা বলল, “মেয়েটার চিকিৎসার জন্যে যদি আমরা চাঁদা তুলি তা হলে কেমন হয়।”

হাসি ফুটল মাস্টারমশাইয়ের মুখে। মাথা নেড়ে বললেন, “খুব ভাল প্রস্তাব। কিন্তু আমরা নিজেরাই চাঁদা তুললে কেউ কেউ প্রশ্ন করবেন। সবার আগে মেয়েটির অপারেশনের জন্যে সাহায্য চাইতে একটা কমিটি তৈরি করা উচিত। এখানকার গণ্যমান্য কয়েকজনকে সেই কমিটিতে রাখলে সাধারণ মানুষও বিশ্বাস করে চাঁদা দেবে। কী বলো তোমরা, আপত্তি নেই তো?”

দীপু বলল, “আপনি যা ভাল মনে করেন তাই হবে। আমাদের তো কোনও অভিজ্ঞতা নেই।”

ঠিক হল, পরের দিন সকালবেলা মাস্টারমশাই ওদের নিয়ে, সকলের কাছে শ্রদ্ধাভাজন, এমন কয়েকজন মানুষের কাছে যাবেন, সব কথা জানিয়ে তাঁদের অনুমতি নেবেন। এই ভাবে চাঁদা তুলে কারও চিকিৎসা করানোর চেষ্টা এর আগে এই জনপদে কখনও হয়নি।

পরের দিন সকালে ওরা মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে কয়েকজনের বাড়িতে গেল। চার জনের মধ্যে মাত্র এক জন তাঁর আপত্তির কথা জানালেন। তিনি বললেন, “একবার এক জনকে সাহায্য করলে প্রচুর মানুষ সাহায্য চাইবে। অসুখে ভুগে অসহায় গরিব মানুষগুলো বাড়িতেই পড়ে আছে। এই মেয়েটিকে সাহায্য করলে তারা দাবি করবে, তাদেরও সাহায্য করা হোক। তারা কী দোষ করল! তখন কী হবে! আমরা কি চাঁদা তুলে অন্তত শ’খানেক মানুষের চিকিৎসা করাতে পারব? অসম্ভব। তখন ভুল বোঝার বদলে এখনই ভুল না-করা ভাল।”

যে-তিন জন এসব কথা বলেননি, তাঁদের নিয়ে কমিটি তৈরি করে চাঁদা তোলা শুরু হল। যে যেমন পারে, চক্ষুলজ্জা এড়াতে উনকির জন্যে দান করতে লাগল।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে বসার ঘরে নিজের চেয়ারে বসে বাবা অতীনকে ডেকে পাঠালেন। অতীন এসে সামনে দাঁড়ালে তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, “তুমি কালই চলে যাও। স্কুলের কাছে থেকে পড়াশোনা করাই ভাল।”

হকচকিয়ে গেল অতীন। সে বুঝতে পারল উনকির চিকিৎসার জন্যে চাঁদা তুলতে যাওয়া বাবা একদম পছন্দ করছেন না। নিশ্চয়ই অফিসে বসে খবরটা পেয়ে গেছেন। সে নিচু গলায় বলল, “মেয়েটার বাবা এত গরিব যে, চিকিৎসা করানো ওদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই মাস্টারমশাই পরামর্শ দিলেন চাঁদা তুলে চিকিৎসা করাতে।”

“চমৎকার! মেয়েটি বা ওর বাবাকে তোমরা কতদিন চেনো?”

“ঠিক চিনি না, তবে মেয়েটি আমাদের খেলা দেখতে আসে।”

“ওর বাবার মতো প্রচুর মানুষ পয়সার অভাবে নিজের অথবা বাড়ির লোকদের চিকিৎসা করাতে পারে না। এক জনের চিকিৎসার জন্যে চাঁদা তুললে বাকিরা বলবে চাঁদা তুলে তাদেরও চিকিৎসা করাতে হবে। পারবি?”

মাথা নিচু করল অতীন, কথা বলল না।

“এই সব কাজ করার পরামর্শ নিশ্চয়ই মাস্টারমশাই দিয়েছেন?”

“না না। আমরাই ওঁর কাছে গিয়েছিলাম।”

“কেন গিয়েছিলে? উনি যে কমিউনিস্ট তা তোমরা জানতে না?”

“আমরা ওসব কিছু ভেবে যাইনি। তা ছাড়া কোনও কমিউনিস্ট যদি ভাল কাজ করে, তা হলে তো তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত,” অতীন বলল।

“উচিত কি অনুচিত তা ঠিক করবে পড়াশোনা শেষ করে যখন নিজে রোজগার করবে, তখন। তার আগে বাবার পয়সায় যখন

পড়াশুনা করছ, তখন সেটা ভাল ভাবে শেষ করো। যাক গে, অনেক কথা হয়েছে। কাল সকালেই চলে যেয়ো।”

“কাল সকালেই যেতে হবে?” অনুনয়ের সুর অতীনের গলায়।

“আমি তো সকালেই বলেছি, দুপুর বা বিকেল বলিনি,” বাবা বললেন।

সকালবেলায় যেন পৃথিবীটা বদলে গেল। অফিসে যাওয়ার আগে ভিতরের বারান্দায় চেয়ার টেবিলে বসে চা খান বাবা। সেখানে অতীনের ডাক পড়ল।

অতীন এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “কী করছিলে?”

“জিনিসপত্র ব্যাগে গোছাচ্ছিলাম।”

“শোনো, আমি ভেবে দেখলাম, ওখানে না-গিয়ে এখানে বসেই তুমি পড়াশোনা করতে পারো। স্কুল যখন খুলবে, তখন না হয় যেয়ো। এবার তোমার ফাইনাল ইয়ার। তাই ডিস্টার্ব করতে চাই না। এখানেই থেকে যাও, কিন্তু বাড়ির সামনের মাঠের বাইরে যাওয়া চলবে না। কথার অবাধ্য হলে আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারব না। মনে থাকবে?”

নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল অতীন।

বাবা অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার খানিক পরেই বন্ধুরা বাড়ির বাইরে এসে অতীনের নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করলে, সে বারান্দায় এল।

দীপু অবাক হয়ে বলল, “এ কী রে! তুই গেঞ্জি পরে আছিস! যাবি না?”

“না রে! বাড়িতে খুব ঝামেলা হয়েছে,” নিচু গলায় বলল অতীন।

“আমাকেও বাবা প্রচুর বকেছে। তবু তো আমি যাচ্ছি। চল চল, মাস্টারমশাই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আজ বেশি চাঁদা তুলতেই হবে,” কিশোর বলল।

ইচ্ছে হচ্ছিল খুব। কিন্তু বাবার মুখ মনে পড়তেই ইচ্ছেটা থাকল না। দীপুর বাবা আদৌ গম্ভীর প্রকৃতির নন। সব সময়ে মুখে হাসি মাখামাখি থাকে। ওই মুখ থেকে নিশ্চয়ই খুব বেশি বকুনি বের হতে পারে না। অতীন মাথা নাড়ল, “না রে, আজ থাক, আমি না-হয় পরে যাব।”

“মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলে কী বলব?” খোকন জিজ্ঞেস করল।

“কী বলবি!” মাথা নাড়ল অতীন, “বলিস শরীর খারাপ।”

বিকেলে খবর পেল অতীন। বন্ধুরা খেলার মাঠে এসে জানাল, আজ সকালে খুব ভাল চাঁদা উঠেছে। মাস্টারমশাই বলেছেন আর দু’দিন এইরকম চাঁদা উঠলে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যাওয়া যায়। সারা দিন মন খারাপ হয়ে থাকলেও খবরটা শুনে খুব ভাল লাগল। ওরা খেলা শুরু করল। আজ ক্রিকেট। তিনটে লাঠি স্ট্যাম্পের মতো পুঁতে টেনিস বল দিয়ে খেলা। দীপুর বাড়িতে একটা ব্যাট বহু দিন ধরে পড়েছিল, সেটা কাজে এসেছে।

খেলা যখন বেশ জমে উঠেছে খোকন ব্যাট করছে, অতীন বল, ঠিক তখনই কিশোরের চোখে পড়ল একটা শিশুকে পিঠে বেঁধে উনকি ধীরে ধীরে এসে দাঁড়িয়েছে শিউলি গাছের পাশে। আজ ও মাঠের গায়ে এসে দাঁড়ায়নি। বন্ধুদের ইশারায় কাছে ডেকে উনকির আসার কথা জানাল সে।

দীপু আড়চোখে দেখে নিয়ে বলল, “ওর বাইরে আসা উচিত হয়নি।”

“একথা বলছিস কেন?” অতীন জিজ্ঞেস করল।

“ওর একটা চোখ তো দেখাই যাচ্ছে না। যদি আমাদের মারা বল সোজা গিয়ে চোখের ওপরে লাগে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে মরে যেতে পারে!” দীপু বলল।

“তা ছাড়া হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেও তো বিপদ হতে পারে,” খোকন চিন্তিত গলায় বলল, “ওকে বাড়ি ফিরে যেতে বল।”

কিশোর বলল, “কিছুই বলতে হবে না। ও শুনলে আরও নার্ভাস হয়ে যাবে। ওকে ওর মতো থাকতে দেওয়াই ভাল।”

অতীনকে বাদ দিয়েই চাঁদা সংগ্রহ করা হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মাস্টারমশাই জানালেন, যা চাঁদা উঠেছে, তার ওপর নির্ভর করে কলকাতাতেও গিয়ে চিকিৎসা করানো যেতে পারে। অবশ্য যদি সেই চিকিৎসা বিনামূল্যে করা সম্ভব হয়।

মাস্টারমশাই এই জন্য ছুটি নিয়ে সদর শহর জলপাইগুড়িতে গিয়ে এক জন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে, তাঁর সুপারিশপত্র নিয়ে এলেন। মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, ওই চিঠির জন্য অপারেশনের খরচ লাগবে না।

মাস্টারমশাই, উনকি আর তার বাবাকে নিয়ে শিলিগুড়িতে যাবেন বলে বাস ধরলেন। এদিককার তিস্তা নদীর ওপর ব্রিজ তৈরি হয়নি এখনও। তাই শিলিগুড়িতে যেতে হলে সেবক ব্রিজ হয়ে যেতে হয়। ছেলেরা বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে ওদের বিদায় জানাল। অবশ্যই এই দলে অতীন ছিল না।

দু’দিন পরে এক জন পরিচিত মানুষ এসে জানালেন, মাস্টারমশাই খবর দিয়েছেন, অপারেশন শিলিগুড়িতেই হবে। মেয়েটা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গেছে। তবে ডাক্তাররা বলছেন, অপারেশনটা খুব সহজ নয়।

শিলিগুড়ি এই চা-বাগান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। কিন্তু তিস্তা নদীর ওপর এখনও পর্যন্ত কোনও সেতু নেই। সেতু তৈরির কাজ সবে শুরু হয়েছে। এখনও ডুয়ার্সে বা আসামে যেতে হলে পাহাড়ের কাছে সেবক ব্রিজ পার হয়ে অথবা নৌকো করে তিস্তা পার হওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। যখন গ্রীষ্মকালে তিস্তার জল কমে যায়, তখন সাইলেন্সারবিহীন ট্যাক্সিতে তিনভাগ বালির চর পেরিয়ে নৌকোয় উঠে নদী পার হতে হয়। ফলে প্রচুর সময় লেগে যায় পারাপার করতে।

চা-বাগান থেকে দূরত্ব বেশি নয়, কিন্তু যাতায়াতের অসুবিধের জন্যে প্রচুর সময় লেগে যায়। উনকির অপারেশন ডাক্তাররা করেছেন কি না তার খবর চা-বাগানে পৌঁছচ্ছিল না। অথচ ছুটি শেষ হয়ে আসায় ছেলেরা একে-একে তাদের স্কুলের শহরে চলে গেল। যাওয়ার আগে ওরা কার্তিককে অনুরোধ করে গেল, অপারেশন কেমন হয়েছে সেই খবর পাওয়া মাত্রই পোস্টকার্ডে বন্ধুদের যেন জানিয়ে দেয়। খেলার সঙ্গীরা চলে গেলে কার্তিক আর দোকান থেকে খুব প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হয় না। এতে তার মামা খুব খুশি। তিনি বুঝিয়ে বলেন, “তুই যাদের বন্ধু বলে ভাবছিস, তারা কেউ তোর বন্ধু নয়। এখানে এসে সময় কাটানোর জন্যে ওরা বল খেলে, খেলার জন্যে লোক চাই বলে তোকে ডাকে। ছুটি শেষ হলেই ফিরে যায় নিজেদের পড়ার জায়গায়। এর পর কলেজে পড়বে, পরে বড় বড় চাকরি করবে, তখন তোর সঙ্গে কথা বলা দূরের কথা, ভুলেও তাকাবে না। বড়লোকরা কখনওই গরিবদের বন্ধু হতে পারে না। তোর কপাল ভাল, তাই এই দোকান আমি তোকে দিয়ে যাচ্ছি। ভাল করে ব্যবসাটা বুঝে নে বাবা!”

মামার কথাগুলো বিশ্বাস করতে একটুও ইচ্ছে হয়নি। কিন্তু চুপ করে রইল কার্তিক। তার তো কিছুই করার নেই।

খারাপ খবর বাতাসের আগে উড়ে আসে। কিন্তু কখনও কখনও ভাল খবর খোঁড়াতে খোঁড়াতে হেঁটে আসে। চা-বাগানের ফ্যাক্টরিতে কাজ করে এক শ্রমিকের স্ত্রী কেরোসিন তেল কিনতে কার্তিকের দোকানে এসে বলল, “ওই মেয়েটার কপাল খুব ভাল। সবার তো এমন কপাল হয় না।”

কার্তিক জিজ্ঞেস করল, “কার কথা বলছ?”

“আরে, যার চোখের ফোড়া কাটাতে মাস্টারমশাই শিলিগুড়িতে গিয়েছে। শনিচরের মেয়ে উনকি,” মহিলা বলল।

“তাই নাকি?” খুব খুশি হল কার্তিক। জিজ্ঞেস করল, “এই কথা তুমি কী করে জানলে? কে বলল?”

“আমার বাচ্চার বাবা বাজারে গিয়ে শুনেছে যে।”

কার্তিকের মনে হল, বন্ধুদের এখনই পোস্টকার্ডে খবরটা পাঠানো দরকার। কিন্তু এই বউটার ওপর বিশ্বাস না-করে খবরটা যাচাই করে

নেওয়া উচিত। তখন মনে হল অপারেশন যদি হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে মাস্টারমশাই ফিরে আসতে পারেন।

বিকেলে মামা দোকানে এলে সে মিথ্যে কথা বলল, "মাস্টারমশাই একবার দেখা করতে বলেছেন। এক ঘণ্টার জন্যে যাব?"

মামার কপালে ভাঁজ পড়ল, "কেন? ডেকে পাঠালেন কেন? তুই তো আর ওঁর কাছে পড়াশোনা করিস না। কী দরকার!" তার পর মাথা নাড়লেন, "ও বুঝেছি।"

অবাক হয়ে তাকাল কার্তিক। সেটা লক্ষ করে মামা বললেন, "চাঁদা এনে দিতে বলবে তোকে। এখানকার একটা গরিব মেয়েকে চিকিৎসার জন্যে তিনি নাকি শিলিগুড়িতে নিয়ে গিয়েছেন। যাওয়ার আগে চাঁদা তুলেছিলেন। তাতে কুলোয়নি বলে আরও টাকা দরকার বোধহয়। ঠিক আছে, তোকে যেতে হবে না। আমি কাউকে দিয়ে কয়েকটা টাকা না হয় পাঠিয়ে দেব।"

মামা চলে যাচ্ছিলেন, মরিয়া হয়ে কার্তিক বলল, "আমি একবার যাই না। দেখা করেই চলে আসব।"

মামা ভাগ্নের দিকে তাকালেন। তার পর কী ভেবে মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন।

বাড়ির কাছাকাছি এসে কার্তিক জানতে পারল, মাস্টারমশাই আজই ফিরে এসেছেন। গতকালই ফিরতে পারতেন, কিন্তু তিস্তার জল আচমকা অনেকটা বেড়ে যাওয়ায় পারাপার বন্ধ ছিল। আজ নৌকো চালু হওয়ামাত্র ফিরে এসেছেন তিনি, কিন্তু শরীর ভাল না-থাকায় শুয়ে আছেন।

বাড়িতে এসে দেখা না-করে ফিরে যেতে হবে বলে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল কার্তিকের। কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী বাইরে এসে জানালেন, সে ভেতরে যেতে পারে। ঘরে সে দেখল মাস্টারমশাই চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলেন, স্ত্রীর কথা শুনে উঠে বসলেন।

"আপনার শরীর খারাপ, ডাক্তারকে দেখিয়েছেন?"

মাথা নাড়লেন মাস্টারমশাই, "অতিরিক্ত পরিশ্রমে এই রকম হয়েছে। এক দিন বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। বলো, কী খবর?"

"অপারেশন হয়ে গিয়েছে?"

"হ্যাঁ বাবা। উনকির অপারেশন খুব ভাল হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন দিন সাতেকের মধ্যেই ওকে ছেড়ে দেবেন। ভবিষ্যতে ওই জায়গায় আবার নতুন করে যাতে আব তৈরি না-হয় তার জন্যে সব ব্যবস্থা তাঁরা নিয়েছেন," তার পর একটু চুপ করে থেকে বললেন, "কার্তিক, তোমার ব্যাপারটা জানার পর আমার খুব খারাপ লেগেছিল। কিন্তু আমার ক্ষমতা আর কতটুকু।"

"আমি যাই স্যার," কার্তিক বলল।

"হ্যাঁ। এসো বাবা।"

সন্ধে নামছে। প্রায় জনশূন্য রাস্তায় ধার ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে সে দাঁড়িয়ে গেল। তার সামনে সোমরা হাঁটছে। পা টিপে টিপে পথ চলছে। সকলেই জানে, ও বাজারের চায়ের দোকান থেকে আসছে। লাইন থেকে এতটা পথ হেঁটে ও রোজ আসে চায়ের দোকানে আধ কাপ চা খেতে। দু'চোখে কোনও দৃষ্টি নেই তার। পায়ে পথ মেপে মেপে সেই কলোনির ও প্রান্ত থেকে চলে আসে উঠে যাওয়া হাটের চায়ের দোকানে। দোকানদার দয়া করে চা খেতে দিলে, আবার ওই ভাবে ফিরে যায় আস্তানায়। সেখানে সোমরা কার সঙ্গে থাকে, কে ওকে দু'বেলা খেতে দেয়, তা কার্তিকের জানা নেই। শুধু কার্তিক কেন, ওর খেলার সঙ্গীদেরও খেয়াল হয়নি কখনও।

দ্রুত পা ফেলে কার্তিক চলে এল পাশে। সম্ভবত পায়ের শব্দ পেয়েই দাঁড়িয়ে গেল সোমরা। তার অন্ধ চোখে-মুখে যেন অস্বস্তি ফুটে উঠল। কার্তিক বলল, "আমি।"

সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাব সরল হল। হেসে সোমরা বলল, "ও, কার্তিক!"

"তুই গলা শুনে কত মানুষকে চিনতে পারিস?" জিজ্ঞেস করল কার্তিক।

উত্তরটা ভাবার চেষ্টা করল সোমরা। মুখ ওপরে তুলে দুটো ঠোঁট দুমড়ে-মুচড়ে কিছু ভেবেও হতাশ হয়ে বলল, "নাঃ, বলতে পারব না।"

"তুই উনকিকে চিনিস?" জিজ্ঞেস করল কার্তিক।

"উনকি! কে উনকি?" মুখ নামাল সোমরা।

"ও তুই চিনবি না। উনকি নদীর ও পারের লাইনে থাকে। ওর চোখের ওপর বিশাল আব হয়েছিল। আব কী তা জানিস?"

মাথা নেড়ে না বলল সোমরা।

"ফোড়ার মতো, ধীরে ধীরে বড় হয়। কিন্তু ভেতরে পুঁজ হয় না।"

"ও, তা হবে। আমি তো কত কী জানি না।"

"সেই বড় আব অপারেশন করাতে উনকিকে নিয়ে মাস্টারমশাই গিয়েছিলেন শিলিগুড়িতে। অপারেশন হয়ে গেছে, ডাক্তার বলেছেন ভাল হয়ে যাবে।"

"ও," তার পর জিজ্ঞেস করল, "এখন কি রাত হয়ে গিয়েছে?"

"না, ঠিক রাত নয়, তবে বেশি দেরি নেই।"

"তা হলে আমি চলি। রাত হলে এই রাস্তায় শেয়াল বের হয়।"

"শেয়াল! তুই কি শেয়ালকে ভয় পাস?"

মাথা নেড়ে আবার পা ফেলল সোমরা। মাথা নিচু করে পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগল সোমরা। কার্তিকের মনে হল উনকির অপারেশন হওয়ার কথা শোনামাত্র ওর মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু কেন, সেটা বুঝতে পারল না সে।

দোকানে আসামাত্র মামা তাকে ভর্ৎসনা করতে শুরু করলেন। এই ভর বিকেলে মাস্টারমশাইয়ের কাছে যাবে বলে কোথায় গিয়েছিল সে, তার কৈফিয়ত চাইলেন। অনেকটা বকাবকির পরে তিনি সতর্ক করে বললেন, ভবিষ্যতে যেন এরকম না-হয়। বলে নিজের কাজে চলে গেলেন।

তবু রাগ হল না কার্তিকের। সে খরিদ্দার সামলাতে সামলাতে ভাবছিল, যাক উনকির চোখ থেকে আব চলে গেছে। আব চলে গেলে উনকিকে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর দেখাবে। তখন ওর বর এসে খুশি হয়ে নিতে চাইবে, কিন্তু উনকি কি বরের বাড়িতে ফিরে যাবে? কে জানে!

শিলিগুড়ি থেকে ফিরে এল উনকি। তাদের গ্রামের লোকজন তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। এখন কপালের ওপর একটা পাতলা কাপড়ের আড়াল থাকা সত্ত্বেও দুটো চোখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সবাই বলছে, আহা, মেয়েটার চোখ দুটো সত্যি সুন্দর।

সামান্য দুর্বলতা ছাড়া উনকির শরীরে কোনও কষ্ট নেই। হাসপাতাল থেকে দেওয়া ওষুধ তাকে খেয়ে যেতে হবে কিছুদিন। কাউকে না-জানিয়ে উনকির বাবা শনিচর জামাইকে খবর পাঠালেন একবার আসার জন্যে। তার বিশ্বাস, এসে মেয়ের মুখের দিকে তাকালে জামাই মুগ্ধ হবেই। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে প্রায় গোপনে খবরটা পাঠাল সে। মেয়েকে চমক দেবে বলে স্ত্রী আগে থেকে কিছু জানাল না।

প্রায় দু'সপ্তাহ শিলিগুড়িতে থাকায় চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছিল শনিচর। কোনও উপায় না-পেয়ে সে কম্পাউন্ডারবাবুর সামনে হাতজোড় করে সাহায্যের জন্যে আবেদন করল। নতুন ডাক্তারবাবু আসার পর কম্পাউন্ডারবাবুর কাজের পরিধি কমে গেছে। বড়সাহেবের কাছে যাওয়ার অধিকার তার নেই। কিন্তু একমাত্র বড়সাহেবই পারেন শনিচরকে সাহায্য করতে। কম্পাউন্ডারবাবু শনিচরকে পরামর্শ দিলেন, উনকিকে নিয়ে বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। উনকিকে দেখে হয়তো বড়সাহেব নরম হতে পারেন।

পরের দিন রবিবার। সকাল সকাল মেয়ে নিয়ে বড়সাহেবের বাংলোর সামনে পৌঁছে গেল শনিচর। দরোয়ানকে জানাল তারা বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চায়। দারোয়ান প্রথমে আপত্তি জানিয়েছিল, কিন্তু যখন শুনল বড়সাহেব অর্থ সাহায্য করেছিলেন বলে মেয়েটার কপালে অপারেশন করা সম্ভব হয়েছিল, তখন সে খবরটা ভেতরে দিল।

আরও আধঘণ্টা পরে তাদের ভেতরে যেতে বলা হল। বড়সাহেব হাফ প্যান্ট আর গোলগলা গেঞ্জি পরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ওকে দেখে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার?"

হাতজোড় করল শনিচর, "এই আমার মেয়ে। ওকে শিলিগুড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওখানকার হাসপাতালে অপারেশন হয়েছিল। ডাক্তার বলছে, আর কখনও কপালে আব হবে না।"

বড়সাহেব উঠে সামনে এসে উনকির কপাল দেখলেন। তার পর বললেন, "গুড। তোমার মেয়ের তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে?"

"হ্যাঁ সাহেব।"

"ওর স্বামী ওর সঙ্গে অপারেশনের সময় ছিল?"

কথা না-বলে মাথা নাড়ল শনিচর।

বড়সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "ওর এখন কত বয়স হয়েছে?"

"পনেরো," শনিচর জবাব দেওয়ার আগেই উনকি নিজের বয়স বলে দিল।

"ওকে। তোমার যখন ষোলো বছর বয়স হবে, তখন বাবাকে মনে করিয়ে দেবে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে," হাত দিয়ে চলে যাওয়ার ইশারা করে বড়সাহেব বাংলোর ভিতরে ঢুকে গেলেন।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হল শনিচর। বড়সাহেব একবারও তার চাকরির ব্যাপারে কথা বললেন না। মেয়েকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে সে সোজা মরাহাটের পাশে মধুর ভাটিখানায় চলে এল। খুব আনন্দ অথবা অত্যন্ত মন খারাপ না-হলে সে ভাটিখানায় বসে হাঁড়িয়া খায় না। পকেটে যা আছে, তাই দিয়ে হাঁড়িয়া কিনে খেতে খেতে তার নেশা এত চড়ে গেল যে, হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল ভাটিখানার একপাশে। মুখ হাঁ হয়ে গেল। মাঠের ইঁদুর দৌড়ে এসে মাথার চুল দাঁতে কাটলেও তার কিছুই বোধ হল না।

তার হুঁশ আসছিল আবার চলে যাচ্ছিল উনকির মায়ের চিৎকারে। কিন্তু তাতে কাজ হচ্ছিল না যখন, তখন একটি পুরুষ কণ্ঠ চেঁচিয়ে বলল, "ওতে হবে না উনকির মা। এই লাঠিটা দিয়ে ওর পিঠে মারো, দেখো যেন মাথায় না-লাগে।"

রাগ ছিল তার সঙ্গে সঙ্কোচ। কিন্তু স্বামীকে সুস্থ করতে আর কোনও উপায় না-পেয়ে লাঠিটা দিয়ে আলতো আঘাত করল সে। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হচ্ছে না দেখে তার রাগ বেড়ে গেল। আঘাত তীব্র হল। এবার উঃ আঃ বলে স্বামীকে ককিয়ে উঠতে দেখে সে হাত গুটিয়ে নিচ্ছিল, কিন্তু যে-লোকটি লাঠি এগিয়ে দিয়েছিল, সে চেঁচিয়ে বলল, "না না। ওতে হবে না আরও মারতে হবে। মায়াদয়া করা চলবে না।"

উনকির মা আবার মরিয়া হল। শেষ পর্যন্ত তার লাঠির আঘাতে শরীর দুমড়ে-মুচড়ে উঠে বসল শনিচর। সঙ্গে সঙ্গে পাশে দাঁড়ানো লোকটি এক বালতি জল ওর মাথায় ঢেলে দিতেই কিছুটা কাজ হল। সে দু'হাত ওপরে তুলে বন্ধ চোখেই উঠে বসতে চেষ্টা করল। এবার লোকটি এগিয়ে এসে শনিচরের হাত ধরে দাঁড় করানোর চেষ্টা করল। কিন্তু নিজের ভার সামলে রাখতে না-পেরে টলতে লাগল শনিচর।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, "আজ তুই বড়সাহেবের কাছে গিয়েছিলিস?"

দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা শোনার পর শনিচর জোরে দু'বার মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। লোকটা জিজ্ঞেস করল, "এখন তোর যা অবস্থা, তাতে তুই বড়সাহেবের হুকুমমতো গুদামবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারবি?"

শরীরের ভারসাম্য রাখার চেষ্টা চালিয়ে মাথা নেড়ে নিঃশব্দে না বলল শনিচর। লোকটা বলল, "তা হলে তোর চাকরি আর হবে না।"

কথাটা শোনামাত্র চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল উনকির মা। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি যাব, আমি যাব। আমি গেলে হবে?"

"যা। গিয়ে দেখ। আমি চললাম। লোকটি চলে গেলে উনকির মা স্বামীর হাত শক্ত করে ধরে, শরীরটাকে বাড়ির দিকে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

চা-পাতা তোলার কাজ করত উনকির মা। কিন্তু এই কাজ সারা বছর থাকে-না বলে বছরের অনেকটা সময় তার রোজগার থাকে না, স্বামীর আয়ের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। এখন স্বামীর চাকরি চলে গেলে তিন জনকেই না-খেয়ে থাকতে হবে। তাই মরিয়া হল সে।

বিকেলবেলা সে গিয়ে দাঁড়াল ফ্যাক্টরির সামনে। একটু পরেই ছুটি হবে। চা-পাতা তোলার মরসুম না-হলে মেশিন দিনরাত চালু থাকে না। কিন্তু কী করে ফ্যাক্টরির বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করবে, ভেবে পাচ্ছিল না সে।

ফ্যাক্টরি ছুটি হল। শ্রমিক-কর্মচারীরা একে একে বেরিয়ে যেতে লাগল। এই সময়ে উনকির মা দেখল, ফ্যাক্টরির ভেতর থেকে বড়সাহেব, মেজোসাহেব আর তাঁদের পেছনে বড়বাবু বেরিয়ে আসছেন। সে ভয় পেল, যদি তাকে এখানে দেখে ওঁরা বিরক্ত হন, তা হলে এখানে আসার উদ্দেশ্যটাই বিফলে যাবে। সে আড়াল খুঁজে একটা দাঁড় করিয়ে রাখা লরির পেছনে বসে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সেটা নজর এড়াল না বড়সাহেবের। বড়বাবুকে তিনি নিচু গলায় কিছু বললে বড়বাবু দু'পা এগিয়ে চিৎকার করে তাকে সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বললেন।

বাধ্য হল উনকির মা। বড়বাবু বেশ রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কে?"

"আমি শনিচরের বউ, উনকির মা।"

"এখানে কী করছিস তুই?"

উত্তরটা দিতে পারল না উনকির মা।

বড়সাহেব বললেন, "উনকি? আচ্ছা। তুমি কী করো?"

"পাতি তুলি, বহু দিন কাজ থাকে না তাই..."

বড়সাহেব বড়বাবুকে বললেন, "ও কী চাইছে তা শুনুন। যদি সম্ভব হয় তা হলে হেল্পারের চাকরি দিয়ে দিতে পারেন।"

তাকে ওখানেই দাঁড়াতে বলে বড়বাবু সাহেবের সঙ্গে অফিসের দিকে চলে গেলে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিল উনকির মা।

চল্লিশ মিনিট পরে ফ্যাক্টরির গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল উনকির মা। বড়বাবু তাকে হেল্পারের চাকরি দিয়েছেন। রোজ আট ঘণ্টা ডিউটি দিতে হবে। সপ্তাহে একদিন ছুটি থাকবে। চা-পাতা তুলে যে-টাকা সে পেত, তা চেয়ে কিছু বেশি মাইনে। তবে চাকরিটা সারা বছর থাকবে।

দুটো পা যেন থামতে চাইছিল না। খানিক এগোতেই সেই লোকটাকে সে দেখতে পেল, যে তার সঙ্গে তার বরকে নিয়ে আসতে ভাটিখানায় গিয়েছিল। তাকে দেখে লোকটি জিজ্ঞেস করল, "কী রে! দৌড়চ্ছিস কেন?"

এক গাল হেসে উনকির মা বলল, "তোমার জন্যে আমি আজ চাকরিটা পেয়ে গেলাম। সারা বছর ধরে কাজ থাকবে।"

"বাঃ, খুব ভাল। তা, যার জন্যে চাকরি পেলি, তাকে যেন ভুলে যাস না।"

মেয়ে খুব খুশি। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখছিল তার মাকে। মাকে এত খুশি, এত হাসিমাখা মুখে কথা বলতে সে কখনও দেখেনি। এ যেন একদম অচেনা মা। অথচ বাবার কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

শনিচর তার খাটিয়াতে শুয়ে আছে চোখ বন্ধ করে। উনকি এগিয়ে গিয়ে তাকে বলল, "বাবা, মা গুদামে চাকরি পেয়েছে।"

একটু সময় নিয়ে শনিচর বলল, "ভাল।"

দু'দিন চাকরি করেই হাবভাব পাল্টে গেল উনকির মায়ের। এটা বাগানে বাগানে ঘুরে চা-পাতা তোলার কাজ নয়, ফ্যাক্টরির ভেতরে একটু সেজেগুজে না-থাকলে বেমানান লাগে। আর আশ্চর্য ব্যাপার, বউ কাজে যাওয়ার পর থেকে শনিচরের ঘুমের নেশা যেন অনেক বেড়ে গেছে। স্নান-খাওয়ার সময়টুকু বাদ দিলে বাকি সময় সে খাটিয়াতে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে।

তিন দিন পরে রবিবারের সকালে শনিচরের বেয়াই এক আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে এল। ঘরের বাইরে এক চিলতে ঘেরা বারান্দায় বাইরের লোককে বসতে দেওয়া হয়। সেখানে বসে একটু অবাক হয়ে বেয়াইমশাই বেয়ানকে দেখে জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছেন সবাই?"

শিল্পী: **নন্দলাল বসু**

সৌজন্য: সুবীর মিত্র

দরজায় দাঁড়িয়ে উনকির মা বলল, "ভাল। তবে মেয়ের বাবার শরীর ভাল না।"

"সে কী। কী হয়েছে?" বেয়াইমশাই যেন উদ্বিগ্ন হলেন।

"শিলিগুড়িতে মেয়ের চিকিৎসার জন্যে গিয়েই শরীর খারাপ হয়েছে। ডাক্তার সব সময়ে শুয়ে থাকতে বলেছেন।"

"ও! তা হলে তো খুব মুশকিল হল।"

"হ্যাঁ। কিন্তু বড়সাহেব আমাকে ওর বদলে চাকরি দিয়েছেন।"

"বাঃ, এ তো খুব ভাল খবর। তা মেয়ে কোথায়? আসছে না কেন?"

মাথা ঘুরিয়ে ঘরের ভেতর তাকিয়ে উনকিকে দেখতে পেয়ে, তিনি ইশারা করলেন বাইরে আসতে। বোঝা গেল আসতে ইচ্ছে নেই, তবু এল উনকি।

শ্বশুর বললেন, "বাঃ, কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে। তুমি তো বিয়ের সময়ে যা ছিলে, তার চেয়েও সুন্দর হয়ে গেছ। তা মা, অনেকদিন তো হয়ে গেল এবার মায়ের বাড়ি ছেড়ে নিজের সংসারে চলো। তোমাকে নিতে এসেছি।"

উনকি কোনও জবাব না-দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরাল।

"তুমি কি খুব রাগ করে আছ। আহা, ভুল তো মানুষ মাত্রই হয়। আমার ছেলের তো খুব মন খারাপ। আপনি কী বলেন, আপনার মেয়ে তো আমার বাড়ির বউও। তাই বউকে নিয়ে গেলে নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না।"

উনকির মা বলল, "এখন তো মেয়ে বড় হয়েছে। ওর যা ঠিক মনে হয়, তাই করুক। আমি কী বলব!"

"এই কথাটা আমাকে তাড়িয়ে দেওয়ার সময় আপনাদের মনে ছিল না! এখন আর আমার পক্ষে... তা ছাড়া ডাক্তার বলেছেন, কেটে ফেলা ফোড়াটা আবার ফুটে উঠবে, একটু একটু করে বড় হবে। তার পর চোখ ঢেকে ফেলবে," গলার স্বর কাঁদো কাঁদো হল উনকির, "আমার মুখ তখন কী রকম দেখাবে ভাবলেই আমি শিউরে উঠছি! ওঃ!"

"ডাক্তার একথা বলেছে?" শ্বশুরের গলার স্বর পাল্টে গেল।

"হ্যাঁ। আমার চোখের ওপরে জলপাইগুড়িতে অপারেশন হয়েছিল। কিন্তু তার পরে তো আবার করতে হল," মাথা নিচু করল উনকি।

উঠে দাঁড়ালেন শনিচরের বেয়াই। আকাশের দিকে মুখ তুলে কোমরে দু'হাত রেখে বললেন, "তা হলে আর কী করা যাবে! চলি আমি।"

"চলে যাবেন?" অস্বস্তি ফুটে উঠল উনকির মায়ের গলায়।

"আর কী করব?" কয়েক পা হেঁটে ঘুরে দাঁড়ালেন বেয়াই, "শোনো, সত্যি কথা খোলাখুলি বলাই ভাল। মেয়ের এই রকম বারংবার হবে আর সে হাসপাতালে গিয়ে ঝরিয়ে আসবে, এ তো চলতে পারে না। জলপাইগুড়িতে গিয়ে কাজ হল না, শিলিগুড়িতে গেল। শিলিগুড়িতে যখন হবে না, তখন হয়তো কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে ওকে। তাতেও যখন হবে না, তখন কোথায় নিয়ে যেতে হবে, তা ভগবানই জানেন। এ তো চলতে পারে না!" একটু থেমে জোর গলায় বেয়াই বললেন, "শোনো, এই বিয়ে আমি ভেঙে দিয়ে যাচ্ছি। আমি আবার আমার ছেলের বিয়ে দেব," কথা শেষ করেই হনহনিয়ে বেরিয়ে গেলেন বেয়াই, সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে।

পরীক্ষা দিয়ে ছেলেরা ফিরে এল চা-বাগানের বাড়িতে। রেজ়াল্ট ভাল হলে যে যার পরিকল্পনামতো কলেজে ভর্তি হতে চলে যাবে। এই কলেজ-জীবন শেষ হতে না-হতেই কারও কারও বাবার চাকরির আয়ু ফুরিয়ে যাবে। ফলে তাদের পরিবার থেকে এখনই শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়িতে জমি কিনে বাড়ি তৈরির চেষ্টা করছে। জলপাইগুড়ির গায়ে তিস্তা নদীর ওপরে সেতু তৈরি হয়েছে। ট্রেন চলাচলের পাশাপাশি গাড়ি চলাচলের সেতু। তবু শিলিগুড়ি শহর বা শহরতলি, যা এতকাল ছিল উপেক্ষিত, তার জমির দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে। তুলনায় জলপাইগুড়িতে কোনও শিল্প না-থাকায় এবং ভৌগোলিক অবস্থার কারণে জলপাইগুড়ির আশপাশে মধ্যবিত্তরা জমি কিনতে সমর্থ হচ্ছে।

কিন্তু এসব চিন্তা ছেলেদের মাথায় নেই। ঠিক দুপুর দুটোয় যখন চারধার খাঁ খাঁ করছে, তখন ওরা সাইকেল চালিয়ে চলে আসে কার্তিকের দোকানে। এই সময়ে কোনও খরিদ্দার দোকানে আসে না। মামারও এখন ভাতঘুমের সময়। একা দোকান পাহারা দেয় কার্তিক। বন্ধুরা দোকানের পাশে তাদের সাইকেল রেখে উঠে আসে। অতীন বলল, "তোকে কাল বলেছিলাম, সব জিনিসের দাম একটা কাগজে লিখে রাখতে। আজ আমরাই কিছুক্ষণ দোকানদারি করব।"

হেসে ফেলল কার্তিক, "ওটা করার সময় পাইনি রে। বসে পড়।"

"মামা আসবে না তো?" দীপু জিজ্ঞেস করল।

"না। পাঁচটার আগে দোকানে আসে না," কার্তিক জানাল।

দোকানের ভেতরে রাখা বড় বাক্সগুলো উল্টে, তার ওপরে বসে পড়ল ছেলেরা। কিশোর বলল, "দে একটা সিগারেট দে।"

"আজ নাম্বার টেন আর কাঁচি সিগারেট আছে। কিন্তু প্যাকেট খুললেই মামা গুনে দেখবে ক'টা বিক্রি হয়েছে," কার্তিক বলল।

"তোর কোনও স্বাধীনতা নেই?" খোকন জিজ্ঞেস করল।

"না নেই," গম্ভীর গলায় বলল কার্তিক।

"ঠিক আছে। আমরা তো দুটো সিগারেট এতজন মিলে খাব। যা দাম, তা তুই নিয়ে নে। কত দাম?" অতীন জিজ্ঞেস করল।

"থাক, তোদের দাম দিতে হবে না," একটা নাম্বার টেন সিগারেট প্যাকেট থেকে বের করে এগিয়ে দিল কার্তিক। ঝটপট সেটা নিয়ে সামনে পড়ে থাকা দেশলাই তুলে আগুন সংযোগ করল খোকন। তার পর অনেকটা ধোঁয়া ছেড়ে সিগারেটটা এগিয়ে দিল অতীনকে।

হাতে হাতে ঘুরতে ঘুরতে সিগারেটের চেহারা ছোট হতে হতে যখন আঙুলে আগুন ঠেকব ঠেকব হল, তখন খোকন সেটা চটির নীচে ফেলে পিষে, ছুড়ে দিল বাইরে।

কার্তিক জিজ্ঞেস করল, "তোরা রোজ সিগারেট খাস?"

অতীন মাথা নাড়ল, "দূর! মুখে গন্ধ পেলে দাদু রক্ষে রাখবে না। এই তো, আজও বাড়ি যাওয়ার আগে ভাল করে মুখ ধুয়ে যেতে হবে।"

ওই সময় এক জন বৃদ্ধা একটা বোতল এগিয়ে ধরল, "আট আনার সরিষার তেল। তাড়াতাড়ি," তার পর ভাল করে দেখে বলল, "বাব্বা! এত দোকানদার! হলটা কী!"

হাত বাড়াচ্ছিল কার্তিক, কিন্তু তার আগেই কিশোর বোতলটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বলল, "তুই বসে থাক। আমি দিচ্ছি!"

"তুই পারবি না," আপত্তি জানাল কার্তিক।

"ঠিক পারব। গতকাল যখন এসেছিলাম, তখন আমি দেখে নিয়েছি কোথায় কী আছে," বলতে বলতে বোতলটা নিয়ে যেখানে সরষের তেল রয়েছে, সেখানে গিয়ে টিন থেকে তেল হাতায় তুলে বোতলে ঢালতে লাগল কিশোর।

চিৎকার করে উঠল কার্তিক, "আরে আরে! অত ঢালছিস কেন, অর্ধেক নামিয়ে রাখ।"

তেল নিয়ে বৃদ্ধা চলে গেলে কার্তিক বলল, "এই ভাবে বিক্রি করলে মামা আমার বারোটা বাজিয়ে দেবে।"

দীপু বন্ধুদের বলল, "না, না। কার্তিককে না-দেখিয়ে জিনিস বিক্রি করিস না। এই, তোর এখানে চা খাওয়া যাবে?"

"না রে," কার্তিক মাথা নাড়ল।

হঠাৎ কিশোর জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে, সেই মেয়েটা যে গাছে উঠে বসেছিল, তাকে বিয়ের পর আর দেখেছিস?"

কার্তিক মাথা নাড়ল, "না। আমি দেখব কী করে? তোরা বাগানে না-এলে তো আমি ছুটি নিই না। আর এই ছুটি পেতে কী কথা শুনতে হয় তা আমিই জানি।"

"আমরা যে তোর এখানে দুপুরবেলায় আসছি, তা তোর মামা জানতে পারে কী করে?"

"বোধহয় মামার মাথার পেছনে দুটো চোখ আছে। তোরা পড়াশোনা করছিস, ক'দিন পরে কলেজে ভর্তি হবি। তোদের তো চাকরি বাঁধা। আমার পেটে বিদ্যে নেই, মাথা ঠুকলেও কেউ আমাকে চাকরি দেবে

না,” ম্লান গলায় বলল কার্তিক।

কথাটা অস্বীকার করতে পারল না বন্ধুরা। তাদের সামনে রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি, কার্তিকের সামনে কিছু নেই। ওকে সারা জীবন গরিব শ্রমিকদের অল্প পয়সার মুদির জিনিস বিক্রি করে যেতে হবে।

দীপু বলল, “কথাটা খারাপ লাগলেও খুব সত্যি।“

খোকন বলল, “তা হলে রোজ আমাদের এখানে এসে বসা উচিত নয়।”

অতীন মাথা নাড়ল, “কার্তিকের উপকার না-করি, ক্ষতি করতে পারি না। ঠিক আছে কাল থেকে যে ক’দিন এখানে আছি, তোর দোকানে আসব না কার্তিক।”

“তা হলে?” কার্তিক একেবারে মিইয়ে গেল।

কিশোর বলল, “তুই বিকেলে কিছুক্ষণ ছুটি ম্যানেজ করে আমাদের খেলার মাঠে আসবি। তখন কথা হবে।”

“রোজ যদি ছুটি পাই,” বড় শ্বাস ফেলল কার্তিক।

এখন ফুটবলের মরসুম নয়। দড়ি টাঙিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলে ওরা। ডাবলস হলে চার জন খেলতে পারে। যে-দু’জন হারে, তাদের জায়গায় সেই শ্রমিক পরিবারের দুই বালক, যারা এর মধ্যে কৈশোরের শেষ প্রান্তে এসেছে, জুড়ি হিসেব র‌্যাকেট ধরে। ভাল খেলে ওরা, তাই খেলা জমে যায়।

প্রথম দিন দর্শক ছিল খুব কম। দ্বিতীয় দিনে বেড়ে গেল, দীপু ছিল অতীনের পার্টনার। খেলার মাঝখানে সে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, “দেখেছিস?”

অতীন না-বুঝতে পেরে মাথা নাড়ল।

“উনকি এসেছে। দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের খেলা দেখছে।”

“সে কী রে!” মাথা ঘুরিয়ে তাকাল অতীন। দেখল, দূরে চার-পাঁচজন দর্শকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে উনকি। অদ্ভুত ব্যাপার, এখনও তার পিঠে খুব ছোট একটি শিশুকে বেঁধে রেখেছে সে। তাকে লক্ষ করা হচ্ছে বুঝতে পেরে, সে প্রথমে অন্য দিকে মুখ ঘোরাল। এদিকে আর তাকাচ্ছিল না সে।

দীপু বলল, “ওর দিকে তাকাস না, খেলা শুরু কর।”

খেলতে খেলতে ওরা লক্ষ করল উনকি আবার মুখ ফিরিয়ে খেলা দেখছে। খেলা শেষ হওয়া মাত্র, দীপু লক্ষ করল, বেশ জোরে পা ফেলে উনকি চোখের আড়ালে চলে গেল। সে অতীনকে জিজ্ঞেস করল, “এই মেয়েটা আমাদের খেলা দেখতে রোজ আসে কেন বল তো?”

“স্পোর্টস লাভার। এ ছাড়া আর কী,” অতীন বলল।

একটা অস্বস্তির আবহাওয়া যেন পাক খাচ্ছিল বন্ধুদের মধ্যে। স্কুলের শেষ পরীক্ষার ফল বের হওয়ার পর দেখা গেল, অতীন আর কিশোর ষাটের ওপর নম্বর পেয়ে গেছে। কলকাতার নামী কলেজে ওরা স্বচ্ছন্দে ভর্তি হতে পারে। খোকনের ফল একটু নীচের দিকে। ওকে মামার বাড়িতে থেকে জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজেই পড়তে হবে। দীপু কলকাতা যাবে কমার্স পড়তে। প্রত্যেকের বুকে দ্রিমি দ্রিমি উত্তেজনা। এই চা-বাগান থেকে জলপাইগুড়ি গিয়ে কোনও অসুবিধে হয়নি। ছুটি হলেই ওরা চলে আসত দল বেঁধে। কলকাতা গেলে সেটা যে সম্ভব হবে না, তা বুঝতে পারছিল সবাই। তার ওপর খোকনের বাবার চাকরির মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী বছর পুজোর এক মাস আগে। জলপাইগুড়ির উপকণ্ঠে জমি কিনে তিনি বেশ কিছুদিন ধরে একটু একটু করে বাড়ি তৈরি করে ফেলেছেন, যাতে অবসর নেওয়ার পর সেখানে গিয়ে নিশ্চিন্তে বাস করতে পারেন। ছেলে বাড়িতে থেকেই কলেজে যাতায়াত করতে পারবে।

কিন্তু এই চলে যাওয়ার অর্থ হল এত কালের বন্ধুদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। ওরা বসেছিল খেলার মাঠে। আজ খেলায় মন ছিল না কারও। এখন বিকেল। রোদ মরে গেছে, কিন্তু অন্ধকার নামতে ঢের দেরি। কিশোর বলল, “মন খারাপ করিস না খোকন। সামনের বছর তোর বাবা অবসর নিচ্ছেন। দু’বছর পরে আমার বাবা। তার পর কারও না কারও। এটাই নিয়ম। মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।”

দীপু বলল, “দেখা না-হোক, আমরা তো চিঠিতে যোগাযোগ রাখতেই পারি।”

কথা খুঁজে পাচ্ছিল না ওরা। এই সময়ে দূরে উনকিকে দেখা গেল। কোন একটা শিশুকে পিঠে বেঁধে মাঠের ওই প্রান্ত দিয়ে মাথা নিচু করে হেঁটে যাচ্ছে। ও কোথায় যাচ্ছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। এদিকে যাওয়ার মতো কোনও জায়গা ওর আছে বলে এত দিন ছেলেদের জানা ছিল না।

কার্তিক এসেছিল আজ। বলল, “কয়েক মাস পরে উনকি চা-বাগানে চাকরি পেয়ে যাবে!”

“কী করে জানলি?” অতীন জিজ্ঞেস করল।

“এসব কথা মুখে মুখে ঘোরে। আমাদের দোকানে যারা জিনিস কিনতে আসে, তারা বলাবলি করে। চাকরি পেয়ে গেলে মেয়েটার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত,” কার্তিক বলল।

অতীন দেখল, উনকি আবার যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকেই ফিরে গেল। কিন্তু এত দূর থেকে মনে হল, উনকির একটা চোখ যেন একটু অস্বাভাবিক। কথাটা বন্ধুদের সে বলল না। তার ভুল হতে পারে।

সবাই যখন চলে যাচ্ছে, কেউ কলকাতায় কেউ জলপাইগুড়িতে, তখন শেষবার ওরা একসঙ্গে হল। কার্তিক এল একটু পরে। এসে বলল, “তোরা আমাকে ভুলে যাস না যেন। আমার তো কোথাও যাওয়ার উপায় নেই, এখানেই থাকতে হবে আমাকে। মনে থাকবে তো?“

সবাই ওর হাত জড়িয়ে ধরল। কেঁদে ফেলল কার্তিক। চোখ মুছে সে বলল, “কাল রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখে খুব মন খারাপ হয়ে গেছে রে।”

দীপু জিজ্ঞেস করল, “স্বপ্ন? কী রকম স্বপ্ন?”

“দেখলাম, অনেক বছর পরে তোদের এক জন এখানে খুব দামি গাড়ি চালিয়ে এসে চারপাশে তাকাল, কিন্তু আমাকে দেখেও চিনতেও পারল না,” কার্তিক বলল।

“ধ্যাত!” অতীন হেসে বলল, “এরকম কখনওই হবে না, পাগল নাকি। বাল্যবন্ধুকে কেউ কখনও ভুলতে পারে না। তুই এসব কথা একদম ভাববি না।”

“ও হ্যাঁ, আর-একটা খারাপ খবর আছে। মানে, খবরটা আমার কানে দোকানে কাজ করার সময় এসেছে। এখনও জানি না সত্যি কি না!” কার্তিক বলল।

“কী খবর?”

“উনকির বোধহয় দ্বিতীয়বারের অপারেশনটা ঠিকঠাক হয়নি,” কার্তিক বলল।

“সে কী? তুই কার কাছে শুনলি?” কিশোর জিজ্ঞেস করল।

“শুনেছি। ওর ভুরুর ওপরটা কারও কারও মনে হচ্ছে একটু উঁচু লাগছে।”

“সর্বনাশ!” অতীন বলল।

“আমাদের কিছু করার নেই,” দীপু বলল।

“করার নেই মানে করার ক্ষমতাই নেই,” অতীন বলল।

খারাপ লাগছিল। কিন্তু এত দিনের শেকড় ছিঁড়ে চা-বাগান থেকে কলকাতায় চলে যাওয়ার আগের দিনে এত রকমের উত্তেজনা ছোবল মারছিল যে, উনকিকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার সুযোগ পায়নি ওরা।

ব্যাপারটা ঘটল একটু অদ্ভুতভাবে।

দু’মাস পরে শিলিগুড়ির হাসপাতালে মেয়েকে নিয়ে মা গিয়েছিল ডাক্তার দেখাতে। অপারেশনের পরে সেকথাই তাদের বলা হয়েছিল। উনকির বাবা অসুস্থ। একটু হাতে-পায়ে শক্তি পেলেই ধার করে পয়সা জুটিয়ে হাঁড়িয়া কিনে খায়। খেয়ে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। মা যদি না আনত, তা হলে উনকির হাসপাতালে পৌঁছনো সম্ভব ছিল না। যে-ডাক্তার অপারেশন করেছিলেন, তিনি উদ্বিগ্ন হলেন। অপারেশনের

জায়গাটা আবার ফুলে উঠেছে।

সে সময় শিলিগুড়িতে ডাক্তারদের একটা সম্মেলন চলছিল। কলকাতা থেকে তো বটেই, ভুবনেশ্বর থেকেও ডাক্তার এসেছিলেন। যে-ডাক্তার উনকির অপারেশন করেছিলেন, তিনি সম্মেলনে আসা সার্জেনদের বিষয়টি জানালে, তাঁদের মধ্যে দু'জন সিনিয়র ডাক্তার উনকিকে দেখতে চাইলেন। দেখার পর আগের অপারেশনের রিপোর্ট পরীক্ষা করে প্রস্তাব দেন, পেশেন্টকে কলকাতায় নিয়ে যেতে। সেখানে তাঁরা উনকিকে সম্পূর্ণ সরকারি আতিথ্যে হাসপাতালে রেখে অপারেশন করবেন নতুন করে।

মুশকিলে পড়ল উনকির মা। তার স্বামীকে একলা চা-বাগানে রেখে দু'-তিন দিন বাইরে থাকা যদিও- বা যায়, কলকাতায় যাওয়া খুবই মুশকিল। তবু স্বামী এবং মেয়ের জীবনের গুরুত্ব দিতে গিয়ে দ্বিতীয়জনকে বেছে নিয়ে উপায় রইল না তার।

খবরটা চা-বাগানে এলে অনেকেরই মনে হল বিশ্বাসযোগ্য নয়। এক জন গরিব অসহায় মেয়ের ভাগ্য এত ভাল যে, বিনা পয়সায় এমন সাহায্য পেয়ে যাবে? কিন্তু পরিবর্তন হল শনিচরের। সে হাঁড়িয়া খেতে যাচ্ছে না, বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে না, সেদ্ধ-ভাত খেয়ে শুয়ে থাকছে।

সচরাচর এমন হয় না।

কলকাতার দু'জন নামী ডাক্তার উদ্যোগী হয়ে উনকি এবং তার মাকে সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। শিলিগুড়ির হাসপাতাল ওদের যাওয়া-আসার ব্যবস্থা করবে। কলকাতার সরকারি হাসপাতালে সম্পূর্ণ সরকারি উদ্যোগে উনকির চিকিৎসা হবে। তবে যেতে হবে দিন পনেরো পরে। উনকির মা ভেবে পাচ্ছিল না, সে একা কী করে সব সামলাবে। উনকির বাবার কাছ থেকে কোনও সাহায্য যে পাওয়া যাবে না, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কোন তারিখে শিলিগুড়ির হাসপাতালে এসে সুপারের সঙ্গে দেখা করতে হবে, তা ওদের বলে দেওয়া হল।

পৌঁছনোর খবর প্রচারিত হওয়ামাত্র উনকিদের ঘরের সামনে ভিড় জমল, সবাই জানতে চায় যা রটেছে, তা সত্যি কি না! সত্যি হলে সেটা কী করে সম্ভব হল? কোনও বড় মানুষ সাহায্য না-করলে সরকারের সাহায্য কেউ পেয়েছে বলে ওরা শোনেনি। ওদের কোন বড় মানুষ সাহায্য করল?

এই সব প্রশ্নের একটারও জবাব উনকির মায়ের জানা ছিল না। তাই কাউকে ঠিকঠাক জবাব দিতে পারছিল না সে। বেশ হতাশ হয়ে ভিড় যখন ঘরের সামনে থেকে চলে গেল, তখন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে উনকির শ্বশুর দেখা করতে এল।

নমস্কার করে উনকির শ্বশুর বলল, "খবর পেলাম বেয়াইমশাই নাকি খুব অসুস্থ। এখন কেমন আছেন?"

"মোটামুটি। কিন্তু কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে," উনকির মা বলল।

"না না, কথা বলার দরকার নেই। আচ্ছা, ছেলে আমাকে জোর করে নিয়ে এল। যা ঘটে গিয়েছে, তার জন্যে ও খুব অনুতপ্ত। বুঝলেন!"

"না। বুঝতে পারলাম না," উনকির মা বলল।

"আসলে ওই যে সেবার বউমার কপালের আব একটা চোখ ঢেকে দিয়েছিল, আমার ছেলের মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। তখন যা হয়, বউমাকে ফেরত দিয়ে গিয়েছিল এখানে। তার পর আমি যখন শুনতে পেলাম, অপারেশনের পর কপাল সমান হয়ে গিয়েছে, তখন ওকে না-বলে বউমাকে ফেরত নিতে এসেছিলাম। কিন্তু তখন সেটা সম্ভব হয়নি।"

"এসব কথা এখন বলছেন কেন?"

"বলছি কারণ, এখন ওর মনে অনুশোচনা এসেছে। বুঝতে পেরেছে খুব অন্যায় করেছে সে সময়ে। তাই আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে।"

"ওসবের এখন কী দরকার!"

"দরকার আছে। শুনলাম, ডাক্তাররা আপনাদের মা-মেয়েকে কলকাতা নিয়ে যেতে চাইছেন চিকিৎসার জন্যে। কিন্তু ঘরের মেয়েছেলে কলকাতা গিয়ে তো দু'চোখে অন্ধকার দেখবে। তাই ওদের সঙ্গে এক জন পুরুষমানুষ থাকা দরকার। তাতে শুধু ওদের নয়, আমাদের মনেও ভরসা আসবে।"

"ও। ঠিক আছে মেয়ের সঙ্গে কথা বলে দেখি।"

"সে কী! ওইটুকু মেয়ের সঙ্গে আবার আলোচনা করার কী আছে, কী বোঝে সে? না না, কথা বাড়ানোর দরকার নেই। আপনাদের জামাই সঙ্গে যাবে। কী রে?"

এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল জামাই। বাবার কথা কানে যাওয়ামাত্র এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে উনকির মায়ের পা ছুঁতে চেষ্টা করেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি তো আপনার ছেলের মতো, যদি ভুল করে থাকি, তা হলে ক্ষমা চাইছি, ক্ষমা করে দিন।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে," বিড়বিড় করে বলল উনকির মা।

"না না, ঠিক নেই," বলতে বলতে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দরজায় দাঁড়াল শনিচর, "বিয়ে ভেঙে দিয়ে যারা চলে গেছে, তাদের সঙ্গে কথা বলছ কেন? চলে যেতে বলো, চলে যেতে বলো," কোনও রকমে কথাগুলো বলে আবার ভেতরে চলে গেল শনিচর। কয়েক সেকেন্ড কেউ কথা বলল না। তার পর বেয়াইমশাই ম্লান হাসলেন, "সত্যি শরীর খুব খারাপ হয়েছে। নইলে কিসে নিজের মেয়ের ভাল হবে, তা বুঝতে পারছেন না। উনকির মা, আমরা কিছুই মনে করছি না। আপনারা কবে কলকাতায় যাবেন তার দিন কি ঠিক হয়েছে?"

মাথা নেড়ে কথা-না বলে উনকির মা জানাল, না।

"যাওয়ার এক দিন আগে জানালেই হবে, ছেলে চলে আসবে। আপনি কি আগে কখনও কলকাতায় গিয়েছেন?" বেয়াই জিজ্ঞেস করলেন।

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে না বলল উনকির মা।

"তা হলে আপনার জামাই সঙ্গে থাকলে খুব সুবিধে হবে। আচ্ছা, আজ তা হলে আমরা যাচ্ছি। আপনাদের যদি বিরক্ত করে থাকি তা হলে..., হেঁ হেঁ..."

শ্বশুর একগাল হেসে ঘুরে দাঁড়ালে জামাই কথা বলল, "মা, যদি উনকিকে এক বার ডেকে দেন, তা হলে ভাল হত।"

উনকির মা তাকাল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে জামাই বলল, "একটা জিনিস দেওয়ার ছিল," কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা কাগজে মোড়া প্যাকেট বের করল সে, "আমার মা ওর জন্যে পাঠিয়েছে।"

"এখন দিতে হবে না। ওর মন খুব খারাপ। যদি কলকাতায় যাওয়া ঠিক হয় তখন," কথা শেষ করল উনকির মা।

শ্বশুর বলল, "ঠিক আছে খোকা, যা বলছে তা শোন, পরেই দিস।"

ওরা দু'জন বেরিয়ে গেলে উনকির মা স্বস্তির শ্বাস ফেলল। তার পর ঘরে ঢুকে দেখল, উনকি এক কোণে বসে হাঁটুতে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ দেখে, উনকির মা বলল, "ওরা চলে গেছে।"

মুখ তুলল উনকি। জলে ভেজা চোখে যেন আলো পড়ল। দ্রুত দু'হাতে মুখ মুছে উঠে সে বাবার কাছে চলে এল। তার পর বাবাকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকল কিছুক্ষণ।

তখনও রোদ্দুর গাছেদের শরীরে। ভাতে ভাত খেতে বেলা হয়েছে বিস্তর। তার পর উনকি ঘরের বাইরে বের হল। আট বছরের মালা তাকে দেখে ছুটে এল। মেয়েটা থাকে ও-পাশের ঘরে। বলল, "তুমি নাকি কলকাতায় যাবে?"

মাথা নাড়ল উনকি। তার পর বলল, "কোনও বাচ্চাকে নিয়ে আসতে পারবি? বাচ্চা পেলে ওর মাকে আমার কথা বলে নিয়ে আসবি।"

মেয়েটা গালে আঙুল দিয়ে খানিক ভাবল। তার পর দৌড়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। একটু পরে কয়েক মাস আগে মা হওয়া একটি শ্রমিক পরিবারের বউকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল, যার কোলে শিশু ঘুমিয়ে আছে।

মহিলা সামনে এসে বলল, "ও তুমি। তোমার চোখ ভাল আছে তো?"

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল উনকি। মহিলা বলল, "ও বলল তুমি আমার মেয়েকে পিঠে নিয়ে বেড়াতে বের হবে। অল্পবয়সি মেয়ে একা একা বেড়ালে অনেক সমস্যা হয়।"

"ও কি খুব কান্নাকাটি করে?" জিজ্ঞেস করল উনকি।

"একদম না। আমার মেয়ে খুব শান্ত। বেশির ভাগ সময় ও ঘুমিয়ে থাকে। তুমি নিশ্চিন্তে ওকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারো," মহিলা তার মেয়েকে উনকির পিঠে একটা কাপড় দিয়ে ভাল করে বেঁধে দিল। তার পর বলল, "দেখলে, একটুও কাঁদল না।"

শিশুটিকে পিঠে নিয়ে উনকি বের হল। ছোট নদীর সাঁকোর ওপর কিছু ক্ষণ দাঁড়িয়ে বিকেলের গাছগাছালি দেখল খানিকক্ষণ। তার পর চা-বাগানের কোয়ার্টার্সের মাঝখানের সরু গলি দিয়ে চলে এল খেলার মাঠের পাশে।

শূন্য মাঠে একটুও রোদ নেই। খেলছে না ছেলেরা। চারধার একেবারে শুনশান। উনকি ধীরে ধীরে মাঠের মাঝখানে চলে এল। কোয়ার্টার্সগুলোর জানলা-দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ক'দিন আগেও যারা এখানে হইচই করত, তারা চলে গেছে যে যার কলেজে। বুকে যেন ভয় জমল। ঠিক তখনই গাড়ির আওয়াজ কানে এল। উনকি মুখ তুলে দেখল একটা ছোট গাড়ি পিচের রাস্তা থেকে নেমে চলে যাচ্ছে একটা কোয়ার্টার্সের দিকে। গাড়ি থামার আগে ড্রাইভার বেশ জোরে হর্ন বাজাল।

বাড়ির দরজা আর গাড়ির দরজা প্রায় একসঙ্গে খুলে গেল। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী হাসিমুখে দরজায় এসে দাঁড়ালেন। গাড়ি থেকে দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল মেয়ে। জামাই নামল ধীরেসুস্থে। ড্রাইভার জিনিসপত্র গাড়ির ডিকি থেকে তুলে এগিয়ে যেতেই ওরা ভেতরে চলে গেল। সম্পূর্ণ দৃশ্যটা দু'চোখ মেলে দেখে বড় শ্বাস ফেলল উনকি। তার পর ধীরে ধীরে মাঠ পেরিয়ে হাইওয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মাঝে মাঝে বাস বা ট্রাক যাচ্ছে হু হু করে, তার পরেই সব চুপচাপ। হাইওয়ের দু'পাশের বড় বড় গাছগুলোতে ফিরে আসা পাখিদের চিৎকার ছাড়া এই পৃথিবীতে কোনও শব্দ নেই।

জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ির নাম সে ছেলেবেলা থেকে বড়দের মুখে শুনেছিল বলে, সেখানে যেতে অস্বস্তি হলেও ভয় হয়নি। কিন্তু কলকাতা তো বহু দূরের, খুব বড় শহর। সেখানে গেলে যদি তাল রাখতে না-পারে। তা ছাড়া দু'-দু'বার অপারেশন করেও এই আবটা নির্মূল করতে পারেনি জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ির ডাক্তাররা। কলকাতা কি ম্যাজিক জানে, সে সেটা পারবে! কিন্তু কী করতে পারে সে! দিন দিন বড় হতে হতে এই আবটা চোখ একেবারে ঢেকে ফেলবে। তার পর মুখের একটা দিক ওর আড়ালে চলে যাবে। ও নিশ্চয়ই মরে যাবে তখন। কেউ ওই আব-বড়-হওয়া মুখের দিকে তাকাবে না। তাই কলকাতায় গেলে যদি ডাক্তাররা ঠিক করে দিতে পারে... শ্বাস ফেলল উনকি।

মেয়ের চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়িতে যাওয়ায় বেশ কয়েক দিন চাকরিতে কামাই হয়েছে এবং সে কারণেই তার মাইনে কাটা যাবে। ফিরে এসে সর্দারের কাছে বিস্তর বকুনি খেতে হয়েছে। মেয়েকে ডাক্তার দেখানো নিশ্চয়ই মায়ের কর্তব্য, কিন্তু চাকরি বাঁচানোটা কম জরুরি নয়। প্রথম বারের অপরাধ যদি কোম্পানি জানতে পারে, তা হলে হয়তো ক্ষমা করে দেবে, কিন্তু দ্বিতীয় বার যেন এমন ঘটনা না-ঘটে—এই বলে তাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।

চাকরি না থাকলে খাবে কী? সেক্ষেত্রে তো যে-ঘরে তারা আছে, সেই ঘর থেকে তাদের চলে যেতে হবে। কিন্তু কোথায় যাবে? কিছুই বুঝতে পারছিল না উনকির মা। অথচ ভগবান দয়া করেছেন বলেই বড় ডাক্তাররা উনকিকে কলকাতায় নিয়ে যেতে বলেছেন চিকিৎসার জন্যে। তার নিজের সামর্থ্য ছিল না। কলকাতা তো দূরের কথা, কোথাও না। যে-ক'দিন উনকি হাসপাতালে ছিল, সেই দিনগুলো তাকে হাসপাতালেই থাকতে হয়েছিল। পয়সার অভাবে বাইরে থাকার জায়গা খুঁজতে পারেনি। মেয়ের খাবার হাসপাতাল থেকে দিয়েছে, ওই ক'টা দিন তাকে দিনের বেলায় মুড়ি আর রাতে রুটি খেয়ে থাকতে হয়েছে। কলকাতায় যাওয়ার আগে ধার করে টাকা নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ফিরে আসার পরে সেই ধার শোধ করবে কী করে যদি চাকরিটা না-থাকে।

তার চেয়ে বেয়াইরা এসে যা বলল, তা শুনলে অনেক উপকার হত। নিশ্চয়ই জামাই খালি হাতে কলকাতায় যাবে না। সে সঙ্গে থাকলে অনেক ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। যদি জামাই মেয়ের সঙ্গে যায়, তা হলে মা না-গেলে কি খুব অসুবিধে হবে! সেক্ষেত্রে চাকরিটা ঠিকঠাক থেকে যাবে। ব্যাপারটা ভাবতেই নিজেই বুঝল ভুল ভাবছে। মেয়ে কিছুতেই মেনে নেবে না। মা না-গেলে সে যে কলকাতায় যাবে না, তাতে সন্দেহ নেই। একমাত্র বড়সাহেব দয়া করলে তার চাকরি রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু বড়সাহেবের সঙ্গে কথা বলা দূরের কথা, দেখা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ছুটির পরে বড়সাহেবের বাংলোর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল উনকির মা। তার জানা ছিল না, সেদিন বড়সাহেব তেলিপাড়ার ক্লাবে গিয়েছেন, ফিরতে রাত হবে।

রাতে মেয়েকে সমস্যার কথা বলল উনকির মা। সে একা আর ভেবে কুল পাচ্ছে না শুনে উনকি বলল, "তা হলে ছেড়ে দাও। আমার জন্যে তোমরা সবাই কেন না খেয়ে থাকবে!"

"তা কী হয়! এরকম সুযোগ কেউ তো চট করে পায় না। আমি আবার কাল চেষ্টা করব বড়সাহেবের দেখা পাওয়ার," উনকির মা বলল।

ঘরের অন্য পাশে বাবু হয়ে বসেছিল শনিচর। এবার সে কথা বলল, "আমি উনকির সঙ্গে যাব।"

অবাক হয়ে দু'জনে তাকাল। উনকি জিজ্ঞেস করল, "তুমি যাবে বাবা?"

"হ্যাঁ।" মাথা নাড়ল শনিচর।

"কিন্তু তোমার তো শরীর খারাপ..." মেয়ে কথা শেষ করল না।

"এখন আগের চেয়ে ভাল। যাওয়ার আগে একদম ঠিক হয়ে যাবে।"

"কিন্তু সঙ্গে আর কেউ যদি যায়?" উনকির মা বলল।

"কারও যাওয়ার দরকার নেই," আবার শুয়ে পড়ল শনিচর।

মা মেয়ের মুখের দিকে তাকাল। কথাগুলো তাদের খুব বেশি ভরসা জোগাচ্ছিল না। তবু মনে হচ্ছিল, শনিচর যদি সুস্থ বাবার মতো মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় চিকিৎসা করাতে যায়, তার চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে!

তখন দুপুর। এই সময় কয়েক ঘণ্টা দোকানে ভিড় থাকে না বলে কার্তিক দোকানের পেছনে নদীর ধারের বাড়িতে যায় স্নান-খাওয়া সেরে নিতে। মামা বলেছেন, দোকান একদম বন্ধ না করে পরিচিত কাউকে বসিয়ে যেতে। সে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পরিচিত মুখ খুঁজছিল।

এখন পাশের হাইওয়ে একদম শুনশান। মাঝে মাঝে এক-আধটা ট্রাক দ্রুতগতিতে যাওয়া-আসা করছে। তার পর আবার শুনশান। কার্তিক দেখল, একটা ট্রাক তীব্র গতিতে উল্টোদিক থেকে ছুটে আসছে। আর তখনই ও-পাশ থেকে রাস্তার বাঁক ঘুরে ধেয়ে এল একটা ছোট গাড়ি। এই গাড়িও বেশ গতিতে চলছিল। দুটো গাড়ি মুখোমুখি হতেই ট্রাক ড্রাইভার পিচের রাস্তা থেকে সরে যেতে চেষ্টা করল। কিন্তু এড়াতে পারল না। ছোট গাড়ির সামনের দিক ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেল। তার পর গড়াতে গড়াতে রাস্তার পাশে বড় গাছের গায়ে যেন আছাড় খেয়ে পড়ল।

হাঁ হয়ে গিয়েছিল কার্তিক। তার পরেই চিৎকার করে উঠল সে। দৌড়ে কাছে যাওয়ার আগেই ট্রাক ড্রাইভার একটু পিছিয়ে নিয়ে গেল গাড়িটাকে। তার পর পিচের রাস্তায় উঠে তীব্র গতিতে বেরিয়ে গেল।

কয়েক সেকেন্ড পরে আর তাকে দেখা গেল না।

দৌড়তে দৌড়তে কার্তিক প্রাইভেট গাড়ির সামনে এসে হতভম্ব হয়ে গেল। গাড়ির একটা দিক ধাক্কা খেয়ে অনেকটা ভেতরে চলে গিয়েছে। কী করবে বুঝতে পারছিল না কার্তিক। তখনই হইহই চিৎকার ভেসে এল। সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ও-পাশের চা-বাগান থেকে কয়েকজন শ্রমিক ছুটে আসছে। গাড়িটা কাত হয়ে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টার পর সবাই মিলে যখন গাড়ির ভেতর থেকে দুটো শরীর টেনে বের করতে পারল, দেখা গেল এক জনের শরীর নিথর, অন্য জনের তখনও প্রাণ আছে। কিন্তু বের করে নীচে শোওয়ানো মাত্র তারও মৃত্যু হল।

শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। এই দু'জন তাদের চেনা নয়। দু'জন শ্রমিক দৌড়ে চা-বাগানের ভেতরে বড়সাহেবের অফিসের দিকে চলে গেল। কার্তিক লোক দুটোকে দেখে মাথা নাড়ল। যে আগেই মারা গিয়েছিল তার মুখের একটা দিক ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। একেবারে কাছের লোক ছাড়া চেনার উপায় নেই।

খারাপ খবর বাতাসের আগে উড়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজন ছুটে আসতে লাগল। এদের বেশির ভাগই বাজার এলাকায় থাকে। সবাই ভিড় করে দেখতে লাগল মৃত দেহ দুটোকে। হঠাৎ এক জন চিৎকার করে উঠল, "আরে! এই লোকটা গাড়ি নিয়ে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে এসেছিল বলে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ এই লোকটাই তো!"

"কী করে বুঝলি?"

"কাল গাড়ি নিয়ে মিষ্টি কিনতে এসেছিল বাজারে। অচেনা লোক, তাই পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিলাম। ইস, লোকটা মরে গেল!"

কথাগুলো শোনামাত্র দু'জন ছুটল ডাক্তারবাবুর বাড়ির দিকে। তার কয়েক মিনিট পরে ওদের দেখা গেল। পাগলের মতো দৌড়ে আসছে মা-মেয়ে। কাছে এসে মেয়ে চোখ বড় করে একটি মৃতদেহর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে চিৎকার করে উঠল। যারা এতক্ষণ ধন্দে ছিল, তাদের বুঝতে অসুবিধে হল না, মৃতদের এক জন নতুন ডাক্তারের জামাই। সেই মেয়েটা, যাকে সে গাছের ওপর প্রথম দেখেছিল, তাকে পাগলের মতো মাটিতে আছড়ে কাঁদতে দেখে আর দাঁড়াতে পারল না কার্তিক। সে ধীরে ধীরে তার দোকানের সামনে এল। ওই বয়সি কোনও মেয়েকে ওরকম চিৎকার করে কাঁদতে দেখেনি সে। হঠাৎ কার্তিকের মনে হল, ওদের তো বেশি দিন বিয়ে হয়নি, এরই মধ্যে মেয়েটা যে ভাবে কাঁদছে, তাতে মনে হচ্ছে স্বামীর সঙ্গে ওর অনেক দিনের সম্পর্ক। কী করে যে এমন হয়!

দোকানে বসেই কার্তিক খবর পাচ্ছিল। ভিড় আরও বেড়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত পাশের শহরের থানা থেকে পুলিশ এল। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রাইভেট গাড়িটিকে একপাশে সরিয়ে রেখে দুটো মৃতদেহ নিয়ে থানায় চলে গেল। যাওয়ার আগে নতুন ডাক্তারের স্ত্রীকে বলে গেল অবিলম্বে থানায় যোগাযোগ করতে। ততক্ষণে নতুন ডাক্তার এসে গিয়েছেন। তিনি কোনও রকমে স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে কোয়ার্টার্সে ফিরে গেলেন।

পোস্টকার্ডগুলো বন্ধুরা যাওয়ার সময় দিয়ে গিয়েছিল। তার একটাতে কার্তিক লিখল, 'অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি, নতুন ডাক্তারবাবুর নতুন জামাতা আজ গাড়ি-দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাইয়াছেন। নতুন ডাক্তারবাবুর সদ্য বিধবা হওয়া কন্যার কান্না দেখা খুব কষ্টকর। এই সংবাদ তোমাদের জ্ঞাতার্থে জানাইলাম।'

চা-বাগানের হাসপাতালে এমন কাণ্ড আগে ঘটেনি। শিলিগুড়ির হাসপাতাল থেকে চিঠি এল। উনকিকে সঙ্গে নিয়ে এক জন অভিভাবক অবশ্যই তিন তারিখের দুপুরে শিলিগুড়ির হাসপাতালের অফিসে গিয়ে দেখা করুন। ওই দিনই তাদের কলকাতার হাসপাতালে যাওয়ার জন্যে ট্রেনের টিকিটের ব্যবস্থা হয়েছে।

কম্পাউন্ডারবাবু এখন হাসপাতালের কাজকর্ম দেখাশোনা করছেন। তিনি বড়বাবুকে চিঠির কথা জানালে, খবরটা বড়সাহেবের কানে গেল। তিনি আদেশ দিলেন কিছু সাহায্য ছাড়া আর কিছু করা যাবে না।

খবরটা কয়েক মিনিটের মধ্যে উনকির মায়ের কানে পৌঁছল। সে তখন গুদামে চায়ের পাতা পরিষ্কারের কাজে ব্যস্ত ছিল। তার সহকর্মী এক জন বলল, "চিন্তা করার কোনও মানে হয় না। তোমার জামাই তো যেচে এসে সাহায্য করতে চেয়েছে। ওর সঙ্গে মেয়েকে পাঠিয়ে দাও। বড়সাহেব অর্থ সাহায্য করবেন যখন, তখন দু'জনের থাকা-খাওয়ার কোনও সমস্যা হবে না।"

উপায় নেই। এ ছাড়া আর যে-পথ খোলা আছে, সেই পথে হাঁটতে মোটেই ভরসা হচ্ছে না। বাড়ি ফিরে মেয়েকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে খবরটা দিল সে। মেয়ের চোখে যেন আলো ফুটল। কিন্তু যেই সে মায়ের মুখে প্রস্তাবটার কথা শুনল, অমনি অন্ধকার জমল। জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "তা হলে আমি যাব না।"

"বোকামি করিস না। আমার চাকরি গেলে আমরা খাব কী?"

"ঠিক আছে। তোমার বদলে বাবা যাবে।"

"আশ্চর্য! ওই মানুষ কি সুস্থ আছে? দেখছিস না?"

"এখন বাবা অনেক ভাল আছে। তুমি বাধা দিয়ো না। বাবার সঙ্গে গেলে আমার কোনও অসুবিধে হবে না," বেশ জোরের সঙ্গে বলল উনকি।

আট মাইল দূরের স্টেশন হয়ে কলকাতার ট্রেন যায় বিকেলবেলায়। ট্রেনটা যাবে রবিবার, তাই উনকির মা স্বামী এবং মেয়েকে নিয়ে চৌমাথায় চলে এল সাতসকালে। শনিচরের হাতে কাঁধে দুটো ব্যাগ। বাসস্টপে এসে শান্ত গলায় সে বলল, "উনকির মা, চিন্তা করিস না।"

এই কণ্ঠস্বর দীর্ঘকাল পরে শুনে অবাক হয়ে তাকাল উনকির মা। তার মনে যেন ভরসা ফিরে এল। গত রাত্রে বড়বাবু তাকে অফিসে ডেকে যে-ছ'শো টাকা দিয়েছেন তা অত্যন্ত সাবধানে উনকিকে ভেতরের সায়ায় যত্ন করে রাখতে পরামর্শ দিয়েছে তার মা। বার বার করে সে বড়বাবুকে দিয়ে ঠিকানা লিখিয়ে আনা পোস্টকার্ড মেয়ের সঙ্গে দিয়েছে, যাতে কয়েকদিন অন্তত 'ভাল আছি' শব্দ দুটো লিখে যেন পোস্ট করে দেয়। উনকি বলল, "আমরা কোথায় যাচ্ছি, সেখানকার ঠিকানা কী, তা কাউকে বলবে না। ওরা নিশ্চয়ই খবর পেয়ে আজ বা কাল এসে তোমার কাছে জানতে চাইবে, কিন্তু তুমি কিচ্ছু বলবে না।"

শনিচর চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। এবার কথা বলল, "কী বলবে তোর মা? আমরা এখন জানি যে, শিলিগুড়ির হাসপাতালে যাচ্ছি। সেখান থেকে ওরা কলকাতার কোন হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে বলবে, তা কি জানি! তোর মা-ও জানে না। তাই..."

মাথা নাড়ল উনকি। তার ভরসা বাড়ল। বাবা এখন অনেক ভেবেচিন্তে কথা বলে। আর যদি হাঁড়িয়া না খায়, তা হলে কোনও ভয় নেই।

সকালের প্রথম বাস প্রায় ফাঁকাই এল। তার ওপর দিনটা রবিবার বলে যাত্রীও কম। ওরা স্বচ্ছন্দে শিলিগুড়িতে যাওয়ার জন্য বাসে উঠে বসলে, আঙুলে চোখের জল মুছল উনকির মা।

কলকাতা থেকে কোনও খবর নেই, শুধু মাঝে মাঝে ওই আগেভাগে লিখে নিয়ে যাওয়া পোস্টকার্ড আসা ছাড়া। তারিখ বা ঠিকানাবিহীন পোস্টকার্ড হাতে পাওয়া মাত্র উনকির মা তা কাজের জায়গায় নিয়ে গিয়ে গুদামবাবুকে দেখায়। তিনি পড়ে মাথা নাড়েন, "ওরা কোনও কথা লেখেনি রে! শুধু পোস্টকার্ডটা পাঠিয়ে দিয়েছে।"

পুলিশের গাড়ি এসে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাইভেট গাড়িটাকে লরির পেছনে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার পর জায়গাটা দেখে মনেই হয় না, ওখানে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছিল। নতুন ডাক্তারবাবু এখন হাসপাতালে গিয়ে কিছু সময়ের জন্যে রোগী দেখছেন বটে, কিন্তু তাঁর বাড়ির দরজা-জানলা বেশির ভাগ সময় বন্ধ থাকছে। নতুন ডাক্তারবাবুর মেয়ে সেই যে ঘরের ভেতরে ঢুকেছে আর বাইরে বের হয়নি।

কিন্তু এক দিন হাইওয়ে দিয়ে সাইকেলে বাজারে যেতে যেতে ওই বাড়ির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল কার্তিক। বাইরের খোলা দরজার পাশে বসে আছে নতুন ডাক্তারের মেয়ে। না, বিধবার পোশাক ওর শরীরে নেই বটে, কিন্তু কাপড়ে কোনও উজ্জ্বল রং নেই। মুখ নিচু করে দরজায় হেলান দিয়ে রয়েছে। যে-মেয়েটাকে সে প্রথমবার গাছের ওপরে দেখেছিল, তার সঙ্গে এই মেয়ের কোনও মিল নেই। সাইকেল থামিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা শোভন নয়, তাই প্যাডেল ঘোরাল কার্তিক।

তার দোকান এখন ভাল চলছে। ধার দেওয়া একদম বন্ধ করেছে সে। তার বদলে জিনিসের দাম টাকায় চার পয়সা কমিয়ে দেওয়ায় তার খদ্দের বেড়ে গেছে। কিন্তু এই দোকানদারিতে তার একটুও মন বসছিল না। পয়সার অভাবে সে বন্ধুদের মতো স্কুলের পড়া শেষে কলেজে পড়তে যেতে পারেনি। কিন্তু সারা জীবন এই চা-বাগানের শ্রমিকদের তেল নুন বিক্রি করে কাটিয়ে দেওয়ার কথা ভাবলেই মনে হয় বিদ্রোহ করি। কিন্তু বিদ্রোহ করে কী করবে! কী ক্ষমতা আছে তার!

কলকাতায় পড়া শেষ করে তার ক'দিন পরে অতীন চাকরির চেষ্টা করবে। তার যা পড়াশোনা, তাতে চাকরি পেতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না। কিন্তু কার্তিক কী করবে! কিছু দিন আগে খবরের কাগজে পড়া একটা মানুষের জীবনবৃত্তান্ত তাকে খুব টানছে। ভদ্রলোক তার মতনই পয়সার অভাবে পড়াশোনা করতে পারেননি। কিন্তু পরে একজনের সাহায্যে ব্যবসাদার হয়ে জীবন শুরু করে বিরাট শিল্পপতি হয়েছিলেন। শিল্পপতি শব্দটার অর্থ সে ভাল করে বুঝতে না পারলেও, অনুমান করেছে। চেষ্টা করলে সব কিছু করা যেতে পারে।

বাজারের কাছে এসে সোমরাকে দেখতে পেল কার্তিক। একটা বন্ধ দোকানের ধারে মুখ নিচু করে বসে আছে। কার্তিক সাইকেল থামিয়ে ডাকল, "এই সোমরা, কী হয়েছে?"

মুখ তুলল সোমরা। অন্ধ চোখ বন্ধ করে মুখ উঁচিয়ে চেষ্টা করল কণ্ঠস্বর চিনতে। সাইকেল থেকে নেমে কার্তিক কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কী রে। বসে আছিস কেন? কী হয়েছে?"

"ও, কার্তিক!" যেন স্বস্তি পেল সোমরা। তার পর মাথা নাড়ল, "কিছু হয়নি।"

"তা হলে এভাবে বসে আছিস কেন?"

"চায়ের দোকান বন্ধ। কাপ-ডিশ সব ধুয়ে দিলে বিশ পয়সায় চা খেতে দেবে চা-ওয়ালা। আজ কেউ দেবে না," মুখ নীচু করল সোমরা।

পকেট থেকে একটা সিকি বের করে কার্তিক বলল, "এই সিকিটা নে। চা কিনে খেয়ে নিস।"

মুখে হাসি ফুটল সোমরার। চোখ বন্ধ করল সে।

দু'দিন পরে ব্যাপারটা ঘটল। সকালে মামা দোকানে এসে কার্তিকের হাতে একটা মোটা খাম দিয়ে বলল, "এটা রেখে দাও।"

"কী আছে এতে?"

"যা আছে তা পড়লেই জানতে পারবে।"

খাম থেকে কাগজ বের করে চোখ রাখল কার্তিক। এই চিঠিতে মামা সজ্ঞানে তাঁর এই দোকানের সমস্ত স্বত্ব কার্তিককে নিঃশর্তে দান করে যাচ্ছেন। এই দানের সাক্ষী হিসেবে তাঁর দুই বন্ধু সই করেছেন।

অবাক হয়ে কার্তিক জিজ্ঞেস করল, "এসব কী?"

"কী লেখা আছে তা পড়ে বুঝতে পারছ না?"

"হ্যাঁ, মানে..."

"আমি হরিদ্বারে চলে যাচ্ছি। ওখানে বাবা মহা অনন্তের আশ্রমে সাধনা করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব। এখন থেকে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে এই দোকান দেখাশোনা করবে। আমি আর মামিমা থাকছি না..."

মামা হাসলেন, "যেখানেই যাই, খেতে-শুতে কিছু খরচ তো হবেই। তাই তুই প্রত্যেক মাসের এক তারিখে অন্তত একশোটা টাকা আমাকে মানিঅর্ডার করে পাঠাবি।"

রাজি না হয়ে কোনও উপায় নেই। এই দোকানের জন্যে এত পরিশ্রম করছে সে, তাই কর্মচারীর বদলে মালিক হলে জীবনটাই বদলে যাবে।

দোকানের মালিক হয়ে যাওয়ার পরে মনে হয়েছিল জীবনটা বদলে যাবে। কিন্তু ক'দিন পরে মনে হল, যে কে সেই। কোনও পরিবর্তন হয়নি। উল্টে সমস্যা বেড়েছে। আগে সে মামার কাছে চাকরি করত। তাই চাকরি ছাড়ার ইচ্ছে প্রবল হলে, সেই পথে এগোচ্ছিল। কিন্তু মালিক তো কারও চাকরি করে না। ছাড়বে কী করে! একটাই রাস্তা আছে সামনে, সেটা হল দোকানটা বিক্রি করে দেওয়া। কিন্তু দোকান বিক্রি করলে প্রতি মাসে মামার একশো টাকা দেবে কী করে! বিক্রির সময় যে-টাকা পাওয়া যাবে, তা থেকে কত মাস-বছর দেওয়া সম্ভব হবে! মামা যে-কাগজটা দিয়েছে সেটা বের করে আবার পড়ল কার্তিক। পড়তে পড়তে থমকে গেল সে। এ কী! প্রথমবার পড়ার সময় তাড়াহুড়োয়, তার দৃষ্টি কি এড়িয়ে গিয়েছিল? এখানে স্পষ্ট লেখা আছে, যত দিন কার্তিক জীবিত থাকবে, তত দিন এই দোকানের মালিকানা ভোগ করতে পারবে, কিন্তু দোকানটা কাউকে দান অথবা বিক্রি করতে পারবে না।

একেই বলে আগাপাছতলা বেঁধে খেতে দেওয়া। না গিলে কোনও উপায় নেই। খুব মন খারাপ হয়ে গেল তার। প্রচণ্ড রাগ হল মামার ওপর।

মাস দুয়েক পরে মা যখন কার্তিককে ডেকে বলল, "শোন, তোর মামা তো তোকে দোকান দিয়ে গেল। আর ক'দিন পরে মামা চলে যাবে হরিদ্বার। তাই যাওয়ার আগে জেনে যেতে চায় তুই ওর ইচ্ছে পূর্ণ করেছিস।"

"ইচ্ছে? কী ইচ্ছে?" অবাক হল কার্তিক।

"তোর মামার ইচ্ছে, ওর পছন্দ করা মেয়েকে তুই বিয়ে করিস।"

"বিয়ে? আমি? কী যা-তা বলছ!"

"আমি যা-তা বলছি না রে। মেয়েটি শুনেছি খুব ভাল।"

"আমি এই বয়সে বিয়ে করব?"

"এখনই না, বছর দুই পরে। এখন তো তুই একটা দোকানের মালিক। বউকে খাওয়াতে পারবি।"

"অসম্ভব। আমি বিয়ে করব না," জোর গলায় বলল কার্তিক।

"আহা, এখনই তো নয়!"

"কোনও দিনই করব না। এসব কথা আমাকে আর বলবে না তুমি।"

মা চুপ করে গিয়েছিলেন। হরিদ্বার যাওয়ার আগে মামা যেটুকু না বললে নয়, তার বেশি কথা বলতেন না।

কার্তিক ঠিক করল, সে কোনও দিন বিয়ে করবে না। বিয়ে করে তার কী লাভ হবে? নতুন ডাক্তারবাবু মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। ভেবেছিল মেয়ে সুখে থাকবে। কেউ তো ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না।

অপারেশন হয়ে গিয়েছিল। যে-দু'জন ডাক্তার শিলিগুড়িতে গিয়ে উনকিকে দেখেছিলেন, তাঁদের উদ্যোগে আরও কয়েকজন ডাক্তার বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন। অপারেশনের পর কিছু দিন পর্যবেক্ষণে রাখার পর ওষুধ দিয়ে এবং কীভাবে যত্ন নিতে হবে জানিয়ে ফিরে যেতে বলা হল। বড় ডাক্তার কিছু বলেননি, কিন্তু হাসপাতালের কর্মচারীরা শনিচরকে ঘুরে-ফিরে জানিয়েছে, যদি আবার অবস্থা আগের মতো হয়, তা হলে চিকিৎসার কোনও সুযোগ থাকবে না।

ফেরার সময় স্টেশনে এসে ফাঁপরে পড়ল ওরা। শনিচরের কাছে আরও কিছু টাকা বেঁচে ছিল। তাই দিয়ে শিলিগুড়ির ট্রেনের টিকিট কেটে দেখল, তাদের কোনও রিজার্ভেশন না থাকায় বসার সিট পাচ্ছে না। মুখের অর্ধেকটা ব্যান্ডেজে ঢাকা থাকলেও কারও মন নরম হল না, অসংরক্ষিত কামরার মেঝেতে বসে আসার সময় বাবার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোতে হল মেয়েকে।

বাস থেকে নেমে নদী পার হয়ে যখন ঘরে পৌঁছল, তখন শরীর টলছিল উনকির। তার মা তখনও চাকরিতে। সেদিন যে আসবে তারা,
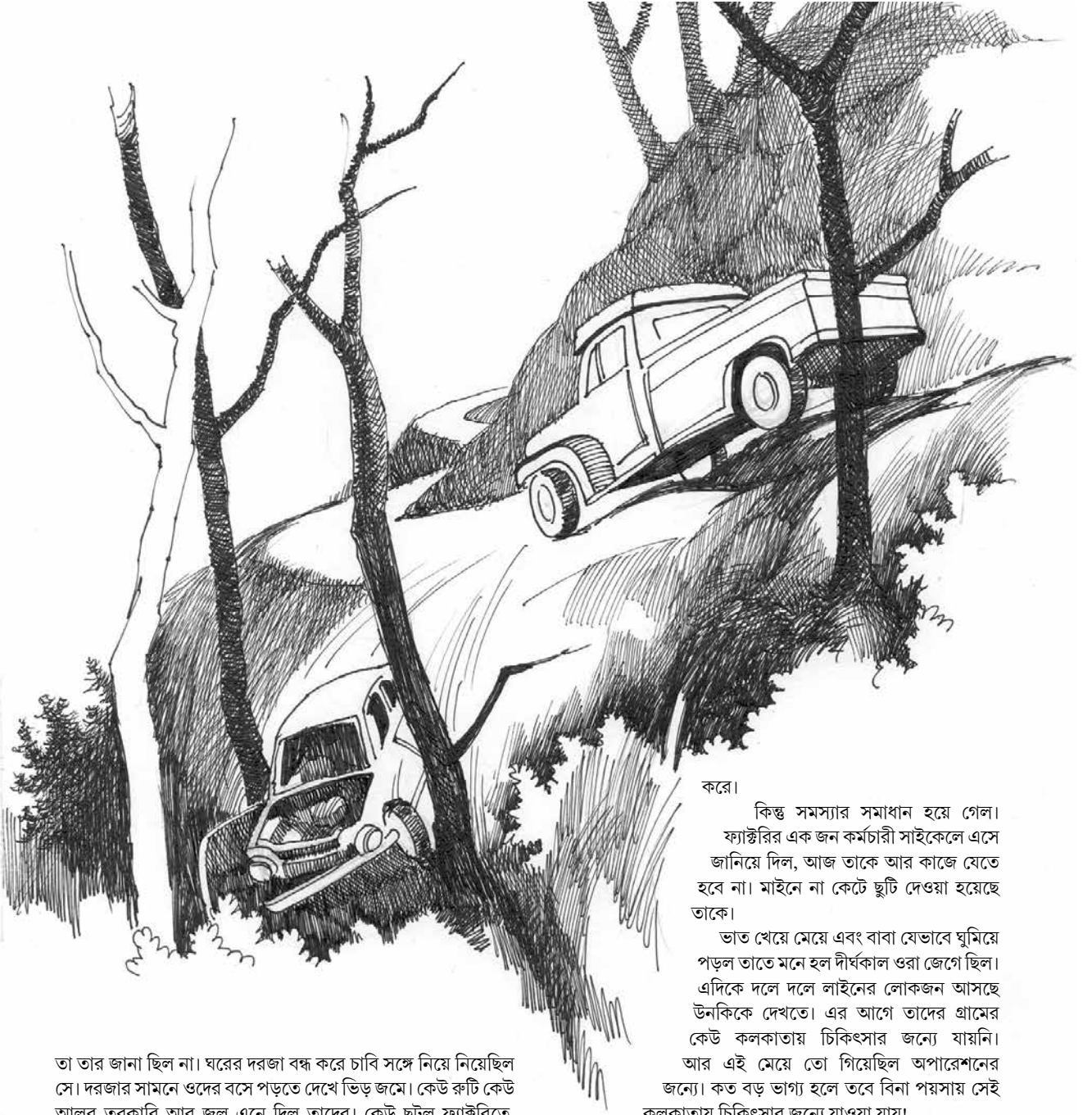
তা তার জানা ছিল না। ঘরের দরজা বন্ধ করে চাবি সঙ্গে নিয়ে নিয়েছিল সে। দরজার সামনে ওদের বসে পড়তে দেখে ভিড় জমে। কেউ রুটি কেউ আলুর তরকারি আর জল এনে দিল তাদের। কেউ ছুটল ফ্যাক্টরিতে, উনকির মাকে খবর দিতে। উনকির মা গুদামবাবুর হাতে-পায়ে ধরে কিছুক্ষণের ছুটি নিয়ে দৌড়ে দৌড়ে লাইনে চলে এল। তাকে দেখে ভিড় রাস্তা করে দিলে সে দ্রুত দরজায় লাগানো তালা খুলে বলল, "আমি জানতাম না, কেউ খবর দেয়নি, কোনও চিঠি আসেনি।"

যত্ন করে মেয়েকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল সে। মেয়ে শুয়ে পড়ে বলল, "মা, খুব খিদে পেয়েছে, আমি ভাত খাব।"

খাবার বানাতে একটু সময় দরকার, কিন্তু সে তো ওই সময় এখানে থাকলে কাজে গিয়ে মহা মুশকিলে পড়তে পারে। প্রতিবেশীদের দেওয়া রুটি তরকারিতে মেয়ের মন ভরছে না দেখে চুপ করে বসে থাকে কী করে।

কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ফ্যাক্টরির এক জন কর্মচারী সাইকেলে এসে জানিয়ে দিল, আজ তাকে আর কাজে যেতে হবে না। মাইনে না কেটে ছুটি দেওয়া হয়েছে তাকে।

ভাত খেয়ে মেয়ে এবং বাবা যেভাবে ঘুমিয়ে পড়ল তাতে মনে হল দীর্ঘকাল ওরা জেগে ছিল। এদিকে দলে দলে লাইনের লোকজন আসছে উনকিকে দেখতে। এর আগে তাদের গ্রামের কেউ কলকাতায় চিকিৎসার জন্যে যায়নি। আর এই মেয়ে তো গিয়েছিল অপারেশনের জন্যে। কত বড় ভাগ্য হলে তবে বিনা পয়সায় সেই কলকাতায় চিকিৎসার জন্যে যাওয়া যায়!

কিন্তু তাদের কোনও রকমে হাতজোড় করে ঘরে ঢোকা বন্ধ করতে পারল উনকির মা। কলকাতা অনেক দূরে। সেখান থেকে ফিরে আসতে ভয়ঙ্কর কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে মেয়েকে। বাবার শরীরও ভাল নয়। একটু ভাল হয়ে উঠলে ওরা নিশ্চয়ই সবার প্রশ্নের উত্তর দেবে। এখন ডাক্তারবাবু কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

তিন দিন পরে মেয়ে একটু স্বাভাবিক হল। শনিচর ফিরে আসার পরে অত্যন্ত শারীরিক প্রয়োজন ছাড়া তার শোওয়ার জায়গা থেকে উঠছে না। উনকির মা তাকে কয়েকদিন বলার চেষ্টা করেছিল, "কলকাতার বড় হাসপাতালে যখন মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলে, তখন ওই সুযোগে

ডাক্তারকে নিজের স্বাস্থ্যের কথা বলোনি? সুযোগ ছিল, ভাল চিকিৎসা করিয়ে ওষুধ নিয়ে আসার, সেটা করতে ভুলে গেলে?"

শুয়ে ছিল কিন্তু জবাব দেয়নি শনিচর।

একে একে চা-বাগানের চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছিল যাঁদের, তাঁরা হয় জলপাইগুড়ি নয় শিলিগুড়িতে সামর্থ্যমতো বাসস্থানের ব্যবস্থা করে চলে যাচ্ছিলেন। তাঁদের সন্তানেরা পড়াশোনা শেষ করে জীবিকার প্রয়োজনে ছড়িয়ে গিয়েছিল হয় কলকাতা নয় অন্য শহরে। বয়সের বিচারে কনিষ্ঠ ছিলেন কিশোরের বাবা। তাই তিনি যখন অবসর নিলেন, তখন তাঁর সহকর্মীদের বেশির ভাগই নতুন। কাজ বেড়েছে বলে বাসস্থানের সংখ্যাও বেড়েছে। কিন্তু দীর্ঘকাল একসঙ্গে থাকার জন্য আগের প্রজন্মের মধ্যে যেরকম সখ্য তৈরি হয়েছিল এখন আর সেরকম নেই। কিশোরের বাবা জলপাইগুড়ির কাছে জমি কিনেছিলেন বটে, কিন্তু বাড়ি তৈরি করা নানান কারণে সম্ভব হয়নি। তার অন্যতম কারণ ছিল বড়সাহেবের আশ্বাস, চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তিন মাস কোম্পানির দেওয়া কোয়ার্টার্সে থাকতে দেওয়া হয়। সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার খানিক আগে স্বস্তি পাওয়া গেল। কিশোরের চাকরি হল চা-বাগানে। তার বাবা যে-চাকরি করতেন তার অনেক নীচের পদ। কিন্তু কোম্পানি অনুগ্রহ করল বলে কিশোরকে তার বাবার কোয়ার্টার্স ছাড়তে হল না। ছেলেবেলার বন্ধুরা আর কেউ চা-বাগানে নেই। কার্তিকের সঙ্গে ধীরে ধীরে দূরত্ব বেড়েই চলেছে। হঠাৎ কখনও দেখা হয়ে গেলে কার্তিক জিজ্ঞেস করে "ভাল?"

মাথা নেড়ে সে ভাল আছে জানিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করে, "তুমি?"

"ওই আর কী!" চোখের সামনে থেকে সরে যায় কার্তিক। চা-বাগানের চাকরিতে ঢোকার পর থেকে কিশোর যে তার সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়েছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না। বাকিরা যাদের সঙ্গে ছেলেবেলায় গভীর বন্ধুত্ব ছিল, তাদের বেশির ভাগই চা-বাগান থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছে। দেখা না হওয়ায় সম্পর্কের ওপর ধুলো এখন যে ভাবে পড়েছে যে, অনুভব করা মুশকিল। কিন্তু কিশোর তো দূরে চলে যায়নি। সেই একই কোয়ার্টার্সে রয়েছে সে। তা হলে এখন তাকে দেখলে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে কেন?

এতগুলো বছরে মুদির দোকানের জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়েছে, কিন্তু লাভের পরিমাণ খুব সামান্য বেড়েছে। কার্তিক স্থির করল এভাবে সে জীবন কাটাবে না। তাকে অনেক বেশি রোজগার করতে হবে। দু'জন বিশ্বাসী ছেলেকে দোকানে বসিয়ে সে বাইরে বের হল। শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়ি থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস, যা তার দোকানে রেখে বিক্রি করা সম্ভব নয়, তাই নিয়ে এসে আশপাশের সমস্ত গঞ্জের দোকানে খুব অল্প মুনাফা রেখে পৌঁছে দিতে লাগল। দোকানদাররা এতদিন যে-দামে জিনিস কিনতেন, তার চেয়ে কিছু কমে কার্তিকের কাছ থেকে পাওয়ায় তাঁরা খুশি হয়েছিলেন। ধীরে ধীরে ব্যবসাটা জমে গেল। প্রথমদিকে মূলধনের অভাবে লাভ বেশি হত না। কিন্তু শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির ব্যবসাদারদের আস্থা অর্জন করায়, একটু একটু করে জিনিসগুলো বিক্রি করে দাম মিটিয়ে দিতে লাগল সে। এক জন উঠতি ব্যবসাদার হিসেবে স্থানীয় মানুষের চোখ পড়ল কার্তিকের উপর। এই সময় ভাগ্য আরও সাহায্য করল তাকে।

মাস্টারমশাইয়ের সুপারিশে বীরপাড়ার নামকরা রাজনৈতিক নেতা কার্তিককে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। প্রথমে কার্তিক ভেবেছিল যাবে না, পরে সে কৌতূহলী হল। উত্তর বাংলার মানুষ বরেন রায়কে খুব ক্ষমতাশালী নেতা হিসেবে মনে করে। তিনি এখন অবধি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি, কিন্তু অন্তত চার জন এমএলএ এবং দু'জন এমপি তাঁর ছায়া থেকে নির্বাচিত হয়েছে। কলকাতা থেকে চাপ আসছে, তাঁকে নির্বাচনে দাঁড়াতে বলছে। দাঁড়ালেই তিনি বিজয়ী হবেন বলে তাঁরা অনুমান করছেন। এমএলএ হলে বরেন রায় যে মন্ত্রী হবেন, তাতে উত্তরবঙ্গের মানুষের সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান বরেন। বলেন, "আমি নেতা হতে চাই না। বরং আমি নেতা তৈরি করতে বেশি পছন্দ করি।" সেই বরেন দেখা করতে বলেছেন, এড়িয়ে যেতে পারল না কার্তিক। তাকে ব্যবসা করে যদি খেতে হয়, তা হলে জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ নেই। এক সকালে সে বাস থেকে নেমে জিজ্ঞেস করতেই লোকে এক কথায় বরেন রায়ের বাড়ি দেখিয়ে দিল।

বরেন রায় কাজ শেষ করে মাঝরাত পেরিয়ে ঘুমোতে যান। ফলে তাঁর ঘুম থেকে উঠতে একটু বেলা হয়ে যায়। তাই কার্তিককে অপেক্ষা করতে হল।

বরেন দেখা দেওয়ার আগেই চায়ের কাপ এসে গেল। সেটা শেষ করতে না-করতেই বরেন রায় দেখা দিলেন, "নমস্কার ভাইটি, বসুন বসুন। খুব খুশি হয়েছি আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন বলে। খুব ভাল।"

উঠে দাঁড়িয়েছিল কার্তিক। ভদ্রলোকের বিনয় দেখে সে আপ্লুত হল। হাতজোড় করে বলল, "আমি কার্তিক। আমাকে দয়া করে 'আপনি' বলবেন না। আপনি আমার গুরুজন।"

"গুরুজন! ভাল বলেছ। তোমরা আজকালকার ছেলে-ছোকরারা প্রথম আলাপেই যদি 'তুমি' শোনে, তা হলে ভাবতেই পারে যে, অসম্মান করছি। বেশ বেশ। তোমার সম্পর্কে সব খবর মাস্টারমশাই আমাকে দিয়েছেন। আমি যে-রাজনীতি করি উনি তা করেন না। কিন্তু মানুষটি খুব ভাল বলে আমি ওঁকে শ্রদ্ধা করি। হ্যাঁ, তুমি তো ব্যবসা করো। খুব ভাল। বাঙালি যত ব্যবসায় মন দেবে, তত জাতির মেরুদণ্ড শক্ত হবে। দ্যাখো ভাই, আমি রাজনীতি করি। এই দেশ আমার মা, মাকে আমি ভালবাসি। এটা আমি শিখেছি, দেশে যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলন করে আত্মত্যাগ করেছেন, তাঁরা স্বাধীনতা এনে দিতে সাহায্য করেছেন, তাঁদের থেকে। কিন্তু সেই স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব আমাদের। সপ্তাহে অন্তত একটা দিন আমার কাছে এসো। এখানে আমার যেসব সহযোগী আছেন, তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। তোমাদের ওখানে তেমন ভাবে কোনও রাজনৈতিক কাজকর্ম এখনও শুরু হয়নি। সে ব্যাপারে তোমাদের চিন্তাভাবনা করতে হবে। ভদ্রলোক হাসলেন।

এর মধ্যে একে একে আরও কয়েকজন এসে গেল। কার্তিক বুঝতে পারল একই রাজনৈতিক দলের সদস্য। এদের কয়েকজন তার মুখচেনা। সে অবাক হল, যখন মধ্যবয়সি এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে বরেন রায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। ইনি যে গত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এমএলএ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, তা জানা থাকায় খুব অবাক হল কার্তিক। যে-লোক সভা সমিতিতে ধমক দিয়ে বক্তৃতা করেন তিনি বরেন রায়ের পায়ের ধুলো নিচ্ছেন। বেশ খুশি হয়ে ফিরে এল কার্তিক।

বড়সাহেব কথা রেখেছিলেন। আঠারো বছর বয়সে চা-বাগানের চাকরি পেয়েছিল উনকি। মায়ের সঙ্গে কাজে যাওয়ার সময় সে যত্ন করে কপালে কাপড় জড়িয়ে নিত। কলকাতার ডাক্তাররা অপারেশন করার পর সেই আবটা আর দেখা দেয়নি। কিন্তু জায়গাটা সামান্য উঁচু হয়ে রয়েছে। কিন্তু দু'বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও যখন আর জায়গাটা আবের চেহারা নিল না তখন উনকি ঠিক করল, ওটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই। যা হওয়ার তা হবে।

মা-মেয়ে একসঙ্গে কাজে যায়। একসঙ্গেই ফিরে আসে। কারও আগে কাজ শেষ হয়ে গেলে সে অন্যের জন্যে অপেক্ষা করে। লাইনের সবাই দেখে মা এবং মেয়ে একসঙ্গে যাওয়া-আসা করছে। এই সময় মেয়ের শ্বশুর লোক পাঠাল। সাত দিনের মধ্যে যদি শনিচরের মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে না আসে, তা হলে তিনি এই বিয়ে ভেঙে আবার ছেলের বিয়ে দেবেন।

মা মেয়ের দিকে তাকাল। উনকি নিচু গলায় বলল, "আমার মনে হয় আপনাদের ছেলের আবার বিয়ে দেওয়াই ভাল। আমার মাথার যা অবস্থা হচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে কোনও দিন ভাল হব না।"

"কিন্তু মা, তুমি তো চাকরি করছ..."

"চাকরি নিজের জন্যে করছি। আপনাদের ছেলের জন্যে করব না।"

লোকটি চলে গেল। তার কিছু দিন পরে লোকে যেচে এসে খবরটা

দিল, উনকির স্বামী দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে।

রবিবার সারা দিন শুয়ে-ঘুমিয়ে কাটিয়ে বেলা পড়ে এলে সেজেগুজে বাইরে বের হয় উনকি। এখন আর কয়েক মাসের বাচ্চা পাওয়া যায় না যে, তাকে পিঠে ভাল করে বেঁধে নিয়ে বেড়াতে বের হবে। তার বদলে কলকাতার হাসপাতাল থেকে পাওয়া স্ট্র্যাপওয়ালা ব্যাগ পিঠে বেঁধে বাড়ি থেকে বের হয় সে। নদীর ওপরে সাঁকোতে উঠে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। যখন সূর্য গাছেদের পেছনে আড়াল খোঁজে, তখন ধীরে ধীরে চলে আসে সে কোয়ার্টার্সের সামনের মাঠে। সেই মাঠে দৌড়োদৌড়ি করছে কচি বাচ্চারা। মাঠের কোনায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাদের দেখে হাঁটতে শুরু করে উনকি।

সে একটু অবাক হয় যখন দেখে, নতুন ডাক্তারবাবুর বাড়ির সদর দরজা খুলে মোড়ায় বসে আছে তার মেয়ে। চা-বাগানের সবাই জানে এই মেয়ের স্বামী দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে। তার পর থেকে মেয়ে আর শ্বশুরবাড়িতে যায়নি। বাড়ির বাইরেও যায় না।

ধীরে ধীরে হাইওয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় উনকি। দিনশেষের এই সময়ে সংখ্যায় একটু বেশি গাড়ি যাতায়াত করে। সেগুলো দেখে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আবার ফেরার পথ ধরে সে। বাচ্চারাও ধীরে ধীরে ফিরে যাচ্ছে যে যার বাড়িতে। ছায়া ঘন হচ্ছে। কোয়ার্টার্সগুলোর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে নদী পেরিয়ে ঘরে ফিরে যায় উনকি।

বন্ধুরা সব ছড়িয়ে রয়েছে কোথায় তা কার্তিকের জানা নেই। যে তাকে এই চা-বাগানে কিছু দিন আগেও দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেত, ইদানীং সে হাত নাড়ছে। মুখোমুখি হয়ে গেলে একগাল হেসে জিজ্ঞেস করে, “ভাল?”

জবাবে বলতেই হয়, “ভাল। তুমি কেমন আছ?”

সেই যে তুই থেকে তুমিতে উঠে গিয়েছিল কিশোর, আর নামতে পারেনি।

চা-বাগানের লাগোয়া বাজার এলাকা আরও বেড়ে গেছে। পূর্ববঙ্গের মানুষ এখানে ধীরে ধীরে নতুন করে শেকড় গেড়ে বসছে। বরেন রায়ের পরামর্শ অনুযায়ী এদের একত্রিত করার চেষ্টা করছে কার্তিক। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ধারার বড় বড় নেতাদের আদর্শ, যা সে বরেন রায়ের মুখে শুনছে, তাই উগরে দিচ্ছে সংগ্রামী মানুষদের কাছে। এর জন্যে তাকে অনেকটা সময় দিতে হলেও রোজগার না কমে বেড়েই চলেছে। আশপাশের যত চা-বাগান, সে অঞ্চলে সাপ্লাই-ব্যবসায় হাত দেওয়ায় একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির মালিক হয়ে গেছে। ছেলের আর্থিক অবস্থার উন্নতি দেখে মা মরিয়া হয়েছিলেন। কার্তিক জানিয়ে দিয়েছিল তার সময় নেই। কিন্তু ভদ্রমহিলা যখন প্রায় অনশন শুরু করলেন, তখন তাকে নিমরাজি হতে হল। শর্ত দিল, সে শুধু বিয়েটাই করবে, যা কিছু ঝামেলা তা মা সামলাবে। মুশকিল মায়ের। এখনও এখানে উনিশ-কুড়ি-একুশের পাত্রের জন্যে গরিব ঘরের সুন্দরী পাত্রী পাওয়া যায়। বিশেষ করে পাত্র যদি স্কুলের গণ্ডি না ডিঙোয় এবং মোটামুটি রোজগার করে, তা হলে তাকে জামাই করতে অনেক মেয়ের বাবাই আগ্রহী। কিন্তু পাত্রের বয়স পঁচিশ পেরিয়ে গেলে কিশোরী পাত্রীর বাবা-মা দ্বিধায় পড়েন। তাই কার্তিকের পাত্রী খোঁজা চলছে, যা তার মায়ের কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না। প্রকাশ্যেই তিনি বলছেন, “পছন্দ হচ্ছে না এমন মেয়েকে ছেলেটার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারি না।”

সেদিন খুব অবাক হল কার্তিক। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার আগে তার মনে হল, অনেক দিন দোকানের ভেতরটা দেখা হয়নি। যে-দু’জনকে দোকান চালাতে সে রেখেছে, তারা মোটামুটি ঠিকই টাকাপয়সা দিচ্ছে, তবে অল্পস্বল্প টাকা সরালেও তার তো কিছু করার নেই। মাঝে মাঝে দোকানে ঢুকলে ওরা খুব বেশি অসৎ হতে পারবে না।

দোকানে ঢুকে কার্তিক খুশি হল। ছেলেরা বেশ সাজিয়ে রেখেছে জিনিসপত্র। এই সকালে এক মাথা রোদ নিয়ে সচরাচর খরিদ্দাররা আসে না। সে একটা টুলে বসে যখন ছেলে দুটোকে উপদেশ দিচ্ছিল, তখন পাশের হাইওয়ে দিয়ে যেতে যেতে একটা প্রাইভেট কার গতি কমিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কার্তিক দেখল, গাড়ির ড্রাইভার দরজা খুলে নেমে আসছে। সামনের সিটে বসে আছে বেশ সুন্দরী এক মহিলা।

লোকটি হেলতে-দুলতে দোকানের সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, “ভাল সিগারেট আছে?”

সামনে বসা সেলসম্যান ছেলেটা মাথা নাড়ল, “ভাল বলতে চারমিনার আছে, কাঁচি আছে। কোনটা দেব?”

“না না,” মাথা নাড়ল লোকটা, “কোনও দামি সিগারেট নেই?”

মাথা নেড়ে ছেলেটি বলল, “এর চেয়ে দামি নেই।”

এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল কার্তিক। এবার মুখ খুলল, “চৌমাথায় চলে যান। স্টেট এক্সপ্রেস পেয়ে যাবেন,” বলে উঠে দাঁড়াল সে।

“অ্যাঁ? চৌমাথার দোকানে স্টেট এক্সপ্রেস পাওয়া যায়? বাঃ,” লোকটি গাড়ির দিকে এগোলে কার্তিক নীচে নেমে এল। তার গাড়ির দরজার কাছে পৌঁছে সে মুখ ঘুরিয়ে দেখল, লোকটি তাদের গাড়িতে উঠছে। কিন্তু পাশের দরজা খুলে মহিলা নীচে নেমে আসছে। খুব আধুনিক সাজগোজ মহিলার, তবু চিনতে অসুবিধে হল না কার্তিকের। অনেক অনেক বছর চলে গেলেও কোনও কোনও মুখকে স্মৃতি নিজের মতো করে লালন করে। কেন করে তা সে নিজেই জানে না। তবে যাকে সে চিনত, তার চেয়ে এই মহিলা অনেক ভাল দেখতে হয়েছে। কয়েক পা এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে গেল মহিলা, “এক্সকিউজ় মি।”

কয়েক বছর আগে হলে এই শব্দ দু’টি শুনলে বেশ ঘাবড়ে যেত কার্তিক। কী জবাব দেবে ভেবে পেত না। এখন তার বরেনদার সৌজন্যে সে শব্দগুলো চিনে নিয়েছে।

কার্তিক বলল, “হ্যাঁ, বলুন।”

“আপনি এই দোকানের...” থেমে গেল মহিলা।

“হ্যাঁ, দোকানটা আমার। কিছু বলবেন?”

“আমার মনে হচ্ছে আমি আপনাকে খুব চিনি, কিন্তু আপনি অনেক বদলে গিয়েছেন। আপনি কি ওই চা-বাগানে থাকেন?”

“না। ওখানে আমি ফুটবল খেলতে যেতাম। হ্যাঁ, আপনি আমাকে ঠিকই চিনেছেন, আপনি তো নতুন ডাক্তারবাবুর মেয়ে, তাই তো?”

মহিলা হাসল, “বাবার অনেক বছর হয়ে গেল এখানে। তবু নতুন শব্দটা দেখা যায় অনেকেই বলে থাকেন। আচ্ছা, আপনার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপের ঘটনাটা কি মনে আছে?”

“মনে থাকাটা খুব স্বাভাবিক। তাই না?”

“ও!” মহিলা ঘুরে দাঁড়াল, “এই শুনছ?”

গাড়ি থেকে ভদ্রলোকের গলা ভেসে এল, “হ্যাঁ, বলো।”

“একটু এখানে এসো, প্লিজ়।”

মহিলা এমন মিষ্টি করে বললেন যে, কার্তিকের কান জুড়িয়ে গেল। দেখল, ভদ্রলোক হাসিমুখে মহিলার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

মহিলা বলল, “এঁকে আমি অল্প বয়স থেকে চিনি। তবে নাম জানি না।”

হেসে ফেলল কার্তিক। হেসে নিজের নাম বলল।

“এই বাগানে আপনারা থাকতেন?” ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

“না। আমি এই মুদির দোকানটা চালাতাম। খুব অল্প বয়স থেকেই করতে বাধ্য হয়েছিলাম। আচ্ছা, আমাকে এবার যেতে হবে। মিটিং আছে।”

“মিটিং?”

হেসে গাড়িতে ওঠার আগে কার্তিক বলল, “ওটা একটা নেশা। নমস্কার। চলি। চৌমাথায় গেলে আপনার সিগারেট পেয়ে যাবেন। কথাগুলো বলে গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন চালু করে বেরিয়ে এল কার্তিক। তখনই তার মনে হল এই লোকটির পরিচয় তো জানা হল না।

সে মাথা নাড়ল। গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবল, এমন নার্ভাস হয়ে পড়েছিল কেন সে! নার্ভাসই তো। যে গাড়ি চালাচ্ছিল সে নিশ্চয়ই এক জন সাধারণ ড্রাইভার নয়। চেহারা, সাজগোজ এবং সিগারেটের পছন্দ বলে দিচ্ছে বেশ ভাল টাকাপয়সা আছে। বাঙালি মেয়েরা যখন কোনও পুরুষকে 'এই শুনছ' বলে সম্বোধন করে, তখন বুঝতে হবে তাদের সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর। প্রেমিকাও প্রেমিককে ওই ভাবে ডাকে না।

এই মেয়ে বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতেই ছিল। তার পর আর ওকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কারণ ছিল না। তা হলে বিয়েটা হল কবে? এই চা-বাগানের কোনও মেয়ের বিয়ে তো চুপচাপ নিঃশব্দে হতে পারে না, তার ওপর মেয়েটি যদি বিধবা হয়, তা হলে পচা খাবারের স্বাদের জন্যে ছুটে আসা মাছির মতো মুখে মুখে কথা ছড়াবে। সেরকম হলে কান এড়িয়ে যেত না। তা হলে বিয়ে হয়েছে অন্য কোথাও, যেখানে মেয়েটি এত দিন ছিল।

অথবা জলপাইগুড়ি জেলার এক কোণের এই চা-বাগানে কলকাতার হাওয়া এসে পৌঁছেছে। চা-বাগানের কোয়ার্টার্সে যারা চাকরি সূত্রে এসে বাস করে, তাদের মধ্যে হয়তো এখন আগের মতো সখ্য তৈরি হয় না। যে যার মতো পৃথক পৃথক কোয়ার্টার্সে পরস্পরকে এড়িয়ে বেঁচে থাকে চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত। তাই নতুন ডাক্তারবাবু বিধবা মেয়ের দ্বিতীয় বিয়ের খবর এই চা-বাগানের সহকর্মীদের দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি।

বরেন রায় এখন কার্তিকের ওপর বেশি নির্ভর করছেন। তার অন্যতম কারণ, কার্তিক এই চা-বাগানে জন্মেছে এবং বড় হয়েছে। সে স্বচ্ছন্দে এখানকার শ্রমিক-কর্মচারীদের ভাষা বলতে পারে। তখন তাকে ঘরের ছেলে বলে মনে করে তারা।

বছর দুয়েক ধরে একটু একটু করে সংগঠন তৈরি করার পরে বরেন কার্তিককে কাছে ডেকে বললেন, "আগামী বিধানসভার নির্বাচনে পার্টি নতুন ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো, দু'বার নির্বাচিত এমএলএ-র শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়েছে। তাই তাঁর জায়গায় যিনি নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁকে যেমন করেই হোক জিতিয়ে আনতে হবে। তোমার চা-বাগান ও তার আশপাশের এলাকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে।"

"আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব," কার্তিক বলেছিল।

"আর একটা কথা। তুমি বাসের পারমিটের জন্যে চেষ্টা করছ না কেন?"

"আমার তো অত টাকা নেই দাদা," সঙ্কোচের সঙ্গে বলল কার্তিক।

"আরে, রাস্তায় নামলে পা আপনা থেকেই হাঁটতে শুরু করে। তুমি যদি বসে বা শুয়ে থাকো, তা হলে তোমার শরীর হাঁটবে কী করে? তুমি বাসের পারমিটের জন্যে দরখাস্ত করে দাও। অন্য সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে," বরেন বললেন।

প্রথমে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড বাস কিনে নিল কার্তিক। ব্যাঙ্ক থেকে ধারের ব্যবস্থা করে দিলেন বরেন। রাজনীতি করার কিছু সুবিধে আছে, যা সাধারণ মানুষ পায় না। তাকে ঠকানোর আগে সাধারণ মানুষ দশবার চিন্তা করে। ফলে দু'বছরের মধ্যে ধার শোধ হয়ে যাওয়ায় একটা আস্ত বাসের মালিক হয়ে গেল কার্তিক। এখন তার শ্বাস ফেলারও যেন সময় নেই। মাকে সমানে বলে চলেছে, আর কিছুদিন অপেক্ষা করো, নির্বাচনটা হয়ে যাক।

মা বললেন, "নির্বাচনে তো অন্য লোক জিতে এমএলএ হবে। তোর কী?"

কার্তিক হাসে। কিন্তু উত্তর দেয় না।

চেহারা পাল্টাচ্ছে দ্রুত। কয়েক বছর আগে এলাকাটা ছিল সম্পূর্ণ চা-বাগান কেন্দ্রিক। চা-বাগানের বাইরে কিছু সরকারি অফিস ছাড়া সাধারণ মানুষ এসে যে-এলাকা গড়েছিলেন, তার জনসংখ্যা ছিল খুব সীমিত। কিন্তু যত পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ অত্যাচারিত হয়ে অথবা ভয়ে সীমান্ত পেরিয়ে আশ্রয় নিতে লাগল ভারতের সীমানার ভেতর, তত এখানকার জনসংখ্যা বাড়তে লাগল। চাষের জমি খুব সীমিত, আশ্রয় নিতে পারা মানুষরা চেষ্টা করতে লাগলেন ব্যবসা করে বেঁচে থাকার লড়াই জিততে।

এই ভেসে আসা মানুষরা যখন ভোটাধিকার অর্জন করলেন, তখন চা-বাগানের গরিমা ম্লান হয়ে এল। চা-শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিক পরিবারের সন্তানেরা ধীরে ধীরে শিক্ষার সুযোগ পেতে লাগল। আর এই পরিবর্তিত আবহাওয়া কার্তিককে খুব সুন্দর সাহায্য করতে লাগল। যে-প্রার্থীর জন্য বরেনের অনুগামী হয়ে সে নির্বাচনে প্রচার করেছিল, তিনি বিপুল ভোটে জিতলেন বটে, কিন্তু তার চেয়ে কার্তিক নিজেকে নেতা হিসেবে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারল।

চা-বাগানের শ্রমিকরা নানান বঞ্চনার ব্যাপারে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে যখন কথা বলছে, তখন শোনা গেল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। খবর পেয়ে কার্তিকও খবর পাঠাল যে, মালিকপক্ষ অথবা বড়সাহেবের সঙ্গে দশ দিন পরে দেখা করবে। তত দিন শ্রমিকরা শান্তি বজায় রাখবে। এর আগে এই চা-বাগানে কোনও শ্রমিক আন্দোলন হয়নি। চা-বাগানের মালিকরা ম্যানেজারের মাধ্যমে যা জানাত, তাই মেনে নিতে বাধ্য হত শ্রমিকরা। পার্টির আঞ্চলিক সম্পাদক হিসেবে কার্তিকের চিঠি পেয়ে কর্তারা খুব অবাক। তাঁরা বুঝলেন ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে না।

দশ দিন পরে হাইওয়ে থেকে নেমে কার্তিকের গাড়ি যখন চা-বাগানে ঢুকছে, তখন সে ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলল। গাড়ি দাঁড়ালে সে পাশের মাঠের দিকে তাকাতেই হুড়মুড়িয়ে বাল্যকাল থেকে কৈশোরের দিনগুলো সামনে চলে এল। অতীন, দীপু, খোকনরা এখন কোথায় তা তার জানা নেই। কিশোর এই চা-বাগানেই চাকরি করছে। চাকরিতে ঢোকার সময় এককালের বন্ধু মুদির দোকানদার বলে সে সম্পর্ক রাখতে চায় না, সেই কথা মাথায় থেকে গিয়েছে বলে আর কাছাকাছি হতে চায়নি কার্তিক।

বড়সাহেবের অফিসের সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই দু'জন সহকারী ম্যানেজার এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালেন কার্তিককে। তার পর পরম সমাদরে তাকে নিয়ে গেলেন বড়সাহেবের অফিসের ভেতরে।

প্রাথমিক পরিচয়ের পর বড়সাহেব চা খাওয়ার প্রস্তাব দিলে কার্তিক সবিনয়ে বলল, "অনেক ধন্যবাদ। আমি বেশি চা পান করি না। শুনুন, আমি আজ প্রথমবার আপনার সঙ্গে কথা বলতে এলাম কারণ, আমি অশান্তি পছন্দ করি না। যে সব ব্যাপারে শ্রমিকরা আপত্তি জানাচ্ছে তা আপনার জানা আছে। আমি তার একটা লিস্ট সঙ্গে এনেছি। এটা ঠিক, আপনাদের পক্ষে এর সবগুলো মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আসুন, একটা সমঝোতায় আসা যাক। আপনারা এর অর্ধেকটা মেনে নিন। অন্তত দু'বছর চুপচাপ ভেবে দেখুন বাকিগুলো কীভাবে নেবেন।"

বড়সাহেব কিছু বলতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে হাত তুলে থামাল কার্তিক, "না, আর কথা বাড়াবেন না। আমি এইটাই ওপর মহলকে রিপোর্ট করছি।"

কার্তিক হাসতে হাসতে গাড়িতে ওঠার সময় দেখতে পেল, একটু দূরে দাঁড়িয়ে কিশোর তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে খুব দ্রুত ভাবল কিশোরের সামনে গিয়ে কথা বলবে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ খেয়াল হল এখানে সে এসেছে বিশেষ প্রয়োজনে, বন্ধুত্ব ঝালাই করতে নয়। সে আর না-এগিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল কিশোর। বহু দিন পরে কার্তিককে এত কাছ থেকে দেখে চেনা মানুষ বলে একদম মনে হচ্ছিল না। ওর হাঁটাচলাও আমূল বদলে গিয়েছে।

এক জন বেয়ারা এসে বলল, "আপনাকে বড়সাহেব ডাকছেন।"

সংবিৎ ফিরে এল কিশোরের। সে দ্রুত বড়সাহেবের সামনে পৌঁছে বলল, "ইয়েস স্যার।"

বড়সাহেব তাকালেন। বললেন, "আপনারা নাকি বাল্যবন্ধু, একসঙ্গে খেলাধুলো করেছেন। কিন্তু এখন তো এসব কথা সত্যি বলে মনে হচ্ছে না।"

কী বলবে বুঝতে না পেরে মাথা চুলকোল কিশোর। তার পর নিচু গলায় বলল, "অনেক দিন দেখাশোনা হয় না তো, তাই।"

"শুনুন, ওরা যেসব ডিমান্ড করেছে, তার ফিফটি পার্সেন্ট মানলে চুপ করে যাবে বলেছে। আমি কিছু বলিনি। কিন্তু আপনি ওর সঙ্গে দেখা করে আমি যা বলব তা জানাবেন। বাই দ্য বাই, ওর বাড়ি কিংবা দোকান কি বাগানের জমির ভেতরে?"

"না স্যার। ওই জায়গা তো সরকারি প্রপার্টি।"

"ও। আপনি লাঞ্চের পরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আমি বলে দেব কোন কোন পয়েন্ট আমরা মেনে নিতে পারি। আপনার তো বন্ধু ছিল একসময়, ওকে চেষ্টা করুন কনভিন্স করতে," বড়সাহেব তাঁর অফিসের ভেতরে ঢুকে গেলেন।

বিকেলের আগেই ডাক পড়ল। প্রবল অস্বস্তি নিয়ে বড়সাহেবের ঘরের ভিতর ঢুকল কিশোর। বড়সাহেব তাঁর চেয়ারে বসেছিলেন। ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বের করে এগিয়ে দিলেন তিনি, "এখানে যেসব পয়েন্ট লেখা আছে তা মন দিয়ে পড়বেন। শুধু দু'তিনটে ব্যাপারে আমরা ওদের সঙ্গে সহমত হতে পারি। বাকিগুলো আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। আপনার বাল্যবন্ধু যখন, তখন নিশ্চয়ই আপনি ওকে বুঝিয়ে বলতে পারবেন।"

"আমি কি ওর বাড়িতে গিয়ে কথা বলব?"

"যেখানে খুশি। ওর সঙ্গে ছেলেবেলার বন্ধুত্ব রিভাইভ করার চেষ্টা করুন," বড়সাহেব কাগজটি কিশোরের দিকে ঠেলে দিয়ে পাশের ফাইল টেনে নিলেন।

কাগজটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল কিশোর।

যতই জনসংখ্যা বেড়ে যাক, একমাত্র পার্টি অফিসটি কোথায় তা সবাই জানে। কিন্তু সেখানে গেলে কারও জানতে বাকি থাকবে না, চা-বাগানের বড়বাবু কেন এসেছিলেন। কিশোর সন্ধের পর চলে এল কার্তিকের মুদির দোকানে। সেখানে এখন তার টেনে এনে ইলেকট্রিকের আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুই মধ্যবয়সি মানুষ খরিদ্দারদের ভিড় সামলাচ্ছে। জিজ্ঞেস করে কিশোর জানতে পারল, কার্তিক এখনও ফিরে আসেনি। আগে ছিল না, এখন কিশোর দেখল, দোকানের সামনে একটা বড় সিমেন্টের বেঞ্চি তৈরি করা হয়েছে। বেঞ্চি অলস লোকদের আড্ডা মারার জায়গা হয়ে গেছে।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকল কিশোর। বড়বাবুকে চেনে না চা-বাগানে এমন শ্রমিকের সংখ্যা খুব কম। খরিদ্দারদের অনেককে কিশোর চেনে, কিন্তু তারা কেউ কিশোরের কাছে এসে তার এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করার সাহস পেল না।

রাত সাড়ে ন'টার কিছু পরে গাড়িটা এসে দাঁড়াল। দরজা খুলে কার্তিক নেমে আসতেই গাড়িটা মুখ ঘুরিয়ে ফিরে গেল। কার্তিক দোকানের দিকে পা বাড়াতেই দূরে দাঁড়ানো কিশোরকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে বলল, "আরে!"

এগিয়ে এল কিশোর, "আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছি।"

"ও। ভেতরে গিয়ে বসবে?" জিজ্ঞেস করল কার্তিক।

"না না। বেশি সময় লাগবে না।"

"বলো।"

"আমাকে বড়সাহেব পাঠালেন।"

"খুব স্বাভাবিক। তুমি তো এখন বড়বাবু।"

"ওই আর কী," বলল কিশোর।

"বেশ, বলো।"

"তোমরা যে ক'টা দাবি রেখেছ তার সবগুলো মেনে নেওয়া এখনই সম্ভব হচ্ছে না।"

"সে তো কথাই হয়ে গেছে। আমি অর্ধেকটা নিয়ে দু'বছর পরে ভাবব বলে এসেছি। বড়সাহেব কি সেকথা শোনেননি?"

"শুনেছেন। উনি, দাঁড়াও," পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে এগিয়ে দিল কিশোর। সেটা নিয়ে চোখ বুলিয়ে হাসল কার্তিক। তার পর বলল, "ঠিক আছে। আমি এই কাগজটা আমাদের দলের যাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন, তাঁদের কাছে পৌঁছে দেব। কী করবেন সেটা তাঁরাই জানিয়ে দেবেন।"

"আমাদের অফিসে গিয়ে অর্ধেক মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত তো তুমি নিজে নিয়েছিলে। তা হলে এখন অন্যদের ওপর ছেড়ে দিচ্ছ কেন?" কিশোর বলল।

"দ্যাখো, তোমাদের বড়সাহেব যদি তাঁর অফিসে আলোচনার সময় এই প্রস্তাব দিতেন, তা হলে আমি তখনই কথা বলতাম। দল আমাকে সেই দায়িত্ব দিয়েছিল। কিন্তু আমার বাড়ির সামনে এই রাত্রে এসে তুমি গোপনে আর-একরকম প্রস্তাব দিলে, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই," একটু থেমে কার্তিক জিজ্ঞেস করল, "এত রাত্রে তুমি নিশ্চয়ই চা খাবে না?"

দ্রুত মাথা নাড়ল কিশোর, "না। তা হলে তুমি কিছু বলবে না?"

"না। হাসল কার্তিক, "আমি তা হলে যেতে পারি?"

মাথা নেড়ে ফেরার পথ ধরল কিশোর। খুব অপমানিত বোধ করছিল, তার মনে হচ্ছিল কার্তিক যেন তার গালে সজোরে চড় মারল। কিন্তু কী করতে পারে সে! চা-বাগানের এক জন বড়বাবুর পক্ষে কী করা সম্ভব!

গতকাল পাতিবাবুকে চাকরি থেকে অবসরের জন্যে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল অফিসে। সঙ্গে কিছু উপহার। প্রায় সমস্ত বাঙালি কর্মচারী উপস্থিত ছিল সেখানে। বড়সাহেব বদলে গিয়েছেন। অদ্ভুত দু'জন বড়সাহেবকে দেখেছেন পাতিবাবু। এখন যিনি বড়সাহেব, তিনি বেশি দিন না এলেও পাতিবাবু সম্পর্কে যা বললেন, তাতে ভুল ছিল না।

আজ থেকে ভদ্রলোকের অবসর নেওয়ার কথা, কিন্তু তাঁকে কয়েকদিন আসতে-যেতে হবেই। অবসরের পর তাঁর যা পাওনা, তার হিসেব যাতে ঠিকঠাক হয় সে-ব্যাপারে সাহায্য করতে। কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী, তিনি আরও তিন মাস কোয়ার্টার্সে থাকতে পারবেন। ওই সময়ের মধ্যে পরবর্তী বাসস্থানের ব্যবস্থা করে তাঁকে চলে যেতে হবে।

আজ দুপুরে একমাত্র ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টার্স ছাড়া বাকিগুলো থেকে মহিলারা বেরিয়ে চলে এলেন পাতিবাবুর কোয়ার্টার্সে। পাতিবাবু যে অফিসে গিয়েছেন তা ওঁদের জানা ছিল।

পাতিবাবুর স্ত্রী বেশ রোগা। স্বামীর সঙ্গে তাঁর বয়সের ব্যবধান অন্তত কুড়ি বছরের। বিজয়া দশমী আর লক্ষ্মী পুজো ছাড়া কোয়ার্টার্সের মহিলারা সাধারণত এক জন অন্য জনের সঙ্গে গল্প করতে যান না। পাতিবাবুর স্ত্রী মাসের বেশির ভাগ সময় অসুস্থ থাকেন। তাঁর তিন মেয়ে। বড়টার বয়স আঠারো, ছোটটার পাঁচ। পুত্রসন্তান হয়নি বলে ভদ্রমহিলার মনে খুব দুঃখ।

দরজা খুলেছিল মেজো মেয়ে। মহিলাদের একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চিৎকার করল, "মা, দ্যাখো, এসে দ্যাখো, কারা এসেছেন!"

সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুই মেয়ে ছুটে এসে অবাক হয়ে তাকাল। তার পর পাতিবাবুর স্ত্রী এসে ভেতরের দরজায় দাঁড়ালেন, "ও মা! কী সৌভাগ্য। এসো এসো!"

"আমাদের সবার খুব মন খারাপ। তাই না এসে পারলাম না।"

"ও। আমারও খুব মন খারাপ ভাই। বাছা, সবাই বসো। এই বড়, ও ঘর থেকে মোড়া এনে দে," বড়মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন।

সবাই বসার পর পাতিবাবুর স্ত্রী বললেন, "চা করতে বলি?"

"না না। এই তো ভাত খেয়ে এলাম," প্রথম জন বলল।

দ্বিতীয় জন বলল, "আমরা এতকাল একসঙ্গে আছি, ভাবতেই পারছি না সামনের পুজোয় এখানে পুজো হবে, কিন্তু তোমাদের দেখতে পাব না।"

"সেটা ভেবে তো মন আরও খারাপ হয়ে আছে। অনেক বাগানে চাকরি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে শুনেছি আরও দু'তিন বছর বাড়িয়ে দেয়। ওঁকে এত করে বললাম। আমার কথা শুনলেন না। বড়সাহেবকে ঠিক করে ধরলে তিনমাস পরে এখান থেকে চলে যেতে হত না। কী যে করি!

খুব মন খারাপ হয়ে গেছে ভাই,” চোখ মুছলেন পাতিবাবুর স্ত্রী।

“আজকাল রিটায়ার হওয়ার পর চাকরির মেয়াদ বাড়াতে চায় না।”

“নতুন রক্ত চাই, খাটতে পারবে বলে ভাবে।”

“তা দিদি, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? বাড়ি কিনেছেন?”

“বাড়ি? মেয়ের বিয়ে দেব, না বাড়ি বানাব! একটা নয়, পরপর তিন-তিনটে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। বাড়ি বানালে ওদের বিয়ে দেব কী করে?” পাতিবাবুর স্ত্রীর কথা শেষ হতেই মেজোমেয়ে ফোঁস করে উঠল, “আমার জন্যে ভাবতে হবে না, আমি বিয়ে করব না।”

“ও মা!” টাইপবাবুর স্ত্রী বললেন, “বিয়ে না করে তুই কী করবি?”

“পড়াশোনা করব। তার পর চাকরির চেষ্টা করলে একটা না একটা ঠিক পেয়ে যাব,” বেশ জোর গলায় বলল মেয়েটি।

“ঠিক আছে। তুই যা, চা বানিয়ে নিয়ে আয়,” কপট ধমকের গলায় বললেন পাতিবাবুর স্ত্রী।

মেজোমেয়ে মুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল।

এক জন জিজ্ঞেস করলেন, “বড় গিন্নি এসেছিলেন?”

“না। ওঁর কর্তার বাবা, রিটায়ার করার পর সাহেবদের হাতে-পায়ে ধরে ছেলেকে চাকরিটা পাইয়ে দিয়েছিলেন, আমাদের তো ধরার কেউ নেই। উনি হয়তো ভাবছেন এখন এত মাখামাখি করার কারণে যদি আমরা ওঁর কর্তাকে অনুরোধ করি আর-একটা বছর বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে,” বড় শ্বাস ফেললেন পাতিবাবুর স্ত্রী, “বড় মেয়ের একটা ভাল সম্বন্ধ এসেছে, তারা মাস তিনেক পর বিয়ে দিতে চায়। এই বাড়ি থেকে বিয়েটা হলে কী যে ভাল হত।”

“এই কথাটা বড়সাহেবকে বললে হয় না?” এক জন জিজ্ঞাসা করল।

“আমি তো ওঁকে তাই বলেছি। ওঁর যত হম্বিতম্বি এই বাড়ির ভেতরে। সাহেবের সামনে গেলে বোবা হয়ে যান।”

“আপনাদের উচিত ছিল একটু একটু করে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করে রাখা।”

“কী বলব ভাই। আমার কথা উনি কানেই তুলতে চান না। বলেন, কাছা ছাড়া শাড়ি পরো, তোমাদের বুদ্ধির বহর জানা আছে।”

এক জন মুখ বেঁকালেন, “বউদের অবহেলা করে পুরুষরা যে কী আনন্দ পায় তা ওরাই জানে। আমি দিদি, তোমার মেজোমেয়েকে মনে মনে খুব সমর্থন করি।”

চা খেয়ে মহিলারা উঠলেন। পাতিবাবুর স্ত্রী বললেন, “তোমরা এসে খুব উপকার করলে ভাই। নিজের মেয়েদের সঙ্গে আর কত কথা বলব! এখান থেকে চলে গেলে তো আর তোমাদের দেখা পাব না।”

“চলে তো যেতেই হবে। এখানে তো কর্তাদের চাকরি শেষ হয়ে গেলে আর আমরা কেউ ইচ্ছে হলেও থাকতে পারব না। কেউ আগে, কেউ পরে, যেতেই হবে।”

আর-এক জন বিষাদমাখানো গলায় বলল, “আমরা কেউই এখানে চিরকাল থাকতে পারব না। আমাদের জায়গায় নতুন মানুষ আসবে। তারা আমাদের চিনতেও পারবে না।”

মহিলারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে চুপচাপ যে যার নিজের গন্তব্যে চলে গেল, তখনও কর্তাদের বাড়ি ফেরার সময় হয়নি। তখনও আলো নেভেনি, তবে রোদের তেজ একেবারেই চলে গেছে।

খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল অতীন। একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠতে সে অভ্যস্ত। অতীনের অফিস দিল্লিতে। কিছু দিন হল অতীনের স্ত্রী ব্যাঙ্গালোরে বদলি হয়ে যাওয়ায় তাকে একাই থাকতে হয়। ওদের একটি মেয়ে, চাকরিসূত্রে বাইরে থাকে। বড় ফ্ল্যাটে একা থাকতে থাকতে অতীন সঙ্গহীনতায় ভুগছে। কোনও এক ছুটির দুপুরে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে চোখে পড়ল, নতুনদিল্লির রেলস্টেশনের সামনে এক জন আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছে। লাশ মিলেছে। লোকটা বাঙালি। নাম দীপক সেন। অলস চোখে পড়তে পড়তে যেন একটা খোঁচা খেল অতীন। সোজা হয়ে খবরটা আবার পড়ল। দীপক সেন। দীপুর টাইটেল কি সেন ছিল, এত বছর পরে সেটা স্পষ্ট মনে আসছে না। কিন্তু সে এই দীপক সেনের বয়সটা কাগজে না-পাওয়ায় অস্বস্তিতে পড়ল। দীপুর বয়স এখন তারই মতো, আটান্ন-ষাট হওয়া উচিত।

বাল্যস্মৃতিগুলো ধারালো হয়ে ফিকে হলে স্বস্তিতে থাকা সম্ভব হয় না। অতীন খবরের কাগজের অফিসে ফোন করে নিহত লোকটির বয়স জানতে চাইল। যে-রিপোর্টার খবর লিখেছিল, তাকে ভাগ্যক্রমে পেয়ে যাওয়ায় সে জানতে পারল, যে দীপক খুন হয়েছে তার বয়স তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে কী ভাল যে লাগল। কয়েক ঘণ্টার উদ্বেগ নিমেষে মিলিয়ে গেল। ষাটের কাছাকাছি মানুষকে কেউ ভুল করে অর্ধেক বয়সের বলে ভাবতে পারে না। কিন্তু সেই উদ্বেগ কমে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে অপর এক চিন্তা প্রবল হল। দীপক, দীপকরা এখন কেমন আছে? যে-দৌড় তারা শুরু করেছিল তাতে পেছন দিকে দূরের কথা, পাশের দিকে তাকানোরও অবকাশ তার ছিল না। বন্ধুরা সবাই ছিটকে গিয়েছে, যে যার বৃত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন মুখগুলো মনে এলে সেই কিশোর-তরুণ মুখগুলোই মনে পড়ে। খোকনের ভাল করে দাড়ি বের হয়নি বলে ভয় পেত সে, মাকুন্দ না হয়ে যায়। মাকুন্দ হলে তো ওর মুখ কেউ ভোরবেলায় দেখবে না। সেই পনেরো বছর বয়স থেকেই তার মসৃণ গালে রোজ স্নানের আগে পেনসিলে ব্লেড গুঁজে দাড়ির চাষ করত খোকন।

এই সব ছোট ছোট ব্যাপার যত মনে পড়তে লাগল, তত বুকে ভার জমতে শুরু করল। টেলিফোনে স্ত্রীকে সে জানাল, কয়েক দিন ছুটি নিয়ে সে জলপাইগুড়ি যেতে চায়। শুনে স্ত্রী অবাক। বিয়ের পর ভদ্রমহিলা কখনওই জলপাইগুড়িতে যাননি। কারণ, তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ি থাকতেন কলকাতায়। সেখানেই তাঁরা দেহ রেখেছেন। আজ এত দিন পরে হঠাৎ অতীনের মন জলপাইগুড়ির জন্যে আকুল হল কেন, বুঝতে না পেরেও আপত্তি জানাবেন না তিনি।

পাঁচ দিনের ছুটি অফিস থেকে নিয়ে দিল্লি থেকে প্লেন ধরে বাগডোগরায় নেমে অতীন দেখল, প্রচুর ভিড় জমেছে। ওই একই ফ্লাইটে এক জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, যিনি কিনা পার্টিরও নেতা, দিল্লি থেকে এসেছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতেই এত জন এসেছে। সে জানত না বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে বাস ধরার সুযোগ নেই। ট্যাক্সিওয়ালারা ছেঁকে ধরে এবং তাদের ধারণা বহু গুণ ভাড়া চেয়ে যাত্রীকে বধ করা যায়।

কিন্তু যেহেতু আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এসেছেন তাই ট্যাক্সিওয়ালাদের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। সুটকেস নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অতীন বুঝতে পারছিল না সে কী করবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বেরিয়ে এলেন। তাঁকে মালা পরানো হল। স্থানীয় নেতারা তাঁকে সাজানো গাড়িতে তুলে একে একে বিমানবন্দর থেকে চলে যাচ্ছিলেন। তখন এক জনকে দেখে খুব পরিচিত বলে মনে হলেও, সেটা ঠিক নয় একথা ভেবে মাথা নাড়ল অতীন। সঙ্গের মানুষের সঙ্গে কথা বলার পর লোকটি ঘুরে দাঁড়াতেই অতীন তার মুখ পরিষ্কার দেখতে পেল। প্রায় চল্লিশ বছরের ব্যবধান, কিন্তু যতই চেহারা বদলে যাক, মুখের গড়ন তেমন বদলায়নি। একটু ভারী হয়েছে এই যা। অতীন দেখল, লোকটিকে সবাই করমর্দন করে অভিবাদন জানিয়ে যাচ্ছে। এইটাই আবার জল ঘোলা করে দিচ্ছে। যার সঙ্গে সে মিল খুঁজে পাচ্ছে তার তো এইভাবে আপ্যায়িত হওয়ার কথা নয়। চোখের সামনে সেই শ্রমিকদের, বলা যায় দরিদ্র শ্রমিকদের মুখখানা ভেসে উঠল। চল্লিশ বছর পরেও সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

অতীন দেখল, লোকটি এক জন মধ্যবয়সি মানুষকে ডেকে তার দিকে তাকিয়ে কিছু বলছে। লোকটি মাথা নাড়ল। তার পর দ্রুত চলে এল তার সামনে, “আপনি কি জলপাইগুড়ি যাওয়ার জন্যে গাড়ি খুঁজছেন?”

হেসে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল অতীন।

“আজ এখানে গাড়ির প্রবলেম আছে। আপনি চাইলে আমাদের একটা গাড়িতে যেতে পারেন, সেটা জলপাইগুড়ি শহরে যাচ্ছে।”

“ওঃ, খুব ভাল কথা।”

লোকটির সঙ্গে যে-গাড়িতে সে উঠে বসল, সেখানে ইতিমধ্যেই ড্রাইভার ছাড়া তিন জন লোক বসে আছে। তাদের যা বলার তা লোকটি

বলে দেওয়ার পর গাড়ি চলতে শুরু করল। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর পাশের লোকটি জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি জলপাইগুড়িতে থাকেন?"

"না," মাথা নাড়ল অতীন, "আমি দিল্লিতে থাকি।"

"ও। মিনিস্টারের সঙ্গে এসেছেন," লোকটি হাসল।

"ছোটদার সঙ্গে বোধহয় দিল্লিতেই পরিচয় হয়েছে?" আর-এক জন জিজ্ঞেস করল।

"ছোটদা?" অবাক হল অতীন।

"এখানে কেউ কার্তিকদার নাম ধরে ডাকে না। সবাই ছোটদা বলে।"

"ও," জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল অতীন। কোনও ভুল নেই, ওই মানুষটিই সেই ছেলেবেলার বন্ধু কার্তিক। দূর থেকে তাকে দেখেই চিনতে পেরেছে অতীন, এত বছর পরেও। বদল হয়েছে চেহারার, কিন্তু অল্প বয়সটা একেবারে হারিয়ে যায়নি। বোঝা যাচ্ছে, দূর থেকে তাকে দেখে চিনতে পেরেছে কার্তিকও। অতীনের স্ত্রী বলে, রোগা বলে নাকি তার চেহারার বদল হয়নি।

কিন্তু তাকে চিনে কার্তিক লোক পাঠিয়ে তার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। প্রচুর উপকার করেছে কার্তিক। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও বুঝতে দিল না, সে অতীনের বাল্যবন্ধু কার্তিক। কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব? যে-ছেলেটা পয়সার অভাবে, স্কুল-বাসের ভাড়া দিতে পারেনি বলে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হল, মামার মুদির দোকানে প্রায় চাকরের কাজ শুরু করল, সেই ছেলে এই পরিণত বয়সে বিমানবন্দরে এক জন ক্ষমতাবান নেতার মতো আচরণ করছে কী করে!

"আপনি জলপাইগুড়ির কোন পাড়ায় যাবেন?" এক জন জিজ্ঞেস করল।

"আমি?" একটু বিব্রত বোধ করল অতীন। বলল, "এখন তো চেনাশোনা কেউ ওখানে আছে কি না জানি না। ভাবছি কোনও হোটেলে উঠব।"

"ও। তার মানে আপনি এখানকার লোক নন?" আর-এক জন বলল।

"ছিলাম, জন্মেছিলাম, স্কুলজীবন কাটিয়েছি..."

"আচ্ছা। জলপাইগুড়ি শহরেই?"

"না, না," হেসে চা-বাগানের নামটা জানাল অতীন।

"আরে! কী আশ্চর্য! আমরা তো ওর কাছাকাছি, বাজারহাটে যাচ্ছি।"

"ও।"

এর পরে লোকগুলো নিজেদের মধ্যে জলপাইগুড়ির হোটেলের নাম বলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত একটি নাম সর্বসম্মত হওয়ায় সেখানেই উঠতে বলল ওরা, অতীনকে। যাওয়ার সময় সেই হোটেলের সামনে অতীনকে নামিয়ে দিয়ে যাবে বলে জানাল।

কথা যখন বন্ধ হল তখন জানলা দিয়ে প্রকৃতি দেখতে দেখতে অতীন ভাবল, উত্তরবঙ্গের মানুষদের কৌতূহল সীমা ছাড়ায় না। নইলে ওরা জিজ্ঞেস করতে পারত, কেন সে এত দিন পরে জলপাইগুড়িতে এসেছে? পরিচিত কেউ আছে কি না এখানে? থাকলে সেখানে না উঠে কেন হোটেলে উঠছে ইত্যাদি, ইত্যাদি।

হোটেলটি ভাল। তার সহযাত্রীরা শুধু এগিয়ে দিয়েই চলে যায়নি, হোটেলের ভেতরে ঢুকে ম্যানেজারকে বলেছে, "ইনি দাদার লোক। একটু খেয়াল রাখবেন।"

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই," ম্যানেজার যে লোকগুলোকে চিনতে পেরেছেন, তা তাঁর চেহারায় বোঝা যাচ্ছিল। ভাল ঘর দেওয়া হল তাকে।

বিকেল হয়ে এসেছে। আজ কোথাও গিয়ে লাভ নেই। সেই দিল্লি থেকে অনেকটা দূরত্ব এসে বিশ্রাম নেওয়াই ভাল। বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল অতীন। এটুকুতেই বিশ্রামের কথা সে কি আগে কখনও ভেবেছিল? সময় কত বদলে দেয়!

হোটেলের ম্যানেজার তার কথায় একটা গাড়ি ভাড়া করে দিলেন। তাকে শহর থেকে তিস্তা পেরিয়ে পঁচিশ মাইল দূরের চা-বাগানে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুটা সময় কাটানোর পর সে ফিরে আসবে। তবে তেমন প্রয়োজন হলে ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে। গাড়িতে বসে সে ভাবছিল কার্তিকের কথা। যে-বেচারাকে পড়াশোনা ছেড়ে মুদির দোকানদারি করতে হয়েছিল, সে এই জেলার ওপরতলায় স্বচ্ছন্দে কাজ করছে কী করে? যার পড়াশোনা নেই, সে কী করে শিক্ষিতদের সঙ্গে তাল রেখে চলছে।

গাড়ি একটা লম্বা ব্রিজে ওঠার আগে থামল। ড্রাইভার তার আসন থেকে নেমে বাসের টিকিট কাউন্টারে গিয়ে টিকিট কেটে ফিরে এলে সে জিজ্ঞেস করেছিল, "এটা কী ব্রিজ?"

"স্যার, এটা তিস্তা ব্রিজ। আগে ছিল না। এখন আমাদের খুব সুবিধে হয়েছে।"

গাড়ি লম্বা ব্রিজ পেরিয়ে যখন ধীর গতিতে চলছিল তখন ড্রাইভারকে থামাতে বলল অতীন। এখন নদীতে তেমন জল নেই। মাঝে মাঝেই বালি জেগে উঠেছে। অতীন আন্দাজ করে দূরের দিকে তাকাল। ও-পারের বাঁধ ছাড়িয়ে কিছু দূর গেলেই জেলা স্কুল। ভাবলেই বুকে থম ধরে।

গাড়ি নদী পেরিয়ে এগোতেই ড্রাইভার ডান দিকের পথ ধরল। অতীন জিজ্ঞেস করল, "এ কী! আপনি ময়নাগুড়ি দিয়ে যাবেন না?"

"না দাদা। আগে যেতাম। এখন এই বাইপাস হয়ে যাওয়ায় রাস্তা কমে গিয়েছে," ড্রাইভার জানাল।

আর কথা বাড়াল না অতীন। সব বদলে গিয়েছে। তিরিশ-চল্লিশ বছর আগের দেখা পৃথিবীটা এরকম পাল্টে যাবে, তা সে ভাবতেই পারেনি।

ধুপগুড়ি পেরিয়ে ডুডুয়া ব্রিজ ছাড়িয়ে কিছুটা এগোতেই ড্রাইভারকে আবার থামতে বলল অতীন। গাড়ি দাঁড়ালে দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল অতীন। গলির মুখে বেশ ঝকঝকে মুদির দোকান। কৈশোরে দেখা সেই দোকানের প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে। দোকানে এই সময় ভিড় নেই বললেই হয়।

অতীন আশা করেনি। দোকানে কার্তিকের দেখা পেল না সে। এক জন কর্মচারী জিজ্ঞেস করল, "কাউকে খুঁজছেন?"

"হ্যাঁ। এই দোকানটা একসময় কার্তিকদের ছিল, এখনও কি তাদের আছে?"

"হ্যাঁ স্যার। এটা দাদারই দোকান।"

"কার্তিক কি বাড়িতে আছে?"

"না। দাদা সাতসকালে বেরিয়ে গেছেন। দিল্লি থেকে মন্ত্রীমশাই এসেছেন তো। তাঁর কাছেই গিয়েছেন। আপনার নামটা..."

"আমি অতীন। আচ্ছা চলি," ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল সে।

ধীরে ধীরে চা-বাগানের কোয়ার্টার্সের সামনের হাইওয়ে দিয়ে বাজারের দিকে যেতেই অতীন সেই মাঠ, চাঁপা গাছ, পর পর একতলা বাড়িগুলো দেখতে পেয়ে উত্তেজিত হল। যে-সব কোয়ার্টার্সে সে এবং তার বন্ধুরা থাকত, সেগুলোর চেহারা পাল্টায়নি। সময় যেন স্থির হয়ে আছে এখানে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময় সব কিছুই ঠিকঠাক থাকতে পারে না। যারা কোয়ার্টার্সগুলোতে থাকত তাদের চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে অন্য কোথাও চলে যেতে নিশ্চয়ই বাধ্য হয়েছে।

বাজার এলাকায় চলে এল গাড়ি। আজ ছুটির দিন। তবে রবিবার নয় বলে হাট বসেনি। খানিকটা পাক দেওয়ার পরে চোখে পড়ল সেই দোকানটা, যা তাদের অল্প বয়সেও ছিল। এখনও একই চেহারায় রয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে দোকানটার সামনে যেতে যেতে মনে পড়ল, দোকানের মালিকের নাম ছিল ব্রজদা। ব্রজগোপাল সাহা। এই নামটাকে সে এত দিন একদম ভুলেই গিয়েছিল। আচমকা এখানে আসামাত্র মনে পড়ল।

দোকানের সামনে পৌঁছে সে দেখতে পেল এক জন বৃদ্ধ তার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রয়েছেন। বললেন, "কী চাই?"

দোকানটা দেখল অতীন। বই-খাতা পেনসিল বা কলমের দোকান। অর্থাৎ এই দেখা চরিত্রের বদল এত দিনে হয়নি। অতীন বলল, "আমার এখন কিছু চাই না। বহু বছর আগে আমি এখানে থাকতাম। এটা ব্রজদার দোকান তো?"

"ঠিক। একদম ঠিক। আপনার নাম কী ভাই?"

নিজের নাম বলার সময় অতীনের মনে হল বৃদ্ধকে তার বেশ চেনা

চেনা মনে হচ্ছে। হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বলল, "আচ্ছা, আপনার নাম কি ব্রজগোপাল সাহা?"

বৃদ্ধের মুখে হাসি ফুটল। মাথা নেড়ে বললেন, "আপনি দেখছি আমার নাম জানেন, কোথায় থাকেন আপনি?"

"ব্রজদা, আপনি আমাকে চিনতে পারলেন না? খুব অল্প বয়সে আমি এখানে থাকতাম। আমার বাবা এই চা-বাগানে চাকরি করতেন। আমার নাম অতীন।"

"ও। তা হবে। আমার তো পঞ্চাশ বছরের দোকান। কত মানুষ এল, গেল। তা এত দিন পরে এখানে কী মনে করে?"

"কোনও কারণ নেই। এসে ভাবলাম পুরনো মানুষদের সঙ্গে দেখা করে যাই। কিন্তু চা-বাগানে যাঁরা চাকরি করতেন, তাঁরা অবসর নেওয়ার পর তো আর এখানে নেই, কোথায় চলে গিয়েছেন তাও জানি না। আমি দিল্লিতে ছিলাম, যোগাযোগ ছিল না," অতীন বলল।

"তাই বলুন। পুরনো লোক কেউ কেউ আছেন, কিন্তু তাদের আপনি চিনবেন কি না জানি না। তবে এখন চা-বাগানের যিনি বড়বাবু, তাঁর বাবা একসময় বাগানেই কাজ করতেন। তিনি বোধহয় আপনার বয়সিই হবেন।"

"আচ্ছা! কী নাম তাঁর?" খুশি হল অতীন।

"আমরা তো বড়বাবু বলতেই অভ্যস্ত। দাঁড়ান। পোস্ট অফিসের পিওন যাচ্ছে জিজ্ঞেস করি। এই যে হরিপদ, এদিকে, হ্যাঁ। আচ্ছা, এই বাগানের বড়বাবুর নাম কী?"

লোকটি হাঁটতে হাঁটতেই জবাব দিল, "কিশোরবাবু।"

চমকে উঠল অতীন। সেই কিশোর! ও এখন বড়বাবু?

"আপনি কি চিনতে পারছেন ভাই?" বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন।

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল অতীন। বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি এখানে কার বাড়িতে উঠেছেন? এখানে তো হোটেল নেই।"

"না না। আমি জলপাইগুড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে এসেছি, আজই ফিরে যাব। আপনাকে অনেকক্ষণ বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না," অতীন বলল।

"আরে, না না। দেখছেন তো, মাছি তাড়াচ্ছি। আচ্ছা..."

গাড়িতে ফিরে এসে ড্রাইভারকে অতীন জিজ্ঞেস করল, "আপনি নিশ্চয়ই এদিকে যাওয়া-আসা করেন, বাগানের বড়বাবুর বাড়িটা আপনি চেনেন?"

লোকটি মাথা নেড়ে না বলে জিজ্ঞেস করল, "গেলেই জানতে পারব।"

"হ্যাঁ, চলুন।"

দেখা গেল যে-কোয়ার্টার্সে কিশোররা থাকত, বড়বাবু হওয়া সত্ত্বেও কিশোর এখনও সেখানেই রয়েছে। এখন রোদের তেজ কমেছে, সূর্য পশ্চিমে ঝুঁকেছে, গাড়ি থেকে নেমে বন্ধ দরজার পাশে বেলের বোতামটায় চাপ দিল অতীন। বাইরে-ভেতরে শব্দ হল। এক ভদ্রমহিলা দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার?"

"বড়বাবু আছেন?" হেসে জিজ্ঞেস করল অতীন। অনুমান করল মহিলা সম্ভবত কিশোরের স্ত্রী।

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, "আছেন, কিন্তু এখন উনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। পরে আসুন।"

"কিন্তু আমাকে যে জলপাইগুড়ি ফিরে যেতে হবে। একটু দেখুন না।"

"না না। এখন ডাকলে খুব রেগে যাবেন।"

"আপনি কি ওঁর মিসেস?"

"হ্যাঁ।"

"ওহো। নমস্কার নমস্কার। আপনি আমাকে চিনবেন না। এই বাড়িতে আপনারা থাকার অনেক আগে আমি এখানেই থাকতাম। দেখুন না, আমার নাম অতীন, নামটা বলুন ওকে।"

ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে গেলেন। খানিক পরে গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। তার চোখ বিস্ফারিত। সেই চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে বলল, "অতীন! মানে তুমিই সেই অতীন! ভাবতেই পারছি না।"

হাত বাড়িয়ে দিল অতীন, জড়িয়ে ধরল কিশোর তার হাত। বলল, "আরে, ভাবতেই পারছি না। এত দিন কোথায় ছিলে ভাই?"

"কী ব্যাপার? আমাকে তুমি তুমি করে কথা বলছিস কেন। কয়েক বছর দেখা হয়নি বলে আমি দূরের মানুষ হয়ে গেছি?" হাসল অতীন।

"না না। অনেককাল যোগাযোগ নেই তো! তা ছাড়া, তোমার চেহারা এখন কীরকম উঁচুতলার মানুষদের মতো হয়ে গিয়েছে..."

"ভাগ। কী উল্টোপাল্টা বলছিস?"

"আয়। ভেতরে আয়," পুরনো বন্ধুর হাত ধরে ভেতরের ঘরে নিয়ে চেয়ারে বসাল কিশোর। তার পর গলা তুলে ডাকল, "এই যে, শুনছ?"

ভদ্রমহিলা ভেতরের দরজার পাশেই ছিলেন, এগিয়ে এসে বললেন, "বলো।"

"তুমি যাকে দরজা খুলে দিলে সে আমার বাল্যবন্ধু। পাশের কোয়ার্টার্সে ওরা থাকত। ছেলেবেলা থেকে স্কুলের শেষ ক্লাস পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। আর বুঝতেই পারছিস, ইনি আমার অর্ধাঙ্গিনী, শিবানী।"

হাতজোড় করল অতীন। বলল, "আমি একটু নাছোড়বান্দা বলে উনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোকে ডেকে দিলেন।"

সঙ্গে সঙ্গে শিবানীর গলায় অভিমান স্পষ্ট হল, "দেখলে, তোমার জন্যে আমার কীরকম বদনাম হয়ে যাচ্ছে," তার পর অতীনের দিকে তাকিয়ে বলল, "সারা সপ্তাহের পরিশ্রমের পর ছুটির দিন ইনি ঘুমিয়ে কাটান। তখন যদি ঘুম ভাঙানো হয় তা হলে..."

"বুঝতে পারছি," হেসে বলল অতীন।

"আপনারা গল্প করুন। আমি চা আনব না কফি?"

"চা-বাগানে এসে চা খাওয়াই তো উচিত," অতীন বলল।

শিবানী ভেতরে চলে গেলে কিশোর বলল, "তোরা যে সেই গেলি আর এইমুখো হলি না। একদম ভুলে গেলি?"

মাথা নাড়ল অতীন, "না। ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত নয়। তীব্র স্রোতে গা ভাসাতে আর পেছন দিকে তাকানোর অবকাশ থাকত না। আমি এতকাল দিল্লিতে ছিলাম। বাকিদের সঙ্গে কি তোর যোগাযোগ আছে?"

মাথা নাড়ল কিশোর, "না। তবে এক জনের কথা শুনলে তুই অবাক হয়ে যাবি।"

"কীরকম?" কৌতূহলী চোখে তাকাল অতীন।

"তুই নিশ্চয়ই কার্তিককে ভুলে যাসনি। ওর বাবার পয়সার অভাবে সেই ছেলে, পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে ও-ও এক জন ছিল। মনে পড়েছে ওকে?"

"নিশ্চয়ই। আমরা ওর মুদির দোকানে গিয়ে একটা সিগারেট ভাগাভাগি করে খেতাম। ওকে মনে থাকবে না! কিন্তু অবাক হব বলছিস কেন?" এয়ারপোর্টে দেখা লোকটি যে কার্তিক, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয় না থাকলেও, সেটা কী করে সম্ভব হল জানার জন্যে উদগ্রীব হল অতীন।

কিশোর বলল, "সেই কার্তিককে দেখলে তুই চিনতে পারবি না।"

"কীরকম?"

"কার্তিক এখন এই জেলার কিং মেকার। রুলিং পার্টির নর্থ বেঙ্গলের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস?" গলার স্বর নীচে নামল কিশোরের।

"বুঝিয়ে বল," অতীন বলল।

"যে-কোনও শ্রমিক আন্দোলনে, মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় কার্তিক না বসলে সিদ্ধান্ত ফাইনাল হত না। কার্তিক এসে ফিনিশিং টাচ দিত। বুঝতেই পারছিস ও কতটা পাওয়ারফুল নেতা," বড় চোখে তাকাল কিশোর।

"শ্রমিক নেতা?"

"না না। কার্তিক এখন পার্টির অত্যন্ত ক্ষমতাশালী সম্পাদক।"

"তোর সঙ্গে কথা হয়?"
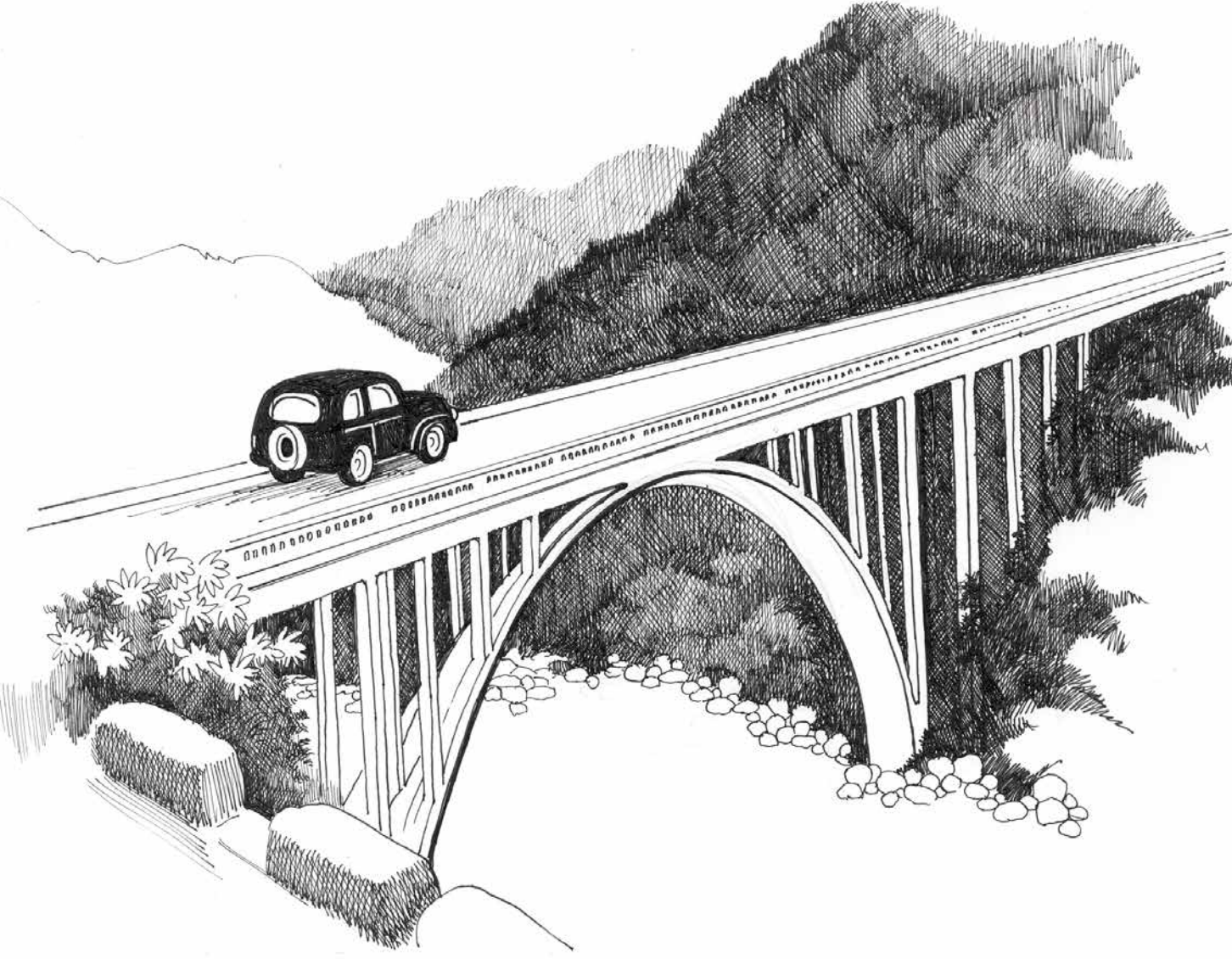
“নাঃ,” বলে একটু চুপ করে থেকে কিশোর বলল, “তুই জানিস, যে-কোম্পানিতে আমি চাকরি করি, তা এককালে ব্রিটিশদের ছিল। ব্রিটিশদের কাছ থেকে ভারতীয়রা কোম্পানি কিনে নিলেও সেই একই রাস্তায় হাঁটছে। কোড অফ কন্ডাক্টে বলা আছে যে, কোনও কর্মচারী তার চেয়ে নিচু স্টেটাসের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবে না। আমি যখন চাকরিতে ঢুকলাম তখন কার্তিক একটা সামান্য মুদির দোকানের কর্মচারী। তার সঙ্গে মেলামেশা করলে আমার চাকরি চলে যাবে। এককালের খেলার সঙ্গী হলেও আমি কার্তিকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারিনি। সেটা নিশ্চয়ই ওর খারাপ লেগেছিল। অনেক বড় নেতা হয়ে যাওয়ার পর আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে সে।”

“বুঝলাম।”

চা নিয়ে এল শিবানী, সঙ্গে একটি কাজের মেয়ে, পরিবেশন করে সে চলে যাওয়ার পরে মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, “আপনার ছেলেমেয়ের কথা বলুন।”

“আমার একটি মেয়ে। এখন হায়দরাবাদে চাকরি করে,” অতীন চায়ের কাপ নিল।

“নাতি-নাতনি?”

“নাঃ। নেই। আসলে ওর বিয়েটা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ওর মা অনেক বলেছে আবার বিয়ে করতে, ও জবাব দেয়নি। আমরা আর চাপ দিচ্ছি না। তোদের কথা?” কিশোরের দিকে তাকাল অতীন।

কিশোর বলল, “এক ছেলে। পড়াশোনায় ভাল ছিল, ওকে আর চা-বাগানে চাকরি করতে হয়নি। বিসিএস করে সে শহরে পোস্টিং পেয়েছে,” কিশোর হেসে স্ত্রীর দিকে তাকাল।

শিবানী বলল, “আপনি ওর বাল্যবন্ধু। আপনাকে বলতে বাধা নেই,

ছেলে এর মধ্যেই নিজের স্ত্রী নির্বাচন করে রেখেছে।”

“বাঃ, খুব ভাল কথা। ওরা যা করলে ভাল থাকবে তাই তো করতে দেওয়া উচিত,” চা শেষ করল অতীন। কাপ রেখে দিয়ে বলল, “দীপু বা খোকনের কথা কিছু জানিস?”

কিশোর মাথা নাড়ল, “না রে। তবে...” একটু থেমে সামান্য ভাবল সে, “মাঝে একটা খারাপ খবর শুনেছিলাম খোকনকে নিয়ে। ও নাকি অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছে।”

“সে কী?” সোজা হয়ে বসল অতীন।

“হ্যাঁ। আমার শোনা কথা। সঠিক বলতে পারব না। তবে খারাপ খবর আকাশে এমনি ওড়ে না। কিছুটা সত্যি থাকে,” কথা শেষ করেই কান খাড়া করল কিশোর। বাইরে একটা গাড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। একটু পরেই দরজায় একটা লোক এসে নমস্কার জানিয়ে বলল, “বড়বাবু আছেন?”

কিশোর উঠে দাঁড়াল, “হ্যাঁ, কী ব্যাপার?”

“আমাকে দাদা পাঠাল। অতীনবাবু কি আপনার বাড়িতে এসেছেন?”

অতীনের দিকে তাকাল কিশোর। তার পর জিজ্ঞেস করল, “কেন বলুন তো?”

“দাদা বললেন, যদি সময় থাকে তা হলে অতীনবাবু যেন দেখা করে যান। দাদা সারা দিন পার্টির অফিসে থাকবেন। নমস্কার,” লোকটি নীচে নেমে গাড়িতে উঠে বসল।

গাড়ি বেরিয়ে গেলে কিশোর অবাক হয়ে বলল, “তুই আমার বাড়িতে এসেছিস তা কার্তিক জানল কী করে?”

“দাদা?”

“এখানে এখন এক জনই দাদা। আমাদের সে-ই কার্তিক। তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?”

অতীন এয়ারপোর্টের ঘটনাটা জানাল, কিন্তু গতকাল জলপাইগুড়িতে গাড়ি থেকে নামার পর তার সঙ্গে কার্তিক বা তার ভাইদের যোগাযোগ হয়নি। সে আজ চা-বাগানে এসেছে, কিশোরের বাড়িতে বসে কথা বলছে, এটা কার্তিক জানল কী করে? কিশোর চেয়ারে ফিরে গিয়ে বলল, “বুঝতেই পারছিস, কতটা পাওয়ারফুল নেতা হয়ে গেছে কার্তিক। তুই যাওয়ার সময় একবার দেখা করে যাস।”

“কেন? তোদের নেতা আদেশ করলেই আমাকে যেতে হবে?” হাসল অতীন।

“না না,” মাথা নাড়লেন শিবানী, “আপনি ওই ভাবে ভাবছেন কেন? এখন আপনাদের ওই পুরনো বন্ধু অবশ্যই খুব ব্যস্ত মানুষ। তবু আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন, কাল যেচে আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়েছেন, সেটা ভাবুন।”

মাথা নাড়ল অতীন। তার পর কথার মোড় ঘুরল, “নতুন ডাক্তারবাবু অবসর নিয়ে এই বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তাঁর মেয়ের বিয়ের পর জামাই দুর্ঘটনায় মারা যায়। তবে মেয়েটি আবার মূল জীবনে ফিরে গিয়েছে, দ্বিতীয় বিয়ের পর আর বেশিবার এই চা-বাগানে তাঁরা যাওয়া-আসা করেননি। মানুষ ভুলে গিয়েছে তাঁদের। চা-বাগানের ম্যানেজাররাও বদলে গিয়েছেন। অনেক নতুন মানুষ এখন এখানে।

ঘড়ি দেখল অতীন। বলল, “আজ আমি উঠছি রে।”

শিবানী বললেন, “একটা কথা বলতে পারি?”

“নিশ্চয়ই,” হাসল অতীন।

“আজকের রাতটা এখানেই থেকে যান না। আপনি নিশ্চয়ই এমন একটা মাছ দীর্ঘকাল খাননি, তা আপনাকে আজ খাওয়াব,” শিবানী বললেন।

“হ্যাঁ রে, আজ তুই থেকেই যা,” কিশোর বলল।

“না রে। কিন্তু কোন মাছের কথা বলছিলেন?”

“এমন একটা মাছ যা দিল্লিতে দূরের কথা, কলকাতাতেও পাবেন না।”

“বাঃ। শুনে কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে যে। কী মাছ?”

“বোরলি,” হেসে বললেন শিবানী।

মনে পড়ে গেল। দেড় ইঞ্চি লম্বা ওই মাছ অতীনের বাবার খুব প্রিয় ছিল। অতীন চল্লিশ বছর আগে খেয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, খেলে খারাপ লাগত না।

সে হেসে বলল, “না ম্যাডাম। এ যাত্রায় হল না। পরের বার হবে।

কিশোর বলল, “এই চা-বাগানের চাকরিতে আমি আর দেড় বছর পরে থাকব না।”

“না না। তার আগেই চলে আসব।”

বারান্দায় এসে দাঁড়াল ওরা। এখন ছায়া নেমেছে পৃথিবীতে। তবে সন্ধে হতে অনেক দেরি। সামনের মাঠ জনশূন্য। অতীন জিজ্ঞেস করল, “এখনকার বাচ্চারা মাঠে খেলাধুলো করে না? কাউকে দেখছি না!”

“সবাই বড় হয়ে গেছে। এখন বাগানের কারও বাড়িতে বাচ্চা নেই,” অন্যরকম গলায় বলল কিশোর।

ওই শূন্য মাঠের দিকে তাকিয়ে সেই মেয়েটির কথা মনে এল তার। কী যেন নাম, কী যেন নাম? অতীন জিজ্ঞেস করল, “সেই মেয়েটা বোধহয় আছে। সেই নামে! সেই যে মেয়েটা, যার ভ্রু-র ওপর আব বেরোত...”

“ও হো! তুই উনকির কথা বলছিস,” কিশোর বলল।

“উনকি? দিব্যি আছে,” হেসে বললেন শিবানী।

“সেই আব এখনও আছে?” কৌতূহলী হল অতীন।

“উনকিকে কি দেখতে চান? ডেকে পাঠাব?” শিবানী জিজ্ঞেস করলেন।

“খুব ভাল লাগবে,” হেসে বলল অতীন।

ভেতরে চলে গিয়ে শিবানী কাজের মেয়েকে নদীর চা-বাগানে পাঠালেন উনকিকে ডেকে নিয়ে আসতে।

অতীন বলল, “আজ যখন বাজারের রাস্তায় গাড়িতে ঘুরছিলাম, তখন এতকাল পরে মাস্টারমশাইয়ের কথা মনে এল। ওইরকম মানুষ আজকাল খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুযোগ পেলে সবাই...” বলে থেমে গেল অতীন।

“যাই বলিস, মানুষের উপকার করে কী লাভ হল মাস্টারমশাইয়ের? উনি মারা যাওয়ার পরে ওঁর স্ত্রীকে তো লোকের দয়ার ওপর নির্ভর করে বাঁচতে হয়েছিল,” কিশোরের মুখ বেশ গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল কথাগুলো বলার সময়।

সেই অল্প বয়সে কলেজে পড়ার সময় একটা কথা শিখেছিল অতীন। কোনও কথা অথবা মন ভারী হয়ে যাওয়া খবর শুনলে হালকা গলায় বলে উঠত, “এই তো জীবন, কালীদা!” ভার লঘু করার জন্য যে বলা, তা সবাই জানত। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে ওই তিনটে শব্দের কথা মনে এলেও মুখে উচ্চারণ করতে পারল না অতীন।

শিবানী ঘরে এলেন, “লোক পাঠিয়েছি ওকে ধরে আনতে।”

কিশোর বলল, “এখানে আছে কি না দ্যাখো। এর মধ্যে ও কি এদিকে এসেছিল, খেয়াল নেই। আমি তো লক্ষ করি না। তবে বয়স হয়েছে, আগের মতো হাঁটাহাঁটি করতে বোধহয় পারে না।”

“তা হলে আজ আপনি থাকবেন না?”

“না, আজ নয়। তবে খুব শিগগির আসব। এখানে আসার পর আমার ছেলেবেলার সেই চিহ্নগুলো যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,” অতীন বলল।

“আর-এক কাপ চা হবে নাকি?” কিশোর জিজ্ঞেস করল।

“না রে। আজকাল দিনে এক কাপের বেশি খাই না।”

“সে কী রে। কেন?”

“ওই আর কী! অভ্যেস হয়ে গেছে।”

“রাতের দিকে ওসব নিশ্চয়ই চলে?”

“বহুকাল আগে সহকর্মীদের পাল্লায় পড়ে একটু-আধটু হত, এখন পেটের অসুখ হওয়ার পর থেকে একদম বন্ধ,” হাসল অতীন।

এই সময় ভেতরের ঘর থেকে কাজের মেয়ের গলা ভেসে এল, “বলে এলাম।”

“কী বলল? আসছে?” গলা তুলে জিজ্ঞেস করলেন শিবানী।

“একটু পরে আসবে বলল,” ভেতরের ঘর থেকে কাজের মেয়ে বলল।

কিশোর হেসে বলল, "এখন দেখলে ওকে চিনতে পারবে বলে মনে হয় না।"

"সেই আবটা আর নেই?" জিজ্ঞেস করল অতীন।

"আশ্চর্য ব্যাপার, কলকাতা থেকে অপারেশন করিয়ে আসার পর নাকি সব ঠিক ছিল, তার পর একটু একটু করে সামান্য উঁচু হয়ে উঠল। তার পর সেই যে থেমে গিয়েছে আর বড় হয়নি। আগের মতো চোখ ঢেকে যায়নি," হাসিমুখে কথাগুলো বলল কিশোর।

"যাক, ভাল কথা। নিশ্চয়ই আবার বিয়ে করে ভাল আছে?"

শিবানী মাথা নাড়লেন, "না, ও আর বিয়ে করেনি।"

"সে কী! কেন?" অতীন অবাক হল।

"এই প্রশ্নটা ও এলে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন," শিবানী বললেন। কথা শেষ হওয়ামাত্র বাড়ির সামনে থেকে গলা ভেসে এল, "দিদি, আমাকে কি ডেকেছিস?"

চাপা গলায় শিবানী বললেন, "এসে গিয়েছে," তার পর গলা তুলে ডাকলেন, "হ্যাঁ রে, আয়। ভেতরে আয়। দরজা তো খোলাই আছে।"

অতীন খোলা দরজার দিকে তাকাল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেখানে যে প্রবীণা এসে দাঁড়াল, তার পরনে সেই একই পোশাক, যা সে ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছে। পিঠে একটা ব্যাগ বাঁধা। অল্প বয়সে সামান্য ব্যাগের বদলে একটি শিশু বাঁধা থাকত।

ঘরের ভেতর চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "বল, ডেকেছিস কেন?"

"তুই এই বাবুকে আগে কখনও দেখেছিস?" শিবানী জিজ্ঞেস করলেন।

অতীনের দিকে না তাকিয়ে মাথা নাড়ল উনকি, "আমি চিনব না কেন? ও তো গুদামবাবুর ছেলে অতীন।"

অতীন হতভম্ব। প্রায় চল্লিশ বছর আগে মাঠে খেলতে দেখেছিল যে, তার অতীনকে চিনে রাখার কোনও কারণ তো নেই। হকচকিয়ে বলল সে, "আমাকে তুমি এত পরে একবার দেখে কী করে চিনতে পারলে?"

হেসে মাথা নাড়ল উনকি। জবাব না দিয়ে শিবানীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আরে! কী কাজ করতে হবে তাই বল না।"

"তুই এই ভদ্রলোককে কত দিন পরে দেখলি তা জানিস?" শিবানী জিজ্ঞেস করলেন।

"না। কত দিন?"

অতীন হেসে বলল, "চল্লিশ বছর।"

ঠোঁট ওল্টাল উনকি, "কী জানি।"

"তুই ওই মোড়াতে বসে পড়, চা খেয়ে যা," শিবানী বললেন।

"আরে, চা খেতে ডাকলি নাকি? কোনও দিন তো ডাকিস না।"

"না রে। এই বাবু তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল, তাই..."

"বাবু? ও বাবু কেন হবে? ও তো অতীন," উনকি হাসল।

হতভম্ব ভাবটা কিছুতেই কাটছিল না অতীনের। কুলি লাইনের একটি বালিকা পিঠে শিশুকে বেঁধে নিঃশব্দে এসে তাদের খেলা দেখত, ওভাবেই চলে যেত। মেয়েটা যখন তাদের মতো বড় হতে লাগল, তখনও পিঠে হয় বাচ্চা নয় কোনও বোঝা বাঁধা থাকত। কোনও দিন তাদের কারও সঙ্গে ওর কথা হয়নি। ওরা কেউ যেচে কথা বলেনি। সেই যে মাস্টারমশাইয়ের নেতৃত্বে ওর চোখের ওপরে বড় হওয়া আবটাকে অপারেশন করে বাদ দেওয়ার জন্য খরচের টাকা চাঁদা করে তুলেছিল ওরা, তখনও কথা বলার দরকার মনে হয়নি। একটা ভাল কাজ করতে হবে বলে সেই সময় উৎসাহিত হয়েছিল। এতকাল সেই মেয়েটাকে ভুলেই থেকেছিল সে। এমনটা তো অনেকের সঙ্গেই হয়। সে বলল, "আচ্ছা, আমার বন্ধুদের, মানে যাদের সঙ্গে খেলাধুলো করতাম, তাদের কথা তোমার মনে আছে?"

চোখ বন্ধ করে একটু ভাবল উনকি। তার পর চোখ খুলে একগাল হেসে বলল, "ওই তো, বড়বাবু আছে। ওকে তো আমার মনে থাকবেই।"

কিশোর বলল, "উনকি, অতীন জিজ্ঞেস করছে আমাদের অন্য বন্ধুদের কথা মনে আছে কি না?"

সঙ্গে সঙ্গে দু'পাশে দু'বার মাথা ঘোরাল উনকি। তার পর উঠে দাঁড়াল সে, "আমি যাই। আমি চা খাব না," বলে দ্রুতপায়ে ঘরের বাইরে চলে গেল।

অবাক হয়ে তাকিয়েছিল অতীন। শিবানী বললেন, "অদ্ভুত, না!"

অতীন তাকাল কিশোরের দিকে, "চলি।"

"দিল্লি যাবি কবে?"

"কাল। এখন জলপাইগুড়িতে গিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে। জানি না, দেখা পাব কি না," কিশোরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিয়ে নেমে গাড়িতে উঠে চলে গেল অতীন। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, "জলপাইগুড়িতে, না দাদার অফিসে যাব?"

খেয়াল হল। কার্তিক নিজে এসে তার সঙ্গে দেখা করেনি, কিন্তু সে যাতে করতে যায় তার অনুরোধ করেছে।

কৌতূহল হল। বলল, "চলো, ওর অফিসে যাই।"

গাড়ি ঘোরাল ড্রাইভার। চৌমাথার কাছেই পার্টি অফিসের সামনে লোকজনের ভিড়। গাড়ি থেকে নামতেই এক জন ছুটে এল, "আপনি অতীনদা?"

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হ্যাঁ বলল অতীন।

"আসুন আসুন," বেশ সমাদর করে ভেতরে নিয়ে গেল যুবক। বাইরের ঘরের ভেতর দিয়ে ভেতরের একটি খালি ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। বলল, "প্লিজ়, বসুন। দাদা এখনই আসবেন। বলুন কী নেবেন? চা না কফি?"

"না না। আমি একটু আগে চা খেয়েছি।"

"তা হলে একটু রেস্ট নিন। দাদা এসে পড়বেন।"

ছেলেটি বেরিয়ে গেলে ঘরে একা হয়ে গেল অতীন। সে মুখ ঘুরিয়ে দেখল, বেশ সুন্দর সাজানো ঘর। এই ঘরে বোধহয় কার্তিকের অনুমোদন ছাড়া বাইরের লোকদের ঢুকতে দেওয়া হয় না।

একেই বলে কপাল। সেই কার্তিক আজ উত্তরবঙ্গের এক অংশে শুধু দাদা বলে পরিচিত হয়ে গিয়েছে। এই ঘরে বসেই বোঝা যায় ওর ক্ষমতা কতখানি। তারা যখন স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছে, তখনও কার্তিক মুদিগিরি করেছে। ওর এই অকল্পনীয় উত্থানের কথা গল্প-উপন্যাসকেও হার মানাবে। কার্তিকের বাবা, যিনি বাস ভাড়া দিতে না পারায় ওকে পড়া ছাড়তে হয়েছিল, তিনি নিশ্চয়ই আজ বেঁচে নেই। কার্তিক কি বিবাহিত? তাও সে জানে না। কার্তিক যেন আচমকা অন্য গ্রহের মানুষ হয়ে গিয়েছে।

ঘড়ি দেখল অতীন। আধঘণ্টা হয়ে গিয়েছে। সে যখন ধৈর্যের শেষ পরীক্ষা দিচ্ছে, তখন সেই ছেলেটি যে তাকে এই ঘরে এনে বসিয়েছিল, ঘরে ঢুকে বলল, "দাদা খবর পাঠিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সভা শেষ হওয়ামাত্র উনি চলে আসবেন। আপনি যেন কিছু মনে না করেন। এবারে কফি দিতে বলি?"

"না না," উঠে দাঁড়াল অতীন, "আমার একটু জরুরি কাজ আছে। আমি তো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। পরে না হয় আর-একদিন আসা যাবে।"

"সে কী! আপনি চলে যাবেন? দাদা আসবেনই, একটু হয়তো দেরি হচ্ছে।"

"হতেই পারে। আপনার দাদাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন ভাই," দরজার দিকে পা বাড়াল অতীন। ছেলেটি মিনমিনে গলায় বলল, "দাদা আমার ওপর খুব রেগে যাবেন।"

অতীন কিছু বলল না। ধীর পায়ে বাইরে এসে দেখল, দর্শনার্থীদের ভিড় আরও বেড়ে গিয়েছে। সে কাছে যেতেই ড্রাইভার দরজা খুলে দিল। ছেলেটি বেশ হতাশ মুখে দাঁড়িয়ে রইল। চৌমাথা ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে যেতেই সেই চায়ের দোকানটা চোখে পড়ল অতীনের। তাড়াতাড়ি গাড়িটাকে থামতে বলে দোকানটাকে ভাল করে দেখল সে।

চল্লিশ বছর মোটেই কম সময় নয়। যে-ছেলেটা পায়ে মেপে মেপে এই এত দূর এসে এককাপ চায়ের জন্য বসে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তার বয়স এখন ষাটের আশপাশে। যে ভয়ঙ্কর আর্থিক দুরবস্থায় ওর

জীবন কেটেছে, তাতে এতটা সময় বেঁচে থাকা অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

অতীন দোকানে ঢুকল। এখন দিন শেষ হয়ে যাওয়ায় চায়ের খরিদ্দার বেড়ে গেছে। কাউন্টারের ওপাশে বসে এক প্রৌঢ় জিজ্ঞেস করল, "চা দেব?"

"না। একটা খবর জানতে চাইছিলাম।"

"বেশ তো, বলুন।"

"আপনি কত দিন এই দোকানের সঙ্গে জড়িত?"

"আমার বাবা চালাতেন। আমি বড় হয়ে বসছি।"

"তা হলে আপনি কি একটি শ্রমিক পরিবারের ছেলেকে দেখেছেন যে, দেখতে পেত না, এই দোকানে এসে বসে থাকত যদি একটু চা খেতে পায়?"

হেসে মাথা নাড়ল প্রৌঢ়, "হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে আছে। রোজ আসত। বাবা চা খেতে দিত। আপনি ওকে চিনতেন?"

"হ্যাঁ। আমি তখন ছোট ছিলাম।"

"ও। খুব দুঃখের কথা, বেচারা আমাদের দোকান থেকে চা খেয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় বাসের ধাক্কায় পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছে।"

"ও আচ্ছা!" নমস্কার জানিয়ে অতীন ফিরে এল গাড়িতে।

এখন বিকেল। রোদ্দুর নিভে গিয়েছে, কিন্তু রোদের স্মৃতি মাখামাখি হয়ে আছে আকাশে, যা এখনও চুঁইয়ে নামছে গাছেদের শরীরে। গাড়ি চৌমাথা পেরিয়ে সাঁকো ছাড়িয়ে চা-বাগানের সামনে হাইওয়েতে আসামাত্র অতীনের চোখে পড়ল।

পিঠে শিশু অথবা শিশুর মতো কিছু বেঁধে নিয়ে উনকি ধীরে মাঠ পেরিয়ে হাইওয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ঝটপট ড্রাইভারকে গাড়ি একপাশে দাঁড় করাতে বলল সে। গাড়ি দাঁড়ালে অতীন লক্ষ করতে লাগল।

বয়স যে হয়েছে তা হাঁটার গতি দেখে বোঝা যায়। ঈষৎ ঝুঁকে হাঁটছে উনকি, খুব ধীরে ধীরে। শেষ পর্যন্ত হাইওয়ে থেকে নেমে আবার মাঠে চলে গেল সে। এখন মাঠে কোনও শিশু খেলছে না। পাখিদের চিৎকার ছাড়া অন্য কোনও শব্দ নেই। কোয়ার্টার্সগুলোর জানলা-দরজা বন্ধ। বালিকাবেলা, কৈশোর, যৌবন পার হয়ে এক জন রমণী প্রৌঢ়ত্বের শেষে এসে একই ভাবে হেঁটে চলেছে। এই যাত্রাপথে তার কোনও সঙ্গী নেই। নাই-বা থাকল!

অঙ্কন: অমিতাভ চন্দ্র

উদ্দাম রজনীর কাব্য

সু বো ধ স র কা র
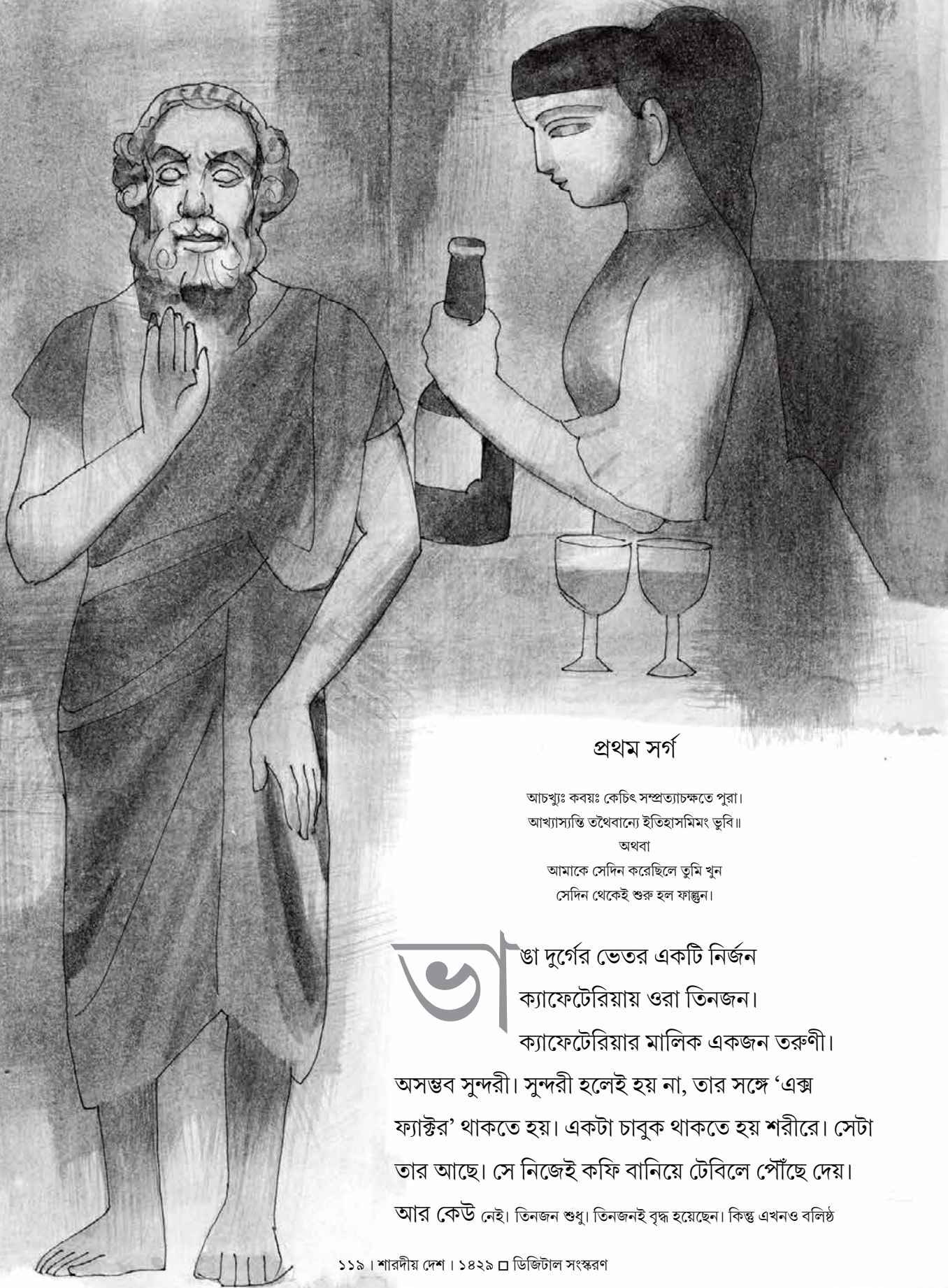
প্রথম সর্গ

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পুরা।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি॥
অথবা
আমাকে সেদিন করেছিলে তুমি খুন
সেদিন থেকেই শুরু হল ফাল্গুন।

ভাঙা দুর্গের ভেতর একটি নির্জন ক্যাফেটেরিয়ায় ওরা তিনজন। ক্যাফেটেরিয়ার মালিক একজন তরুণী। অসম্ভব সুন্দরী। সুন্দরী হলেই হয় না, তার সঙ্গে 'এক্স ফ্যাক্টর' থাকতে হয়। একটা চাবুক থাকতে হয় শরীরে। সেটা তার আছে। সে নিজেই কফি বানিয়ে টেবিলে পৌঁছে দেয়। আর কেউ নেই। তিনজন শুধু। তিনজনই বৃদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু এখনও বলিষ্ঠ

চেহারা। তাঁদের একজনের নাম বাল্মীকি, একজন বেদব্যাস, একজন হোমার। তাঁদের তিনজনই মেয়েটিকে চাইছেন। ব্যাস হোমারকে বললেন, তোমার এবং আমার নায়িকা দু'জনই আছে কফি মালিকের শরীরে। তাই শুনে বাল্মীকি বললেন, হাই ওল্ডিজ়, আমাকে বাদ দিলে কেন? আমার নায়িকাও আছে। তিনজন যখন তর্ক শুরু করে দিলেন, তখন দেখা গেল ক্যাফেটেরিয়ার মালিক একটা দূরের টেবিলে বসে ল্যাপটপে মগ্ন।

তার টেবিলে দেখা যাচ্ছে তিনটে বই— *ইলিয়াড*, *মহাভারত* ও *রামায়ণ*। তুলনামূলক মহাকাব্য নিয়ে সে পেপার তৈরি করছে। সে দিনেরবেলা বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়, বিকেল পাঁচটা থেকে রাত দশটা কফিশপ চালায়। বেদব্যাস এবং হোমার তর্ক শুরু করলেন মেয়েটিকে নিয়ে। হোমার বললেন, কী অপূর্ব সুন্দরী, কিন্তু মেয়েটি এক বছর আগে তার প্রেমিককে খুন করেছে। বাল্মীকি বললেন, ভালবাসলে খুন হতে হয়। তাই সে খুন হয়েছে। বেদব্যাস বললেন—

অরুণাংশে, ভগ্নাংশে, বস্ত্রাংশে স্বাহা রজত
কত দীর্ণ, কত শীর্ণ, কত নষ্ট, ওঁ বসত।

ভূমিপুত্র, যশকাঙ্ক্ষী, দায়ী অন্ন, জাগো বিমল
আমি দম্ভ, আমি দূর্বা, আমি উচ্চ, অসমতল
আমি প্রণয়, আমি প্রলয়, আমি অতীত, ভাঙা নিলয়
আমি গরম, আমি গহন, উদ্ভাবন মহা সময়
নারী গোলক, নারী দ্যোতক, নারী গমন, ঘৃত সমান
আমি কী চাই হতে পাগল, দৌবারিক, খোলো দোকান।

খোলো দোকান খোলো দোকান লজ্জা নয়
আমি দোকান তুমি দোকান কবি দোকান পৃথিবীময়।

*

বিকেল পাঁচটা থেকে দশটা
সব সুরে বাজে মূর্ছনা কি?
সারাদিন সুর ওঠে বাতাসে
মৃত্যুর পরে আসে জোনাকি।

পাঁচটায় খোলে দ্বার এখানে
ভেসে আসে বকুলের গন্ধ
যে ফুল আমার দেশে ফোটে না
বাতাস বহে না মৃদুমন্দ।

যে ফুল আমার দেশে দেখিনি
গন্ধকে বিশ্বাস করি না
সে ফুল দেখতে চাই কেন যে
চাঁদকেও হাতে পেলে ধরি না।

এত লোভ মানুষের নাভিতে
এখনও মানুষ যায় যুদ্ধে
স্নান করে বন্ধুর রক্তে
আশা নেই শরণং বুদ্ধে।

পাথরে আটকে আছে মুক্তি
মানুষের মন আজও ভিন্ন
মুখে বলে আছি এক সঙ্গে
দল করে, তবু বিচ্ছিন্ন।

সেদিন মানুষ ছিল চক্রী
রাতে হত বড় ষড়যন্ত্র
দিনে হত খুব বড় দয়ালু
লোককে দেখাত প্রজাতন্ত্র।

বিকেল পাঁচটা থেকে দশটা
আমাদের লোভ ওঠে চরমে
মেয়েটিকে দেখে আশ মেটে না
দেখে দেখে মরে যাই মরমে।

আমাদের মন বড় দমকা
এই আছে এই নেই সঙ্গে
জঙ্গম থেকে আজ স্থাবরে
হাহাকার শুনি বুড়ো অঙ্গে।

বুড়ো তবু সব আছে তুঙ্গে
এখনও লোহার মতো শক্ত
এখনও লাভার মতো কামনা
গরম হলেই ছোটে রক্ত।

মাতাল না হলে কেউ লেখে না
এত এত বড় মহাকাব্য
লিখেছি কারণ যেন তোমাকে
শুনতে না হয় অশ্রাব্য।

লিখতে লিখতে উদ্‌ভ্রান্ত
লিখতে লিখতে সূর্যাস্ত
লিখতে লিখতে অবসন্ন
না লেখা কবিতা মনে আসত।

শরীরে যখন বেজে উঠত
তখনই লেখার তেজ বাড়ত
মধ্য গগনে উঠে লিখেছি
আমাকে গগন ভালবাসত।

চিরদিন ভাল লেখা যায় না
সূর্য থাকে না মাঝগগনে
আমিও পারিনি নেমে এসেছি
ভ্রষ্ট হয়েছি মহা লগনে।

আমরা এখনও চাই অগ্নি
শিরায় শিরায় ওঠে দাহ্য
ও মেয়ে তোমার এত লাস্য
আমাকে কোরো না অগ্রাহ্য।

তোমার সামনে এসে বসেছি
একবার দাও হাত ধরতে
একবার নিতে দাও স্পর্শ
আমার আয়ুর পরিবর্তে।

একবার যদি পাই স্পর্শ
ভুলে যাব আমি তৃষ্ণার্ত
পৃথিবী তোমাকে ছাড়া শূন্য
কবি যা পারেনি তাই পারত।

তরুণীকে টেনে নেয় বৃদ্ধ
তরুণীর ঠোঁটে ঠোঁট তীব্র
শরীরের খনিজ পদার্থ
ছুটে চলে হাতে পায়ে ক্ষিপ্র।

অন্য দু'জন যেন কেউ না
দু'জনকে কবি বলে ধরি না
মেয়েটির স্তনে মুখ নামিয়ে
চিৎকার করি 'আমি কবি না'।

আমরা মানুষ হতে চাইছি
হতে পারছি না তবু হচ্ছি
হতে চাই মানবের পুত্র
বারবার তবু ভুল করছি।

এবারের ভুল হবে পুণ্য
এবারের ভুল হবে গর্ব
আমাকে দেখুক ওরা দু'জনে
বয়স করেছি কত খর্ব।

*

এবার তিনজন আমরা তিনজন লিখতে চাই
এবার তিনজন আমরা তিনজন শিখতে চাই
এবার তিনজন আমরা তিনজন ভিক্ষে চাই

আফ্রোদিতে ছিলে হেলেন হয়ে এলে, না দ্রৌপদী?
অন্ধকার হয়ে এল যে চারদিক, অন্ধকারে নদী
যেমন বয়ে চলে যেমন চলে যায় দিনের আলো

বলতে দ্বিধা নেই আমি যে নিয়তিকে বেসেছি ভাল।
ভগ্ন অংশকে দু'হাতে জড়ো করে বাঁচতে চাই।

এবার তিনজন আমরা তিনজন লিখতে চাই
এবার তিনজন আমরা তিনজন ভিক্ষে চাই।

*

এবার আমি চাই একটা দুটো কথা বলুক বাল্মীকি
দেখতে হয় তাকে দশ দিগন্তের দশ দিক-ই।

কী আর বলি আমি বলার কথা সব
হয়েছে ফাল্গুনে বলা
এই যে মেয়েটির নয়ন ছেড়ে আমি
কোথাও যেতে পারছি না
আমার মন থেকে স্পর্ধা চলে গেছে
আমার চোখ থেকে ঘৃণা।

এখান থেকে আমি যেখানে খুশি যাব
কিন্তু যেতে পারছি না।
আমার কী যে হল ধৈর্য চলে গেল
আমার কিছু থাকল না
সূর্য নেমে গেল আমাকে না জানিয়ে
ইচ্ছে তবু মরল না।

এখান থেকে আমি যেখানে খুশি যাব
কিন্তু যেতে পারছি না
তোমরা দুই কবি আমাকে যেতে দাও
আমার কাজ হল পথে পথে
কবি কোথায় যাবে কবি কোথায় খাবে
কবি কি যায় কোনও রাজরথে?

এখান থেকে আমি যেখানে খুশি যাব
কিন্তু যেতে পারছি না
অরণ্যের বাঁশি নাকি এ মেয়েটির
শরীরে বেজে যায় বীণা।

ক্যাফেটেরিয়া হবে বন্ধ দশটায়
কারওর হাতে নেই অনন্ত
আমার এক হাতে তোমার মৃগনাভি
অন্য হাতে তুমি জ্বলন্ত।

ভীষণ সুন্দর তোমার চোখদুটো
তোমার স্তনে হাত দিতে পারি?
এত যে সুন্দর কী করে হল দোষ
তোমার আজও নেই কোনও বাড়ি।

তোমার দেশ নেই তোমার ভাষা নেই
নেই তোমার কোনও উচ্চাশা
তোমাকে দিতে পারি উজাড় করে ঢেলে
আমার কাছে আছে ভালবাসা।

তোমাকে দিতে পারি জাহ্নবীর তীরে
একটি সুন্দর গৃহ
বাড়ির দরজায় এবং গাছে গাছে
আমার নাম লিখে নিয়ো।

আমার নাম লিখে চতুর্দিকে দেখো
চলছে কত লীলা অবান্তর
তৃণাঞ্জন আমি, আমার ভালবাসা
যুগের থেকে বেশি যুগান্তর।

*

আমার শরীরে উচ্ছ্বাস আনে সন্ধ্যা
তরঙ্গ থেকে তরঙ্গ যায় পিছিয়ে
হতে পারে আজ আমার কিছুটা মৃত্যু
কী আছে আমার বেঁচে থাকি আমি কী নিয়ে?

সন্ধ্যা নেমেছে আমার যুগল বৃন্তে
শূন্যতা আমি উৎসব করি কী সুখে?
আমি তোমাদের পাশের বাড়ির নিয়তি
সন্ধ্যা নেমেছে আমার গোপন ঝিনুকে।

আমি তোমাদের জন্য দোকান খুলিনি
দোকান খুলেছি নিজেকেই ভালবাসতে
আমি জীবনকে একমুঠো চাল ভেবেছি
সব ধানখেতে সমাধান নয় কাস্তে।

আমার শরীরে উত্থান আনে সন্ধ্যা
আমি তোমাদের মেয়ে নই, আমি রজনী
আমি তো যোজনগন্ধার মতো লাস্য
আমাকে তোমরা কোনওদিন ভালবাসনি।

আমার শরীরে গড়িয়ে নামছে মরিয়া
মরিয়া নামের এক মানবীর গন্ধ
ঘাসজন্মের চিহ্ন আমার কোমরে
খুলেছি দোকান, হবে দশটায় বন্ধ।

তার আগে আমি বন্ধ করতে পারি না
তার পরে আমি খোলাও রাখতে পারি না
এক অনন্তে আমি এ দোকান খুলেছি
দোকানবাড়িটা এখনও আমার বাড়ি না।

তোমরা যেভাবে চাইছ আমাকে দেখতে
সারা পৃথিবীর পুরুষ সেভাবে তাকায়
মহাপুরুষরা আসলে সবাই পুরুষ
নিজের ভেতরে জড়িয়ে রয়েছে লালায়।

আমারও রয়েছে ঘাসজন্মের চিহ্ন
আমার মধ্যে প্রাচীন একটি রজনী
আমার মধ্যে অতি আধুনিক গর্ব
তবু তো পাখির মা-কে আমি বলি সজনী।

যখন যেভাবে তখন সেভাবে তখনই
মানুষ আমাকে পারে না কাঁদাতে যা নিয়ে
তা নিয়ে তোমরা কেন রাগ করো বিকেলে
আমাকে তখন তরঙ্গ যায় কাঁদিয়ে।

মরীয়া নামের একটি তরুণী যেদিন
আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল গগনে
আমাকে ফেরত দিয়েছে মাতাল তরণী
আমাকে সহ্য করেছে তেমন ক'জনে?

কবিকে আমিও বলতে পারিনি সত্য
ধরতে পারেনি আমার গোপন দোষটা
যাকে ভালবাসি কেন তাকে করি হত্যা?
ভ্রষ্ট হলেও কবিরা আসলে দ্রষ্টা।

দ্বিতীয় সর্গ

কী আছে তোমার মধ্যে কী আছে জানি না
তোমার ঝিনুকে বিষ আছে কিনা জানি না
তোমার ঝিনুকে অমৃত কিনা জানি না
তোমার ঝিনুকে গত জন্মের অশ্রু
ভালবাসলাম ভালবাসলাম কী করে
আমি যদি আজ নাই হতে পারি দস্যু?

'Fas est ab hoste doceri'
শত্রুর থেকে নাও শিক্ষা
—ওভিদ, *মেটামরফোসেস*

রাজা জানতে চাইলেন, কী আছে ভালবাসায়? বিদূষক হেসে বললেন, মহারাজ আমি কি যোগ্য? কী উত্তর দিতে পারি আমি? আমি কী আপনার রাজ পরিষেবা পরিত্যাগ করেছি ভালবাসার জন্য? আমি কি রাজতিলক মুছে ছুটে গিয়েছি দ্বীপান্তরে? আমি কী জানি ভালবাসার?

রাজা বললেন, এরা দুই বীর দু'রাত্রি ধরে মল্লযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। থামবার কোনও লক্ষণ দেখছি না। আমি সংবাদ পাঠিয়েছি, তোমরা থামো। থামেনি। আমি ভাবছিলাম বিদূষক, কী সে বস্তু যা ভালবাসার মধ্যে আছে, যার সন্ধান আমি পাইনি কোনওদিন?

বিদূষক বললেন, মহারাজ, পাশের দেশ থেকে রানি নিয়ে এলেন। বিবাহ করলেন। অঙ্গরাজ্য পেলেন। শত্রুজয় হল। কোল আলো করে পুত্র এল। পুত্র বড় হল। তার অভিষেকের জন্য আপনি এখন ব্যস্ত। আপনি একজন সৎ, দক্ষ প্রশাসক। একে সুন্দরভাবে সংসার করা বলে। আপনি সফল রাজা। কিন্তু আপনি প্রেমিক নন। সফল রাজা কখনও প্রেমিক হতে পারে না। আপনার ভেতর কোনও বিষণ্ণতা নেই।

রাজা বললেন। কী করে অনুমান করা গেল?

বিদূষক বললেন, আপনি যদি আজ রাজ্য ছেড়ে, পুত্রের অভিষেক ছেড়ে, রাজবস্ত্র ছুড়ে ফেলে দিয়ে একটি সাধারণ মেয়ের জন্য পাগল হয়ে অরণ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়ান। রাজসভার বদলে বনের ভেতর পড়ে থাকা জ্যোৎস্নাকে আপনার অনেক বেশি দরকারি মনে হয়, তখন বুঝব আপনি প্রেমিক। আপনার ভেতরে ভালবাসা আছে। ভালবাসার আসল নাম কষ্ট। আপনি কি পৃথিবীতে কষ্ট সহ্য করতে এসেছেন? আপনি এসেছেন রাজ্যজয় করতে। লক্ষ লক্ষ জনগণের হৃদয় জয় করতে। আপনি কি হরিণের হৃদয় জয় করতে এসেছেন? না আপনি একটা প্রজাপতির সঙ্গে কথা বলতে জানেন? আমি দেখেছি যারা প্রেমিক তারা নদীর সঙ্গে কথা বলে। গাছের সঙ্গে কথা বলে। গাছের পাতা মুছিয়ে দেয়।

রাজা বললেন, বিদূষক এ আমি পারব না। আমি গাছের পাতা মুছিয়ে দিতে পারব না।

বিপ্লবে প্রতি-বিপ্লবে আমি আসি
হিংসায় প্রতি-হিংসায় থেকে যাই
কাহিনি কখনও আমাকে করেনি দায়ী
কবিতায় বাঁচি, মরে যাই কবিতায়।

বিপ্লবে আমি, প্রতি-বিপ্লবে মরি
হিংসায় মরি, বেঁচে থাকি হিংসায়
কলঙ্ক ছাড়া ভালবাসা হয় নাকি
কবিতায় মরি, বেঁচে উঠি কবিতায়।

কলঙ্ক নিয়ে যারা আসে গঙ্গায়
গঙ্গা কি কারও কলঙ্ক ধুতে পারে?

ভালবাসা এসে কীর্তিনাশায় ডাকে
নিশি-কলঙ্কে আমাকে ডুবিয়ে মারে।

গঙ্গার বুকে যত কলঙ্ক করো
গঙ্গার গায়ে লাগে না পাপের দাগ
গঙ্গা বক্ষে যতই দাঙ্গা করো
গঙ্গাকে কেউ করতে পারেনি ভাগ।

আমি তো কেউ না, তুচ্ছ অনুলেখক
আমি তাই লিখি যা আমি লিখতে পারি
যা যা লিখে গেছেন হোমার, বাল্মীকিরা
তাঁদের পাড়ায় কিনতে পারিনি বাড়ি।

তাঁদের থালায় পারিনি অন্ন নিতে
তাঁদের পাত্রে করিনি পানীয় পান
স্মরণীয় তাঁরা, তাঁদের প্রণাম করে
আমার মতন গেয়েছি আমার গান।

প্রতিটি গুল্ম যেমন বনৌষধি
প্রতিটি পুরাণ পরা-বাস্তব মায়া
দু'টি মানুষকে পরানো হয়েছে তালা
একটি কবিতা বহু কবিতার ছায়া।

দুই প্রেমিককে এনেছি রাজদ্বারে
দু'জনের হাত লোহার দণ্ডে বাঁধা
সবাই দেখছে একটি বিরাট তালা
সব কাহিনিতে আছে একজন রাধা।

দু'জন পুরুষ দু'জনে সমান বীর
দু'জন পুরুষ দু'জনেই খ্যাতিমান
হয় না, হয়নি কেন তারা চায় হোক
আকাশে কখনও চলে নাকি জলযান?

দু'জন পুরুষ দু'জনে রাজপুরুষ
রাজ অভিষেক হয়েছিল এক দিনে
এদিকে শস্য ওদিকে খনিজ ছিল
ভাগ হয়ে গেল উত্তর দক্ষিণে।

পুবদিকে ওঠে পশ্চিমে যায় ডুবে
পুবদিক আছে, পশ্চিম নেব কিনে
কিনলে মানুষ সমেত কিনতে হয়
দাঙ্গা লাগল উত্তর দক্ষিণে।

একটি মেয়ের জন্য এতটা দূর
দু'জন পুরুষ সমানে সমানে দায়ী
দু'জন পুরুষ মাঝখানে এক নদী
দু'জন পুরুষ সমান মদ্যপায়ী।

এই মদে হয় সবচেয়ে বেশি নেশা
এই মদ হল আসল সর্বনাশী
এই মদে কেউ গন্ধ পায়নি কোনও
এই মদ খেতে আমরাও ফিরে আসি।
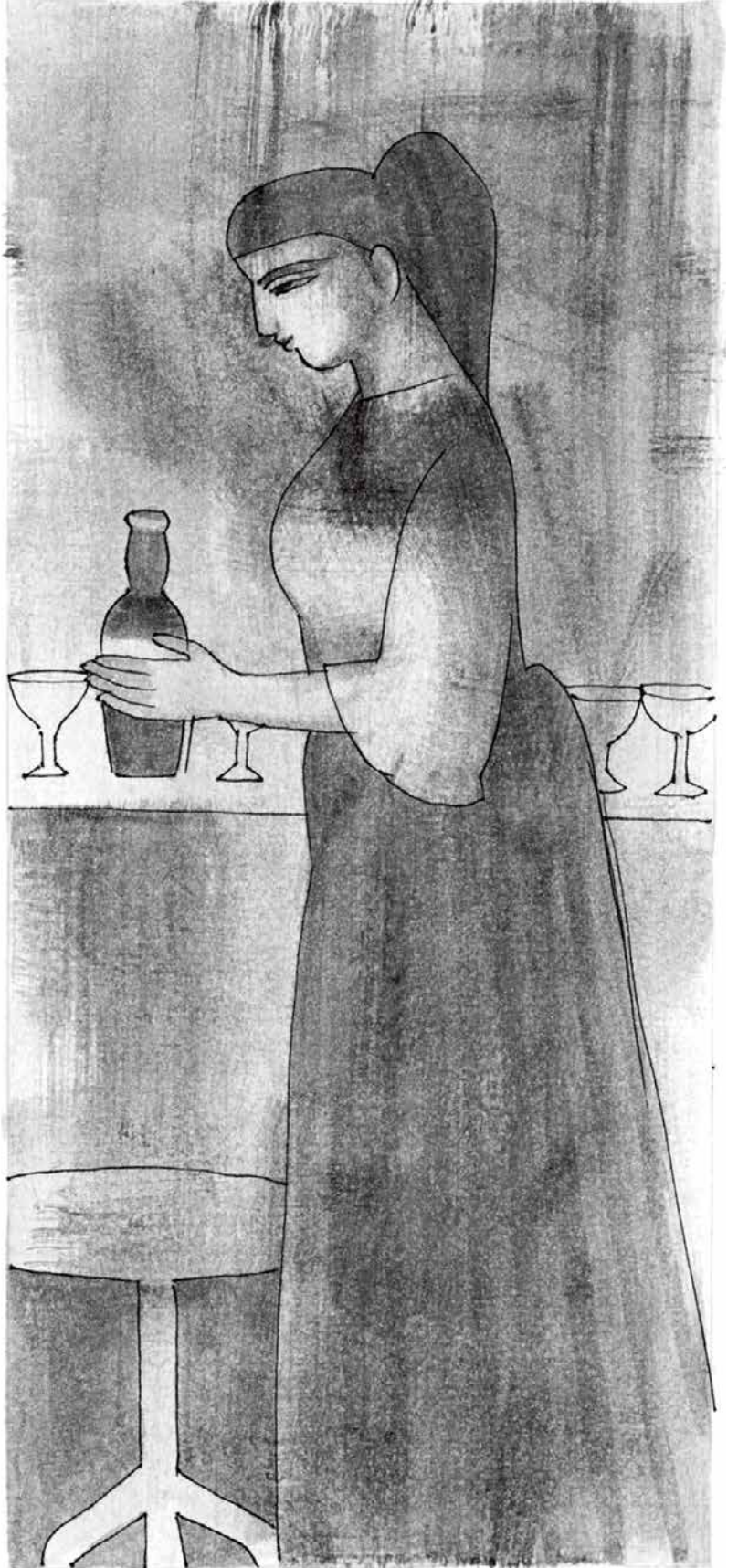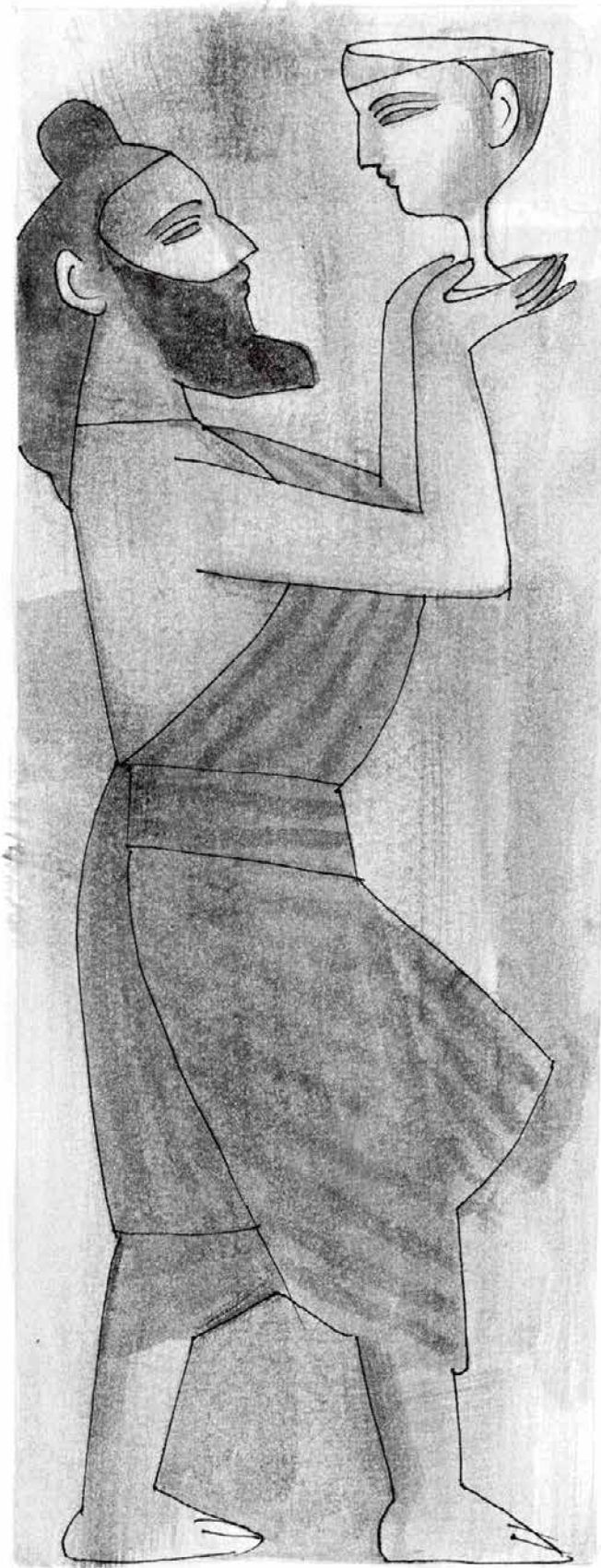
পাত্রে আঁটে না এত আগ্নেয়গিরি
সেই মেয়েটিকে পিঠে তুলে নিয়ে ছোটে
একজন ছোটে একজন বলে, থামো
একটি পাহাড়ে দু'জন দু'ভাবে ওঠে।

মেয়েটিকে তারা মাঝখানে এনে রাখে
মেয়েটি তখন নিয়তি দেবীর মতো
এ ওকে আঘাত করে যায় বার বার
দু'জন পুরুষ দু'জনকে করে ক্ষত।

এই মেয়েটিকে কেন দু'জনেই চায়
পৃথিবীতে বুঝি মাধবীলতারা নেই
দু'জনে কেন যে একজনকেই চায়?
দু'খণ্ড করে নিয়ে নিক দু'জনেই।

অন্ধকে কেউ জ্যোৎস্না বোঝাতে পারে
খঞ্জকে কেউ উড়ান চেনাতে পারে?
যুক্তি কখনও থামায় বিদ্রোহীকে?
যাকে ভালবাসে তাকে বারবার মারে।

ভালবাসা মানে রাতজাগা দুটো চোখ
ভালবাসা মানে দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে
কী করে কখন বিদ্যুৎ যায় ছুটে
থামানো যায় না বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে।

সারা রাজ্যের মানুষ প্রশ্ন করে
রাজ-প্রাসাদের চেয়ে ভালবাসা বড়?
এই পৃথিবীতে কখনও কেউ কি বলে
ভালবাসা বলে, 'আমাকে ভিখিরি করো।'

দু'জন বীরের লড়াই দেখতে আসি
দু'জনের হাতে রক্ত দেখতে আসি
দু'জনের চোখে অপূর্ব ভালবাসা
মেয়েটি বলছে দু'জনকে ভালবাসি।

দু'জনকে ভালবাসতে পারে কি কেউ
দু'জনকে ভালবাসতে পারা কি যায়?
ধ্বনি ছেড়ে আসে নিজের প্রতিধ্বনি
সব গর্জন থেমে যায় বর্ষায়।

দক্ষিণ থেকে উত্তরে লোক যায়
উত্তর থেকে দক্ষিণে লোক আসে
লড়াই দেখছে হাজারে হাজারে লোক
লড়াই দেখতে জনগণ ভালবাসে।

বাঘে শার্দূলে লড়াই হরিণ নিয়ে
সাপে ও নেউলে লড়াই গর্ত নিয়ে
আমরা মানুষ লড়াই দেখতে আসি
আহতকে আজও আমরা যে ভালবাসি।

মৃত্যু, তুমি কি চলমান বিনোদন
মানুষের মনে বিষ আছে আর কত?
কেউ কি কখনও তরবারি দিয়ে জেতে
পড়ে থাকে শুধু দিকে দিকে হতাহত।

ভালবাসা যদি সব ছেড়ে দিতে পারে
ভালবাসা পদপল্লবে ফিরে আসে
পাড়ায় পাড়ায় প্রেমিক প্রেমিকা কাঁদে
চোখে জল নিয়ে তারাই তো ভালবাসে।

যুদ্ধকে তারা বলেছিল বিনোদন
করেছিল তারা একে ওকে তাকে দায়ী
আসে আর যায় ভেলার মতন ভাসে
কোনও ভালবাসা হয় না চিরস্থায়ী।

কোনও রাজ্যই হয় না চিরকালীন
আমরা ভেবেছি আমরা ভালর দলে
ভাল বলে কিছু আছে নাকি পৃথিবীতে?
সেই ভাল হয় রাজা যাকে ভাল বলে।
খারাপ লোককে অনেকেই ভাল বলে
শয়তান আজও অনেকেরই ঈশ্বর
শয়তান নাকি অনেকের ভাল করে
সেটাই এখনও আমাদের বিস্ময়।

ভালবাসলে তো মানুষ উদার হয়
ভালবাসা পেয়ে মানুষ নরকও হয়
জ্যোৎস্না যখন আত্মহত্যা করে
জয়ী মানুষের ফিরে আসে পরাজয়।

পাহাড়ে দু'জন মুখোমুখি দুই বীর
সূর্য তাদের মাথার ওপর স্থির
মেয়েটি তাদের মাঝখানে আছে বসে
সে যেন একটি বাবুই পাখির নীড়।

পাখির বাসাকে দু'জনেই ভালবাসে
দু'জনেই চায় দু'জনের তাজা খুন
কোনও দেবতা কি তাদের থামাতে পারে?
তারা কি থামবে যদি আসে ফাল্গুন?

মেয়েটি তাদের দু'জনের মাঝে ওঠে:
'এভাবে তোমরা যদি হয়ে যাও শেষ
আমি মরে গিয়ে হব শেষ রূপকথা
রূপকথাতেই থেকে যাবে তার রেশ'।

'চাই না আমরা রূপকথা হয়ে থাকি
জানতাম যদি ভালবাসা মানে ঘৃণা
জানতাম যদি এত বিষ আছে মনে
এই ভালবাসা আর নিতে পারছি না'।

চাই না আমরা রূপকথা হয়ে বাঁচি
প্রতিধ্বনির মতন আছড়ে পড়ি
ঝড়ের মতন গাছে গাছে তুলি ঝড়
পোকামাকড়ের সঙ্গে বসত করি।

তোমরা দু'জন আমার মিনতি শোনো
বীর উত্তর শোনো বীর দক্ষিণ
তোমরা দু'জন আমার জীবনে আলো
একজন রাত একজন ভরা দিন।

একজন শীত একজন কম্বল
এইটুকু তো-ই আমাদের সম্বল
দিন কি কখনও রাতকে মারতে পারে?
দিন না থাকলে রাত কি থাকতে পারে?

শোনো উত্তর শোনো তুমি দক্ষিণ
এতটাই যদি তোমরা আমাকে চাও
এত দূর যদি তোমাদের ভালবাসা
আমাকে তাহলে গলা টিপে মেরে যাও।

তোমরা দু'জন দু'জনের হাত ধরে
ফিরে যাও নীচে তোমাদের নগরীতে
তোমরা দু'জন আবার বন্ধু হলে
সব মিটে যাবে হিতে আর বিপরীতে।

তোমরা দু'জন থামাও এবার ক্রোধ
তোমরা আমাকে এনেছ গগনতলে
আমি মরে গেলে তোমাদের ভাল হবে
যুদ্ধ থামবে, পাথর গলবে জলে।

এই যুদ্ধের চাই না কারণ হতে
এই যুদ্ধের যত ব্যঞ্জনা থাক
এই যুদ্ধের জয় পরাজয় নেই
হৃদয়ের কাছে হৃদয় জায়গা পাক।

উত্তরে আমি ছিলাম তখন লীন
উত্তরে আমি স্বপ্ন দেখেছি রোজ
উত্তরে আমি দু'হাতে পেয়েছি সুখ
ভালবাসা পেলে বেড়ে যায় সঙ্কোচ।

উত্তরে আমি ছিলাম আত্মহারা
কেন যে আমাকে নিয়ে এলে দক্ষিণে?
আমার সঙ্গে দক্ষিণে এল চাঁদ
আমাকে বললে চাঁদটাও দেব কিনে।

দক্ষিণে এসে আলাপ করিয়ে দিলে
এক এক করে লিখে দিলে সব খত
রাজা বলেছেন জনগণ জেনে যাক
তোমরা দু'জন দেশের ভবিষ্যৎ।

এক এক করে লিখে দিলে সব কিছু
দক্ষিণে তবে তিনজন মিলে থাকি
উত্তর এসে দক্ষিণে গেল মিশে
আমাকেও তুমি লিখে দিয়েছিলে নাকি?

তোমরা দু'জন এ ওর পরিপূরক
তোমরা সেদিন শ্রেষ্ঠ বন্ধু ছিলে
এ ওকে তখন চোখে হারানোর দিন
এ ওকে নিজের নিজস্ব করে নিলে।

রাত্রে যখন এ ওর পাত্রে সুরা
ঢেলে দিতে দিতে নিজেরাই যেতে ঢলে
ঘুমে উত্তর, দক্ষিণ উঠে আসে
চাঁদটা তখন মাথায় এসেছে চলে।

আমার প্রেমিক ঘুমিয়ে পড়লে কাদা
ওগো উত্তর, উত্তর বলে ডাকি
দক্ষিণ এসে আমার হাতটা ধরে
কী করে নিজেকে সংহত করে রাখি?

আমি চলে আসি অন্য একটি ঘরে
সেখানে তখন দক্ষিণ হাঁটু মুড়ে
আমার সামনে নতজানু হয়ে বলে
তোমাকে চেয়েছি এক শতাব্দি জুড়ে।

উঠুন রাজন! শক্ত থাকুন বীর
আমি একজন অতি সাধারণ নারী
জন্ম আমার কাঠুরিয়া পরিবারে
একজনকেই ফাল্গুন দিতে পারি।

দক্ষিণ বলে, ভিক্ষা চাইছি আমি
যা আছে তোমার দিলে আরও বেড়ে যাবে
কেউ জানবে না আমাকে একটু দিলে
আমার কুয়াশা আরও কুয়াশাকে পাবে।
হে বীর আপনি বন্ধুকে যদি চান
তাহলে আমাকে মুছে দিন মন থেকে
উত্তর যদি উঠে আসে এক্ষুনি
কী হবে চাঁদকে নিজের মাথায় রেখে?

দু'হাতে আমাকে এক ঝটকায় টেনে
জড়িয়ে ধরল নিজের ঠোঁটের কাছে
এক ঝটকায় আঁচল পড়ল খসে
ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে বুঝেছি মৃত্যু আছে।

ঠোঁট কোনওভাবে রাখতে চাইনি ঠোঁটে
ভেঙেও ভাঙিনি বীরের বাহুর চাপে
সরিয়ে নিয়েছি আমার আনত মুখ
মরে যাব আমি মরে যাব আমি পাপে।

পদপল্লবে চুমো দিয়ে বলে, দাও
মুখ এনে বলে খুলে দাও দু'টি বুক
গ্রীবা কামড়িয়ে ফিসফিস করে বলে
তোমার স্তনেই রাখা আছে সব সুখ।

কেন চাও তুমি আমার সর্বনাশ?
তোমার হৃদয় কখনও হয়নি দেখা
আমি ভালবাসি ঘুমিয়ে যেজন কাদা
তোমরা দু'জন কিন্তু আমি তো একা।

কী করে তোমাকে ভালবাসি হে রাজন?
আমার পুরুষ ঘুমে অচেতন বলে
এই কি সুযোগ তুমি নাকি বড় বীর
পাপ কি কখনও ঢাকা যায় বল্কলে?

তুমি বলেছিলে, আমি নাকি লেলিহান
আমি নাকি ঘুম হরণ করেছিলাম
প্রথম দেখার দিন থেকে নাকি আমি
দু'হাতে তোমার মরণ ধরেছিলাম।

আমি কী তাহলে মৃত্যুর চেয়ে বড়?
তুমি বলেছিলে আমাকে দু'ভাগ করো
কোনওদিন আমি শান্তি পাবো না ঘরে
পল-অণুপল আমাকে জড়িয়ে ধরো।

তার বেশি আমি চাইতে পারি না আজ
তার বেশি আমি তোমার যোগ্য নই।
আমি ভালবাসি তোমাকে আত্মা দিয়ে
আজ থেকে যেন তোমার যোগ্য হই।

সিঁড়ি দিয়ে আমি নেমে আসি উত্তরে
কী যেন একটা গন্ধে উতলা মন
তখনও আমার অচেতন প্রিয়তম
আমার ভেতরে নড়ছে অবদমন।

ফিরিয়ে দিয়ে কি ভাল করলাম আমি?
কেউ কোনওদিন জানবে না সে কি হয়
সব ভালবাসা সূর্য স্পর্শ করে
সব গন্ধ কি আলাদা আলাদা নয়?

সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি আর
কী যেন একটা গন্ধে আমার স্নায়ু
উত্তর থেকে দক্ষিণে গেল ঘুরে
ষড়যন্ত্রের সেই ছিল খরবায়ু।

ফিরিয়ে দিয়ে কি ভাল করলাম আমি?
ভোররাতে আমি ফিরে যাই তার কাছে
ভোররাতে আমি বলি তার হাত ধরে
আমার ভেতরে দু'জন মানবী আছে।

আমার ভেতরে দু'খানা বকুল গাছ
আমার ভেতরে দু'রকম ফাল্গুন
আমার গলায় দু'জনের মণিহার
দুটো নৌকোয় দু'দিকে টানছি গুণ।

ফিরিয়ে দিয়ে কি সবটা ফেরানো যায়?
ভোররাতে আমি ফিরে আসি তার কাছে
মুখ দিই আমি সর্বনাশের পিঠে
সর্বনাশেও একটা শান্তি আছে।

সে আসে যখন সে আসে ঝড়ের বেগে
সে আসে যখন আসে উল্কার মতো
সর্বনাশের মিথ্যা না থাকে যদি
মিথ্যা নিজে কি এত সুন্দর হত?

মিথ্যা ক্রমশ আমাকে অবশ করে
মিথ্যা আমাকে চুম্বন করে স্তনে
ভোরের আলোয় সত্য এসে দাঁড়ায়
নির্জন থেকে আসি আরও নির্জনে।

মিথ্যাকে নিয়ে এত লোক ঘর করে
মিথ্যাকে নিয়ে এত লোক করে স্নান
মিথ্যা নিজেই সত্যি কথাটা বলে
আমিই তোমার বেঁচে থাকবার গান।

যারা সম্পদ লুঠ করে বেঁচে থাকে
নারী লুণ্ঠন করে যারা বেঁচে থাকে
অন্যের রানি রাজনন্দিনী হয়
মিথ্যাকে তারা গহনার মতো রাখে।

মিথ্যা দিয়েই নির্মাণ হয় দেশ
মিথ্যা দিয়েই সত্যকে আনো বাড়ি
কে খায়নি বলো মিথ্যা নামক নুন
মিথ্যাকে ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি?

আমি একজন দুই পুরুষের চোখে
আমার মধ্যে দু'জন মানবী আছে।
আমার মধ্যে আছে সেই পানশালা
যাকে পান করে দু'জন মানবী বাঁচে।

এবার পাহাড়ে সূর্য ডোবার পালা
ওরা দুই বীর প্রহারে প্রহারে ক্ষত
সেনাবাহিনীর সেনাপতি এসেছেন
রক্ত ঝরছে অবিরাম অবিরত।

হিংসা দিয়ে কি হিংসা থামানো যায়?
ঘোষণা হয়েছে গ্রেফতারি পরোয়ানা
দু'জনকে আজ গ্রেফতার করা হবে
সঙ্গে আমাকে সেটা সকলেরই জানা।

সূর্য ডোবার এক মুহূর্ত আগে
দু'জনকে ওরা খাঁচায় বন্দি করে
রাজপথে পথে উপচে পড়েছে ভিড়
কেউ ঢিল মারে, কোথাও পুষ্প ঝরে।

কেউ কেউ বলে বাপরে মরণ প্রেম
কেউ কেউ বলে এর নাম ভালবাসা
দুটো বাঘ আর একটা হরিণ ছিল
সবাই জানে না ভালবাসবার ভাষা।

খাঁচার ভেতরে রাতে ফুঁসে ওঠে ওরা
এ ওকে এখনও পিষ্ট করতে চায়
এ ওকে এখনও প্রহার করতে চায়
মেয়েটি তখন জ্যোৎস্নায় পুড়ে যায়।

খাঁচার ভেতরে থামে না তাদের ক্রোধ
খাঁচা ভেঙে ওরা বাইরে আসতে চায়
অনন্তকাল এ ওকে মারতে চায়
মেয়েটি তখন জ্যোৎস্নায় পুড়ে যায়।

শেষ রজনীতে শেষ করে দিতে চায়
মেয়েটি তখন জ্যোৎস্নায় পুড়ে যায়।

তৃতীয় সর্গ

'ভানুদাদা, দোহাই আপনার, আমাকে কখনও বিয়ে করতে বলবেন না। আমি যেমন আছি থাকব। আপনি ছাড়া আমি কাউকে কখন ভালবাসতে পারব না। ভানুদাদা জানেন আমার মরতেও ইচ্ছে করে আপনার বুকের কাছে।'

আমার তরল যখন গরম থাকে
ভালবাসা তাকে সংযত করে রাখে।

আমার তরল যখন গরম হয়
আমার শরীরে তখনই সূর্যোদয়।

আমার তরল জমতে জমতে নড়ে
তোমার ওখানে সহসা ছিটকে পড়ে।

টলটল করে ভুবন তোমার হাতে
ভাল হত যদি পড়ত তোমার চাঁদে।

কবি বললেন, হরিদ্বার থেকে তুমি আমার জন্য কী এনেছ? পাঠক বললেন, এক ঘটি গঙ্গাজল।

কবি বললেন, গঙ্গাজল দিয়ে আমি লিখব? পাঠক বললেন, হে কবি, ট্রেনে করে, গোরুর গাড়ি করে, রিকশ করে আসতে আসতে ঘটি আর ঘটি নেই, আমি চা খেতে রাস্তার ওপারে একটা ধাবায় গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি ঘটি রূপান্তরিত হয়েছে একটি অপরূপা কন্যায়। সে আপনার সব লেখা পড়েছে। আপনি তাকে নিন। আমি তাকে আর হরিদ্বারে ফিরিয়ে নিতে পারব না। যে একবার জন্মায়, তাকে আর মাতৃগর্ভে ফেরানো যায় না।

কবি বললেন আমার বয়স হল
বয়সের ভারে পথ চলি আমি ঝুঁকে
আমার সামনে কেন নিয়ে এলে একে?
নতুন দুঃখ সইতে পারি না বুকে।

পুরনো দুঃখ একটু একটু পারি
পুরনো দুঃখ পুরনো লেখার মতো
বিষণ্ণ করে, অবশ করে না মন
বিকেলের গায়ে থেকে গেছে তার ক্ষত।

যখন যখন অবাক হয়েছি আমি
সুন্দর দেখে সুন্দর হতে চাই
জ্যোৎস্নায় আমি জ্যোৎস্নার মতো ভাসি
ভেসে যেতে যেতে নতুন কষ্ট পাই।

মানুষের মন যত আনন্দ করে
মানুষ ততই নিয়তিকে ডেকে আনে
সুন্দর এসে যখন দাঁড়ায় ঘরে
ঘর ভরে ওঠে আঘ্রাণে আঘ্রাণে।

কাকে নিয়ে এলে আমার সামনে তুমি
এ যে একেবারে আগুনের লেলিহান
বহুদিন বাদে সোজা হয়ে আমি উঠি
জেগে ওঠে যত মৃত বাসনার গান।

মানুষ আসলে একটি বাসনালয়
একটা বাসনে ধরেছি বৃষ্টিজল
একটা বাটিতে ঈর্ষা মাখানো ডাল
অশ্রু-চামচে চোখ দুটো ছলছল।

বহুদিন বাদে রক্ত গরম হল
সুন্দর, তুমি এত দেরি করে এলে?
তোমার বাবাকে ঈর্ষা না করে পারি
বাবার মতন আমিও তোমার ছেলে?

সুন্দর, তুমি এত দেরি করে এলে?
যখন আমার শিকড়ে ধরেছে ঘুণ
যখন আমার চোখের তলায় কালি
লেখাতেও নেই পরশমণির গুণ।

সুন্দর, তুমি এত দেরি করে এলে?
তুমি কি সত্যি আমাকে দেখবে বলে
ঘটির ভেতর জলের ভেতর ছিলে?
মায়া ছিলে তুমি, তাহলে সত্যি হলে?

সুন্দর, তুমি এত দেরি করে এলে
দু'চোখ ভরে যে তোমাকে দেখব আজ
সেই দুটো চোখ হারিয়ে ফেলেছি আমি
ভালবাসা হল চোখের আসল কাজ।

সুন্দর, তুমি কেন দেরি করে এলে?
আমার দু'হাত ভর্তি অশ্রুজল
তোমার মাথায় দু'ফোঁটা অশ্রু রাখি
তোমার স্পর্শে হয়ে উঠি চঞ্চল।
আমার ভেতরে নতুন ঝরনা জাগে
আমার ভেতরে জাগছে গুলমোহর
আকাশের থেকে তারা নেমে আসে গাছে
ভোরের আগেই এসেছে নতুন ভোর।

আমার ভেতরে যখন ফোয়ারা ছিল
কবিতাও ছিল হরিণের মতো লাফ
ভালবাসা ছিল ব্যথা বহ্নিতে ভরা
কলঙ্ক ছিল সারারাত নিষ্পাপ।

কলঙ্ক আসে, কলঙ্ক চলে যায়
কলঙ্ক ছাড়া ভালবাসা হয় নাকি?
ঘরে ঘরে যত দ্রুত হয় জানাজানি
জেনেও আমরা না-জানায় ভাল থাকি।

আরও একবার হাত রাখি ঝরনায়
আরও একবার চোখ রাখি আমি চোখে
আরও একবার উনুন ধরাই আমি
শুনতে চাই না, যা বলে বলুক লোকে।

আরও একবার আমাকে পাগল করো
আরও একবার আমাকে অবশ করো
গুল্ম যেমন ধরে থাকে সানুদেশ
গঙ্গা যেমন ঘটির ভেতরে ধরো।

আরও একবার আমাকে পাগল করো
আরও একবার গরল লিখতে চাই
আরও একবার ছাই-ভস্মকে বলি
ভস্মকে যেন পবিত্র করে যাই।

আরও একবার আমাকে পাগল করো
হাতের মুঠোয় ধরেছি আমার ঝড়
তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়ছে পায়ে
পা থেকে আবার উঠে আসে মর্মর।

আরও একবার আমাকে বন্দি করো
এক অপরূপ মাধুরীর কারাগারে
কারাগারে আমি দেয়াল টপকে নামি
ধরে রাখো তাকে যে ভালবাসতে পারে।

আরও একবার, আরও একবার আমি
সারারাত জেগে লিখব তোমার চোখ
আরও একবার আরও একবার আমি
চাইছি ভেতরে প্রলয় বন্ধ হোক।

এত সুন্দর এত সুন্দর তুমি
সহ্য করার মতন ক্ষমতা কই
তোমার মধ্যে দাবানল ওঠে ফুঁসে
আমার মধ্যে পুড়ছে আমার বই।

তোমার বাবার বন্ধু ছিলাম আমি
তোমার বাবাকে বাঁচিয়েছিলাম আমি
তোমার বাবাও আমাকে বাঁচিয়েছিল
এখন আমরা দু'জনে অস্তগামী।

ছোটনাগপুরে একটি মেয়ের কাছে
তোমার বাবার আত্মা লুকনো আছে
মেয়েটির পাড়া প্রতিবেশী বলেছিল
তোমার বাবার মৃত্যু রয়েছে গাছে।

গাছের সঙ্গে তোমার বাবাকে বেঁধে
তির ছুড়ে ছুড়ে মারবে বাবার বুকে
ছোটনাগপুরে আমি নতজানু হয়ে
বলেছি এবার ছেড়ে দাও বন্ধুকে।

ছেড়ে দিয়েছিল, তবু ছিল ভালবাসা
সারা পথ আমি কাঁদতে দেখেছি তাকে
ফিরতে চায়নি, মরতে চেয়েছে গাছে
মরণ কি আর সবার কপালে থাকে?

এসব গল্প তোমাকে বলছি কেন?
তোমার জন্ম এক ঘটি জল থেকে
তোমার জন্ম আমার পিপাসা থেকে
গঙ্গায় আমি অতীতকে যাই রেখে।

গঙ্গায় যারা অতীতকে যায় রেখে
তারা যদি ফেরে কোনওদিন গঙ্গায়
ফেরত পাবে না অতীত কখনও আর
সন্ধ্যা কখনও ফেরে নাকি সন্ধ্যায়।

সন্ধ্যার কাছে আমার একটা কথা
লুকিয়ে রেখেছি এতদিন কথাটাকে
সন্ধ্যা শুনছ, তোমার গলার হার
সময় হয়েছে পরাও এবার তাকে।

সন্ধ্যা নিজেই তোমাকে ডাকছে ঘরে
সন্ধ্যা নিজেই তোমাকে পরাতে চায়
সন্ধ্যা নিজেই তোমাকে দেখে অবাক
রাত্রি নামছে তবু সন্ধ্যাই থাক।

হঠাৎ তোমাকে দেখতে পাই না আমি
হঠাৎ তুমি কি বুদ্বুদ হয়ে গেলে?
হঠাৎ তুমি কি মিশে গেলে কোনও ফুলে
যেখানেই যাও যেও না আমাকে ফেলে।

যে ফুলে তাকাই সে ফুল উঠছে হেসে
দূরে দূরে ফুল হেসে ওঠে খিলখিল
সারস যাবেই যত দূরে ফোটে ফুল
যত দূরে থাক জোড়া পদ্মের বিল।

সারস উড়ছে, উড়ছে আমার মন
হাসিতে হাসিতে ফুলগুলি যত দোলে
এত ফুল দিয়ে কী হবে আমার বলো
একটা ফুলেই এ জীবন যাবে চলে।

মানুষ কি আজও ফুলের জন্য বাঁচে?
নাকি মানুষকে ফুল এসে বলে, বাঁচো
ন্যায়-অন্যায় মিশে যায় বৃষ্টিতে
এই পৃথিবীতে ফুলের জন্য আছ।

এই পৃথিবীতে ফুলের জন্য আছি
এত যে দুঃখ এত যে নিষ্ঠুরতা
বলতে চেয়েছি বলতে পারিনি আমি
ফুলের সঙ্গে বাকি আছে যত কথা।

কবি কি কখনও বলতে পেরেছে সব
সব কি কখনও লিখতে পেরেছে কবি
লিখতে জানলে সব লেখা যায় নাকি?
পাতায় পাতায় থেকে যায় পল্লবী।

এখনও আমার জঠরে অনেক খিদে
এখনও আমার তৃষ্ণা রয়েছে বড়
এখনও আমার জঙ্ঘায় জ্বলে তেজ
আগুনে আগুনে আমাকে নবীন করো।

যেমন আমার জঠরে জ্বলছে খিদে
যেমন আমার শরীর করছে হু হু
তারা দিয়ে ঢাকা তোমার কুমারী নাভি
মাঝরাতে শুনি মৃত কোকিলের কুহু।

এই পৃথিবীতে সকলের খিদে পায়
যারা খেতে পায় তাদের বলেছি দিতে
যত না পিপাসা রয়েছে ভূমণ্ডলে
তার চেয়ে বেশি জল আছে পৃথিবীতে।

এত জল আছে, তৃষ্ণা মেটে না তবু
ঔষধি আছে তবু কেন এত ক্ষত
আলো আছে এত তবু কেন এত ভয়
ক্ষয় হয়ে গেছি সহ্য করেছি যত।

ঘুম ভেঙে যায় মাঝরাতে উঠে পড়ি
দেখি পড়ে আছে বিছানায় কত ফুল
খিলখিল করে হেসে ওঠে ফুলগুলো
বারবার আমি করে চলি একই ভুল।

হঠাৎ একটি ফুলের ভেতর থেকে
তুমি উঠে বসো, ভোর হব হব করো
ভোর হলে তুমি ভোরের আলোর মতো
ফুলের মতোই আমাকে করেছ জড়ো।

আস্তে আস্তে আমার ঠোঁটের কাছে
এনেছ তোমার ভোরের অপূর্বকে
আমার ভেতরে দপদপ করে আলো
জমে থাকা জল বাঁধে গিয়ে মাথা ঠোকে।

আস্তে আস্তে তোমার ঠোঁটের কাছে
আমার হাতের একটি আঙুল ওঠে
তারপর আমি চুম্বন করে ফেলি
এত বাকি আছে ঠোঁটের সঙ্গে ঠোঁটে।

কবির দুর্নাম হল। হাওয়া ছুটে গেল দিকে দিকে। যশ ধীরে ধীরে আসে। অপযশ দ্রুতগামী। তার কোনও দায় নেই। সে কোনও দর্শন মানে না। ভালবাসা মানে না, সে শুধু ছোটে। ছুটতে ছুটতে রাজার কাছে এসে দাঁড়ায়। রাজা জিজ্ঞাসা করেন অপযশকে, বলো, কী খবর? অপযশ সব বলে। রাজা মন্ত্রিসভায় তোলেন। রায় শোনা যায়, ধরে আনো কবিকে। বিচার চাই। প্রশ্ন ওঠে, কত ধারায় বিচার হবে? রাজা বললেন, ধারা বুঝি না। বুঝি শ্লীলতাহানি।

কবি হবে সবচেয়ে তীব্র
কবি হবে স্বর্গের বৃষ্টি
তাঁর কাছে আমাদের অন্ধ
তাঁর দৃষ্টিতে পাবে দৃষ্টি।

বয়সের ভারে তিনি ন্যুব্জ
একে একে খসে গেছে অস্ত্র
তবু অনুদান তাঁর লাগবে
অন্নের পরে দিয়ো বস্ত্র।

কবি কেন এরকম তাকাবে
কবির তাকানো হবে কাব্য
নারী হবে তার চোখে গঙ্গা
আমরা কবিকে নিয়ে ভাবব।

অনাচার ঘটে গেছে রাজ্যে
মানহানি মানছে না রাজ্য
এতদূর যেতে পারে লজ্জা
ন্যায় হতে পারে অগ্রাহ্য।

পতনের থেকে করি রক্ষা
আমরা সমাজ রাখি ঊর্ধ্বে
এ কেমন ভালবাসা হে কবি
তুমি এসে দাঁড়িয়েছ যুদ্ধে?

কী করে নিজেকে বলো শুদ্ধ

তোমার পতন দেখে ভাবছি
কন্যাকে নিয়ে পাপ করেছ
তোমার স্পর্ধা দেখে কাঁপছি।

*

ওইখানে ওর স্পর্ধা আর ওইখানে ওর স্নেহ
সেখান থেকেই শুরু হয়েছে বিরাট সন্দেহ।

রাজদ্বারে এমন কথা আনতে পারি মুখে
এখানে কোনও প্রেমিক নেই আমার সম্মুখে।

কেন এলাম আজ সকালে আমি এদের কাছে
এদের নামে একশো এক অশ্লীলতা আছে।

কখনও কোনও রাজদ্বারে হয়নি আলোচনা
কখনও কারও শাস্তি হয় যায় না সেটা শোনা।

আমার কাছে জানতে চান কেন করেছি দোষ
ভালবেসেছি, ভালবেসেছি তাই কি জনরোষ?

গঙ্গা থেকে জন্ম নেওয়া এক মাধবীলতা
বলেছে তার গোপনতম সব প্রগল্‌ভতা।

আমিও তার আগুনে হাত নিয়ে
ঢেকেছিলাম আগুন আভা গোটা আকাশ দিয়ে।
সেই মেয়েটি কন্যাসম সেই মেয়েটি মেয়ের মেয়ে
সারা জীবন কাটানো যায় ওই মেয়েকে চেয়ে।

আমিও তার বাবার মতো আমিও তার বাবা
পিছিয়ে দিই বনমানুষ সরিয়ে দিই থাবা।

আমি যে তাকে আমার বুকে পিণ্ড করে রাখি
ঘুমিয়ে গেলে আমি যে তার দু'হাত ধরে থাকি।

সেই আমার দোষ?
রাজদ্বারে সংগঠিত করেছ জনরোষ?

মারো আমাকে ধরো আমাকে দ্বিখণ্ডিত করো
গোটা দেশের লোককে করো জড়ো।

অনেক লোক জড়ো হলেই, সত্য জড়ো হয় না
তোমরা যাকে বলছ জয় আসলে সেটা জয় না।

আমাকে যদি বন্দি করো তোমার কারাগৃহে
চোখের জল পড়বে চোখ দিয়ে

চোখের জলে অশ্রু থাকে, সেটাই ভালবাসা
কারাগৃহে সেটাই পথ একটু আলো আসার।

আমার হাত ছিন্ন, আমি কুড়িয়ে নিয়ে আসি
ছিন্ন হাত নড়তে পারে, বলবে ভালবাসি।

মারো আমাকে, মারো আমাকে যতটা তুমি পার
কিন্তু আমি জন্ম নেব আরও।

জন্ম নেব শাপলা ফুলে, জন্ম নেব পদ্ম বিলে জন্ম নেব
জন্ম নেব দুর্বিপাকে, জন্ম নেব বাসনালয়ে
জন্ম নেব ধুলোবালিতে জন্ম নেব গুল্ম লতা
জন্ম নেব চাঁদ সড়কে জন্ম মারি মড়কে
জন্ম নেব জন্ম নেব ভালবাসায়
স্বর্গে কবি থাকে না, কবি থাকে না কোনও নরকে।

চতুর্থ সর্গ

জল কখনও নিজেকে পান করে?
গাছ কখনও নিজের ফল খায়?
—তুকারাম

স্বর্ণচাঁপা গাছে
তোমার কানের একটা দুল এখনও আটকে আছে।

স্বর্ণচাঁপা পাতায়
ভোরের আগে মেয়েরা উঠে চোখের জল পাঠায়।

স্বর্ণচাঁপা ফুলে
নদীর নীচে যে পথ ছিল গিয়েছি আমি ভুলে।

স্বর্ণচাঁপা শাখায়
সবার নীলকণ্ঠ পাখি দু'দিকে লেজ নাড়ায়।

আমি জানি আমি নারী অপহরণকারী। কিন্তু আমি দস্যু নই। আমার রথ যখন উড়ে চলল, আমি তখন একটা ঝরনাকে নামিয়ে দিলাম টিলার পাশে। আমি যখন উড়তে উড়তে চলেছি, আমার ভেতরে ভয়। একটা ভয় পাওয়া হরিণকে আমার ভয় করছিল। আমার গায়ে একটা লতা লেগেছিল। আমি সেই লতাকে বললাম, যাও তুমি অরণ্যে ফিরে যাও, আমার সঙ্গে এসো না। আমার চুলে লেগেছিল একটা পল্লব। আমি তাকে আদর করে রেখে দিলাম নিজের কাছে। সে বলল, তোমার মন যেদিন শুকিয়ে যাবে সেদিন আমিও শুকিয়ে যাব। আমার কানের একটা দুল কোথায় ছিটকে পড়ল কে জানে। যেখানেই পড়ে থাক, ভাল থাকুক। অপহরণ করতে আমার ছলনা বিদ্যায় কোনও কম পড়েনি। কিন্তু এখন আমার ভয় করছে যাকে অপহরণ করেছি সে যদি আমাকে ঘৃণা করে। কিন্তু সে বলল, 'এই নাও তোমার কানের দুল, অপহরণকালে সে আমার কোলে এসে পড়েছিল।'

অনেক রাত আমি কষ্টে কাটিয়েছি
কী শীত তবু শীত কষ্ট নয়
একটুখানি ভালবাসার লোভী আমি
একটু ভালবাসা চেয়েছিলাম
ভাবলে আজ বড় কষ্ট হয়।

একটুখানি ভালবাসার জন্য যে
অনেকরাত আমি নিদ্রাহীন
একটুখানি ভালবাসার জন্য যে

অনেকদিন আমি করিনি স্নান
শুকিয়ে গেছে ভালবাসার গান।

বহু শীতের রাত কষ্টে কাটিয়েছি
ধুলোবালিকে আমি করি না ভয়
পাতা যেমন ঝরে দুঃখ তত ঝরে
ধুলোয় ধুলো বাড়ে, বাড়ে আমার স্নেহ
আমাকে তত ওরা করেছে সন্দেহ!

গহনা পরে রোজ দাঁড়াতে ভাল লাগে?
আমি কি শুধু এক পুতুলরানি?
সব মেয়ে কি হারে সোনাদানার কাছে?
গোধূলি পরে কোনও অলঙ্কার?
আমার ধুলো বালি অহঙ্কার।

কত শীতের রাত একা দাঁড়িয়ে ঠাঁই
রাজবাড়িতে কত সুখ আমার
কে আর এসে হায় জানতে চায়
গভীর রাতে একা দাঁড়িয়েছিলে কেন?
শূন্য মিশে যায় শূন্যতায়।

সেদিন রাতে আমি প্রশ্ন করলাম
তুমি আমার রাজা, দক্ষ প্রশাসক
কিন্তু তার আগে আমার সুপুরুষ
কখনও কোনওদিন জানতে চাইলে না
পায়ে আমার কেন ফুটেছে কুশ?

দিনের বেলা আমি প্রশ্ন করলাম
আমি তোমার বৌ, শুধু কি রানি?
আমার লতা আছে, আমার পাতা আছে
আমি তো তার আগে তোমার নারী
নুনের মতো ভালবাসতে পারি।
আমার বুক থেকে বস্ত্র খুলেছিলে
ভদ্রভাবে খুলে পরিয়ে দিয়েছিলে
এ অপমান আমি কী করে ভুলি?
আমার গালে দিলে ভিক্ষা চুম্বন
পাতাল থেকে আজও পাতাল তুলি।

একটা মেয়ে যদি নিজের থেকে চায়
তার ঝিনুকে জাগে প্রতিধ্বনি
তার কোমরে জাগে প্রবাল দ্বীপ
পুরুষ জানে হাত রাখতে হয়
কপালে নিতে হয় রাজার টিপ।

গোধূলিকালে আমি প্রশ্ন করলাম
আমাকে একদিন সারস এনে দেবে
সেই সারস রোজ আমার ঘরে এসে
আমার দুঃখকে দু'ভাগ করে নেবে?
আমাকে একদিন সারস এনে দেবে?

দাওনি, দিলে তুমি অনেক দাসদাসী
তারা আমার হাতে রং পরিয়ে দিল
তারা সকালগুলো নষ্ট করে দিল
বিষণ্ণতা ছিল, অনেক ভাল ছিল।

তোমাকে আমি শেষ প্রশ্ন করলাম
আমি কি মধু নই শুধু যামিনী?
আমি কি ফুটে থাকা শুধুই ফুল?
আমাকে তুমি পাশে রেখেছ রানি করে
সবটা জেনে তুমি করেছ ভুল?

আমি তোমার কাছে বলিষ্ঠতা চাই
আমি তোমার কাছে প্রগল্‌ভতা চাই
চেয়েছিলাম তুমি আমাকে মারো পিষে
শূন্য করে তুমি ভরিয়ে দাও
তোমার অমৃতে তোমার বিষে?

অশোকবনে আমি কোনওদিন জোর করিনি। আমাকে ওরা বলে রাক্ষস। আমাকে ওরা বলে অনুভূতিহীন। আমার দুটো হাত। আমার একটা মাথা। দুটো কান। দুটো চোখ। আমি প্রথম শুনেছিলাম এক মেষপালকের কাছে, আমার দশটা মাথা। সে আমাকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার আর ন'টা মাথা কোথায় রেখেছ? আমি বলেছিলাম, দেখো আমি মানুষ, আমি রাক্ষস নই। আমি জল শাসন করি, বায়ু শাসন করি, আমি বায়ুদূত বানাতে পারি। আমি মর্মরের বন্ধু। আমি প্রতিধ্বনির বন্ধু। আমি রাখালের বাঁশি। আমি কৃষকের বৃষ্টি। যাদের খুব রাগ আমার ওপর আমি কালো বলে, তারা আমার নামে কুৎসা করে, বলে আমি দশানন। আমি একজন প্রেমিক। আমি পাগলের মতো ভালবাসি একজনকে। আমি বাতাস হয়ে তার কাছে গিয়েছি। আমি বৃষ্টি হয়ে তার গবাক্ষে দাঁড়িয়েছি। আমি জোনাকি হয়ে তার অলিন্দে গিয়েছি। আজ সে আমার সামনে।

তোমাকে একবার দেখেছিলাম
যে দেখা-অদেখায় মরতে চাই
বলেছিলাম আমি দ্বিতীয়বার
স্বপ্নে এসো আমি ধরতে চাই।

লোকে আমাকে বলে কী কুৎসিত
লোকে আমাকে বলে অন্ধকার
লোকে আমাকে বলে হৃদয়হীন
আমার চারপাশে বন্ধ দ্বার।

কালো মানুষ বলে স্বপ্ন নেই?
কালো মানুষ বলে জড় পাথর?
কালো মানুষ আমি কালো মানুষ
মৃগনাভির কাছে চাই আতর।

আমারও ভাল লাগে সূর্যোদয়
আমারও ভাল লাগে গোধূলিকাল
আমারও ভাল লাগে উঠলে চাঁদ
আমি অতীত নই, আমি ত্রিকাল।

তোমাকে তুলে আনি ছলনাময়

অপহরণ করি অহঙ্কার
লক্ষ্মণের রেখা মিলিয়ে যায়
পিনাকে বেজে ওঠে কী টঙ্কার।

তির-ধনুকে আমি করি না ভয়
আমার হাতে আছে কুজ্ঝটিকা
আমার হাতে আছে ধুলো-পবন
গড্ডলিকা থেকে অট্টালিকা।

গগনে ভয় নেই পবনে ভয় নেই অনলে ভয় নেই আর
প্রভাতে ভয় নেই প্রদোষে ভয় নেই গরলে ভয় নেই আর।

অন্ধকার আমি অন্ধকার
আমি যা বলি তাই করে দেখাই
আমি অপূর্বকে দেখে অবাক
আমি অপূর্বকে দু'হাতে চাই।

দু'হাতে চাইলেই দু'হাতে দেয়!
পারলে হাত বিচ্ছিন্ন করে
পারলে এই মাথা উড়িয়ে দেয়
তির-ধনুকে বুক দীর্ণ করে।

আমি অপূর্বকে চেয়েছিলাম
আমি অপূর্বকে পেয়েছি আজ
তুলে এনেছি আমি মৃগনয়ন
অযোধ্যায় কাল পড়েছে বাজ।

তোমার চোখে চোখ পড়ল যেই
ওঠে আগুন শিখা অনন্তের
তাহলে সার্থক অপহরণ
সারা শরীরে ঢেউ বসন্তের।

অপহরণ করা হয়নি ঠিক
অপহরণ করা হয়নি ভুল
আমার হাতে নেই ভবিষ্যৎ
কোথায় পড়ে গেল কানের দুল।

সে মেয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, রাজা
এই তো আপনার অলঙ্কার
কী করে এল এটা আমার কোলে
এ দুল আপনার অহঙ্কার।
ঈষৎ ছিল অসামান্য হাসি
ঈষৎ বিদ্যুৎ ভ্রূপল্লবে
আমি তখন চুপ, আত্মহারা
আর কি ভালবাসা জীবনে হবে?

পাইনি ভালবাসা হয়নি প্রেম
আমার ঔরসে হয়েছে গাছ
হয়েছে প্রজনন লতাপাতায়
চাইছি হতে আমি প্রেমিক আজ।

তোমাকে ভালবাসি সাহস নেই
আমার পৌরুষ আছে অটুট
তোমাকে তুলে এনে করেছি দোষ
কিন্তু তুমি নও আমার লুঠ।

সহসা বৃষ্টিতে ওঠে তুফান
সহসা থেমে যায় ঝড় বাদল
তুমি কি বৃষ্টিতে পাল্টে গেলে
তসরে বৃষ্টিতে কী হিল্লোল।

'যে বৃষ্টির আগে ছিল অতীত
সে বৃষ্টির পরে ভুলে গেলাম
যত গহনা ছিল ফেলে দিলাম
এ আমি কোন দেশে চলে এলাম?

এ আমি কার কাছে চলে এলাম
নবীন মেঘ আর নবীন জল
নবীন গাছ আর নবীন পাতা
আমার শেষ স্মৃতি পায়ের মল?

এ দেশ কোনওদিন দেখিনি আগে
কী সুন্দর দেশ পুরোটা নীল
কী সুন্দর নদী ছোট পাহাড়
যেন ঠোঁটের পাশে একটি তিল।

আমার এত রূপ কী হল রূপে
অপহরণ হলে রূপ কি বাড়ে
আমার শরীরের অনেক দাম
অপহরণ হলে দৃষ্টি কাড়ে।

ভালবাসার কোনও মূল্য নেই
আমার নাভিমূল ভীষণ দামি
চাইত সে আমার অভিবাদন
চাইত সে আমার রাত-প্রণামী।

আমি কি পুরোহিত কেবল পুজো
শুধু কি পুজো করে পুণ্য হয়?
আমার কামনায় ফোটেনি ফুল
আমার বাসনা কি জ্যোতির্ময়?

পুরুষ পুজো পেতে তখন চায়
যখন তার হাতে বসুন্ধরা
দেখেনি কোনওদিন আমার স্তন
আকুল কান্নায় দুগ্ধে ভরা।

কত না ভালবেসে সেজেছিলাম
পলিমাটির মতো নাভির ত্বক
রসের ভারে দৃঢ় দুটো খেজুর
ওই তো রাজা আসে, কী ধকধক!

দরজা খুলে গেল প্রহরী সরে গেল দাসীরা চলে গেল হাসতে
আমার বুকে তুমি এবার ঠোঁট দেবে কেন যে দেরি করো আসতে?

আমার হাত ধরে বললে, শোনো
আজকে বড় বেশি ক্লান্ত আমি
তোমার সুন্দর কপালে চুমু

রাত্রে ঘুম চাই আজকে থামি।

রাজকাজের শেষে ঘুম না হলে
পরের দিন সব চলকে যায়
পরের দিন হল আসল দিন
প্রজার মুখে হাসি দেখতে চাই।

সিংহাসন নয় নিষ্কলুষ
যে কেউ হতে পারে অগ্নিময়
করতে হতে পারে গণবিনাশ
একটি তুষ, সেও বহ্নি হয়।

যে ছিল সবচেয়ে কাছের লোক
তাকেও দিতে হয় নির্বাসন
সুপরামর্শকে শুনতে নেই
রাজ্য চলে যদি থাকে শাসন।

দণ্ডনীতি বড় কলঙ্কের
দণ্ডনীতি ছাড়া হয় না ভোর
সেই ভোরের এক গন্ধ আছে
মুছতে পারবে না কোনও আতর।

যা চায় জনগণ তা যেন পায়
আমাকে ডাকে তারা দেবতা বলে
তাদের কথা আমি মান্য করি
চলে না রাজকাজ হতাশ হলে।'

'যত অতীত ছিল সরিয়ে রাখি
যত গহনা ছিল ফেলে দিলাম
কাজলে মোছে নাকি চোখের জল
আমার ভাগ্যকে মেনে নিলাম।
কৌটো ভরা ছিল রাজমোহরে
কৌটো থাক কারুবাসনাময়
রাজারা সুখ দেন, নিয়েও নেন
রাজারও হতে থাকে রাজ্যক্ষয়।

অশোকবনে আমি বন্দি আজ
অবচেতনে নীলকণ্ঠ পাখি
সুখের কারাগারে কেটেছে দিন
অশোকবনে চুল খুলেই রাখি।

এখানে নেই কোনও রাজ শাসন
এখানে নেই কোনও দাসানুদাস
এখানে আমি নীলকণ্ঠ পাখি
মনটা ভাল হলে হই উদাস।

অপহরণকারী করেনি জোর
করেনি কোনওদিন অশ্লীলতা
দেয়নি ইঙ্গিত অপমানের
বলেনি গ্রীবা ধরে কলুষ কথা।

যেদিন খুব শীতে কাঁদছিলাম
সেদিন রাতে শীতবস্ত্র নিয়ে
এসেছিলেন তিনি বিনীত হয়ে
চলে গেলেন শীতবস্ত্র দিয়ে।

দেখিনি আমি তার অসভ্যতা
ডাকেনি কোনওদিন স্বশয্যায়
তাহলে কেন আমি হলাম লুঠ?
নারী তো লুণ্ঠন হতেই চায়।

ভালবাসার কাছে আসে না সুখ
চাইনি রাজসুখ চাইনি রাজা
চেয়েছি প্রেমিকের বকুল ফুল
শাস্তি চাই আমি চেয়েছি সাজা।

এই তো সাজা পেয়ে করছি গান
প্রতিটি গানে আছে আমার সই
পড়ছে ঝরে ঝরে আমার কোলে
মেয়েরা নিজে লেখে নিজের বই।

সুখের মঞ্জরি দু'হাতে ছিঁড়ে
অঝোর বৃষ্টিতে কেঁদে ভাসায়
কান্না থেকে ওঠে নতুন জেদ
নতুন মানে খোঁজে ভালবাসায়।

এত যে ঘরবাড়ি সোনার রথ
অঙ্গে কারও সোনা থাকে না, যায়
এত প্রাসাদ আছে, কিন্তু শোনো
মেয়েরা নিজেদের বাড়ি কি পায়?

কারও ভালবাসায়, কারও কৃপায়
আমরা বেঁচে থাকি আমরা বাঁচি
যেভাবে কাঠুরিয়া গাছ বাঁচায়
আমরা আমাদের সঙ্গে আছি।

সেদিন রাতে ওঠে তুমুল ঝড়
অশোকবনে ওঠে কী তোলপাড়
যে আমি ভীত নই, পেলাম ভয়
পড়েই ওড়ে গাছ আকাশপার।

ঝড় থামার পরে বুঝতে পারি
এ ঝড় সে ঝড় না, এ ঝড় আমি
উঠে দাঁড়াই অবচেতন ঝড়ে
কষ্ট করে আমি থামাই, থামি।

অপহরণ হতে হয়নি ভয়
সেদিন রাতে আমি কেঁপে গেলাম
ভোর হবার আগে বাইরে এসে
স্বর্ণচাঁপা গাছে ফুল পেলাম।

প্রথমবার আমি বুঝতে পারি
থেমে গেলেও ঝড় পুরো থামেনি
এ ঝড় কোনওদিন থামে না পুরো
সেদিন সব গাছ ঝড়ে ভাঙেনি।

ভেঙেছে জানালার কত কপাট
হয়েছে দরজার পাল্লা নত
আমার মনে যত দরজা ছিল
ছিটকে পড়ে আছে ইতস্তত।

মধ্যরাতে আমি দাঁড়াই সরোবরে
সরোবরের জলে হাসছে চাঁদ
মধ্যরাতে আমি চাঁদকে ডাকি
আমার জ্যোৎস্নার কী সংবাদ?

হঠাৎ উঠে আসে একটি ছায়া
এ ছায়া পুরুষের। এ ছায়া কার?
আমার হাত ধরে বলছে এসো
এ ছায়া বাসনার। এ ছায়া যার।

আমার হাত ধরে নামায় জলে
জলে কী সুন্দর পদ্মনাভ
পুরোটা জল আজ জ্যোৎস্নাময়
এ রাত আমি আর কখনও পাব?

আমার হাত ধরে নামায় চাঁদে
চাঁদের মধ্যে যে এত গগন
চাঁদের মধ্যে যে এতটা চাঁদ
লগ্নভ্রষ্টার যেন লগন।

এ ছায়া ছায়া নয়, এ তো মানুষ
আমাকে বলে এসো, এসো গভীর
আমার চুলে মুখ লাগিয়ে বলে
তুমি আমার শেষ পাখির নীড়।

ছায়ার ছায়া দেখে চিনতে পারি
এই তো সেই চুল, এই তো চোখ
ছায়ার ছায়া পড়ে আমি কি জানি?
তাহলে প্রচ্ছায়া আমার হোক।

জলের ওঠা পড়া জলের ঢেউ
এ ঢেউ থামবে না, থামানো যায়?
আমার ছায়া পড়ে গগনময়
ছায়া কি একবার ছায়াকে পায়?
আমাকে নিয়ে তুমি আঁধারে যাও
আমাকে নিয়ে তুমি এসো আলোয়
আমাকে নিয়ে করো অনন্যতা
আমাকে ভাল করো আরও ভালয়।

আমার ভাল হলে তোমার ভাল হবে তোমার ভাল হবে দিগ্বিজয়
তোমার ভাল হলে আমার ভাল হবে আত্মা হবে আরও জ্যোতির্ময়।

তোমাকে যেন আমি করি শাসন
তোমাকে যেন আমি রাত্রে পাই
তোমাকে যেন আমি করি বারণ
তোমাকে যেন আমি সকালে চাই।

রাত্রে চাই আমি সকালে চাই
সকালে চাই আমি রাত্রে চাই
আমার সরোবরে ডাকছে চাঁদ
যেন চাঁদের কাছে চাঁদকে পাই।

আমার ভাল হলে তোমার ভাল হবে তোমার ভাল হলে পৃথিবীময়
তোমার ভাল হবে তোমার ভাল হবে আমরা পার হব দুঃসময়।

পঞ্চম সর্গ

'Our City dies—we've lost count of all the dead.'
—সোফোক্লিস

যতই তুমি বানাও রাজবাড়ি
নারী মানেই আগন্তুক নারী।
চেনো না তাকে, দেখোনি তাকে ধরে
এত গভীর হল কেমন করে?
যামিনী যায় দিবসে করো বাস
দূর্বা করে শিশিরে পরবাস।
ঈর্ষা হয় দেখে তোমার বাড়ি
তোমার ঘরে আগুন দিতে পারি?

আমার জন্ম একটি ফাইভ স্টার হোটেলে
কিন্তু আমাকে ঘাসের ভেতর শুইয়ে রেখে
আমার মা পালিয়ে যান
আমাকে পাহারা দিত একটি বাজপাখি
সেই বাজপাখি
যে পাহাড়ে বেঁধে রাখা একটি লোকের
পিঠ থেকে এক খাবলা মাংস তুলে নিয়ে চলে যেত
যখন
মাংস গজাত
সে আবার ফিরে এসে এক খাবলা মাংস
তুলে নিয়ে উড়ে যেত।

যেত বলছি কেন?
সে এখনও উড়ে এসে মাংস তুলে নিয়ে যায়।

ফাইভ স্টার হোক অথবা ঘাস
যেখানেই মানুষ জন্মাক,
একজন মা লাগে।

বসুন্ধরা যেমন সূচের ফুটোর মধ্যে থাকে
হোসপাইপের মধ্যেও কই মাছ খলবল করে।
ঘাস থেকে কলাপাতায় তুলে
একজন মেষপালক আমাকে নিয়ে যায়
কিন্তু সে আমাকে রাখতে পারেনি ঘরে।
সেই ঘরে
হলুদ, নীল এবং সবুজ
ধুন্ধুমার লাগাত, লেগে যেত রঙের রায়ট
কাপড় মুড়ে আমাকে পাঠানো হয় ইরানে
সেখানেও আমার একটা দোলনা জোটেনি
ক্ষিতি আর অপ দু'জনে দু'দিক থেকে দোলাত

তাতে কি আর শিশুকে ভোলানো যায়।

আমার খিদে পেত
আমি চাইতাম মায়ের দুধ, মায়ের বোঁটা।
বোঁটা কখনও নিপল দিয়ে
মেটানো যায় না।

আমাকে নিয়ে আসা হল বেথলেহেমে
সেখানে আবার উল্টো গল্প
বাবা পালিয়েছে
ডাস্টবিনে তার ছেলেকে রেখে
একটি মেয়ে তাকে কোলে নিয়ে বসে আছে
কোলে যেন একটি নক্ষত্র
আমার মনে হল সারা পৃথিবীটা একটা ডাস্টবিন
তার ভেতরে একটি কুমারী মা
তার কোলে একটা আলো যার নাম পঁচিশে ডিসেম্বর।

কলাপাতা পাল্টে গেল লরেল পাতায়
পাতা যে রকম হয় হোক, পাতায় শিশির পড়ে
শিশিরের ভেতর কার ঔরস?
একটা ফোঁটার ভেতর কয়েক অযুত বিন্দু
তারা বলছে তমসা মা জ্যোতির্গময়
কাউন্ট মি, কাউন্ট মি, আই অ্যাম অ্যা বিলিয়ন ডলার স্পার্ম।

আমি এলাম রাজার বাড়িতে
আমার জীবন থেকে মেষপালক হারিয়ে গেল
মানুষ হারিয়ে গেলেও তার বাঁশি শোনা যায়
আমাকে রাখা হল একটা কাসলে।
কুটিরে বা কাসলে যেখানেই বড় হও, বাঁশি লাগে।

একজন মা এল আমাকে স্নান করাতে
তার একটা চোখ নীল, একটা হলুদ। তার চুল ব্লন্ড।
স্তন চামড়া দিয়ে ঢাকা
আর তার ঝিনুকের ওপর একটা তালা।
কিন্তু সেই তালার চাবি পাওয়া যায় না।

স্নান করতে করতে আমি বড় হতে লাগলাম
আমার মাগুর বড় হতে লাগল
মা আমার মাগুর মুখে নিয়ে আদর করে দিল
আমি আরও বড় হতে লাগলাম।

আমার ভেতরে একটা বাইসন জন্ম নিল
সে বলল আমাকে খেতে দাও
আমি তাকে আমার ডিনারের সুসিদ্ধ বাছুর দিয়ে দিলাম
সে বলল, এ আমি খাই না
আমি তাকে এক গামলা বেগুন, গাজর, ক্যাপসিকাম দিলাম
সে বলল, এ সব আমি খাই না।
তাহলে তুমি কী চাইছ?
আমি চাই নারীর উল্লাস এবং চোখের জল
আমি চাই লালা এবং লাবণ্য
আমি চাই বিচুলি এবং বিলাস
আমি চাই খিদে, এবং ড্যামোক্লিসের খড়্গ।
আমি চাই নদীর বাতাস এবং বিহ্বলতা
আমি চাই শাস্তি এবং উল্কা
উল্কার মতো আছড়ে পড়তে চাই নারীর প্রবালদ্বীপে।
পড়ব কিন্তু ফাটব না।
জ্বলব, জ্বালাব, জ্বলব, জ্বালাব।

আমি জানি ভালবাসা ছাড়া কাউকে জ্বালানো যায় না
ভালবাসা ছাড়া কাউকে নেভানো যায় না।
কিন্তু ভালবাসা আমি পাব কোথায়?
কত হিরে খুলে দেখলাম
সব হিরের ভেতর ভালবাসা থাকে না।

ক্ষমতা, ক্ষমতা যাকে বলে পাওয়ার
ক্ষমতা হল মৌরির মদের মতো
একটু একটু করে খেতে হয়।
আমার অপরাহ্ণ আর তোমার অপরাহ্ণ এক নয়
একটু একটু করে খেতে হয়।
আমার সূর্যাস্ত আর তোমার সূর্যাস্ত এক নয়।
একটু একটু করে খেতে হয়।

সামনে চারটে পেছনে চারটে ঘোড়া আমার রথ টানছে
আমি আমার সারথি
আমার কোনও ভগবান লাগে না গাড়ি চালাতে
আমার নিয়তি আমার হাতে
আমার রথ ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করতে চাইছে
একটা সুসজ্জিত শহরে
এথেন্স কিংবা কলকাতা কিংবা ক্যালিফোর্নিয়া
যেখানে মেয়েরা কল্লোলিনী
আর ছেলেরা কীর্তিনাশা
দিনরাত কবিতা লেখে আর গিটার বাজায়।

আমি শহরে ঢোকার মুখেই তীব্র বাধা পেলাম
উল্টোদিক থেকে একটা রথ এসে আমার রথকে মারল।
আমার তিনটে ঘোড়া মুখ থুবড়ে পড়ল।
আমার গ্রীবা ছড়ে গেল
আমার দুটো আঙুল কেটে রূপকথা বেরিয়ে এল।

আমি গেলাম রেগে, আমার মাথা ঠিক থাকল না
আমি রথ থেকে নামলাম
লোকটাকেও রথ থেকে নামালাম
কী পেয়েছেন কী?
লোকটা বলল, নিয়ন্ত্রণহীন রথ
আর কবে রথ চালাতে শিখবেন?

আমি আর পারলাম না নিজেকে ধরে রাখতে
বের করে আনলাম তরবারি
ঢুকিয়ে দিলাম লোকটির পেটে।
গলগল করে বেরতে লাগল রক্ত,
রাস্তা লাল হয়ে গেল
আমার একটা ঘোড়া রক্তে মুখ দিয়ে দেখল।
ঘোড়া কখনও রক্ত খায় না
কিন্তু সে দেখেছে সবচেয়ে বেশি রক্ত।
ঘোড়া বলল, তমসো মা জ্যোতির্গময়
রক্তপাত ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না

আর আমরা যারা অশ্ব,
তারা গতি ছাড়া বাঁচতে পারি না।

যে শহরে আমি প্রবেশ করলাম
সেখানে রাস্তার দু'ধারে দ্রাক্ষালতা
দু'ধারে টাইগার গ্রাস
দু'ধারে ফোয়ারা।
একটা ফোয়ারা আমি মুখে নিলাম, কী মিষ্টি জল
একটি দ্রাক্ষা মুখে দিলাম, মুখ ভরে গেল।
কবে আমি তোমার কালো দ্রাক্ষা মুখে নেব?

জন অরণ্য ছুটে এল, আমি বললাম কে তোমাদের রাজা?
অরণ্য বলল, আমাদের রাজা এক্ষুনি মারা গেছেন
তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে।
তুমি বীর, তোমার মতো বীর আমরা আগে দেখিনি।
আমি অবাক হয়ে বললাম, আমি কাউকে হত্যা করিনি তো?

এই যে তুমি পাঁচ মাথার মোড়ে
তরবারি দিয়ে যাঁকে হত্যা করলে তিনি আমাদের রাজা ছিলেন।
আমাদের নিয়ম হল
যে আমাদের রাজাকে মারবে সেই আমাদের রাজা হবে।
আমি যাকে এইমাত্র হত্যা করেছি
তার মুখ মনে পড়ছে না কেন?

অশ্ব বলল, তুমি ভাগ্যবান,
তুমি যাকে হত্যা করবে
তাকে মনে করতে পারবে না।
আমার কি আংশিক স্মৃতিনাশ হল?
আমি তো কাউকে হত্যা করিনি?

যদি আমি করে থাকি হত্যা
কেন কেউ থামাল না অস্ত্র?
মাথায় আগুন লাগে মারতে
কেউ টেনে ধরল না বস্ত্র?

পাপ করে কেন ভুলে গিয়েছি
যে যার নিজের পাপ বইছি
পাথর নিজের থেকে নামছে
যে যার নিজের গ্রহ সইছি।

তোমাকে অমর করে মারছে
এখানে তোমার নেই মৃত্যু
পেরেক সবার হাতে ঢুকছে
মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে একটু।
খিদে পেয়েছিল যার যেখানে
রুটি এনে দিয়েছিল কুটিরে
কী দোষ করেছি আমি বলো না
কাকে দোষ বলে আমি বুঝিরে।

খিদে পেটে ভগবান অন্ন
খিদে পেটে ভগবান মিথ্যে
খরার পরেই অতি বৃষ্টি
মিথ্যে সরিয়ে হয় জিততে।
এ শহর বৃষ্টিতে ধন্য
দু'দিকের নদীদুটো নাব্য
আমি এই শহরের নিয়তি
আবার নতুন করে ভাবব।

কেন রাজা হতে হবে আমাকে
শিশুকাল থেকে শরণার্থী
বাহুবল দিয়ে ফল ফলে না
আমি তোমাদের কৃপাপ্রার্থী।

কেন রাজা হতে হবে আমাকে
তোমরাই হতে পার যোগ্য
রাজা হলে খারাপের সঙ্গে
করে যেতে হয় সব সহ্য।

এতটা খারাপ হতে পারব?
মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন
হতে হতে একদিন বলব
পড়ে থাক কাটা হৃৎপিণ্ড।

এতটা খারাপ হতে পারব?
বৃষ্টিতে ভিজব না রাত্রে
বসন্তে বাজাব না বাঁশরী
বিষ দিতে হবে পানপাত্রে?

যা হবার হয়ে গেছে অতীতে
সুন্দরভাবে চাই বাঁচতে
একজন পেতে দেবে শয্যা
আমি চাই তাকে ভালবাসতে।

চুল খুলে মেঘবতী সে নারী
আমার বুকের ব্যথা মোছাবে
শৈশব ধিকিধিকি জ্বলছে
চোখের ইশারা দিয়ে ঘোচাবে।

ভালবাসা চোখে থাকে যতটা
ভালবাসা তত থাকে ঝিনুকে
আমি আজও ভাল করে বুঝি না
মানুষ মানুষ মারে কী সুখে?

আমি যদি করে থাকি হত্যা
আমাকেও করো তবে হত্যা
আমার ধারণা হল আজকে
ভাল নই আমি এই লোকটা।
আমি কুয়াশাকে বলছি, কুয়াশা তুমি কি কখনও
নারীর চুলের ভেতর হাত দিয়ে
নিজের মুখে হাত দিয়েছ?
আমি কুজ্ঝটিকাকে বলছি, তুমি কি সঙ্গমরত নারীপুরুষকে
ঢেকে দিয়েছিলে শামিয়ানায়?

কুজ্ঝটিকা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি রহস্যের সন্তান
আমি আবছায়ার সহোদরা

আমি কুহেলির মহাবিশ্ব
আমাকে অত সহজ ভাবে নিয়ো না। আমি এক পাত্র জল
কিন্তু বাষ্প হয়ে যখন ধারক পরিত্যাগ করি
তখন আমি বিন্দু
কিন্তু মহাসাগর।

আমাকে দু'পয়সার কুজ্ঝটিকা ভেবে তিন পয়সার কুয়াশাকে
বেশি সুযোগ দেবে, তা আমি হতে দেব না।
আমার ভেতরেও ঈর্ষা আছে
ঈর্ষা আছে সিংহের কেশরে, ঈর্ষা আছে পিঁপড়ের মনে।

সিংহের কামড়ে আমার মৃত্যু হতে পারত
একটা বিরাট মাঠে
আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল সিংহের মুখে
সিংহ গ গ করছিল
কিন্তু থাবা বসাতে চায়নি
সিংহ আমার সুঠাম চেহারা, লৌহ কোমর, বলিষ্ঠ হাত দেখে
গ গ করছিল।

কিন্তু আমি অজগরের মতো তার গলা টিপে ধরলাম
গ গ করছিল
তারপর আমি তার ঘাড়ে বসালাম কামড়
সিংহ মাটিতে পড়ে থাকল
আর রাজা এলেন আমাকে লরেল পরাতে।

তোমরা আমাকে রাজা হতে বলছ?
বাহুবল দিয়ে সিংহকে শাসন করা যায়
মানুষকে করা যায় না।
কুজ্ঝটিকা আমাকে বলল, এসো আমার সঙ্গে
আমি চললাম স্ফটিকের ভেতর দিয়ে।

আমি চললাম দ্রাক্ষাবনের ভেতর দিয়ে
আমি চললাম ধুলোর টানেল দিয়ে
আমি চললাম অন্ধকারে যেটুকু আলো থাকে
সেই আলোর ভেতর দিয়ে
একটা একটা করে নক্ষত্র নিভে যেতে লাগল
আমি চললাম মৃত নক্ষত্রের ভেতর দিয়ে।

কুজ্ঝটিকা বলল, দাঁড়াও, এবার তোমাকে
কুজ্ঝটিকার ভেতর দিয়ে যেতে হবে
আমি যেতে যেতে আবিষ্কার করলাম
মেঘ করে আসছে আমার হৃদয়
কে যেন দাঁড়িয়ে আছে চন্দনের বনে
তার শরীর মেঘ দিয়ে ঢাকা
সেই মেঘ একটু সরে যেতেই
দেখতে পেলাম তার মুখ।

মুখ এত সুন্দর হতে পারে?
বকুলের মতো নিখুঁত
পানপাতার মতো নিরাময়
মরালীর মতো তরঙ্গ
বিদ্যুতের মতো ঠোঁট
কদলীকাণ্ডের মতো গ্রীবা
অগ্নিগোলার মতো স্তন।
আমি কুজ্ঝটিকাকে বললাম, আমাকে মেরে ফেল
এ কোন মানবীর সামনে আমাকে নিয়ে এলে?
যার মুখে একই সঙ্গে খেলা করছে
সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত।

কুজ্ঝটিকা বলল, আমার কাজ ঢেকে রাখা।
আমি ঢাকতে জানি, খুলতে জানি না।
আমি ঢাকতে থাকি
তুমি খুলতে থাকো
এখানেই মানব জাতির সঙ্গে কুজ্ঝটিকার লড়াই।

আমার শরীর চায় বজ্র
আমি চাই বিদ্যুৎ সঙ্গে
আমি যাকে দেখলাম আজকে
তাকে চাই অঙ্গের অঙ্গে।

উচ্ছ্বাসে ছুটে আসে বন্যা
আমার আঙুল পিপাসার্ত
এত সুন্দর আমি দেখিনি
ভালবাসা চলে যেতে পারত।

আমার শরীর চায় বহ্নি
আমার শরীর ওঠে পাহাড়ে
আমার শরীর নামে নদীতে
অগ্নিকে ধরে আনি আহারে।

এত সুন্দর আজ সন্ধ্যা
এত সুন্দর আজ রজনী
গাছে গাছে তারাদের চৈত্র
কেন যে আমাকে আগে আনোনি?

সেই নাকি বৈশাখে বড্ড
তোলপাড় করে দিত মনকে
আকাশে উঠিয়ে দিত ঝরনা
মর্মর দিত নির্জনকে।

ঝড় নাকি সব কথা জানত
এইখানে আমি নাকি আসব
আকাশের সব তারা জ্বলবে
এইখানে আমি ভালবাসব।

এইখানে আমি ভালবাসব
এইখানে আমি হব ধন্য
এইখানে আমি হব ভিখিরি
ভিখিরি যখন হবে বন্য।

তোমাকে ভেতর থেকে চাইছি
তুমি কি ভেতর থেকে চেয়েছ?
আমি যত লেলিহান হচ্ছি
তুমি তত লেলিহান হয়েছ?

টান মেরে খুলে ফেলি কুয়াশা

ধীরে ধীরে খুলি বাজুবন্ধ
দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলি কাঁচুলি
ভালবেসে হতে চাই অন্ধ।
তুমিও তো নিজে হাতে খুলছ
আমার কোমর থেকে অস্ত্র
দাঁড়াও আসুক আগে সন্ধ্যা
সূর্য কখন যাবে অস্ত?

সূর্য কখন যাবে অস্ত
জানালা দরজা হবে বন্ধ
কাঞ্চনে ভরে যাবে জঙ্ঘা
ভালবেসে হতে চাই অন্ধ।

ভালবেসে হতে চাই অন্ধ
আমার ভেতরে বাঁধ ভাঙছে
জল আর মানছে না দিব্যি
বন্যা ভেতর থেকে টানছে।

বিশ্বাস করি ভালবাসাকে
খুলে যাক যত আছে রন্ধ্র
জিভে জিভ লেগে সব বন্ধ
ভালবেসে হতে চাই অন্ধ।

তোমাকে যেভাবে আমি চাইছি
তুমি চাও হতে আজ বর্ষা
তুমি চাও হতে আজ বজ্র
ভালবাসা আজও শেষ ভরসা।

তুমি চেয়েছিলে, এল বৃষ্টি
বৃষ্টিতে হলে তুমি নগ্ন
বিন্দুকে করি আমি গণনা
ভগ্নাংশকে করি ভগ্ন।

বৃষ্টিতে তুমি হলে পুণ্য
পুণ্য তখনই হয় কান্না
সঙ্গম হবে পরিপূর্ণ
যখন বলবে তুমি 'আর না'।

উনিশ বছর বাদে কুজ্ঝটিকা এসেছিল। আমি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিই। সে চলে যাচ্ছিল। আমি বলি, দাঁড়াও। একটা কথার উত্তর দিয়ে যাও। তুমি জানতে? তুমি জানতে? তুমি জানতে?

কুজ্ঝটিকা বলল, আমি জানি
আমি জানি না
আমি দেখি
আমি দেখি না
আমি বুঝি
আমি বুঝি না।
আমার কোনও মতামত নেই।

আমি বায়ু নিয়ন্ত্রণ করি না
আমি জল ধারণ করি না
আমি মাটি নিষ্পেষণ করি না
আমি কুমোর নই, কামার নই
আমি কবি নই, কাহিনিকার নই
আমি কারও অন্ন গ্রহণ করি না
আমি কারও রাত্রি শাসন করি না।

আমি বলি দাঁড়াও, কেন তুমি আমাকে বলোনি সেদিন? কেন বলোনি?

কুজ্ঝটিকার কোনও রাগ নেই, তিরস্কার নেই, আস্ফালন নেই, অনুতাপ নেই।

সে বলল
যা ঘটেনি, আমি তাকে ঘটাতে পারি না
যা ঘটেছে, আমি মুছেও দিতে পারি না
আমি শুধু আমার কুয়াশা দিয়ে ঢেকে রাখতে পারি।
কিন্তু যা ঘটেছে তা বাইরে আসবেই
যা ঘটেনি আমি তাকে ঘটাতে পারি না।

ষষ্ঠ সর্গ

'A tiger does not proclaim his tigritude, he pounces'
উওলে সোয়িঙ্কা

কার শরীরে কী ফুল ফোটে কেউ কখনও খোঁজ রাখে না
ফুল ফোটে না যার শরীরে তার শরীরে কেউ থাকে না।

তোমার গাছে ফুল যেমন রোজ ধরে না
শিউলি ফুল টগর ফুলে কাজ করে না।

তুমি যখন নিজেই বলো, ধরো আমার ফুল
করেছি আমি দ্বিতীয়বার মারাত্মক ভুল।

মারাত্মক ভুল না হলে হয় না ভালবাসা
ধ্বংস হয়ে গেলেও থাকে বেঁচে থাকার আশা।

আমি সেনাপতির ক্রীতদাস। কিন্তু আমার কাজ সেনাপতির সঙ্গে নয়। তার উপপত্নীর সঙ্গে। খুব একটা বড় কাজ নয়। আমার কাজ উপপত্নীর পায়ের আঙুল পরিষ্কার করে দেওয়া। হাতের আঙুলে নখ বড় হলে সুন্দর করে কেটে দেওয়া। আর একটা কাজ কাজল তোলা। কাজল বানিয়ে কোনও কোনওদিন কাজল পরিয়ে দিতে হয়। একদিন আমার হাত পা বেঁধে ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়ে অনেক দ্বীপপুঞ্জ পার করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। আমাকে একা নয়। আমার মতো অনেককে। আমরা কেউ আসতে চাইনি। আগে আমি ঘাড়ে করে পাথর তুলে আনতাম নদীর জল থেকে। এখন আমাকে আর পাথর তুলতে হয় না। কাজল বানাতে হয়।

পাথর তুলে আনতে হত নদীর তলা থেকে
আমি এখন নদীর কথা জানি

প্রাসাদ হত পাহাড় জুড়ে প্রাসাদ হত বড়
আমি এখন পাখির কথা জানি

প্রাসাদে হত রানি বদল, বিরল বিলাসিতা

আমি এখন গাছের কথা জানি

আমি ছিলাম পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দাস
আমি এদের অসভ্যতা জানি

আমি যখন কাদায় ডুবে পাথর তুলে আনি
আমি তখন নিজেই কালো পাথর
আমার ঊরু ঝলসে ওঠে পাথরে ঘষা লেগে
আমি এদের বিপন্নতা জানি।

এদের হাতে অনেক জোর অনেক লোকজন
আমি এদের অক্ষমতা জানি।

এত পেয়েও কেন যে এরা আরও অনেক চায়
আমি এদের সন্ধ্যাগুলো জানি।

বাইরে ঠাঁই দাঁড়াতে হত কেউ না এসে পড়ে
আমি এদের রাত্রিগুলো জানি।

এক রানিমা লুকিয়ে এনে মাংস খেতে দিত
আমি এদের কান্নাগুলো জানি।

কান্না হয় মধুর যদি বিষণ্ণতা থাকে
আমি এদের নৃশংসতা জানি।

*

আমাকে লোকে বলে দুর্নিবার আমি
আমার চোখদুটো অকুতোভয়
পাথর তুলে তুলে অতিমানব আমি
আমার কাঁধে অমাবস্যা হয়।

আমার দুই ঊরু করে অহঙ্কার
পায়ের গোড়ালিতে লোহার দাগ
বন্দি হয়ে আমি এসেছিলাম বলে
জানে না এরা ক্রীতদাসের রাগ।

আমার দুটো চোখ অগ্নি লেগে লাল
পাথর ভেঙে করি পাথরদানি
এখনও ভালবাসি ঝরাপাতার পথ
অরণ্যের চেয়ে অরণ্যানি।

করিনি বিদ্রোহ, কেন করিনি জানো?
করব কাকে নিয়ে কী ভরসায়
আমার আগে কেউ বোঝেনি কোনওদিন
মানুষ কেনা যায় দু'পয়সায়?

আমাকে কিনে এনে গাছের গায়ে বেঁধে
প্রথমে রেখে দিত বৃষ্টিতে
আমি যে ক্রীতদাস তা নাকি বোঝা যেত
আমার বিহ্বল দৃষ্টিতে।

কিন্তু ওরা অত বুঝতে পারত না
আমাকে জ্বালাত যে হোমশিখা

আমার মধ্যে যে মাতৃভাষা কাঁদে
আমার মধ্যে যে আফ্রিকা।

আমার কাজ ছিল পাথর তুলে আনা
পাথর তুলে আনা সহজ নয়
তুলতে হত বলে তুলেছি রাত জেগে
মৃত্যভয় ছিল, মৃত্যুভয়।

আমার মধ্যে যে কাঁদছে আফ্রিকা
আমার মধ্যে যে ক্ষিপ্রতা
আমার মধ্যে যে দেশের বাড়ি কাঁদে
বলতে চাই অস্পৃশ্যতা।

কেউ কোথাও নেই মাতৃভাষা শোনে
কেউ কি শোনে নাকি আমার গান
পাথর তুলে আনি নরক থেকে আমি
আমার নরকেই অবস্থান।

ভাগ্য খুলে গেল হঠাৎ একদিন
ভাগ্য খুলে গেল পূর্ণিমায়
একটি অপরূপা তরুণী যাচ্ছিল
আমাকে দেখে একা দাঁড়িয়ে যায়।

আমাকে ভাল করে প্রদক্ষিণ করে
জানতে চাইছিল আমার নাম
আমার নাম নেই, আমি তো নশ্বর
হারানো দেশ আমি, হারানো গ্রাম।

আমার সবটাই মুছে ফেলেছে ওরা
থাকতে নেই কোনও দুঃখ সুখ
ধারালো খুর দিয়ে যেমন মোছা হয়
হেরে যাওয়া কোনও রাজার মুখ।

আমাকে ভাল করে প্রদক্ষিণ করে
ভ্রুপল্লব তুলে মেয়েটি বলে
কী কথা বলেছিল, জানি না, সেইদিন
মেয়েটি চলে যায় সদলবলে।

কিন্তু ফিরে আসে বাতাসে দক্ষিণ
রাজার বাড়ি থেকে সেনাপতি
বলল, 'আজ থেকে এখানে কাজ শেষ
চলো, না গেলে হবে শেষ ক্ষতি'।

সূর্য ওঠে রোজ তাতে আমার কী
জ্যোৎস্না জ্যোৎস্নার মতো আসে
আমার স্মৃতি থেকে মুছে দিয়েছ দেশ
কে থাকে দুর্যোগে কার পাশে?

আমাকে নিয়ে এল পরিখা দিয়ে ঘেরা
একটি দুর্গের চিলেকোঠায়
সেনাপতির উপপত্নী ডাকলেই
রাখতে হবে মনে আমি কোথায়।

ওই তরুণী এসে বলল, ক্রীতদাস

দেখো তো পায়ে বড় হয়েছে নখ
একটু কেটে দেবে পরিষ্কার করে?
কেটে দিলাম নখ, এঁকে দিলাম চোখ

চোখের ধার দিয়ে কাজল দিয়ে দিয়ে
নতুন করে আমি দৃষ্টি দিই
তরুণী আয়নায় নিজেকে দেখে বলে
নতুন করে যেন বৃষ্টি দিই।

আবার সাতদিন পরে সে এসে বলে
আমাকে চোখ দাও হে কারিগর
আমার পায়ে দাও নতুন পল্লব
দারুণ হবে, চলো আমার ঘর।

বিপদ ওত পেতে এখানে বসেছিল
আমার কাজ হল নকশা তোলা
এসেছি কাজ করে নিজের ঘরে যাব
কে দিল তরুণীর কোমরে দোলা।

পরের দিন থেকে কোমর বন্ধনী
আমার পৌরুষে পড়ল চাবি
কার কী আসে যায় আমার চিন্তায়
আমাকে নিয়ে যদি আমি না ভাবি?

এখানে এই দেশে সবার ঘরে ঘরে
ললাটে দেখি আমি রাজটিকা
আমার জন্য যে আলাদা ঘটি বাটি
আমার মধ্যে যে আফ্রিকা।

আমার কালো ত্বক আমার কালো চুল
আমার কালো বুক কালো তিল
নিগ্রো বলে এরা, যেন মানুষ নই
আমাকে ডেকে যায় গাঙচিল।

সেনাপতির উপপত্নী চায় রূপ
পরপুরুষ হবে অসাধারণ
সেনাপতির উপপত্নী চায় যশ
শুনতে চায় না সে কোনও বারণ।

নিজের রূপ নিজে অবশ হয়ে থাকে
উপচে পড়ে তার যৌনতা
আমি যখন তাকে পরিষ্কার করি
সে যেন হয়ে ওঠে রূপকথা।

হঠাৎ একদিন আমার ঠোঁটে ঠোঁট
বসিয়ে বলে, নাও, আমাকে নাও
আমি অবাক হয়ে হতচকিত হয়ে
বলি আমাকে দাও, আমাকে দাও।

আমাকে বহুদিন দেয়নি কেউ কিছু
মাথা আনত করে কেটেছে দিন
আমার ঠোঁটে কেউ করেনি চুম্বন
কারওর কাছে নেই আমার ঋণ।

তুমি সেনাপতির আসল রক্ষিতা
তোমার মতো নেই সুন্দরী
তুমি আমার কাছে কী চাও নিষ্ঠুর
কলঙ্ককে আমি গুণ ধরি।

নিষ্ঠুরতা চাই, নিষ্ঠুরতা মদ
যে মদ আমি একা করব পান
তোমার কণ্ঠায় তোমার পাঁজরায়
তোমার উরুদ্বয়ে করব স্নান।

তখন আমি বলি তুমি কি দেখছ না
আমার পৌরুষে তালা পরানো
সেনাপতির ঘরে লুকনো আছে চাবি
চাবির গায়ে আছে সুতো জড়ানো।

সে সুতো খোলা খুব সহজ কথা নয়
সে সুতো দৈবের অহঙ্কার
আমাকে দুর্গের দেয়ালে চেপে ধরে
দেখায় চাবিটিকে চমৎকার।

কী করে পেলে তুমি কী করে পেলে চাবি
কী করে খুলে গেল জড়ানো সুতো?
এসব প্রশ্নের একটি উত্তর
আমরা নিজেরাই উপদ্রুত।

অবাক হয়ে দেখি আমার তালা খুলে
হাসছ তুমি যেন কী ঝিলমিল
আমার পৌরুষ শক্ত হয়ে ওঠে
হাসছ তুমি যেন হাসি মিছিল।

আমার পৌরুষ প্রথম হাতে নিলে
হাতেও শোনা যায় বন্যাডাক
এবার মুখে নিলে, নিলে গলার কাছে
গলায় পৌরুষ আটকে যাক।

অবাক হয়ে দেখি তোমার সারা গায়ে
তারার পর শুধু তারার গ্রাম
ধ্রুবতারায় ঢাকা তোমার নাভিমূল
সেখানে রেখে যাই আমার নাম।

যদি এখন আসে সেনাপতির লোক
লুকিয়ে থাকে যদি গুপ্তচর
আমাকে মেরে ফেলে রাজার লোকজন
বন্ধ হবে চিরবন্ধ ঘর।

এবার সুন্দরী আমাকে বলে শোনো
‘তোমার মতো নেই কারও শরীর
নিষ্ঠুরতাময় আদর ঝলসানো
এখানে বোঝা যায় কে কত বীর’।

আমার কালো পিঠ আমার কালো হাত
আমাকে বলা হয় নিগ্রো
মেয়েটি হেসে বলে নিগ্রো দেখে হয়

আমার ভালবাসা তীব্র।

হাসতে নেই হাসি এখন এ সময়
স্পর্শ এসময় স্পর্শাতীত
হাসতে নেই হাসি কাঁদতে নেই হাসি
বিলীন হয়ে যায় গ্রীষ্ম শীত।

গুপ্তচর বলল, হে সেনাপতি, আমি আপনার ক্রীতদাসকে আপনার ঘর থেকে চাবি নিতে দেখেছি। এই ক্রীতদাসকে আপনি দা দিয়ে কেটে, খণ্ড করে ভূমধ্যসাগরে ফেলে দিন। সেনাপতি বললেন, হে গুপ্তচর, আপনি এই বীরভোগ্যা দেশের অতি বিশ্বাসী একজন গুপ্তচর। আপনি বিদ্বজ্জন। আপনি আমাকে সর্বসমক্ষে বলুন, তারপর কী হল।

আপনার সুন্দরী উপপত্নী নিজঘরে প্যাপিরাস-পুঁথি পাঠ করছিলেন। সে সময় আপনার ক্রীতদাস চড়াও হয় দেবীর ওপর। তারপর বলপূর্বক তাঁকে ধর্ষণ করে। সেনাপতি এক রাত্রি সময় দিলেন ক্রীতদাসকে। কাল তাঁকে দ্বিপ্রহরে গাছের সঙ্গে বাঁধা হবে। তারপর দুটো বাজপাখি দিয়ে খাওয়ানো হবে। এই নির্দেশ দিয়ে সেনাপতি তাঁর নতুন লুণ্ঠিত এক ককেশীয় নারীর কাছে চললেন।

রাত্রে সবাই যখন নিদ্রামগ্ন, তখন সেনাপতির উপপত্নী প্রহরীকে মোহর ঘুষ দিয়ে ক্রীতদাসের ঘরে এলেন। খুলে ফেললেন বাঁধন, চলো আমরা পালাই। যে করে হোক পালাই। সূর্য ওঠার আগে আমাদের দেশের বাইরে চলে যেতে হবে।

নৌকো খুলে আমি তোমাকে তুলে নিই
আমরা নৌকোয় উঠে পড়ি
তুমি কি সব সুখ জলাঞ্জলি দিলে?
এভাবে ভাসে কোনও সুন্দরী?

ভাসতে থাকি আমি ভাসতে থাক তুমি
ভাসতে থাকে দেশ দেশান্তর
এভাবে ভাসি যেন দু'জনে ভেসে যাই
একটা যুগ থেকে যুগান্তর।

কাল কি খেতে পাব? খাবারজল পাব?
এসব ভাবনার সময় কই
আকাশ ভেসে যায় বাতাস ভেসে যায়
মৃত্যু হলে হবে এ নৌকোয়।

তুমি তখন বলো, 'যদি ধরাও পড়ি
মৃত্যু যদি থাকে এ জলপথে
বরণ করে নেব সে মৃত্যুকে আমি
চাই না ফিরে যেতে রাজার রথে'।

'অনেকদিন থেকে কলঙ্কের দাগ
সহ্য করে আমি বেঁচেছিলাম
আমার সেনাপতি মারত রাতে ফিরে
আজকে আমি প্রতিশোধ নিলাম'।

'আজকে আমাদের নৌকো ভাসমান
তারচে বেশি আমি ভাসতে চাই
তোমার পৌরুষ আমার স্তনে নিয়ে
বারংবার আমি বাঁচতে চাই'।
'আমার অর্ধেক বাসনা ছিল মৃত
আমার অর্ধেক কামনাহীন
আমার অর্ধেক কখনও যদি ফেরে
তোমার পৌরুষ হোক নবীন'।
'আমার অর্ধেকে জ্যোৎস্না পড়ে রাতে
আমার অর্ধেকে বৃষ্টিপাত
তোমার পৌরুষে আমার ভেজা ঠোঁটে
ভিজতে গিয়ে করি দৃষ্টিপাত'।

'দৃষ্টিপাত করি তোমার কামনায়
দৃষ্টিপাত করি তোমার ঝড়ে
ভুলতে চাই আমি অতীত আজ
অতীত মাথা কুটে নিজেই মরে'।

'আমার অর্ধেকে বৃষ্টি ঝরে পড়ে
আমার অর্ধেক মরুৎময়
তোমাকে হাতে নিই তোমাকে মুখে নিই
আমার সঙ্গম নৌকো হয়'।

'আজ যেমন করে আকাশ চাইছিল
আমার সারা গায়ে আলো ছড়াতে
তেমনি করে আমি চাইছি তোমাকেও
আমার কামনায় গ্রীবা জড়াতে'।

'অনেকবার আমি চাইছি সঙ্গম
অনেকবার আমি ভাসতে চাই
নিগ্রো শরীরের অবাধ স্পন্দনে
অনেকবার আমি কাঁদতে চাই'।

'আনন্দের থেকে উৎসারিত হয়
আনন্দের যত কান্না রোল
যৌনতার কাছে হয়েছি হয়রান
হয়রানিতে জাগে কী হিল্লোল'।

নৌকো ভেসে চলে সূর্য ঢলে পড়ে
আমিও ঢলে পড়ি তোমার বুকে
আকাশে চাঁদ ওঠে আমরা উঠি চাঁদে
চাঁদকে নিয়ে নামি অবাধ সুখে।

কিন্তু সুখ কারও থাকে না বেশিদিন
রাজার সৈন্যরা উঠে দাঁড়ায়
অতল জল থেকে জলের তলা থেকে
সকালবেলা তারা হাত বাড়ায়।

একটা করে হাত ছিন্ন করি জলে
ভাসতে থাকে জলে রক্তময়
যুদ্ধ জলে জলে, ভেবেছিলাম আমি
রাজার সৈন্যরা শক্ত হয়।

যুদ্ধে আমি চাই যুদ্ধ জয়
যুদ্ধে আমি আজও অকুতোভয়
যুদ্ধে আমি চাই যুদ্ধজয়
আমার ভালবাসা যে অক্ষয়।

যুদ্ধে আমি চাই যুদ্ধজয়
আমার প্রতিশোধ গর্জে ওঠে আজ
যত পাথর আমি তুলেছি এতদিন
তারা আমার গায়ে যুদ্ধসাজ।
এখানে জল হল রক্তে লাল
এগিয়ে এসে দেখি জল সুনীল
সুনীল জল হল আবার লাল
রক্তে ভাসে খাল, পদ্মবিল।

আবার চাঁদ ওঠে আমরা উঠি চাঁদে
আমরা সঙ্গম করি আবার
যুদ্ধ থাকবেই যুদ্ধ আসবেই
যুদ্ধে আয়ু বাড়ে ভালবাসার।

আমরা ভেসে চলি নৌকো ভেসে চলে
দু'পাশে ভেসে চলে গ্রাম নগর
তোমার নামে হবে আমার নামে হবে
দু'পাড় জুড়ে হবে নতুন ভোর।

*

এত দিন আমি সহ্য করেছি ঘৃণা
আজকে বলছি আমি আর পারছি না।

এত দিন আমি লজ্জা লুকিয়ে আছি
মানুষ জানে না কী করে আমরা বাঁচি।

এতদিন ছিল আকোমর বন্ধনী
লাল হয়ে যেত আমার চোখের মণি।

এত ঔরস আমার শরীরে আছে
যতটা পুরুষ রেখেছ আমার কাছে।

আমার ভেতরে আটকে রেখেছি লাভা
ওঠেনি সূর্য, ওঠে সূর্যের আভা।

ফাল্গুন ছাড়া আসে কি চৈত্রমাস?
আমি যে ছিলাম এতদিন ক্রীতদাস

বসন্তে কেন ধরে না আমার ফুল
বসন্তে যেন আমার না হয় ভুল।

বসন্তে যেন খারাপ না করে মন
কাঁদে না আমার উইলো গাছের বন।

আমি তো মানুষ, আমি নই ক্রীতদাস
নিষ্ঠুরতাই মানুষের ইতিহাস।

নির্জনে আমি লেলিহান হয়ে উঠি
কী দোষ আমার? জানি না আমার ত্রুটি।

আমি ক্রীতদাস এটাই কি পরিচয়?
ভয় পেলে ভয় বারবার পেতে হয়?

আজকে আমার পৌরুষ গেছে খুলে
আমরা দু'জনে ভেসে চলি পাল তুলে।

আমরা দু'জন দুই মহাদেশে থাকি
ভালবাসা দিয়ে মহাদেশ ধরে রাখি।

উপসংহার

আমার কাহিনি ছিল একটা
তাকে ঘিরে ধরে বহু গল্প
উপসংহার বলে কম কী!
অল্প কখনও নয় অল্প।

অশোকবনের রাজা দুঃখী
সেও হতে পারে সন্ত্রান্ত
সে চায় নারীর চোখে বাঁচতে
আমরা কি থেকে যাব ভ্রান্ত?
ঈর্ষায় ডোবে রথচক্র
ঈর্ষায় ভালবাসা বহ্নি
ভালবাসা আজও বিয়োগান্ত
আমরা চলেছি কেটে দণ্ডি।

আমার কাহিনি ছিল একটা
একটাই দিঘি ছিল উৎস
মানুষ এখনও ভাল বোঝে না
প্রেম ছাড়া এ জীবন তুচ্ছ।

ক্রীতদাস হতে পারে বন্দি
গান গায় তবু তার আত্মা
কাকে ভালবাসা বলে রাত্রে
যদি না ছাড়াতে পার মাত্রা?

আমার কাহিনি ছিল একটা
নৌকোতে উঠেছিল দস্যু
সে সময় চাঁদ ওঠে আকাশে
চাঁদটাকে মনে হয় অশ্রু।

ভালবাসা সব্বার জন্য
তবু ভালবাসা থাকে আড়ালে
বাঘ এসেছিল খেতে আমাকে
ভাগ্যিস তুমি এসে দাঁড়ালে।

তুমি এসে খুলে দিলে দরজা
ভালবাসা খুলে দিল ভাণ্ড
ঘাসের মাথায় এক বিন্দু
সেটাই আমার ব্রহ্মাণ্ড।
শেষ হয়ে গেল শেষ কাহিনি
ভালবেসে আমি উদ্‌ভ্রান্ত
ভালবাসা এখানেই শেষ না
কেউ না জানুক, কবি জানত।

ভালবাসা দিয়ে ধরে রাখতে

আমি তো করেছি তার চেষ্টা
কাহিনিকে হবে ফিরে আসতে
শুরু থেকে শুরু হয় শেষটা।

কেন এত সারাদিন ভাবছি
হতে হবে আমাদের ধ্বংস
ভালবেসে জ্বলে মরি, তবু তো
আমরা যে যার পোড়া অংশ।

চুম্বন করেছিল একটি
একটিই ছিল অনবদ্য
ভালবাসা নয় গণনাট্য
এ রজনী শেষ নয় অদ্য।

লেখা হতে পারে নাকি আজকে
আধুনিক কালে মহাকাব্য?
সে-কথা দু'জন মিলে রাত্রে
সোমরস পান করে ভাবব।
আমরা এখন হব নগ্ন
আমি কি তোমার আজও যোগ্য?
তুমি বলো, 'শোনো এক বাক্যে
ভালবাসা ছাড়া নই ভোগ্য'।

লেখা হতে পারে আসমুদ্র
লেখা হতে পারে গগনেন্দ্র
যে লেখাই লিখি আমি আজকে
ভালবাসা আমাদের কেন্দ্র।

ওঁ স্বাহা, ওঁ স্বহা, সন্ধ্যা
ওঁ স্বাহা, ওঁ স্বাহা, রাত্রি
অসুখের থেকে চাই মুক্তি
ভালবাসা পৃথিবীর ধাত্রী।

অঙ্কন: সুব্রত চৌধুরী

শেষ না হওয়া ঘর

প্রচেত গুপ্ত
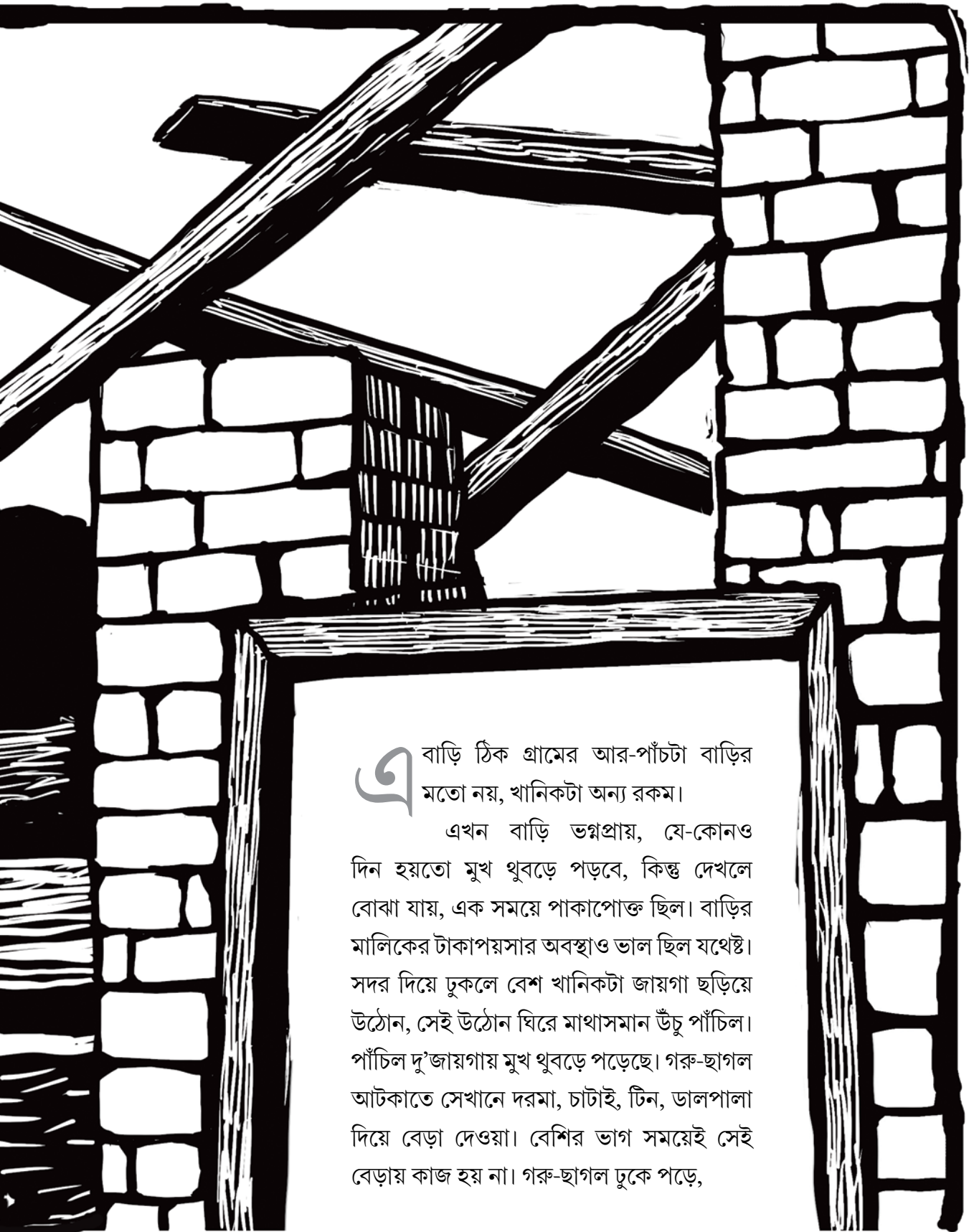
এ বাড়ি ঠিক গ্রামের আর-পাঁচটা বাড়ির মতো নয়, খানিকটা অন্য রকম।

এখন বাড়ি ভগ্নপ্রায়, যে-কোনও দিন হয়তো মুখ থুবড়ে পড়বে, কিন্তু দেখলে বোঝা যায়, এক সময়ে পাকাপোক্ত ছিল। বাড়ির মালিকের টাকাপয়সার অবস্থাও ভাল ছিল যথেষ্ট। সদর দিয়ে ঢুকলে বেশ খানিকটা জায়গা ছড়িয়ে উঠোন, সেই উঠোন ঘিরে মাথাসমান উঁচু পাঁচিল। পাঁচিল দু'জায়গায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। গরু-ছাগল আটকাতে সেখানে দরমা, চাটাই, টিন, ডালপালা দিয়ে বেড়া দেওয়া। বেশির ভাগ সময়েই সেই বেড়ায় কাজ হয় না। গরু-ছাগল ঢুকে পড়ে,

মানুষও ঢোকার চেষ্টা করে। তবে সে বেশি রাতের দিকে। ঢোকার কারণ দুটো। এক,আগলহীন বাড়ি থেকে টুকিটাকি যদি কিছু চুরি করা যায়। আর দ্বিতীয় কারণ হল, এ বাড়ির অল্পবয়সি গৃহকর্ত্রী। সে পুরুষের জন্য বেশি আকর্ষণীয়। উঁকিঝুঁকি দিয়ে যদি অগোছালো অবস্থায় তাকে দেখা যায়, যদি কোনও ইঙ্গিতে সাড়া দেয় সেই মেয়ে। বাড়ির একমাত্র পূর্ণবয়স্ক পুরুষমানুষ নন্দগোপাল, শেষ রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। তার কান খাড়া। বেড়া সরানোর আওয়াজ পেলে শ্লেষ্মাভরা গলায় হাঁক পাড়ে, "কে? কে রে? কোন শুয়ারের বাচ্চা বাড়ি ঢুকিস?"

যে ঢোকার চেষ্টা করে, তার বিয়াল্লিশ বছরের নন্দগোপালকে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই, নন্দগোপাল উঠে তাকে তাড়া করতে পারবে না, কিন্তু তার পরও সে ভয় পেয়ে থমকে যায়। নন্দগোপাল থমকায় না, চিৎকার করতে থাকে, "কে? কোন শুয়ারের বাচ্চা বাড়ি ঢুকিস?"

উঠোনের এক পাশে খড়ের চাল দেওয়া গোয়াল, উল্টো দিকে রান্নাঘর। গোয়াল শূন্য তো বটেই, ঝড়-জলে একটা পাশ ভেঙে পড়েছে। উঠোনের এক দিকে কুয়ো। দাওয়ায় উঠতে এক ধাপ সিঁড়ি। লম্বা দাওয়ার পাশে পরপর তিনটে ঘর। দুটো চালু, একটা বাতিল জিনিসে ঠাসা। সেই জিনিসের মধ্যে ভাঙা কাচ, কাঠ, লাঙল, বস্তা রয়েছে। ঘরটা ছোট হলেও, এক কালে অতিথি এলে ব্যবহার হত। পিছনের জানলা খুলে দেওয়া হত। সেই জানলায় অনেক দিন হল, আড়াআড়ি কাঠ লেগেছে। খোলা যায় না। মূল বাড়ির দেওয়াল পাকা হলেও, ছাদ টালি আর টিনের। ঘরবাড়ি এখানেই শেষ নয়। ভিতরবাড়ির পিছনে এক ফালি জমি ছিল, সেই জমিতেও ঘর হয়েছে। ঘর নয়, ঘরের কাঠামো বলাই ঠিক। ইট, বালি, সিমেন্ট দিয়ে অনেকটা খাড়া করা। মাথায় আধখানা ছাদ। দরজা-জানলাও হয়নি, কাঠের ফ্রেম নিয়ে উলঙ্গ হয়ে পড়ে রয়েছে। বোঝা যায়, ঘর তৈরি হতে হতে থমকে গিয়েছে। এই ঘরের মালিকের শখ ছিল, আধখানা ছাদেও ফ্রেম দিয়ে বড় কাচ লাগানো হবে। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে মনে হবে, খোলা আকাশের নীচে শুয়ে রয়েছি। দরজা-জানলাতেও বসবে কাচ। রোদ, বৃষ্টি, জ্যোৎস্নায় ঘর ভেসে যাবে। কাজটা কঠিন ছিল। পাড়াগাঁয়ে এ রকম বাহারি কাজ কে করবে? শুধু কাচ লাগিয়ে দিলেই তো হবে না, পাকাপোক্তও করতে হবে। কাজ কতটা কঠিন, পরীক্ষা করতে গঞ্জ থেকে মিস্ত্রি ডাকা হল। সে ভ্যানরিকশায় কয়েক খণ্ড কাচ, খড়ে মুড়ে নিয়ে হাজির হল এক সকালে। জানলায় সেই কাচ লাগানো হল বিস্তর কসরত করে। মুখে 'সব পারি' ধরনের ভাব থাকলেও, সেই মিস্ত্রি একেবারেই দক্ষ ছিল না, অত বড় কাচকে জানলার ফ্রেমের সঙ্গে বাঁধার কারিকুরি তার জানা ছিল না। ফলে যা ঘটার তা-ই হল। রাতের ঝোড়ো হাওয়ায় কাচ জানলা থেকে খুলে মুখ থুবড়ে পড়ল বাড়ির পিছনে। বাড়ির মালিক চিন্তিত হলেন। তবে কি তিনি যে রকম ভেবেছেন, সে রকম করা যাবে না? মুখে মুখে এই ঘরের নাম হয়ে গেল, 'শেষ না হওয়া ঘর'। নাম বড়, তাও এমনই পরিচয় হল।

শেষ না হওয়া ঘর অসম্পূর্ণ, আগলহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে দীর্ঘ দিন। মেঝেয় আগাছা, দেওয়ালে শ্যাওলা। সাপখোপের আস্তানা হয়ে গেলে কখনও পরিষ্কার হয়, কখনও হয় না। এই ঘর শেষ করা হয়নি, আবার ভেঙে ফেলাও যায়নি। ঘরের পিছনে গল্প রয়েছে। সেই গল্প আশ্চর্যের এবং বেদনার।

ঘর তৈরিতে হাত দিয়েছিলেন মানিনীর শ্বশুরমশাই ব্রজগোপাল। এই বাড়ির মালিক ছিলেন তিনি। শহুরে ঘরের শখ হয়েছিল। ঠিক করলেন, কাচে মোড়া ঘর বানাবেন বাড়ির বাইরে। পিছনের মজা পুকুরটা লিজ় নিয়ে সংস্কার করাবেন। পুকুরের মালিকের সঙ্গে কথাও হল। সেখানে মাছ চাষ হবে। সপ্তাহে এক-দু'দিন কাচের ঘরে বসে পুকুর থেকে তোলা মাছ ভেজে বিলিতি মদ খাবেন, আর জানলা দিয়ে আকাশ, গাছপালা, পুকুরের জল দেখবেন। ঘরে লাগাবেন টিমে আলো। গরমের রাতে হু হু বাতাস বইবে, বৃষ্টিতে জলের ছাট ঢুকে ঘর ভেসে যাবে। বিলিতি মদ আসবে গঞ্জ থেকে। সেখানে তখন দোকান হয়ে গিয়েছে। তারা দিশির সঙ্গে বিলিতি জিনিসও রাখছে। আগে এ সব আনতে মন্তেশ্বর পর্যন্ত যেতে হত। এখন হাতের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, আরও কাছে চলে আসবে। এলে ভাল। দিশি মদ ব্রজগোপালের মুখে আর রোচে না। শরীরও নিতে চায় না। বয়স হচ্ছে। যদিও পান করেন কালেভদ্রে, তবে যে দিন করেন, হুঁশ থাকে না। ভাল নেশা করতে আয়োজন লাগে। সেই আয়োজনেরই একটা ভাবনা ছিল বাড়ির পিছনের কাচের ঘর। বাড়িতে থাকা হল, আবার থাকাও হল না। সকলের থেকে আলাদা, সব কিছু থেকে আলাদা। নিজের সঙ্গে একা থাকার ব্যবস্থা। ব্রজগোপালের বয়স তখন বাহান্ন-তিপান্নর মাঝখান দিয়ে ছুটছিল।এই বয়সে পুরুষমানুষের মন, শরীর দুই-ই ছোটে। কে জানে, হয়তো দৌড়শেষের দড়ি ছোঁবে বলে তাড়াহুড়ো করে।

কাচ ভাঙার পর, আবার নতুন করে মিস্ত্রির খোঁজ শুরু করলেন ব্রজগোপাল। তবে এ বার আর কাছাকাছি নয়, একেবারে কলকাতা থেকে লোক আনা হবে। সকলেই বলল, "সে তো অনেক খরচের ব্যাপার।"

ব্রজগোপাল বললেন, "সে তো বটেই। তবে শখের জন্য খরচকে খরচ বলে না, মনের মতো বাঁচা বলে। তা ছাড়া 'শেষ না হওয়া ঘর' শুনতেও বিশ্রী লাগে। ঘর শেষ করে ওই নাম মুছতে হবে।"

মিস্ত্রির খোঁজ পাওয়া গেল, কাজের দিনক্ষণও ঠিক হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজ হল না। এক সন্ধেয় ব্রজগোপালের জীবনে অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল।

সেটা ছিল শ্রাবণ মাসের সন্ধে। বৃষ্টি শুরু হয়েছিল সকাল থেকে। সারা দিন ঝুপঝুপ করে পড়েই চলেছে এক নাগাড়ে। সন্ধেয় ক্লান্ত হয়ে ধরে এল এবং শেষ পর্যন্ত এক সময় থমকাল। শুধু গাছের পাতা থেকে জল ঝরে পড়ার টুপটাপ আওয়াজ। গ্রামে গাছপালা এত বেশি যে, অভ্যেস না থাকলে এই আওয়াজে ভ্রম হয়। মনে হয়, বৃষ্টি এখনও পড়ছে। তখনও কামরাঙায় ইলেকট্রিক লাইন আসেনি। পোস্ট বসেছে মাত্র। চারপাশ অন্ধকার, ভেজা। শিরশিরে বাতাস বইছে। লুঙ্গি, ফতুয়ার ওপর একটা পাতলা চাদর জড়িয়ে নিলেন ব্রজগোপাল। আলমারি থেকে বোতল বের করলেন। মাদুর নিলেন।

বিভা বললেন, "কোথায় যান?"

ব্রজগোপাল স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে বললেন, "বাইরের ঘরে।"

বিভা ভয় পাওয়া গলায় বললেন, "এই বাদলা দিনে ওই ঘরে যায়েন না, সাপখোপ থাকবে।"

ব্রজগোপাল বিরক্ত গলায় বললেন, "আহ্, এত কথা বলো কেন? গ্লাস আর জল দাও। বাটিতে ছোলা-লঙ্কা দাও।"

বিভা জলের জগ, ছোলা-লঙ্কার বাটি নিয়ে আসেন। ব্রজগোপাল হাত বাড়ালে মাথা নামিয়ে বলেন, "দেন, আমি রেখে আসি। মাদুরটা আমাকে দেন।"

ব্রজগোপাল বলেন, "তোমাকে যেতে হবে না। আমিই পারব।"

ব্রজগোপাল ওই ঘরে বাড়ির আর কারও যাতায়াত পছন্দ করতেন না। মুখে না বললেও, হাবেভাবে বুঝিয়ে দিতেন।

বিভা বললেন, "হ্যারিকেনটা নিয়ে যান।"

ব্রজগোপাল বললেন, "না, আলো লাগবে না।"

বিভা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। স্বামীর চেয়ে তাঁর বয়স অনেকটাই কম। এত কম যে, বিয়ে হওয়ার কথা নয়। তার পরেও হয়েছে। রোগা চেহারা, ময়লা রং, বাবা হতদরিদ্র হলে মেয়ের বিয়েতে ছেলের বয়স বিচার করা চলে না। তবে বিয়ের পর বিভার কখনও মনে হয়নি, বিয়ে ভুল হয়েছে। বরং উল্টো। কিছু দিন পরেই বুঝেছেন, বয়সে বড় হলেও তার স্বামী মানুষটি ভাল। রাগী, জেদি, নিজের হুকুমই শেষ কথা হওয়া সত্ত্বেও ভিতরে স্নেহ, ভালবাসা, দায়িত্ববোধ রয়েছে। ভিতরের এই নরম মনটা বাইরের কাউকে বুঝতে দেন না। যে-ভয়ে বিয়ের কথা হওয়া থেকে কেঁপেছিলেন বিভা, সেই ভয়টাই নেই। স্ত্রীর শরীরের

জন্য তাঁর স্বামী কোনও দিন জোর-জবরদস্তি করেন না। নিচু গলায় “আজ শরীর ভাল নেই,” বললে শান্ত ভাবে সরে যান। গলা তুলে কথাও বলেন না খুব একটা, তার পরেও বিভা তাঁকে ভয় পান। নাকি এটাও এক রকম ভালবাসা? মেয়েমানুষ এক রকম ভাবে ঘৃণা করে, ভালবাসে নানা ভাবে। সব পদ্ধতি সে নিজেও বুঝতে পারে না।

শ্রাবণের সেই সন্ধেবেলা শেষ না হওয়া ঘরের দিকে রওনা দিলেন ব্রজগোপাল। ছাদবিহীন, আগলবিহীন ঘরে মাদুর পেতে বসলেন গুছিয়ে। মজার ব্যাপার হল, সারা দিন বৃষ্টি ঝরিয়েও, কিছু ক্ষণ পর মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঠে পড়ল নিঃশব্দে। শ্রাবণ মাসের চাঁদের আলোয় জোর কম থাকে, তবে সে দিন কোনও এক রহস্যময় কারণে জ্যোৎস্না হল জোরালো। বৃষ্টিধোওয়া জ্যোৎস্না। সেই আলোয় সাদার চেয়ে নীলের ভাগ বেশি। অসম্পূর্ণ ঘর, চারপাশের গাছপালা, ঝোপঝাড়, পিছনের টইটম্বুর পুকুরে সেই নীল ছড়িয়ে পড়ল। মদ আর চাঁদের আলোয় অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রজগোপাল নেশায় বুঁদ হয়ে পড়লেন। তিনি যতই গোছানো, হিসেবি ব্যবসাদার হোন না কেন, প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে ভিতরে এক ধরনের বিষণ্ণতা লালন করতেন। মাঝে মাঝে সব ভুলে একা হওয়ার ইচ্ছে হয়তো সেখান থেকেই এসেছে। বোতলের শেষটুকু গ্লাসে ঢেলে নিতে নিতে খসখস আওয়াজে মুখ তুললেন ব্রজগোপাল। শাড়ির খসখস।

অম্বরী দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। ব্রজগোপালের প্রথম স্ত্রী। কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ার দু’ঘণ্টার মধ্যে এই মহিলা গঞ্জের হেলথ সেন্টারে মারা যান। রক্তক্ষরণের সমস্যা। জমাট বাঁধছিল না। যে-ওষুধে লড়াই করা যেত, সেই ওষুধ গাঁয়ের হেলথ সেন্টারে পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সদ্যোজাত সন্তানের খোঁজে চারপাশ হাতড়াতে হাতড়াতে তিনি মারা যান।

শেষ না হওয়া ঘরের দরজায় মৃত বৌকে দেখে প্রথমটায় থতমত খেলেন ব্রজগোপাল, তার পর লজ্জা হল। মদ খাচ্ছেন বলে লজ্জা। তাড়াতাড়ি বোতল, গ্লাস লুকোতে গেলেন।

অম্বরী ঘরে পা রেখে নিচু গলায় বললেন, “থাক, সরাতে হবে না। কেমন আছ?”

অম্বরী ছিলেন গ্রামের সবচেয়ে সুন্দরী বৌ। চড়া নয়, স্নিগ্ধ সুন্দরী। গায়ের রং পুরনো কালের বর্ণনায় দুধে-আলতা। চোখ দুটো বড়, মুখ পান পাতার মতো। কোমর ছাপানো চুল। হাসলে বাঁ দিকের গালে টোল পড়ে। গ্রামের মা-কাকিমারা বলতেন, “বাঁ দিকের গালে টোল সুলক্ষণ। এই মেয়ের যন্ত্রণা সহ্যের ক্ষমতা বেশি। বাড়ির বৌয়ের সহ্য করার ক্ষমতা বেশি হলে সংসারে সুখ থাকে।”

প্রবাদ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সন্তান জন্ম দেওয়ার যন্ত্রণা তিনি সহ্য করতে পারেননি।

ব্রজগোপাল লজ্জা পেয়ে হেসে বললেন, “ভাল আছি। তুমি?”

অম্বরী বললেন, “কেকা কেমন আছে? মেয়েটার ঠান্ডা লাগার ধাত।”

ব্রজগোপাল বললেন, “ক’দিন আগে জ্বর হয়েছিল, এখন ভাল আছে।”

অম্বরী বললেন, “বিভাকে বলবে, ওকে যেন রোজ সকালে মধু আর বাসক পাতার রস খাওয়ায়। একটু কুসুম কুসুম গরম জল নেবে। নন্দ কেমন আছে? বিভার ছেলেটি বড় মিষ্টি।”

ব্রজগোপাল বললেন, “এসো অম্বরী, ভিতরে এসো।”

মৃত স্ত্রী ঘরে ঢোকার পর চাঁদের আলোতেই ব্রজগোপাল বুঝতে পারেন, তিনি ভিজেছেন। চুল থেকে জল ঝরছে। শাড়ি-ব্লাউজ়ও ভেজা। মরা মানুষও ভেজে! অম্বরী আঁচল দিয়ে মুখের জল মুছলেন। শাড়িটা ব্রজগোপাল চিনতে পারলেন। এই কমলা রঙের শাড়ি ছিল তাঁর বিশেষ পছন্দের। দু’-এক বার সে কথা তিনি স্ত্রীকে বলেওছিলেন। ব্যথা ওঠার পর যখন ভ্যান ডেকে তাঁকে হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, উঠোন পর্যন্ত নেমেও অম্বরী আবার ঘরে ফিরে যান। ব্রজগোপাল বিরক্ত হয়েছিলেন তাতে।

“আবার ঘরে গেলে কেন? তাড়াতাড়ি চলো, দেখছ না মেঘ করেছে? ঝেঁপে নামল বলে।”

অম্বরী বলেছিলেন, “দাঁড়াও, একটা কাজ আছে।”

অম্বরী শাড়ি বদলে ফিরে এসেছিলেন। তার পর সে দিন, মৃত্যুর এত বছর পর, শেষ না হওয়া ঘরে স্বামীর কাছে ফিরে আসার সময়ও সেই কমলা রঙের শাড়িই পরে ছিলেন অম্বরী।

“এসো, বোসো এখানে,” ব্রজগোপাল সরে গিয়ে মাদুরের এক পাশে অম্বরীকে জায়গা দেন।

অম্বরী বসেন। দু’জনে টুকটাক কথা হয়। ফেলে যাওয়া সংসারের কথা।

“তোমার নতুন বৌ ভাল হয়েছে।”

ব্রজগোপাল কৈফিয়তের ঢঙে বললেন, “কী করব? কেকা তখন ওইটুকু, এক জনের দরকার ছিল...ওকে মানুষ করবে কে? আমি তো কাজে-অকাজে বাইরে বাইরে থাকি...আমি আবার বিয়ে করায় তুমি রাগ করেছ অম্বরী?”

অম্বরী পা গুটিয়ে নিলেন। শাড়ি টেনে গোড়ালি ঢাকলেন। বললেন, “ঠিক করেছ। শুধু মেয়ের নয়, তার বাবারও এক জনের দরকার ছিল। বয়সকালে মেয়েমানুষের যত্ন-সোহাগ লাগে। নতুন বৌ ঘরে ছেলে এনেছে।”

ব্রজগোপাল বলেন, “এ তোমার রাগের কথা নয় তো অম্বরী?”

অম্বরী কোনও জবাব দিলেন না। কপাটবিহীন জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকলেন। জ্যোৎস্নার নীল রং তাঁর মুখে এসে পড়েছে। তাঁকে মনে হচ্ছে এক নীল মানবী, যে এই পৃথিবীর নয়। অসময়ে, অনেক দেখা বাকি রেখে যাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। সে আবার দেখতে এসেছে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে। ব্রজগোপাল অবাক হয়ে দেখলেন, অম্বরী আগের মতোই রূপবতী রয়েছেন। মৃত্যুর পর কি তবে বয়স বাড়ে না? নাকি তাঁর চোখে আগের চেহারাটাই থমকে রয়েছে? তা-ই হবে। এই রূপ তিনি ভুলতে চাননি বলেই, দ্বিতীয় বার বিয়ের সময় পাত্রীর গায়ের রং, চুলের ঢাল খোঁজেননি। বরং উল্টোটাই করেছেন। মেয়ের যেন রূপ না থাকে, তাকে দেখলে যেন অম্বরীর বিকল্প বলে মনে না হয়।

অম্বরী নিচু গলায় বললেন, “গায়ের রং যতই কালো হোক, বিভার মনটা সুন্দর।”

ব্রজগোপাল শান্ত গলায় বললেন, “জানি অম্বরী। তুমি যে নেই, সে কথা কেকাকে বুঝতে দেয় না বিভা।”

“তোমার বৌকে হিংসে হয়।”

ব্রজগোপাল হাসলেন। মৃদু স্বরে বললেন, “আমার কাছে তুমি সবার ওপরে। অমন ভাবে দুম করে চলে গেলে কেন?”

অম্বরী আবার চুপ করে রইলেন। মাথা নামিয়ে বললেন, “কেউ চলে যায় না, সবাই থাকে। মনে হয়, চলে গেছে। আমিও যাইনি।”

ব্রজগোপাল কিছু বলতে গেলেন, কিন্তু অম্বরী মুখ তুলে বললেন, “এই ঘরটা আমার পছন্দ হয়েছে।”

ব্রজগোপাল উৎসাহ নিয়ে বললেন, “সত্যি?”

অম্বরী বললেন, “সত্যি।”

ব্রজগোপাল বললেন, “ঘরটা আরও সুন্দর করে বানাব অম্বরী। ছাদে, জানলায়, দরজায় কাচ বসাব। আলো দেব। পাশে বাগান হবে। দরজা খুলে বাগানে যাওয়া যাবে। একেবারে পুকুর পর্যন্ত বাঁধানো রাস্তা চলে যাবে। পুকুরটা লিজ় নেব ঠিক করেছি। নিজেদের ঘাট করব। এই ঘরে বসে রোদ-বৃষ্টি দেখা যাবে,” একটু থেমে থেমে বলছিলেন ব্রজগোপাল, “ভাল হবে না?”

অম্বরী চাপা গলায় বললেন, “না। এই ঘরে আর কিছু করবে না। তুমি কাচ লাগিয়েছিলে, আমার মনে ধরেনি। এখন যেমন আছে, ঘর তেমনই থাকবে। জানলা, দরজা কিচ্ছু নয়। ঘরের কাজ শেষ হবে না কোনও দিন। সব ঘর শেষ হয় না, সাজানোও হয় না। তোমার এই ঘর হবে সে রকম। শেষ না হওয়া ঘর। আমার জীবনের মতো, তোমারও,

অথবা কে জানে সবার ভিতরেই হয়তো এ রকম একটা ঘর থাকে, যেটা শেষ করা হয় না। এই ঘরটা আমার জন্য থাকবে। শুধু আমার। ইচ্ছে হলে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে, আমি এসে বসব। এই শেষ না হওয়া ঘরে কেউ হাত দেবে না।”

ব্রজগোপাল কিছু বলতে যান। পারেন না। কেমন ঘোরের মতো লাগে। অম্বরী এই ঘর চান! তাঁর ভিতরটা আনন্দে কেঁপে ওঠে। তিনি কল্পনাও করতে পারেননি, মৃত্যুর পর অম্বরী এসে কিছু চাইবেন। তাঁর এত আনন্দ হয় যে, এই বয়সেও চোখে জল চলে আসে। তিনি মুখ ফেরান। পুরুষমানুষের চোখে জল আসা ঠিক নয়, এলেও সে জল কাউকে দেখাতে নেই। এক সময় অম্বরী বলেন, “এ বার চলি।”

ব্রজগোপাল বললেন, “আর একটু থাকো।”

অম্বরী বললেন, “বৃষ্টি আসছে।”

ব্রজগোপাল অস্ফুটে বললেন, “বৃষ্টি কোথায় অম্বরী? মেঘ তো কেটে গেছে।”

অম্বরী যেন হাসলেন। বললেন, “কখন ফের মেঘ জমে যায় কেউ বলতে পারে?” একটু থামেন অম্বরী, বলেন, “একটা কথা বলতে লজ্জা করছে, তাও বলি, তুমি কি আমাকে একটু আদর করে দেবে?”

ব্রজগোপাল বলেন, “অবশ্যই দেব।”

অম্বরী এগিয়ে আসেন। ব্রজগোপাল হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরতে যান। অম্বরী হেসে উঠে দাঁড়ান, “থাক, আজ নয়, আর-একদিন হবে।”

মৃত স্ত্রী চলে যাওয়ার পর দীর্ঘ ক্ষণ থম মেরে বসে রইলেন ব্রজগোপাল। নিজেকে বোঝালেন, এমন কিছু ঘটেনি। মৃত মানুষ কখনও ফিরে আসে না। নেশায় তিনি ভুল দেখেছেন, ভুল শুনেছেন। এই যে এখনও অম্বরীর শরীরের গন্ধ তিনি পাচ্ছেন, সেটা মিথ্যে ছাড়া আর কিছুই নয়। নেশা কেটে গেলে গন্ধও চলে যাবে। জীবনের কিছু অংশে মানুষ আসলে নেশার মধ্যেই বেঁচে থাকে। মদ খেলেও থাকে, না খেলেও থাকে। এই নেশা মানুষকে তাড়িয়ে বেড়ায়। মিথ্যে বোঝায়। ব্রজগোপাল নেশা কেটে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। সেই অপেক্ষার মাঝেই আবার বৃষ্টি নামে, তুমুল বৃষ্টি। খানিকটা দম নিয়ে যেন দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে ফিরে এসেছে। সঙ্গে আকাশ ফালাফালা করে বজ্রপাত। খানিক আগে যে ঘর ভেসে যাচ্ছিল জ্যোৎস্নায়, এখন সেই ঘরই ঝলসে ঝলসে উঠতে লাগল বিদ্যুতের ঝলকানিতে। একেই বলে প্রকৃতির আশ্চর্য মায়া। সে এক আলো নিয়ে গেলে অন্য আলো ফেরত দেয়।

বৃষ্টি আর বাতাসে দুমড়ে-মুচড়ে, এলোমেলো হয়ে যাওয়া ছাতা কোনও রকমে সামলে বিভা এসেছিলেন বেশ খানিক পরে। হ্যারিকেন আনতে পারেননি। এই জলে হ্যারিকেন আনবেন কী করে?

“চলুন, ঘরে চলুন।”

ব্রজগোপাল ভিজে দেওয়াল ধরে কোনও রকমে উঠে দাঁড়ান। নেশায় চুর। মাথা টলমল করছে। এত নেশা কখনও হয় না তাঁর। মনে হচ্ছে, পড়ে যাবেন। বিভা এগিয়ে এসে স্বামীকে শক্ত করে ধরলেন।

পর দিন ব্রজগোপাল ঘোষণা করলেন, কাচের ঘরের কাজ আর এক পা-ও এগোবে না। এখানেই শেষ। ওই ঘর আর গড়াও হবে না, ভাঙাও হবে না। যেমন আছে তেমন থাকবে।

সেই থেকে আজও ঘর একই ভাবে পড়ে রয়েছে। অসম্পূর্ণ।

দুই

ধ্রুবর বয়স নিয়ে সমস্যা রয়েছে। তার দুটো বার্থ সার্টিফিকেট। একই মানুষের দুটো বার্থ সার্টিফিকেট থাকা একটা জটিল বিষয়। কেমন করে এটা হল, ধ্রুবর কাছে স্পষ্ট নয়, তবে কীর্তিটি কার, তা সে খানিকটা আঁচ করতে পারছে।

দ্বিতীয় বার্থ সার্টিফিকেটের কথা ধ্রুব জানতে পেরেছে খুব বেশি দিন হয়নি। দোতলায় ঢুকেই দরজার ডান পাশে যে পুরনো দেরাজ রয়েছে, তার একেবারে নীচের ড্রয়ার থেকে পাওয়া গিয়েছে। গাদাখানেক হাবিজাবি কাগজের মধ্যে মিশে ছিল। হলদে হয়ে আসা মলিন কাগজের মাথায় রেজিস্ট্রেশন অফিসের নাম, নীচে সিলমোহর, সই। সেখানে ধ্রুবর নাম, জন্মতারিখ জ্বলজ্বল করছে। ধ্রুব অবাক হয়। তার নিজের কাছেও তো একটা সার্টিফিকেট রয়েছে, সেখানে তারিখ অন্য রকম। এটা কোথা থেকে এল?

সেই সময় কৃষ্ণপ্রিয়া সেন ড্রয়িং রুমে বসে সেলাই করছিলেন। ক্রস স্টিচের কাজ। এক মাস হল তিনি সেলাই-ফোঁড়াইতে ঢুকেছেন। ভাল না হলেও মোটের ওপর করতে পারছেন। দোসুতি কাপড়ের টুকরো ফ্রেমে আটকে ইতোমধ্যেই তিনি কার্পেট সুচ দিয়ে লতাপাতা করে ফেলেছেন। টেবিল ক্লথ করার চেষ্টা চলছে। টি টেবিলের জন্য। তবে একটা গোলমাল হচ্ছে। গোলমাল আগে বোঝা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে কাজ খানিকটা এগোনোর পর। ফুলের পাপড়ি ছোট-বড় হয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণপ্রিয়া অবাক হচ্ছেন, এত গোনাগুনি, মাপজোক করার পরও ভুল হচ্ছে কেন? কর্মজীবনে তিনি এক জন হিসেবরক্ষক। ছাত্রী থাকার সময় অঙ্কে মাথা ছিল পরিষ্কার। তা হলে সেলাইয়ের হিসেবে ভুল হবে কেন?

আজকাল সেলাই, উল বোনার চল উঠে যেতে বসেছে। কারও হাতে এত সময় নেই, তার ওপর সবই রেডিমেড কিনতে পাওয়া যায়। তাও কৃষ্ণপ্রিয়া কিছু দিন হল, এই শখের মধ্যে ঢুকেছেন। ঢোকার কারণ ক্রস স্টিচের প্রতি ভালবাসা নয়, কারণ মনোবিদ ডক্টর তফাদার। তিনিই পরামর্শ দেন।

“মিসেস সেন, যখন হাতে কাজ নেই, ল্যাপটপে সিনেমা-টিনেমা দেখতে ভাল লাগছে না, তখন এমন কিছু একটা করুন, যা আপনার মনকে স্থির রাখতে পারবে।”

কৃষ্ণপ্রিয়া বলেন, “আমি তো চাকরি করি ডক্টর। অনেকটা সময় আমি এমনিই অফিসের ঝামেলায় থাকি।”

ডক্টর তফাদার বলেন, “চাকরি ছাড়াও অন্য কিছু করতে হবে, কোনও হবির কথা ভাবুন।”

কৃষ্ণপ্রিয়া জিজ্ঞেস করেন, “মন স্থির থাকে, এমন কোনও হবি কি আছে?”

ডক্টর তফাদার হেসে বললেন, “সেটা আপনাকেই খুঁজে নিতে হবে। বেশি নয়, দিনে ঘণ্টা খানেক, ঘণ্টা দেড়েক কনসেন্ট্রেশনের মধ্যে থাকতে হবে। অনেক চিকিৎসক ধ্যান, যোগাসন সাজেস্ট করেন। আমি বলব, ক্রিয়েটিভ কিছু করলে বেশি উপকার। মন হল শরীরের সবচেয়ে বড় ক্রিয়েটিভ পার্ট, সে সব সময়ই কিছু-না-কিছু সৃষ্টি করে চলেছে। আপনি চাইলেও করছে, না চাইলেও করছে। তাই তাকে সুস্থ রাখতে ক্রিয়েটিভ কিছু করাই বেটার।”

কৃষ্ণপ্রিয়া শুকনো হেসে বললেন, “বয়স কম হল না, যে-চাকরি করি, তার সঙ্গে ক্রিয়েটিভিটির কোনও সম্পর্ক নেই, যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগের সম্পর্ক আছে। এখন নতুন করে শখ কোথা থেকে পাব?”

“ছোটবেলায় গান গাইতেন না? ছবি আঁকা? সে রকম কোনও একটা ভাললাগা ফিরিয়ে আনুন না হয়।”

কৃষ্ণপ্রিয়া খানিকটা হতাশ ভাবেই বলেছিলেন, “ডক্টর, শুধু মেডিসিন দিয়ে হয় না? হবি নিয়ে পড়ে থাকার সময় নেই।”

ডক্টর তফাদার গলা নরম করে বললেন, “না, হবে না। মনকে বাগে আনতে হলে তাকে যেমন জব্দ করতে হয়, তেমন যত্নও করতে হয়। তা ছাড়া আপনার অস্থিরতা যেমন অমূলক, তেমন আবার তার কারণও রয়েছে। যে-ঘটনা নিয়ে আপনি এত ডিসটার্বড হয়ে পড়েছেন, এমন নয় যে সে ঘটনা ঘটেনি। ঘটেছে, কিন্তু তাকে নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। এই অস্থিরতা শুধু মেডিসিনে দূর করা যাবে না, সঙ্গে একটু ম্যানেজমেন্টেরও প্রয়োজন। লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট। আপনি ভাববেন না, আমার অ্যাডভাইস মতো চলুন, এভরিথিং উইল বি ওকে।”

কৃষ্ণপ্রিয়া বেশ ক’দিন ধরে চিন্তা করেন, কোন শখে যাবেন? গান, ছবি আঁকা তিনি জানেন না। বাগানও হবে না, গাছের বীজে, ফুলের

পরাগে অ্যালার্জি। দূর থেকে দেখতে ভাল, ঘাঁটাঘাঁটি করলে হাঁচি হতে থাকে। রান্নাবান্না করতে এক সময় ভাল লাগত। তখন ঘরে খাওয়ার মানুষ ছিল। এখন নেই, ইচ্ছেও করে না। এই বয়সে অনেকে সমাজসেবা ধরনের সংগঠনে যুক্ত হয়ে পড়ে। তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। অফিস এবং জরুরি প্রয়োজন ছাড়া, বাইরে মেলামেশার পাট তাঁর অনেক দিন বন্ধ। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ব্যক্তিগত ভাবে যে জটিল জীবন তিনি যাপন করছেন, তাতে চট করে কারও সঙ্গে মেলামেশা সম্ভব নয়। সময়ও নেই। তা হলে? এমন একটা সময়ে সবাইকে ছেড়ে দুম করে দিদিমার কথা মনে পড়ে কৃষ্ণপ্রিয়া সেনের। ছোটবেলার স্মৃতি। দিদিমা সেলাই করতেন। নেশার মতো ছিল তাঁর। গোল ফ্রেমে কাপড় আটকে ক্রস স্টিচের কাজ। সুন্দর সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলতেন। কৃষ্ণপ্রিয়ার খুব ইচ্ছে হত, দিদার মতো তিনিও সেলাই করবেন। ছোটবেলায় দিদা সুচে হাত দিতে দেননি, খানিকটা বড় হওয়ার পর একটু শিখিয়েছিলেন। গোলাপি কাপড়ে সবুজ পাতা করে খুব মজা লেগেছিল। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মজা উধাও হল। আচ্ছা, এখন এক বার চেষ্টা করলে কেমন হয়? ক্রস স্টিচের সুতোকে যেন কী বলে? ডিএমসি সুতো না কী? সে জিনিস কি এখন পাওয়া যাবে? কার্পেটি সুচ, সুতো, ডিজ়াইনের বই?

অনলাইনে সব পাওয়া গেল। ডিজিটাল দুনিয়ায় 'না' নেই। পারলে যা এখনও তৈরি হয়নি তা-ও হাতে এনে দেয়, আবার সময়ের মাটি খুঁড়ে নীচে নেমে যেতে পারে হুড়মুড়িয়ে। চাইলে হয়তো সিন্ধু সভ্যতার জলের কলসি ঘাড়ে করে এনে ডোরবেল বাজিয়ে বলবে, 'আপনার মোবাইলে যে ওটিপি এসেছে, সেটা বলুন।'

কৃষ্ণপ্রিয়া সেলাই শুরু করেছেন। মন কতটা স্থির হচ্ছে জানেন না, তবে একেবারে মন্দ লাগছে না। শুধু ফুলের পাপড়ির এলোমেলো মাপ নিয়ে যা একটু চিন্তা।

ধ্রুব ঘরে ঢুকে বলে, "এই বার্থ সার্টিফিকেটটা কার?"

কৃষ্ণপ্রিয়া একটা অলিভ রঙের হাউসকোট পরে ছিলেন সে দিন। ঘাড় পর্যন্ত কাটা চুল, ঝকঝকে চোখ, তীক্ষ্ণ নাক-মুখ, মূলত ফর্সা, চেহারা একটু ভারীর দিকে। তিনি শুধু সুন্দরী নন, এই প্রায় মধ্য চল্লিশেও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। একেই বোধ হয় ইংরেজিতে বলে, অ্যাপিলিং। যে-দিন স্লিভলেস জামা পরে অফিসে যান, পুরুষ কলিগরা আড়চোখে তাকায়। কৃষ্ণপ্রিয়াকে দেখলে বোঝা যায়, 'মেয়েরা চট করে বুড়িয়ে যায়' কথাটি যারা তৈরি করেছে, তাদের অভিসন্ধি ছিল। মেয়েদের ছোট করা তো বটেই, বার বার সঙ্গিনী বদলের মতলবও থাকতে পারে। 'বুড়ি' যখন, এ বার ত্যাগ করা যেতে পারে।

কৃষ্ণপ্রিয়া মুখ তুললেন। গত দশ বছর ধ্রুব মায়ের সঙ্গে খুব একটা কথা বলে না। দেখাও হয় কম। সে চট করে দোতলায় ওঠে না। এক তলায় নিজের ঘরেই থাকে। কলেজ শেষ করার পর আর এ বাড়িতে থাকতে চায়নি। কৃষ্ণপ্রিয়া তাকে শান্ত ভাবে বুঝিয়েছিলেন, "এতে মনে হবে, তুমি একটা অপরাধকে সমর্থন করছ।"

ধ্রুব বলেছিল, "আমি কাউকেই সমর্থন করছি না।"

কৃষ্ণপ্রিয়া সেন চকিতে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। সে কী বলতে চায় বুঝতে পেরেছিলেন। নিচু গলায় বলেছিলেন, "আমাকে তোমায় সমর্থন করতে হবে না ধ্রুব। আমি গোড়া থেকে জানি, তুমি আমাকে সমর্থন করো না। শুধু তা-ই নয়, তুমি আমাকে ঘেন্নাও করো। যদি কোনও দিন আমার মতো কিছু করে ফেলো, এমন কোনও সম্পর্কে জড়াও, যা সমাজের নিয়ম-খাতায় লেখা হয়নি, সে দিন বুঝতে পারবে, ভালবাসা কোনও অবস্থাতেই রাগ বা ঘেন্নার নয়। যাক, তুমি যেমন ভাল বুঝেছ, আমার বলার কিছু নেই, কিন্তু আমার প্রতি তোমার রাগ, ঘেন্না প্রকাশ্যে দেখানোর কোনও প্রয়োজন আছে কি? বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া মানে লোকে তা-ই বুঝবে।"

ধ্রুব চুপ করে ছিল। এ সব জটিল কথা সে বুঝতে চায় না। সে জানে, তার বুদ্ধি নীচের দিকে। চেহারা মায়ের মতো হলেও বুদ্ধি সে তার বাবার মতোই পেয়েছে। বাবা মানুষটা আদপে বোকাই। বোকা না হলে, যার সঙ্গে যোগ্যতা, স্বভাবে কোনও মিল নেই, এমন এক জনকে বিয়ে করে বসে? তাও দেখেশুনে বিয়ে হলে কথা ছিল। দুম করে এক সুন্দরী, বুদ্ধিমতী মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল, পাগলের মতো প্রেম, তার পর এক রকম প্রায় হাতে-পায়ে ধরে বিয়ে। তখন বাবা কে? কেউ নয়। ভাড়াবাড়িতে থাকে। ছোট ব্যবসা। বিয়ের কয়েক মাস কাটতে-না-কাটতে স্ত্রীর হাত ধরে গুটিগুটি শ্বশুরবাড়ি চলে এল। এই লোক বোকা নয়?

কৃষ্ণপ্রিয়া থমথমে গলায় বলেছিলেন, "তুমি এক তলায় যেমন ছিলে তেমনই থাকবে ধ্রুব। নিজের মতো করে থাকবে। আমি তো তোমায় বিরক্ত করি না, যে দিন থেকে তুমি জিনিসপত্র নিয়ে নীচে নেমে গিয়েছ, সে দিন থেকেই করি না। বাইরে কোথাও চাকরিবাকরি পেলে চলে যাবে, তখন তো ধরে রাখতে পারব না। কিছু দিনের জন্য তো তুমি বাইরে ঘুরে কাজ করেছ, পাড়াগাঁয়ে ঘুরতে হয়েছে। তখন সপ্তাহের ক'টা দিনই-বা বাড়িতে থাকতে? এর পর পাকাপাকি ভাবে বাইরে গেলে সেটুকুও থাকবে না। যে ক'টা দিন কলকাতায় আছ থেকে যাও।" এতটা বলে একটু থেমেছিলেন কৃষ্ণপ্রিয়া। ফের গলা নামিয়ে বলেছিলেন, "যাকে নিয়ে তোমার সমস্যা, সে তো এ বাড়িতে কখনও আসেনি, আসবেও না। তোমার কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।"

উত্তর কলকাতার গলির ভিতর এই দোতলা বাড়িটা ছোট, কিন্তু ছিমছাম। কৃষ্ণপ্রিয়া ঢোকা-বেরোনোর পথ আলাদা করে নিলেন, যাতে ধ্রুবর অস্বস্তি না হয়। ওই কথাটাও সত্যি, মানবেশ মজুমদার কখনও এ বাড়িতে আসেন না। মুকুন্দপুরে তাঁর নিজেরই ছড়ানো বাংলো বাড়ি। কৃষ্ণপ্রিয়া সেখানেই যান।

ধ্রুব মায়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, "এটাও আমার বার্থ সার্টিফিকেট মনে হচ্ছে। দুটো বার্থ সার্টিফিকেট কী করে হল?"

সেলাইয়ের সরঞ্জাম সরিয়ে কৃষ্ণপ্রিয়া হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিলেন। ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর। মনে করার চেষ্টা করলেন। অল্প ক্ষণের মধ্যে মনেও পড়ল।

"তোমার বাবার কাজ। সে আলাদা করে চেষ্টা করেছিল। এই ভুল সার্টিফিকেটটা জোগাড় করে সে। ফেলে দাও।"

ধ্রুব কথা না বাড়িয়ে তার দু'নম্বর জন্মবৃত্তান্তটি নিয়ে নীচে নেমে গিয়েছিল সে দিন। ফেলে দেয়নি।

এই যুগ হল টার্গেটের যুগ। জীবন জীবিকা সবেতেই লক্ষ্যস্থির করে এগোনোর সময়। পঁচিশ বছর তিন মাস বয়সের ধ্রুব নামের এই যুবকের ধ্রুব কোনও লক্ষ্য নেই, উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। লেখাপড়ার মান সাধারণ। এতটা সাধারণ সে ছিল না, জীবনে বড় ধরনের বিপর্যয় লেখাপড়া থেকে তার মন সরিয়ে দেয়। পরীক্ষার রেজ়াল্ট খারাপ হতে থাকে। ফলে কাজকর্মও যে বিরাট কিছু হবে, এমন আশা সে করে না। নিজের যোগ্যতায় মোটের ওপর একটা কিছু করলেই হল। তার ইচ্ছেও অতি সাধারণ। একটি মেয়েকে সে ভালবাসে এবং তাকে বিয়ে করবে বলে জানে। দু'জনে মিলে সুখে থাকার কথা ভাবে। সেই সুখে কোনও জটিলতা থাকবে না। শুধু প্রেমে কেন, নিজের জীবনেও সে কোনও জটিলতা চায় না, জটিলতা এড়িয়ে চলে।

তার পরেও তিন মাস হল, ধ্রুব এক ধরনের জটিলতার মধ্যে পড়েছে। এই জটিলতায় না জড়ালেও হত। এখনও হয়। ইচ্ছে করলে বেরিয়ে আসতে পারে। তবু পারছে না। অমোঘ টানের মতো জড়িয়ে পড়ছে। সাধারণ ছেলের এ কী অদ্ভুত সমস্যা!

তিন

গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা পথে ফুল কুড়িয়ে পায়, বাগানে আম কুড়িয়ে পায়, কখনও আবার হাটেবাজারে কারও ট্যাঁক ফস্কে পড়ে যাওয়া দু'-চার আনা পয়সাও জোটে। কামরাঙা গ্রামের বিল্ব আজ সকালে কুড়িয়ে পেয়েছে একটা রিভলভার। ছোটখাটো চেহারার

আস্ত একটা রিভলভার। ছাই রঙের রিভলভারের বাঁটে খানিকটা কাঠ। বেঁটে নল আর চকচকে ট্রিগার। দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, এ জিনিস হেলায় পড়ে থাকা জিনিস নয়, রীতিমতো খাতির-যত্নে থাকা জিনিস। রিভলভার পাওয়া গিয়েছে লাল কাপড়ে মোড়া একটা পুঁটুলির মধ্যে। পুঁটুলির ভিতরে বেশ খানিকটা খই-মুড়ি। রিভলভার রাখা ছিল তার ভিতরে। গ্রামের ছেলে বিল্ব, এই বয়সেই পুঁটুলিতে খই-মুড়ি বেঁধে নেওয়া সে কম দেখেনি, তা বলে তার ভিতরে এই বন্দুক! গুলি ছোড়া যায় যখন, বন্দুকই তো বটে। দুনিয়ায় এ রকম মজার কাণ্ডও ঘটে।

বিল্বর বয়স সাত বছর। লোকে ডাকে বিল্লু। ছেলে দেখতে সুন্দর। গোলগাল, মাথায় ঘন চুল, হাসলে দুটো গালেই টোল পড়ে, মায়ের মতো চোখে মায়াকাড়া ভাব। এক ঝলক দেখলে মনে হয়, এই ছেলে শান্ত। ঘটনা উল্টো। ছেলে নানা ধরনের দুষ্টুমির মধ্যে থাকতে পছন্দ করে। সে পড়ে গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে, ক্লাস টু-তে। স্কুল ফাঁকি দিয়ে খেতে, মাঠে, ঝোপঝাড়ে, পরের আমবাগানে, পোড়োবাড়িতে, দিঘির ধারে চক্কর মেরে বেড়ায়। মিড-ডে মিলের সময় কোনও দিন খেতে যায়, কোনও দিন যায় না। মেজাজের ওপর নির্ভর করে। স্কুল ফাঁকি দিয়ে ঘোরাঘুরি করলে তাকে ভেবেচিন্তে চলতে হয়। কার চোখে পড়ে যাবে ঠিক নেই। সে ঘটনা হয়েছেও। গাঁয়ের লোকে দেখতে পেয়ে ঘাড় ধরে স্কুলে দিয়ে এসেছে, বাড়িতেও বলে দিয়েছে। মা উঠোনে কান ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তাই ক'দিন হল খানিক দূরের দিকে হাঁটা দেয় বিল্ব। পশ্চিমে, গাঁয়ের সীমানার দিকে চলে যায়। সেখানে লোকজন কম, থাকলেও নজরে পড়ে না। পথে একটা গাছের ডাল জোগাড় করে নিলেই হল। সেই ডাল কখনও ঝোপেঝাড়ে ঘা দেওয়ার লাঠি, কখনও শূন্যে ঘোরানোর তরবারি, কখনও কাঠবিড়ালি শিকার করার বন্দুক, কখনও আবার ক্রিকেট ব্যাট। ইটের টুকরোকে বল ভেবে মারতে থাকে। আজও বিল্ব ও দিকে চলে গিয়েছিল। ও দিকটা একটু পাথুরে আর জংলি ধরনের, খেত-টেতও নেই, একটা বিরাট দিঘি রয়েছে। নাম কালাদিঘি। কালা সিংহ নামে কোনও এক জমিদার খুঁড়িয়েছিলেন। আশপাশের ক'টা গ্রামের জলের প্রয়োজন মিটবে। ঘটনা কত দিন আগের, কেউ হিসেব রাখেনি। তবে এই দিঘির অদ্ভুত ব্যাপার হল, প্রথম থেকেই এই জলে মাছ হয় না। গ্রামের লোকে বলে, বিষ আছে। সেই ভয়ে দিঘি ব্যবহার করতেও লোকে আসে না। বছর কুড়ি আগে, এক বার শহর থেকে কোট-প্যান্ট, টুপি পরা এক গাদা লোক এল। কাঁধে গাঁইতি, কোদাল, শাবল, ব্যাগে শিশি, বোতল, গ্যাসের স্টোভ। তাঁবু খাটিয়ে বসে পড়ল কালাদিঘির পাড়ে। গভর্নমেন্টের লোক সব। কী ব্যাপার? না জলে কেমন বিষ আছে পরীক্ষা করে বের করবে। পুকুর থেকে মাটি, পাথর তুলে, জলে গুলে, হামানদিস্তা দিয়ে গুঁড়ো করে, কাচের শিশি-বোতলে ফেলে, আগুনে ফুটিয়ে তিন দিন ধরে হরেক কাণ্ড করল। গ্রামের লোক ভিড় করে দেখল। সন্ধেবেলা যাওয়ার সময় বলে গেল, বিষ-টিষ কিছু নয়, দিঘির নীচে এমন কিছু পাথর রয়েছে যেগুলো মাছের সহ্য হয় না। মানুষের জলে নামতে কোনও অসুবিধে নেই। গ্রামের মানুষ সে কথা বিশ্বাস করল এবং অল্পস্বল্প দিঘি ব্যবহার শুরু করল। তিন মাসের মধ্যে দু'জনের মৃতদেহ পাওয়া গেল দিঘির জলে। এক জন গাঁয়েরই মেয়ে, ষোলো বছরের কনক। পালিয়ে শহরের ছেলেকে বিয়ে করেছিল। বিয়ের বছর ঘুরতেই পেটে বাচ্চা নিয়ে ফিরে এসেছে। শ্বশুরবাড়ি তাড়িয়েছে। তাকে পাওয়া গেল, দিঘিতে চিৎ হয়ে ভাসছে। দু'নম্বর মৃতদেহ ছিল পুরুষের, অচেনা। আশপাশের গাঁয়েরও নয়। পুলিশ এসে বডি নিয়ে গেল। দু'জনেরই পেটে নাকি বিষ। ব্যস, ফের কালাদিঘির জল ব্যবহার বন্ধ। দু'টি মৃত্যুর কোনও সঠিক তদন্ত হল না। পাড়াগাঁয়ে এমন হয়েই থাকে।

তবে দিঘির কাছে শ্রাবণ মাসে মেলা বসে, শীতের সময় পিকনিকের ভিড় হয়, বাকি সময় ফাঁকা। দিঘির পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালে ধু ধু মাঠ পেরিয়ে দূরের বড় রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটছে দেখা যায়। গাড়ি চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার বেশ খানিকটা পর হুশ শব্দ ভেসে আসে। রাস্তার ও পাশে জঙ্গল শুরু। আবছা দেখা যায়। বিল্ব মায়ের কাছে গল্প শুনেছে, এই জঙ্গল চলে গিয়েছে অনেক দূর। তার খুবই ইচ্ছে, এক দিন বড় রাস্তা পর্যন্ত যাবে এবং জঙ্গল দেখে আসবে।

আজ সে অবশ্য কালাদিঘির পাড়ে গিয়েছিল প্যান্টের পকেট ভর্তি করে মাটির হাঁড়িভাঙা টুকরো নিয়ে। জলে ব্যাঙ লাফ খেলবে। প্রতি বারই এই খেলার সময়ে তার মনে হয়, এমন আনন্দময় সময় তার আগে কখনও আসেনি, পরেও আর আসবে না। দিঘির এক পাশে দাঁড়িয়ে ভাঙা মাটির টুকরো দু'-চার বার ছোড়ার পর হঠাৎই তার চোখ পড়ে দিঘির ঘাটের দিকে। ওটা কী! লাল রঙের একটা পুঁটুলি না? এখানে কাপড়ের পুঁটুলি ফেলে গেল কে! বিল্ব খেলা থামিয়ে গুটিগুটি পায়ে সে দিকে এগিয়ে যায়।

বালক হলেও বিল্ব রিভলভার চেনে। মুখে বলে পিস্তল। খেলনা পিস্তল। মেলায় পাওয়া যায়। তার নিজেরও একটা ছিল, টিনের। পুজোর সময় মা কিনে দিয়েছিল। ফটফট আওয়াজ করে ক্যাপ ফাটাত। এ বছর পুজোতেও চেয়েছিল, মা দেয়নি। তবে বন্ধুরা হাতে ধরে প্যান্ডেলে 'তাড়া করা, তাড়া করা' খেলেছে। খুব মজা। এই জিনিস বিল্ব আরও দেখেছে। এক বার গ্রামে পুলিশ এসেছিল। কোমরে ঝোলানো ছিল। মা বলেছিল, ওকে বলে রিভলভার। এক রকমের বন্দুক। ছোটখাটো চেহারা।

"এটা দিয়ে কী করে মা?" বিল্ব জানতে চেয়েছিল।

"কী করে? ধরো হঠাৎ যদি তোমার গায়ের ওপর বাঘ লাফিয়ে পড়ে, অমনি তুমি এটা থেকে গুলি ছুড়ে দিতে পারবে, বাঘও অমনি চিৎপটাং।"

"এর মধ্যে গুলি থাকে?"

"থাকে তো। ছিটকিনির মতো একটা জিনিস থাকে, তাকে বলে ট্রিগার। সেই ট্রিগার টিপলে নল থেকে আগুনের হলকা দিয়ে গুলি বের হয়।"

"মা, পুলিশকাকুরা কি এই ছোট বন্দুক দিয়ে বাঘ মারে?"

"না বাঘ মারে না, ওরা খারাপ লোকেদের মারে। এই ধরো চোর, ডাকাত, গুন্ডা। সব সময় মারে এমনও নয়, এটা দেখিয়ে ভয় দেখায়।"

"মা, আমাকে একটা দেবে? আমিও খারাপ লোকেদের ভয় দেখাব।"

"ওরে বাবা, ও জিনিস ভয়ানক, ছোটদের নিতে নেই।"

মা অনেক কিছু জানে। ক'দিন কলেজেও পড়েছে। কলেজ কী? মা-ই বলেছে, কলেজ হল বড় স্কুল। বেশি লেখাপড়া শিখতে হলে সেখানে যেতে হবে। বিল্ব কোনও দিনই যাবে না। পড়াশোনা তার ভাল লাগে না।

কামরাঙা গ্রামকে বাইরে থেকে দেখতে কালাদিঘির মতোই। নিস্তরঙ্গ, শান্ত, খানিকটা নির্বিকারও। আলো ফুটতে-না-ফুটতে খেতে, মাঠে কাজ শুরু হয়ে যায়। বড় রাস্তার ধারে বাজার। সেখানে গুটিকয়েক দোকান, টিন-ঢাকা সেলুন, মোবাইল ফোন মেরামতির ঘর, সাইকেল সারাইয়ের দোকান। হালে ক্লাবঘরে কম্পিউটার বসিয়ে সাইবার কাফে হয়েছে। শিবমন্দিরের কাছে মোটরবাইকের চাকায় বাতাস দেওয়ার জন্য গাছে নল ঝোলানো হয়েছে। গ্রামে মোটরবাইক ঢুকছে যে। চটের পর্দা দেওয়া ভিডিয়ো হল হয়েছে একটা। শনিবার রাতে সেখানে 'গরম ছবি' চলে। সেই ছবির পোস্টার সাঁটা হয় বাইরে। খলনায়িকা খালি পিঠে দাঁড়িয়ে। হলের মালিক কথা ছড়ায়, টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকলে বাকিটুকুও দেখা যাবে।

শনিবার করে হাট বসে। মেয়ে-বৌরা দুপুরে পুকুরঘাটে বকবক করতে করতে কাপড় কাচে, বাসন মাজে। সন্ধেবেলায় ঘরে টিমটিম করে ইলেকট্রিকের বাতি জ্বলে, জোরে বাতাস দিল কি দিল না, সেই আলো নিভে যায়। ছেলেমেয়েরা কুপি জ্বেলে দাওয়ায় পড়তে বসে ঘুমে ঢলে। পুরুষমানুষরা কাজ শেষে ঘরে ফেরে। জামবাটির এক বাটি মুড়ি, শসা নিয়ে বসে খালি গায়ে। বৌ পিঠের ঘামাচি মারতে মারতে ফিসফিসিয়ে সংসার আর সোহাগের গল্প বলে। মাঝে মাঝে নিচু স্বরে হেসে ওঠে। কোনও কোনও পুরুষ আবার কাজ শেষে ঘরে ফেরে না,

বাজারে দিশি মদের দোকানে ভিড় করে অথবা চলে যায় গঞ্জে। এ দিক ও দিক চেয়ে খালপাড়ের নিঝুম গলিতে ঢুকে নীল পর্দা সরিয়ে টিনের দরজায় টোকা দেয়। উঁচু ব্রা পরা মেয়ে দরজা খুলে পান খাওয়া ঠোঁটে হাসে। আটটা বাজতে-না-বাজতে কামরাঙা গ্রাম ঘুমিয়ে পড়ে। তার পরেও এ দিক ও দিক যেটুকু আনাগোনা হয়, সে সব গোপনে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে।

লাল কাপড়ের পুঁটুলি খুলে রিভলভার বের করল বিল্ব। হাতে নিয়ে সে যেমন বিস্মিত, তেমনই উত্তেজিত। খেলনার মতো হালকা নয়, বেশ ভারী। উত্তেজনায় বড় বড় শ্বাস পড়তে থাকে, চোখের পাতা কাঁপতে থাকে বিল্বর। এটা তো সেই ছোটখাটো বন্দুক, যেটা থেকে গুলি ছুড়লেই বাঘ মরে। খারাপ লোকেরা পালায়। কিন্তু সে এটা নিয়ে এখন করবেটা কী? পুঁটুলিতে রেখে দেবে ফের, যেমন ছিল? নাকি কালাদিঘির জলে ছুড়ে ফেলে দেবে? আচ্ছা, বাড়ি নিয়ে গেলে কেমন হয়? মা দেখলে নিশ্চয়ই খুশি হবে। বলবে, 'যাক, আর আমার বাঘের ভয় নেই। বিল্লু গুলি ছুড়ে মেরে দেবে।'

রিভলভার হাতে নিয়ে বিল্ব ছুটতে শুরু করে। উত্তেজনা আর আনন্দে ভারীও লাগছে না আর, মনে হচ্ছে পালকের মতো হালকা। পথে তাকে কে দেখতে পেল, সে দিকে খেয়ালও করল না বিল্ব। এই জিনিস কোনও দিন তার হাতে আসবে, কল্পনাও করতে পারেনি সে। এখনও যে বিশ্বাস হচ্ছে এমন নয়। গেল পুজোর সময় বন্ধুদের কাছ থেকে কত বার চেয়েছে।

"আমাকে এক বার ধরতে দে।"

"যা ভাগ, ক্যাপের কত দাম জানিস?"

"কথা দিচ্ছি, ক্যাপ ফাটাব না। শুধু হাতে নিয়ে ছুটব।"

"তোকে আর বন্দুক হাতে ছুটতে হবে না বিল্ব, তুই প্যান্ট ধরে ছোট। যেমন ঢলঢল করছে, খুলে পড়ে না যায়।"

"এটা মোটেই বন্দুক নয়, একে বলে রিভলভার। মা বলেছে।"

"ইস রে, ওর মা যেন সব জেনে বসে আছে। বেশি বকবক না করে দৌড় দে দেখি, বন্দুক নিয়ে তোকে তাড়া করি।"

এ বার কী হবে? কে কাকে তাড়া করবে? কালাদিঘি থেকে বাড়ির কম পথ নয়। এত রোদেও কী ভাবে যে ছুটতে ছুটতে চলে এল, বিল্ব নিজেই বুঝতে পারল না। পথে দু'-একবার যেন কারা পিছু থেকে ডাকও দিল। নিশ্চয়ই গাঁয়ের কাকা, মামা কেউ। ডাকুক। সাড়া দেওয়ার মতো সময় এখন বিল্বর হাতে নেই।

চার

প্রায় চল্লিশ মিনিট হতে চলল বেলেঘাটা বাজারের বাইরে ঘুরপাক খাচ্ছে ধ্রুব। এক বার বড় রাস্তার মুখ পর্যন্ত যাচ্ছে তো এক বার যাচ্ছে পিছনের পার্কের গেটের ধারে। বাজারের ভিতরেও উঁকি মেরে এল। না, এখনও আসেনি। ন'টা বাজতে কিছুটা দেরি, এর মধ্যেই রোদের তেজ অনেকটা বেড়েছে। বাড়ারই কথা। বৈশাখ শুরু হতে আর মাত্র ক'টা দিন। বোঝা যাচ্ছে, কলকাতায় এ বার জাঁকিয়ে গরম পড়বে। গরমকালে গরম পড়লে অসুবিধে নেই, গরম কত দিন থাকবে সেটাই কথা।

ধ্রুব এক জন কর্মহীন যুবক। তবে একেবারে খাঁটি কর্মহীন নয়, তিন তিন বার কাজ পেয়েছে। রাখতে পারেনি। কখনও নিজের জন্য, কখনও মালিকের জন্য কাজ হারিয়েছে। প্রথম চাকরি ছিল এক প্রাইভেট ইনশিয়োরেন্স কোম্পানিতে। তিন মাসে টার্গেটের অর্ধেকও পূরণ হল না। বস মানুষটা ভাল ছিলেন। কবিতা লিখতেন। ধ্রুবকে চেম্বারে ডেকে মাঝে মাঝে সেই কবিতা শোনাতেনও। কিছু না বুঝেই ধ্রুব তারিফ করত। বস বলে খুশি করতে করত না, মানুষটা ভাল বলে করত। ভাল মানুষের দুর্বল কিছু নিয়ে বলতে ভাল লাগে না। সম্ভবত এই প্রশংসার জোরেই টার্গেট ফেল করার পরেও এক মাস অতিরিক্ত সময় জুটে গেল ধ্রুবর কপালে। তাও পারল না ধ্রুব। অতএব বিদায়। শেষ দিনও ঘরে ডেকে চা খাইয়ে, বস কবিতা শোনালেন। দু'লাইনের কবিতা। সেই লাইন আজও ধ্রুবর মনে আছে— 'সাগরের মেঘে কলোনিতে যে বৃষ্টি হয়,/ সে কোন বালিকার কথা কানে কানে কয়?'

কবিতা পড়া শেষে মুখে তুলে বস বললেন, "ছন্দমিলে কোনও গোলমাল রয়েছে?"

ধ্রব লজ্জিত ভাবে বলেছিল, "স্যর, আমি কবিতার কী বুঝি? ছন্দ-টন্দ তো কিছুই জানি না।"

বস বললেন, "সব জানতে বুঝতে হয় না ধ্রুব, কানই বলে দেয়। তোমার কান কী বলছে?"

ধ্রুব আমতা আমতা করে বলেছিল, "ভাল হয়েছে।"

বস বললেন, "না, ভাল হয়নি। কলোনি শব্দটা এখানে যাচ্ছে না। যাক ধ্রুব, কিছু মনে কোরো না, কেনাবেচার লাইন তোমার জন্য নয়।"

ধ্রুব বলল, "অর্ডিনারি গ্র্যাজুয়েট স্যর, আর কী কাজ পাব? ঘুরে ঘুরে ফিরি করতে পারি।"

বস বলেছিলেন, "আমার এখানে তাও পারোনি। কারণ, ফিরি করা অত সহজ নয়। কত ফিরিওয়ালা ঘুরে বেড়াচ্ছে, টাফ কম্পিটিশন। তার পরেও আমি তোমাকে একটা সার্টিফিকেট লিখে দিচ্ছি। ভবিষ্যতে যাতে কাজ পেতে সুবিধে হয়, তার জন্য ভাল কথা থাকবে এতে। তবে আমার বিশ্বাস, সে কাজ তুমি রাখতে পারবে না। মূলত যারা সৎ, নির্লোভ তাদের উপার্জন করা একটা কঠিন ব্যাপার।"

ধ্রুব বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ স্যর।"

বস বললেন, "মাঝে মাঝে এসো, কবিতা শুনে যেয়ো।"

সেই সার্টিফিকেটের জোরে আবার সেলসের কাজ পেল ধ্রুব। তবে এ বার কাজ শহরের বাইরে। ধানের সার, কীটনাশক বিক্রি করতে হবে। পরিশ্রম করেছিল খুব। গ্রামে গিয়ে পড়ে ছিল। নতুন জিনিস। কৃষককে হাতে-কলমে বোঝাতে হবে। অন্তত একটা ফসল তোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করে প্রমাণ করতে হবে, তাদের কোম্পানির জিনিস ভাল। তার পর তো বিক্রি। সেই কাজও টেকেনি। জিনিসে গোলমাল ধরা পড়ল। এমন গোলমাল যে, ধানে পোকা তো লাগলই, তোলার পর শুকিয়েও গেল। যেটুকু জমিতে পরীক্ষামূলক চাষ হয়েছিল, তার সব খরচ মিটিয়ে ফিরেছিল ধ্রুব। কোম্পানি তো রেগে আগুন। হাতেকলমে পরীক্ষা করে দেখাতে কে বলেছিল? সুতরাং বিদায়।

তিন নম্বর কাজটি গেল গত বুধবার। এই চাকরির আয়ু এক মাস হব হব করছিল। প্রথম বেতনের সময়ও এসে গিয়েছে। কোম্পানি নতুন। যাকে বলে স্টার্টআপ। টাকাপয়সা নিয়ে কারবার। ধ্রুব কাজ শিখছিল, সামনের মাস থেকে ফিল্ডে নামার কথা। ক্যামাক স্ট্রিটে সতেরো তলায় ছোট এক ফালি ঘর। ঘর ছোট হলে কী হবে, চকচকে চেয়ার-টেবিল, জানলায় ঘষা কাচ। ওপর থেকে শহরকে দেখায় অস্পষ্ট, নীচের ছুটে বেড়ানো ব্যস্ত মানুষ, ঘরবাড়ি, গাড়িতে যেন কেউ আঁচড়ে দিয়েছে। বেশি ক্ষণ তাকিয়ে থাকলে গা ছমছম করে। সে করুক, ধ্রুব তো সতেরো তলার ওপর থেকে দুনিয়া দেখতে যায়নি, চাকরি করতে এসেছে। চুক্তিতে বেতনের কথা ভালই ছিল। সঙ্গে ট্রাভেলিং অ্যালাওয়্যান্স। তিন বছর টিকে থাকতে পারলে বছরে এক বার পুরী বা দার্জিলিং ভ্রমণের খরচ দেবে। রাধিকাকে এ কথা জানাতে সে নাক কোঁচকায়।

"ধুস, ও সব ভেতো বাঙালি মার্কা জায়গায় কে যাবে!"

ধ্রুব অবাক হয়ে বলেছিল, "ভেতো বাঙালি মার্কা জায়গা মানে? কী বলছ রাধি! পুরী-দার্জিলিংয়ে কত বিদেশি ট্যুরিস্ট যায় জানো? স্কুলের গরমের ছুটিতে আমার এক বন্ধু বাবা-মায়ের সঙ্গে গিয়ে কী বিপদে যে পড়েছিল! দেখে, সমুদ্রের ধারে ক'জন মেমসাহেব মাদুর পেতে শুয়ে আছে, গায়ে কিছু নেই বললেই চলে। বন্ধুর বাবা তো ছুটে পালানোর পথ পায় না।"

রাধিকা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "খালি গায়ের মেমসাহেব দেখতে

তোমার ভাল লাগতে পারে, আমার কী? দিঘা, পুরী, দার্জিলিং মানেই মাছ-ভাতের বাঙালিপনা। তাও আবার বাড়ির মতো রান্না চাই। আরে বাপু, বাড়ির মতো রান্না খেতে হলে বাইরে যাওয়ার দরকার কী? বাড়ি বসে থাকলেই হত।" একটু চুপ করে থেকে রাধিকা গলা নামিয়ে বলেছিল, "আমি ঠিক করে রেখেছি, হানিমুনে সিটং যাব।"

রাধিকার নিজের বয়স চব্বিশ বছর তিন মাস, ধ্রুবর সঙ্গে প্রেমের বয়স এক বছর তিন মাস। রাধি ডাকনাম। ধ্রুব তাকে সেই নামেও ডাকে। এখনও তাদের বিয়ের ঠিক-ঠিকানা নেই, অথচ মাঝে মাঝেই রাধিকা হানিমুনের জায়গা ঘোষণা করে বসে। অভ্যেসের মতো। এই মেয়ে বুদ্ধিমান না বোকা, ধ্রুব ঠিক আন্দাজ করতে পারে না। করার প্রয়োজনও নেই। সে জানে, মেয়েটির কোনও ভান নেই। আর রাধিকা জানে তার প্রেমিকটি জগতের প্রথম দশ বুদ্ধিহীনের এক জন। আলাপের কিছু দিন পর থেকেই সে ধ্রুবর জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে।

ধ্রুব বলল, "সিটং! সে আবার কোথায়?"

রাধিকা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "সিটং জানো না! তুমি তো কিছুই জানো না দেখছি, সবাই জানে। সিটং-এ পাইন গাছ আর কমলালেবুর বাগান রয়েছে। আমি কখনও কমলালেবুর বাগান দেখিনি। আমি দেখতে চাই।"

ধ্রুব মাথা চুলকে বলেছিল, "জায়গাটা দূরে কোথাও? ফরেন?"

রাধিকা বিরক্ত হয়ে বলল, "ছাড়ো, দেশে না বিদেশে তোমার জেনে কাজ নেই। তুমি পুরী-দার্জিলিং গিয়ে মেমসাহেব দেখো।"

ধ্রুব তাড়াতাড়ি বলে, "আমার জানাজানিতে কী আসে-যায় রাধি? তুমি জানলেই হবে। বিয়ের পর না হয়, ওটাই ফাইনাল করা যাবে, ওই সিটং না টিটিং কী যেন বললে। অফিস তো খানিকটা টাকা দেবেই, বাকিটা জোগাড় করে নেব।"

রাধিকা মুখ ঘুরিয়ে থমথমে গলায় বলে, "করতে হবে না। তুমি কোনও একটা হদ্দ বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করে নতুন অফিসের পয়সায় পুরীতেই যেয়ো। সে মাথায় ঘোমটা টেনে তোমার হাত ধরে বিচে ঘুরবে। তার পর হোটেলে হোটেলে ঘুরে দেখবে, কোথায় বাড়ির মতো ট্যালট্যালে মাছের ঝোল জোটে। আমাকে ভুলে যাও, কেটে পড়ো।"

রাধিকা রেগে গেলে এটাই বলে, 'আমাকে ভুলে যাও, কেটে পড়ো।' ধ্রুবকে প্রায়ই শুনতে হয়। অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। তবে আপাতত পুরী বা সিটং কোথাওই যাওয়া হবে না। ধ্রুবর এই চাকরিও 'নট' হয়েছে। বুধবার সকালে ক্যামাক স্ট্রিটের সতেরো তলায় পৌঁছে সে দেখেছে, কোলাপসিবল গেটে মস্ত দুটো তালা। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বসকে মোবাইলে সাত বার ফোন করেছিল ধ্রুব। ফোনের নারীকণ্ঠ প্রতি বারই জানাল, এই নম্বরের নাকি কোনও অস্তিত্বই নেই। পাশের অফিসের দরজা খুলে কোট-প্যান্ট পরা বয়স্ক এক জন বেরিয়ে এসেছিল, ধ্রুবকে দেখে থমকে দাঁড়াল। আপাদমস্তক দেখে বলল, "ওখানে বেশি ক্ষণ দাঁড়িয়ো না ইয়াং ম্যান, পুলিশ কাল তিন জনকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। অফিসের নামে টাকাপয়সা নিয়ে ফ্রডবাজি হচ্ছিল। তালা পুলিশই দিয়েছে। বাকিদের খুঁজছে, যারা টাকা হাতিয়েছে তাদেরই ধরবে। তুমি কিছু পেয়েছ নাকি?"

ধ্রুব কোনও রকমে বলল, "না স্যর, কিছু পাইনি, ক'দিন পরে মাইনে হওয়ার কথা।"

সেই লোকটি বলল, "যাক, মাইনে পাওনি বলে বেঁচে গেলে। এক বার টাকা নেওয়ার লিস্টে নাম উঠে গেলে বিপদে পড়তে। এখন কেটে পড়ো, মনে হয় ক'দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকাই ভাল।"

এর পরে সেখানে অপেক্ষা করার মানে হয় না। ধ্রুব সতেরো তলা থেকে নেমে আসে এবং আবার বেকার হয়ে যায়। কথাটা এখনও কাউকে জানায়নি। না মাকে, না রাধিকাকে। মাকে জানাবেও না, আগেও এক বার জানায়নি। অফিস থাকলে যেমন বাড়ি থেকে বেরোত, সে ভাবে রোজ বেরিয়ে গিয়েছে। রাধিকা জানলে রাগ করবে, তাকে অযোগ্য মনে করবে। সে মনে করে, অযোগ্য না হলে কারও চাকরি যেতে পারে না। কই তার বাড়িতে বাবা, কাকা, দাদাদের তো কাজ যায়নি। তার বন্ধুরা যারা চাকরি পেয়েছে, তারাও তো দিব্যি রয়েছে। উল্টে একটা কোম্পানি ছেড়ে আর-একটায় ঢুকেছে। রাধিকা নিজেও তো তাই। ক্লিনিকের ফ্রন্ট ডেস্কে দু'বছর বসা হয়ে গেল। প্রোমোশন হল বলে। তবে? ধ্রুবর কাজ কেন বার বার যাবে? তার মতে, ছেলেমেয়েরা বেকার থাকে নিজের দোষে, অন্যের নামে দোষ চাপায়, হম্বিতম্বি করে।

এ ভাবে রোদে ঘুরপাক না খেয়ে ছায়া দেখে কোথাও দাঁড়াতে পারে ধ্রুব, অথবা ফুটপাথের কোনও চায়ের দোকানে ঢুকে পড়া যায়। গ্লাসে চা, দুটো বিস্কুট, একটা সিগারেট নিয়ে আধ ঘণ্টা বসা কোনও ব্যাপার নয়। প্রায় সব চায়ের দোকানেই খবরের কাগজ থাকে। নতুন না থাকলেও দু'-চার দিনের বাসি তো থাকেই। বাসি হলে ভাল, চোখের সামনে খুলে বসলে কোনও চিন্তা নেই। সময় কাটানোর জন্য বাসি খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়া সবচেয়ে ভাল পন্থা। খবর পুরনো হওয়ায় মনে কোনও চাপ পড়ে না। খবরের স্বাদও পাওয়া গেল, আবার মনটাও ফুরফুরে রইল। আসলে কর্মহীনদের সময় কাটানোর জন্য কলকাতা শহরে নানা ধরনের সুবন্দোবস্ত আছে। সকালে, দুপুরে, সন্ধেয় ভাগে ভাগে সব ব্যবস্থা। শ্যামবাজারের মোড় থেকে কলেজ স্ট্রিট, রাসবিহারী থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত অলস ভঙ্গিতে হাঁটলেই হল। কত যে দৃশ্য, কত যে ঘটনা! থিয়েটার, সিনেমার মতো। পথের ধারে কী নেই! প্রেম, বিরহ, সেক্স, ক্রাইম। ছোটখাটো একটা জীবনদর্শন হয়ে যায়। দুপুরে বাড়িতে খাওয়ার জন্য এক বার ঢুঁ মেরে আবার বেরিয়ে পড়ো। শহরের পার্কগুলোয় এখন গোছগাছ হয়েছে। মাপে ছাঁটা ঘাস, কেয়ারি করা ফুলের গাছ, রং করা বেঞ্চ। একটা বেঞ্চে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেই হয়। বিরক্ত করার কেউ নেই। 'পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ি, পাখির ডাকে জাগি' ধরনের তোফা আয়োজন। ঘুম থেকে উঠে শরীর, মন দুই-ই ঝরঝরে। সম্ভবত শহরে দ্রুত বেড়ে চলা বেকারদের কথা মাথায় রেখেই এই ব্যবস্থা। যে-বেকার পার্কের বেঞ্চে ঘুমনোর কথা ভাবতে পারে না, একটু নাক উঁচু, তার জন্য অন্য উপায়। ইন্টেলেকচুয়াল ধরনের উপায়। শহরে এখন অনেক আর্ট গ্যালারি। কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে ঢুকে পড়লে কেউ ধরতে পারবে না, তিন বছর হল ছোকরা চাকরির জন্য ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে। রোদে জলে না ঘুরে, ঠান্ডা ঘরে দিব্যি সময় কাটাও। কমবয়সি ছেলেমেয়েদের জন্য রয়েছে শপিং মল। ফাঁকা পকেটে দামি জিনিস দেখতে কোনও বাধা নেই। দেখানোর জন্য হাসি হাসি মুখের, সুন্দর পোশাকের পুরুষ-মহিলাও থাকবে। অল্প ক্ষণের জন্য হলেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করবে, দুনিয়ায় অভাব-অনটন, সমস্যা, দুশ্চিন্তা বলে কিছু নেই। যদি কেউ এ সব বলে, সে ডাহা মিথ্যে বলে। এখানেই শেষ নয়, আয়োজন আরও হয়েছে। শহরের বিভিন্ন স্পটে আজকাল বিনাপয়সায় ওয়াই-ফাই কানেকশন মেলে। কর্মহীন যুবসমাজ এই সব স্পটের হদিশ রাখে। ফুটপাথের ওপর, পথের ধারের রেলিংয়ে, অফিসবাড়ির সিঁড়ির ধারে মোবাইল ফোনটি হাতে নিয়ে বসে পড়লেই ল্যাঠা চুকে যায়। এখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অর্থে কোনও ভেদাভেদ নেই। অফিস, হোটেল, রেস্তরাঁ থেকে বাইরে চুঁইয়ে আসা ওয়াই-ফাই কানেকশন মোবাইলের ক্ষুদ্র স্ক্রিনে আমোদে-প্রমোদে মন নিবিষ্ট করে দেয়। কর্মহীন থাকার দুর্ভাবনা, গ্লানিকে তুচ্ছ করার এ এক অতি উত্তম, আধুনিক ব্যবস্থা।

হাতের কাছেই ছায়া এবং চায়ের দোকান থাকলেও ধ্রুবকে এখন ঘুরঘুরই করতে হবে। আজ বলে নয়, যেখানেই সে সন্তোষ সেনের সঙ্গে দেখা করতে যায়, তাকে এমন পায়চারি করে সময় কাটাতে হয়। সন্তোষ সেনের হুকুম।

"খবরদার, কোথাও বসবি না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবি না। নেভার সিটিং অ্যান্ড নেভার স্ট্যান্ডিং।"

কথার মাঝে মাঝেই ইংরেজি শব্দ, বাক্য ব্যবহার করার অভ্যেস রয়েছে সন্তোষ সেনের। সবটাই প্রায় ভুল বলেন, তাতে কিছু আসে-

যায় না। ঠিক না ভুল বড় ব্যাপার নয়, সন্তোষ সেনের কাছে ইংরেজি বলাটাই আসল কথা। আগে এই অভ্যেস ছিল না, সাত বছর জেলে থাকার সময় হয়েছে।

"নিজে প্র্যাকটিস করে শিখেছি। খেয়াল করে দেখলাম, জেলে ইংরেজি এখনও সমীহের ব্যাপার। সে তোর কয়েদিই বল আর গার্ডই বল, ইংরেজি শুনলে ভয় পায়। ব্রিটিশ শাসনের কিছু জঞ্জাল তো পড়ে থাকবে। সেই চান্সটাই নিয়েছি।"

তবে শুধু ইংরেজি নয়, সন্তোষ সেনের কথায় এক ধরনের দার্শনিক ভাবও এসেছে। হয়তো জেল খাটার কারণেই এসেছে।

ধ্রুব অবাক হয়ে বলেছিল, "বসব না, দাঁড়াবও না, তা হলে করবটা কী?"

সন্তোষ সেন চাপা গলায় বললেন, "কেন, ঘোরাফেরা করবি, পায়চারি। লয়টারিং যাকে বলে।"

ধ্রুব আরও অবাক হয়ে বলল, "পায়চারি! পায়চারি করব মানে?"

সন্তোষ সেন বিরক্ত গলায় বললেন, "পায়চারি মানে জানিস না? করিসনি কখনও? নেভার ডিড? রাস্তা তো পায়চারি করারই জায়গা, রাস্তা তো পা ছড়িয়ে বসার জায়গা নয়।"

ধ্রুব বলেছিল, "তা বসব কেন? কিন্তু আমি যদি কোথাও দাঁড়িয়ে বা দোকানে-টোকানে বসে অপেক্ষা করতে পারি, তবে সমস্যা কোথায়?"

সন্তোষ সেন চাপা ধমকের গলায় বললেন, "মুখে মুখে তর্ক করবি না। ডোন্ট আরগিউ। যা বলছি চুপ করে শুনবি। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বা বসে থাকলে চোখে পড়ে যেতে পারিস। তুই চোখে পড়ার মানে হল, আমিও চোখে পড়া। আমি চোখে পড়ার মানে হল সন্দেহ। তার চেয়ে হাঁটাচলার মাঝখানে হঠাৎ দেখা হওয়াটা সেফ। কথাও বলব হাঁটতে হাঁটতে— নো স্ট্যান্ডিং, নো সিটিং।"

ধ্রুব বলে, "কার চোখে পড়বে?"

সন্তোষ সেন বলেন, "সে কি আর বোঝা যায়? জেনে রাখবি, দুনিয়ায় সব দিকে আই ঘুরছে। কোন আই কাকে দেখছে তার ঠিক নেই।"

আর কথা বাড়ায়নি ধ্রুব। সন্তোষ সেনের নির্দেশই মেনে চলে। মানুষটা যেমন চায়, তেমনই থাক। তিন মাসে এক বার দেখা। তাও অল্প ক্ষণের জন্য। এই ঘটনা চলছে বছর খানেক ধরে। মানুষটা সাত বছরের হাজতবাস সেরে বাইরে বেরোনোর পর এ পর্যন্ত চার বার দেখা হয়েছে। হাজতে ঢোকার আগে বেশ কয়েক বছর পালিয়ে বেড়িয়েছে। সেও কম দিন নয়। ধ্রুব স্কুলে পড়ছে তখন। এখান-সেখান ঘুরে ডালটনগঞ্জে কোন এক কারখানায় কাজ জুটিয়েছিল, খবর পেয়ে পুলিশ ধরে আনল। সন্তোষ সেন ধ্রুবকে আফসোস করে বলেছেন, "ভেবেছিলাম, পুলিশ ভুলে যাবে, মামলা ডিসমিস। মার্ডারের মামলা যে তামাদি হয় না, রিমেম্বারে ছিল না। বেটারা ধরেও ফেলল ঠিক। বুঝলাম, আই রয়েছে সর্বত্র, এভরিহোয়্যার, নজরদারি চলছে।"

সাক্ষী, প্রমাণ, মোটিভে খুঁত ছিল না, তার পরেও বিচার লম্বা সময় ধরে চলে। আগেই ধরা পড়েছিল মূল আসামি বিশু। তার কাছ থেকে খুনের অস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল, পুলিশি ভাষায় যাকে বলে মার্ডার ওয়েপন। তার পর পাকড়াও হলেন সন্তোষ সেন। সবাই ভেবেছিল, দু'জনের হয় ফাঁসি, নয় যাবজ্জীবন হয়ে যাবে। বিশুর যাবজ্জীবন হল, সন্তোষ সেন চূড়ান্ত সাজা থেকে বেঁচে গেলেন। শেষ পর্যন্ত প্রধান সাক্ষী বেঁকে বসল। সেই লোকের নাম বিরাজ। কোর্টে দাঁড়িয়ে বলল, তার আগের বয়ানে কিছু ধোঁয়াশা রয়েছে। পিছন থেকে যে-লোককে তার সন্তোষ সেন বলে মনে হয়েছিল, তিনি সন্তোষ সেন হতেও পারেন, আবার না-ও হতে পারেন। ঘটনার পর আততায়ীরা যখন পালিয়ে যাচ্ছিল, ফ্ল্যাটের সিঁড়ি ছিল অন্ধকার। সেই অন্ধকারে হুড়মুড়িয়ে নেমে যাওয়া মানুষ চিনতে গোলমাল হতে পারে।

জজসাহেব খুবই বিরক্ত হলেন, "আগের বয়ানে আপনি বলেছিলেন, সন্তোষ সেনকে আপনি চিনতে পেরেছেন। এখন বলছেন ভুল হতে পারে!"

বিরাজ নামের লোকটি হাতজোড় করে বলল, "ধর্মাবতার, ভুল হয়েছে সে কথা তো নিশ্চিত করে বলতে পারছি না, ঠিকও হতে পারে। আপনার কাছে মনে তৈরি হওয়া ধোঁয়াশাটা শুধু জানালাম।"

জজসাহেব বললেন, "এত দিন পরে ধোঁয়াশা তৈরি হল কেন?"

বিরাজ হাত কচলে বলল, "আমায় মাফ করবেন ধর্মাবতার। ক'দিন আগে অমনই অন্ধকার ছিল আমাদের ফ্ল্যাটের সিঁড়ি। মনে হয় ফিউজ় উড়ে গিয়েছিল, বাল্বও কাটতে পারে। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি, সিঁড়ি দিয়ে রাজকুমার নামছে।"

জজসাহেব বলেন, "রাজকুমার! সে কে? তার কথা বলছেন কেন? এই মামলার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?"

বিরাজ মাথা চুলকে বলল, "সম্পর্ক নেই, আবার আছেও। যাকে আমি রাজকুমার বলে ডেকেছিলাম, সে মুখ ঘোরাতে দেখি— রাজকুমার নয়, আমার ভুল হয়েছে। তখনই এই মামলার কথা মনে পড়ে গেল ধর্মাবতার। মনে হল, আজকের মতো সে দিনও মানুষ চিনতে ভুল করিনি তো? হয়তো সন্তোষ সেন নয়, অন্য কাউকে সে দিন দেখেছিলাম। কেমন একটা ধোঁয়াশার মতো লাগছে। মনে হল, আদালতে দাঁড়িয়ে হুজুরকে কথাটা বলে আসি।"

জজসাহেব রায় ঘোষণার সময় বললেন, "ধোঁয়াশায় থেকে কাউকে চূড়ান্ত সাজা দেওয়া যায় না, তাই অন্যান্য প্রমাণ ও সাক্ষ্য মোতাবেকে..."

সাত বছরের সাজায় জেলে ঢুকে গেলেন সন্তোষ সেন। যদিও তাঁর বিশ্বাস, পুলিশ আদালতের এই সাজায় সন্তুষ্ট নয়। তারা এখনও চায় তিনি পুরো জীবনটাই গারদের ভিতরে থাকুন। আর সেই কারণেই আবার তাঁর ওপর নজর রেখেছে। সন্তোষ সেনের কথায়, যে-কোনও সময় আবার গারদে ইন করে দেবে।

ধ্রুব বলল, "গারদে ইন কী?"

সন্তোষ সেন হতাশ গলায় বলেছিলেন, "উফ, এটাও বুঝিস না? না, লেখাপড়াটা ঠিকমতো হয়নি। হবেই-বা কী করে? মেন্টাল গ্রোথের সময় তো আমাকে পাসনি। ছেলেমেয়েদের হাতে-পায়ে গ্রোথ আসল কথা নয়, আসল কথা হল মেন্টাল গ্রোথ। গারদে ইন মানে জেলের ভিতর। ওরা আমাকে ফের ধরে ঢুকিয়ে দিতে পারে।"

ধ্রুব বলে, "আবার কেন ধরবে? ঝামেলা থেকে তো বেরিয়ে এসেছ। আসনি?"

সন্তোষ সেন গলা নামিয়ে বলেছিলেন, "সে ব্যাপার আছে। সাত বছর হাজত খাটার পর তুই যতই হাজত ছাড়িস, হাজত তোকে ছাড়বে না। নো, নেভার। হোল লাইফ ইউ উইল বি ইন দ্য কেজ। খাঁচার পাখি হয়ে থাকতে হবে, নো বনের পাখি।"

ধ্রুব মোবাইলে সময় দেখল। আসার সময় অনেকটাই পেরিয়ে গিয়েছে, তা হলে কি আসবে না? নিশ্চিত করে বলা যায় না। এক ঘণ্টা লেটেও তো এসেছে। এক বার তো আগেই চলে এসেছিল।

ধ্রুব বলেছিল, "আগে চলে এসেছ যে! বলেছিলে আড়াইটেয় আসবে। এখনও তো মিনিট কুড়ি-পঁচিশ বাকি।"

সন্তোষ সেন গলা নামিয়ে বললেন, "এটাও একটা কায়দা। পুলিশের চোখে ডাস্ট দেওয়ার কায়দা। ডাস্ট বুঝিস তো? ধুলো। ধর, পুলিশ আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট টাইমটা জেনে ফেলেছে, আমি আগে এসে গুলিয়ে দিলাম। যেহেতু টাইমে মিলছে না, সে আমাকে চিনেও বিভ্রান্ত হয়ে যাবে, কনফিউজ়ড যাকে বলে। ভাববে, এ-ই কি সন্তোষ সেন? কই, সময় তো মিলছে না!"

ধ্রুব যে এখন ফোন করে জানতে চাইবে, কেন দেরি হচ্ছে, সে উপায় নেই। সন্তোষ সেনের মোবাইল ফোন নেই। পাবলিক বুথ, পোস্ট-অফিস, দোকান থেকে ফোন করে। অন্যের মোবাইল থেকেও করেছে। পর দিন আর সেই নম্বরে পাওয়া যায়নি।

ধ্রুব বলেছিল, "তুমি একটা মোবাইল ফোন নাও না কেন? টাকা নেই?"

সন্তোষ সেন চোখ বড় করে বললেন, "তুই তো দেখছি দিন দিন

বিরাট ফুলিশ হয়ে যাচ্ছিস! টাকা নেই আবার কী কথা? সন্তোষ সেনের কাছে টাকা নেই, এমন কখনও হয়েছে? এখন তো রমরম করে ব্যবসা চলছে। যখন জেলে ছিলাম, তখনও টাকা ছিল।”

ধ্রুব বলে, “তখন কী করে টাকা ছিল? জেলে তো কাজের পারিশ্রমিক হাতে দেয় না শুনেছি।”

সন্তোষ সেন ঠোঁটের ফাঁকে গর্বের হাসি হেসে বললেন, “খবর পাচার করে ইনকাম করতাম। পাচারের কাজে তো তখন থেকেই হাত পাকিয়েছি।”

“খবর পাচার! কিসের খবর?”

সন্তোষ সেন ঠোঁটে আরও একটু হাসি বাড়িয়ে বললেন, “সে খবর থাকত। আরে বাবা, জেলে থাকলেও কয়েদিদের বাইরে যোগাযোগ রাখতে হয়। কারবার টিকিয়ে রাখতে হয়। তাদের নানা রকম কারবার। মার্ডার টু এডুকেশন। এডুকেশন শুনে ঘাবড়ে গেলি? বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি এমন আসামির সঙ্গে থেকেছি, যার তিন-তিনটে নার্সারি স্কুল ছিল। ইংলিশ মিডিয়াম। রমরমা ব্যবসা। সেই লোকের সঙ্গে সরাসরি কেউ দেখা করতে আসত না। স্কুলের বদনাম হয়ে যাবে। আমার লোক খবর দেওয়া-নেওয়া করত। আবার ভিতরেও কয়েদিতে কয়েদিতে খবর চালাচালির ব্যাপার আছে। তা-ও করেছি। পাচার একটা আর্ট, শিল্প। সবাই পারে না, আমি রপ্ত করেছিলাম। আমার এই কমন ম্যান চেহারাও আমাকে সাহায্য করেছে। কেউ বুঝতে পারত না। সেই শিক্ষা দিয়েই তো এখন চলছে।”

কথাটা সত্যি। চুয়ান্ন বছরের সন্তোষ সেনের চেহারাটা ভিড়ে মিশে যাওয়া ধরনের। এতটা বয়সও বোঝা যায় না। দীর্ঘ সময় জেলে থাকলে শরীর বিশ্রী ভাবে ভেঙে যায়। আশ্চর্যজনক ভাবে সন্তোষ সেনের বেলায় তা হয়নি। তিনি এখন না মোটা, না রোগা। উচ্চতা, গায়ের রং সবই গড়পড়তা বাঙালির মতো। শুধু মাথার পিছনে চুল উঠে হালকা টাক বেরিয়েছে।

ধ্রুব বলল, “তুমি এখনও পাচার করো? কী পাচার করো?”

সন্তোষ সেন একটু থমকে থেকে বললেন, “এভরিথিং। শুধু মাদক আর মানুষ বাদ। মানুষ একেবারে করি না তা নয়, তবে তাকে পাচার বলে না, শেল্টারে পৌঁছে দেওয়া বলতে পারিস। বিপদে পড়লে আশ্রয় জুটিয়ে দেওয়া। অবশ্যই ফর আ প্রাইস। থুতু দিয়ে টাকা গুনে নিই। ও সব কথা ছাড়, এটুকু শুধু জেনে রাখ, ব্যবসা ভাল চলছে। টাকাপয়সার দিক থেকে আই অ্যাম ইন গুড পোজ়িশন। দরকারে বলতে পারিস।”

ধ্রুব বলল, “তা হলে একটা ফোন কিনতে অসুবিধে কোথায়?”

সন্তোষ সেন বললেন, “নাহ্, তুই দেখছি চেহারাতেই বড় হয়েছিস, মাথার ভিতরের অংশ বাড়েনি। নো ডেভেলপমেন্ট। আজকাল মোবাইল ফোন রাখাও যা, থানায় গিয়ে সারেন্ডার করাও তাই। পকেটে ওটি থাকা মানে, তুমি পুলিশের নখের ডগায় চড়ে পা দোলাচ্ছ। সিটিং অন দেয়ার ফিঙ্গারটিপস অ্যান্ড সুইঙ্গিং ইয়োর লেগস। কোথায় যাচ্ছ, কোথায় খাচ্ছ, কোথায় হাঁচছ, সব খবর জেনে যাবে। তার চেয়ে এ-ই ভাল। আরে বাপু, পথেঘাটে ফোনের তো অভাব নেই। কলি যুগের মতো এটা হল তোর ফোন যুগ।”

ফলে এই লোকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের কোনও উপায় নেই। প্রথম দিন ফোন পেয়ে হকচকিয়ে গিয়েছিল ধ্রুব। সন্তোষ সেন! নিশ্চয়ই কেউ মজা করছে। কিন্তু এটা কী ধরনের মজা! আবার এমনও হতে পারে, একই নামের অন্য কেউ। তবে দুটো কথা শুনেই ধ্রুব বুঝতে পেরেছিল, মজা-টজা কিছু নয়, এ-ই সেই মানুষ। জেল থেকে কবে ছাড়া পেল? কপালে ঘাম জমছিল ধ্রুবর।

“তোর সঙ্গে দেখা করতে চাই।”

গলা এতই সহজ এবং স্বাভাবিক যে, মনে হচ্ছিল মাঝখানের দশটা বছর মানুষটা মুছে ফেলেছে। ধ্রুব বুঝতে পারছে না কথা বলবে কি না, বললেও কী বলে সম্বোধন করবে! আপনি না তুমি? সে বেশ খানিকটা সময় চুপ করে রইল। লোকটা ফোন নম্বর পেল কোথা থেকে?

ও পাশের গলা ফের বলল, “তোর সঙ্গে দেখা করতে চাই ধ্রুব।”

ধ্রুব অস্ফুটে বলল, “কেন?”

“এমনি। মনে পড়ছে বলে।”

ধ্রুব আবার চুপ করে রইল। ও পাশ থেকে সন্তোষ সেন বললেন, “তাড়াহুড়োর কিছু নেই। নো হারি। ভাবনাচিন্তা কর। তার পর যদি মনে হয় দেখা করিস, নইলে নো। পিতার মনে পড়লেই যে পুত্রকে দেখা করতে হবে, তার কোনও মানে নেই। গলা শুনে বুঝতে পারছি, ভাল আছিস। আমি আবার ফোন করব। ইচ্ছে হলে কথা বলবি, নইলে নো। আমার কোনও এক্সপেকটেশন নেই। ফোন নম্বর কোথা থেকে পেয়েছি, তাই নিয়ে বোকার মতো চিন্তা করিস না। নম্বরের দুনিয়ায় ফোন নম্বর পাওয়াটা সহজ কাজ।”

ক’টা দিন ভয়ঙ্কর অশান্তিতে ছিল ধ্রুব। মনে হয়েছিল, মাকে গিয়ে বলে। মানুষটা আবার গোলমাল করতে চাইছে। কিন্তু মাকে বলে লাভ কী? টেনশনে পড়বে। এর পর ফোন করলে কথা না বললেই হল।

দ্বিতীয় বার ফোন এসেছিল এক মাস পরে, “বুঝলি ধ্রব, ভেবে দেখলাম, আমাদের দেখাসাক্ষাতের কোনও প্রয়োজন নেই। একটা কথা বলার ছিল, সে কথা না বললেও চলে। কথাটা অতি সামান্য। সুতরাং নো নিড। ওয়ানস দ্য ফাইল ইজ় ক্লোজ়ড, ইট ইজ় ক্লোজ়ড। শুধু ক্লোজ়ড নয়, ফাইলে ধুলোও পড়েছে। ধুলো ঝেড়ে সেই ফাইল খোলার কোনও দরকার নেই। বুঝলি, জীবন হল তাকের মতো, সেখানে নতুন ফাইল থাকে, কিছু পুরনো ফাইলও থাকে। তাদের ফেলতে নেই, আবার হাত দিতেও নেই। সবাই মিলে ভাল থাকিস। গুডবাই।”

ধ্রুব দুম করে বলে বসল, “আমি দেখা করব। কোথায় যেতে হবে?”

এক বছর ধরে এমনটাই চলছে। যে-কথা বলার জন্য সন্তোষ সেন ডেকেছিলেন, সে কথা এখনও তিনি বলতে পারেননি। জিজ্ঞেস করলে বলেছেন, “আচ্ছা, পরের দিন বলব। আই মাস্ট।”

এখন আর জানতে চায় না ধ্রুব। আজও চাইবে না। তার পরেও ডাকলে কেন যায় সে? ধ্রুব ঠিক জানে না, আবার হয়তো জানেও। চোদ্দো-পনেরো বছরের কোনও স্মৃতি, সতেরো তলার ওপর থেকে শহর দেখার মতো আঁচড়ে যাওয়া স্মৃতি।

ধ্রুব পকেট থেকে মোবাইল বের করে ঘড়ি দেখল। অনেকটা সময় চলে গেছে। না, মানুষটা আজ আর আসবে না। অপেক্ষার মানে হয় না। ধ্রুব বড় রাস্তার দিকে পা বাড়াল। আবার কাজ খোঁজার জীবন শুরু করতে হবে। রোদ আরও বেড়েছে। মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে ধ্রুব এক সময় মুখ তুলল। তুলে থমকে গেল। সন্তোষ সেন আসছেন দ্রুত পায়ে। ফুটপাথে তাঁর লম্বা ছায়া পড়েছে। ধ্রুব ভুরু কোঁচকাল, বাবাকে আজ একটু কুঁজো লাগছে না? নাকি বাবা এ রকমই, সামনে ঝুঁকে পড়ে হাঁটে?

ছেলের সামনে এসে সন্তোষ সেন বললেন, “একটা ইমার্জেন্সি কাজে আটকে পড়েছিলাম। কাছাকাছি কোনও ফাঁকা চায়ের দোকান আছে? বাপ-বেটায় নিরিবিলিতে বসে কথা বলা যাবে এমন কোনও জায়গা? তোর সঙ্গে ভেরি আর্জেন্ট টক রয়েছে।

ধ্রুব অবাক হয়ে বলল, “সে কী! তুমি চায়ের দোকান খুঁজছ!”

সন্তোষ সেন বললেন, “বড্ড গরম। হাঁটতে ভাল লাগছে না।”

পাঁচ

ছেলেকে দেখে মানিনী চমকে ওঠে। চমকে ওঠাই স্বাভাবিক। সাত বছরের ছেলে হাতে রিভলভারের মতো দেখতে একটা কিছু নিয়ে বাড়ি ঢুকলে মায়ের না চমকে উপায় কী?

দাওয়ায় বসে চাল বাছছিল মানিনী। চালে পাথর রয়েছে। অবিকল চালের মতো দেখতে; এমন ভাবে গা ঢাকা দিয়ে থাকে যে নজর একটু সরালেই বিপদ, পিছলে ভিতরে ঢুকে যাবে। এই সময়ে অন্য দিকে মন ফেরালে হয় না। মানিনীও ফেরায় না। আঠাশ ছুঁয়েছে সে। গায়ের রং ময়লা হলেও, বালিকা বয়স থেকেই সবাই তাকে সুন্দরী বলে

জানে। এক মাথা চুল ক্রমশ বড় হয়ে এক সময় কোমর ছুঁয়েছিল, মুখে টলটলে ভাব। কিশোরী বয়সে বড় বড় চোখে কাজল, কপালে টিপ পরলে ছবির মতো লাগত। যত বড় হয়েছে সেই রূপ বেড়েছে, বেড়েছে নারীর আবেদন। তাতে প্রেম, যৌনতা সবই আছে। শরীরের গড়নটি রোগা, তবে মাপাজোখা। আর পাঁচ জনের তুলনায় বুক দু'টি বেশি বড়, কিন্তু বেমানান নয়। মনে হয়, তীরে হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে কোনও ঢেউ থমকে গিয়েছে। কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকলেও তারা নজর কাড়ে। পুরুষের তো কাড়েই, নারীরও কাড়ে। এই নিয়ে বিয়ের আগে রসিকতা যেমন শুনতে হয়েছে, হিংসেও দেখেছে মানিনী। কেউ কেউ আড়ালে মুখ ফুটে বলেই ফেলত।

"দেখিস, এই মেয়ে বুকের জোরে অনেক কিছু বাগিয়ে নেবে।"

"এ কী কথা বলছিস! মানি ও রকম মেয়ে নয়।"

"রাখ দিকিনি, কে কেমন মেয়ে তা কি আগে বলা যায়? সময়ে সময়ে বদলায়। পুরুষমানুষ কিসে মজে সে নিজেও জানে না, তবে ডাগর বুকে যে কাত হয়, সবাই জানে।"

শুধু বাপের বাড়ির গ্রামে নয়, শ্বশুরবাড়িতে এসেও শুনতে হয়েছে। ননদ কেকার তখন বত্রিশ বছর বয়স। স্বামীর সৎ বোন। মানিনীর বিয়ের বছর ঘুরতে-না-ঘুরতে শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে বিশ্রী গোলমাল লাগল তার। জমি-বাড়ির ভাগ নিয়ে গোলমাল। এ বাড়িতে এলে টানা দশ-বারো দিন থেকে যেত কেকা, আর সকাল-বিকেল গজগজ করত। নিজের বাবাকে জড়িয়ে বিশ্রী কথা বলতেও ছাড়ত না।

"বৌদি বাবাকে কী ভাবে হাত করেছে জানি না ভেবেছ? সব জানি, সব বুঝি। অমন বুক, পেট থাকলে আমিও শ্বশুরমশাইয়ের আশপাশে ঘুরঘুর করতাম আর ছলে-বলে শাড়ির আঁচল ফেলতাম। বাবাই হোক, দাদাই হোক আর বরই হোক, বেটাছেলেরা সব সমান। সব দেখা আছে আমার।"

এ কথা কানে আসায় শ্বশুরমশাই আফসোস করতেন, "তোর মা তো এমন ছিল না! অম্বরী ছিল শান্ত, ভদ্র। এ কোন সন্তানকে সে পেটে ধরেছিল!"

কেকা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলত, "তুমি তো আমার বাবা, তুমিই তো জানো তোমার মেয়ে কার সন্তান। সন্তান তো শুধু মায়ের নয়, বাবারও। আর অতই যদি অম্বরী-অম্বরী করো, সে মরে যাওয়ার পর আর-একটা বিয়ে করতে গেলে কেন? পরের বৌটাকেও তো টেকাতে পারোনি। সেও তো গেছে।"

ব্রজগোপাল কাঁপতে কাঁপতে বলেন, "মুখ সামলে কথা বল।"

কেকা মুখে তাচ্ছিল্যের আওয়াজ করে বলে, "সত্যি কথা বললে সবাই মুখ সামলানোর কথা বলে, তুমিও বলছ। তবে এ বার কিন্তু সত্যি সত্যি মুখ খুলব, তখন বিপদে পড়বে বাবা।"

ব্রজগোপাল বলেন, "কী বলবি তুই? এই বাড়িতে এত দিন বসে থাকিস কেন? কেন থাকিস? বিয়ে হয়েছে, শ্বশুরবাড়ি যা। একটা কানাকড়িও তোকে দেব না।"

কেকা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলে, "আমি দেখে নেব। মামলা করব। এ বাড়ির ভাগ আমারও।"

ব্রজগোপাল এগিয়ে এসে মেয়ের গালে সপাটে চড় মারেন। মানিনী ছুটে আসে। ননদকে টেনে সরাতে চায়। কেকা ঝটকায় বৌদির হাত সরিয়ে ঝাঁজিয়ে ওঠে, "ঢং করতে হবে না, তুমি কেমন নোংরা মেয়েছেলে আমার বুঝতে বাকি নেই বৌদি। বাবকে বশ করেছ তুমি। কী দিয়ে করেছ তা-ও জানি। দেখে নেব তোমাকেও।"

শ্বশুরমশাই বলেন, "যা খুশি করিস, আমার সম্পত্তি আমি যাকে খুশি দিয়ে যাব। তুই বাড়ি থেকে বেরো, নইলে চুলের মুঠি ধরে বের করব।"

বহু বছর আগের কথা এ সব। যে-রূপের এক সময় গর্ব ছিল মানিনীর, সে রূপ নিয়েই সে অপমানিত হতে থাকে। তাও চেষ্টা করেছিল মন থেকে এ সব ঝেড়ে ফেলতে, ভুলে যেতে। পারেনি।

পারেনি কারণ, একটা সময়ের পর নন্দগোপালও তাকে সন্দেহ করতে শুরু করে। দুর্ঘটনায় পঙ্গু হওয়ার এক বছর পর থেকে সন্দেহ অসুখ দেখা দেয় তার। বিল্ব তখন জন্মেছে সবে। শাশুড়ি মারা গিয়েছেন। শ্বশুরমশাই অসুস্থ, বাড়ি-জমি, ব্যবসাপাতি সব পুত্রবধূর নামে লেখাপড়া করে সংসার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। কোনও কোনও দিন শেষ না হওয়া ঘরে গিয়ে বসে থাকেন সারা দিন। ব্যবসাপাতি প্রায় বন্ধ, বাইরের কারও সঙ্গে দেখাও করেন না। ব্যবসা নিজে চালানোর উপায় ছিল না। কাজের মূল অংশটাই তো ছিল যাতায়াত। এ দিক ও দিক যেতে হত নিয়মিত। তার মধ্যে কলকাতাও ছিল। নন্দগোপালই সব দেখত। তার আগে দেখেছেন ব্রজগোপাল নিজে। দুর্ঘটনার পর নন্দগোপালের চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। বৃদ্ধ, অসুস্থ ব্রজগোপাল কিছু দিন লোক রেখে কাজ সামলানোর চেষ্টা করলেন। চুরিতে, লোকসানে, ধার-দেনায় সেই চেষ্টা মুখ থুবড়ে পড়ল। বেশিটাই বন্ধ হল, যেটুকু রইল, পুরনো কর্মী বিরাজ ধরকে ধরে এনে দায়িত্ব দেওয়া হল। সে আবার কামরাঙায় থাকে না, থাকে গঞ্জে।

এই সময়ে স্ত্রীর প্রতি নন্দগোপালের সন্দেহ বাড়তে থাকে। কেকা এ বাড়িতে আর না ঢুকলেও, নন্দগোপাল তার মতোই মনে করতে শুরু করল, তার শরীরের অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে সুন্দরী স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গ করছে। এটা তার মাথায় ঢুকে গেল। হাজার সেবা-যত্ন করেও সেই সন্দেহ সরাতে পারেনি মানিনী। তা আরও জোরদার হয়েছে। অথচ বিয়ের পরে লোকটা শান্তই ছিল। যত দিন শাশুড়ি বেঁচে ছিলেন, তত দিন বাড়ির কোনও বিষয়ে নিজের মতামত দিত না। সব ফেলত মায়ের ঘাড়ে। শাশুড়িই বরং রাগারাগি করতেন।

"এ বার নিজে ঠিক করো। আমাকে জড়াবে না। নিজে না পারলে মানির সঙ্গে কথা বলে নাও। তোমার বৌটি খুবই বুদ্ধিমতী। বাবা-মা আর কত দিন?"

এই কথায় নন্দগোপালের যে খুব হেরফের হত এমন নয়। বিভা মারা যাওয়ার পর সে গুম মেরে গিয়েছিল। তবে কখনও আচরণ খারাপ করেনি। পঙ্গু জীবন শুধু শরীর নয়, নন্দগোপালের মনকেও একবারে বদলে দিয়েছে। নিষ্ঠুর, বিষাক্ত করে তুলেছে। প্রথম দিকে এই বিশ্রী ঘটনা সহানুভূতির চোখেই দেখত মানিনী। হঠাৎ করে মানুষটার জীবনযাপনে বাধা এসেছে, সেই বাধা কাটিয়ে ওঠার সুযোগও নেই, স্বাভাবিক ভাবেই মনের দিক থেকে বিধ্বস্ত। গোটা দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা, রাগ হওয়াটা সেই ভেঙেচুরে যাওয়া মনেরই প্রতিফলন। এক সময় নিশ্চয়ই ঠান্ডা হবে, আশা রেখেছিল মানিনী। তবে মানুষটার ঘৃণা আরও বাড়তে থাকল। আরও হিংস্র হয়ে উঠল যেন সে। হাতে-পায়ে কিছু করে ওঠার সুযোগ ছিল কম, শুধু মুখে গালাগালি। কখনও হাতের কাছে জিনিসপত্র থাকলে ছুড়ে মারে। আবার কখনও রাগ করে খাওয়া বন্ধ করে। কেকা করেছিল অপমান, স্বামীর সন্দেহে মানিনীর মনে তৈরি হল রাগ। যত দিন গিয়েছে সেই রাগ বেড়েছে। সেই রাগের খানিকটা উপশম ছিলেন শ্বশুরমশাই, এক সময় তিনিও মারা গেলেন। মানিনী একা হয়ে গেল। নন্দগোপালের স্বভাবে নিষ্ঠুরতা আরও বাড়ল। শুরু হল নির্যাতন।

"সব কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে আলো জ্বালো, দেখব অন্য পুরুষের আঁচড়-কামড়ের দাগ রয়েছে কি না।"

সঙ্গে খুনের হুমকি। শোওয়া অবস্থাতেই চিৎকার করে উঠত, "কামরাঙার সবাইকে বলে দেব, আমার বৌটা বেশ্যা মাগি। বাবাকে হাত করে সম্পত্তি নিয়েছে, এ বার আমাকে সরিয়ে দিতে চায়।"

মানিনী শান্ত ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে, "আমার দোষ কোথায়? আমি তো তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ট্রেন থেকে ফেলে দিইনি।"

নন্দগোপাল হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "কে জানে, তুমি হয়তো লোক লাগিয়েছ। তোমার কোনও নাগর আমার পিছনে ছিল। ধাক্কা না মারলে আমি ট্রেন থেকে পড়ব কেন? এত দিন তো পড়িনি।"

মানিনী বলে, "তুমি ভুল করছ।"

নন্দগোপাল চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, "ভুল আমি করছি না মানি। আমিও তোমাকে ছাড়ব না। এখন আমার মনে হচ্ছে, তুমি আমার মাকেও মেরেছ। কী ভাবে মারলে? বিষ দিয়েছিলে? কোন বিষ?"

মানিনী চুপ করে। নন্দগোপাল যা বলে, তা-ই শোনে। ঘরের দরজায় খিল দিয়ে, হ্যারিকেন সামনে আনে। শাড়ির আঁচল সরিয়ে জামা খোলে। মনে হয়, এর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। কিন্তু ছেলেটার কী হবে? গভীর রাতে শেষ না হওয়া ঘরে গিয়ে নিঃশব্দে কাঁদে মানিনী।

এমন সময় জীবনে এল মণিনাথ, মণিমাস্টার। নন্দগোপালের নির্যাতন, অপমানের প্রতিশোধ হয়ে। এক দিন সন্ধে নামার আলো-ছায়ায় সেই মণিমাস্টার যে-দিন দাওয়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে, আঁচলের ওপর দিয়ে মানিনীর বুকে হাত রেখে ফিসফিসিয়ে বলে, "কুচযুগ শোভে যেন শ্রীফল যুগল," মানিনী বাধা দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই বাধায় জোর ছিল না। কাঁপা গলায় বলেছিল, "এ আপনি কী বলেন মণিবাবু? এ কথার মানে কী?"

মণিনাথ ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে ফেলতে নিচু গলায় বলেছিল, "কবিতা মানিনী, বহু বছর আগের লেখা এক কবিতা। সেই কবিতায় শ্রীকৃষ্ণ রাধার রূপের কথা বলেছিলেন। তুমিও তো রাধা। মানিনী তো শ্রীরাধারই আর-এক নাম। তোমারও সে রকম, বেল ফলের মতো দুটো ভারী বুক। কৃষ্ণের মতো আমাকেও পাগল করে দেয়।"

এই কথায় অবাক হয়েছিল মানিনী। যে-শরীর এত অপমানের, রাগ, ঘেন্নার— সেই শরীর তার এত সুন্দর! রাধার মতো! যে-বুকের জন্য শুধু নোংরা কথাই শুনতে হয়েছে, সেই রকম বুক নিয়ে কবিতাও লেখা হয়েছে! কই, তার বাড়িতে তো কখনও বলেনি, মানিনী রাধারই নাম! হয়তো জানত না, বা জানত, বলতে ভুলে গিয়েছিল। দাদা জানত না হতে পারে না। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো মানিনী বুকের মাঝে রাখা মণিনাথের হাত চেপে ধরে, হাঁপাতে হাঁপাতে অস্ফুটে বলে, "এমন করে না মণিবাবু, এমন করে না।"

ঘর থেকে নন্দগোপাল সে দিন চিৎকার করে উঠেছিল।

"কোথায় গেলি, গেলি কোথায় মাগি? ভরসন্ধেয় পা-কাটা স্বামী ঘরে পড়ে আছে সে দিকে খেয়াল নেই, মাগি পাউডার মেখে পাড়া বেড়াতে গেছে।"

মণিবাবুকে ধাক্কা দিয়ে মানিনী ঘরের দিকে ছোটে। সে তার স্বামীকে ঘেন্না করে, কিন্তু ভয় ভাঙেনি। এর পর থেকে নিয়ম করে মণিনাথ যাতায়াত শুরু করল। মানিনীর লুকনো মোবাইল ফোনে ডাক আসে। মানিনী শেষ না হওয়া ঘরে চলে যায়।

উঠোনে দাঁড়িয়ে বিল্ব হাঁপাচ্ছে। হাঁপানোরই কথা, অতটা পথ ছুটে এসেছে সে। তার ওপর কাঁধে স্কুলের ব্যাগ। অল্প ক'টা হলেও, বই-খাতাও তো রয়েছে তাতে। মানিনী দ্রুত ভাবতে থাকে। বিল্বর হাতে রিভলভারের মতো ওটা কী? খেলনা? হয়তো যাত্রায় যেগুলো হাতে নিয়ে অভিনয় করে, সে রকম কিছু। ছেলে কোথাও থেকে জোগাড় করেছে। লুকিয়েও নিয়ে আসতে পারে। তার দুষ্টুমির কথা সে বিলক্ষণ জানে। কিন্তু গ্রামে কি কোনও যাত্রাপার্টি এসেছে? কই, এমন খবর তো শোনেনি। যাত্রা তো আসে পুজোপার্বণে। তবে কি মেলা বসেছে? মেলায় তো কত রকমের খেলনা আসে। ছেলে হয়তো কাউকে ধরে-টরে একটা খেলনা অস্ত্র কিনে ফেলেছে। আজকাল খেলনাগুলোও সব আসলের মতো। তবে মেলা বসলেও তো জানা যেত। আর তারও তো সময় রয়েছে। বিল্ব আরও খানিকটা এগিয়ে এলে ভুল ভাঙতে সময় লাগে না মানিনীর। ডান হাতে জিনিসটা উঁচিয়ে ধরা। গুলি ছোড়ার ভঙ্গি। মুখে হাসি। বুক কেঁপে ওঠে মানিনীর। সে বোঝে, নকল নয়, আসল রিভলভার। আসল রিভলভার চেনে সে। খুব কাছ থেকে দেখেছে। তখন স্কুলে পড়ত, ক্লাস ফাইভ। দাদা এক দিন বেশি রাতে বাড়ি ফিরল। দাদা রাতেই ফিরত। খিড়কির দরজা ভেজিয়ে রাখত মা। বাবা জানতেও পারত না। সে দিন দাদা বাড়িতে ঢুকে সোজা চলে এল বোনের খাটের পাশে। হাত দিয়ে ঝাঁকিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে, ঝুঁকে পড়ে চাপা গলায় বলল, "মানি, এটা তোর পুতুলের বাক্সে লুকিয়ে রাখতে হবে।" মানিনী ধড়ফড় করে উঠে বসল। দাদার রাতে ফেরা,

সন্দেহজনক চলাফেরা, ঘরে থাকলে দরজায় খিল দিয়ে থাকায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল মানিনী। চোখ কচলাতে কচলাতে বলল, "কী এটা?"

দাদা আরও গলা নামিয়ে বলল, "খেলনা। তোর পুতুলের বাক্সটা কোথায়?"

মানিনী বিরক্ত হয়েছিল। আমার পুতুল নিয়ে টানাটানি কেন বাপু! কিন্তু দাদা অনেকটা বড় আর ভালবাসত বলে, মুখের ওপর কিছু বলতে পারেনি।

"দাও, আমি রেখে দিচ্ছি।"

দাদা বলল, "তোকে রাখতে হবে না, বাক্সটা কোথায় বল।"

"আমায় দাও।"

দাদা চাপা গলায় এ বার যেন ধমক দিয়ে বলল, "না, তোকে দেওয়া যাবে না। লোড করা আছে।"

মানিনী ফিসফিসিয়ে বলল, "লোড করা মানে কী?"

"মানে তোকে জানতে হবে না। কাল কাউকে বলবি না, আমি রাতে বাড়ি ফিরেছিলাম।"

পুরনো একটা টিনের বড় বাক্সে মানিনী পুতুল রাখত। দাদা তার 'খেলনা' সেই বাক্সে লুকিয়ে রেখেছিল। পর দিন ভোরে অন্ধকার থাকতে বেরিয়ে যায়। মানিনী তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বেলায় খবর আসে, রেললাইনের ধারে আঠারো-উনিশ বছরের এক ছেলের ডেডবডি পাওয়া গিয়েছে, হাতে রিভলভার। সেই রিভলভারের গুলিতেই নাকি মরেছে ছেলেটা। মানিনী ছুটে গিয়ে তার পুতুলের বাক্স খোলে। সেই 'খেলনা' নেই। পুলিশ জানিয়েছিল, রেলের ওয়াগন ভাঙতে গিয়ে দু'দলে লড়াই। কেউ বলল, বাজে কথা, রাজনীতির ব্যাপার। পুলিশ মেরে হাতে রিভলভার ধরিয়ে দিয়েছে। আবার শোনা গিয়েছিল, এ নাকি আত্মহত্যা। কোনটা ঠিক মানিনী জানে না, সেই বয়সে বোঝার ক্ষমতা ছিল না। তবে সে এটুকু বুঝেছিল, দাদার এই দুম করে মরে যাওয়ার পিছনে ওই অস্ত্র কোনও-না-কোনও ভাবে ছিল। তখন সে অস্ত্রের নাম জানত না। পরে জেনেছে। বড় হওয়ার পর। ছেলের হাতে সেই রিভলভার দেখে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল মানিনীর। চালের থালা সরিয়ে ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াল সে। তত ক্ষণে বিল্ব উঠোন থেকে দাওয়ায় লাফিয়ে উঠেছে। হাত থেকে রিভলভার নামিয়ে জলচৌকির ওপর রেখে মায়ের দিকে তাকিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে হাসল। যেন যুদ্ধ জিতেছে। তার পরনে কালো হাফ-প্যান্ট, বহু বার ধোওয়ায় রং হারানো নীল শার্ট, পায়ে রাবারের জুতো। মানিনী এগিয়ে ছেলের দু'কাঁধ চেপে ধরে।

"এটা কী? কী এটা?"

বিল্ব এক গাল হেসে বলে, "বন্দুক। ছোট বন্দুক। তুমি চেনো না মা?"

মানিনী স্থির চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, "এ তুই কোথায় পেয়েছিস?"

বিল্ব আরও বেশি করে হেসে বলে, "কালাদিঘির ঘাটে কুড়িয়ে পেয়েছি। পুঁটুলির মধ্যে ছিল, চিঁড়ে-মুড়ির ভিতরে। কী মজা, না মা?"

মানিনী শক্ত চোখে-মুখে বলল, "ওই সকালে কালাদিঘির ঘাটে কী করছিলি? স্কুলে যাসনি?"

বিল্ব বিপদ আঁচ করে। কাঁচুমাচু হয়ে বলে, "স্কুলেই তো যাচ্ছিলাম।"

মানিনী বোঝে ছেলে মিথ্যে বলছে। স্কুল শুরু হয়েছে সেই সকালে, এত ক্ষণ পর কী করে যাবে? তা ছাড়া কালাদিঘি তো গ্রামের এক প্রান্তে। স্কুলে যাওয়ার পথে পড়ে না। ছেলে নিশ্চয়ই আজও স্কুল পালিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তবে এখন এ সব প্রশ্নের মানে হয় না। স্কুল পালানো নয়, আগে ওই রিভলভারের ব্যবস্থা করতে হবে। একটু চুপ করে কাঁপা গলায় সে বলল, "এ কী সর্বনেশে কাণ্ড করলি বিল্লু!"

বিল্ব অবাক গলায় বলে, "আমি কী করলাম! আমি কি কারও কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি? ঘাটে পড়ে ছিল, প্রথমে তো দেখতেই পাইনি।"

মানিনীর মাথায় আগুন চড়ল। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "ফেলে দিলি না কেন? জলে ফেলে দিলি না কেন? কে তোকে এ জিনিস বাড়ি আনতে বলেছে?"

বিল্ব মুখ ভেংচে বলল, "ইস, ফেলব কেন? আমি পেয়েছি, আমি রেখে দেব। এটা আমার বন্দুক। আমি গুলি চালাব।"

কথা শেষ করে আঙুলের সঙ্গে আঙুল জড়িয়ে অদৃশ্য বন্দুক থেকে গুলি চালানোর অভিনয় করল বিল্ব।

আর নিজেকে সামলাতে পারল না মানিনী। ঝুঁকে পড়ে সপাটে চড় মারল ছেলের গালে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "ও কথা বলবি না কখনও। ওই জিনিস আমার বললে কী হয় জানিস? জানিস কী হয়?" একটু দম নিয়ে ফের বলল, "পুলিশে ধরে নিয়ে যায়, হাজতে পুরে রাখে।"

চড় খেয়ে অবাক হয়ে যায় বিল্ব। মার খাওয়ার কারণ বুঝতে পারে না। কী অন্যায় করেছে সে? একটা জিনিস পড়ে থাকতে দেখে তুলেছে। পথে-ঘাটে পড়ে থাকা এমন কত জিনিসই তো তুলেছে। তার একটা লুকোনো সুটকেস রয়েছে। ভাঙা টিনের সুটকেস। কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসে ভর্তি। মার্বেল গুলি, তামাটে পয়সা, কাঠের লাট্টু। এ বন্দুকও তেমন। চুরি তো করেনি। তা হলে? কী দোষ তার? মায়ের হাত থেকে ছিটকে সরে যায় বিল্ব। লাল হয়ে যাওয়া গালে হাত রেখে বলে, "মারলে কেন?"

মানিনী হিসহিসিয়ে বলে, "আবার মারব, মেরে হাড় ভেঙে দেব। আর কখনও বলবি না, এই জিনিস আমার। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি...বলবি...কিছুই বলবি না...কাউকে এ জিনিসের কথা বলতে যাবি না।"

বিল্ব থমকে থেকে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, "একশো বার বলব, ওটা আমার, ওটা আমার, ওটা আমার।"

কথা বলতে বলতে বিল্ব এগিয়ে এসে রিভলভারটা তুলতে যায়। মানিনী এগিয়ে ছেলের হাত চেপে ধরে। বিল্ব মায়ের হাতে কামড়ে দেয়। মানিনী তার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকিয়ে দেয়। পিঠে কিল-চড় মারতে থাকে। বিল্ব নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করে আপ্রাণ। মা-ছেলের ঝটাপটি শুরু হয়। মানিনী চাপা গলায় বলতে থাকে, "ওতে হাত দিলে তোকে মেরেই ফেলব...খুন করে ফেলব আজ..."

ধস্তাধস্তিতে বিল্ব এক সময় মায়ের হাত ছাড়িয়ে ফেলল। রিভলভার, স্কুলের ব্যাগ ফেলে, মাটির দাওয়া টপকে উঠোনে নামে সে, তার পর কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় এক ছুটে। সম্ভবত মায়ের মূর্তি দেখে সে ভয় পেয়েছে, তার মনে হচ্ছিল, সত্যি বুঝি মেরে ফেলবে। ছেলে চোখের আড়াল হতে মানিনী থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। পা নাড়াতে পারে না। শরীর কাঁপতে থাকে। তবে কয়েক মুহূর্ত যেতেই সে বুঝতে পারল, দাঁড়িয়ে থাকার মতো সময় তার হাতে নেই। যা করার এখনই করতে হবে। কেউ এসে পড়লে সর্বনাশ। জিনিসটার দিকে আগে চোখ পড়বে। তখন কী হবে? চারপাশে তাকাতে থাকে মানিনী। চাদর? গামছা? কী দিয়ে চাপা দেবে? দাওয়ার এক কোণে রাখা কতকগুলো বস্তার দিকে ছুটে যায় মানিনী। আলুর ছেঁড়া বস্তা। একটা তুলে এনে অস্ত্রটার ওপর আগে চাপা দেয়। এতে হবে না, একেবারে লুকিয়ে ফেলতে হবে। শুধু বাইরের লোক নয়, বিল্বর কাছ থেকেও লুকোতে হবে। কোথায় লুকোবে? বাইরে যে বাঁশঝাড়টা রয়েছে, সেখানে? নাকি আর একটু এগিয়ে ডোবার মধ্যে ফেলবে? সবচেয়ে ভাল হয়, আরও দূরে গিয়ে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দিতে পারলে। সত্যিই কি ভাল হয়? থরথর করে কাঁপছে মানিনী। সে মনস্থির করতে পারছে না। দাদার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেই মৃত্যু সামলাতে বাবাকে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল তার ঠিক নেই। মর্গ, পুলিশ, আদালত সব জায়গায় জলের মতো টাকা খরচ হয়েছে। এমনি মৃত্যুতে তাও কিছু সম্মান, সহানুভূতি থাকে। গুলি খাওয়া মৃত্যুকে সবাই ঘেন্না করে। আবার মারতে চায় যেন। কী করবে এখন সে? কিন্তু কী করবে ভেবে বসে থাকলে চলবে না। কিছু একটা করতে হবে। হাতে সময় নেই। বিল্লু যে ভাবে হাতে ধরে জিনিসটা নিয়ে এসেছে, নিশ্চয়ই কেউ দেখেছে। খবর গোপন থাকবে না। বস্তার আড়ালে রিভলভার হাতে তুলে মানিনী বুঝল, জিনিসটা ভারী।

গুলি ভরা নয় তো? পুকুরে ফেলে দিলে ডুবে যাবে। কিন্তু পুকুরে জাল ফেললে উঠেও আসবে যে। তার চেয়ে বরং অন্য কোথাও। আচ্ছা, শেষ না হওয়া ঘরে যদি রাখা যায়? ওই ঘরে তো কারও যাতায়াত নেই। গ্রামের লোকেও ঢুকতে ভয় পায়। নানা রকম গল্প ফাঁদে। বলে, ব্রজগোপাল নাকি ওই ঘরে প্রথম বৌয়ের সঙ্গে রাত জাগতেন। ঘর দিয়ে গিয়েছেন তাকেই। কেন জানি মানিনীর মনে হচ্ছে, এই জিনিস লুকোনোর জন্য ওই ঘরই সবচেয়ে ভাল। পুলিশ এলেও ঢুকবে না। গাঁয়ে ঢুকলেই ওই ঘর সম্পর্কে রটনা জানতে পারবে। ওদের যত হম্বিতম্বি গরিব মানুষের সঙ্গে। ভূত-টুতের কথা শুনলে ভয় পায়। মুখে বলবে, 'সাপখোপ আছে, গিয়ে কাজ নেই।' আসলে অন্য ভয় পাবে।

ছয়

দুটো দোকানে ঢুকেও বেরিয়ে এলেন সন্তোষ সেন। ছেলেকে নিয়ে বসলেন তিন নম্বর চায়ের দোকানে। ফুটপাথের এক পাশে দরমার বেড়া দিয়ে ঘেরা। এক সময় এই ধরনের দোকান কলকাতার পথেঘাটে ছিল। এখন কমেছে। তার বদলে নানা ধরনের কফি শপ, টি শপ গজিয়েছে। কাচের দরজা ঠেলে ঢুকতে হয়। এক পশলা বর্ষায় জল জমা, দিনের বেলায় ট্র্যাফিক জ্যাম, রাত আটটায় পথে পথে বাস নেই, যেখানে-সেখানে ফুটপাথ দখলের শহর সম্ভবত কফি শপ দিয়ে আধুনিক হচ্ছে।

"কেন এত বার দোকান বদলালাম বলতে পারিস?"

ধ্রুব বলল, "কেন?"

"কেউ যদি ফলো করে, তাকে খানিকটা বোকা বানিয়ে নিলাম, মেড হিম আ ফুল।"

এই ঘোর বেলাতেও দোকানে পর্যাপ্ত আলো নেই। কেমন ছায়া ছায়া। উল্টো দিকের টেবিলে যে বসে রয়েছে, এই আলো-ছায়ায় তার মুখটাও স্পষ্ট দেখা যায় না। পিছনের দিকের এক মাত্র জানলাটি আটকে আখাম্বা ফ্ল্যাটবাড়ি উঠছে। এক সময় এই সব সরু গলিতে বড় বাড়ি তৈরির কথা কেউ ভাবতেও পারত না। এখন লম্বা লম্বা ফ্ল্যাট জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়, যেন বলতে চায়, 'আরে, আমাকে টিকতে হবে তো'। আশপাশের ঘরবাড়ির আকাশ, আলো, রোদ, বৃষ্টি সব এলোমেলো করে দেয়। এই দোকানেও তা-ই হয়েছে। আলো-বাতাসের মৃত্যু হয়েছে।

সন্তোষবাবু বললেন, "চা বল, অমলেট পাওয়া যাবে না? খিদে পেয়েছে।"

ধ্রুব বলল, "তা হলে এখানে এলে কেন? কোনও ভাতের হোটেলে যেতে পারতে। যাবে?"

সন্তোষবাবু বললেন, "নো নিড, জেলে থাকলে খিদে সহ্য করার কায়দা রপ্ত করতে হয়। সেটা মাঝে মাঝে ঝালিয়ে নিই। কে জানে আবার কবে ঢুকে যাই, হ্যাবিট নষ্ট করা যাবে না। এখন অমলেটেই হবে।"

ধ্রুব অমলেট, ঘুগনি, টোস্ট— যা খাবারদাবার এখানে পাওয়া যায়, সবই দিতে বলল। মনে পড়ে, বাড়িতে বাবাই বাজার করত। সকালে মায়ের সময় হত না, অফিসের তাড়া। সন্ধেবেলা ফেরার পথে কোনও কোনও দিন আনাজ-টানাজ হয়তো কিনে আনত। আবছা মনে পড়ে। মা ঘরে ঢুকে আগে রান্নাঘরে গিয়ে ব্যাগ নামাত। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে রসিক ছিল বাবা। খেতে বসে 'এটা চাই, সেটা চাই' করত। পেলে ভাল, না পেলে যে ব্যস্ত হয়ে পড়ত এমন নয়। খাওয়ার পর দুপুরে একটা ঝিম মারা ঘুমও দিত। ছোট সাপ্লাইয়ের ব্যবসায় দুপুরের ঘুম কোনও সমস্যা নয়। ব্যবসায় মনও ছিল না। ধ্রুবর মনে পড়ল, মানুষটার এই ভাতঘুম নিয়ে মা রাগারাগি করত।

"না ঘুমিয়ে কাজে মন দিতে পারো তো।"

বাবা শান্ত গলায় বলত, "কৃষ্ণপ্রিয়া, আমার কাজের ব্যাপার আমাকে বুঝতে দাও।"

মা রেগে গিয়ে বলত, "তুমি বুঝলে তো কোনও সমস্যা ছিল না। যা উপার্জন করো সেটা যে সংসারের জন্য, ছেলে মানুষ করার জন্য কিছুই নয়, সেটা বোঝো? আমার বাড়িতে বসে, আমার উপার্জনে যে তোমাকে টিকে থাকতে হয়, সেটা কি বুঝতে পারো?"

বাবা আরও শান্ত ভঙ্গিতে বলত, "বুঝব না কেন, অবশ্যই বুঝি প্রিয়া। আর এও বুঝি, এটাই আমার যোগ্যতা। তোমার মতো স্ত্রী পেতে যোগ্যতা লাগে।"

বাবা মাঝে মাঝে মায়ের নাম ছোট করে নিত। কখনও কৃষ্ণা, কখনও প্রিয়া। কখনও আবার পুরোটাই বলত।

মা ফুঁসে উঠত, "আমাকে কী ভাবে পেয়েছ আমি সবচেয়ে ভাল জানি। আমার ভুল। সব মানুষই জীবনে কিছু-না-কিছু হঠকারিতা করে, কারওটা ভয়ঙ্কর হয়, আমার তা-ই হয়েছে। যে শুনেছিল, সে-ই বলেছিল, কৃষ্ণপ্রিয়া, ভুল করছিস। তখন আবেগে ছিলাম, একটা মানুষ এ ভাবে প্রেমে উন্মাদ হয়ে উঠেছে, নিজেকে সামলাতে পারিনি। এই ভুল অনেক মেয়েই করে, আমিও করেছি। অনেক ভাল পাত্র জুটত আমার।"

বাবা হাসত। বলত, "কিচ্ছু ভুল করোনি কৃষ্ণপ্রিয়া। ভাল পাত্র হয়তো জুটত, কিন্তু কেউ আমার মতো তোমাকে ভালবাসতে পারত না, এটা আমি হলফ করে বলতে পারি। আর তুমিও সেটা জানতে। তুমি এত বোকা নও যে, আমি চাইলাম, আর কিছু না ভেবে তুমি আমাকে টপাত করে বিয়ে করে ফেললে।"

মা ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে ফেলতে বলত, "হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলাম, ভেবেছিলাম, তুমি নিজেকে বদলাবে। উদ্যমে, রুচিতে বদলাবে। পুরোটা না পারো, খানিকটা আমার যোগ্যতার কাছে আসতে চেষ্টা করবে। অনেকেই এ রকম হয়। চারপাশে দেখো না? মিসম্যাচড বিয়ে, স্বামী-স্ত্রী দু'জনে নিজেদের বদলাতে চেষ্টা করছে, দেখতে পাও না?"

বাবা বলত, "তুমি বরং আমার মতো হয়ে যাও কৃষ্ণা। অত টেনশন না নিয়ে ফুরফুরে থাকো।"

এই পর্যায়ে মা শোওয়ার ঘরে ঢুকে জোর আওয়াজে দরজা বন্ধ করে দিত। বন্ধ দরজার ও পাশ থেকে জিনিস ভাঙা, কাপড় ছেঁড়া, কান্নার আওয়াজ ভেসে আসত। বাবা ফ্যালফ্যাল করে বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকত। তার পর দরজার আড়াল থেকে ভীত মুখখানি বের করা বালক পুত্রের দিকে ফিরে বোকার মতো হেসে নিচু গলায় বলত, "আড়াল থেকে সব শুনেছিস নাকি? বুঝেছিস কিছু? তোর মা অমন রেগে গেল কেন রে ধ্রুব? আমি কোন কথাটা খারাপ বললাম? তোর মাকে কি আমি ভালবাসি না? এতে রেগে যাওয়ার কী হয়েছে!" তার পর বিড়বিড় করে নিজের মনে কথা বলতে বলতে বাড়ি থেকে বেরিয়েও যেত।

একটা সময়ের পর থেকে মা ধ্রুবকে নিয়ে রাতে আলাদা শুতে শুরু করেছিল। অনেক রাতে দরজায় খুটখুট আওয়াজ হত। কেউ যেন টোকা দিত। ঘুম ভেঙে যেত ধ্রুবর। ভয় পেয়ে মাকে আঁকড়ে ধরে বলত, "মা, দরজায় আওয়াজ করে কে?"

মা পিঠে চাপড় দিয়ে ফিসফিস করে বলত, "ও কিছু নয়, ঘুমিয়ে পড়ো সোনা।"

ভালবাসি কথাটার মানে যখন বুঝতে শুরু করল ধ্রুব, তখন বাবা-মায়ের দূরত্ব অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। কোনও কোনও সময় বিরক্ত লাগত। মায়ের মতো ঝকঝকে, স্মার্ট এক জনের পাশে বাবা লোকটাকে আরও অকর্মণ্য, ম্রিয়মাণ মনে হতে লাগল। ধীরে ধীরে এও বুঝতে শিখল, বাবার ভালবাসার কথা শুনে মায়ের দরজা বন্ধ করে জিনিস ভাঙা, কাপড় ছেঁড়া, কান্নাকাটি করা আসলে ছিল অনুশোচনা। বাবার ভালবাসাকে এক সময় গ্রহণ করার

অনুশোচনা। কে জানে, রাগও হতে পারে। নিজের ওপর রাগ। মানুষের এ বড় আশ্চর্য অভ্যেস। নিজের ভুলে নিজেই রাগ করে। পৃথিবীর প্রাণিকুলে এই আত্মক্রোধের অভ্যেস আর কারও কি রয়েছে? ভুল করে কোনও শিকার ধরতে ব্যর্থ হলে, পশু কি নিজের ওপর রাগ করে? কাঁদে? এই মানুষটা মাকে পছন্দ করে ফেলল কেন? সব দিক থেকে যে আলাদা, তাকে বোঝাটাই তো মুশকিল। হয়তো ভালবাসা এ রকমই। বোঝাবুঝির ধার ধারে না। ধ্রুব নিজের মনে ভাবে, রাধিকা কি তাকে বুঝতে পারে? কখনও মনে হয় পারে, কখনও মনে হয় পারে না।

পরিতৃপ্তির সঙ্গে অমলেট, ঘুগনি শেষ করে সন্তোষ সেন চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। আরামের চুমুক।

"সব জায়গাতেই স্ট্রিট ফুড উপাদেয় হয় কেন জানিস?"

রোদের মধ্যে এক ঘণ্টা পথে ঘুরিয়ে এটা কোনও প্রশ্ন হল? হাবিজাবি কথা। তার পরেও কেন জানি, এই লোকের হাবিজাবি কথা শুনতে ধ্রুবর আজকাল ভাল লাগে। কেন? বাবা বলে? নাকি মানুষটা ইন্টারেস্টিং বলে? যত দিন বাড়িতে ছিল, সংসারের মধ্যে ছিল, তত দিন ছিল বিরক্তিকর। ঘুড়ি, বল, চকোলেট কিনে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। তাই নিয়ে কোনও চিন্তা ছিল না লোকটার। চাইলে নির্লিপ্ত ভাবে বলত, "মাকে বলিস।" কথা বেশি বলত না, পারতও না। বললেও একঘেয়ে সব বিষয়। গোটা মানুষটাকেই ম্যাড়মেড়ে লাগত। মনে হত, মা ঠিকই বলে, একটা অযোগ্য মানুষ। বন্ধুদের বাবাদের দেখলে হিংসে হত, দুঃখ হত। সেই মানুষটাই অমন ভয়ঙ্কর অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে জেলে গেল, ফিরে এল যেন অন্য মানুষ হয়ে! হয়তো এ রকমই হয়। ঘরের বাইরে গিয়ে মানুষ বদলে যায়। হয়তো তা-ও নয়, ঘরে থেকেও বদলায়। নইলে এক জন বোকা ধরনের মানুষ এ রকম একটা অপরাধের সঙ্গে জড়ায় কী করে?

জেলে কখনও সন্তোষ সেনকে দেখতে যায়নি ধ্রুব। যাওয়ার প্রশ্নও ওঠেনি। অপরাধ করে ফেরার হওয়ার পর থেকে কৃষ্ণপ্রিয়া শুধু সম্পর্ক অস্বীকার করেননি, নামও মুখে আনতেন না। অকর্মণ্যতার সঙ্গে অপরাধ যুক্ত হয়ে লোকটাকে মন থেকে মুছে দিল। পুলিশ বেশ কয়েক বার বাড়িতে এসেছে— থানায়, লালবাজারে ডেকে পাঠিয়েছে কৃষ্ণপ্রিয়াকে। সম্ভবত বার কয়েক কথা বলে ওরা বুঝতে পারে, আসামির সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর যোগাযোগ থাকা তো দূরের সম্ভাবনা, মহিলা তাঁর স্বামীকে এই অপরাধের আগে থেকেই অপছন্দ করেন। বিয়ের সামান্য ক'টা বছরের পরই, দু'জনে পরস্পরের থেকে অনেকটা সরে যান। তার পরেও কি কৃষ্ণপ্রিয়ার ওপর পুলিশের নজর ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। এক দিন বাড়িতে বসে কৃষ্ণপ্রিয়া পুলিশ অফিসারকে বলেছিলেন, "আপনারা আমার টেলিফোনে আড়ি পাতুন, বাড়ির সামনে সিভিল ড্রেসে লোক বসিয়ে দিন, আমি যেখানে যাই সেখানে ফলো করুক— কোনও সমস্যা নেই, আমি চাই খুনি অ্যারেস্ট হোক। ওর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।"

ধ্রুব শুনেছিল সে কথা। কৃষ্ণপ্রিয়া সেন চেয়েছিলেন বলেই শুনতে পেরেছিল। ছেলের সামনেই বলেছিলেন। মাঝে এক-দু'বার মর্গেও কৃষ্ণপ্রিয়া সেনকে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। মৃতদেহ দেখে চিনতে হবে। সে সব পালা ফুরিয়ে যায় আসামি ধরা পড়ার পর।

সন্তোষ সেন চোখ নাচিয়ে বললেন, "কী রে বল, স্ট্রিট ফুড খেতে কেন ভাল লাগে?"

"জানি না কেন," ধ্রুব জবাব দেয়। বলে, "তোমার পেট ভরেছে তো? তা হলেই হবে।"

সন্তোষ সেন বেঞ্চে হেলান দিয়ে ভাষণ দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "পথের খাবার খোলা জায়গায় তৈরি হয়, বেশির ভাগ সময়েই একেবারে আকাশের নীচে। অরিজিন্যাল সানলাইট, এয়ার এসে পড়ে। ওগুলো হল তোর খাঁটি মশলাপাতির মতো। ওতেই স্বাদ বেড়ে যায়। পথের খাবার আর পথের মানুষ একই রকম জানবি, খাঁটির ভাগ বেশি।"

বাবার এই দার্শনিক ভানে ধ্রুব মজা পায়। বলে, "তা-ই হবে।"

সন্তোষবাবু চায়ের কাপ নামিয়ে টেবিলে ঝুঁকে পড়েন। গলা নামিয়ে বলেন, "এ বার ওয়ার্ক টক। কাজের কথা।"

ধ্রুব বলে, "বলো।"

"তুই আবার বেকার হয়েছিস। এই নিয়ে থার্ড টাইম। তা-ই তো?"

ধ্রুব অবাক হয়ে বলল, "তুমি কোথা থেকে জানলে? কে বলল?"

সন্তোষ সেন ছেলের এই প্রশ্ন উপেক্ষা করে বললেন, "তুই যে চাকরিবাকরি ধরে রাখতে পারবি না, সেটা জানা কথা। এটা তোর সমস্যা নয়, জিনঘটিত প্রবলেম। তোর বাবাও কাজকর্ম পারেনি, তুইও পারবি না। এক সময় আমার হাতে কোনও কাজই ছিল না। তোর মা জানত আমি ব্যবসার কাজে বেরোচ্ছি, আসলে বাইরে গিয়ে পথে ঘুরে বেড়াতাম, পার্কে বসে থাকতাম। কী করব, হুট করে বিয়ে করে বসেছি, এখন বেকার বললে কে শুনবে? এক দিন ধরাও পড়ে গেলাম। তোর মা তো এই মারে কি সেই মারে। আরে বাপু, সবাই কি সব পারে? তার পর অবশ্য চেঞ্জ হয়ে গেল। ইন কেজ, বুঝতে পারলাম, ওয়ার্ক ইজ় লাইফ। কর্মই জীবন। ইন কেজ কী বুঝতে পারছিস? জেলের ভিতর। তার পর... থাক সে সব কথা। কাজ করবি?"

ধ্রুব বলল, "কী কাজ? চাকরি? তুমি চাকরিও পাচার করছ নাকি?"

সন্তোষবাবু চোখ সরু করে বললেন, "নো পাকা চাকরি, ফ্রিলান্স।"

ধ্রুব বলল, "কে দেবে?"

সন্তোষবাবু বললেন, "আমি দেব।"

ধ্রুব বলল, "না, করব না।"

সন্তোষবাবু বললেন, "জানতাম করবি না। এই নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তা হলে টাকাপয়সা না নিয়েই আমার একটা উপকার করে দে। আ হেল্প ফ্রম মাই সন।"

ধ্রুব নড়েচড়ে বসল। বলল, "কোনও গোলমালের কাজ?"

সন্তোষবাবু বললেন, "অন্য কেউ করলে নিশ্চিত গোলমাল, তুই করলে গোলমাল নয়। সেই জন্যই তোকে বলা। তুই রাজি না হলে আমাকে নিজে যেতে হবে। আমি হয়তো ফাঁসব।"

ধ্রুব বলল, "কাজটা কী?"

সন্তোষবাবু এ দিক ও দিক তাকিয়ে চাপা ধমকের গলায় বললেন, "আহ্, অত জোরে কথা বলছিস কেন? গলা নামা," তার পর নিজেই আরও খানিকটা গলা নামিয়ে বললেন, "আমার একটা জিনিস ভুল জায়গায় সাপ্লাই হয়ে গিয়েছে, ফেরত আনতে হবে।"

ধ্রুব বলল, "কী জিনিস? কোথায় চলে গেছে? পুরোটা বলো, নইলে বুঝতে পারছি না।"

সন্তোষ সেন টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, "একটা রিভলভার। পাঠাচ্ছিলাম লোক দিয়ে। সে বেটা মাঝপথে ফেলে পালিয়ে আসে।"

ধ্রুব ঢোঁক গিলে বলে, "রিভলভার! কী বলছ এ সব? তুমি ও সব জিনিসের কারবার করো নাকি?"

সন্তোষবাবু দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "গলা নামিয়ে কথা বল। তোকে তো বলেছি, পাচারের কাজ করি। এ দিকের জিনিস ও দিকে পাঠাই। সে রিভলভার হোক আর হোলি গ্যাঞ্জেস ওয়াটারই হোক। হোলি গ্যাঞ্জেস ওয়াটার কী জানিস? পবিত্র গঙ্গার জল, বিজ়নেসে নো ভেদাভেদ।"

ধ্রুব ভয় পায়। অবাকও হয়। রিভলভারের মতো একটা ভয়ঙ্কর অস্ত্র নিয়ে এমন সহজ ভাবে কথা বলা যায়! মানুষটা এখনও অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে? জেল খেটে শিক্ষা হয়নি? অবশ্য অপরাধ করে জেলে ঢুকলে, অপরাধ ঘাড়ে চেপে বসে। ছাড়ার উপায় থাকে না।

সন্তোষবাবু বললেন, "এই সব কাজ আমি নিজে করি না। লোক আছে, ক্যুরিয়র। ঠিক ছিল জিনিসটা সে পার্টিকে পৌঁছে দেবে।"

ধ্রুব বলল, "কোথায় পৌঁছে দেবে?"

সন্তোষবাবু বললেন, "একটা ব্যবহার না হওয়া দিঘির পাশে। বাতিল দিঘি, গ্রামের লোক ব্যবহার করে না। সেখানে আমার লোক রেখে আসবে, পার্টি এসে তুলে নেবে। ওই দিঘির একটু পরেই হাইওয়ে, তার পর জঙ্গল। পার্টি হাইওয়েতে গাড়ি নিয়ে আসবে। টাইম মতো আমার

ক্যুরিয়র জিনিস রেখে সরে গেলে, সে মাঠ পেরিয়ে এসে দিঘির ধার থেকে জিনিস নিয়ে যাবে।”

ধ্রুব কাঁপা গলায় বলল, “বাবা, তুমি এখনও এ সবের মধ্যে জড়িয়ে রয়েছ কেন? কী দরকার তোমার?”

সন্তোষ সেন ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, “জ্ঞান দিস না। ডোন্ট গিভ মি অ্যাডভাইস। সব কিছুতে জড়িয়ে পড়াটা ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে না। সিচুয়েশন বাধ্য করে। তুই যে নানা ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকিস, সে কি তোর নিজের ইচ্ছের ওপর? ডোন্ট ফরগেট, তোর পিতৃদেব সেভেন ইয়ারস ভেতরে ছিল। ভেতরে থাকা মানুষ আর বাইরে থাকা মানুষে ফারাক থাকে। না চাইলেও আমাকে কিছু কাজ করতে হয়। কথা দিয়ে এসেছি, জিনিস পৌঁছে দেব। যাকে কথা দিয়েছিলাম, সে আমাকে বাইরে আসতে সাহায্য করেছিল। জেলের ভিতর থেকেই যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে আমার মামলায় বিরাট সাহায্য করেছে। শেষ সময়ে মূল সাক্ষী বয়ান বদলেছে। নইলে এত ক্ষণে আমি হয়তো ঝুলে গেছি। হ্যাঙ্গড টু ডেথ। তাকে আমি ‘না’ কী করে বলব? আমি কি সেলফিশ? তা ছাড়া...তা ছাড়া ভাল কাজ, মন্দ কাজ ব্যাপারটা স্পষ্ট নয়। মানুষের মতোই। কে কোন দিক থেকে দেখছে, তার ওপর নির্ভর করে। জেলে এমন অনেককে দেখেছি যারা অপরাধ করেনি, তার পরেও আটকে আছে, বছরের পর বছর, বিচার পাচ্ছে না। দুনিয়া কিন্তু তাদের জানে অপরাধী, মন্দ লোক বলে,” হড়বড় এতটা বলে একটু থামলেন সন্তোষবাবু। প্লেটের ওপর পড়ে থাকা অমলেটের একটা সামান্য টুকরো তুলে মুখে নিলেন। বললেন, “তা ছাড়া, এর চেয়ে ভাল কাজ আর কী পাব?”

ধ্রুব চায়ের খালি কাপ চেপে ধরে নিচু গলায় বলল, “তোমাকে কিছু পেতে হবে না, আমি আছি।”

সন্তোষবাবু একটু চুপ করে ঠোঁটের ফাঁকে হাসলেন। বললেন, “তুই কী করবি? আমাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলবি? ধ্রুব, যা বুঝিস না, তা নিয়ে তর্ক করিস না। তুই একটা ফুল বাট গুড বয়, বোকা কিন্তু ভাল ছেলে। এমন একটা কাজের সঙ্গে জড়িয়ে তোকে বিপদে ফেলতে চাইতাম না। চাইছি এই কারণে যে, কাজটা শান্ত ভাবে এক মাত্র তুই করতে পারবি... থাক, অন্য কোনও উপায় বের করতে হবে। পার্টির কাছ থেকে ফুল পেমেন্ট নেওয়া হয়ে গেছে। এই ধরনের সাপ্লাইতে ধার-বাকি হয় না। জিনিসটার দামও অনেক। চল, উঠি।”

ধ্রুব একটু চুপ করে থেকে বলল, “জায়গাটা কোথায়?”

“কাজ যখন করবি না, শুনে লাভ কী?”

ধ্রুব বলল, “তাও শুনি।”

সন্তোষবাবু বললেন, “এই গ্রাম তুই চিনিস। নাম কামরাঙা। এক সময় কামরাঙায় গিয়ে দিনের পর দিন পড়ে ছিলি, সে গল্প তুই-ই ক’দিন আগে আমায় বলেছিস। তোর সেকেন্ড চাকরি। চাষের জন্য নতুন কোম্পানির সার, পেস্টিসাইড নিয়ে গিয়েছিলি। প্রোমোশনের কাজ। এক টুকরো জমিতে চাষও করিয়েছিলি, সার কেমন কাজ করছে দেখার জন্য। ওই গ্রামে পড়ে থাকার কারণে লোকজনকেও চিনে ফেলেছিলি।”

ধ্রুব বলল, “হ্যাঁ, সে তো কয়েক বছর আগে। সারের প্রোমোশন ফেল করল। আমারও কাজ গেল। সেখানে কী?”

সন্তোষবাবু এ দিক ও দিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, “বললাম তো, ওই গ্রামের বর্ডারে একটা দিঘি মতো রয়েছে, কালাদিঘি। কেউ ব্যবহার করে না, বলে দিঘির জলে বিষ আছে। পয়জ়ন ইন দ্য ওয়াটার।”

ধ্রুব বলল, “মনে আছে।”

সন্তোষবাবু বললেন, “আমার লোক ওই দিঘির ঘাটেই একটা লাল কাপড়ের পুঁটুলির মধ্যে রিভলভারটা রেখে আসে। পুঁটুলিতে চিঁড়ে-মুড়ি রাখা ছিল, যাতে কেউ সন্দেহ করলেও চট করে বুঝতে না পারে। পার্টি সে রকমই বলেছিল। চিঁড়ে-মুড়ি রাখতে হবে। আমার ক্যুরিয়র লোকটা গ্রেট মিসটেক করল। বিগ ব্লান্ডার। বিকেলের বদলে দিঘির ধারে পুঁটুলি রেখে এল ভোরে। একেবারে কাক ডাকা ভোরে।”

সন্তোষবাবু থামলেন। ধ্রুবর কাছে অবিশ্বাস্য লাগছে। এ সব গল্পে থাকে, সত্যি ঘটে নাকি! মানুষটা নিশ্চয়ই গল্প বানাচ্ছে। সন্তোষ সেন ফের বলতে শুরু করলেন, “বিকেলে পার্টি স্পটে গিয়ে দেখতে পায় পুঁটুলিটা পড়ে আছে, ভিতরে চিঁড়ে-মুড়িও রয়েছে, শুধু আসল জিনিস নেই।”

ধ্রুব নিজেকে সামলাতে পারল না। অস্ফুটে বলে ফেলল, “কে নিল?”

“তোর পরিচিত।”

ধ্রুব অবাক হয়ে বলল, “আমার পরিচিত! আমার পরিচিত রিভলভার নিয়ে পালিয়েছে! কী বলছ এ সব?”

সন্তোষ সেন গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, “ঠিক বলছি। সেই কারণেই তোকে ডেকেছি। আই কলড ইউ। নইলে এ সব ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিতে তোকে জড়াব কেন? সব খবর নিয়েছি। বছর ছ’-সাতের একটা বাচ্চা খেলতে খেলতে ওই দিঘির পাড়ে যায়। ওই ছেলে দুরন্ত, সকালে স্কুলে না গিয়ে গাঁয়ে চক্কর মেরে বেড়ায়। সে দিনও মারছিল, পুঁটুলি দেখে কৌতূহলে হি ওয়েন্ট অ্যান্ড ওপেনড ইট। চিঁড়ে-মুড়ির নীচে রিভলভার দেখতে পায় এবং সেটা হাতে নিয়ে বাড়ির দিকে দৌড় দেয়। গ্রামে ওই ছেলে বিল্লু নামে পরিচিত। বাবার নাম নন্দ, নন্দগোপাল। বাবা পা-খোয়ানো লোক, বাড়িতে পড়ে থাকে। রানিং ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে সোজা লাইনে, বোথ লেগস গন। হাঁটুর নিচ থেকে বাদ দিতে হয়েছিল। ক্রাচ নিয়ে হাঁটতেও সমস্যা। বিল্লুর ঠাকুরদা ছিলেন টাকাপয়সাওয়ালা দাপুটে মানুষ। তিনি মারা গেছেন অনেক দিন হল। সুখের সে সব দিন গেছে,” সন্তোষবাবু থামলেন। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির চোখে বললেন, “পরিবারটিকে মনে পড়ছে?”

ধ্রুব বিস্ফারিত চোখে বলল, “তুমি এত জানলে কী করে?”

সন্তোষ সেন মাথা নাড়িয়ে বললেন, “আমাদের জানতে হয়। তোর ফাদার নো মোর দ্য সেম ম্যান। যেমন অকম্মাটি ছিল, তেমন আর নেই। সে এখন এমন সব জিনিস নিয়ে বিজ়নেস করে যে, তাকে সব খবর না রাখলে চলে না। সে দিন গাঁয়ের কেউ কেউ বিল্লু ছেলেটার হাতে পিস্তল, রিভলভারের মতো একটা জিনিস দেখেছে। খেলনা ভেবেছে। একটু খোঁজ করতেই সব জানা গেছে। আর ওই ছেলের ফ্যামিলির তো গাঁয়ে বেশ নামডাক রয়েছে। সুনাম, দুর্নাম দুটোই। ওই ছেলে নিশ্চয়ই জিনিসটা বাড়িতে রেখেছে। এখন কাজ হল, তার বাড়ি থেকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রিভলভারটি বের করে আনা। সব দিক থেকে এটা দরকার। নট ওনলি ফর মানি, নট ওনলি ফর মাই বিজ়নেস, ওই জিনিস বাইরে থাকা ঝুঁকির। রিভলভারে দানা ভরা রয়েছে। একটা কিছু ঘটে গেলে ঝামেলা।”

ধ্রুব দাঁতে দাঁত চেপে বলল, “দানা মানে?”

সন্তোষবাবু শান্ত ভাবে বললেন, “গুলি ভরা আছে। ও সব ছাড়। কামরাঙা গ্রামের আরও পাঁচটা ফ্যামিলির মতো তুই তো ওই ছেলেটির পরিবারকেও চিনিস? একটু বেশি চিনিস। ঠিক কি না?”

ধ্রুব একটু চুপ করে থেকে, মাথা নামিয়ে বলল, “না। মনে পড়ছে না। চলো, উঠব এ বার। অনেক বেলা হয়েছে।”

সাত

মানবেশ মজুমদার বসে রয়েছেন সোফায়। সুপুরুষ মানুষটির চেহারায় এক ধরনের চাপা আভিজাত্য আছে। এক মাথা চুল কিছুটা সাদা হয়ে রূপ যেন আরও বাড়িয়েছে। সাদা পায়জামার ওপর অফ-হোয়াইট ফতুয়া। চোখে হালকা ফ্রেমের চশমা। ফ্রেমের রং জলে-ধোওয়া বাদামি।

মানবেশ মজুমদারের হাতে বই। পেপারব্যাক বই। প্রচ্ছদে একটি ভাস্কর্যের ফোটো। পাথরের মাঝে এক নগ্ন পুরুষ দাঁড়িয়ে। তার খানিকটা মুখ, হাত-পা, পেশি, ভঙ্গিমা দেখে বোঝা যাচ্ছে বয়স বেশি

নয়। এক হাতে মুখের খানিকটা ঢেকে রেখেছে, অন্য হাত পাথরখণ্ডের সঙ্গে মিশে। ছেনি দিয়ে কুঁদে হাত বের করা হয়নি। আসলে ভাস্কর্যটি অসম্পূর্ণ। নগ্নতায় পাথর জমে রয়েছে এখনও। প্রচ্ছদে ইংরেজিতে বইয়ের নাম লেখা— নন ফিনিটো।

বই ভাঁজ করে মানবেশ মজুমদার মুখ তুললেন।

"দুনিয়ায় শেষ না হওয়া কাজের মূল্য যে এত বেশি, এই বই না পড়লে আমার হয়তো জানা হত না। শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্যের অসম্পূর্ণ সৃষ্টি নিয়ে কত চর্চা, কত গবেষণা যে হয়ে চলেছে, তুমি ভাবতেও পারবে না। অথচ দ্যাখো, কাজ ফেলে রাখলে, বাকি রাখলে, আমরা সাধারণ মানুষ বিরক্ত হই। ছোটবেলা থেকেই বাবা-মা, টিচারের কাছে শুনে এসেছি, আধখানা কাজ ফেলে রাখা ঠিক নয়। যে-কাজে হাতে দিয়েছ সেটা আগে শেষ করো। আর এখন অসম্পূর্ণ কাজের বাহার জেনে চমকে উঠছি।"

"কী আছে বইতে?"

মানবেশ উৎসাহ নিয়ে বললেন, "এমন সব শিল্পের কথা, যেগুলোর কাজ শেষ করা হয়নি।"

"অসম্পূর্ণ শিল্প! কথাটার মানে কী? আর্টিস্টের হঠাৎ মৃত্যু ঘটেছে?"

মানবেশ বললেন, "সে তো আছেই, আর্টিস্টের মৃত্যু হলে কাজ শেষ হয় না। এই বিষয়টা তেমন নয়। বহু শিল্পী ইচ্ছে করেও কাজ শেষ করেন না। বিশ্বের তাবড় আর্টিস্ট, স্কাল্পটর এই কাণ্ড করেছেন। তাঁদের শেষ না হওয়া কাজের ছড়াছড়ি। কেউ বলেছেন, এটা হল আর্টিস্টের ভাবনাকে কারও সামনে না আনা। সেটাও নাকি এক ধরনের শিল্প! আমি ভেবেছি, কিন্তু তোমাকে পুরোটা দেখতে দেব না। যেটুকু করলাম না, সেটুকু তুমি নিজের মতো ভেবে নিতে পারো, আবার না-ও পারো। কেউ বলেছেন, আর্টিস্ট যেখানে মনে করেন কাজটির উদ্দেশ্য বোঝা হয়ে গেছে, আর কিছু জানার নেই, সেখানেই ছেড়ে দেন। কোন পর্যায়ে কাজ বন্ধ করে দেবেন, অসমাপ্ত রেখে দেবেন, সেটা আর্টিস্টের মর্জি। অনেকে আবার হতাশা থেকেও কোনও কাজের মাঝপথে সরে গেছেন। আর্ট ক্রিটিকরা এই সব অসমাপ্ত কাজের ভিতরে অন্য মাত্রা খুঁজে পান। অসম্পূর্ণ শিল্প অনেক সময়ই মাস্টারপিস হিসেবে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি পেয়েছে।"

"তা-ই নাকি! কাজ শেষ না করেও এত নামডাক?"

"অবশ্যই তা-ই। মোনালিসা ছবিটার কথাই ভাবো না।"

এ বার বইটা তুলে ধরলেন মানবেশ। বললেন, "কাভারের ছবিটা দ্যাখো, এটা মিকেলাঞ্জেলোর অতি বিখ্যাত একটা ভাস্কর্য। নাম, দ্য ইয়াং স্লেভস। ছবি দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, শিল্পী কাজটা শেষ করেননি। শরীরের নানা অংশে পাথর জমে রয়েছে। এই শেষ না করাটাই শিল্পের একটা ধরন, স্টাইল। মিকেলাঞ্জেলো অনেক সময়ই এমন করেছেন, পিকাসোর অজস্র ছবি অসম্পূর্ণ, দা ভিঞ্চিরও তাই। শিল্পের এই ধরনকে বলা হয়, নন ফিনিটো। এই বইয়ের নাম। শব্দটা সুন্দর না? নন ফিনিটো একটা ইটালিয়ান শব্দ। সহজ বাংলায় যার মানে, যা শেষ করা হয়নি। সাহিত্যেও রয়েছে। এই বই অসম্পূর্ণ সব শিল্পের কথা নিয়ে লেখা। সে দিন হঠাৎই পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথে চোখে পড়ল। পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথে যে এখন এত চমৎকার সব বই বিক্রি হয় জানতাম না, ও সব কলেজে পড়ার সময়ে দেখেছি। বইটা কেনার সময় নন ফিনিটো শব্দটার মানেই বুঝতে পারিনি। বলতে পারো কাভারের আকর্ষণেই বইটা তুলি। ভাগ্যিস সে দিন গাড়িটা দূরে পার্ক করতে হয়েছিল। ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে হাঁটছিলাম, নইলে তো বইটা চোখেই পড়ত না। যা-ই বলো, অনলাইনে সব সময় বই কেনা যায় না। হাতে তুলে দেখতে হয়।"

কৃষ্ণপ্রিয়া সেন উল্টো দিকের সোফায় বসে রয়েছেন। আজ অনেকটা সকালে, প্রায় ভোরের দিকে তিনি মুকুন্দপুরে এসেছেন। মানবেশ মজুমদারের বাড়িতে। লন, বাগান, পোর্টিকো সব রয়েছে। তখনও পূর্ব কলকাতার এই পিছন দিকটায় এত ঘন বসতি হয়নি, মানবেশবাবুরও বয়স ছিল কম। বাবার কেনা, বহু বছর ফেলে রাখা জমিতে শখ মিটিয়ে বাড়ি সাজালেন। লন্ডন থেকে বিজ়নেস ম্যানেজমেন্ট কোর্স করে ফিরেছিলেন মানবেশ। অনেকেই ভেবেছিল, বিদেশে লেখাপড়া শিখে এসে ছেলে নিশ্চয়ই পূর্বপুরুষের ব্যবসায় ঢুকবে না। বড় কোনও চাকরি নেবে অথবা আবার বাইরে পালাবে। মানবেশ শান্ত ভাবে ব্যবসার হাল ধরলেন। দু'বছর যাওয়ার পর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়িটাও বানিয়ে ফেলেছিলেন। মা আগেই মারা যান, নতুন বাড়িতে এসে বাবাও বছর খানেক পর প্রয়াত হলেন। মানবেশ হয়ে পড়লেন একা। মন দিয়ে ব্যবসা চালান, বাকি সময়ে বই পড়েন, গান শোনেন, বেড়াতে যান। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিশতে গিয়ে দেখলেন, সমস্যা হচ্ছে। তারা যখন-তখন বাংলোয় এসে ঘাঁটি গাড়ছে, আর আপ্রাণ চেষ্টা করছে চেনাজানা মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দিতে। বড় ব্যবসা, বাংলো, বিদেশি ডিগ্রি, দেখতে সুন্দর— এমন ছেলেকে হাত করার জন্য সবাই উঠেপড়ে লাগল। চাটুকারবৃত্তিরও শেষ ছিল না। মানবেশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। সবাইকে এড়িয়ে চলা শুরু করলেন। এক মাত্র ঘনিষ্ঠতা ছিল স্কুলের বন্ধু নীলেশের সঙ্গে। ছোটবেলা থেকেই নীলেশ অন্য রকম। সরকারি চাকরি করতেন, সাধারণ জীবনযাপন করতেন। মানবেশ সময় পেলে এই বন্ধুর কাছে চলে যেতেন। কোনও লেনদেন নেই, চপ-মুড়ি খাও আর গল্প করো। শিল্প-সাহিত্য, খেলাধুলো নিয়ে আড্ডা হত। তবে স্বার্থ একেবারে ছিল না বললে ভুল হবে। এই নির্লোভ, সাদাসিধে অথচ বুদ্ধিমান বন্ধুর কাছে মানবেশের ছুটে যাওয়ার একটা কারণ ছিল। এই মানুষ তাঁর ভুল বলে দেবেন। আসলে সব মানুষেরই নিজের কথা বলার জন্য কাউকে প্রয়োজন হয়, নিরপেক্ষ কাউকে। আয়নার মতো সে থাকবে। বলে দেবে, 'তোমার পোশাক ঠিকমতো পরা হয়নি, তোমার চুল আঁচড়ানোয় গোলমাল, তুমি কি একটু রোগা হয়ে গেলে?' আবার এমনটাও বলতে পারে, 'কী হয়েছে? তোমার মনখারাপ কেন?' ঠিক আয়না শুধু বাইরেটা দেখে না, মনটাও দেখতে পায়। নীলেশকেই মানবেশ প্রথম কৃষ্ণপ্রিয়া সেনের কথা বলেছিলেন।

"এ বার বল, আমি কি গোলমাল করে ফেলেছি?"

নীলেশ বলেন, "ওই মেয়েকে তুই বিয়ে করবি?"

মানবেশ বলেছিলেন, "না, সেটা সম্ভব নয়। ওর ফ্যামিলি রয়েছে, হাজ়ব্যান্ড, ছেলে রয়েছে।"

নীলেশ বললেন, "তাতে কী? ফ্যামিলি থাকলে, আবার বিয়ে হয় না?"

মানবেশ বললেন, "তা হয়, তবে আমাদের বিয়ের প্রয়োজন নেই। আমাদের দু'জনেরই বয়স কম হল না। আমার ফর্টি পেরোতে চলল, তা ছাড়া বিয়ে সম্পর্কে কৃষ্ণপ্রিয়ার অভিজ্ঞতা তিক্ত। ওর বিয়েটা ভাল হয়নি।"

নীলেশ বললেন, "কেন, স্বামী খারাপ? মাতাল না লম্পট?"

মানবেশ বললেন, "মনে হয় অন্য কিছু। কৃষ্ণপ্রিয়া তেমন করে বলে না, আমি জানতেও চাই না। সম্ভবত দু'জনের ম্যাচ করেনি।"

নীলেশ বললেন, "ও তাই বল, মানিয়ে নেওয়ার প্রবলেম রয়েছে।"

মানবেশ অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, "হতে পারে। কৃষ্ণপ্রিয়ার কথায় আঁচ করতে পারি, সন্তোষ সেন লোকটার কোনও ফাইনার কোয়ালিটিজ় নেই, উদ্যম নেই।"

"সন্তোষ সেন কে?"

মানবেশ বললেন, "কৃষ্ণপ্রিয়ার হাজ়ব্যান্ডের নাম। কৃষ্ণপ্রিয়ার মতো বুদ্ধিমতী, রুচিশীল মহিলার স্বামী হতে গেলে যোগ্যতা লাগে, আগুন জ্বেলে সাত বার ঘুরলেই হয় না।"

বন্ধুর রাগ দেখে সে দিন মিটমিটি হেসেছিলেন নীলেশ। বলেছিলেন, "বেশ জমিয়ে প্রেমে পড়েছিস মনে হচ্ছে। রাগ-অনুরাগ সবই রয়েছে। কত দিন হল?"

"বেশি দিন নয়, তবে ডিপেনডেন্ট হয়ে পড়েছি।"

নীলেশ বললেন, "কার ওপর ডিপেনডেন্ট? কৃষ্ণপ্রিয়া সেন?"

মানবেশ বললেন, "না, এই রিলেশনশিপটার ওপর। কমফর্ট ফিল করছি।"

নীলেশ একটু চুপ করে থেকে বলেন, "বেস্ট অফ লাক। যাক,

আমার বন্ধুটি বিয়ে না করুক, প্রেমে তো পড়ল। একা থাকার চেয়ে ভাল।"

মানবেশ বললেন, "এটা তোর এড়িয়ে যাওয়া কথা। আমি সমালোচনা চাইছি। কোথাও ভুল হয়ে যাচ্ছে?"

নীলেশ হাই তুলে বলেছিলেন, "সমালোচনা কী করব? প্রেমের আবার ঠিক-ভুল কী? সে ভাবে দেখতে গেলে, সব প্রেমই ঠিক, আবার সব প্রেমই ভুল। তবে কী জানিস মানব, দুনিয়াটা খুব একটা ভাল নয়। তোর সম্পত্তি, টাকাপয়সা বেশি। সেই সঙ্গে ছেলে হিসেবেও ভাল। ব্যবসা করতে গিয়ে আদ্যোপান্ত লাভ-লোকসানের মধ্যে ডুবে যাসনি। ওই কী যেন বললি, ফাইনার কোয়ালিটিজ়, বাংলায় কী বলব? স্পর্শকাতর মন, সূক্ষ্ম রুচিবোধ? যা-ই হোক, এ সব তোর আছে, তাই সাবধানে থাকাটা তোর বেশি জরুরি।"

মানবেশ ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন, "কিসের থেকে সাবধান?"

নীলেশ বললেন, "বললে রেগে যাবি, না রাগলেও বিরক্ত হবি।"

"বিরক্ত হওয়ার জন্যই তো তোকে ঘটনাটা বললাম। আর কাকে বলব? আমার অফিসের কর্মচারীদের? আত্মীয়, বন্ধুদের পাট তো তুলে দিয়েছি।"

নীলেশ বন্ধুর চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, "তুমি যথেষ্ট ম্যাচিয়োর্ড। বিজ়নেস করছ এত দিন, মানুষ চিনতে ভুল হওয়ার কথা নয়, তার পরেও দেখো, কোনও গোলযোগে পোড়ো না। সূক্ষ্ম রুচিবোধ থাকা ভাল, কিন্তু তার জন্য ঠকে যাওয়া ভাল নয়। শুধু গোলযোগ বা ঠকে যাওয়ার কথাই-বা বলি কেন? বেশি বয়সে দুঃখ পাওয়াও ঠিক হবে না।"

এই আলোচনার ক'দিন পরেই, নীলেশের সঙ্গে কৃষ্ণপ্রিয়া সেনের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন মানবেশ। রেস্তরাঁয় রাতে খাওয়াদাওয়া করেন তিন জনে। উপলক্ষটি ছিল মানবেশ মজুমদারের জন্মদিন। সে দিন রাতে মানবেশের সঙ্গে তাঁর বাংলোয় প্রথম রাত কাটান কৃষ্ণপ্রিয়া। বাড়িতে খবর পাঠান, অফিসে অডিটের কাজ হবে সারা রাত। ধ্রুব তখন স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ছে। তার ঘর আলাদা। ওকে নিয়ে চিন্তা ছিল না কৃষ্ণপ্রিয়ার। সারা রাত অডিয়ো সিস্টেমে নিচু স্বরে গজ়ল চালিয়েছিলেন মানবেশ। সেই সুর আজও কৃষ্ণপ্রিয়ার কানে বাজে। মানবেশের অনভিজ্ঞ হাতে নগ্ন হতে ভাল লেগেছিল খুব। স্বামীর সঙ্গে শরীরের পাট চুকেছিল অনেক দিন। বিছানায় মানবেশ হয়ে পড়েছিলেন কুণ্ঠিত, খানিকটা সঙ্কুচিতও।

"আমি অভ্যস্ত নই কৃষ্ণপ্রিয়া।"

কৃষ্ণপ্রিয়া তাঁর কানে মুখ রেখে বলেছিলেন, "আমিও নই। ভুলে গিয়েছি।"

মানবেশ বলেছিলেন, "ভয় করছে, তোমার যদি ভাল না লাগে?"

কৃষ্ণপ্রিয়া বলেছিলেন, "তুমি যেমন ভাবে আসবে, তেমনই আমার ভাল লাগবে। এসো, তোমার পোশাক খুলে দিই।"

সে দিন মানবেশকে জাগিয়ে তোলার কাজ সেরেছিলেন কৃষ্ণপ্রিয়াই। নারীশরীরের মোড়, বাঁক, নির্দেশ, সঙ্কেত চিনিয়েছিলেন।

"সবটা কেউ জানতে চায় না। নারীশরীর ছবির মতো, বাজনার মতো। কত তুলির আঁচড়, মিড়, গমক লুকিয়ে থাকে, খুঁজে নিতে হয়। যে যেটুকু দেখতে পায়, তাতেই তৃপ্তি খোঁজে। অথচ কত রহস্য উন্মোচিত না হয়ে শরীর জুড়ে পড়ে থাকে।"

মানবেশ অস্ফুটে বলেন, "সত্যি?"

কৃষ্ণপ্রিয়া মানবেশের গালে ঠোঁট বুলিয়ে আলতো হেসে বলেন, "আমাকে পাশ ফিরিয়ে দ্যাখো না এক বার।"

এক সময় দু'জনেই তৃপ্ত হন, কিন্তু পরস্পরকে ছাড়েন না। সে দিনের পর থেকে অবশ্য নীলেশ কখনও বন্ধুর প্রেম নিয়ে আর বিরূপ মন্তব্য করেননি। বরং মানবেশের জন্য তাঁর খারাপ লেগেছিল। কৃষ্ণপ্রিয়ার মতো মেয়ের সঙ্গে ছেলেটার আগে দেখা হওয়া উচিত ছিল। কী করা যাবে? সব দেখা সময় মেনে হয় না। হয় না বলেই তো দেখা হওয়া এত রহস্যময়, এত আকর্ষণের। তার টান থেকে বেরনো যায় না। মাঝে মাঝেই মানবেশের বাংলোয় চলে আসতেন কৃষ্ণপ্রিয়া। তবে হিসেব করে আসতে হত। সন্তোষ সেন যেন জানতে না পারেন, ধ্রুব যেন বুঝতে না পারে। দশ বছর হয়ে গেল, সে সব হিসেব চুকেছে। এই দশ বছরের তিন বছর সন্তোষ সেন নিখোঁজ ছিলেন, সাত বছর ছিলেন জেলে। এখন আর কিছু গোপনও নেই। কৃষ্ণপ্রিয়া বাংলোয় এলে তাঁরা স্বামী-স্ত্রীর মতোই থাকেন। মানবেশ এক বার পাকাপাকি এসে ওঠার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কৃষ্ণপ্রিয়া রাজি হননি। বলেছিলেন, ছেলে যত দিন কাছে রয়েছে, তত দিন এ রকম কিছু করবেন না। মানবেশ বলেছিলেন, "হোয়াই? সে তো সবই জানে।"

"তা হলেও নয়। তার বাবার সঙ্গে এখনও আমার ডিভোর্স হয়নি।"

মানবেশ বলেছিলেন, "যদি চাও, আমি লইয়ারের সঙ্গে কথা বলি। সে বলে দেবে, এই সময় কী করতে হয়। এ কথা তো তোমাকে আগেও বলেছি কৃষ্ণপ্রিয়া।"

কৃষ্ণপ্রিয়া চুপ করে থেকে বলেন, "তোমার অসুবিধে কী হচ্ছে? এই তো আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। যা চাইছ, যতটা চাইছ আমাকে পাচ্ছ। আমিও পাচ্ছি। তা ছাড়া...তা ছাড়া স্বামী-স্ত্রী হয়ে থাকার জন্য তো আমাদের সম্পর্ক তৈরি হয়নি মানব। ওই সম্পর্ক আমি নিতে পারি না।"

মানবেশ নরম গলায় বললেন, "তুমি নিজের বিয়ে দিয়ে সবটা বিচার কোরো না কৃষ্ণপ্রিয়া। কত জনে তো একাধিক বিয়ে করে। তারা কি অ-সুখে আছে? তা ছাড়া মানুষটা সব দিক থেকেই মন্দ ছিল। শুধু উদ্যমহীন, অলস বললে গ্লোরিফাই করা হয়। হি ইজ় আ ক্রিমিনাল। তুমি এক জন ক্রিমিনালের পাল্লায় পড়েছিলে কৃষ্ণপ্রিয়া।"

কৃষ্ণপ্রিয়া হাত তুলে বলেছিলেন, "ও সব বাদ দাও। বিয়ে করে কার কী হয়েছে আমি জানতে চাই না। আমার যা হয়েছে, তা আর কারও হয়েছে কি না আমার জানা নেই। আমি ভুলতে পারি না, পারবও না। আমি আর বিয়ের মধ্যে যেতে পারব না। প্লিজ়, ও দিকে আমাকে ঠেলো না মানব, তোমার অসুবিধে হলে বলো, আমি অন্য কিছু ভাবব।"

"সরি," বলে মানবেশ সে দিন চুপ করে গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গ আর কখনও তোলেননি।

কৃষ্ণপ্রিয়া হাত বাড়িয়ে বইটা নিলেন। অস্ফুটে বললেন, "নামটা সত্যিই সুন্দর।"

সামনের টেবিলে ব্রেকফাস্ট রাখা। মানবেশ ঝুঁকে পড়ে, টোস্টে মাখন লাগাতে লাগাতে বললেন, "আমার পড়া হলে তুমি নিয়ো।"

ব্রেকফাস্ট করতে করতে কৃষ্ণপ্রিয়া সেন বইয়ের পাতা ওল্টান। পাতায় পাতায় অসম্পূর্ণ শিল্পকর্মের ছবি। ছবির মর্মার্থ যে খুব বুঝতে পারছেন এমন নয়, কিন্তু দেখতে ভাল লাগছে। কৃষ্ণপ্রিয়া সেন শিল্পের বোদ্ধা নন, কিন্তু সান্নিধ্য ভাল লাগে। তাঁর দাম্পত্য জীবনে শিল্প তো কোন ছার, টবে ফোটা ফুলেরও কোনও জায়গা ছিল না। সন্তোষ সেনের এ সব বিষয়ে কোনও আগ্রহ নেই। বেড়াতে গেলেও প্রকৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছেন। জিজ্ঞেস করলে বলেছেন, "আমার এ সব ভাল লাগে না প্রিয়া, আমি বুঝি না।"

কৃষ্ণপ্রিয়া বিস্মিত হয়ে বলেছেন, "কী ভাল লাগে তোমার? এত সুন্দর পাহাড়, জঙ্গল, ঝর্নার মধ্যে বোঝার কী আছে? দেখলেই তো মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়।"

সন্তোষ সেন বলতেন, "কী করব কৃষ্ণপ্রিয়া? মনে হয়, আমার মুগ্ধ হওয়ার ক্ষমতা কম।"

প্রথম দিকে কৃষ্ণপ্রিয়া মাথা ঠান্ডা করে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, "এটা একটা প্র্যাকটিস। ক্রমাগত সুন্দর কিছু, ভাল কিছু দেখলে, তার মধ্যে থাকলে, ভিতরেও এক ধরনের সৌন্দর্যবোধ তৈরি হয়।"

সন্তোষ সেন হেসে বলতেন, "তোমার কথাগুলো ইশকুলের দিদিমণির মতো লাগছে, আমি ছাত্র হলে হয়তো ভাল হত, কিন্তু সে বয়স যে নেই।"

কৃষ্ণপ্রিয়া তার পরেও চেষ্টা করেছেন। স্বামীকে নিয়ে আরও সুন্দর জায়গায় বেড়াতে গিয়েছেন। ভাল সিনেমা, থিয়েটার দেখিয়েছেন, রবিবার সকালে বাড়িতে গান বাজিয়েছেন, বই এনে দিয়েছেন। লাভ হয়নি। সন্তোষ সেন এমন চোখে সমুদ্র, পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন যে, মনে হত, শ্যামবাজারের মোড়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন। বাড়িতে গান বাজলে ‘একটু আসছি’ বলে পায়ে চটি গলিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। ফিরেছেন বেলা গড়িয়ে যাওয়ার পর। সিনেমা হলে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ডেকে দিলে ধড়ফড় করে উঠে পড়ে বলেছেন, ‘সরি’। বই নিয়ে দু’পাতার বেশি এগোতে পারেননি। শুধু এটুকুই নয়, শরীরের সম্পর্কেও সবটা ছিল স্থূল। শরীরের সঙ্গে মনকে স্পর্শ করার ভঙ্গি, কথা, আদর কিছুই থাকত না। এমনকি, পুরুষের কাছ থেকে যে-জোরটুকুর জন্য নারী অপেক্ষা করে থাকে, সেটুকুও সন্তোষ সেনের কাছ থেকে পাননি কৃষ্ণপ্রিয়া। হতাশ হয়ে সময় নিয়েছিলেন। নিজেকে বুঝিয়েছিলেন, ভুল বিচার হচ্ছে। সব মানুষেরই সৌন্দর্যবোধ, গান শোনার অভ্যেস, বই পড়ার নেশা থাকতে হবে এমন কোনও কথা নেই, থাকেও না। তার পরেও তারা কোনও-না-কোনও দিক থেকে ভাল হয়। কৃষ্ণপ্রিয়া ভাবলেন, সন্তোষ সেন হয়তো সে রকমই এক জন। দ্রুত বুঝতে পারলেন, এটাও ভুল ভেবেছেন। তাঁর স্বামী মানুষটি আসলে কোনও রকমই নন। উদ্যমহীন, নির্লিপ্ত, সঙ্গী হিসেবে অযোগ্য। হঠাৎ দেখে সুন্দরীর প্রেমে পড়েছিলেন। উন্মাদের মতো প্রেম। যাঁর প্রকৃতি, ছবি, গানের সৌন্দর্যে কোনও মন নেই, তিনি কৃষ্ণপ্রিয়ার রূপে কেমন করে অতটা মজে গিয়েছিলেন, সেটা একটা প্রশ্ন। হয়তো শরীরের লোভ, হয়তো আচম্বিতে শরীরে পৌরুষ হানা দিয়েছিল সেই সময়। যা-ই হোক, সেই উন্মাদনা সামলাতে পারেননি কৃষ্ণপ্রিয়া। শিক্ষা, বুদ্ধি তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাদের আর দোষ কী? অল্প দিনের আলাপেই বিয়েতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন কৃষ্ণপ্রিয়া। সাবধান করার মতো তেমন কেউ ছিল না। যাঁরা হালকা প্রশ্ন তুলেছিলেন, তাঁদের কথাও উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

“ছেলে কাজকর্ম কী করে?”

“নিজের ব্যবসা।”

“কিসের ব্যবসা?”

“অত ডিটেলস জানি না।”

“সে কী, যার সঙ্গে সারাটা জীবন থাকতে হবে, তার কাজকর্মের সব খবর রাখবি না?”

“কেন রাখব? সন্তোষ কি আমার কাজের সব খবর রাখতে চায়? অফিসের ব্যালান্স শিট দেখতে চায়? বিয়ে তো শুধু আমিই করছি না, সেও করছে।”

“প্রেমে পাগল হওয়া পুরুষের কাছে অন্ধের মতো সারেন্ডার করছিস না তো?”

কৃষ্ণপ্রিয়া হেসে বলেছিলেন, “প্রেমহীন বড় রোজগেরের বদলে প্রেমে পাগল কম রোজগেরে কারও কাছে সারেন্ডার করা কি ভাল নয়?”

কিছু দিন পরেই কৃষ্ণপ্রিয়া বুঝেছিলেন, প্রেমের ভাবনাটা ঠিক ছিল না। বিয়েতে প্রেমের পাগলামি শেষ হতে পারে, প্রেম শেষ হয় না— এই বোধ সন্তোষের নেই। যে-ভাবে ঝড়ের মতো এসেছিলেন, সে ভাবেই ঝড়ের মতো মিলিয়ে যান। কৃষ্ণপ্রিয়া বোঝেন, ভুলটা তাঁর, বোঝার ভুল। ভালবাসার ইতিহাসে এই ভুল নিয়ে পাতার পর পাতা লেখা রয়েছে। হয়তো ভুলও নয়, সেই মুহূর্তটায় সত্যি ছিল। সব সত্যি যে অনন্তকালের হবে এমন তো কথা নেই।

মানবেশ মজুমদারকে কৃষ্ণপ্রিয়ার পছন্দ হয় এক গানের অনুষ্ঠানে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। এই ধরনের গানবাজনা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে গভীর ভাবে না বুঝলেও কৃষ্ণপ্রিয়ার শুনতে ভাল লাগত। সন্তোষকে এ সব জায়গায় নিয়ে যাওয়ার উৎসাহ মিইয়ে গেলে কৃষ্ণপ্রিয়া একাই যেতেন। কোনও কোনও দিন অফিসের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হলে রবীন্দ্র সদন, অ্যাকাডেমি চত্বরে ঘুরতেন। শুধু ভাল গানবাজনা, ছবির এগ্‌জিবিশন, সিনেমা, থিয়েটারের জন্য নয়, বাড়ি থেকে পালিয়ে থাকতেও চাইতেন। ছেলের প্রাইভেট টিউটর আসত, ফলে ফেরার তাড়া ছিল না।

মানবেশ মজুমদারের সঙ্গে এ রকম একটা অনুষ্ঠানের পরে আলাপ হল। একেবারেই ঘটনাচক্রে। এক অফিস কলিগের মাসির মেয়ে মধুশ্রী। মেয়েটি ভাল, হাসিখুশি। এনজিও-র সঙ্গে যুক্ত। অনাথ আশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহে গানবাজনার অনুষ্ঠান করেছিল। কলিগের কাছ থেকে ডোনেশন কার্ড নেন কৃষ্ণপ্রিয়া। গান শুনতে চলেও যান। অনুষ্ঠান শেষে হল থেকে বেরিয়ে দেখেন, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। রাতও বাড়ছে। বাড়ি ফেরার জন্য ছটফট করতে থাকেন কৃষ্ণপ্রিয়া। তাঁকে দেখে মধুশ্রীই এগিয়ে আসে। মানবেশ মজুমদার নামের পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের একটি মার্জিত চেহারার ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

“মানবেশবাবু, আপনি কি মুকুন্দপুরে ফিরবেন?”

ভদ্রলোক বলেন, “না, আজ বিডন স্ট্রিটের পুরনো বাড়ি যাব। সেই কারণেই ভয় পাচ্ছি, নর্থ ক্যালকাটায় আবার চট করে জল জমে যায়। পথে গাড়ি না আটকে যায়।”

মধুশ্রী বলে, “কিচ্ছু আটকাবে না, আমার দিদির এই সহকর্মীকে একটু লিফট দিতে পারবেন? বাড়িতে ছেলে একা রয়েছে, কে জানে কর্তাটিও বোধ হয় এত ক্ষণে বৃষ্টি মাথায় করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।”

কৃষ্ণপ্রিয়া লজ্জা পেয়ে বলেছিলেন, “আরে না না, আমি একটা ট্যাক্সি পেয়ে যাব। কেন ওঁকে বিব্রত করছ?”

মধুশ্রী হেসে বলে, “দিদির সঙ্গে কালই তোমার দেখা হবে কৃষ্ণপ্রিয়াদি, ফাংশনের পর তোমায় জলে ফেলে দিয়েছি জানলে আমার মাথা ভাঙবে। এর পরের কাজের জন্য ডোনেশনও জুটবে না। আর মানবেশবাবু বিব্রত হওয়ার মতো মানুষ নন।”

মানবেশ মজুমদার সহজ ভাবে বলেন, “ম্যাডাম, চিন্তা করবেন না। আমিও মনে মনে ভগবানকে ডাকছিলাম, ভগবান, লিফট নিতে রাজি হবেন এমন এক জনকে এনে দাও প্লিজ়। পথে জলে গাড়ি আটকে গেলে ঠেলবে কে? মধুশ্রী, আরও দু’-চার জনকে রাজি করানো যায়? একেবারে বাড়ির দরজায় নামিয়ে দেব কথা দিচ্ছি।”

কৃষ্ণপ্রিয়া না হেসে পারেন না। গাড়িতে উঠে কৃষ্ণপ্রিয়া বুঝতে পারেন, ভদ্রলোক শুধু রসিক নন, রুচি এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক জন মানুষ। গোটা পথ কোনও ব্যক্তিগত কথা না বলে, শুধু গানের কথা বললেন।

“গান কেমন লাগল?”

কৃষ্ণপ্রিয়া বললেন, “খুব ভাল। তবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আমি তো তেমন বুঝি না।”

মানবেশ বললেন, “ভাললাগাটাই আসল কথা। অনেক বুঝলাম কিন্তু ভাল লাগল না, তাতে লাভ কী?”

কৃষ্ণপ্রিয়া বললেন, “তাও এই ধরনের গানবাজনা শোনার জন্য খানিকটা জ্ঞানগম্যি দরকার। নইলে রসটা ধরা যায় না।”

মানবেশ বললেন, “শুনতে শুনতেই কান তৈরি হয়। ভাল গানবাজনা আপনি শুনবেন কি না, ভাল বই আপনি পড়বেন কি না, ভাল ছবির এগ্‌জিবিশন আপনি দেখবেন কি না, সে তো আপনার বিষয়। অনেকেই তো মুখ ঘুরিয়ে থাকে অথবা সস্তা, চটুলে গা ভাসায়।”

কৃষ্ণপ্রিয়া ভিতরে ভিতরে শিহরিত হন। কত সহজ কথা, অথচ কী গভীর! এই সব কথা শোনার জন্যই তো তিনি উন্মুখ হয়ে থাকেন। উৎসাহের সঙ্গে বললেন, “আজ তো ভদ্রলোক বিষ্ণুপুর ঘরানার গান করলেন। তেমনই বললেন। এই ঘরানাটা এগ্‌জ্যাক্টলি ঠিক কেমন? বিষ্ণুপুর থেকে এসেছে?”

গাড়ির ওয়াইপার বৃষ্টির ছাটের সঙ্গে লড়ছে, তার পরেও উইন্ডস্ক্রিন ঝাপসা হচ্ছে বার বার। মানবেশ গাড়ি চালাচ্ছিলেন সাবধানে। রাস্তায় জল জমেছে, তবে তা গাড়ি আটকে দেওয়ার মতো নয়।

"ও আপনি গুগল সার্চ করলেই জানতে পারবেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একটা ঘরানা। ইন্টারেস্টিং বিষয় কী জানেন, গর্বেরও, আমি যত দূর জানি, এটা হল ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একমাত্র ঘরানা, যার সৃষ্টির কেন্দ্র হল আমাদের এই বাংলা। আপনি তো জানেন ম্যাডাম, একটা সময় বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহর ছিল মল্লভূমের রাজধানী। এই মল্লভূম ছিল ভারতের অন্যতম সিরিয়াস কালচারাল সেন্টার। ইস্টার্ন ইন্ডিয়ায় এত বড় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কমই ছিল। নানা ধরনের শিল্পকর্মের সঙ্গে মল্লরাজারা যুক্ত হতেন। তাঁরা ছিলেন সঙ্গীতের ভক্ত। শুধু ভক্ত নন, এই ঘরানার ক্ষেত্রে তাঁদের কনট্রিবিউশন অনেক। শুধু রাজ্যপাট টেকালে তো আর সত্যিকারের রাজা হওয়া যায় না, দেশের শিল্প-সঙ্গীতকেও রক্ষা করতে হয়।"

কৃষ্ণপ্রিয়া বললেন, "বাপ রে, আপনি এত পড়েছেন!"

মানবেশ মজুমদার বললেন, "দূর, একটা-দুটো বই আর একটু কম্পিউটার ঘাঁটলেই এ সব জানা যায়। আপনিও তো কত কিছু জানেন। তানসেনের বংশধর ছিলেন অতি নামজাদা ধ্রুপদ গায়ক বাহাদুর খান। এক টালমাটাল সময়ে তিনি চলে এসেছিলেন বিষ্ণুপুরে। যেমন গাইতেন, তেমন বাজাতেন। রবাব ও বীণা তাঁর হাতে মধু ঝরাত। শ্রোতারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন। রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহদেব এই প্রতিভাধর শিল্পীকে সভায় মর্যাদা দিয়ে আসন দেন। ঠিক হয়, কেউ যদি ইচ্ছে করেন এবং যোগ্য হন, বাহাদুর খানের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা নিতে পারেন। খরচ যা লাগবে, দেওয়া হবে রাজকোষ থেকে। অনেক ছাত্র হল। বলা হয়, উস্তাদ বাহাদুর খানের ছাত্র, পণ্ডিত রামশঙ্কর ভট্টাচার্যই নাকি এই বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা।"

সে দিন গভীর রাতে কৃষ্ণপ্রিয়ার ঘুম ভেঙেছিল। তিনি জল খান, খোলা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন দীর্ঘ ক্ষণ। বুঝতে পারেন, এই পুরুষটিকে তিনি পছন্দ করে ফেলেছেন।

পর দিন অফিস-ফেরত কলেজ স্ট্রিটে যান কৃষ্ণপ্রিয়া। দোকান ঘুরে দু'টি বই কিনে ফেলে নিজেই অবাক হন। কত দিন পর কলেজ স্ট্রিট! কত দিন পর নিজের জন্য বই কেনা! তার ওপর আবার এমন বিষয়ের বই, যার প্রায় কিছুই তিনি জানেন না। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নিয়ে পড়াশোনা করার কথা আগে কখনও ভাবেননি। কেন এমন ঘটল? তা হলে বিষয় নয়, বিষয়টি নিয়ে কে বলছে, সেটাই আগ্রহ তৈরির মূল চাবিকাঠি? এখানেই শেষ নয়, এর পর কৃষ্ণপ্রিয়া এমন একটা কাজ করে ফেলেন, যা সেই বয়সে তাঁকে মানায় না। মধুশ্রীর কাছ থেকে মানবেশ মজুমদারের নম্বর চেয়ে নিয়ে তাঁকে ফোন করে ফেলেন। কোনও ভূমিকা ছাড়াই ছেলেমানুষের মতো বলে বসেন, "জানেন, আপনার ওই বিষ্ণুপুর ঘরানা নিয়ে আমিও খানিকটা খোঁজখবর জোগাড় করেছি।"

এই ফোনে মানবেশ মজুমদার অবাক হন। কিন্তু সেই অবাক হওয়া বুঝতে না দিয়ে, সহজ ভাবে বলেন, "কেমন খোঁজখবর, আমি কি জানতে পারি?"

কৃষ্ণপ্রিয়া বলেন, "আপনি জানেন। যে-বই আমি কিনেছি, তা আপনার কাছেও নিশ্চয়ই আছে।"

"না শুনলে বুঝব কী করে আমার কাছে আছে কি না?"

কৃষ্ণপ্রিয়া একটু থমকে থেকে বলেন, "ঠিক আছে, বলব এক দিন।"

মানবেশ মজুমদার বলেন, "কবে? আবার যে দিন বৃষ্টি হবে?"

কৃষ্ণপ্রিয়া হেসে ফেলে বলেন, "শুধু বৃষ্টি হলে তো হবে না, রাস্তায় জলও জমতে হবে। গাড়ি আটকে গেলে চলবে না, ঠেলার জন্য না হলে আপনি লিফট দেবেন কেন?"

দু'জনেই হাসেন। ঠিক এক সপ্তাহ পর এক সন্ধেয় এমন এক রেস্তরাঁয় তাঁরা বসেছিলেন, যার জানলা থেকে গঙ্গা দেখা যায়। ভেসে আসে স্টিমারের ভোঁ। মানবেশ মজুমদার বলেন, "নিন, বলুন এ বার।"

সে দিন কৃষ্ণপ্রিয়া কিছু বলতে পারেননি। লজ্জা পেয়েছিলেন।

আজ ব্রেকফাস্ট শেষ করার পর বললেন, "একটা জরুরি কথা বলার জন্য সাতসকালে ছুটে এসেছি।"

মানবেশ একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, "কী কথা? সে কথা তো জানি, তোমার স্বামী জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। আর তাতে তুমি এতটাই বিচলিত হয়ে পড়েছ যে, সাইকায়াট্রিস্টের কাছে পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। কনসাল্ট করতে হয়েছে। মন স্থির রাখার জন্য তুমি সেলাই করা শুরু করেছ। তাই তো?"

কৃষ্ণপ্রিয়া সেন থমথমে গলায় বললেন, "না, তা নয়। এ সব তো তুমি জানো। বলতে এসেছি, ধ্রুব তার বাবার সঙ্গে দেখা করছে এবং সেটা নিয়মিত।"

মানবেশ একটু চুপ করে থেকে বললেন, "তোমাকে কে বলল?"

কৃষ্ণপ্রিয়া বললেন, "খবর পেয়েছি। ধ্রুবকে সরাসরি কাল রাতে জিজ্ঞেস করেছি, সে নিজেও বলল।"

"কেন দেখা করছে?"

কৃষ্ণপ্রিয়া বললেন, "বলল, এমনি।"

মানবেশ বললেন, "দ্যাখো, এটা নিয়ে টেনশন করে কোনও লাভ হবে না কৃষ্ণপ্রিয়া। ধ্রুব অনেক বড় হয়েছে, সে কার সঙ্গে মিশবে সেটা তার ব্যাপার।"

কৃষ্ণপ্রিয়া নিজের জায়গা ছেড়ে মানবেশের পাশে গিয়ে বসলেন। তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেন, "আমার ভয় করছে মানব।"

মানবেশ তাঁর হাতের ওপর হাত রেখে বললেন, "ভয় কী? আমি তো আছি।"

কৃষ্ণপ্রিয়া বললেন, "ছেলেটার কোনও ক্ষতি হবে না তো?"

মানবেশ একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আমাকে একটু ভাবতে দাও। ধ্রুব মোবাইলের নাম্বরটা বদলায়নি তো?"

কৃষ্ণপ্রিয়া বললেন, "কেন? তুমি কথা বলবে?"

মানবেশ বললেন, "না, আমি নয়...দেখছি।"

আট

মানিনীকে ঝটকা দিয়ে কাছে টানল মণিনাথ। হাত দিয়ে কাঁধ থেকে আঁচল ফেলে ব্লাউজ়ের বোতাম খুলতে লাগল দ্রুত। তার হাতে সময় বেশি নেই।

প্রতি বার এই সময়টায় শরীরে অদ্ভুত অনুভূতি হয় মানিনীর। এ শুধু পুরুষ-স্পর্শের উত্তেজক অনুভূতি নয়, আরও বেশি কিছু। মণিমাস্টার জাদু জানে। এমন করে তার শাড়ি-ব্লাউজ় খুলবে যে, শরীর শিথিল হয়ে আসবে, হাত-পা অবশ লাগবে। বাধা দিতে ইচ্ছে করলেও শক্তি লোপ পাবে। তাও লজ্জায় হাত গুটিয়ে খালি দুটো বুকের ওপর রাখে মানিনী। আড়াল করার চেষ্টা করে। মণিনাথ আলগোছে সেই হাত সরিয়ে দেয়। ফিসফিস করে ওঠে, "তোর দুষ্ট কুচকুম্ভ বান্ধি নিজ গলে।/ বোল রাধা পৈসোঁ মো লাবণ্যগঙ্গাজলে॥"

উদ্ভাসিত বুকে মানিনী এই ফিসফিসানি শুনে লজ্জায় কেঁপে ওঠে। বলে, "এ কথার মানে কী মাস্টার?"

মণিনাথ সামান্য হেসে বলে, "মানে জেনে দরকার নেই। শুধু জেনে রাখো, এ তোমার দুই সুন্দর বুকের বন্দনা।"

মানিনীর পড়াশোনা স্কুল পার করে কলেজ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তবে মাস গড়াতে-না-গড়াতে সে পাট চুকে যায়। তাও, অত অবধি যাওয়ার একটা ফল তো রয়েছেই। কিছু শব্দের মানে সে জানে।

"বুকের আবার বন্দনা কী! বন্দনা মানে তো পুজো।"

মণিনাথ এক স্তনে হাতের তালু রেখে বলে, "সুন্দর সব কিছুকেই পুজো করা যায় মানিনী। তোমার শরীরের মতো সৌন্দর্য আমি আগে কখনও দেখিনি। এই রূপ প্রকৃতিকেও হার মানায়। তা ছাড়া তুমি তো রাধাই, মানিনী তো রাধারই নাম। রাধাকে পুজো করতে অসুবিধে কী? আসলে কাব্যের ভাষাতেই তোমার বুকের প্রশংসা করলাম। এ বার

গ্রহণ করতে দাও।”

মণিনাথ মুখ নামালে মানিনী নিচু গলায় বলে, “আপনি কবিতা লেখেন?”

দুই স্তনবৃন্তে ছোঁয়া দিয়ে মণিনাথ মুখ তুলে হেসে ওঠে।

“এ আমার কবিতা নয় মানিনী, বহু বছর আগে লেখা। বড়ু চণ্ডীদাস নামে এক মস্ত কবি পুঁথিতে লিখে গেছেন। সেই কাব্যের নাম *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। এক গ্রামে পাওয়া গেল সেই ছেঁড়াখোঁড়া পুঁথি। তাও আবার গোয়ালঘরে। পরে সেই পুঁথি বই হল। আর আমিও তোমাকে পেলাম এই গ্রামে। এই শেষ না হওয়া ঘরে। কেমন আশ্চর্য কথা না?”

মানিনী মণিনাথের হাত সরাতে চেষ্টা করে, আসলে চায় যেন সরাতে না পারে। পুরুষের এই আদরের কথা মানিনী কেবল বন্ধুদের মুখেই অল্পস্বল্প শুনেছে, স্বাদ পায়নি কখনও।

বান্ধবী বলত, “বড় আদরের আগে ছোট ছোট আদর লাগে। সেই আদরে তোর শরীর ছটফটাবে।”

“যাহ্, কী সব অসভ্য কথা বলিস।”

“আমাকে যত ইচ্ছে বকাবকি কর, বিয়ের পর বরকে কিন্তু বলবি অসভ্য হতে। বিছানায় বর সভ্য হলে বিপদ।”

“তুই থামবি?”

বান্ধবী থামেনি। বলেছে, “দরজা বন্ধ করে খাটে ঝাঁপ দিলে গাদাখানেক বাচ্চার মা হবি, কিন্তু শরীর বুঝবি না।”

বিয়ের পর বান্ধবীর কাছে শোনা গল্প গল্পই থেকে গিয়েছে। অধিকাংশ মেয়েরই বোধ হয় একই অভিজ্ঞতা। শুধু মা হওয়াই হয়, শরীর বোঝা হয়ে ওঠে না। নন্দগোপাল আদর, জোর-জবরদস্তি কিছুই জানত না। মানিনীকেই উদ্যোগ নিতে হয়েছে। নিজে কাপড়-চোপড় সরিয়ে গা ঘেঁষেছে স্বামীর। নন্দগোপাল উত্তেজনা লাঘব করেছে মাত্র, মানিনীর শরীরের কথা আলাদা করে ভাবেনি। যেমন জোর করেনি, উপভোগও করেনি। নিছক শরীরের কর্তব্য সেরেছে। আবাহন, বিসর্জন কিছুই ছিল না। এখন তো পাশ ফেরারও ক্ষমতা নেই। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে, ধরে তুলতে হয়। দাঁড় করিয়ে দিলে দুই বগলে ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে পারে খানিকটা। এতটা যে পারবে, তা-ও কল্পনা করা যায়নি। মানিনীর ছোটাছুটিতে সম্ভব হয়েছে।

মণিনাথ গাল রাখে মানিনীর বুকের মাঝে। দু’কাঁধ ধরে আলতো চাপে তাকে শুইয়ে দেয় মাদুরের ওপর। এই মাদুর বহু পুরনো। শেষ না হওয়া ঘরের মাদুর। ব্রজগোপাল পেতে বসতেন। সামান্য হাট থেকে কেনা বেতের জিনিস এত দিন টেকার কথা নয়, অদ্ভুত কোনও কারণে টিকে গিয়েছে। বাতিল জিনিসপত্রের সঙ্গে ঘরে বন্ধ ছিল। মানিনী বের করেছে। অভিসারের জন্য এই অসমাপ্ত ঘর বেছেছে মণিনাথই। এই ঘরের কথা সে আগেই শুনেছে ব্রজগোপালের কাছে। মানিনীও আপত্তি করেনি। বাড়িতে থেকেও এই ঘর বাড়ির বাইরে। সন্ধে নামলে এ দিকটায় কেউ আসে না। নানা কারণে সাহস পায় না। মাদুর আর একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে নিয়ে আসে মানিনী। হ্যারিকেনের শিখা কমিয়ে দেয়।

শুয়ে থাকা মানিনীর দুটো হাত মাথার ওপর লম্বা করে তুলে দেয় মণিনাথ। হ্যারিকেনের আলোর রেখা নামে তার হাত বেয়ে, নামতেই থাকে। মণিনাথ নিচু গলায় বলে, “এ ভাবে যদি শিল্পীরা তোমাকে দেখতে পেত, উন্মাদ হয়ে যেত মানিনী।”

মানিনী বলল, “এ মা ছি ছি, দেখবে কেন?”

“এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। বিশ্বের সব বড় শিল্পী নগ্ন নারীকে সামনে রেখে ছবি এঁকেছেন।”

মানিনী আরও লজ্জা পায়। তাড়াতাড়ি হাত নামিয়ে উঠে বসতে যায়। মণিনাথ তাকে ধরে ফেলে। বলে, “শিল্পী নেই তো কী হয়েছে? আমিই দেখব। একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।/ হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়।” বলে একটু থামল মণিনাথ, তার পর মানিনীর নগ্ন কাঁধে নাক ঘষে বলল, “এ কবিতা কার লেখা জানো? রবি ঠাকুর।”

মানিনী আবেশে চোখ বোজে, তার শরীর থেকে পোশাকের বাকিটুকু সরাতে থাকে মণিনাথ। যত ক্ষণ না গোটা শরীর উন্মুক্ত হয়, অস্ফুটে কবিতা, গান, ছবির কথা বলতে থাকে। তার প্রায় কিছুই বোঝে না মানিনী, বোঝার কথাও নয়। শুনতে ভাল লাগে। যে-পুরুষের পাশে শোওয়ার কথা, সে শুধু গালি দেয়, মারে। আর যে-পুরুষের পাশে কোনও দিনও শোওয়ার কথা ভাবেনি, সে এমন কথা বলে যাতে শরীর শিউরে ওঠে। মানিনী পাশ ফিরতে চাইলে মণিনাথ বাধা দেয়। অন্ধকারেও উদোম জানলা থেকে আলো এসে পড়েছে। রাতের আলো। সেই আলোয় ভেসে ওঠে মানিনীর মুখ, বুক, পেট, জঙ্ঘা। এক দুঃখী মেয়ের শরীরের আনাচ-কানাচ, যাবতীয় ব্যক্তিগত গোপনীয়তা হেসে ওঠে যেন। অন্ধকারকে তারা বলতে চায়, ‘দ্যাখো, আমি কত সুন্দর।’

পাজামা-পাঞ্জাবি থেকে নিজেকে মুক্ত করে মণিনাথ এ বার মানিনীর শরীরে হাত রাখে, পা রাখে, এক সময় নিজেকে রাখে। মানিনীর শীৎকার-মুহূর্তে তার মুখে হাত চাপা দেয়। মূল বাড়ি থেকে চিৎকার ভেসে আসে, “মাগি কোথায় গেলি? কার সঙ্গে ছেনালি করতে বেরিয়েছিস? মাগি কোথায় গেলি?”

কামরাঙা গাঁয়ে যে হাতে-গোনা দু’-তিন জন কলেজ পাশ করেছে, মণিনাথ সান্যাল তাদের এক জন। বিজুডাহি হাই স্কুলের মাস্টার সে। বিজুডাহি কামরাঙা থেকে এক ঘণ্টা দশ মিনিটের ট্রেনের পথ। এক সময় কামরাঙা স্টেশনের কাছে বৃদ্ধা মাকে নিয়ে একা থাকত মণিনাথ। বছর কয়েক হল, মা মারা যেতে, কামরাঙার পাট চুকিয়ে বিজুডাহিতে বাড়ি বানিয়েছে। জায়গাটা মফস্‌সল শহরের মতো। মণিনাথের বয়স পঁয়ত্রিশ বছর হতে দেরি নেই, বিয়ে-থা করেনি, মাকে দেখতে গিয়ে করা হয়ে ওঠেনি। কামরাঙায় থাকার সময়ে ব্রজগোপালের কাছে আসা-যাওয়া ছিল। তাঁর দোকানে, কাঠের গোলায়, ধান ভাঙার আড়তে ঢুঁ মারত। ব্রজগোপাল তাকে ডাকতেন ‘মাস্টার’। নন্দগোপালের অ্যাক্সিডেন্টের পর ছুটে এসেছিল। দাওয়ায় মোড়া পেতে বসিয়ে মানিনী চা করে খাওয়াল। শিক্ষিত কথা, মার্জিত ভঙ্গির রোগা, লম্বা, ঝাঁকড়া চুলের মানুষটাকে দেখে মুগ্ধ হওয়ার মতো পরিস্থিতি তখন মানিনীর ছিল না। মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়েছে। মণিনাথ যাতায়াত বাড়াল তারও বেশ কয়েক বছর পর। ব্রজগোপাল তখন মারা গিয়েছেন। বিজুডাহি থেকে মণিনাথ আসত স্কুটার চালিয়ে, নন্দগোপালের খবর নিতে। অত দূর থেকে শুধু নন্দগোপালের খবর নিতে যে মাস্টার আসছে না, মানিনীর বুঝতে সময় লাগেনি। তত দিনে স্বামীর সন্দেহ, কদর্য গাল, নোংরা আচরণও বেড়েছে।

এক দিন সন্ধের সময় আড়ালে পেয়ে মানিনীকে দেওয়ালে চেপে ধরে মাস্টার। নির্দ্বিধায় বুকে হাত রেখে ঠোঁট নামায়। দীর্ঘ ক্ষণ মানিনীর ভরা কালো ঠোঁট রেখে দেয় নিজের মুখের ভিতরে। মানিনী ছটফট করেও বাঁচতে পারেনি। জড়ানো গলায় মাস্টার বলেছিল, “আমি পারছি না মানিনী...পারছি না নিজেকে সামলাতে...তোমার যা খুশি করো, চাইলে খুন করো আমায়।”

পুরুষমানুষের চুমুর অভিজ্ঞতা সেই প্রথম মানিনীর, তার আগে যেটুকু যা নন্দগোপালের সঙ্গে হয়েছে তাকে আর যা-ই বলা যাক, চুমু বলা যাবে না। নন্দগোপালের কোনও দোষ ছিল না। একটা সময় পর্যন্ত মানুষটা যতই ভাল থাকুক না কেন, তার পক্ষে আদরের এই ভঙ্গি জানা সম্ভব নয়।

মণিনাথকে আর সরাতে পারেনি মানিনী। শরীর থেকে মনেও জড়িয়ে পড়েছে। তার বিশ্বাস, মাস্টারের এত আদর, এত সুখ উঠে এসেছে তার প্রতি গভীর ভালবাসা থেকে। অনেক না ভালবাসলে এই তৃপ্তি দেওয়া অসম্ভব। ভুল ভাঙে দ্রুত। শুধু ভাঙে না, কাচের বাসনের মতো টুকরো হয়ে যায়। ধারালো টুকরো।

মণিনাথ আসে সাবধানে, গোপনে। সন্ধে পেরিয়ে যাওয়ার পর। দীর্ঘ পথ স্কুটার চালিয়ে অন্ধকারে গ্রামে ঢোকে। লোকে যেন দেখতে না পায়। কানাঘুষো হবে। গ্রামের মানুষ যেমন সরল, তেমন চালাকও। নন্দগোপালকে ঘন ঘন দেখতে আসার গল্প বেশি দিন

বিশ্বাস করবে না। তাই সে ঢোকে কালাদিঘির পাশ দিয়ে। ও দিকটায় লোকের যাতায়াত নেই। পুকুরপাড়ের জঙ্গলে স্কুটার রেখে শেষ না হওয়া ঘরে চলে আসে সোজা। সারা দিন দুষ্টুমি করার পর ভিতরবাড়িতে নিজের ঘরে তখন ঘুমিয়ে পড়ে বিল্লু। মানিনীকে সময়, তারিখ আগেই বলা থাকে। রান্নাঘরে কুপি রেখে পা টিপে উঠে আসে মানিনী। রোজই ভাবে, যাবে না। এ অন্যায় হচ্ছে। ঘরে পঙ্গু স্বামী, ছোট ছেলে। বাড়িতে উপার্জনও তেমন নেই। বাড়ির ব্যবসাপাতি ভেঙেচুরে একটুখানি হয়ে গিয়েছে। বিরাজ ধর আগে বিশ্বাসী ছিল, পরে নষ্ট হয়েছে। হবে না-ই বা কেন? এমন সুযোগ পাবে? একটাই বাঁচোয়া, লোকটার নজর শুধু টাকাপয়সার দিকেই। মাস শেষে এক দিন করে নন্দগোপালকে হিসেব দেয় বটে, তাতে জলের ভাগটাই বেশি। নন্দগোপাল রাগারাগি করলে সে ভয় দেখায়।

"আমাকে ছেড়ে দাও হে, নিজের দোকান নিজে বোঝো গিয়ে। নুন আনতে পান্তা ফুরনো ব্যবসা নিয়ে তোমার গলাবাজি শুনব না নন্দ। এই রইল তোমার খাতা, আমি চললাম। আমার পাওনাগন্ডা মিটিয়ে হিসেব বুঝিয়ে দাও।"

নন্দগোপাল হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, "পাওনাগন্ডা কিসের? হিসেব তো তুমি বোঝাবে। জমি, আড়ত বন্ধক তো তোমার কাছে।"

বিরাজ ধর চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, "সুদও দাও না, আসলও ফেরাও না, বন্ধক আবার কী হে? সবই আমার এখন।"

নন্দগোপাল খাটের পাশে রাখা ক্রাচ হাতে তুলে ধরে মারতে যায়। বিরাজ গজগজ করতে করতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

সেই লোক উঠোন পেরনোর আগেই মানিনী ছুটে গিয়ে পারলে হাতে-পায়ে ধরে। ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে সামান্য টাকাটাও তো আসবে না। অভাবের সংসার ধুঁকে ধুঁকে হলেও চলছে, নইলে মুখ থুবড়ে পড়বে। সেই লোক নরম হয়। তবে হুমকিও দেয় প্রতি বার।

"তোমার বরকে সামলাও মানিনী। নইলে ছেলে নিয়ে বিপদে পড়বে, এই বলে রাখলাম। তোমাদের কথা ভেবে আরও ক'টা দিন রয়ে গেলাম। নেহাত ব্যবসা তোমার নামে, নইলে দিতাম টান মেরে ফেলে।"

বিরাজ ধর থেকে গিয়েছে, নিজের লাভের জন্যই রয়েছে। এই সঙ্কটের সময়ে মণিনাথের সঙ্গে সম্পর্কে পাপবোধে ভোগে মানিনী, তার পরেও নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। সব অভিসারই কি এ রকম? নিয়তির মতো? যেতেই হয়?

মানিনী আর-পাঁচ জনের মতো নয়। দাদার মৃত্যুর ঘটনা তাকে বালিকাবেলাতেই বদলে দিয়েছে। যে-মেয়ে ছিল উচ্ছ্বাসে ভরা, সে চুপ মেরে গিয়েছে। এই অতীত তার স্বামী জানে না। ব্রজগোপাল জানতেন। তিনি বিভাকে বলেছিলেন। মেয়ে দেখার সময় বিভা ছেলেকে বলতে চেয়েছিলেন।

"মেয়ে কেমন তুই জানতে চাস না নন্দ?"

"আমি জেনে কী করব মা? তুমি জানো, তা হলেই হবে।"

বিভা হেসে বলেছিলেন, "পাগল ছেলে, বিয়ে আমি করব না তুই?"

নন্দগোপাল বলেছিল, "আমার তো বিয়ে করারই ইচ্ছে নেই। তোমাদের জবরদস্তিতে করছি। বেশ তো রয়েছি।"

বিভা নন্দগোপালের গায়ে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, "বোকা ছেলে। আমরা আর কত দিন? সংসার সামলাবে কে? শুধু তো সংসার নয়, বাইরের কাজকম্মও তো দেখতে হবে। তুই সবটা একা পারবি না।"

নন্দগোপাল বলেছিল, "না পারলে, না পারব।"

বিভা বললেন, "অমন বলে না। বিয়ে কর, ভাল হবে। মেয়েটা ভাল।

দেখতে ডানাকাটা পরি নয়, আবার আমার মতো বিশ্রীও নয়। নামটাও মিষ্টি। মানিনী। শ্রীরাধার একটা নাম ছিল মানিনী।"

নন্দগোপাল বিরক্ত গলায় বলল, "ঠিক আছে, বুঝলাম। অত জেনে কী করব?"

বিভা বললেন, "যা এক দিন মেয়ে দেখে আয়। বেশি তো দূর নয়। জংশনে নেমে বাস ধরলে ঘণ্টা দেড়েক। জায়গাটার নাম দহিপুর। খবর দিয়ে রাখব, মেয়ের বাড়ি থেকে লোক এসে নিয়ে যাবে।"

নন্দগোপাল বলল, "আমার যাওয়ার দরকার নেই।"

বিভা বললেন, "তোর না থাকতে পারে, মেয়ের বাড়ির তো দরকার থাকতে পারে। যে-ছেলের হাতে মেয়েকে তুলে দিচ্ছে, তাকে এক বার দেখবে না? যদিও ওই বাড়িতে দেখার মতো তেমন কেউ নেই। তার পরেও..."

নন্দগোপাল বলেছিল, "আর বলতে হবে না। আমার এ সব ভাল লাগে না।"

বিভা পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, "এই মেয়েকে বিয়ে করলে তোর ভাল হবে নন্দ। মেয়েটাও আমার মতো, পরিবার বলতে তেমন কেউ নেই। বাপ-মায়ের বয়স হয়েছে। টাকাপয়সা, জমিজমাও নেই। যে এক-আধটা কানের দুল, গলার চেন রয়েছে, তা-ই দিয়ে বিয়ে হবে। আমি বলেছি, কিছু লাগবে না।"

নন্দগোপাল বলেছিল, "এ সব আমাকে বলছ কেন?"

বিভা একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আর একটু বলার ছিল নন্দ।"

নন্দগোপাল উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "অনেক শুনেছি, আর নয়।"

বিভা স্থির চোখে বললেন, "কথাটা দরকারি।"

বিরক্ত নন্দগোপাল বলেছিল, "দরকারি হলেও বলবে না।"

বিভা বললেন, "আচ্ছা, বলব না। তুই এক দিন ঘুরে আয়।"

বিভা ছেলেকে তার ভাবী শ্যালক সম্পর্কে বলতে চেয়েছিল। যতই হোক, অপঘাতে মৃত্যুর বাড়ি। নন্দগোপাল কি এখনও সে ঘটনা জানে? মানিনী জানে না। এখন অবশ্য তার জানা না-জানা সমান। সাত বছর হল নন্দগোপাল মূলত শয্যাশায়ী। দুর্ঘটনাটা ঘটে কামরাঙা হল্ট স্টেশনে। বেশির ভাগ ট্রেনই এখানে থামে না। কোনও কোনও গাড়ি শুধু গতি কমায়, তাও সিগনালের জন্য। অনেকেই তখন ওঠা-নামার সুযোগ নেয়। নন্দগোপালও সে দিন নিয়েছিল। নিচু প্ল্যাটফর্মে পা রাখতে গিয়ে ফস্কে যায়। নিমেষে হড়কে চাকার তলায় ঢুকে পড়ে। ট্রেন সিগন্যাল পেয়ে গতি বাড়িয়ে দেয়। পা তো বাদ দিতেই হয়েছে, শিরদাঁড়ার নার্ভ ছিঁড়ে যাওয়ায় ঠিকমতো পিঠও সোজা হয় না। টেনে-হিঁচড়ে বসাতে হয়, দাঁড় করাতে হয়। ভারী শরীর কাঁপতে থাকে। তবে সামান্য জোর এসেছে। বছর তিন হল, দুটো ক্রাচ নিয়ে একটু হাঁটাচলা করতে পারে। তাও ঘরের মধ্যে, অল্প ক্ষণের জন্য। মানিনীই সব করে দেয়। বিল্ব বাবার ধারে-কাছেও যায় না, ঘরেই ঢোকে না, সে মায়ের সঙ্গে অন্য ঘরে শোয়। নন্দগোপালের এতেও রাগ।

"ওই বজ্জাত মেয়েছেলেই ছেলেটাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।"

নন্দগোপালের বিয়ের বছর ঘুরল না, এক ভোররাতে ঘুমের মধ্যেই মারা গেলেন বিভা। শব্দহীন মরণ। ব্রজগোপাল সংসার থেকে নিজেকে একেবারে সরিয়ে নিলেন। শুরু হল বিপদ। বাড়িতে টাকাপয়সা ক্রমশই কমে আসছিল। তবু ডাল-ভাত, অসুখ-বিসুখ, বাড়ি মেরামত সামলে নিতে পারত নন্দগোপাল। বিল্বর খরচও ছিল। সাদাসিধে, সরল নন্দগোপাল ধীরে ধীরে ধার-দেনায় জড়িয়ে পড়ল। ঠকতেও লাগল। তার

পর এল দুর্ঘটনা। তার চিকিৎসা গ্রামের হেলথ সেন্টারে হওয়ার নয়, কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল। খানিকটা জমিজমা বন্ধক দিতে হল। আর কোনও উপায় ছিল না, মানুষটাকে তো বাঁচাতে হবে। বেঁচে গেল ঠিকই, কিন্তু সে বাঁচা জীবনের নয়, মরার বাঁচা।

স্বামীর চিৎকার শুনেও মণিনাথের শরীর থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না মানিনী, চায়ও না। মাস্টারের পিঠ আঁকড়ে থাকে সে। তার মনে হয়, সেই পিঠ অন্ধকারের মতো ঘন, মাছের মতো পিছল। তা ছাড়া তেমন ভয় করার কারণ নেই। নন্দগোপাল চাইলেও উঠে আসতে পারবে না। অভিসারের সময় মানিনী তার স্বামীর ক্রাচ নাগালের বাইরে সরিয়ে রাখে।

শরীর ফুরোলে মণিনাথ তাড়াহুড়ো করে। পাঞ্জাবি-পাজামা হাতড়ে টেনে পরতে থাকে দ্রুত। অনেকটা পথ ফিরতে হবে। মানিনী জড়ামড়ি করা কাপড় চেপে ধরে রাখে বুকের ওপর। মণিনাথ বেরোলে তবে কলতলা থেকে ঘুরে এসে পরবে। তখনও শরীর জুড়ে তৃপ্তির ক্লান্তি। তখনও জানে না, এক মুহূর্ত পরেই কত ভয়ঙ্কর প্রস্তাবের মুখোমুখি হতে হবে তাকে।

মণিনাথ দু'হাত দিয়ে গায়ের পাঞ্জাবিটি পরিপাটি করতে করতে নিচু গলায় বলে, "দুটো কথা মন দিয়ে শোনো মানিনী। হাতে সময় নেই। এ ভাবে বেশি দিন আসা ঠিক হবে না আমার। গ্রামের লোকেরা সন্দেহ করতে শুরু করেছে। আজ আমার স্কুটারের আওয়াজে দু'জন থমকে দাঁড়িয়েছিল। তাদের এক জনকে চিনেছি, কালুকাকা। আমি হাত তুললাম, সে উত্তর দিল না। দু'জনে মাথা নামিয়ে কিছু বলতে লাগল।"

মানিনী কাঁপা গলায় বলল, "তবে?"

মণিনাথ হেসে হাত বাড়িয়ে মানিনীর বুকের কাছে ধরা কাপড়ে হালকা টান দেয় খেলাচ্ছলে। বলে, "মানে একটাই। এ বার তুমি আমার হবে, এই বাড়ি আমার হবে। আমাকে আর ভয়ে ভয়ে কামরাঙায় ঢুকতে হবে না। নিজের বাড়ি আসতে কিসের লজ্জা? কিসের ভয়?"

মানিনী বিস্ফারিত চোখে বলল, "কী বলছেন!"

"ঠিকই বলছি।"

মানিনীর শরীর কেঁপে উঠল। মানুষটা কী বলছে! মণিনাথ সহজ ভাবে নিজের চুলে হাত বোলায়।

"অন্য কোনও উপায় নেই। এই জমিজমা-বাড়ি, ব্রজগোপালবাবুর এই শেষ না হওয়া ঘর, সব কিছুর দায়িত্ব আমি নিতে চাই। আমি জানি, এই সম্পত্তি তোমাকে দিয়ে গেছেন ব্রজগোপালবাবু। সুতরাং তুমি সই করলেই হবে। বাড়িতে তোমার স্বামী-ছেলে বহাল তবিয়তে থাকবে, খরচ আমার। আর ওই কে যেন লোকটা, যার কাছে কিছুটা জমি নাকি বাঁধা রয়েছে, বিরাজ না ধীরাজ? তাকে আমি বুঝে নেব।"

ভিতরবাড়ি থেকে চিৎকার আসে। নন্দগোপাল বলছে, "আজ মেরেই ফেলব, ফিরুক সে বাড়িতে। আমার ক্রাচ কোথায় রেখেছে হারামজাদি?"

মণিনাথ এগিয়ে আসে। মানিনীর চিবুকে হাত রেখে বলে, "এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর হতে পারে না মানিনী। তুমি ওই পশুর হাত থেকে নিস্তার পাবে।"

মানিনী অস্ফুটে বলে, "বিল্লু..."

মণিনাথ একটু থমকে থেকে বলে, "ওরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ক'দিন পরে বাইরে চলে যাবে। বোর্ডিং স্কুলের তো অভাব নেই। আমার চেনা-জানাও রয়েছে। বিল্লু লেখাপড়া শিখবে, না বাবার গালিগালাজ শিখবে? তুমি কোনটা চাও? চিন্তা কোরো না মানিনী, আমাকে সব লিখে দিয়ে এক বার দেখো, কত ভাল ভাবে গুছিয়ে দিই।"

রাগে, ঘেন্নায় মানিনীর শরীর কাঁপছে। এই মানুষটাও আসলে লোভী! এত ভালবাসা, সব অভিনয়? দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে, "বিল্লু একটা রিভলভার কুড়িয়ে পেয়েছে।"

মণিমাস্টার চাপা গলায় হেসে ওঠে। দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলে, "খেলনা রিভলভার দিয়ে সে আমায় মারবে নাকি?"

নয়

ধ্রুব অন্যমনস্ক। এতটাই অন্যমনস্ক যে, খানিক আগে রাধিকাকে তার চাকরি যাওয়ার ঘটনাটা বলে ফেলেছে।

ঘটনা শুনে রাধিকা যে চমকে উঠেছে এমন নয়, একটু আগে সে যা করছিল, সেটাই করছে। নীল রঙের কেডস পরা পা দুলিয়ে খোলা ভেঙে বাদাম খাচ্ছে। যে-মেয়ে অতিরিক্ত ছটফটে, সে আজ বেশি রকম শান্ত। শান্ত হওয়ার কারণ, আজ দুপুরে ক্লিনিকে সে একটা ভয়ঙ্কর খবর পেয়েছে। খবরটা সে বিশ্বাস করেনি, সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুবকে মোবাইলে ধরেছে।

"বিকেলে দেখা করবে।"

ধ্রুব বলল, "আজ হবে না রাধিকা। আজ এক জনের সঙ্গে দেখা করতে যাব।"

রাধিকা চাপা গলায় বলল, "এক জনের সঙ্গেই দেখা করবে, সেটা আমি। ঠিক পাঁচটা পনেরো মিনিটে আমার ক্লিনিকের উল্টো দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি ক্যাব ডেকে তুলে নেব।"

ধ্রুব আবারও বাধা দিতে গিয়েছিল, রাধিকা ফোন কেটে দিয়েছিল।

গোটাকতক বাদাম ধ্রুবর হাতে দিয়ে রাধিকা বলল, "আমি জানতাম।"

ধ্রুব বলল, "কী জানতে? আমার চাকরি টিকবে না?"

রাধিকা সহজ ভাবে বলল, "জানতাম শুধু চাকরি নয়, তোমার পক্ষে কোনও কিছুই টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।"

রাধিকা আজ নীল শার্ট-প্যান্ট পরেছে। প্যান্টের বেল্টে বাক্‌ল। বেল্ট থেকে গলা পর্যন্ত টেনে তোলা সাসপেন্ডার্স। সে এমনিতেই স্মার্ট মেয়ে, এই পোশাকে তাকে আরও স্মার্ট লাগছে। লম্বার দিকে এই তরুণীর চোখ-মুখ, চিবুক তীক্ষ্ণ। নিয়মিত চর্চা করা চেহারায় এখনকার বেখেয়ালে থাকা সৌন্দর্য রয়েছে। আলতো বুক, সরু কোমর, লম্বা গলায় মানানসই পোনিটেল। ক্যাবে তুলে সে ধ্রুবকে আজ নিয়ে এসেছে গঙ্গার ঘাটে। তবে এই গঙ্গার ঘাট সাজানো-গোছানো ইভনিং ওয়াক বা প্রেম করার ঘাট নয়। বাঁ হাতে বাবুঘাটকে ফেলে উত্তর দিকে সোজা যেতে হবে বেশ খানিকটা। বাঁ দিকেই, চক্র রেলের লাইন টপকে গেলে, পোর্টের একটা বাতিল গোডাউন পড়ে। ভাঙা লোহালক্কড় টপকে যদি সাহস করে গোডাউনের পিছনে পৌঁছনো যায়, সেখানে আছে এই কাঠের জেটি। এই জেটিও ঘাটের মতোই বাতিল। অন্য কোনও মেয়ে কতটা সাহস পেত বলা মুশকিল, রাধিকা দিব্যি চলে এল। ভাঙা জেটিতে ধ্রুবকে পাশে নিয়ে বসেও পড়েছে। এই জায়গার সন্ধান সে পেয়েছে অস্মির কাছ থেকে। অস্মি এক জন বলিয়ে-কইয়ে তরুণ। এক জন ব্লগার। নিজের দিকে ক্যামেরা তাক করে এক হাত নেড়ে বকবক করে নানা রকম ভিডিয়ো করে, সেই ভিডিয়ো ফেসবুকে, ইউটিউবে তুলে দেয়। বকবকের বিষয় থাকে। কখনও পথের খাবার, কখনও কলকাতার রিকশা, কখনও ফুটপাথে ঘুম। এমনই একটা ব্লগ হল 'আননোন লাভার্স পয়েন্ট'। বাংলা করলে মোটের ওপর বলা যেতে পারে, প্রেম করার অজানা জায়গা। সেই ব্লগ থেকেই এই স্পট খুঁজে পেয়েছে রাধিকা। শুধু প্রেম করার নতুন জায়গা খুঁজে পায়নি, এক জন প্রায় নতুন প্রেমিককেও খুঁজে পেয়েছে। 'প্রায়' বলা এই কারণে যে, সেই ছেলে এক বার 'হ্যাঁ' শোনার জন্য নাগাড়ে ঘ্যানঘ্যান শুরু করে দিয়েছে। এতটাই ঘ্যানঘেনে যে, প্রয়োজন ছাড়া সে রাধিকাদের ক্লিনিকে এসে তিন বার ব্লাড, ইউরিন পরীক্ষা করে গিয়েছে। রাধিকার কলিগরা তাকে চিনে গিয়েছে এবং হাসি-ঠাট্টা শুরু করেছে।

"রাধিকা, ওই এসে গিয়েছে। দেখ, আজ কী নিয়ে এল, ব্লাড?

নাকি ইউরিন? গোলাপের বদলে কেউ যে এ সব নিয়ে প্রোপোজ় করতে আসে, প্রেমের ইতিহাসে এ ঘটনা প্রথম।"

ব্লগ করার পাশাপাশি অস্মি সল্ট লেকের সেক্টর ফাইভে চাকরি করে। নাইট শিফটে। এই ছেলেটাকে নিয়ে রাধিকা খুব দ্রুত একটা সিদ্ধান্তে আসতে চায়। কিন্তু এর মধ্যে বোকা, ক্যাবলাকান্ত ধ্রুব সম্পর্কে একটা ভয়ঙ্কর খবর শুনে তার মাথা ঘুরে গিয়েছে।

আর কী কী সে টেকাতে পারবে না, সে বিষয়ে প্রশ্ন করতে ধ্রুবর ইচ্ছে করল না। তার এই নিস্পৃহ ভাব খানিক ক্ষণ ধরেই নজর করছে রাধিকা। রাগও হচ্ছে। ভয়ঙ্কর খবরটা যদি সত্যি হয়, তা হলে রাগ তো হবেই। এত বড় একটা ঘটনা সে লুকিয়ে রাখল কী করে! তার মানে এত দিন বোকা, ক্যাবলা সাজার অভিনয় করেছে।

রাধিকা পা দোলানো থামিয়ে ধ্রুবর দিকে ফিরল, তার পর সরাসরি প্রশ্ন করল, "তোমার বাবা জেলে ছিলেন ধ্রুব? আমার মনে হয় এই খবরটা আমি আজ ভুল শুনেছি।"

অন্যমনস্ক ভাব থেকে বেরিয়ে এল ধ্রুব। বাতিল জেটির সামনে যে গঙ্গা বয়ে যায়, সেও কি বাতিল? না, সে বাতিল নয়, সে তো চলছে। যা চলে, তাকে বাদ দেওয়া যায় না। কিছু অকিঞ্চিৎকর জীবনের মতো। সমাজের চোখে, আত্মীয়-পরিজনের চোখে যতই বাতিল হয়ে যাক না কেন, সে কোথাও-না-কোথাও রয়ে যায়। রয়ে যায় বলেই কি সন্তোষ সেন থেকে বেরোতে পারে না ধ্রুব?

"কী হল, বলবে না?"

ধ্রুব এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে স্পষ্ট গলায় বলল, "হ্যাঁ, আমার বাবা সন্তোষ সেন সাত বছর জেলে ছিল।"

রাধিকা থমকে গেল। হাতের বাদামের দিকে তাকিয়ে ফের চোখ তুলল, "কেন? জেলে কেন?"

ধ্রুব গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার বাবা একটা খুনের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে। যাবজ্জীবন বা ফাঁসি, যে-কোনও একটা সাজা হতে পারত। শেষ মুহূর্তে সাক্ষী বয়ান বদল করায় বেঁচে যায়। জেল খাটার সাজা হয়। ছ'মাস হল মুক্তি পেয়েছে।"

স্মার্ট রাধিকা এ বার ঘাবড়ে গেল। খুন বা জেল শুনে যতটা না ঘাবড়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ঘাবড়েছে ধ্রুবর সটান উত্তর শুনে। কুণ্ঠা তো দূরের কথা, বাবার কারাবাসের কথা বলতে তার কোনও জড়তাও নেই। ছেলেটা দুম করে এতটা বদলে গিয়েছে! রাধিকা নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে।

"তোমার বাবাকে নিশ্চয়ই ভুল করে জেল খাটতে হয়েছে। অনেক সময়ে হয়, বিনা অপরাধে...গল্পে পড়েছি। আবার কেউ ফাঁসিয়েও দিতে পারে।"

গরমে সূর্য ডোবে দেরিতে। তার পরেও চারপাশ আলো হয়ে থাকে। এখনও তা-ই হয়ে আছে। সূর্য চলে যাওয়ার আগে খানিকটা গোলাপি আলো গঙ্গার জলে রেখে গিয়েছে। হয়তো পরে এসে নিয়ে যাবে। এ দিকটায় নদী যেন বেশি গভীর, বেশি স্থির। প্রকৃতির এটাই রহস্য। যেখানে মানুষের চোখ কম পড়ে, সেখানে সে থাকে নিজের খেয়ালখুশি মতো। ধ্রুব জলের দিকে তাকিয়ে রইল। তার বাবা কি সত্যিই অপরাধী?

কৃষ্ণপ্রিয়া কিশোর ধ্রুবর কাছে ঘটনাটা লুকিয়েছিলেন। সন্তোষ সেন পালিয়ে যাওয়ার পর বাড়িতে পুলিশের আসা-যাওয়ায় ধ্রুব অস্থির হয়ে পড়েছিল। কৃষ্ণপ্রিয়া তাকে কাছে ডেকে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, "চিন্তা কোরো না, তোমার বাবাকে পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ হারিয়ে গেলে, পুলিশকে ইনভেস্টিগেট করতে হয়, তার বাড়িতে আসতে হয়। এটা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তুমি লেখাপড়ায় মন দাও। সবার জীবনেই কিছু-না-কিছু অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে, এটাও সে রকম।"

মা যা-ই বলুক, আড়াল থেকে শুনতে পেয়ে ধ্রুব বুঝতে পারে, ঘটনা মারাত্মক। তার বাবা নিখোঁজ নয়, পালিয়ে বেড়াচ্ছে। স্কুলের বন্ধুরাও জানতে পেরেছে, তার দিকে বিস্মিত চোখে তাকাচ্ছে, তাকে জিজ্ঞেস করছে। সে সরাসরি মায়ের কাছে যায়। কৃষ্ণপ্রিয়া খানিকটা থমকে গেলেও বুঝতে পারেন, সব লুকনো যায়নি। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, ধ্রুব যতটুকু নিজে থেকে জেনেছে জানুক, বাকিটুকুও বলে দেবেন। মানবেশ তাঁকে আগেই এই পরামর্শ দিয়েছিলেন।

"ছেলে জানুক তার বাবা কেমন। খুন করে যে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, ছেলের শ্রদ্ধা, সহানুভূতি পাওয়ার কোনও অধিকার তার নেই কৃষ্ণপ্রিয়া। ছবিটা তার সামনে ক্লিয়ার করো এখনই। ধ্রুব শিশু নয়, তার জানার বয়স হয়েছে।"

কৃষ্ণপ্রিয়া তার পরেও সময় নেন। মনে হয়েছিল, মানবেশ চাইছেন বাবার প্রতি ধ্রুবর এক ধরনের ঘৃণা তৈরি হোক। এই চাওয়ায় কৃষ্ণপ্রিয়ার কোনও আপত্তি ছিল না, ধ্রুবর অপরিণত মনে বড় কোনও ধাক্কা তৈরি হবে কি না, তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল। মানবেশ এতেও বিরক্ত হয়েছিলেন, "আর কী বড় ধাক্কা হবে? ওর জানা উচিত।"

শেষ পর্যন্ত ছেলেকে বলেছিলেন কৃষ্ণপ্রিয়া। খানিকটা রেখে-ঢেকে বলেছিলেন।

"তোমার বাবা একটা বিশ্রী ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছে। ধরা পড়লে তাকে বড় ধরনের সাজা পেতে হবে। যত দিন না ধরা পড়ে, পুলিশ আমাদের বিরক্ত করবে। তোমারও পিছু নিতে পারে।"

ধ্রুব অবাক হয়ে বলেছিল, "আমার পিছু নেবে কেন?"

কৃষ্ণপ্রিয়া শান্ত ভাবে বলেছিলেন, "ওরা ভাবতে পারে, তোমার বাবা হয়তো লুকিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে।"

ধ্রুব আরও অবাক হয়, যে-মানুষটা এমনিতেই তার সঙ্গে কোনও দিন স্কুলে যায়নি, সে কিনা এই অবস্থায় তার সঙ্গে দেখা করবে! কৃষ্ণপ্রিয়া বললেন, "মন শক্ত রাখো। বিপদের সময়ে মন শক্ত রাখতে হয়। তা ছাড়া আমরা তো একা নই, আমাদের বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে রয়েছে... এই যেমন তোমার মানবেশ আঙ্কল। উনি তো সব সময় খবর রাখেন।"

মানবেশ আঙ্কল আর মায়ের সম্পর্ক ধ্রুবর কাছে স্পষ্ট হয় বাবা ধরা পড়ার পর। লোকটা কখনও বাড়িতে না এলেও, তাদের পরিবারের যে এক জন বিশেষ কেউ হয়ে উঠছেন, সেটা সে বুঝতে পারল। মায়ের অনেকটাই তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। বাবার সঙ্গে দেখা করতে জেলখানায় যাওয়া তো দূরের কথা, বাড়ি থেকে সন্তোষ সেন নামটাই এঁরা মুছে দিয়েছেন। মায়ের হাবেভাবে, টেলিফোনের কথায় ধ্রুব নিশ্চিত হল, তার বাবার ফাঁসি হতে চলেছে। কোনও এক আশ্চর্য কারণে, হঠাৎ এক দিন বাবার জন্য ধ্রুবর মনখারাপ হল। দেখা করতে ইচ্ছে করল, কথা বলতে ইচ্ছে করল। এই মনখারাপ বাড়তে লাগল। কৃষ্ণপ্রিয়া শুনে কেমন হকচকিয়ে গেলেন। তিনি ছেলেকে নিয়ে গেলেন মানবেশের কাছে। মানবেশ মজুমদার তাকে শান্ত ভাবে, যত্ন করে বোঝালেন।

"যে-মানুষটা কোনও দিনও তোমার মায়ের দিকে, তোমার দিকে ফিরে তাকায়নি, দায়িত্ব পালন করেনি, তাকে নিয়ে তোমার মনখারাপ হওয়া অনুচিত। মনকে বোঝাও ধ্রুব। মানুষটা ভয়ঙ্কর একটা অন্যায় করেছে। মানুষকে হত্যা করা সবচেয়ে বড় অন্যায়। তার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখানোও অন্যায়। তোমার জীবন পড়ে রয়েছে। কোনও অন্যায়ের ধারে-কাছে তুমি যাবে না। আমি তো রইলাম। তোমার বন্ধু, তোমাদের বন্ধু। সে রকম মনে হলে, আমার বাড়িতে এসে থাকবে।"

ধ্রুব বুঝল, একটু বেশি করেই বুঝল। সন্তোষ সেনকে সে মন থেকে সরাতে লাগল, আর একই সঙ্গে সে তার মায়ের কাছ থেকে সরে যেতে লাগল। সে বুঝতে পারল— বাবা, মা কেউই তার জন্য নয়। সে একা। একাই তাকে বাঁচতে হবে। এর মাঝেই রাধিকার সঙ্গে দেখা এবং রাধিকার তাকে ভালবেসে ফেলা। এই সম্পর্ক থেকে চাইলেও সরে যেতে পারেনি ধ্রুব। রাধিকার উচ্ছলতা, ভরপুর প্রাণশক্তি তার কাছে বদ্ধ ঘরে জানলার মতো। মাঝে মাঝে যে চাকরি

পেয়েছে, সেখানে নিজের ক্ষমতা মতো মন দিয়ে কাজ করেছে। মন দিয়ে কাজ করলে অনেক কিছু ভুলে থাকা যায়। কামরাঙা গ্রামে সার, কীটনাশক নিয়ে পড়ে থাকার সময়টা তো ভারী সুন্দর কেটেছিল। কত মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কয়েক জনের কথা খুব মনে পড়ে। সে ঠিকই করে রেখেছে, যাবে এক বার। সবার সঙ্গে দেখা করবে।

ধ্রুব রাধিকার দিকে না তাকিয়েই বলল, "না, বাবাকে ভুল করে জেল খাটতে হয়নি, খুনের সময়ে বাবা ঘটনাস্থলে ছিল। বিশু নামে যে-লোকটা কাজটা করে, বাবা তার সঙ্গেই গিয়েছিল। তবে বাবা জানত না, ঘটনাটা খুন পর্যন্ত গড়াবে। কিছু টাকা নিয়ে ঝগড়া যে শেষ পর্যন্ত এমন চেহারা নেবে, কল্পনাও করতে পারেনি।"

সন্তোষ সেন ছেলের পাশে হাঁটতে হাঁটতে এক দিন ঘটনাটা বলেছিলেন। ধ্রুব যে শুনতে আগ্রহী ছিল এমন নয়। সে বরং বলেছিল, "থাক, এখন আর এ সব শুনে কী হবে? যা ঘটার তা তো ঘটে গেছে।"

সন্তোষ সেন বলেছিলেন, "নো। পুত্র শুড নো দ্য ট্রুথ। সে যদি ভেবে থাকে তার ফাদার নির্দোষ, সে বিগ মিসটেক করবে। তার বাবা অবশ্যই এক জন অপরাধী, কিন্তু সে জানত না, এত বড় একটা ঘটনা ঘটবে। সে দিন বিশুর কাছে গিয়েছিলাম, হাজার পাঁচেক টাকা যদি ধার পাওয়া যায়। ব্যবসার মাল তুলতে পারছিলাম না।"

ধ্রুব বলল, "বাড়ি থেকে নিলে না কেন?"

সন্তোষ সেন মুচকি হেসে বললেন, "মাই সন, সে দিন বাড়ি থেকে যদি টাকাটা পেতাম, তা হলে তো কিছুই ঘটত না। নো মার্ডার, নো অ্যারেস্ট, নো জেল। বাড়ি থেকে টাকা নেওয়ার মতো পরিস্থিতি আমার কখনওই ছিল না।"

ধ্রুব ভুরু কুঁচকে বলেছিল, "কেন, মা? মা তো চাকরি করত।"

সন্তোষ সেন বলেছিলেন, "টাকা দেওয়ার ব্যাপারে তোর মা আমাকে ভরসা করত না। করবেই-বা কেন, আমি টাকা ফেরত দিতে পারব কি না তার ঠিক ছিল না। বিশুর মতো লোকেরাই আমার ভরসা ছিল। যাক ও সব কথা, সে দিন তো বিশুর কাছে গেলাম। হি সেড, তার কাছে নো মানি। তবে উপায় রয়েছে। তার এক পরিচিত হাজার কুড়ি টাকা নিয়ে ফেরত দিচ্ছে না, তার কাছ থেকে কিছু যদি আদায় করা যায়, তবে আমার হতে পারে। বিশু বলল, তুমিও চলো। দু'জনে থাকলে বেশি কাজ দেবে। আমি দেখলাম, এ আর এমন কী কাজ? মান্ধাতার আমলের ভাঙাচোরা ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকত সেই লোক। অন্ধকার, ঘুপচি সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম দু'জনে। লোকটা দরজার আই-হোল দিয়ে আমাকে দেখে দরজা খুলল। দরজা খুলতেই আমাকে ধাক্কা দিয়ে বিশু ঢুকে পড়ল ভিতরে। গলা চেপে ধরল, আমিও ছাড়াতে গেলাম।"

ধ্রুব আবার বাধা দেয়, "আমি শুনব না।"

সন্তোষ সেন মাথা নেড়ে বললেন, "তা বললে হবে না। বাকিটুকুও শুনতে হবে। হ্যাভ পেশেন্স। তোদের বয়সে আমাদের ধৈর্য ছিল। একটা জাতি কি এমনি এমনি এত বড় হয়? তাকে ধৈর্য ধরতে হয়। যাক, বাকিটা শোন। এই ধস্তাধস্তির সময়ে আমি যখন লোকটাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছি, বিশু তাকে ছেড়ে কাঁধের ঝোলা থেকে একটা বেঁটে লোহার ডান্ডা বের করল এবং এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে লোকটার মাথায় দিল বাড়ি। ব্যস, যা হওয়ার হয়ে গেল। হাসপাতালে মরার আগে বেটা পুলিশকে বলল, আমি তাকে চেপে ধরে ছিলাম, বিশু তার মাথায় রড মেরেছে।"

ধ্রুব বলল, "তা হলে তো তুমি কোনও অপরাধই করোনি।"

সন্তোষ সেন বললেন, "নো মাই সন, আমিও অপরাধী। আমি বিশুর সঙ্গে সে দিন টাকা আদায় করতে গিয়েছিলাম।"

ধ্রুব বলল, "তাতে কী? তুমি তো জানতে না বিশু লোকটাকে রড দিয়ে মারবে।"

সন্তোষ সেন বললেন, "সেটা আমার অজ্ঞতা। অজ্ঞতাটা আইনের চোখে কোনও কৈফিয়ত নয়, তাও তো সাজা কম হয়েছে। তা ছাড়া ডেস্টিনি বলে একটা কথা রয়েছে। নিয়তি। মানুষের নিয়তি মানুষকেই বহন করতে হয়। আর সেই ভাবে দেখলে, সে দিনের ঘটনা ছাড়াও তো আমি মস্ত অপরাধী ধ্রুব। তোর মায়ের স্বপ্ন, তোর বড় হওয়া, কিছুই পূর্ণ করতে পারিনি। নো, নেভার। তোর মাকে বিয়ে করাটাই তো আমার একটা মস্ত অপরাধ। তার একটা শাস্তিও তো তোলা ছিল। ও সব কথা ছাড়।"

এর পর আর সে দিন কথা বাড়াতে পারেনি ধ্রুব।

রাধিকা ফের পা দোলাচ্ছে। কে বেশি খুনি, কে কম খুনি, তা নিয়ে হিসেব করার কোনও ইচ্ছে তার নেই। খুনের সময়ে খুনির সঙ্গে যে থাকে, সেও খুনি। এ সবের চেয়ে বড় কথা অন্য। ধ্রুব এত দিন তাকে বলেনি কেন?

ধ্রুব বলল, "ভালই হল রাধিকা, তুমি নিজে থেকে জানতে চাইলে। এক দিন না এক দিন তো আমাকে বলতেই হত। আমি মন থেকে তৈরিও হচ্ছিলাম। বোকা বলে তৈরি হতে দেরি হচ্ছিল।"

রাধিকা পা দোলানো বন্ধ করে বলল, "তুমি কি মনে করো এর পরেও তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক একই রকম থাকবে?"

ধ্রুব বলল, "থাকা উচিত নয়। যেটুকু আমার তোমাকে বলতে বাকি রয়ে গেছে সেটা হল, আমি এখন নতুন করে বাবার সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছি। তাকে আমার পছন্দ হতে শুরু হয়েছে রাধিকা। কেন জানো? লোকটার কোনও ভান নেই, প্রায় অকারণে এত দিন জেল খাটার পরও কাউকে দোষারোপ করা নেই। আমার মা যে অন্য পুরুষে আসক্ত, তা জানা সত্ত্বেও কোনও রাগপ্রকাশ নেই। যেন নির্লিপ্ত, যেন কারও সুখ নিয়ে আপত্তি নেই। যে-সহবন্দি তাকে জেলখানায় বসে এক সময় সাহায্য করেছিল, তার শাস্তি কমানোর ব্যবস্থা করেছিল, তার জন্য এখনও বিপদের ঝুঁকি নিতে পিছপা হচ্ছে না। এই লোককে পছন্দ না করে উপায় কী রাধিকা?"

জলে অন্ধকার নেমেছে। পিছনের ভাঙা গুদামেও আলো নেই। এই জেটিও আর নিরাপদ নয়। রাধিকা বলল, "ধ্রুব, তোমাকে আরও একটা কথা বলার রয়েছে। অস্মি নামে এক ঝকঝকে, চটপটে ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। সে তোমার মতো বোকা নয়। তার বাবা খুনের অপরাধে জেল খাটেনি। সে ভাল চাকরি করে, আবার এক জন স্মার্ট ব্লগার। ব্লগার কী জানো? থাক, জানতে হবে না। অস্মি খুব চাইছে, আমি তার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ি।"

ধ্রুব বলল, "খুব ভাল কথা রাধিকা। তোমাকে অভিনন্দন।"

রাধিকার মুখে দূরের নৌকা থেকে ভেসে আসা আলো পড়েছে। সে মুখ নামিয়ে বলল, "মজার কথা হল, সে আমাকে নিজে থেকে বলেছে, যদি আমাদের বিয়ে হয়, তা হলে হানিমুন হবে কোনও কমলালেবুর বনে তাঁবু খাটিয়ে।"

ধ্রুব হেসে বলল, "তা হলে তো দারুণ ব্যাপার! বিদেশে যাবে। তোমার স্বপ্ন সফল হবে।"

রাধিকা ধ্রুবর দিকে মুখ এগিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "না, যাব না। বোকা ছেলেকে শাস্তি দেব।"

কথা শেষ করে জামার কলার ধরে ধ্রুবকে কাছে টেনে নেয় রাধিকা। গলা জাপটে ঠোঁটে নিজের ঠোঁট চেপে ধরে। কিছু সময়ের মধ্যেই অস্পষ্ট বোঝা যায়, প্রায় অন্ধকার ভাঙা জেটিতে দুই তরুণ-তরুণী শুয়ে রয়েছে। নিজের শার্ট-প্যান্ট, অন্তর্বাস যেমন খুলেছে, তরুণী তার সঙ্গীটিকেও নগ্ন করেছে। জড়ামড়িতে তারা বিপজ্জনক ভাবে খানিকটা গড়িয়েও যাচ্ছে। শরীরের ঘ্রাণ নিতে নিতে রাধিকা ফিসফিসিয়ে বলছে, "তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব ধ্রুব? কোনও কমলালেবুর বন আমার দরকার নেই, তোমার গায়েই তো কমলালেবুর গন্ধ।"

তরুণটিও তরুণীর গালে মুখ ঘষে কী যেন বলতে লাগল। জেটির গায়ে নদী ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ তুলে জীবনের প্রথম সঙ্গমে মত্ত দুই মানব-মানবীর যাবতীয় কথা আড়াল করল।

যে-সম্পর্ক শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কয়েক মুহূর্ত আগেও, তা-ও অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। শুধু গড়া নয়, কোনও কোনও ভাঙাও মাঝপথে থেমে যায়।

দশ

কৃষ্ণপ্রিয়া আজ অফিস যাননি। তিনি এখন এক তলায়। এর আগেও দু'বার এক তলায় এসে ঘুরে গিয়েছেন। দরজায় তালা ছিল। বিকেল চারটের পর ধ্রুব ফিরল। দোতলা থেকে কোলাপসিবল গেট টানার আওয়াজ পাওয়া যায়। সেই আওয়াজ পেয়ে কৃষ্ণপ্রিয়া নেমেছেন।

কৃষ্ণপ্রিয়া সাধারণত এক তলায় আসেন না, এলেও ঘরে ঢোকেন না। বাইরে থেকে ছেলের সঙ্গে দু'-একটা কথা বলে চলে যান। আজ ঢুকেছেন। সদর দরজা দিয়ে ঢুকলেই এক ফালি জায়গা। সেখানে দু'জনে বসতে পারে, এমন একটা ছোট টেবিল পাতা। তারই সামনে একটা চেয়ার টেনে বসেছেন কৃষ্ণপ্রিয়া। এই ঘর তাঁর বাবার প্রথম দিকে বানানো। পরে দোতলা ওঠে। তখন কৃষ্ণপ্রিয়া কিশোরী। সেই সময় পাড়ার ছেলেরা বাড়ির সামনে দিয়ে সাইকেলে চক্কর দিয়ে যেত। দোতলার বারান্দায় হুটহাট বেরোলে, ছাদে উঠে গেলে মা রাগারাগি করত। কিশোরী কৃষ্ণপ্রিয়া বিরক্ত হতেন।

"কী বলছ মা! ইচ্ছে হলে একটু খোলা বাতাসে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না?"

মা গম্ভীর ভাবে বলত, "না, পারবে না। একটা বয়সের পর মেয়েরা ইচ্ছে করলেও খোলা হাওয়া-বাতাসে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না।"

এখন ভাবলে অবাক লাগে কৃষ্ণপ্রিয়ার। যখন বারণ করার কেউ ছিল না, থাকলেও শোনার কোনও দায় ছিল না, বাতাসের জন্য নিজের খুশি মতো বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েও দমবন্ধ লেগেছে। নিজের পছন্দে বিয়ে করে লেগেছে, নিজের পছন্দে সম্পর্ক তৈরি করেও লাগছে। মা ঠিকই বলেছিল, একটা বয়সের পর ইচ্ছে করলেও মেয়েরা খোলা বাতাসের কাছে যেতে পারে না। ভাবে যায়, এক সময় ভুল ভাঙে। আজকাল মানবেশ মজুমদারের কাছেও মাঝে মাঝে দমবন্ধ লাগছে কৃষ্ণপ্রিয়ার। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, কোথাও বুঝতে ভুল হচ্ছে। মানবেশ এক জন সুন্দর মানুষ। তাঁকে ভালবাসেন, তাঁর জন্য গোটা জীবন অপেক্ষা করে রইলেন। সন্তোষ সেন যদি খুনের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে প্রথমে পালিয়ে এবং পরে জেলে না যেতেন, এত দিনে হয়তো তাঁর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে যেত কৃষ্ণপ্রিয়ার। মানবেশের সঙ্গে হয়তো নতুন করে সংসার শুরু হত। সবটাই জট পাকিয়ে গেল। কোনও কোনও সময় মানবেশ অধৈর্য হয়ে পড়লেও নিজেকে শান্ত করেন। এর চেয়ে মুক্ত মনের পুরুষ কোথায় পেতেন কৃষ্ণপ্রিয়া? তার পরও মানবেশের সঙ্গ আজকাল মাঝে মাঝে কেমন দমবন্ধ করে দেয়। তিনি চলে আসেন। একা থাকতে স্বস্তি পান। কেন? কৃষ্ণপ্রিয়ার ভয় করে, তিনি কি মানসিক ভাবে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন? নাকি এ তাঁরই তৈরি অস্থিরতা, যার জন্য সেলাই করার মতো কাজও ঠিক করে পারছেন না? ক'দিন হল কৃষ্ণপ্রিয়া সেলাইতে মন দিতে পারছেন না। শুধু মন দিতে পারছেন না এমন নয়, কাপড়, সুতো দেখলেও বিরক্ত লাগছে। চোখের সামনে থেকে সব সরিয়ে রেখেছেন। গত কালের পর অস্থিরতা বেড়েছে। ভেবেছিলেন রাতেই ছেলের সঙ্গে কথা বলবেন। মানবেশ মজুমদার তাঁকে বারণ করেন। কাল রাতে ফোনে কথা হয়।

"আগে আমার ব্যবস্থাটা হয়ে যাক, তুমি তার পর কথা বলো কৃষ্ণপ্রিয়া।"

কৃষ্ণপ্রিয়া কাঁপা গলায় বলেন, "আমার ভয় করছে মানব।"

মানবেশ বললেন, "পুলিশের কথা অত সহজে বিশ্বাস কোরো না কৃষ্ণপ্রিয়া। ওরা বেশি ভয় দেখায়, তুমি তো জানো।"

কৃষ্ণপ্রিয়া নিচু গলায় বলেছেন, "জানি। কিন্তু তার পরেও..."

মানবেশ বললেন, "দ্যাখো না কাল কী ঘটে। ধ্রুব যদি রাজি হয়, আমার মনে হয় হবেই, তা হলে পরশু সকাল বা বিকেলের ফ্লাইটেই ওকে রওনা হতে হবে। ও আর কিছু করার সুযোগ পাবে না।"

কৃষ্ণপ্রিয়া মানবেশের কথায় আশ্বস্ত হননি, কিন্তু শুনেছেন। ছেলের কাছে আসার আগে অপেক্ষা করেছেন।

পুলিশ অফিসার শতদ্রু রায় তাঁকে যে-তথ্য জানিয়েছেন তা ভয়ঙ্কর। গত কাল ভদ্রলোক ফোন করেন। কৃষ্ণপ্রিয়া তখন অফিসে, সবে লাঞ্চ শেষ করে ডেস্কে ফিরেছেন। এই পুলিশ অফিসারকে কৃষ্ণপ্রিয়া দশ বছর ধরে চেনেন। সন্তোষ সেনের মামলায় ইনভেস্টিগেটিং অফিসার ছিলেন এক সময়। পরে নানা জায়গায় বদলি হয়ে আবার পুরনো ডিপার্টমেন্টে ফিরেছেন। লোকে ভাবে পুলিশ মানেই খারাপ, এই ধারণা ঠিক নয়। শতদ্রু রায় আগাগোড়াই কৃষ্ণপ্রিয়ার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছেন। লোকটার মানুষকে বোঝার যেমন ক্ষমতা, তেমন খবরও রাখতে পারেন। সেই সময় কৃষ্ণপ্রিয়াকে বলেছিলেন, "মিসেস সেন, স্বামীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আমি বুঝতে পেরেছি। খবরও পেয়েছি। ইউ হেট দ্যাট পার্সন। উনি যদি যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন, আপনি যে এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে পুলিশকে খবর দেবেন আমি জানি। উনি জেলে ঢুকে গেলে আপনার লাভ। অবশ্যই সেটা আপনার ব্যক্তিগত বিষয়। ফলে আপনাকে নিয়ে আমার চিন্তা নেই, শুধু একটা বিষয়ে আপনাকে অ্যালার্ট করে দিই, এই ধরনের লোক ফার্স্ট ক্রাইম করার পর খুব ঘাবড়ে যায়। বাঁচার জন্য যা খুশি করতে পারে। তাই কোনও কিছুই ইজ়ি ভাবে নেবেন না।"

এই শতদ্রুই ক'মাস আগে ফোন করে সন্তোষ সেনের মুক্তির খবর জানিয়েছিলেন। কিছু দিনের মধ্যে এ-ও জানিয়েছিলেন, ধ্রুব তার বাবার সঙ্গে দেখা করছে।

কৃষ্ণপ্রিয়া বললেন, "হতে পারে না। ধ্রুব তার বাবাকে কোনও দিনই পছন্দ করে না।"

টেলিফোনের ও পাশে শতদ্রু মুচকি হেসেছিলেন, "সে তো আপনাকেও পছন্দ করে না।"

থমকে গিয়ে কৃষ্ণপ্রিয়া বলেছিলেন, "তার কারণ অন্য। সে আমার আর মানবেশের রিলেশনশিপকে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু অফিসার, এটা আপনি কোথা থেকে জানলেন?"

শতদ্রু এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলেছিলেন, "কে কাকে কখন পছন্দ করবে, এটা একটা জটিল বিষয় মিসেস সেন। তার ব্যাখ্যা মনস্তাত্ত্বিকরা দেবে, পুলিশ নয়। তবে আমরা কোনও কিছুই অসম্ভব বলে মনে করি না। আমরা জেনেছি, মানুষের মন অতি জটিল বিষয়, আজ যার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে, কালই তার হাত ধরতে পারে। আবার উল্টোটাও ঘটে।"

কৃষ্ণপ্রিয়া একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, "এত দিন বাদেও কেসটা নিয়ে পুলিশের মাথাব্যথার কারণ জানতে পারি?"

শতদ্রু বললেন, "পুরনো কেস নিয়েই এখন আমার কারবার। ঠিক কেস বলব না, পুরনো ক্রিমিনালরা কে কোথায় রয়েছে, কী করছে, কিসে ইনভলভড হল, খোঁজখবর রাখি আর কী। আহামরি কিছু নয়, পুলিশের রুটিন কাজ। ইনএফিশিয়েন্ট অফিসারদের এই ডিউটি দেওয়া হয়।" কথাটা বলে একটু হেসেছিলেন শতদ্রু। তার পর বলেছিলেন, "যাক, একটু অ্যালার্ট থাকবেন। ছেলের হাত ধরে ওই লোক বাড়িতে ফেরার চেষ্টা করতে পারে। সে রকম কিছু হলে জানাবেন।" আবার একটু থেমে শতদ্রু অস্ফুটে বলেছিলেন, "ওই পছন্দ-অপছন্দের কথা বলেছিলেন না? একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি মিসেস সেন, আপনার পুত্র তার বাবার জন্য, এই গরমেও রাস্তায় পায়চারি করে। আমার ধারণা, তার বাবাই তাকে নির্দিষ্ট কোথাও অপেক্ষা করতে বারণ করেছে। তার সন্দেহ, তার ওপর পুলিশের নজর রয়েছে। বুদ্ধিমান লোক।"

এর পর থেকে কৃষ্ণপ্রিয়া এক ধরনের মানসিক অস্থিরতার মধ্যে ঢুকে যান। ধ্রুব কেন তার বাবার সঙ্গে দেখা করছে তা নিয়ে অস্থিরতা নয়, অস্থিরতা ধ্রুবর মত হঠাৎ বদলাল কেন, সেটা নিয়ে। কেন সে জেল খাটা বাবার প্রতি এত সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল? কই, মায়ের বেলায় তো তার এমন হল না! তার বাবার সঙ্গে নষ্ট সম্পর্কের জন্য সে কি শুধু তাঁকেই দায়ী করে? এই অস্থিরতা থেকেই কৃষ্ণপ্রিয়া চিকিৎসকের

সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তিনি খুব একটা গুরুত্ব দেননি, মনকে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখার পরামর্শ দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন।

শতদ্রু কাল যে-খবর দিয়েছেন, তাতে শরীর কেঁপে উঠেছিল কৃষ্ণপ্রিয়ার। শতদ্রু ফোনে বলেননি। অফিসে ডেকে নিয়েছিলেন।

"খবরটা ভাল নয় মিসেস সেন। আমরা এ রকম একটা সন্দেহ করছিলাম। বাইরে এসে সন্তোষ সেনের চলছে কী করে? জানতে পারলাম, সে পাচারের বিজ়নেস শুরু করেছে।"

কৃষ্ণপ্রিয়া বললেন, "স্মাগলিং?"

"না, ঠিক স্মাগলিং নয়, ভিতরেই কাজ করে। আমরাও তক্কে তক্কে আছি, গোলমালের কিছু হলে খপ করে ধরব। খবর পেয়েছি রিসেন্টলি একটা আর্মস পাচারের কাজ নিয়েছিল সন্তোষ সেন, একটা রিভলভার। ক্যুরিয়র মারফত কাজটা করতে গিয়ে সেটা মিসপ্লেস করে ফেলেছে।"

কৃষ্ণপ্রিয়া বললেন, "মিসপ্লেস! মানে?"

শতদ্রু বললেন, "অন্য এক জায়গায় জিনিসটা চলে গিয়েছে। কামরাঙা নামের এক গ্রামে, ছোট একটা ছেলে সেটা কুড়িয়ে নিয়েছে। খেলনা হিসেবে বাড়িও নিয়ে গিয়েছে। দেখুন মিসেস সেন, খবর দেওয়ার জন্য আমাদের যেমন লোক ছড়ানো থাকে, ক্রাইম যারা করে, তাদেরও চারপাশে লোক থাকে। সন্তোষ সেনও জেনেছে, জিনিস কোথায় গেছে।"

কৃষ্ণপ্রিয়া বললেন, "আমাকে ডেকে এনে এ সব বলছেন কেন?"

শতদ্রু রায় একটু চুপ করে থেকে, ভেবে বললেন, "বলছি তার কারণ, এই ঘটনার সঙ্গে আপনার পুত্র জড়িয়ে পড়তে চলেছে। আর্মস কেস কিন্তু খুব কঠিন। ধরা পড়লে সহজে ছাড়া পাওয়া যায় না।"

কৃষ্ণপ্রিয়া উত্তেজিত ভাবে বললেন, "আপনি কী বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না অফিসার। নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হছে। ধ্রুব এক জন সহজ, সাধারণ ছেলে। আপনি তাকে চেনেন না, সে তার বাবার সঙ্গে দেখা করে মানে এই নয়, সেও ক্রিমিনাল হতে চায়। আর তার বাবা এখন ফ্রি, সাজা শেষ হয়ে গিয়েছে।"

শতদ্রু বললেন, "শান্ত হোন মিসেস সেন। আমাদের কাছে খবর এসেছে, ওই রিভলভার ফিরে পাওয়ার জন্য সন্তোষ সেন তার পুত্রকে কাজে লাগাতে চায়।"

কৃষ্ণপ্রিয়া বিস্ফারিত চোখে বললেন, "কী বলছেন এ সব! ধ্রুব কী করবে?"

শতদ্রু গলা নামিয়ে বললেন, "কী করবে জানি না, সেটাই জানতে চাই। আপনি ছেলেকে বলুন আমার কাছে এসে গোটা প্ল্যানটা বলে দিতে, সেই মতো আমরা রেডি থাকব, সন্তোষ সেনকে হাতেনাতে ধরব। এই সব মামলায় হাতেনাতে না ধরলে কোনও দাম নেই।"

কৃষ্ণপ্রিয়া দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "আর ধ্রুব? তার কী হবে?"

শতদ্রু সহজ গলায় বললেন, "কিছুই হবে না। তাকে আমরা আমাদের অপারেশনের এক জন হিসেবে ধরব। এ রকম জটিল অপারেশনে সব সময় বাইরের কেউ না কেউ সঙ্গে থাকে। হেল্প করে। আমরা তাকে টিমের এক জন হিসেবে দেখি।" একটু থেমে শতদ্রু বললেন, "আর, আপনার হাজ়ব্যান্ডের এই বিজ়নেসে নতুন কিছু নেই। সাজা শেষ করে বাইরে এলে ক্রিমিনালদের এটা কমন প্র্যাকটিস, ফের অন্ধকার জগতে ঢুকে যায় তারা।"

কৃষ্ণপ্রিয়া কপালে হাত রেখে মাথা নামিয়ে বসে থাকেন। অফিসার শান্ত গলায় বলেন, "চিন্তা করবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি শুধু ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি বুঝতে পারছি বাবার প্রতি সে আবেগ অনুভব করছে, তার কথাতেই একটা বড় অপরাধে জড়িয়ে পড়তে চলেছে। আইন আবেগের কথা শোনে না। তাকে আটকাতে হবে। আমি আপনার এবং আপনার পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল এটা আপনি জানেন, সো ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম।"

কৃষ্ণপ্রিয়া মানবেশকে ঘটনাটা জানান। তিনি আজ সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছেন। এটা কৃষ্ণপ্রিয়ার পছন্দ হয়নি। দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো? তাও শুনেছেন সে কথা, আর এখন ছেলের সঙ্গে কথা বলতে নীচে এসেছেন।

ধ্রুব আজ সকালে একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল। একেবারেই অচেনা একটা কোম্পানি থেকে মোবাইলে কল পায় সে। চমকায়নি ধ্রুব। রাধিকা তার সিভি না-বলেই মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে পাঠিয়ে দেয়। ডাক পেয়ে না গেলে বিরাট ঝামেলা শুরু করে। ধ্রুব ভাল বেতনের কাজ না পেলে তার হানিমুনের পরিকল্পনাগুলো সব ভেস্তে যাবে যে। এটাও নিশ্চয়ই সে রকম কিছু হবে। কোনও রকম গুরুত্ব না দিয়েই সকালে গিয়েছিল ধ্রুব। গিয়ে যা ঘটে তাতে সে গোড়াতেই ধাক্কা খায়। ইন্টারভিউ দিতে সে একা এসেছে। যে-ভদ্রলোক তাকে কাচের ঘরে ডাকেন, তিনি দুটো কথা শেষ করতে-না-করতেই বলেন, "আপনি আজ বিকেলের ফ্লাইটে বরোদা চলে যান। কাল ওখানে আমাদের মেন অফিসে জয়েন করুন। ওরা আপনাকে কাজ বুঝিয়ে দেবে। আপাতত আমরা আপনার থাকার জন্য হোটেলে ঘরের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। দিন দশেকের মধ্যে আপনি নিজে ঘর নিয়ে নেবেন।"

ধ্রুব থতমত খেয়ে বলে, "আজই যেতে হবে?"

"কেন? অসুবিধে কী? আপনি তো এখন আর কোথাও যুক্ত নন। রিলিজ় নেওয়ারও কিছু নেই। আমাদের রিকোয়ারমেন্টও জরুরি। এক্সপোর্টের একটা কাজ আসছে। আজ না পারলে কাল ভোরের ফ্লাইট নিন।"

ধ্রুব আমতা আমতা করে বলে, "তা বলে এত তাড়াতাড়ি..."

ভদ্রলোক বলেন, "আপনার কি স্যালারি পছন্দ নয়?"

ধ্রুব বলে, "না না তা নয়, এত তাড়াতাড়ি হচ্ছে বলে অবাক হচ্ছি।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "অবাক হওয়ার কিছু নেই ধ্রুববাবু। চাকরিবাকরি বিষয়টাই এ রকম। যখন হওয়ার দুম করে হয়ে যায়, নইলে বছরের পর বছর গড়িয়েও হতে চায় না।"

ধ্রুব বলল, "আমার ক'দিন সময় লাগবে। আমার এখানে একটু কাজ রয়েছে।"

ভদ্রলোক এই প্রশ্নের জন্য যেন তৈরি ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "এইটা প্লিজ় চাইবেন না। এই পোস্টের মেন কন্ডিশনই হল ইমিডিয়েট রিক্রুটমেন্ট। এই কারণে আমরা তিন জনকে ক্যানসেল করতে বাধ্য হয়েছি। ওখানে গিয়ে কাজ বুঝে নিতেও সময় লাগবে।"

ধ্রুব বলল, "আমার খবর কোথা থেকে পেলেন?"

"যোগ্য ক্যান্ডিডেটের খবর রাখাটা এইচআর ডিপার্টমেন্টের কাজ। ধ্রুববাবু, আপনি কাল সকালেই চলে যান। প্রয়োজন হলে, ক'দিন পর ছুটি নিয়ে এসে এখানে কাজ করে যাবেন।"

ধ্রুবর বিস্ময় বাড়ে। এ তো প্রায় জোর করে বেশি মাইনে, বেশি সুযোগ-সুবিধেতে ঢুকিয়ে নেওয়া! সে এমন কী যোগ্য যে, তাকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে হবে? খটকা লাগে ধ্রুবর। আর ঠিক তখনই টেবিলে ফেলে রাখা ভদ্রলোকের দুটো মোবাইল ফোনের একটা বেজে ওঠে। চোখ পড়ে ধ্রুবর, চমকে ওঠে সে। ফোনের স্ক্রিনে নাম ফুটে উঠেছে— মানবেশ মজুমদার।

ভদ্রলোক প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েন ফোনের ওপর। তিনি বুঝতে পারেননি, তত ক্ষণে ধ্রুবর ভেসে ওঠা নাম পড়া হয়ে গিয়েছে।

"হ্যাঁ স্যর... এই তো আমার সামনে বসে আছেন। কথা ফাইনাল হয়ে গিয়েছে। এখনই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার... যেমন কথা ছিল... হ্যাঁ স্যর, কালকের ফ্লাইট... বরোদায় বলে রেখেছি..."

ফোন ছেড়ে ভদ্রলোক ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। বললেন, "আপনি একটু বসুন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা রেডি করে আনছি।"

ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরনোর পরই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে ধ্রুব। সবটা জলের মতো স্পষ্ট হয়ে যায়। এটা মা করেছে। এর আগেও মানবেশ লোকটাকে ধরে চাকরি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ধ্রুব নেয়নি বলে বিরক্তও হয়েছিল। এ বার তাই সামনে থেকে নয়, আড়ালে থেকে ব্যবস্থা করেছে। মা কি তাকে কোনও কাজে ঢোকাতে চাইছে? নাকি চাইছে সে কলকাতা থেকে সরে যাক? নিঃশব্দে কাচের ঘর থেকে

বেরিয়ে আসে ধ্রুব। সেই কিশোরবেলা থেকেই কৃষ্ণপ্রিয়া সেনের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল ধ্রুবর। বয়স বাড়ার সঙ্গে সেই দূরত্ব বেড়েছে। সে যে তার বাবার পক্ষ নিয়েছিল এমন নয়, সেই লোকের প্রতি তার কোনও দুর্বলতাই ছিল না, বরং বিরক্তি ছিল। তার পরে এক সময় মনে হল, মা-ও তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নিজের পছন্দ, সুখ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে। তার কথা ভাবেনি। ঠিক তার বাবার মতো। সংসারের প্রতি, সন্তানের প্রতি উদাসীনতা আসলে স্বার্থপরতা। একটা বয়সে পৌঁছে ধ্রুব বুঝতে পারল, মানবেশ নামে লোকটার সঙ্গে মা ঘনিষ্ঠতা করেছে ভালবাসার কারণে নয়, শরীরের তৃপ্তি পেতে। ছেলের ভাল-মন্দের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। লোকটাও ভান করে। ধ্রুবর ভাল করার ভান।

অফিসবাড়ি থেকে বেরিয়ে ধ্রুব বুক ভরে শ্বাস নিল।

কৃষ্ণপ্রিয়া অনেকটা সময় চুপ করে বসে রয়েছেন। ধ্রুব একটা ছোট স্যুটকেস খুলে জামাকাপড় ঢোকাচ্ছে। এক সময় চাকরির জন্য ট্যুরে যেতে হত, এই কাজে সে অভ্যস্ত।

কৃষ্ণপ্রিয়া বললেন, "ধ্রুব, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।"

ধ্রুব শান্ত গলায় বলল, "এখন না বললে হয় না? দু'দিনের জন্য বেরোচ্ছি। ফিরে এসে শুনতাম।"

কৃষ্ণপ্রিয়া চোয়াল শক্ত করে বললেন, "তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

ধ্রুব জামা ভাঁজ করতে করতে বলল, "কাজে।"

কৃষ্ণপ্রিয়া বললেন, "কী কাজ আমি কি জানতে পারি?"

ধ্রুব চুপ করে রইল। কৃষ্ণপ্রিয়া আবার বললেন, "এমন কী কাজ যা আমাকে বলা যাবে না?"

ধ্রুব হাতের কাজ থামিয়ে বলল, "তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও?"

কৃষ্ণপ্রিয়া বললেন, "হ্যাঁ, বলতে চাই। তুমি যা করছ সেটা ঠিক নয়, ভয়ঙ্কর কাজ।"

ধ্রুব ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হেসে বলল, "তুমি কি আমার পিছনে গুপ্তচর লাগিয়েছ?"

কৃষ্ণপ্রিয়া দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "আমি নয়, পুলিশ লাগিয়েছে। তুমি আজ থেকে ওই মার্ডারারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা বন্ধ করো।"

ধ্রুব একটু চুপ করে থেকে বলল, "বাবা খুন করেনি, করতে যায়ওনি। বাবা জানত না এ রকম একটা ঘটনা ঘটবে। সে দিন যদি সব রকম আইনি সাপোর্ট নিয়ে লড়াই করা যেত, লোকটাকে হয়তো জেলে পচতে হত না।"

কৃষ্ণপ্রিয়া বিস্ফারিত চোখে বললেন, "এ সব কে বলেছে তোমাকে? তোমার বাবা? খুন না করলে পালিয়ে গিয়েছিল কেন?"

ধ্রুব বাথরুম থেকে টুথব্রাশ, পেস্ট এনে স্যুটকেসের খাপে রাখল। বলল, "ভয়ে পালিয়েছিল, যে-লোকটা মারা যায় সে নাম বলে দিয়েছিল। ডেথ-বেডে কারও নাম বললে, তার ছাড় পাওয়া কঠিন। তবু কোর্টে ঠিকমতো লড়লে হয়তো বোঝানো যেত।"

কৃষ্ণপ্রিয়া অস্ফুটে বললেন, "কে লড়ত?"

ধ্রুব নিচু গলায় বলল, "এক দিনও জেলে না গিয়ে, কোর্টে না গিয়ে, পুলিশের পক্ষ নিয়ে, কোনও ভাবে মামলায় ইনভলভড না হয়ে ভালই করেছিলে। আমিও তা-ই করতাম। তার ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই চাইতাম। তুমি ঠিকই করেছ। যে-মানুষ আমাদের জন্য কিছু করেনি, তার জন্য আমাদেরও কিছু করার কারণ নেই।"

কৃষ্ণপ্রিয়া উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত গলায় বললেন, "তা হলে এখন করছ কেন? কেন তার ব্যবসার অংশীদার হয়েছ?"

ধ্রুব বলল, "আমি কোনও ব্যবসার অংশীদার হচ্ছি না। এক জন মানুষ একটা সাহায্য চেয়েছে, সেটা করব ঠিক করেছি।"

"এই সাহায্য করাটা যে অপরাধ, জানো না? ক্রাইমে জড়িয়ে পড়ছ!"

ধ্রুব বলল, "অপরাধ-টপরাধের কথা আমি জানি না, জানতে চাইও না। হলে হবে। সন্তোষ সেনকে আমি সাহায্য করব বলেছি, করব। আমি তোমার কোনও অপরাধে বারণ করিনি, আশা করি তুমিও করবে না।"

কৃষ্ণপ্রিয়া সেন রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "এত বড় বড় কথা তোমায় কে শেখাল ধ্রুব? তোমার বাবা? খাইয়ে-দাইয়ে, লেখাপড়া শিখিয়ে, অসুখ-বিসুখে রাত জেগে চিকিৎসা করার পর আমার অপরাধ খুঁজতে তোমায় শেখাল কে? খুনি বাবার হয়ে কথা বলতে তোমার লজ্জা করছে না?"

ধ্রুব বলল, "আমি কারও হয়ে কথা বলছি না। নিজের হয়ে বলছি। সন্তোষ সেন একটা বিশ্রী ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার পর তার পরিচিত জনের যেটুকু পাশে থাকা উচিত ছিল, তারা তা থাকেনি বা থাকতে পারেনি। তার মধ্যে আমিও পড়ি। সেই কারণে এখন আর তাকে ছাড়তে পারব না।"

"এই ভাবে পাশে থাকবে? গুলি-গোলা, বন্দুক পাচারে যুক্ত হয়ে?"

ধ্রুব মুখ তুলে বলল, "বাহ্, অনেকটা পর্যন্ত জেনে গেছ তো! আমি ও সব দেখছি না। আমি কাজটা করতে রাজি হয়েছি। নইলে সে বিপদে পড়বে।"

কৃষ্ণপ্রিয়া এ বার কড়া গলায় বললেন, "আমি কোনও কথা শুনব না। তুমি এখনই পুলিশ স্টেশনে যাবে, আমি অফিসারকে ফোন করে দিচ্ছি। তোমার বাবা তোমাকে যা বলেছে সব ওঁকে জানাবে। তিনি যে রকম বলবেন, সে রকম ভাবে চলবে।"

ধ্রুব বিস্ময়ের সঙ্গে খানিক ক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তার পর চাপা গলায় বলে, "ছিঃ মা, তুমি এত দূর নেমেছ! আমি ভাবতেও পারি না।"

কৃষ্ণপ্রিয়া আর নিজেকে সামলাতে পারেন না। তিনি কয়েক পা এগিয়ে এসে ছেলের গালে একটা চড় কষান। কত বছর পর তিনি ছেলের গায়ে হাত তুললেন? দোতলায় উঠে এসে কৃষ্ণপ্রিয়া মনে করার চেষ্টা করলেন, মনে পড়ল না। মোবাইলে শতদ্রু রায়ের নম্বর টিপলেন, ওই স্কাউন্ড্রেলটার ফোন নম্বর লাগবে, তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। এখনই বলতে হবে।

শতদ্রু রায় ঠান্ডা গলায় বললেন, "সন্তোষ সেন নিজে ফোন ব্যবহার করে না। তবে কখন কোথায় থাকে, আমরা খবর রাখি। পিছনে লোক লাগানো আছে। আপনি তৈরি থাকবেন মিসেস সেন, খবর পেলেই দেব।"

এই কথা চলার সময়েই স্যুটকেস হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল ধ্রুব। দরজায় তালা লাগাল না। এ বাড়িতে সে আর ফিরবে না।

এগারো

জীবন শুধু রহস্যময় নয়, স্বেচ্ছাচারীও বটে। কারও নিয়ন্ত্রণ সে মানে না। যদি কেউ ভাবে জীবনকে সে আদর ও শাসনে হাতের মুঠোয় রেখে দিয়েছে, সে ভুল ভাবে। যার কাছে জীবন লালিত হয়, সুযোগ পেলে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে তার এতটুকু দ্বিধা হয় না। মায়া-দয়া দেখায় না সে। টেনে-হিঁচড়ে সামনে এনে দাঁড় করায়। দাঁড় করিয়ে বলে, 'খুব তো ভেবেছিলে আমাকে কব্জা করেছ, এখন দ্যাখো কে কার দখলে। আমি তোমার আদর, শাসন কিছুরই তোয়াক্কা করি না। মনে রেখো আমিই বড়, আমিই শেষ কথা।'

এত বছর পর সন্তোষ সেনের মুখোমুখি বসে কৃষ্ণপ্রিয়ার নিজেকে খুবই অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে। ক'দিন আগে পর্যন্ত তাঁর ধারণা ছিল, এই মানুষটাকে তিনি জীবন থেকে মুছে দিতে পেরেছেন। কোথাও কোনও দাগ লেগে নেই, থাকবেও না। এখন বুঝতে পারছেন, জীবনের সঙ্গে চক-ডাস্টার পদ্ধতি চলে না, কোন লেখা থাকবে, কোন লেখা মুছবে, সে-ই জানে, ঠিক করে সে-ই।

সন্তোষ সেনের আস্তানার হদিশ তাঁকে পুলিশ দিয়েছে। শতদ্রু রায়। "সাবধানে থাকবেন। খাতায়-কলমে লোকটা এখনও আপনার হাজব্যান্ড হতে পারে, বাট নাউ হি ইজ় আ ডেঞ্জারাস পার্সন। এই ঠিকানা আপনাকে দেওয়া বেআইনি, তার পরেও দিচ্ছি, আপনার অনুরোধে।

আমাদের একটা অনুরোধও আপনাকে রাখতে হবে মিসেস সেন। ওই লোকের কাছ থেকে কোনও ইনফরমেশন পেলে আমাদের দিতে হবে। মনে রাখবেন, আস্তানাটা একটু ইয়ে, মানে একটু গোলমেলে জায়গায়। অ্যালার্ট থাকবেন।"

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ছেড়ে ডান হাতে এ গলি সে গলির মধ্যে বেশ খানিকটা ঢুকলে বাড়ি। বাড়ির সামনের ফুটপাথে অ্যালুমিনিয়ামের বাসন-কোসনের দোকান দরজা ঢেকে বসে রয়েছে। কৃষ্ণপ্রিয়া বাড়ির নম্বর বলতে দোকানদার ভুরু কুঁচকে বলল, "ওই কড়াইগুলো সরিয়ে ঢুকে যান।"

দড়িতে ঝুলে থাকা হাঁড়ি-কড়াই সরালে দরজার গায়ে প্রায় মুছে যাওয়া নম্বর, পাশে চক দিয়ে লেখা 'গৃহস্থের যাতায়াতের পথ'।

পুরনো বাড়ির অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে গলির দু'পাশে খুপরি ঘর। কোনও ঘরে চাপা স্বরে গান বাজছে, কোথাও নারীকণ্ঠের খিলখিল আওয়াজ, কোথাও খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে মানুষ দেখা যাচ্ছে। সায়া আর ঝলমলে ব্লাউজ় পরা মহিলা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজ সারছে। ঘরগুলো থেকে গলিতে বেরনো যায় না। কৃষ্ণপ্রিয়া মাথা নামিয়ে হাঁটতে লাগলেন। নাক বরাবর ধাক্কা খেয়ে আর একটু এ দিক সে দিক গেলে সন্তোষ সেনের ঘর। শতদ্রু রায় তেমনই বলেছেন। লোহার গরাদ দেওয়া জানলা। ঘরে এখনও হলুদ আলোর বাল্ব। কাঠের ভাঁজ করা দরজায় পুরনো দিনের শিকল। ক'বার নাড়তে লুঙ্গি, স্যান্ডো গেঞ্জি পরা সন্তোষ সেন দরজা খুললেন। কয়েক মুহূর্ত থমকে রইলেন, তার পর সহজ গলাতেই বললেন, "এসো কৃষ্ণপ্রিয়া। ভিতরে এসো।" যেন কৃষ্ণপ্রিয়ার এখানে আসার ঘটনাটা বড় কোনও বিষয় নয়।

জামা পরে নিয়ে খাটে পা ঝুলিয়ে বসলেন সন্তোষ সেন। কৃষ্ণপ্রিয়াকে বসতে দিয়েছেন মোড়ায়। অতি অগোছালো ঘরের মাঝখানে দড়ি টাঙানো, গামছা, লুঙ্গি ঝুলছে। এক পাশে জমে রয়েছে বাক্স-প্যাঁটরা। বসার জায়গা বলতে তক্তপোশ আর মোড়া। একটা ভাঙা, একটা ছেঁড়া। তক্তপোশের এক কোনায় চাদর, বালিশ, মশারি জড়িয়ে-মড়িয়ে পড়ে রয়েছে।

কৃষ্ণপ্রিয়া নিচু গলায় বললেন, "আমাকে দেখে অবাক হচ্ছ না?"

সন্তোষ সেন মৃদু হেসে বললেন, "অবাক হওয়ার ক্ষমতা অনেক দিন আগে নষ্ট হয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কী, কেন জানি আমার মনে হচ্ছিল, তুমি আসবে।"

কৃষ্ণপ্রিয়া মনকে শক্ত করে এসেছেন। কোনও রাগ, কোনও উত্তেজনা তিনি দেখাবেন না। কোনও রকম চেঁচামেচি, ঝগড়ার মধ্যে যাবেন না। খুব কঠিন হলেও যতটা সম্ভব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করবেন। কাজ হাসিল করতে এসেছেন, যে করেই হোক সেই কাজ করতে হবে। তার জন্য নামতে হলে নামবেন, উঠতে হলে উঠবেন।

"কী করে ভাবলে আমি আসব?"

সন্তোষ সেন বললেন, "জানি না, বাট আই থট। কে কখন কী ভাববে তা তো আগাম ঠিক করা যায় না। ভাবনাচিন্তা নিজের হাতেও থাকে না। এই যে তুমি আমার এখানে এসেছ, ক'দিন আগেও কি ভাবতে পেরেছিলে কৃষ্ণপ্রিয়া? ক্যান ইউ থিঙ্ক?"

স্বামীর মুখের ইংরেজি এবং দার্শনিক ঢঙের কথা শুনে কৃষ্ণপ্রিয়া অবাক হলেন। তাঁর ভুরু কোঁচকানো দেখে সন্তোষ সেন আঁচও করলেন। লজ্জা পাওয়া ধরনের হেসে বললেন, "জেলখানায় অভ্যেস করেছি। ইংরেজির এখনও খুব কদর করে, সে ভুল ঠিক যা-ই হোক না কেন। ধ্রুব জানে, ওকে বলেছি।"

কৃষ্ণপ্রিয়া ঝট করে কথাটা ধরে নিলেন, "ধ্রুবর সঙ্গে তোমার দেখা হয়?"

সন্তোষ সেন হেসে বললেন, "না দেখা হলে তুমি আমার কথা জানবেই-বা কী করে, এখানে আসবেই-বা কেন কৃষ্ণা? হোয়াই? আমাদের ছেলে অতি ভাল হয়েছে, ভেরি গুড বয়। সবাইকে যে লেখাপড়া, উপার্জনে ভাল হতে হবে এমন তো নয়, ভাল হওয়ার আরও নানা বিষয় থাকে। নাম্বার অফ আইটেমস। আমরা সেগুলোকে গ্রাহ্যের

মধ্যে ধরি না। ধ্রুব ভিতর থেকে ভাল হয়েছে। এতে তার বাবা-মা কারও অবদান নেই। নো কনট্রিবিউশন। চা খাবে? বলব?"

চায়ের আমন্ত্রণের কোনও জবাব না দিয়ে কৃষ্ণপ্রিয়া একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আমি এখানকার ঠিকানা কোথায় পেলাম জানতে চাইলে না?"

সন্তোষ সেন ফের হেসে বললেন, "তোমার সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক যে ভাল, আমি জানব না? যখন পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম, আমার চেনা, হাফ-চেনা, কোয়ার্টার-চেনা সবার বাড়ির ঠিকানা তুমি পুলিশকে দিয়েছিলে। তাড়া খেয়ে আমি একটা আস্তানা থেকে আর-একটা আস্তানায় ছুটে বেড়িয়েছি।"

কৃষ্ণপ্রিয়া নড়েচড়ে বসলেন। তাঁর বলতে ইচ্ছে করছিল, 'পুলিশ কোনও খুনির খোঁজ করলে এক জন শিক্ষিত, সচেতন নাগরিকের কী করা উচিত? তার লুকিয়ে থাকার সম্ভাব্য জায়গাগুলোর ঠিকানা বলে দেওয়া, নাকি হাত গুটিয়ে বসে থাকা?' কৃষ্ণপ্রিয়া সে কথা বললেন না। নিজেকে সামলালেন। মুখে বললেন, "তখন উপায় ছিল না। ওইটুকু ছেলেকে নিয়ে থাকি, রোজ বাড়িতে পুলিশ এসে জানতে চাইছে কোনও রকম যোগাযোগ হচ্ছে কি না।"

সন্তোষ সেন উৎসাহ নিয়ে বললেন, "ঠিকই করেছিলে, কারেক্ট ডিসিশন। জীবনে কারেক্ট ডিসিশন ইজ় মোস্ট ইমপর্ট্যান্ট। এই যে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম, এটাও একটা কারেক্ট ডিসিশন ছিল। অন্তত তিনটে বছর জেলের বাইরে থাকতে পারলাম। আমি জানতাম, বিরাট ফেঁসেছি এবং সেখান থেকে বেরনোর জন্য যে খরচাপাতির দরকার, তা আমার সাধ্যে নেই। নোবডি উইল হেল্প মি, সো কাটিতং।" একটু থামলেন সন্তোষ সেন।

বাইরে থেকে হারমোনিয়ামের আওয়াজ, ঘুঙুরের ঝুমঝুম, চাপা হট্টগোল ভেসে আসছে। কৃষ্ণপ্রিয়া এ রকম পরিবেশ শুধু সিনেমাতেই দেখেছেন। কেমন একটা ঘিনঘিনে লাগছে। সন্তোষ সেন আবার বলতে শুরু করলেন, "তার পর ধরো, আমাদের বিয়ের সিদ্ধান্ত, একেবারে রাইট সিদ্ধান্ত ছিল। এখন আমার কী মনে হয় জানো কৃষ্ণা? মনে হয়, নরনারীর জীবনে বিবাহ অতি প্রয়োজনীয়। এতে আলাপ সম্পূর্ণ হয়। তোমার সঙ্গে আমার যেমন হয়েছে, পরিচয় সম্পূর্ণ হয়েছে। হয়েছে কি না?"

কৃষ্ণপ্রিয়া বুঝলেন, মানুষটার কথা খুব বেড়েছে। বিয়ের আগে যে অল্প কয়েকটা কথা বলত, বিয়ের পর তো তাও বন্ধ করে দিয়েছিল। এত কথার অভ্যেস কোথা থেকে হল?

"ও সব কথা ছাড়ো," সন্তোষ সেন বললেন, "ওই ভদ্রলোককে বিয়ে করেছ? ওই যে, কী নাম যেন? ভেরি জেন্টলম্যান। ধ্রুব কিছু বলেনি, আমি তোমার বিষয়ে কথা বলি না। বিয়ে না করলে করে ফেলো। আলাপ কমপ্লিট হবে।"

কৃষ্ণপ্রিয়া নিজেকে সামলাতে পারলেন না। নিচু গলায় বলে ফেললেন, "কী করে কমপ্লিট হবে? এখনও তো আমাদের ডিভোর্স হয়নি।"

সন্তোষ সেন চোখ বড় করে, জিভ বের করলেন। বললেন, "ওহ্, আমার তো খেয়ালই ছিল না। কী কেলেঙ্কারি! আমি তো জানতাম... অনেক বছর আগেই। কী অদ্ভুত কাণ্ড দেখো কৃষ্ণপ্রিয়া, যতই ছাড়াছাড়ি হোক, আইনে সিলমোহর না মারলে বিচ্ছেদ বলা যাবে না।" খানিকটা হাসলেন সন্তোষ সেন।

বাইরে থেকে এ বার চাপা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। মেয়ের গলা। ভাল করে সন্ধে হল না, তার আগেই এ সব শুরু হয়ে গেল!

"কাগজটা দাও। সই করে দিচ্ছি।"

কৃষ্ণপ্রিয়া অবাক হয়ে বললেন, "কিসের কাগজ?"

সন্তোষ সেন বললেন, "কেন? ডিভোর্সের।"

কৃষ্ণপ্রিয়া বললেন, "এ রকম কিছু তো আমি আনিনি। তার জন্য আসিওনি আমি।"

সন্তোষ সেন স্বাভাবিক গলায় বললেন, "ও। অনেক বকে ফেললাম, এই আমার একটা ব্যাড হ্যাবিট হয়েছে। দরকার ছাড়াই অনেক কথা বলি আজকাল। যাক, এ বার তোমার কাজের কথাটা শুনে নিই। এর পর আর এই জায়গাটা তোমার জন্য সেফ নাও থাকতে পারে।"

কৃষ্ণপ্রিয়া ভয় পেয়ে বললেন, "কী হবে?"

সন্তোষ সেন বললেন, "কী হয় না এখানে? রেড লাইট এলাকায় যখন-তখন খুনও হয়। যাক, কেন এসেছ বলো। পুলিশ পাঠিয়েছে?"

অন্য কোনও সময় হলে কৃষ্ণপ্রিয়া এ কথার কঠিন উত্তর দিতেন। এখন নিজেকে সামলে নরম গলায় বললেন, "ধ্রুবকে ছেড়ে দাও। তুমি তো নিজেই জানো, ও ভাল ছেলে। সাতে-পাঁচে থাকে না। লোভ নেই। এমনকি ... এমনকি তোমার কারণে ও আমার সঙ্গে বছরের পর বছর ঠিকমতো কথা পর্যন্ত বলে না। ও মনে করে, তোমার অপরাধের চেয়ে আমার অপরাধ কম নয়। কেন মনে করে জানি না। আমার কাছ থেকে কোনও সুযোগ নিতে চায় না। প্লিজ়, ওকে ছেড়ে দাও।"

সন্তোষ সেন মাথা নামিয়ে একটু ক্ষণ চুপ করে রইলেন। বললেন, "কী ভাবে ছেড়ে দেব?"

কৃষ্ণপ্রিয়া উৎসাহ নিয়ে বললেন, "ওর সঙ্গে যোগাযোগ করো। বলো, তোমার বন্দুক, রিভলভার পাচারের ব্যবসার সঙ্গে ও যেন নিজেকে না জড়ায়। ফিরে আসে যেন।"

সন্তোষ সেন ঠোঁটের ফাঁকে যেন সামান্য হাসলেন। বললেন, "এটা ব্যবসা নয়। আমি ওর হেল্প চেয়েছি।"

কৃষ্ণপ্রিয়া দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "হেল্প করার জন্য অন্য কেউ নেই?"

সন্তোষ সেন একটু ভেবে বললেন, "হয়তো আছে, তারা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। পুত্র, পিতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। ধ্রুব তো নয়ই।"

এ বার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল কৃষ্ণপ্রিয়ার। নিজেকে আর আটকাতে পারলেন না তিনি। নিজের স্নায়ুর সঙ্গে অনেক ক্ষণ যুদ্ধ করছেন, আর সম্ভব নয়। দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, "নাটুকেপনা থামাও। অনেক ক্ষণ ধরে তোমার লেকচার শুনছি। তুমি ধ্রুবকে আটকাও, তাকে ফোন করে বাড়ি ফিরে আসতে বলো।"

ঘরের মলিন আলোয় সন্তোষ সেনকে মনে হচ্ছে এক জন হলুদ মানুষ। ব্যথায় হলুদ।

"আমার লাভ?"

কৃষ্ণপ্রিয়া চাপা গলায় বললেন, "ব্ল্যাকমেল করছ? জানো, তোমাকে এক্ষুনি অ্যারেস্ট করিয়ে দিতে পারি?"

সন্তোষ সেন সামান্য হেসে বললেন, "জানি, পারো। শুধু পারো নয়, তুমি করাবেও। তার জন্য আমি প্রস্তুতও। কিন্তু বললে না তো, ধ্রুবকে ফিরিয়ে আনলে আমার কী লাভ?"

কৃষ্ণপ্রিয়া দাঁত চাপা গলায় বললেন, "কত টাকা চাই?"

সন্তোষ সেন বললেন, "টাকা! টাকা দিয়ে আমার কী হবে? ওই যে ঘরের কোনায় বাক্স-পেটি দেখছ, ওগুলো সব সাপ্লাইয়ের জিনিস। আমার ব্যবসা মন্দ চলে না কৃষ্ণপ্রিয়া। সন্তোষ সেন আর আগের সন্তোষ সেন নেই ম্যাডাম।"

"এ সব আমি জানতে চাই না, তোমার ড্রামা অনেক শুনলাম। ধ্রুবর বদলে কী চাই বলো।"

সন্তোষ সেন একটু চুপ করে থেকে মাথা নেড়ে বললেন, "কিছু চাই না। তোমার কাছ থেকে অনেক বেশি পেয়ে গেছি। ধ্রুবর মতো একটা ছেলেকে পেয়েছি। শিক্ষা, রুচি, উদ্যমহীন একটা মানুষের আর কী চাই? খুনের দায়ে জেল খাটা বাবার বিপদ হবে শুনে, ছেলেটা নির্দ্বিধায় একটা ভয়ঙ্কর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। একটাই শর্ত দিয়েছে, আমাকে এ সব ছেড়ে দিতে হবে। ভাল মানুষ বনে বাপ-বেটায় এক সঙ্গে থাকতে হবে তার পর। কী আবদার বলো দেখি! একেবার রূপকথার গল্প যেন।" একটু থামলেন সন্তোষ সেন। ফের গলা নামিয়ে হাসি হাসি মুখে বললেন, "ভেবেছি, দেব সব ছেড়ে। সারা জীবন তোমার কথা

মতো কিছু করিনি, শেষ জীবনে এক বার ছেলের কথা মতো করে দেখি কেমন হয়। মাতা পারিল না যাহা, পুত্র পারে যদি।”

কথা শেষ করে গলা খুলে হা-হা আওয়াজে হেসে উঠলেন সন্তোষ সেন। কৃষ্ণপ্রিয়ার ভাল লাগছে না। লোকটার মুখে এ সব কথা তাঁর অস্থিরতা বাড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে, সঙ্গে যদি সেলাইয়ের লম্বা সুচ থাকত, এত ক্ষণে হয়তো একটা কিছু করে বসতেন। কী করে বসতেন? চোখে ঢুকিয়ে দিতেন? মনে মনে শিউরে উঠলেন কৃষ্ণপ্রিয়া। খুনির সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনেও কি খুনের ইচ্ছে জাগছে? কী যেন বলে? হ্যাঁ মনে পড়েছে, কিলার ইনস্টিঙ্কট।

“আমার কথা শেষ করো আগে।”

সন্তোষ সেন বললেন, “সব কথা শেষ হয় না কৃষ্ণপ্রিয়া। যেমন সব ঘর বাঁধা শেষ হয় না।”

কৃষ্ণপ্রিয়া ঝাঁজিয়ে উঠলেন, “শাট আপ। এখনই ফোন করো।”

সন্তোষ সেন বললেন, “তুমি করছ না কেন?”

কৃষ্ণপ্রিয়া বললেন, “করছি, ধরছে না। তোমাদের নিশ্চয়ই ফোনের টাইম ফিক্সড রয়েছে, যে ভাবে আন্ডারওয়ার্ল্ডের কারবার চলে।”

সন্তোষ সেন তক্তপোশ থেকে উঠে দাঁড়ালেন। মুচকি হেসে বললেন, “তোমাকে দেখে করুণা হচ্ছে কৃষ্ণপ্রিয়া। ফিলিং পিটি। ইংরেজি ঠিক আছে? স্বামীর বেলায় যাওনি ঠিক আছে, ছেলের বেলায় কী করবে? সে যদি জেলে যায়? দেখা করতে যাবে? আদালতে দাঁড়িয়ে বলবে তো, আমার ছেলের কোনও দোষ নেই, একটা খুনির পাল্লায় পড়ে সে ফেঁসে গেছে? নাকি আগের বারের মতো তোমার রুচি, শিক্ষায় বাধবে?”

কৃষ্ণপ্রিয়া এ বার চিৎকার করে উঠলেন, “চুপ করো, একদম চুপ করো। খুনি, খুনির মতো মাথা নামিয়ে থাকবে। আর একটাও বাজে কথা না বলে ধ্রুবকে ফোন করো।”

এই গালি, অপমানের পরও সন্তোষ সেনের বিন্দুমাত্র হেলদোল হল না। যেন এমন অপমানই তিনি আশা করেন। বললেন, “এখন করব না। ওর ফোন বন্ধ। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো প্রিয়া। ডোন্ট ওয়ারি। আমার যতই অসুবিধে হোক, ওই রিভলভার ও কামরাঙা গ্রাম থেকে নিয়ে আসবে না।”

কৃষ্ণপ্রিয়া চোখ-মুখ শক্ত করে বললেন, “ও কথা শুনবে তো?”

সন্তোষ সেন মাথা কাত করে বললেন, “শুনবে। এখানে তোমাকে হারিয়ে দিয়েছি কৃষ্ণপ্রিয়া। একদম ডিফিটেড। যাক, এসো এ বার। এর পর এই এলাকাটা গোলমেলে হয়ে যাবে। আর পুলিশকে জানিয়ো, এখনই আমাকে ধরার মতো কোনও প্রমাণ ওরা পাবে না। তাও যেমন নজর রাখছে তেমন যেন রাখে, কখন কোন কীর্তি করে বসি তা তো আগে থেকে বলা যায় না। সুযোগ পেলেই একেবারে ক্যাচ দ্য বল। আবার আউট হয়ে মাঠ ছেড়ে ফিরে যাব। খুব খারাপ লাগছে, এত দিন পর দেখা হল, এক কাপ চা-ও খাওয়াতে পারলাম না।”

একটা কথাও না বলে কৃষ্ণপ্রিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। খানিকটা নিশ্চিন্ত লাগছে। শতদ্রু রায় একটু পরেই ফোন করবেন। বলার মতো কোনও ইনফরমেশন নেই। যতই নাটুকেপনা করুক, মানুষটা বেফাঁস কিছু বলেনি। এক মাত্র ঘরের কোণের বাক্স-প্যাঁটরাগুলোর কথা বলা যেতে পারে। পুলিশ যদি এসে সার্চ করে, গোলমালের জিনিস নিশ্চয়ই পাবে।

একটা বাড়িকে মাঝখান থেকে চিরে এই গলি চলে গিয়েছে। বেশিটাই অন্ধকার। আসার সময় তাও আলোর ভাব ছিল যেন, এখন খুপরি ঘরের জানলাগুলো বন্ধ। কেন বন্ধ? ভিতরে ‘লোক’ ঢুকেছে? হালকা কেঁপে উঠলেন কৃষ্ণপ্রিয়া। তিনি হাঁটার গতি দ্রুত করলেন। অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করলেন। ভেবেছিলেন, এত দিন পর লোকটাকে দেখে কেমন লাগবে? যতই হোক, এক সময়ের প্রেমিক, স্বামী, ছেলের বাবাও তো। ভয় করছিল, কোনও কারণে মনে আবেগ এসে যাবে না তো? নরম হয়ে পড়বেন না তো? এখন মনে হচ্ছে, রাগ-ঘেন্না আরও বাড়ল। লোকটাই বাড়িয়ে দিল। ধ্রুবর সঙ্গে ক’টা দিন কথা বলে, তাকে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করে ভাবছে, জিতে গিয়েছে। শিগগিরই বুঝতে পারবে, কত বড় ভুল করেছে। এ সব ভাবনার মধ্যেই হঠাৎ অস্বস্তি হল কৃষ্ণপ্রিয়ার। রাস্তায় পড়তে আরও কত দূর? আসার সময়ে তো এতটা সময় লাগেনি! সন্তোষের ঘর থেকে বেরিয়ে কোনও ভুল গলি ধরলেন? এ সব জায়গায় নানা ধরনের গলি থাকে, তিনি শুনেছেন। বুকের ভিতরে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল কৃষ্ণপ্রিয়ার। কী হবে? কেমন ভাবে বেরোবেন এ বার? থমকে দাঁড়ালেন কৃষ্ণপ্রিয়া। আর তখনই তিন-চার হাত দূরে, বাঁ দিক থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে এল। যেন দেওয়াল ফুঁড়ে বেরোল! নিশ্চয়ই দরজা আছে কোনও। বেশি অন্ধকার আর অল্প আলোয় মেয়েটিকে পিছন থেকে দেখতে পেলেন কৃষ্ণপ্রিয়া। সম্পূর্ণ নগ্ন। হাত দুটো জড়ো করা বুকের কাছে। মেয়েটি কাঁপছে, কাঁদছেও। এ বার দরজা খোলার আওয়াজ।

মেয়েটি এ বার গলি ধরে দৌড়তে শুরু করল। মাঝে মাঝে ভয়ার্ত চোখে-মুখে পিছনে ফিরছে। সেই মুখে কখনও আলো পড়ছে, কখনও অন্ধকার। কৃষ্ণপ্রিয়ার তাকে চেনা লাগছে। খুব চেনা। মনে হচ্ছে, আয়নার সামনে দাঁড়ালে তিনি এই মেয়েটিকে দেখতে পাবেন। যে সব হারিয়েছে, যার পালানো ছাড়া কোনও পথ নেই।

দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে, মুখে হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কৃষ্ণপ্রিয়া। থরথর করে কাঁপছেন।

বারো

কালবৈশাখীর ঝড় হয় দিনে এক বার। আজ কামরাঙা গ্রামে ঝড় এল দু’বার। প্রথম বার দুপুরে, দ্বিতীয় বার সন্ধের একটু পরে।

দুপুরে চারপাশ এমনই কালো হয়ে এসেছিল যে, মনে হল এই বুঝি আকাশ ভেঙে পড়বে। এক সময় মাতিয়ে ঝড় উঠল। শোঁ শোঁ আওয়াজ তুলে শুরু করল দাপাদাপি। যে-সব ঘরের চালা নড়বড়ে, তাদের কিছুটা উড়ে গেল, কিছুটা কাত হয়ে পড়ল পাশে। গাছ পড়ল না, তবে ডালপালা ভাঙল। মাঠের গরু-ছাগল, যারা আকাশ কালো দেখেও ফিরে যেতে পারেনি, তারা হয়ে পড়ল দিশাহারা। শুরু করল ছোটাছুটি। ঘরের বাইরে থাকা গ্রামের মানুষ, যাচ্ছি-যাব করেও ঘরে ফেরেনি যারা, কাজে ব্যস্ত ছিল, তারা দিল দৌড়। না দিয়ে উপায় কী? কোথাও দাঁড়ানো যে বিপদ। পাকা ঘরে ঢুকতে হবে। মাথার ওপর ছাদ ভেঙে না পড়ে! তবে সব হুড়োহুড়িই অল্প সময়ের। সাধারণত এই ধরনের ঝড় সময় নেয় কম, নামে তুমুল বৃষ্টি। তীব্র গরমের পর আহ্, কী শান্তি! তবে প্রথম ঝড়ে বৃষ্টি তেমন হল না, ঝড়ের দাপটে মেঘ গেল উড়ে। এক পশলা ঝমঝমিয়ে থেমে গেল। এতে চারপাশ খানিকটা ঠান্ডা হল বটে, আহামরি কিছু নয়। বরং ফের আলো ফুটল। ঝড়-জলে মোছা আলো ছড়িয়ে পড়ল খেতে, মাঠে, পুকুরে, গাছের পাতায়। মায়াবী আলো। কেউ যদি ওপর থেকে তখন এই ছোট্ট গ্রামটাকে দেখতে পেত, নিশ্চয়ই তার মনে হত, কেউ এমন রং ফেলেছে, যে-রঙের কোনও নাম নেই। দ্বিতীয় বারের ঝড় এল সন্ধে পার করে। কোথা থেকে যে ফের আকাশ ভরে মেঘ জমেছে, কেউ খেয়ালও করেনি। এ বার তুমুল ঝড়ের সঙ্গে এল মুষলধারে বৃষ্টি। শিল পড়ল টিনের চালায় আওয়াজ করে। যে হেতু দ্বিতীয় বারের এই ঝড় কেউ আঁচ করেনি, সকলের ঘরেই দরজা-জানলা ছিল খোলা। গরমের সময়ে কে বন্ধ করবে? হাওয়ার দাপটে তারা যেন দুমড়ে-মুচড়ে ছিটকে বেরিয়ে যেতে চাইল।

মানিনী শুয়ে ছিল ঘরে। গায়ে হালকা চাদর। তার জ্বর হয়েছে। ক’দিন ধরেই শরীর খারাপ যাচ্ছিল, গা গরম। আজ দুপুরের পর থেকে জ্বর খুব বেড়েছে। কোনও কাজ করতে শরীর চাইছে না। মনে হচ্ছে, শুয়ে থাকে। এখন আর শুয়ে থাকতে পারল না মানিনী। ঝড়-জলে ঘরদোর সব ভেসে যাবে। তক্তপোশ থেকে নেমে এক রকম ছুটেই গেল স্বামীর ঘরে। গ্রামে বিদ্যুৎ এমনিতেই থাকে না, ঝড়ে তো

প্রশ্নই নেই। হ্যারিকেন জ্বালানোরও সময় পায়নি মানিনী। অন্ধকারেই বুঝতে পারল, খোলা দরজা দিয়ে বৃষ্টির ছাট ঘরে ঢুকছে। বিছানাও কি ভিজেছে? নন্দগোপাল শুয়ে রয়েছে নিঃশব্দে। ঘুমোচ্ছে? তা-ই হবে। সাড়াশব্দ নেই। সন্ধের পর থেকে মানুষটা শুয়ে থাকে। হয় ঘুমোয়, নয় ঘোরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আর থেকে থেকে গাল পাড়ে। লক্ষ্য অনেকে, তবে বৌকেই বেশি। শুধু গাল নয়, মারধরও করে। আগেও করেছে, ইদানীং পরিমাণ বেড়েছে। নাগালের মধ্যে পেলে চড়-চাপড় দিত, এখন শুয়ে শুয়েই হাতের কাছে ডেকে নেয়। চুলের মুঠি চেপে ধরে। চড়, কিল মারতে থাকে। শাড়ি, ব্লাউজ় টেনে ছিঁড়তে চায়। দু'হাতে মুখ ঢেকে ব্যথায় ককিয়ে ওঠে মানিনী, কিন্তু সরে আসতে পারে না। খানিকটা নন্দগোপালের শক্তির জন্য, খানিকটা বিল্লুর কারণে। চিৎকার-চেঁচামেচিতে ছেলে যদি ছুটে এসে দেখে, সে বড় বিশ্রী হবে। তাই নিঃশব্দেই মার খায়, অপমান সহ্য করে। অপেক্ষা করে নন্দগোপালের শান্ত হওয়া পর্যন্ত। পায়ের দিকে অকেজো হয়ে পড়ায় কোমরের ওপর থেকে লোকটার বল অনেকটা বেড়েছে। যখন টান মারে, মনে হয় অসুরের শক্তি।

মণিমাস্টার গলায়, গালে দাগ দেখে এক দিন জিজ্ঞেস করেছিল, "এ সব কিসের দাগ মানিনী?"

"কিছু নয়," বলে মানিনী মুখ ফিরিয়েছিল।

মাস্টার ছাড়েনি, চেপে ধরেছিল। মানিনী বলেছিল, "ছেলের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে হয়েছে।"

"মিথ্যে বলছ। কেউ তোমাকে মেরেছে। কে মেরেছে?"

মানিনী মাথা নামিয়ে বলে, "ও রাগ করলে মাথার ঠিক থাকে না।"

মণিনাথ বলে, "কবে থেকে এ রকম করে?"

"অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে। আগে এ রকম ছিল না। গাল, মারধর কিছু জানত না। শান্ত মানুষ ছিল," মানিনী চোখের জল মুছে বলে, "মাঝে মাঝে মনে হয় ঘরদোর ছেড়ে চলে যাই, ছেলেটার জন্য পারি না।"

মণিনাথ মানিনীর গলায়, গালে হাত বুলিয়ে শান্ত ভাবে বলে, "কেঁদো না মানিনী। তোমার কথা শুনে প্রথমটায় আমিও রেগে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম পুলিশ ডেকে রাসকেলটাকে ধরিয়ে দিই। এখন বুঝতে পারছি, এটা একটা সাইকোলজিকাল ডিজ়অর্ডার। সাইকোলজিকাল ডিজ়অর্ডার কী জানো? আচ্ছা, তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। সহজ করে বললে, মানসিক গোলমাল।"

মানিনী অবাক হয়ে বলে, "মানসিক গোলমাল কেন হবে?"

মণিনাথ হেসে বলল, "নন্দগোপালও তো এক জন পুরুষমানুষ মানিনী, এটা ভুললে চলবে কেন? তারও তো কামনা রয়েছে। ওই ঘটনার পর থেকে সে বৌকে আর পায় না। পেলেই-বা কী করবে? গাল, মারধরের মধ্য দিয়ে সে তার কাম চরিতার্থ করে।"

মানিনী বলল, "এ কেমন কথা বলছেন মণিবাবু? তা বলে মারবে!"

মণিনাথ নরম গলায় বলল, "আমি কিছু বলছি না মানিনী, বলছে সাইকোলজি, মনস্তত্ত্ব। এটুকু অত্যাচার তোমাকে সহ্য করতে হবে। আর চিন্তা কী? আমি তো আছি। তোমার বর যেখানে মারবে, আমি সেখানে আদর করে দেব। তুমি বলবে আমায়। বুকে কোথাও লেগেছে? দেখি, ব্রা খোলো।"

মণিমাস্টারের কথা মানিনী মানতে পারে না। গালি না হয় হল, মারও সহ্য করতে হবে! তার কী অপরাধ? সে তো ট্রেন থেকে ধাক্কা মারেনি। আজকাল ঘুরে-ফিরে নন্দগোপাল একটা কথাই বলে, "আমি জানি, তুই বাইরের কারও সঙ্গে নিয়মিত শুতে শুরু করে দিয়েছিস। ঘরে ঢুকলে পুরুষের আঁশটে গন্ধ পাই। লোকটা কে? কামরাঙার? নাকি বাইরে থেকে আসে?"

মানিনী বলে, "চিৎকার কোরো না, বিল্লু বাড়ি রয়েছে।"

নন্দগোপাল বলে, "শুনুক। মায়ের ছেনালিপনার কথা ছেলে জানুক। অন্য পুরুষমানুষের সামনে কাপড় খুললে দোষ নয়, ছেলে শুনলে দোষ?"

মানিনী বলে, "তুমি তো এ রকম ছিলে না, কত বদলে গেছ!"

নন্দগোপাল হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "তুই বদলাসনি? রাতে গেটের আওয়াজ পাই, বেড়া সরানোর আওয়াজ পাই। কে আসে? যদি ধরতে পারি, এই ক্রাচের বাড়ি দিয়ে তার মাথা ভাঙব। আজ না হয় কাল ধরতে তো পারবই।"

মানিনী চুপ করে থাকে। মনে মনে রাগ পোষে।

বাইরে থেকে নন্দগোপালের দরজা টেনে দিল মানিনী। জল পরে মুছবে। বাকি ঘরের দরজা-জানলা আটকে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল মানিনী। ঝড় থেমেছে, বৃষ্টি হচ্ছে। উঠোনে জল জমেছে। বহু দিন মেরামত না করা বাড়ির মাথার ওপর থেকেও জল পড়ছে। পড়ুক। এ বাড়ির প্রতি আর কোনও মায়া নেই মানিনীর। দাওয়ায় দাঁড়াল সে। ক্ষণে ক্ষণে আকাশ-চেরা বিদ্যুতের আলোয় চারপাশ রুপোর মতো ঝলমল করে উঠছে। প্রকৃতির আশ্চর্য ক্ষমতা, একই সঙ্গে সে তার ভয়ঙ্কর চেহারা এবং সৌন্দর্য দেখাতে পারে। যেমন ভয় পাওয়ায়, তেমন মন ভাল করে দেয়।

বিল্ব বাড়ি নেই। পরশু দিন তাকে তার এক পাতানো মাসি নিজেদের গ্রামে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছে। আম খাওয়ার বেড়ানো। এই বাড়িতেই যা একটু যাতায়াত রয়েছে বিল্বর। ওরাও বিল্বকে ভালবাসে খুব, তাই ভরসা করে ছাড়াও যায়। সে রিভলভারটার কথা ভুলে গিয়েছে মনে হয়। অন্তত মানিনীকে তো আর বলে না। বাইরে কারও কাছে যদি বলেও থাকে, সে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেনি। আর সে দিন বিল্বর হাতে দেখে থাকলে ভেবেছে খেলনা। নইলে এত দিনে খোঁজখবর শুরু হয়ে যেত। ক'দিন অপেক্ষা করেছে মানিনী। বিষয়টা নিয়ে শোরগোল কিছু হয় কি না দেখার জন্য। সে রকম কিছু এখনও হয়নি, হবে বলে মনে হয় না। মণিমাস্টারকে বলাতে সে তো হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমে "খেলনা দিয়ে আমাকে মারবে?" বলে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছিল, পরে থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "ধুস, ও ছেলেমানুষের গল্প। বিল্লু রিভলভার কোথা থেকে পাবে?"

মানিনী বলেছিল, "কালাদিঘির ধার থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে।"

ঝোলা থেকে চিরুনি বের করে অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়েই চুল আঁচড়ায় মণিনাথ। প্রতি মিলনের পরেই সে নিজেকে ফিটফাট করে। কেউ যেন দেখে বুঝতে না পারে।

"মানিনী, তুমিও বিল্লুর কথা বিশ্বাস করে বসলে? সত্যিকারের রিভলভার কি কুড়িয়ে পাওয়ার জিনিস? নিশ্চয়ই একটা খেলনা এনে তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে। বাদ দাও দেখি।"

মানিনী বলেছিল, "আপনি দেখবেন?"

মণিনাথ বলেছিল, "না সোনা, আমার খেলনা দেখার বয়স নেই। তোমাকে দেখলেই আমি খুশি। দু'দিন পরে তোমার কাছে সব কাগজপত্র নিয়ে আসব মানিনী, সই করে দেবে। তখন অল্প কিছু টাকা দেব। বাকি পরে ধাপে ধাপে হবে। নগদ টাকা তো লাগবে তোমার। লাগবে না? তোমার বর আরও কত দিন শুয়ে থেকে টাকা ওড়াবে, তার তো ঠিক নেই। সুতরাং আমার প্রস্তাব মেনে নেওয়াই তোমার পক্ষে বুদ্ধির কাজ হবে। আর একটা কথা জেনে রাখো আমার রাধিকে, এত দিন যে তোমাকে এত আদর করলাম, আমার পুরুষত্ব দিয়ে তোমাকে তৃপ্ত করলাম, তার একটা দাম রয়েছে না? আমার ভালবাসা যদি না পেতে, তোমাকেও নন্দগোপালের মতো মানসিক গোলমালের মধ্যে চলে যেত হত মানিনী। কাম নিয়ে ছটফটিয়ে মরতে হত। হত কি না? রাধার মনত তবেঁ জাগিল মদন। এ কথার মানে জানো? *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য। পরে পড়ে শোনাব। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কথা বড় চমৎকার।"

মানিনী বিড়বিড় করে কিছু বলতে গেল। মণিনাথ তাকে থামিয়ে দিয়েছিল।

"আর কথা নয় শ্রীরাধিকে। এটাই হাই টাইম, চূড়ান্ত সময়। আর লুকোচুরি ভাল লাগছে না। এ বার মাথা উঁচু করে কামরাঙায় ঢুকব, আইনি অধিকার নিয়ে। নিজের বাড়িতে ঢুকতে তো বাধা নেই। সইসাবুদের কাগজপত্র নিয়ে আসব, কেউ জানতে পারবে না। আমার

ফোন পেলে এই ঘরে চলে আসবে। মোবাইল ফোনটা সাবধানে রেখো। বরের হাতে না পড়ে। শুভ ঘরে শুভ কাজ সাঙ্গ হবে। ভাল হবে না?" তার পর একটু থমকে ঘরের চারপাশে তাকিয়ে বলেছিল, "এই ঘর অবশ্য আর এমন আধখানা হয়ে থাকবে না। আমি শেষ করব। তোমার শ্বশুরমশাইয়ের শখ মতোই কাচের ঘর হবে। চারপাশের বন-জঙ্গল কেটে ফেলে ফুলের বাগান হবে, পুকুর পরিষ্কার হবে, ঘাটে পাথর বসবে। কোনও কোনও রাতে তুমি ওই পুকুরে জলপরির মতো স্নান করবে, আমি ঘাটে বসে দেখব। ভাল হবে না?"একটু থেমে মণিনাথ বলেছিল, "গরিব মাস্টার হলে কী হবে, মনটা আমার জমিদারের মতো।"

বুকের ওপর দলাপাকানো কাপড় চেপে ধরে মানিনী সে দিন হতবাক হয়ে গিয়েছিল। মাথা এলোমেলো লাগে তার। মাস্টার এ সব কী কথা বলে! সে কি এই বাড়িকে বাগানবাড়ি বানাতে চায়? তাকে রক্ষিতা?

ভিতরবাড়ি থেকে নন্দগোপাল চিৎকার করে উঠেছিল আবার।

"কোথায় গেলি, কোথায় পালালি মাগি?"

মণিনাথ দরজার দিকে পা বাড়িয়ে নিচু গলায় বলে, "তোমার মাগি পালিয়েছে নন্দবাবু...পালিয়েছে।"

সে দিন মানিনী থম মেরে বসে ছিল আরও অনেক ক্ষণ।

বৃষ্টি ধরেছে। বাজের হাঁকডাক চাপা হয়েছে। এক সময় বাজ পড়লে কী ভয়টাই না করত! দাদা ঠাট্টা করত।

"এই মেয়েটা আস্ত ভিতু একটা। বাজ কী করবে তোকে? ঘরের ভিতর বসে আছিস, সে কি ঘরে ঢুকতে পারে?"

মানিনী নিজের মনেই হাসল। বাজের চেয়েও অনেক ভয়ঙ্কর তার ঘরে রয়েছে। বড় হয়ে জেনেছিল, দাদা পার্টি-পলিটিক্সের সঙ্গে জড়িয়েছিল। দল করত। সে সব দল নাকি লুকিয়ে করতে হয়। বাবা তাকে বলেছিল সে কথা। মানিনী অবাক হয়েছিল, মানুষের জন্য কিছু করতে গেলেও লুকোতে হবে!

বাবা বলেছিল, "কখনও কখনও হয়। নইলে যারা মানুষের ভাল চায় না, জানতে পারলে তারা বাধা দেয়। তোর দাদা লুকিয়েও বাঁচতে পারল না।"

দাদার মৃত্যু যে আত্মহত্যা বা অপরাধের ঘটনা নয়, জানতে পেরে রাগ হয়েছিল খুব। এ কেমন মানুষের ভাল চাওয়া! এ তো বোকার মতো মরে যাওয়া।

রিভলভারটার একটা হিল্লে করতে হবে। মানিনী ভেবেও রেখেছে। প্লাস্টিকে মুড়ে, ভিতরে পাথর রেখে কালাদিঘিতেই ফেলে দিয়ে আসবে। ফেলে দেওয়াই দরকার। সবাই তো তার দাদা নয় যে, এই ভয়ঙ্কর জিনিস নিয়ে মানুষের ভাল করতে ছুটবে। যদি ছোটে কেউ, তা-ও তো ভুল হবে। ওই পথ মারাত্মক, দাদা নিজের জীবন দিয়ে বুঝিয়ে গিয়েছে।

মানিনীর শরীর খারাপ লাগছে। মনে হয় জ্বর বাড়ছে। শীতও করছে। গোটা বাড়ি এখনও অন্ধকার। আলো জ্বালাতে ইচ্ছে করছে না। কী হবে আলো জ্বেলে? বিল্ব বাড়িতে থাকলে তাও একটা কথা ছিল। তবে বসে থাকলে হবে না, রাতের খাবার বানাতে হবে। সে না খাক, নন্দগোপাল তো খাবে। মণিমাস্টার নন্দগোপালের খাওয়া নিয়েও ভয়ঙ্কর পরামর্শ দিয়েছিল।

"দু'দিন না খাইয়ে রেখে দাও মানিনী। জোর কমবে, হম্বিতম্বিও শুকিয়ে যাবে।"

মানিনী অবাক হয়ে বলেছিল, "এ আপনি কী বলেন! ছিঃ, মানুষটাকে অনাহারে রাখব?"

মণিনাথ নিজেকে সামলে মানিনীকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, "ধুস, সত্যি বলেছি নাকি? মজা করলাম।"

মানিনী নিচু গলায় বলেছিল, "এমন মজা করবেন না, আমার ভয় করে।"

মণিনাথ কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে ফিসফিস করে, "কিসের ভয়?"

মানিনী বলে, "পাছে আপনাকে ভুল বুঝে না ফেলি, সেই ভয়।"

মানিনীর এত দিন মনে হত, মণিমাস্টার সবটাই তার জন্য করে, তাকে ভালবেসে। এই যে শরীরের এত প্রশংসা, এত কবিতা, গান, এত আদর সবই তার জন্য। সে দিনের পর থেকে বুঝতে পেরেছে, না, তার জন্য নয়। আসলে জমি-বাড়ির লোভে। সেই লোভেই শরীরের ফাঁদে ফেলেছিল মাস্টার, এ বার জাল গোটাচ্ছে। কেঁপে উঠল মানিনী। ভয়ে? নাকি জ্বর আরও বাড়ল? অথবা অন্য কিছু। ঘেন্না, রাগে কি শরীর কাঁপে না? বাড়ি-জমি লিখে না দিলে মণিমাস্টার সহজে ছেড়ে দেবে না। সে আগেই জানত, শ্বশুরমশাই সব তাঁর পুত্রবধূর নামে লিখে দিয়ে গিয়েছেন। সেই সম্পত্তির দিকেই তাকিয়ে ছিল এত দিন। বুঝতে দেয়নি।

মানিনী উঠে পড়ল। আজ দু'বারের ঝড়ে এলোমেলো হয়ে যাওয়া ঘরবাড়ি, প্রকৃতির মাঝে বসে মানিনী যেন বেশি করে বুঝতে পারছে, দু'জন পুরুষ তাকে দু'ভাবে ব্যবহার করছে। এক জন পথ বেছেছে মিথ্যে আদরের, এক জন নির্যাতনের। মুষলধারে ঝরার পর বৃষ্টি আকাশে কোথাও থমকে দাঁড়িয়েছে। মানিনী নিজের ঘরে ফিরে হ্যারিকেন জ্বালাল। রান্নাঘরে যেতে হবে। গায়ে একটা চাদর নিল। দাওয়া থেকে উঠোনে নামতেই জমা জল পায়ে লাগল ছ্যাঁৎ করে। কী ঠান্ডা! বরফ গলেছে? নাকি জ্বরের কারণে এত ঠান্ডা লাগছে? রান্নাঘরের সামনে পৌঁছতেই গেট খোলার আওয়াজ। হাওয়ায়? নাকি কেউ এসেছে? এই ঝড়বৃষ্টিতে কে এল?

হ্যারিকেন উঁচু করে ধরে চমকে উঠল মানিনী।

তেরো

আজ পূর্ণিমা নয়, তার পরেও মস্ত একখানা চাঁদ উঠেছে। এই চাঁদকে বলে আকাশ ভাসিয়ে দেওয়া চাঁদ। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, আলোর সমুদ্রে চারপাশ ভাসছে।

শেষ না হওয়া ঘরের এক কোনায় চুপ করে বসে আছে মানিনী। হ্যারিকেন নেই, তার পরেও তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সে বসে আছে মাদুরের ওপর জড়সড় হয়ে। মাঝখানে এক দিন বাদ দিয়ে আবার জ্বর এসেছে। কেমন ঘোরের মতো লাগেছে। বিল্বকে তার সেই মাসি আজ বিকেলে দিতে এসেছিল। যাওয়ার সময় ছেলে কান্না জুড়ল, সে আরও দুটো দিন থেকে আসবে। দূর সম্পর্কের সেই বোনও বলল, "নিয়েই যাই মানিদি। তোমারও তো শরীর ভাল নেই। আরও ক'টা দিন থেকে আসুক।"

মানিনীও মনে মনে চাইছিল, বিল্লু ক'টা দিন পরে ফিরুক। নন্দগোপাল গোলমাল বাড়িয়েছে। নোংরা গালির সঙ্গে আরও বিশ্রী আচরণ করছে। সায় না দিলে বাড়ি মাথায় করছে। হাতের কাছে যা পাচ্ছে ছুড়ছে। জল খাওয়ার গ্লাস ছোড়ায় কাল তার কপাল কেটেছে। মানিনী চায় না, বিল্লু বাবাকে এ ভাবে দেখুক।

যাওয়ার সময় বিল্ব বলল, "মা, আমার বন্দুকটা ঠিক করে তুলে রেখেছ তো?"

মানিনী ঘাড় নেড়ে বলল, "খুব ভাল করে রেখেছি।"

বিল্বর সেই মাসি চোখ বড় করে হেসে বলল, "ও বাবা, বন্দুকও আছে নাকি তোর?"

বিল্ব বলল, "আছে তো। বন্দুক নয়, রিভলভার। গুলি ভর্তি কিন্তু। তুমি যদি আমায় বকেছ, একেবারে শাঁই করে গুলি ছুড়ে দেব।"

মানিনী শুকনো হেসে বলল, "ওর বন্দুক, রিভলভার, কামান সব আছে। ছেলে আমার মস্ত বীর কিনা।"

না-হওয়া ঘরের না-হওয়া জানলা দিয়ে হু হু করে হাওয়া ঢুকছে। মানিনীর শীত ভাব বাড়ছে। তার গায়ে চাদর। সে দিন গায়ে চাদর দেখে ধ্রুব জিজ্ঞেস করেছিল, "কী হল মানিদি, শরীর খারাপ নাকি?"

মানিনী বলেছিল, "ও কিছু নয়, ঝড়-বৃষ্টিতে ঠান্ডা লাগছে। তুমি ভেজোনি তো?"

ধ্রুব হেসে বলল, "ভিজতাম, ঝড়-বৃষ্টিতে ট্রেন লেট করল বলে বেঁচে গিয়েছি। কামরাঙায় যখন গাড়ি ঢুকেছে, বৃষ্টি কমে গিয়েছে। স্টেশনেও খানিকটা অপেক্ষা করেছি। আর ছাতা তো আছেই, এই দ্যাখো। আমি ভিতু মানুষ। কামরাঙায় এত দিন পর এসে খুব ভাল লাগছে। কত দিন পর দেখা হল বলো তো?"

এই ছেলেটিকে বিশেষ পছন্দ করে মানিনী। পছন্দের কারণ রয়েছে। কয়েক বছর আগে ধ্রুব যখন কামরাঙায় কাজ করতে এসেছিল, অনেক বাড়িতেই ঘুরতে হত ধ্রুবকে। সঙ্গে থাকত কোম্পানির সার, কীটনাশকের স্যাম্পল, আর তাদের গুণপনার ফিরিস্তি শোনানোর বকবকানি। মানিনীর শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গেও ছেলের আলাপ হয়। সেই সূত্রে বাড়িতেও আসা-যাওয়া। ছেলেটাকে দূর থেকে দেখেই পছন্দ হয়েছিল। শহুরে প্যাঁচপয়জার নেই, সহজ সরল মানুষ। সবচেয়ে বড় কথা, মানিনীর মনে হয়েছিল, হাসিখুশি ধ্রুবর সঙ্গে কোথায় যেন তার দাদার মিল রয়েছে। কেন এমন মনে হয়েছিল বলা মুশকিল। দাদার কারবার ছিল পার্টি-পলিটিক্স, রাতে লুকিয়ে অস্ত্র নিয়ে আসত। ধ্রুব ছেলেটা কাঁধের ব্যাগে সারের প্যাকেট নিয়ে আসে। দেখতেও যে এক রকম তা-ও নয়। তার পরেও মানিনীর মনে হত, দাদা ফিরে এসেছে। মনে হয় দু'জনের ভিতরের কোনও গুণ মানিনী অনুভব করতে পারত।

শ্বশুরমশাইও বলেছিলেন, "বুঝলে মানিনী, ছেলেটা বেশ ভাল। আমার ওকে পছন্দ হয়, চালিয়াতি নেই। সবচেয়ে বড় কথা, যে-মাল সে বেচতে চাইছে, তা আগে হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখাতে চায়। অন্যদের মতো ঠকিয়ে পালাতে চায় না।"

একটু-আধটু হাসি, মাথা নাড়া ছাড়া ধ্রুবর সঙ্গে তেমন কথা হত না মানিনীর। কথা হল নন্দগোপাল এক রাতে খাট থেকে পড়ে যাওয়ার পর। কপাল ফাটল, রক্তে ভেসে গেল জামাকাপড়। খবর পেয়ে ছুটে এসেছিল ধ্রুব। অত রক্ত দেখে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল মানিনী। জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা। ধ্রুব বলেছিল, "দিদি, চিন্তা কোরো না, আমি গঞ্জে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি। ওখানে হেলথ সেন্টার রাতে খোলা থাকে। মনে হচ্ছে স্টিচ করতে হবে। একটা ছেঁড়া গেঞ্জি-টেঞ্জি দাও দেখি, জোর একটা ফেট্টি বেঁধে দিই। ওতেই রক্ত বন্ধ হবে।"

গোটা রাত হেলথ সেন্টারে ছিল ধ্রুব। কপালে স্টিচ করার লোক পাওয়া গেল সকাল ন'টার পর। পাঁচটা স্টিচ করার পর নন্দগোপালকে ইঞ্জিন ভ্যানে চাপিয়ে, যত্ন করে, অতি সাবধানে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছিল। তখন সে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত।

মানিনী বলেছিল, "তুমি দুটো ডাল-ভাত খেয়ে যাও।"

ধ্রুব হেসে বলল, "তা হলে তো খুব ভাল হয় মানিদি। নইলে আবার বাজারে ছুটতে হবে, আর খাবারের দোকান এখন খোলা পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। তবে চানের জন্য একটা গামছা দাও দেখি।"

অত টেনশনেও মন ভরে গেল মানিনীর। ছেলেটা এমন ভাবে কথা বলছে, যেন বহু দিনের পরিচিত। তার পরেও মাঝে মাঝে আসত। নন্দগোপালের সঙ্গে দেখাও করেছে। নন্দগোপাল ভাল ভাবে নিত না। হ্যাঁ-হুঁ করে পাশ ফিরে শুত। মানিনী এক বার জিজ্ঞেস করল, "ধ্রুবর সঙ্গে অমন ব্যবহার করো কেন?"

"কী করি?"

মানিনী বলল, "বোঝাই যায়, পছন্দ করো না।"

"একটা অচেনা-অজানা লোককে পছন্দ করতে যাব কেন?"

মানিনী বলল, "ও সে দিন না থাকলে রক্ত বেরিয়েই মারা যেতে। সেলাইয়ের পর কত যত্ন করে তোমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছে। হত এ সব?"

নন্দগোপাল মুখ বেঁকিয়ে বলে, "কে বলেছে হত না? কামরাঙা গাঁয়ে কারও মাথা ফাটলে তার চিকিচ্ছে হয় না?"

মানিনী অবাক হয়ে বলে, "ওইটুকু ছেলের ওপর তুমি অকারণে রাগছ!"

নন্দগোপাল চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, "ধ্রুব মোটেই ওইটুকু নয়, কলকাতার লোকেরা ও রকম ভিজে বেড়ালের মতো থাকে। আমি জানি ও কেন ঘুরঘুর করছে, বুঝতে পারছি।"

মানিনী বলে, "কেন?"

নন্দগোপাল বলে, "তুমিও জানো কেন, ওই ছেলেকে যেন আর বাড়িতে না দেখি। গ্রামের মেয়ে-বৌয়ের দিকে চোখ দেওয়া বের করে দেব।"

মানিনী বলেছিল, "ছিঃ, ধ্রুব আমার ভাইয়ের মতো, ওর মধ্যে আমি আমার দাদাকে দেখতে পাই।"

নন্দগোপাল বলেছিল, "চুপ করো। ও সব দাদা-ভাই আমাকে দেখিয়ো না। সবাই অমন সেজে থাকে। আর এক দিনও যেন ওর সঙ্গে কথা বলতে না দেখি।"

মানিনী খুব দুঃখ পেয়েছিল, কিন্তু তখনও বুঝতে পারেনি, নন্দগোপালের সন্দেহ অসুখ শুরু হয়েছে। শুধু সন্দেহ নয়, সে চাইছে না স্ত্রী কারও সঙ্গে মেলামেশা করুক। সে বুঝেছিল, কোথাও একটা গোলমাল হচ্ছে। ধ্রুবকে বাড়িতে আসতে বারণ করে দিল।

ধ্রুব অবাক হয়ে বলেছিল, "কেন মানিদি? কিছু হয়েছে?"

মানিনী মুখ ঘুরিয়ে বলেছিল, "ঠিক বুঝতে পারছি না।"

সারের বিক্রিতে ফেল করে কামরাঙা ছেড়ে যাওয়ার সময় ধ্রুব দেখা করে গিয়েছিল। বাড়িতে আসেনি। বাইরে দেখা করল। বিল্টুর জন্য গাদাখানেক খেলনা দিল। বলল, "যদি কোনও সমস্যা হয় আমাকে খবর দিয়ো মানিদি। সঙ্কোচ কোরো না। আমার মোবাইল ফোনের নম্বর লিখে দিয়ে যাচ্ছি।"

এত বছর পর ধ্রুবকে দেখে অবাক শুধু হয়নি, বিশ্বাসও হচ্ছিল না মানিনীর। নন্দগোপাল তখন ঘুমোচ্ছিল, তাও কোনও ঝুঁকি নেয়নি। পা টিপে টিপে ধ্রুবকে নিয়ে এসেছিল শেষ না হওয়া ঘরে।

"এখনও সমস্যা চলছে?"

মানিনী বলল, "ও কিছু নয়। দাঁড়াও, একটা হ্যারিকেন জ্বেলে আনি।"

ধ্রুব বলল, "লাগবে না, আমার কাছে টর্চ আছে। বের করছি।"

"তা হলে এক কাপ চা করে আনি।"

ধ্রুব হেসে বলল, "চা খেলে খুব ভাল হত, তবে রিস্ক হয়ে যাবে, জামাইবাবু টের পেলে গোলমাল পাকাতে পারে।"

মানিনী বলল, "সেটা খুব বিশ্রী হবে। এখানে কোথায় এসেছ? থাকবে কোথায়?"

"এসেছি তোমার কাছেই। রাতে গঞ্জে চলে যাব, রাতটা কোথাও একটা কেটে যাবে। তোমার সঙ্গে যদি কাজটা হয়ে যায়, কাল সকালেই কলকাতার ফার্স্ট গাড়ি ধরব। হাতে একদম সময় নেই। এখানে বেশি ক্ষণ থাকাটাও রিস্কি হয়ে যাবে।"

মানিনী অবাক হয়ে বলল, "আমার সঙ্গে কাজ! কী কাজ ধ্রুব?"

ধ্রুব একটু থমকে থেকে বলল, "মানিদি, বিল্টু কিছু দিন আগে কালাদিঘির পাশ থেকে একটা রিভলভার কুড়িয়ে পায়, সেটা বাড়িতেও নিয়ে আসে। এটা কি ঠিক?"

মানিনী দম চেপে বলল, "হ্যাঁ, ঠিক।"

"ওটা কি এই বাড়িতে আছে?"

মানিনী অস্ফুটে বলল, "হ্যাঁ, আছে। আমি লুকিয়ে রেখেছি।"

ধ্রুব গলা নামিয়ে বলল, "ভেরি গুড। নইলে আমাকে কাল থেকে নতুন ভাবে খোঁজা শুরু করতে হত। কী ভাবে করতাম জানি না। জিনিসটা আমি নিতে এসেছি মানিদি। তোমার কাছে থাকতে পারে বলেই এসেছি। আমি জানি তুমি 'না' বলবে না। নইলে এ দায়িত্ব আমি নিতাম না।"

মানিনী বলল, "তুমি কী করে জানলে, ওটা আমার কাছে আছে?"

ধ্রুব একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমি নিজে সবটা জানি না, তুমিও জানতে চেয়ো না। তবে আন্ডারওর্য়াল্ডের খবর রাখার ক্ষমতা দেখে অবাক হচ্ছি। জিনিসটা তোমার কাছে আছে ওরা জানে না। এই

বাড়িতে আছে, শুধু সেটুকু আঁচ করেছে। সম্ভবত সে দিন পথে বিল্লুকে জিনিসটা নিয়ে আসতে দেখেছে কেউ।"

ধ্রুবর হাতের ওপর হাত রাখল মানিনী। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "ওটা তোমার? তোমার হলে দেব না। আমার দাদার মতো ভুল তোমাকে করতে দেব না ধ্রুব।"

ধ্রুব মানিনীর হাত চেপে ধরে বলল, "তোমার দাদা কী ভুল করেছিলেন আমি জানি না মানিদি, তবে গোলা-বারুদ, বন্দুকের আমার কোনও দরকার নেই। তুমি তো জানো, আমি এক জন সাধারণ, শান্ত, বোকাসোকা মানুষ। ও সব নিয়ে আমি কী করব? ভিতুও তো। কলকাতায় ফিরে যার জিনিস তাকে ফেরত দেব। তুমি শান্ত হও। তোমার কী হয়েছে মানিদি? আমাকে লুকিয়ো না। তোমার গা তো খুব গরম!"

দু'হাতে মুখ ঢেকে এ বার মানিনী কাঁদতে শুরু করে। নিজেকে সামলাতে পারে না। যাবতীয় জমা দুঃখ, অভিমান বেরিয়ে আসতে থাকে দমক দিয়ে। ধ্রুব পরম যত্নে ধরে থাকে কেঁপে ওঠা মানিনীকে।

"ধ্রুব, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে, বিল্লুর জন্য পারি না। বিল্লুকে কলকাতায় নিয়ে যাবে ধ্রুব? কোনও বোর্ডিং, আশ্রমে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারবে? আমি এখানে নিশ্চিন্তে মরতে পারব।"

ধ্রুব বলে, "কী হয়েছে মানিদি? এ কথা কেন বলছ?"

"আমার ভয় করছে ধ্রুব।"

এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে চিৎকার ভেসে আসে, "কোথায় লুকিয়েছিস হারামজাদি? এক বার পাই, আজ তোকে কাপড় খুলে পেটাব... কোথায় ঘাপটি মেরেছিস শয়তানি? কার সঙ্গে শুয়ে আছিস?"

ক্রাচের আওয়াজ ভেসে আসে। মানিনী ঝটকায় ধ্রুবর টর্চ নিভিয়ে দেয়। কাঁপা গলায় বলে, "পালিয়ে যাও ধ্রুব। ও আসছে, ও মারবে।"

ধ্রব দাঁতে দাঁত চেপে বলে, "আসুক, তুমি আটকাবে।"

"পারব না, সবাই সব পারে না ধ্রুব। আরও শয়তান আছে। কত জনের সঙ্গে লড়ব? আমার শক্তি কোথায়?"

ধ্রুব বলে, "আরও আছে! কে সে?"

মানিনী দ্রুত বলে, "সে আরও সাংঘাতিক। আমার অবস্থার সুযোগ নিয়েছে। আমিই ভুল করেছি। মেয়েরা এই ভুল করে। ছাড়ো ও সব, এখন যাও। কাল কোনও একটা সময়ে এসো, পুঁটুলিতে জিনিস গুছিয়ে রাখব।"

ক্রাচের আওয়াজ এগিয়ে আসে। নন্দগোপালের হুঙ্কার স্পষ্ট হয়।

"অন্ধকারে কোথায় লুকিয়েছিস? যে-বুকের জোরে পুরুষ টানিস, সেই বুকের আজ কী হাল করি দেখ..."

ধ্রুব উঠে দাঁড়ায়। মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে তার। নিজেকে কেমন মনে হয় যেন! মনে হয়, সে আর একটু আগের ধ্রুব নেই, সে অন্য কেউ। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়। সন্তোষ সেন কি এই সিদ্ধান্তে রেগে যাবেন? নিশ্চয়ই নয়। তার আগের বাবা হলে হয়তো রেগে যেত, কিন্তু এই সন্তোষ সেন ছেলের সিদ্ধান্তে কখনও রাগবেন না।

চাপা গলায় ধ্রুব হিসহিসিয়ে বলল, "মানিদি, ওই জিনিস এখন তোমার কাছে রইল। তোমার লাগবে। ব্যবহার করতে হবে না, শুধু ভয় দেখিয়ো, ওতেই কাজ হবে। তোমার শক্তি টের পাবে। আমি ক'দিন পরে এসে নিয়ে যাব। সাবধানে থেকো।"

যেমন এসেছিল তেমনই প্রায় নিঃশব্দে ধ্রুব চলে গিয়েছিল সে দিন। বাড়ির ভিতরের ঘরে মানিনীকে খুঁজে না পেয়ে ক্লান্ত গলায় গাল দিতে দিতে নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছিল নন্দগোপাল। দাওয়া থেকে একা নামার ক্ষমতা থাকলেও, জলে-বৃষ্টিতে সাহস পায় না। তার পরেও সে দিন শেষ না হওয়া ঘরে বসে ছিল মানিনী। জ্বরে, কান্নায় কিছুটা সময় ঘোরের মধ্যে চলে যায়। আর সেই ঘোরের মাঝে একটু ক্ষণের জন্য তার কাছে এসেছিলেন মৃত অম্বরী। যাঁকে মানিনী শুধু ফোটোতেই দেখেছে। আবছা হওয়া ফোটো। পুকুরের ধার থেকে যেন উঠে আসেন। শেষ না হওয়া ঘরের উন্মুক্ত দরজায় দাঁড়িয়ে নরম গলায় বলেন, "মা, কাঁদে না।"

মানিনী চমকে ওঠে। মুখ তুলে জল-আলোমাখা সেই অপার্থিব নারীর দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে কিছু বলতে চায়। হাত তুলে বারণ করেন

অম্বরী।

“তোমায় কিছু বলতে হবে না। তুমি শুধু নিজের ওপর ভরসা রেখো মানিনী। সাহস রেখো। ধ্রুব তোমাকে তো সাহসই দিয়ে গেল? ইস, ছেলেটা এত রাতে কিছু না খেয়ে চলে গেল। তোমার শ্বশুরমশাই বেঁচে থাকলে কিছুতেই যেতে দিতেন না, জোর করে খাইয়ে ছাড়তেন। এ তুমি ঠিক করোনি মানিনী।”

ব্যস, ওইটুকুই। দ্রুত ঘোর কেটে গিয়ে সংবিৎ ফিরেছিল মানিনীর। তখন আর দরজায় কেউ ছিল না। থাকার কথাও নয়। মৃত মানুষ কখনও দরজায় এসে দাঁড়ায় না। মানিনী সে কথা জানে। তার পরেও তার মনে হতে থাকে, মৃত্যুর পর ভাল মানুষরা কেউ চলেও যায় না।

মাঝে এক দিন কেটেছে। আজ সকালে লুকিয়ে রাখা মোবাইলে ফোন করেছিল মণিমাস্টার।

“সন্ধের পর যাচ্ছি। পুকুরের পাড় দিয়ে ঘরে ঢুকব। তৈরি থাকবে। কাগজপত্রে সই করতে বেশি সময় লাগবে না।”

বিকেলে নন্দগোপাল বলল, “আমি জানি, বড় কোনও নটঘট করার জন্য তুমি বিল্লুকে বাড়ি থেকে সরিয়েছ। কে আসবে?”

মানিনী বলে, “বাজে কথা।”

নন্দগোপাল বলে, “মিথ্যে বলছ।”

মানিনী ঠান্ডা গলায় বলে, “যা খুশি ভাবতে পারো। তুমি তো তা-ই ভাবো।”

নন্দগোপাল চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, “ঠিক আছে। বিকেলের পর থেকে তুমি আমার ঘরে থাকবে।”

মানিনী বলে, “কেন?”

নন্দগোপাল হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, “আমার ইচ্ছে। আজ যদি বাইরে এক পা-ও যেতে দেখি, পা ভেঙে দেব। নেংটা করে হাত-পা বেঁধে রেখে দেব, সবাইকে ঠকিয়ে ঘর-বাড়ি নিজের নামে লিখিয়ে নেওয়ার মজা টের পাইয়ে দেব।”

চুপ করে থাকে মানিনী। তার শরীর ভাল নয়। সে আর এই সব অশান্তিতে যাবে না। সে কী করবে, তা তার ঠিক করা হয়ে গিয়েছে। খানিকটা ধ্রুব, খানিকটা অম্বরী বলে দিয়েছেন। বাকিটুকু তার নিজের ঠিক করা।

এই মুহূর্তে মানিনীর গায়ের চাদরের নীচে তার সুন্দর বুক দুটো যেমন রয়েছে, তেমন রয়েছে ডান হাতে ধরা একটা গুলি ভরা রিভলভারও। কুড়িয়ে পাওয়া। রিভলভারের ট্রিগারে হাত রেখে মানিনী অপেক্ষা করছে। যে আসবে তার জন্যই অপেক্ষা করছে। সে তার স্বামী নন্দগোপালও হতে পারে, আবার প্রেমিক মণিনাথও হতে পারে।

আকাশ ভাসিয়ে দেওয়া চাঁদের আলোয় ব্রজগোপালের শেষ না হওয়া ঘর আজ যেন বেশি ঝলমল করছে।

অঙ্কন: রৌদ্র মিত্র

সেদিন চৈত্রমাস

কৃ ষ্ণে ন্দু মু খো পা ধ্যা য়

প্রান্তিক স্টেশনে স্নেহা নামতেই কোথায় যেন একটা কোকিল ডেকে উঠল। এখন চৈত্র মাস। কলকাতায় এখন বেশ গরম পড়ে গিয়েছে। কিন্তু বসন্তটা বোধহয় একেবারে চলে যায়নি। কোকিলের কুহু কুহু ডাকটা শুনে মনটা বেশ ভাল হয়ে গেল স্নেহার। প্রান্তিক স্টেশনটা যত এগিয়ে আসছিল, ভেতরে ভেতরে একটা দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত কাজটার দায়িত্ব সেই একার ঘাড়ে এসেই পড়ল। একা অবশ্য আসতে হত না, যদি পিয়ালীদি সঙ্গে আসত। কিন্তু যথারীতি পিয়ালীদি এ বারেও শেষ মুহূর্তে শ্বশুরবাড়ির ঝামেলায় আটকে গিয়েছে।

ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে দ্রুত লোকজন বাইরে চলে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই স্টেশন ফাঁকা। প্রান্তিক স্টেশন তো আর হাওড়া-শিয়ালদা নয় যে, লোকজন সব সময় গমগম করবে। পিঠে ব্যাকপ্যাকটা নিয়ে স্টেশনের বাইরে এল স্নেহা।

প্রান্তিক কেন, শান্তিনিকেতনেই এর আগে কখনও আসেনি স্নেহা। পুরো জায়গাটাই নতুন। কোকিলের ডাকে মন ভাল হওয়ার রেশটা এখনও আছে। স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে মনটা আরও যেন ফুরফুরে হয়ে উঠতে চাইছে। কত দিন পর সত্যিকারের বাইরে এল। লকডাউন, করোনা, প্রথম ঢেউ, দ্বিতীয় ঢেউ, তৃতীয় ঢেউ করতে করতেই দুটো বছর পার। তৃতীয় ঢেউটা তো রেয়াত করেনি ওকেও। কোকিলের ডাকটা তাই যেন এক নতুন পৃথিবীতে স্বাগত জানাচ্ছে স্নেহাকে।

এখন তিনটে কাজ। এক, বাড়িতে ফোন করে মাকে পৌঁছনোর খবরটা দেওয়া। দুই, অর্কদের ফোন করা। আর তিন, একটা টোটো ধরে গন্তব্যে পৌঁছনো। দ্বিতীয় কাজটাই সবচেয়ে জরুরি। ফাঁকা টোটোর দিকে চোখ রেখে এক পাশে একটু সরে এসে অর্ককে মোবাইলে ফোন করল স্নেহা। ফোনটা রিং হয়ে হয়ে থেমে গেল। কেউ ধরল না। চোরা দুশ্চিন্তাটা বাড়তে লাগল। স্নেহাকে অনুরাধাদি কোনও ঠিকানা দেয়নি। বলেছিল স্টেশনে নেমে অর্ককে ফোন করতে। অর্ক ছেলেটার সঙ্গে পরিচয় তো দূর, কখনও চোখেই দেখেনি। তবে এ সব নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবেনি স্নেহা। কারণ পিয়ালীদির সঙ্গে আসার কথা ছিল। এখন দায়িত্বটা ওর একারই।

টোটোওয়ালাকে তো কিছু একটা বলতে হবে। কোথায় যাবে সেটাই তো জানে না। অল্প টেনশন নিয়ে অনুরাধাদিকে ফোন করল। কিন্তু ভাগ্য যখন খারাপ থাকে, তখন চার দিকে সবই গোলমাল। অনুরাধাদির ফোনটাও সুইচড অফ। দুশ্চিন্তা বাড়ল স্নেহার। নিজেকে বোঝাল, জলে তো আর পড়ে নেই। একটা আস্ত স্টেশনের বাইরে ভরদুপুরে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিকানা না পেলে ফিরতি ট্রেনে কলকাতায় ফিরে যাবে। তবে সেটা শুধু নিজের মনকেই সান্ত্বনা দেওয়া। এত দিন পর বাইরে একটা কাজ করতে এসে শুধু ঠিকানা পাচ্ছে না বলে ফিরে যাবে? বোকা বোকা চিন্তা। দেখাই যাক আরও কিছু ক্ষণ।

খানিক ক্ষণ উসখুস করে পিয়ালীদিকে ফোন করল স্নেহা। এ বার ভাগ্যটা আর অতটা খারাপ হল না। কয়েকটা রিং হতেই মোবাইলটা ধরল পিয়ালীদি, "হ্যালো, বল।"

পিয়ালীদির গলাটা বেশ চাপা। স্নেহা বলল, "দিদি, ট্রেন থেকে নেমেছি। কিন্তু অর্ককে ফোনে পাচ্ছি না। কী করি বলো তো? তোমার কাছে আর কোনও নাম্বার বা কোথায় যাব ঠিকানা আছে?"

"এই রে! না তো, আমার কাছেও তো কোনও ঠিকানা নেই। অনুরাধাদিকে চেষ্টা করেছিলি?"

"করেছিলাম। ওঁকেও পাচ্ছি না। সুইচড অফ।"

"ক্লায়েন্ট মেয়েটার মোবাইল নম্বর অবশ্য আছে আমার কাছে। কিন্তু তুই ওকে ফোন করলে তো..."

পিয়ালীদির কথা থেমে গেল। স্নেহা একটু চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "বুঝেছি।"

পিয়ালীদর ফোন থেকে একটা উত্তেজিত কথা কাটাকাটির হালকা শব্দ ভেসে আসতে শুরু করল। শ্বশুরবাড়ি নিয়ে পিয়ালীদির অশান্তি লেগেই আছে। শাশুড়িকে নিয়ে সমস্যা। সত্যেনদাকে নিয়ে সমস্যা। আর এখন পিয়ালীদির মেয়েটাও বড় হয়েছে। মেয়েটাকে নিয়েও হাজার একটা সমস্যা। সমস্যা যেন পিছু ছাড়ে না পিয়ালীদির। এই কাজগুলোর মধ্যে পিয়ালীদি একটা মুক্তি খুঁজে পায়। যত ক্ষণ কাজের মধ্যে ডুবে থাকে, তত ক্ষণ সমস্যা থেকেও যেন দূরে থাকে।

"কী বলি বল তো তোকে?"

পিয়ালীকে আর বিড়ম্বনায় না ফেলে স্নেহা বলল, "ঠিক আছে, দেখছি। সে রকম হলে সোজা কলকাতায় ফিরে যাব।"

স্নেহা ফোনটা ছেড়ে দেওয়ার আগে পিয়ালী আর এক বার চাপা গলায় বলল, "ফিরে আসবি? একটা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে রাখ না অর্ককে।"

ফোনটা ছেড়ে একটু নিশ্চিন্ত লাগল স্নেহার। মেসেজ করে রাখার এই বুদ্ধিটা মাথায় আগে আসা উচিত ছিল। অর্ক হয়তো কাজের মধ্যে আছে, তাই ফোনটা ধরতে পারছে না। মেসেজটা পেলে নিশ্চয়ই উত্তর দেবে। অনেক লোকের ফোন নাম্বার আর হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আলাদা থাকে। ভাগ্য ভাল অর্কর যে নম্বরটা রয়েছে সেই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে। স্নেহার একটা স্বভাব আছে নতুন লোকের নম্বর পেলে হোয়াটসঅ্যাপে ডিপি দেখা। হোয়াটসঅ্যাপটা খুলে অর্কর ডিপিটাই প্রথমে দেখল। তার পর আঙুল ছুঁইয়ে ছবিটাকে বড় করে নিল। লোকে ডিপিতে নানা রকম ছবি দেয়। তবে অর্ক নিজের ছবিই রেখেছে। নিজেকে যতখানি স্মার্ট দেখানো যায়, সেই ভাবে। চোখে একটা নীল কাচের সানগ্লাস। জামার কলার পেছনে সামান্য উঁচু করা। ছেলেটার মুখটা একটু চেনা চেনা লাগল। আগে কোথাও দেখেছে কি? মনে পড়ছে না। ছবিটা দেখার মাঝেই মোবাইলটা বেজে উঠল। অর্ক রিংব্যাক করছে, "হ্যালো, আপনি কি আমাকে এই নম্বরে ফোন করেছিলেন?"

স্নেহা বুঝতে পারল অর্কর নম্বরটা ওর নামে নিজের মোবাইলে সেভ করা থাকলেও অর্কর নেই। না থাকারই কথা। থাকলে পিয়ালীদিরটাই থাকবে। গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে স্নেহা বলল, "আমি স্নেহা। অনুরাধাদি পাঠিয়েছেন। ব্রাইডাল মেকওভার করতে। পিয়ালীদির সঙ্গে আসার কথা ছিল। কিন্তু একটা কাজ পড়ে যাওয়ায় আসতে পারেনি। আমি একাই এসেছি।"

"জানি। আপনি কোথায়?"

"আমি ট্রেন থেকে নেমে প্রান্তিক স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করছি। কোথায় আসব?" একটু ইতস্তত গলায় স্নেহা জিজ্ঞেস করল।

"আপনাকে অনুরাধা ম্যাডাম কিছু বলেননি?"

"বলেছেন ট্রেন থেকে নেমে আপনাকে ফোন করতে।"

অর্ক বিরক্ত হয়ে উঠল, "দেখেছেন কাণ্ড। আপনাকেই কিছু জানায়নি। কিছু মনে করবেন না, এই মহিলার স্বভাব যত দেখছি তত অবাক হয়ে যাচ্ছি। পার্টির সঙ্গে আজ সকালে অনুরাধা ম্যাডামের ব্যাপক ঝামেলা হয়েছে। কিছু জানায়নি আপনাকে?"

হতভম্ব গলায় স্নেহা বলল, "না তো।"

"হুম! আপনার কথা শুনে এ বার মেলাতে পারছি। পার্টির বোধহয় পছন্দ ছিল আপনার যিনি সিনিয়র, পিয়ালীদি, তাঁকে। তিনি আসতে পারছেন না জেনেই পার্টি কন্ট্রাক্ট ক্যানসেল করে দিতে চেয়েছিল। আর অনুরাধা ম্যাডামও নাছোড়বান্দা। আপনাকে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়েছেন। এত সব আমাকে জানিয়ে মোবাইলটা সুইচড অফ করে বসে আছেন। আর আপনাকে কিছুই বলেননি। আপনাদের এই অনুরাধা ম্যাডাম অদ্ভুত মহিলা। পার্লার থেকে ইভেন্ট ম্যানেজার হতে চাইছেন। শুধু কাজটা ধরা আর মুখে বড় বড় কথা বলা। শুধু আপনাকে আর আমাকে এক জায়গায় জড়ো করে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়াই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট নয়। কে কাকে বোঝায়! ইভেন্ট ম্যানেজার নিজে কোথায়? কোঅর্ডিনেটর কোথায়?"

স্নেহা কিছু বলল না। তবে অনুরাধাদি সম্পর্কে ভুল কিছু বলছে না অর্ক। মাঝে মাঝে অদ্ভুত কাণ্ড করে অনুরাধাদি। পার্লারের ব্যবসাটা বাড়িয়ে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে নামতে চাইছে। এটাই তার প্রথম ছোটখাটো কাজ। আর ব্যাপারটা বোধহয় পিয়ালীদিও জানে। তাই ক্লায়েন্টের মোবাইল নম্বরটা ইতস্তত করে দিল না। অনুরাধাদিকে কিছুতেই পিয়ালীদি চটাবে না। দু'জনের ওপরই বিরক্তিটা বাড়ল। এই ব্যাপারটা ওকে জানাতে কী অসুবিধে ছিল? এই সব ঝামেলার মধ্যে দুম করে ওকে পাঠিয়ে দিল! স্নেহা নিচু গলায় অর্ককে বলল, "কাজের কোনও অসুবিধে হত না। সামলে নিতাম। যাক গে।"

অর্ক হেসে উঠল, "সে সব আমাকে বলে লাভ নেই। গোটা ব্যাপারটাই অনুরাধা ম্যাডাম আর পার্টির মধ্যে। আমরা তো শুধু অনুরাধা ম্যাডামের কথায় ছবি তুলতে এসেছি। চারটে নাগাদ সোনাঝুরির মাঠে শুট শিডিউল। আপনার কাছে শিডিউলটা নিশ্চয়ই আছে।"

"চারটের সময় সোনাঝুরির মাঠ?" অবাক হয়ে স্নেহা বলল, "আমি

তো জানি সন্ধেবেলায় মেয়ের বাড়িতে একটা প্রিওয়েডিং ছোটখাটো পার্টি, মেকআপ করাতে হবে। তার আগে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। আপনিই কোঅর্ডিনেটর।"

"আমি কোঅর্ডিনেটর! এই প্রথম শুনছি আপনার মুখ থেকে। উফ যেমন আপনাদের অনুরাধা ম্যাডাম, তেমনই পার্টি। একেবারে সেয়ানে সেয়ানে। পার্টি হঠাৎ ঠিক করেছে বিকেলের আলোয় সোনাঝুরির মাঠে একটা প্রিওয়েডিং শুট। এটা আগে কন্ট্রাক্টে ছিল না। ভীষণ খামখেয়ালি পার্টি। আমাদের কী! যত কাজ তত পয়সা। পার্টিও মালদার। আপনার মতো আমিও শুনেছিলাম, এটা একটা ছোট ঘরোয়া পার্টিতে সাজগোজ করা, গান বাজনা, ছবি তোলার ব্যাপার। এক জন মেকআপ আর্টিস্ট আর এক জন ক্যামেরাম্যানের কাজ। এটাই ইভেন্ট। সেই মতো কাল রাতে এসে পৌঁছেছি।"

স্নেহা চুপ করে শুনে বলল, "জানি। তাই হয়তো পিয়ালীদি আসতে পারছে না বলে অনুরাধাদি অত টেনশন করেনি। কিন্তু এখন আমি কী করব? আমি আগে কোনও দিন শান্তিনিকেতনে আসিনি।"

"আমিও আসিনি। এই প্রথম। এসে দেখছি কোনও ব্যবস্থাই নেই। শুধু রাতে একটা থাকার জায়গা দিয়েছে। একটা কিছু ভেবে ফেলা আর সেটা করা— দুটোর মধ্যে কিন্তু আকাশ পাতাল তফাত," অর্কর বিরক্তি কাটছে না।

"বুঝতে পারছি," কাতর গলায় বলল স্নেহা বলে উঠল, "আমার তা হলে এখন কী উচিত বলুন তো?"

"এই মরেছে! আমি কী করে বলি? এক কাজ করুন। বিশ্বরূপ মিত্রকে ফোন করুন। ক্লায়েন্টের বাবা।"

"ওঁকে? চিনিই না তো। কী জিজ্ঞেস করব? আচ্ছা, আপনার সঙ্গে একটু দেখা করা যায় কি? আপনি কি অনেক দূরে আছেন?"

"না। প্রান্তিক স্টেশনের কাছেই পার্টির ঠিক করে দেওয়া গেস্ট হাউসে আছি। টোটোয় মিনিট দশ-পনেরো লাগবে। চলে আসুন।"

"ঠিকানাটা?"

"এইটাই মুশকিল। ঠিকানা, রোড ডাইরেকশন বলতে পারব না। লাইভ লোকেশন পাঠিয়ে দিচ্ছি। টোটোওয়ালাকে দেখান, বুঝে যাবে।"

দুটো ফাঁকা টোটো দাঁড়িয়েছিল। তার প্রথমটার কাছে গিয়ে স্নেহা মোবাইলে লাইভ লোকেশনটা দেখানো মাত্র টোটোওয়ালা জায়গাটা বুঝে ফেলে বলল, "বসুন।"

টোটোটা চলতে আরম্ভ করল। যে কোকিলের ডাক শুনে শান্তিনিকেতনে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে স্নেহার মনটা ভাল হয়ে উঠেছিল, সেই রেশটা কোথায় যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। রাগ আর বিরক্তিটা ক্রমশ বাড়ছে অনুরাধাদির ওপর। ফিরে গিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করবে। অনেক দিন ধরে যথেষ্ট সহ্য করে যাচ্ছে। এ বার দরকার হলে চাকরিটাই ছেড়ে দেবে।

দুই

তিন ঘণ্টা আগে...

বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বরূপ মিত্র করজোড়ে অসীম সেনগুপ্তকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বিনীত গলায় বললেন, "আসুন, আসুন। রাস্তায় কোনও অসুবিধা হয়নি তো?"

"না, না। একদম আরামে এসেছি," প্রতিনমস্কার করতে করতে অসীমবাবু বললেন।

গেটের ফলকে চোখ পড়ল অসীমবাবু আর অপরূপা দেবীর। 'খেলাঘর'। প্রান্তিকে সুন্দর বাংলো প্যাটার্নের ছিমছাম বাড়ি। বাড়ির সামনে বাগান। প্রচুর ফুলের গাছ। এখন অবশ্য গোলাপ ছাড়া সে রকম ফুল ফোটেনি। তবে পাঁচিলের ঠিক বাইরে একটা বড় পলাশ গাছ লাল হয়ে রয়েছে। সকালের রোদ্দুরে ঠিক যেন ডালে ডালে আগুন লাগিয়েছে। তাতেই বাড়িটা একটা অন্য মাত্রা পেয়েছে।

অপরূপা দেবী বললেন, "বাঃ, আপনার বাড়ির নামটা তো বেশ, খেলাঘর।"

হেসে উঠলেন বিশ্বরূপবাবু, "খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি আমার মনের ভিতরে। কত রাত তাই তো জেগেছি, বলবো কী তোরে, খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি। বুঝলেন বউদি, এই বাড়িটা যখন করিয়েছিলাম, কত রাত জেগেছি এই বাড়িটার নাম কী দেব ভাবতে ভাবতে। এক বার রবিঠাকুরের এই শব্দটা মনে পড়ে তো আর এক বার অন্য শব্দ। সবই তো মণিমুক্তো। শেষে এক দিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে মনের মধ্যে বেজে উঠল, 'প্রভাতে পথিক ডেকে যায় অবসর পাই নে আমি হায়', অমনি মনে পড়ে গেল প্রথম লাইনগুলো, খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি আমার মনের ভিতরে। ব্যস পেয়ে গেলাম বাড়ির নাম, খেলাঘর।"

অপরূপাদেবী এক বার অসীমবাবুর মুখের দিকে তাকালেন। অসীমবাবুর মুখটা বেশ করুণ। কী প্রতিক্রিয়া দেবেন বুঝতে পারছেন না। আসার পথে শক্তিগড় থেকে ল্যাংচা কিনেছিলেন। সেই হাঁড়িটা ধরে ঈষৎ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অবশ্য বোঝা উচিত ছিল। আড়াই বছরের ওপর চেনেন রবীন্দ্রপ্রেমী মানুষটাকে। প্রস্তুতি নিয়ে আসা উচিত ছিল। এখন দোষটা অপরূপাদেবীরই। 'খেলাঘর' শব্দটা উচ্চারণ করে স্ফুলিঙ্গটা উনিই ধরিয়েছেন।

"এ কী! তুমি এঁদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন?" ভেতর থেকে বিশ্বরূপবাবুর স্ত্রী সংযুক্তাদেবী বেরিয়ে এসে শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "আসুন দাদা, আসুন দিদি। আর ও কোথায়, মিতদ্রু?"

"গাড়িটা নিয়ে একটু গেল, এখুনি আসছে বলল," অপরূপাদেবী বাইরের দিকটা দেখালেন।

বিশ্বরূপবাবু চিন্তিত গলায় বললেন, "কোথায় আবার গেল? এখানে তো ও কিছু চেনে না। আরে মধু আছে তো। যা দরকার মধুকে বললেই এনে দেবে। দাঁড়ান দেখি।"

বিশ্বরূপবাবু পাঞ্জাবির পকেট থেকে মোবাইলটা বার করতে যেতেই সংযুক্তাদেবী বিরক্ত হয়ে উঠলেন, "আঃ ছাড়ো না। চলে আসবে। দাদা-দিদিদের ভেতরে নিয়ে এসো। আসুন দাদা।"

বাগান পেরিয়ে সদর দরজা। সদর দরজার ঠিক পাশে একটা স্থাপত্যকর্ম। বিশ্বরূপবাবু একটু থেমে মূর্তিটা দেখিয়ে বললেন, "এইটা হচ্ছে রামকিঙ্কর বেজের..."

অপরূপাদেবী বিশ্বরূপবাবুকে থামিয়ে দিলেন, "আচ্ছা দেখাবে, দেখাবে। আজ কাল সারাদিন পড়ে রয়েছে।"

সদর দরজা পেরিয়ে বড় একটা হলঘর। ঘরটায় ঢুকেই তাক লেগে গেল অসীমবাবু আর অপরূপাদেবীর। অত্যন্ত পরিপাটি অন্দরসজ্জা। আর সব জায়গাতেই রবীন্দ্রনাথ। সবচেয়ে নজর কাড়ছে দেওয়ালজোড়া রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত বাউলবেশের ছবি। বিশ্বরূপবাবু ছবিটার কাছে এগিয়ে গদগদ গলায় বলে উঠলেন, "হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে, যাহা কিছু সব আছে আছে আছে—" তার পর অসীমবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আছে, আছে। অনেক কিছু আপনাদের দেখানোর আছে।"

এক দিকে বইয়ের তাক। সেখানে রবীন্দ্র রচনাবলী তো আছেই, সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আরও কত বই। এ ছাড়া আছে চোঙা গ্রামাফোন থেকে গ্র্যান্ড পিয়ানো আরও অনেক কিছু।

"বসুন। বসুন। শোনাব আপনাদের রবিঠাকুরের নিজের গলায় রেকর্ড করা অরিজিন্যাল রেকর্ড। আমার কালেকশনে আছে," বিশ্বরূপবাবু বললেন।

দোতলার কোনও একটা ঘর থেকে উত্তেজিত কথা কাটাকাটির আওয়াজ ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে গলাটা হৈমন্তীর। বিশ্বরূপবাবুর রবীন্দ্রপ্রীতির নিদর্শন থেকে পরিত্রাণ পেতে অপরূপাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, "হৈমন্তী কোথায়?"

সংযুক্তাদেবী বললেন, "ওই যে গলা পাচ্ছেন না, সাত সকালেই ঝগড়া বাধিয়েছে।"

অপরূপাদেবী হাসলেন, "কার সঙ্গে আবার কী হল?"

"আর বলবেন না। কলকাতা থেকে ওর মেকআপ আর্টিস্টের আসার কথা ছিল। যার আসার কথা ছিল, সে আসতে পারছে না। অন্য এক জনকে পাঠাচ্ছে। তাকে মেয়ের পছন্দ নয়। দুর্গাপুর থেকে অন্য এক জনকে আনাচ্ছে। এই চলছে সকাল থেকে।"

মধু দুটো শ্বেতপাথরের গ্লাসে আমপোড়ার শরবত নিয়ে এসে সেন্টার টেবিলে রাখল। তেষ্টা পেয়েছিল। অপরূপাদেবী গ্লাসটা তুলে শরবত খেতে শুরু করলেন। অসীমবাবু গ্লাসের দিকে হাত বাড়াননি। তাই দেখে বিশ্বরূপবাবু বললেন, "কী হল, খান।"

"আমার শুগার। একটু জল পেলেই চলবে," ইতস্তত করে অসীমবাবু বললেন।

বিশ্বরূপবাবু কথাটাকে আমলই দিলেন না। গ্লাসটা তুলে অসীমবাবুর দিকে এগিয়ে বললেন, "আরে খান খান। এ আম্রপালির শরবত।"

"আম্রপালি মানে?"

"দেখাব আপনাকে। বাড়ির পেছনেই গাছটা। কাঁচামিঠে আমে গাছটা ভরে রয়েছে। এ আমের শরবত খেলে সুগার বাড়বে না। জানেন তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ভারী পছন্দের ছিল আম্রপালি।"

এ রকম কোনও যুক্তি অসীমবাবু কস্মিনকালেও শোনেননি। খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাত বাড়িয়ে শরবতের গ্লাসটা তুললেন। তার পর কুণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "অনুষ্ঠান তো সন্ধেবেলায়?"

গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন বিশ্বরূপবাবু, "এই যে আপনারা পদধূলি দিলেন আর অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। বড্ড ইচ্ছে ছিল বসন্ত উৎসবের সময় এই অনুষ্ঠানটা করতে। বসন্ত উৎসবের শান্তিনিকেতন, আহা! ওরে গৃহবাসী খোল, দ্বার খোল, লাগল যে দোল। স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল। দ্বার খোল, দ্বার খোল।"

দু'কলি গানটা গেয়ে বিশ্বরূপবাবু বললেন, "একটু ফ্রেশ হয়ে জলখাবার খেয়ে নিন। তার পর আপনাদের নিয়ে যাব বিশ্বভারতী দেখাতে। রবিঠাকুরের অনেক গল্প আছে যেগুলো কোনও বইয়ে পাবেন না। আপনাকে বলেছিলাম না আমার দাদুর কথা। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের ছায়াসঙ্গী ছিলেন। সব দেখাব আপনাদের। সেই কোন কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথ বাবার সঙ্গে এসে কোন বাড়িতে ছিলেন থেকে আরম্ভ করে রেলের মিউজ়িয়ামে রাখা রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন থেকে শেষ বার চলে যাওয়ার রেলের কোচ পর্যন্ত, একটা একটা করে সব দেখাব।"

ঢক ঢক করে শরবতটা খেয়ে নিয়ে অসীমবাবু বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

অপরূপাদেবী মৃদু গলায় বললেন, "কঙ্কালীতলা যাব কিন্তু এক বার। সতী মায়ের পীঠ।"

বিশ্বরূপবাবু যেন শুনতেই পেলেন না। নিজের কথাই বলতে থাকলেন, "বুঝলেন, মংপুতে রবিঠাকুরের সঙ্গে দাদুর অনেক মনের কথা হয়েছিল। শুধু মংপুতে কেন, কালিম্পঙের গৌরীপুর লজের এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী আমার দাদু। সে দিন কবির জন্মদিন। রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করলেন, 'আজ মম জন্মদিন। জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে, দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবন প্রান্তে মম... ' এই দেখুন গায়ে কাঁটা দিচ্ছে মশাই। ভাবতে পারেন, রবীন্দ্রনাথ টেলিফোনে এই আবৃত্তি করেছিলেন আর সেটা সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছিল আকাশবাণী থেকে! সেই দৃশ্য আমার দাদু নিজের চোখে দেখেছিলেন একেবারে রবীন্দ্রনাথের পায়ের সামনে বসে। ভাবতে পারছেন, ভাবলেই আমার গা-টা কী রকম শিরশির করে কাঁটা দিয়ে ওঠে। চোখ বন্ধ করে আমিও যেন দেখতে পাই দাদু চোখের সামনে দেখেছেন এই বিরল দৃশ্য।"

সংযুক্তাদেবী বিশ্বরূপবাবুকে থামালেন, "আরে ওঁরা এত দূর থেকে এসেছেন। কোন ভোরবেলায় বেরিয়েছেন, একটু ফ্রেশ হতে যেতে দাও।"

বিশ্বরূপবাবু বললেন, "সেই কথাটাই তো আমি বলছিলাম। আপনারা ফ্রেশ হয়ে আসুন। তুমি মধুকে লুচি ভাজতে বলো। খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে ভাজে যেন।"

"সব ব্যাপারে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।"

সংযুক্তাদেবী অসীমবাবু আর অপরূপাদেবীকে গেস্টরুমে নিয়ে এলেন। অপরূপাদেবী জানতে চাইলেন, "আমাদের লাগেজটা?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। মধু দিয়ে যাচ্ছে," ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন সংযুক্তাদেবী।

হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচলেন অপরূপাদেবী, "উফ! এদের দেখছি শিরায় শিরায় রবীন্দ্রনাথ বইছে।"

অসীমবাবু বললেন, "এত দিনে বুঝলে?"

"এতটা বাড়াবাড়ি বুঝিনি। সামলাতে পারবে তো? তোমার তো রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে দৌড় ওই আমাদের ছোট নদী থেকে কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি পর্যন্ত।"

"এক বার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আইনস্টাইনের দেখা হওয়ার প্রসঙ্গটা আসতে দাও। ফাটিয়ে দেব। ফিজ়িক্সে গোল্ড মেডালিস্ট আমি।"

"সব জানা আছে। সেই মিউমিউই করবে।"

অসীমবাবু চাপা গলায় বললেন, "গা শিরশির করে ওঠে, কাঁটা দিচ্ছে, কী সব বলছে গো! বসার ঘরে দাদুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনও ছবি দেখলে? দাদু নিয়ে যা বলছেন সব সত্যি নাকি?"

"আমি কী করে জানব? দু'বছর ধরে তো তাই শুনছি। আমার তো অন্য চিন্তা হচ্ছে। বাবুসোনা মানিয়ে নিতে পারবে তো?"

"বাবুসোনা তো আর এখানে থাকবে না। আমেরিকায় থাকবে।"

"আমি ওর হবু শ্বশুর শাশুড়ির কথা বলছি না, মেয়েটার কথা বলছি। মেয়েটা শুনলে তো পছন্দের মেকআপের লোক আসেনি বলে দুর্গাপুর থেকে অন্য মেকআপের লোক আনাচ্ছে। তাও এই সন্ধেবেলার একটা ছোট পার্টির জন্য। তোমাকে অনেক বার বলেছিলাম, এই সব বিয়ে সমানে সমানে হওয়া উচিত।"

"ম্যাট্রিমনিয়াল সাইটে তো বলেছিল পারফেক্ট ম্যাচ। কী করে বুঝব বলো?"

"বুঝবে না মানে? দু'বছর ধরে কম কথা হচ্ছে?"

"সে সব তো ফোনে। মুখোমুখি তো দেখা হয়নি। আর তুমিও তো কম কথা বলনি। তুমি বুঝতে পেরেছিলে? সব সময় সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দাও। আর বাবুসোনারও তো খুব পছন্দ হৈমন্তীকে।"

অসীমবাবুর কথা থেমে গেল। দরজার সামনে মধু এসে ব্যাগপত্তর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অপরূপাদেবী ডাকলেন, "এসো। এই এক দিকে ব্যাগগুলো রেখে দাও। আচ্ছা বাবুসোনা ফিরেছে?"

"কোন বাবুর কথা বলছেন?" মধু জিজ্ঞাসু চোখে জানতে চাইল।

"মানে আমার ছেলে মিতদ্রু..."

মধু উত্তর দেওয়ার আগেই ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল হৈমন্তী। 'আন্টি' বলে অপরূপাদেবীকে জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলল, "কেমন আছ?"

"ভাল," মেয়েটার স্বভাব যেমনই হোক না কেন, মুখটা ভারী মিষ্টি। আর এই মিষ্টি মুখটা দেখেই বাবুসোনা যেমন ভুলেছে, অপরূপাদেবীও তেমন ভুলেছেন। হৈমন্তীর থুতনিটা অল্প নাড়িয়ে চুমু খেয়ে মাথায় হাত বোলালেন অপরূপাদেবী।

"ও স্যরি," হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় হৈমন্তী দু'জনকে প্রণাম করল।

"থাক মা থাক," অসীমবাবু হাতদুটো তুলে বললেন। তার পর জিজ্ঞেস করলেন, "বাবুসোনা, মানে ইয়ে মিতদ্রু ফিরেছে?"

"না, ফোনে কথা হয়েছে। আমি ওকে বলেছি ওয়েট করতে। আমি একটু বেরোচ্ছি, ওকে মিট করে নেব। একটা কাজ আছে। সেটা সেরে ফিরে এসে তোমাদের সঙ্গে অনেক অনেক গল্প করব।"

"কী কাজ?" জিজ্ঞেসই করে ফেললেন অপরূপাদেবী।

"তুমি রাগ করবে না তো, বলো! ও আসলে সিগারেট খেতে বেরিয়েছে। তোমরা সঙ্গে আছ বলে অনেক ক্ষণ খেতে পারেনি তো। তাই আমি বললাম দাঁড়াও তুমি, সিগারেট খাও, আমি আসছি।"

"তুমিও?" অসীমবাবুর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। সংযুক্তাদেবীর মুখটা একটু কঠিন হল।

হৈমন্তী ঠিক ধরতে পারল না। বলল, "আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। সোনাঝুরির মাঠে একটা ফটোশ্যুট করব বিকেলবেলায়। ফটোগ্রাফারকে বলেছি। রাজি হয়েছে। ঝক্কাস আইডিয়া, কী বলো?

লোকেশনটা এক বার মিতদ্রুকে নিয়ে দেখে আসি। আচ্ছা, আমাকে কেমন দেখতে লাগছে তুমি কিন্তু এক বারও বললে না আন্টি?"

অদ্ভুত একটা জংলা ছাপের লম্বা ঝুলের ফ্রক-জাতীয় পোশাক পরেছে হৈমন্তী। দেখে ঈষৎ গম্ভীর গলায় অপরূপাদেবী বললেন,"খুব সুন্দর।"

"রাতে কিন্তু শাড়ি পরব। দেখাব তোমাকে শাড়িটা। তোমারটাও প্লিজ় দেখিয়ো। আচ্ছা, আসি তা হলে!"

হৈমন্তী যেমন ঝড়ের মতো এসেছিল সে রকমই ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল।

কপালে রগদুটো আঙুল দিয়ে চেপে ধরে খাটের উপর ধপ করে বসে পড়লেন অপরূপাদেবী।

তিন

মিনিট দশেকের মধ্যেই টোটোওয়ালা স্নেহাকে একটা হাউজ়িং কমপ্লেক্সের ভেতরে নিয়ে এল। স্নেহা টোটো থেকে নেমে বলল, "একটু দাঁড়াবেন ভাই?"

টোটোওয়ালা গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, "কোথায় যাবেন? আপনি এখানে প্রথম এলেন তো।"

একটু আশ্চর্য হয়ে স্নেহা বলল, "কী করে বুঝলেন?"

"ওই যে আপনি ফোনে বলছিলেন।"

স্নেহা বিরক্ত হল। আজকাল ব্যক্তিগত পরিসর বলে কি কিছুই থাকবে না? টোটোয় আসতে আসতে একটাই ফোন করেছিল। মা-কে। মায়ের সঙ্গে শেষ কথা হয়েছিল যখন, তখন ট্রেনটা গুসকরা স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রেন টাইমে ছিল। সুতরাং মা হিসেব রেখেছিল, কখন প্রান্তিক স্টেশনে নামবে। তার পর প্রায় কুড়ি মিনিট কেটে গিয়েছে এই ঝামেলায়। পৌঁছনোর খবরটা না পেয়ে মা স্বাভাবিক কারণেই বারবার ফোন করছিল। টোটোয় আসতে আসতে মাকে ফোন করেছিল। টোটোওয়ালা বুদ্ধিমান আর কানও খাড়া রাখে। ঠিক বুঝে ফেলেছে।

"কলকাতায় ফেরার ট্রেন কখন আছে?"

টোটোওয়ালা অবাক গলায় বলল, "এই তো এলেন। আজকেই ফিরে যাবেন?" তার পর কলকাতায় ফেরার ট্রেনের সময়গুলো বলে বলল, "আমার মোবাইল নম্বরটা রাখুন। ফোন করবেন। চলে আসব।"

"এক মিনিট দাঁড়ান," স্নেহা অর্ককে ফোন করল। অর্ক মোবাইলটা ধরতেই এক সঙ্গে দুটো গলার আওয়াজ পেল। একটা মোবাইলে, আর একটা একটু দূর থেকে। ওই দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল অর্ককে। একটা হাত তুলে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে বলল, "ও তুমি! নামটা শুনে বুঝতে পারিনি।"

স্নেহার এখন আরও চেনা চেনা লাগছে অর্কর মুখটা। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছে না।

"তুমি বোধহয় এখনও প্লেস করতে পারছ না আমাকে। পার্ক স্ট্রিটে আলাপ হয়েছিল," অর্ক বলল।

পার্ক স্ট্রিট! পার্ক স্ট্রিটে খুব একটা যায় না স্নেহা। দু'-এক বার অনুরাধাদি খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল। সে রকমই কোনও সময়ে আলাপ হয়েছিল কি?

"দিদিভাই ভাড়াটা?" টোটোওয়ালা তাড়া দিল।

"কত?" স্নেহা জানতে চাইল।

টোটোওয়ালা কিছু বলার আগেই অর্ক পকেট থেকে টাকাটা বার করে দিয়ে দিল। অপ্রস্তুত গলায় স্নেহা বলল, "আরে আপনি দিলেন কেন?"

"এত আপনি আপনি করে ফর্মাল হোয়ো না তো। চলো।"

এই কমপ্লেক্সে অনেকগুলো দোতলা বাড়ি। তার একটাতে স্নেহাকে নিয়ে যেতে যেতে বলল, "পার্টি এখানে কয়েকটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে রেখেছে। তার একটাতেই আমরা আছি। তোমাদেরও একটা ফ্ল্যাট আছে। অবশ্য..." অর্ক থেমে গেল।

"কী?"

"অনুরাধা ম্যাডামের সঙ্গে ঝামেলার পর, ওই যে বললাম, পার্টি শুনলাম দুর্গাপুর থেকে মেকআপের অন্য লোক আনছে। গাড়িতে আসছে। এখন তাদের যদি সেই ফ্ল্যাটটা দিয়ে দেয়..." অর্কর মুখটা একটু চিন্তিত দেখাল।

স্নেহা হাসল, "চিন্তা কোরো না। আমি ফিরে যাব। টোটোওয়ালার কাছে ফেরার ট্রেনের টাইম জেনে নিয়েছি।"

অর্ক ঈষৎ উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, "এত দূর এসে চুপচাপ ফিরে যাবে মানে? আরে আমরা তো প্রফেশন্যাল। তুমি এসো। জলটল খেয়ে ঠান্ডা মাথায় পার্টিকে ফোন করে এসেছ বলে রিপোর্ট করো। ওদের কনট্রাক্টে এসেছ। ব্যবস্থা ওদের করতে হবে, ইয়ার্কি নাকি?"

স্নেহাকে নিয়ে ফ্ল্যাটের মধ্যে ঢুকল অর্ক। ঢুকেই খাওয়ার আর বসার জায়গা। প্রথমেই চোখে পড়ল খাওয়ার টেবিলে দুটো বিয়ারের খোলা বোতল।

"আমরা দু'জন আছি। আমি আর সমুদ্র। দাঁড়াও আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। ও বোধহয় স্নানে গিয়েছে। কোল্ড ড্রিঙ্ক খাবে?"

"না। জল পেলে ভাল হয়।"

জলের বোতল এগিয়ে দিয়ে অর্ক বলল, "অনুষ্ঠানটা ঠিক কী জানো?"

গলাটা ভিজিয়ে স্নেহার একটু আরাম হল। জলের বোতলটা নামিয়ে বলল, "প্রিওয়েডিং পার্টি টাইপ কিছু। পিয়ালীদি বলেছে এথনিক থিম।"

"এথনিক?" হেসে উঠল অর্ক, "তোমাকে বলে দেয়নি, রাবীন্দ্রিক। সেটা অবশ্য এথনিক বলে কি না জানি না। উফ, এই বিশ্বরূপ মিত্র। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ করে মাথা খেয়ে ফেলছে। আচ্ছা, আমি রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে কী জানি বলো তো? অ্যাই, তুমি কিছু মনে করবে যদি আমি বিয়ারটা শেষ করি?"

"না, মনে করার কী আছে? খাও।"

"তোমাকেও অবশ্য জিজ্ঞেস করা উচিত, তুমি খাবে?"

"না, আমি খাই না।"

অর্ক বিয়ারের বোতলটা নিয়ে এসে সেন্টার টেবিলের ওপর রেখে মোবাইলটা তুলে নিয়ে বলল, "দাঁড়াও। আগে সবচেয়ে জরুরি ফোনটা করে নিই।"

"কাকে? বিশ্বরূপবাবুকে?"

"না..." স্নেহাকে উত্তর দেওয়া শেষ করার আগেই অর্ক ফোনে কাউকে একটা বলতে শুরু করল, "মধুদা, আমাদের তিনটে লাঞ্চের প্যাকেট লাগবে কিন্তু।"

ফোনটা ছাড়ার পর স্নেহা বলল, "আবার আমার জন্য এই সব ঝামেলা করছ কেন?"

"ঝামেলা মানে? দুপুরে খাবে না নাকি? খাবে এবং আমাদের সঙ্গে সোনাঝুরির মাঠে যাবে। তার পর কলকাতা ফিরে যাওয়ার কথা ভাববে।"

স্নেহা হেসে ফেলল, "মাঠের মধ্যে মেকআপ হবে নাকি?"

"পয়েন্ট! পয়েন্ট!" আবার খানিকটা বিয়ার খেয়ে মোবাইলটা নিয়ে অর্ক বলল, "দাঁড়াও, এই বার আর একটা ফোন করি..." বলে মোবাইলটা নিয়ে ফোনবুক ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে অর্ক বলল, "ভাবছি।"

"কী?"

"ফোনটা কাকে করি? বিশ্বরূপবাবুকে না হৈমন্তীকে।"

"হৈমন্তী কে?"

"কনে। বাপের আদুরি। আমরা তো কাল রাতে এসেছি। সকালে ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম। গিয়ে যা বুঝলাম বাপ মেয়ের মাথা পুরো চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে রেখেছে। পয়েন্ট হচ্ছে, বিশ্বরূপবাবুকে যদি ফোন করি উনি ঝুটঝামেলা এড়াতে তোমার পুরো পেমেন্ট দিয়ে দেবেন। দেদার পয়সা। মাথাই ঘামাবেন না। আর তোমাদের অনুরাধা ম্যাডাম,

সেও এটাই চায়। দেখবে এই সেটলমেন্টটা হয়ে গেলেই অনুরাধা ম্যাডামের মোবাইলটা ম্যাজিক করে অন হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার এই হয়রানির ওপর সুবিচার হবে না।”

স্নেহা বুঝতে পারছে না, অর্কর হঠাৎ ওর ওপর এত দরদ হচ্ছে কেন! সে মেয়ে বলে, নাকি বিয়ারের ঘোরে।

“হৈমন্তীকে দেখেছ? আলাপ আছে? কখনও তোমাদের পার্লারে গেছে?” অর্ক জিজ্ঞেস করল।

“না। মেয়েটার শুনেছি লকডাউনের সময় ফেসবুকে অনুরাধাদির সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ হয়েছিল। অনুরাধাদি সেই সময় পিয়ালীদিকে দিয়ে মেকআপ করার ভিডিয়ো আপলোড করত। তার পর অনুরাধাদিই পিয়ালীদিকে ওদের কলকাতার বাড়িতে পাঠিয়েছিল। মেয়েটা সেই থেকে পিয়ালীদির ক্লায়েন্ট। তবে আমি মেয়েটার ছবি দেখেছি। কেমন সাজতে ভালবাসে পিয়ালীদি বলেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথা শুনিনি।”

“শুনবেও না। রবীন্দ্রনাথ শুধু ওর বাপের সম্পত্তি। আচ্ছা, ছেলেটার ছবি দেখেছ?”

“না।”

“শুনলাম, আমেরিকায় থাকে। খুব শান্তশিষ্ট ভদ্র ছেলে। এই সব একদমই পছন্দ নয়। মেকআপ টেকাপের ধার ধারে না। এই তো কিছু ক্ষণ আগে ডেকেছিল, স্পট দেখাতে। উফ! তখনই বুঝেছি,” হঠাৎ একটু চুপ করে গিয়ে অর্ক উৎফুল্ল হয়ে উঠল, “আইডিয়া!”

তার পর মোবাইলটা নিয়ে হৈমন্তীকে ফোন করল। ও প্রান্তে রিং হওয়ার ফাঁকে স্পিকার মোডে দিয়ে নিচু গলায় স্নেহাকে বলল, “চুপচাপ শুনে যাও কী বলছি।”

হৈমন্তী ফোনটা ধরে বলল, “বলো অর্কদা।”

“হৈমন্তী ম্যাডাম, একটা কথা বলছি, সকালে যে স্ক্র্যাচ ছবিগুলো তুললাম, সেগুলো দেখছিলাম। ম্যাডাম, স্যারের কিন্তু একটু মেকআপ দরকার। মানে কী বলুন তো, কিছু মনে করবেন না। এটা তো আপনাদের লাইফ টাইম মেমারি। ডিজিটাল কারেকশন তো পরের কথা। আগে একটু যদি, মানে একদমই হালকা একটু টাচ আপ করানো যায়, ব্যাপারটা বেশ ন্যাচারাল হত।”

চিন্তিত গলায় হৈমন্তী বলল, “রাজি হবে কি? তখন দেখলে তো! তখন এক বার বললে না কেন? আচ্ছা, শ্যামলীদি এলে দেখছি। যদি বলে রাজি করাতে পারি।”

“শ্যামলীদি কে ম্যাডাম?”

“আরে দুর্গাপুর থেকে যে আমাকে মেকওভার করাতে আসছে। এই তো লাঞ্চের পর বসব।”

“একটা কথা বলব ম্যাডাম? স্যারের ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। ছেলেদের ব্যাপার। অনেক দিন এই লাইনে কাজ করছি। অনেক ছেলেরাই এরকম। মেকআপ টেকআপ করতে চায় না। কিন্তু আমাদের তো কাজটা ঠিক করে করতে হবে। শ্যামলীদিকে আর বিরক্ত করার দরকার নেই। ওই যে অনুরাধা ম্যাডাম যাকে পাঠিয়েছেন, তিনি তো এসে বসে আছেন। ফ্রি-ই আছেন। আপনি বললে আমি দেখে নিচ্ছি।”

একটু চুপ করে থেকে হৈমন্তী বলল, “দেখো যদি রাজি করাতে পারো।”

“থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। যাক কাজটা ভালয় ভালয় হোক। আপনি শুধু খেয়াল রাখবেন, স্যার যেন আপনার অ্যাটায়ারের সঙ্গে ম্যাচ করে পাঞ্জাবি পরেন। ও আচ্ছা, আর একটা কথা। আপনি একটু অনুরাধা ম্যাডামের টিমের থাকার ব্যবস্থাটা দেখে দেবেন।”

“খুব ব্যস্ত আছি জানো তো। আচ্ছা, ড্যাডিকে বলছি।”

ফোনটা ছেড়ে হাত মুঠো করে ঝাঁকাল অর্ক, “ইয়েস।”

স্নেহা চুপ করে শুনছিল। অর্কর এত উৎসাহের কারণ বুঝতে পারল না। অর্ক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “এই সাকসেসটা সেলিব্রেট করার জন্য আর একটা বিয়ার নিয়ে আসি।”

স্নেহার কোথাও একটা খারাপ লাগছিল। অচেনা একটা ছেলে এ ভাবে ওর কাজের জন্য চেষ্টা করছে। বলল, “সাকসেস আদৌ হল কি? আর কেন এত সব করছ? আমি বরং ফিরে যাই।”

অর্ক মাথা নাড়ল, “না, না। এর পরে আর প্রশ্নই ওঠে না।”

“কিন্তু ছেলেটা যদি মেকআপ করতে রাজি না হয়?”

“তখন ভাবা যাবে। আচ্ছা, তুমি নিশ্চয়ই ছেলেটার ছবি দেখোনি?”

“না। এটা তো কাজের মধ্যে ছিল না।”

“দাঁড়াও, সকালে তোলা ছবিগুলো দেখাচ্ছি তোমাকে। মনে মনে একটা প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে পারবে,” অর্ক গলা ছেড়ে বলল, “সমুদ্র, সমুদ্র, ক্যামেরাটা নিয়ে আয় তো।”

স্নেহা দেখল ভেতরের ঘর থেকে, খালি গায়ে বারমুডা পরা সদ্য চান করা একটা ছেলে হাতে একটা ক্যামেরা নিয়ে এসে স্নেহাকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। না, এই ছেলেটাকে স্নেহা আগে কখনও দেখেনি। রোগা পাতলা চেহারা। বয়সটা অর্কর চেয়ে কম। অর্ক আলাপ করিয়ে দিল, “ও হচ্ছে আমার পার্টনার। আমি কিন্তু কাউকে আমার অ্যাসিসট্যান্ট বলি না।” ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে এলসিডি স্ক্রিনটা খুলে ফটো বেছে ক্যামেরাটা স্নেহার দিকে এগিয়ে বলল, “এই দ্যাখো ওদের ছবি, হৈমন্তী আর মিতদ্রু।”

মিতদ্রু নামটা শুনে চমকে উঠল স্নেহা। এই নামে এক জনকেই চেনে। অবশ্য আরও কারও নাম মিতদ্রু হতেই পারে। চুপ করে হাত বাড়িয়ে ক্যামেরাটা নিল স্নেহা।

প্রান্তিক স্টেশনে যখন নেমেছিল তখন একটা কোকিল ডেকেছিল, কুহু কুহু। মনটা ভাল হয়ে উঠেছিল। তার পর নানা ঝামেলায় সেই মনটার আর খোঁজ রাখেনি। এখন মিতদ্রুর ছবি দেখতে দেখতে মনটা কেমন যেন উদাস হতে শুরু করল। কোকিলের কুহু কুহু ডাকটা যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে।

চার

দু’বছর আগে, ২৪ মার্চ ২০২০

“নমস্কার! মেরে প্যারে দেশওয়াসিয়োঁ, ম্যায় আজ এক বার ফির করোনা ভৈসয়িক মহামারী পর বাত করনে কে লিয়ে আপকে বিচ আয়া হুঁ। ২২ মার্চ কো জনতা কার্ফু কো যো সঙ্কল্প হামনে লিয়া থা, এক রাষ্ট্র কে নাতে উসকি সিদ্ধি কে লিয়ে হর ভারতবাসী নে পুরে সমাধান সিধ্ধা কে সাথ, পুরে জিমেদ্দারি কে সাথ, আপনা যোগদান দিয়া। বাচ্চে, বুড়ে, ছোটে, বড়ে, গরিব...”

বাঁ হাতের চেটোয় এয়ারপোর্ট থেকে লাগানো নিভৃতবাসে থাকার তারিখের স্ট্যাম্পটা দেখে রিমোটের বোতাম টিপে টিভিটা বন্ধ করে রিমোটটা সোফার ওপর ফেলে দিল মিতদ্রু। প্রধানমন্ত্রী যে আজ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন, সকাল থেকেই টিভির সব চ্যানেলে বলছিল। কয়েক দিন আগে আর এক বার প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিয়েছিলেন। ২২ মার্চ জনতা কার্ফুর কথা বলেছিলেন। তার পর করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন যে সব ডাক্তার, নার্স, হাসপাতালের কর্মী, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধা জানাতে হাততালি, ঘণ্টা, আর কিছু না পেলে থালা বাজাতে বলেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বান নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পক্ষে-বিপক্ষে মতামতের অনেক ঝড় বয়ে গেলেও মিতদ্রুর কিন্তু ভালই লেগেছিল।

আমেরিকা থেকে এসে মিতদ্রু এখন সরকারি নিয়মে গৃহবন্দি। সম্পূর্ণ হোম আইসোলেশন কোয়ারেন্টাইন। বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই। কোনও উপসর্গ না থাকলেও প্রশাসন থেকে দু’বেলা খবর নেয়। ফ্ল্যাটটা কোম্পানির ভাড়া নেওয়া গেস্ট হাউস। ভাগ্য ভাল বাড়িওয়ালা এখানে কোয়ারেন্টাইনে থাকার অনুমতি দিয়েছেন। এই পর্বটা চুকে গেলেই মিতদ্রুর ইচ্ছে আছে শ্যামনগরে বাবা-মায়ের কাছে চলে যাবে। কিন্তু এখন পৃথিবী জুড়ে সব কিছুতেই একটা ডামাডোলের অবস্থা চলছে। সব দেশের শেয়ার মার্কেট তলানিতে। এত সব কিছুর

বারান্দায় আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মিতদ্রু। রাজ্যে লকডাউন শুরু হওয়ার আগেই যেহেতু হোম কোয়ারেন্টাইন শুরু হয়ে গিয়েছিল, তাই অ্যাপে অর্ডার দিয়ে ফ্রিজ ভর্তি নানা রকম খাবার আনিয়ে রেখেছে। ভাত, ডাল থেকে আরম্ভ করে শুক্তো, চিতল মাছের মুইঠ্যা... যা যা খেতে ভালবাসে সব। প্রথম প্রথম কয়েক দিন বেশ আয়েশ করেই খেয়েছিল। তার পর একধরনের একঘেয়েমি, কুঁড়েমি এসে গেছে। যত দিন যাচ্ছে, ফ্রিজ থেকে বের করে মাইক্রোওয়েভে খাবার গরম করে খেতেও আলিস্যি আসছে। খাবারগুলোও ক্রমশ কেমন যেন পানসে হয়ে যাচ্ছে। বরং এই এক চিলতে বারান্দায় সময় কাটাতেই বেশ ভাল লাগে এখন।

বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিল মিতদ্রু। জলা জায়গাটার ওপর চাঁদের চিকচিকে আলো দেখার মধ্যে একটা সম্মোহন আছে। ওই দিকেই উদাস চোখে তাকিয়ে ছিল। তার পর হঠাৎ চোখে পড়ল রাস্তার উল্টো দিকে কোনাকুনি একটা বাড়ির বারান্দায়। ওখানে একটি ছায়া ছায়া মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চেয়েও মিতদ্রুর বেশি চিন্তা মা-বাবাকে নিয়ে। বয়স হয়েছে। কোনও রকম ঝুঁকি সে নিতে চায় না।

নিউ টাউনের যে ফ্ল্যাটে মিতদ্রু গৃহবন্দি, সেই পাড়াটা এমনিতেই নিঝুমপুরী। লম্বা রাস্তার দু'দিকে সার দিয়ে পরপর হাউজ়িং সোসাইটি। সব চার তলার। প্রত্যেক তলায় দুটো করে ফ্ল্যাট। কিন্তু এমনিতেই এই জায়গায় অধিকাংশ ফ্ল্যাটে কোনও আবাসিক নেই। লোকেরা বিনিয়োগ করার জন্য ফ্ল্যাটগুলো করে রেখেছে। কারও দ্বিতীয়, কারও তৃতীয় সম্পত্তি। যে ক'জন মানুষজন থাকেন, তাঁদের অধিকাংশই মিতদ্রুর মতো ভাড়াটে। কোনও কোনও ফ্ল্যাটে দু'-তিন জন পিজি করে থাকেন। কাছাকাছি আইটি সেক্টরে কাজ করেন। অফিসের পুলকারে তাঁরা নিঃশব্দে বেরিয়ে যান, নিঃশব্দে ফেরেন। পাড়াটা সারা বছর নিঝুমই পড়ে থাকে।

মিতদ্রুর মাঝে মাঝে খুব জানতে ইচ্ছে করে সত্যিই এই পাড়ায় কত জন থাকেন। তারই কিছুটা আন্দাজ পেয়েছিল ২২ তারিখ। বিকেল পাঁচটার সময় অনেকে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। হাততালি দিয়েছিলেন, থালা বাজিয়েছিলেন। কয়েক জন কিছু না পেয়ে হাতা দিয়ে গ্রিল বাজিয়েছিলেন। কেউ এক জন মঙ্গল কামনায় শাঁখও বাজিয়েছিলেন।

নোভেল করোনার এই কঠিন সময়ে গোটা দেশকে সাহসী, সতর্ক থাকতে হবে। টিভিতে এখন প্রধানমন্ত্রী হয়তো সেই বার্তাই দিচ্ছেন। কলকাতায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা গতকাল ছিল দুই, আজ তার দ্বিগুণ হয়েছে। এমনিতেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পরশু বিকেল পাঁচটা থেকে পশ্চিমবঙ্গে পাঁচ দিনের লকডাউন ঘোষণা করেছেন। অবশ্য তার আগে থেকেই মিতদ্রু হোম কোয়ারেন্টাইনে আছে। এয়ারপোর্টে বাঁ হাতের চেটোর ওপর একটা বেগুনি স্ট্যাম্প দিয়ে দিয়েছে। চোদ্দো দিনের হোম কোয়ারেন্টাইন। হাতের ওপর তারিখটা দেখলেই বিরক্তি হয় মিতদ্রুর। প্রত্যেক দিন সকালে উঠে হাতের চেটোটা দেখে হিসেব করে আরও কত দিন গৃহবন্দি থাকতে হবে। আজ হিসেব করেছে, আরও সাত দিন।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা কিছুটা শুনেই মাঝপথে টিভিটা বন্ধ করে সোফাতেই চুপ করে বসেছিল মিতদ্রু। এমন সময় মোবাইলে একটা কল আসতে শুরু করল। সিএলআই-তে নামটা দেখল, বাসু। কোনও রাজনৈতিক দলকেই পছন্দ করে না। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতাটা হয়তো এখনও শেষই হয়নি, বাসুর ফোন করা শুরু হয়ে গেল। ওর এই স্বভাব। বক্তৃতাটা শুনতে শুনতেই জনে জনে ফোন করবে, নিজের বিশ্লেষণ শোনাবে। ফোনটা না ধরে বারান্দায় এল মিতদ্রু।

গ্রিলে ঘেরা এক চিলতে বারান্দা। রাত্রিবেলায় এই নিঝুম বারান্দায় অনেক ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে মিতদ্রু। ভাগ্য ভাল, এই বাড়িটার সামনে এখনও বাড়ি হয়নি। প্লটটা ফাঁকা। চারতলার বারান্দা থেকে এই ফাঁকা প্লটটার জন্য বেশ চোখের আরাম পাওয়া যায়। কিছুটা দুরে একটা জলা। আকাশে চাঁদ ফুটে থাকলে জ্যোৎস্নার আলো ওখানে চিকচিক করে। এই পাড়াটা নিউ টাউনের এক প্রান্তে। এর পরেই গ্রাম। কেউ বিশ্বাসই করতে পারবে না এরকম একটা ঝাঁ চকচকে নতুন শহরের গায়ে লেপ্টে আছে ছবির মতো একটা গ্রাম।

বারান্দার গ্রিলে নাক ঠেকিয়ে রাস্তার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চোখ বোলাল মিতদ্রু। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু কিছু ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। আর একটু রাত্রি হলে আলোগুলো একে একে নিভে যাবে। থাকবে শুধু স্ট্রিট লাইটের আলো। এই বারান্দায় সিগারেট খেতে আসা ছাড়া আর কখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে এত সব লক্ষ করেনি। অফিস বলেছে এই হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার সময় 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' করতে। অফিসের সার্ভারের পুরো অ্যাক্সেস আছে। কিন্তু মিতদ্রুর অধিকাংশ ক্লায়েন্টই ইউরোপের। ইউরোপের অবস্থা এখন বেশ খারাপ। ইতালি আর স্পেনের তো কথাই নেই। লকডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে ইউরোপের এক একটা দেশে। ফলে সে রকম ক্লায়েন্ট কলই নেই। আর এই ফ্ল্যাটটাও সে রকম। সময় কাটানোর প্রায় কিছুই নেই। কলকাতায় থাকলে এই ফ্ল্যাটটা রাতে ঘুমনোর একটা ট্রানজ়িট ফ্ল্যাট।

পাঁচ

স্নেহা বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে দেখল খাবার টেবিলের ওপর তিনটে বড় সাদা প্যাকেট নামানো আছে। অর্ক আর সমুদ্র টেবিলে বসে অপেক্ষা করছে। স্নেহাকে দেখেই বলল, "চলো, চটপট লাঞ্চটা করে নিই। বিয়ারটা খেয়ে একটু ঝিম লাগছে। ঘণ্টাখানেক পাওয়ার ন্যাপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। ক্লায়েন্ট গাড়ি পাঠিয়ে দেবে। পৌঁছতে বেশি সময় লাগবে না।"

স্নেহা নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "কথা বলেছ?"

প্যাকেট খুলতে খুলতে অর্ক বলল, "তোমার সামনেই বললাম তো।"

"আমি মেয়েটার কথা বলছি না। ছেলেটার কথা বলছি। মিতদ্রু।"

"না, কী কথা বলব?"

"ওই যে তুমি বললে রাজি হওয়ার কথা।"

"আরে ছেলেটার ফোন নম্বরই নেই আমার কাছে। ও তুমি চিন্তা কোরো না। কিছু জিনিস স্টেজে মারতে হয়।"

স্নেহা নিজের মোবাইলটা খুলে আনমনা হয়ে ঘাঁটতে থাকল। সমুদ্র প্যাকেটটা খুলে বেজার মুখে বলল, "সেই কাল রাতেরই মেনু অর্কদা।"

অর্ক হাসতে হাসতে বলল, "মনে হয় রাতে এক্সট্রা প্যাকেট ছিল। ফ্রিজে রেখে দিয়েছিল। সেগুলোই পাঠিয়ে দিয়েছে ওই মধু ব্যাটা। যা পাচ্ছিস খেয়ে নে।"

স্নেহা তখনও প্যাকেট খোলেনি দেখে অর্ক বলল, "আরে তুমি খাবে না নাকি? খিদে পায়নি? শুরু করো, শুরু করো। তুমিও তো একটু রেস্ট নেবে, নাকি? এতটা ট্রেন জার্নি করে এসেছ। এখানে দুটো বেডরুম আছে। সমুদ্র আমার ঘরটায় চলে আসবে। তুমি ওই ঘরটায় চলে যেয়ো।"

প্যাকেটটা দেখে স্নেহার ভেতরটা কেমন একটা করছে। খানিকটা অযাচিত ভাবে ভিক্ষে চাওয়ার মতো প্যাকেটটা যেন পাওয়া। খিদে পেলেও প্যাকেটটা দেখে খাওয়ার ইচ্ছেটা চলে গিয়েছে। জোর করেই প্যাকেটটা খুলল। ভেতরে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের ছোট ছোট কন্টেনার। ফ্রায়েড রাইস, মাংস থেকে চাটনি মিষ্টি সবই একটু একটু আছে। সমুদ্র আর অর্ক তত ক্ষণে খেতে শুরু করে দিয়েছে। স্নেহা বলল, "আমি এত খেতে পারব না।"

"ঠিক আছে। যতটা পারো খাও, শুরু করো।"

স্নেহার মাথায় একটাই নাম ঘুরছে। মিতদ্রু। মিতদ্রুর হোয়াটসঅ্যাপে ডিপির সঙ্গে অর্কর ক্যামেরায় দেখা ছবিটা মিলে গিয়েছে। সেই থেকে মনের মধ্যে একটা ঝড় বইছে। বাইরে সেটা কিছুতেই প্রকাশ করতে দিচ্ছে না। শান্ত ভাবে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলগুলো খুলে একটু খুঁটে খুঁটে

খেতে আরম্ভ করল স্নেহা।

"তোমাদের সোনাঝুরি মাঠে কাজটা কত ক্ষণ?" স্নেহা জানতে চাইল।

"চারটেয় শুরু করলে ঘণ্টাখানেক মতো। কেন?"

"না, ভাবছি যদি ওরা কাজ করতে না রাজি হয় তা হলে প্রান্তিক থেকে লাস্ট ট্রেন ক'টায় পাব।"

"সে যদি একান্তই আজকে কলকাতায় ফিরে যেতে চাও, প্রান্তিকে না পেলে বোলপুরে চলে যাবে। অনেক ট্রেন পাবে। আমরা তো কালকে বোলপুর হয়েই এসেছি। আর আগেই ভেবে নিচ্ছ কেন, রাজি হবে না!"

"সেটা তুমিই তো বললে। তোমার যেমন অভিজ্ঞতা, আমারও তেমনই অভিজ্ঞতা। যে ছেলেরা মেকআপ করতে রাজি হয় না, তাদের অত সহজে রাজি করানো যায় না।"

সমুদ্র বলল, "কী বলো তো স্নেহাদি, এই ছেলেটা কিন্তু একটু নরম ধরনের। ব্যক্তিত্ব আছে। কিন্তু খুব জেদি টাইপের মনে হয় না। আর হবু বউয়ের কথা মেনে নেয়। হবু বউয়ের প্রেমে লাবুডুবু লাবুডুবু হয়ে আছে।"

সমুদ্র আর অর্ক হাসতে থাকল। স্নেহার হাতের গ্রাসটা কেন যেন আটকে গেল। অর্ক সেটা খেয়াল করে বলল, "তুমি থেকে থেকে এরকম ভাবুক হয়ে ওঠো কেন বলো তো?"

নিজেকে সামলে নিয়ে স্নেহা বলল, "না..."

"আসলে তখন আমাদের সে রকম সাপোর্ট পায়নি। আমরাও জোর করিনি। সকালে তো মেকআপের ব্যাপার ছিল না। লোকেশন দেখতে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম যেটুকু ঠিকঠাক করার, ডিজিট্যালি করে দেব। এখন অবশ্য অন্য ব্যাপার।"

স্নেহার মোবাইলে 'টুং' করে একটা মেসেজ এল। বাঁ হাত দিয়ে মোবাইলটা তুলে মেসেজটা পড়ে মেজাজটা আরও বিগড়ে গেল। অনুরাধাদি ছোট্ট দু'লাইনের মেসেজ লিখেছে, 'আমি জানি তুই ঠিক ম্যানেজ করে দিতে পারবি। বাকি ব্যাপারটা আমি বুঝে নেব। মাথা গরম করিস না।' তার পর কয়েকটা ইমোজি। অনুরাধাদি আসলে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বরাবরের যা স্বভাব। অনলাইন আছে কিন্তু কথা বলার সাহস নেই।

স্নেহার মুখটা দেখে অর্ক বলল, "আবার কী হল তোমার?"

"কিছু না। কী যেন তখন বলতে যাচ্ছিলে সন্ধেবেলার প্রোগ্রামের ব্যাপারে?"

"শোনো, পাঁচ বছর এই লাইনে কাজ করছি। বিয়ে ছাড়াও অনেক আশীর্বাদ মেহেন্দি সঙ্গীত কভার করেছি। কিন্তু এ রকম বিচিত্র পার্টি আমি আগে দেখিনি। সকালবেলায় বিশ্বরূপবাবুর সঙ্গে কথা বলে যেটা বুঝেছি, সন্ধেবেলায় যেটা হবে সেটা সঙ্গীত, তবে রবীন্দ্রসঙ্গীত। বিয়ের আগে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর তুমি আগে কখনও শুনেছ?"

"না," স্নেহা মাথা নাড়ল, "লোকজন কত হবে?"

"সংখ্যাটা তো আমাদের বলেনি। তবে খুব বেশি হবে বলে মনে হয় না। ম্যারাপ প্যান্ডেল কিছুই তো বাঁধা হয়নি। যা হবে বাড়িতে। আসল ব্যাপারটা বুঝেছি, কিছু লোকজনকে রবীন্দ্রপ্রেম দেখানো। না হলে তো নিজেকে এলিট বাঙালি প্রমাণ করা যায় না। ও দিকে হৈমন্তী বাবাকে 'ড্যাডি' বলে ডাকে আর খিচুড়ি চচ্চড়ি বাংলা বলে। যাকগে, আমাদের কাজ ফটো শ্যুট করে দেওয়া যার ফ্রেমে ফ্রেমে লেপ্টে থাকবে রবীন্দ্রপ্রেম আর তার পর একটা অ্যালবাম করে দেওয়া। আমি তো বুঝেই পেলাম না, আমাদের এক দিন আগেই বা ডাকল কেন আর তোমাকে ফিরিয়ে দিতে চাইছে কেন?"

"বললাম না, মেয়েটা পিয়ালীদির ক্লায়েন্ট। যাক গে, বাদ দাও। আমেরিকায় থাকে বললে না ছেলেটা?"

"তাই তো শুনলাম। বিয়েটা নাকি অনেক দিন আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছে। দু'হাজার কুড়িতে হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। লকডাউনের চক্করে হতে পারেনি। তার পর ছেলেটাও আমেরিকা ফিরে গিয়েছিল। কী সব ভিসার সমস্যার জন্য আসতে পারেনি। এই বছর জানুয়ারিতে বিয়ে ঠিক হয়েছিল। তখন আবার থার্ড ওয়েভ। এবার একবার শিওর শট। আভি নেহি তো কভি নেহি।"

"তোমাকে এত সব বলল?"

"আরে আমাকে কি আর বলে! মেয়েটার ড্যাডি মোবাইলে এক জনের সঙ্গে কথা বলছিল। তখন সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ইনফো পেয়ে গেলাম!" অর্ক হাসতে থাকল, "কথা বলতে আরম্ভ করলে ভরভর করে সব বলে রবীন্দ্রনাথ দিয়ে শেষ করে। তুমি আর চিন্তা করো না। রাজি হয়ে যাবে। মেয়েটার মাথার ট্যালা পোকাটা নাড়িয়ে দিয়েছি। তোমার তো বেশি কিছু করার নেই। ওই মুখে একটু কমপ্যাক্ট ট্যাক্ট লাগিয়ে দেবে।"

"রাস্তায়? মানে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে?"

"আরে না। ওদের একটা বড় এসইউভি আছে। কাচগুলোতে কালো ফিল্ম লাগানো। প্রাইভেসি পাবে। আচ্ছা শোনো, পাঁচটার মধ্যে সোনাঝুরির কাজটা শেষ হয়ে গেলে তার পরে আবার সাতটা থেকে কাজ। মাঝে ঘণ্টা দুয়েক সময় পাব। তোমার মতো আমরাও প্রথম বার শান্তিনিকেতন এলাম। তাও আবার এই প্রান্তিকে। ঠিক করেছি ওই দু'ঘণ্টা একটু বাইরে থেকেই না হয় বিশ্বভারতী দেখে নেব। তার পর ভুবনডাঙার মাঠটা দেখতে যাব। যাবে তো?"

স্নেহা খাওয়া থামিয়ে অর্কর চোখের দিকে চেয়ে বলল, "কলকাতায় ফিরে যাব না ভুবনডাঙার মাঠ দেখতে যাব, সবটাই নির্ভর করছে ওই মিতদ্রুর রাজি হওয়ার ওপরে।"

ছয়

দু'বছর আগে

বারান্দায় কত ক্ষণ আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিতদ্রুর খেয়াল নেই। বাইরে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। ঝিম ধরে যাচ্ছে। সংবিৎ ফিরল ঘরের মধ্যে ডোরবেলের আওয়াজে।

দরজার বাইরে ক্যামেরা লাগানো আছে আর ভেতরে চৌকাঠের এক পাশে এলসিডি স্ক্রিন। সুইচ টিপতেই গোবিন্দর মুখটা ভেসে উঠল। গোবিন্দ এই বাড়ির কেয়ারটেকার। অল্পবয়সি। হাসনাবাদের দিকে কোথাও একটা থাকে। সেখানে পোয়াতি বউ আছে। ফ্ল্যাটটা পরিষ্কার করা থেকে রান্নাবান্না করার জন্য কোম্পানি থেকে এক জনকে রাখা আছে। মিতদ্রু যেহেতু কোয়ারেন্টাইনে আছে, সে তাই স্বাভাবিক কারণেই নেই। এখন টুকটাক দরকারে গোবিন্দই ভরসা। মিতদ্রু এ সব ফাইফরমাশ খেটে দেওয়ার জন্য বকশিশ দেয়। গোবিন্দ তাতেই খুশি। অবশ্য হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার সময় গোবিন্দকে এক বারও ফ্ল্যাটের মধ্যে আসতে দেয়নি মিতদ্রু।

দরজা না খুলে স্পিকারে মিতদ্রু বলল, "বল গোবিন্দ।"

গোবিন্দ ঈষৎ উত্তেজিত গলায় বলল, "দরজাটা এক বার খুলবেন?"

"খুব বিশেষ প্রয়োজন কি?"

"শুনেছেন?"

"কী শুনব?"

"প্রধানমন্ত্রী আজ রাত্রি বারোটা থেকে একুশ দিনের জন্য গোটা দেশে লকডাউন ঘোষণা করেছে।"

মিতদ্রু একটু টানটান হয়ে উঠল। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুরুটা একটু শুনেই টিভিটা বন্ধ করে দিয়েছিল। একুশ দিনের লকডাউন! দেশে করোনা রোগীর সংখ্যা ঢিমে তালে বাড়লেও এই আশঙ্কাটা ছিল। সবাই বলছিল কেরল আর মহারাষ্ট্রে লকডাউন হবে। তবে গোটা দেশে লকডাউন ব্যাপারটা একটু যেন আকস্মিকই।

"দরজাটা এক বার খুলবেন?" স্ক্রিনে গোবিন্দর মুখটা চঞ্চল দেখাচ্ছে।

দরজার পাশেই জুতোর র‍্যাকের আলমারিটার ওপর রাখা আছে স্যানিটাইজারের হ্যান্ড পাম্প লাগানো বোতল, এন-৯৫ মাস্ক, ফেস শিল্ড আর রবারের দস্তানা। মিতদ্রু সেগুলো পরে নিয়ে দরজাটা খুলে পিছিয়ে এল। গোবিন্দ দরজার বাইরেই দূরত্ব মেনে থাকল। তবে মুখোমুখি

কথাবার্তা বলতে পেরে যেন একটু স্বস্তি পেল।

“দাদা, আমি দেশে বেরিয়ে যাচ্ছি।”

মিতদ্রু বিস্মিত গলায় বলল, “দেশে যাচ্ছিস? কী করে যাবি? রাজ্যে লকডাউন, নাইট কার্ফিউ চলছে। তার পর তো বলছিস রাত্রি বারোটা থেকে দেশ জুড়ে লকডাউন হবে।”

গোবিন্দ বলল, “আমাদের দেশের কয়েক জন এখানে থাকে দাদা। দেশ থেকে টাটা মেমোরিয়ালে একটা অ্যাম্বুলেন্স এসেছিল। রাতে ফিরে যাবে। আমাদের নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে। এর পরে আর কিছুই পাব না।”

মিতদ্রু বোঝানোর চেষ্টা করল, “শোন গোবিন্দ, এই সময় অ্যাম্বুলেন্সে এ ভাবে গাদাগাদি করে যাওয়া উচিত নয়। যদি এক জনেরও সংক্রমণ হয়ে থাকে সবার মধ্যে ছড়াবে।”

গোবিন্দ ছটফট করে উঠে বলল, “উপায় নেই দাদা। বলেছিলাম না আপনাকে, আমার বউয়ের ভরা মাস। এর পর আর কোনও ব্যবস্থা হবে না। যেতে আমাকে হবেই। আপনাকে মেন গেটের চাবিগুলো দিতে এলাম।”

“আমাকে কেন?” ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল মিতদ্রু।

“কারণ আর কেউ নেই এই বাড়িতে।”

এই বাড়িতে আটটা ফ্ল্যাট। মিতদ্রু জানে আরও দুটো পরিবার ভাড়া থাকে। মিতদ্রুর ধারণা ছিল তারা এই বাড়িতেই আছে। হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার জন্য গোবিন্দও আসেনি, ফ্ল্যাটের অন্য বাসিন্দাদের খোঁজখবরও কিছু পায়নি মিতদ্রু।

“বাকিরা কোথায় গেল?”

“সবাই তো দিদির লকডাউন বলার সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়েছে। আপনি জানতেন না?”

“না রে!”

গোবিন্দ পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে জিজ্ঞেস করল, “কোথায় রাখব দাদা?”

“এত চাবি কিসের?”

“এই বাড়ির মেন গেট থেকে ছাদের দরজা, পাম্প ঘর, আমার কোয়ার্টারের ডুপ্লিকেট সব চাবি আছে।”

অগত্যা মিতদ্রু ইশারায় জুতোর র‍্যাকটা দেখিয়ে বলল, “ওখানে রেখে হাতে স্যানিটাইজ়ার নিয়ে নে।”

গোবিন্দ হাত বাড়িয়ে আলগোছে চাবিগুলো জুতোর র‍্যাকের ওপর রেখে হাতের তালুতে স্যানিটাইজ়ার নিয়ে ঘষতে ঘষতে বলল, “আমি তা হলে আসছি দাদা।”

“রাস্তায় যাবি, পুরো স্যানিটাইজ়ারের বোতলটাই নিয়ে নে। তবে শোন গোবিন্দ, আমি কিন্তু তোকে পারমিশন দেওয়ার মালিক নই। এটা একটা কোঅপারেটিভ ফ্ল্যাট। জানিস তো, এই ফ্ল্যাটটা আমাদের কোম্পানির ভাড়া নেওয়া। আমি যত দূর জানি কোঅপারেটিভ ফ্ল্যাটের এক জন সেক্রেটারি আছেন। তিনিই তোকে ছুটি দেওয়ার মালিক। কথা বলেছিস?”

“পালবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি দাদা। প্রথমে যেতে দিতে চাইছিলেন না। কিন্তু আমাকে যেতে হবেই। দরকার হলে চাকরি ছেড়েই যেতে হবে দাদা। পরিবার আগে। তখন উনিই বললেন তা হলে চাবিগুলো আপনাকে দিয়ে যেতে।”

“আমাকে?” মিতদ্রু খুব অবাক হল। ও এই বাড়ির কাউকে চেনে না। পালবাবু, এই কোঅপারেটিভের সেক্রেটারি, নামটা কয়েক বার গোবিন্দর মুখে শুনলেও ভদ্রলোককে কখনও চোখে দেখেনি। কোন ফ্ল্যাটের মালিক, তাও জানে না। গোটা বাড়ির এ ভাবে দায়িত্ব নিয়ে নেওয়াটা একটা বড় ব্যাপার। অফিসে এইচআর-কে জানাতে হবে। তবে এ সব গোবিন্দকে বলে লাভ নেই। গোবিন্দ এখন বাড়ি যাওয়ার জন্য মরিয়া।

একটু বিরক্ত মুখে মিতদ্রু বলল, “কী আর বলব বল!”

“দাদা, আপনাকে বিশেষ কিছু করতে হবে না। ট্যাঙ্কে জল উপচে ভর্তি করে দিয়েছি। আপনি একলা মানুষ, কতটুকু আর খরচ হবে! ফুরিয়ে গেলে পাম্পটা এক বার চালিয়ে নেবেন। আর পেছনের কোয়ার্টারে কোঅপারেটিভের কেয়ারটেকারের বউ কান্তাবউদি আছে। তাকে বলে রেখেছি। আপনাকেও নম্বরটা মোবাইলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিছু দরকার হলে ফোন করবেন। এনে দেবে।”

মিতদ্রু হেসে বলল, “অনেক ব্যবস্থাই করে এসেছিস দেখছি।”

গোবিন্দ একটু চুপ করে থেকে ইতস্তত গলায় বলল, “একটা কথা বলব দাদা? কিছু টাকাকড়ি হবে আপনার কাছে? মানে ধার। মাইনে পেলে শোধ দিয়ে দেব। মানে বুঝতেই পারছেন, এখন কবে কোথায় কী টাকাকড়ি পাব...”

“তোর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে না?”

“আছে দাদা।”

“ব্যাঙ্কের ডিটেলস আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দে। পাঠিয়ে দিচ্ছি। এটিএম থেকে তুলে নিস।”

গোবিন্দকে একটু নিশ্চিন্ত দেখাল। যাওয়ার আগে বলে গেল, “আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে যাব দাদা। তার পর আপনি নীচে নেমে এসে মেনগেটের তালাটা ভেতর থেকে লাগিয়ে দেবেন। ১৫৫ নম্বর চাবি।”

গোবিন্দ বেরিয়ে যাওয়ার পর গভীর হতাশায় ডুবে গেল মিতদ্রু। আজ রাত্রি থেকে আবার ২১ দিনের লকডাউন। হিসেব করে দেখল লকডাউন শেষ হবে সেই ১৪ এপ্রিল। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে মোবাইলটা হাতে তুলে নিয়ে দেখল ১১টা মিস্‌ড্ কল। মিতদ্রুর মোবাইল সাইলেন্ট মোডে রাখার অভ্যেস। তাই শুনতে পায়নি। এখন দেখছে মিস্‌ড্ কলগুলোর চারটে বাবার, তিনটি মায়ের, দুটো বাসুর আর দুটো হৈমন্তীর। বুঝতে পারল সবাই এখন ২১ দিনের খবরটা জানাতে উদ্‌গ্রীব।

বাবাকেই আগে ফোনটা করল। আজকাল ফোন করতে গেলেই বিরক্ত লাগে। উল্টো দিকে শুরু হয়ে যায় খকখক করে কাশির শব্দ। তার পর নোভেল করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে সতর্কবাণী। কাশির শব্দটা অসহ্য। যেন কানের কাছে একটা করোনা রোগী। তবে সেটা বেশি ক্ষণ সহ্য করতে হল না। ফোনটা ধরেই বাবা খুব উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল, “কোথায় ছিলি বাবুসোনা?”

“স্যরি বাবা। ফোনটা সাইলেন্টে থাকে তো, খেয়াল করিনি।”

“শুনেছিস তো? আজ মাঝরাত থেকে ২১ দিনের লকডাউন।”

“এই শুনলাম।”

“কী করবি এ বার? বাড়ি চলে আসবি?”

“কী করে যাব বাবা? একে লকডাউন। তার ওপর আমি নিজেই হোম কোয়ারেন্টাইনে আছি। সেটা শেষ হতে আরও সাত দিন বাকি।”

বাবার গলাটা আরও চিন্তিত হল, “কিন্তু ওই খাঁ খাঁ জায়গাটায় কী করে থাকবি? ওখানে তো কিছুই পাওয়া যাবে না। কোনও রকমে একটা ব্যবস্থা করে এখানে চলে আয়। আমরাও নিশ্চিন্ত হই। বল না তোর অফিস যদি একটা গাড়ি আর পুলিশের পারমিট জোগাড় করে দেয়। তোর তো কিছু হয়নি বাবুসোনা। জ্বর নেই। গলা ব্যথা নেই। প্রশাসন ফোনে খোঁজ নিচ্ছে দু’বেলা। এখানে এলেও নেবে।”

“কিছু হয়েছে না হয়নি, সেটা আরও সাত দিন গেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। তবে তার পরেও তোমার ওখানে গেলে বিপদ আছে বাবা।”

“কিসের বিপদ?”

“বিদেশ থেকে কেউ ফিরলে এখন তাদের অনেকেই গণশত্রু ভাবছে। কলকাতার প্রথম করোনা রোগী তো বিদেশ থেকেই এসেছিল। পাড়ায় তো সবাই জানে আমি আমেরিকা থেকে ফিরেছি। সে আমি যতই চোদ্দ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে কাটিয়ে ফিরি না কেন, লোকে কিন্তু আমাকে শত্রুই ভাববে। টিভিতে দেখছ না? গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে এই সমস্যা চলছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে আমি বাড়ি ফেরা উচিত হবে না। এখানে অন্তত সেই বিপদটা নেই। কেউ জানে না আমি আমেরিকা থেকে ফিরেছি। আমার বাড়িওয়ালা জানলেও আপত্তি করেননি। এখানে আসেনও না। মাস পয়লায় আমাদের কোম্পানি থেকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ভাড়া ঢুকে গেলেই খুশি। খুব শান্তিতে আছি বাবা এখানে।”

বাবা কোনও উত্তর দিতে না পেরে মা-কে ফোনটা ধরিয়ে দিল। মায়েরও সেই এক চিন্তা। কী খাবে? কে রান্না করবে? শরীর খারাপ হলে কে দেখাশোনা করবে? বাবা মায়ের বয়স হয়েছে। বাবা শুগারের, মা প্রেশার-থাইরয়েডের রোগী। একগাদা মিথ্যে কথা বলে মা-কে আশ্বস্ত করল মিতদ্রু। ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দিল না একটু পরেই গোবিন্দ দেশে চলে যাচ্ছে, তার পর এই বাড়িটায় মিতদ্রু সম্পূর্ণ একা থাকবে।

মায়ের পরে আবার বাসু। সবাইকে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলে ফোনটা রাখার পর ভীষণ ক্লান্ত লাগল মিতদ্রুর। এখনও কল রেজিস্টারে আর এক জনের মিসড কল জমে আছে। হৈমন্তীর। কিন্তু আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না মিতদ্রুর। সোফায় আধশোয়া হয়ে টিভির রিমোটটা টিপল। প্রধানমন্ত্রী যে বক্তৃতাটা দিয়েছিলেন তারই রিপিট টেলিকাস্ট চলছে এখন।

সাত

দু'ঘণ্টা আগে

মোবাইলটা ছেড়ে হৈমন্তী বলল, "উফ! বাবুসোনাটা আমার! তোমার জন্য তোমার মা আর হবু মা দু'জনেই খুব চিন্তিত, বেচারি বাবুসোনাটার খাওয়া হয়নি বলে। কী হবে বলো তো?" খিলখিল করে হেসে উঠল হৈমন্তী।

মিতদ্রু ঘড়ি দেখল। এক ঘণ্টার ওপর হৈমন্তীর সঙ্গে ঘুরছে। কোথায় ঘুরছে, কেন ঘুরছে কিছুই বুঝতে পারছে না। দিশাহীন। এখানে আসা অবধি হৈমন্তীদের বাড়িতে যায়নি। ওর মা-বাবার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত হয়নি। ব্যাপারটা যথেষ্ট দৃষ্টিকটু। একটু ক্লান্তও লাগছে।

হৈমন্তী বলল, "কাল থেকে বাড়িতে দক্ষযজ্ঞ চলছে। মাম্মির এখানে একজন ফেভারিট রাঁধুনি আছে। সে বাহিনী নিয়ে হাজির আর ড্যাডির পছন্দ মধুকাকা। চলো, ওই যুদ্ধের মধ্যে গিয়ে দরকার নেই। আমি তোমাকে ভাল জায়গায় নিয়ে গিয়ে ব্রেকফাস্ট করিয়ে দিচ্ছি। গরম গরম কচুরি। আমার তো বাড়িতে যাওয়ার এখন কোনও ইচ্ছেই নেই। চলো, আমরা নিজেদের মতো ঘুরি। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ করি।"

"আবার কচুরি?" মিতদ্রু যেন প্রমাদ গুনল। শ্যামনগর থেকে আসার সময় শক্তিগড়ে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে কচুরিটচুরি খেয়ে সে রকম খিদে নেই। খালি অনেক ক্ষণ সিগারেট খায়নি বলে প্রাণটা আঁকুপাকু করছিল। হৈমন্তীদের বাড়ির সামনে বাবা-মা নামতেই একটু আসছি বলে এগিয়ে গিয়েছিল একটু ফাঁকা জায়গায় একটা সিগারেট খেয়ে আসবে বলে। সিগারেট ধরাতে না ধরাতেই হৈমন্তীর ফোন, "কোথায় আছ?" তার পরেই নির্দেশ, "ওখানেই থাকো, আমি আসছি। দরকার আছে।"

হৈমন্তীর সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হবে ভেবেই মনটা ভাল হয়ে উঠেছিল মিতদ্রুর। দু'বছরের ওপর হৈমন্তীর সঙ্গে দেখা হয়নি। সেই লকডাউন থেকে শুরু। তার পর আবার আমেরিকায় ফিরে যাওয়া। দু'বছরের উথালপাথাল সময়। দেশে আর আসাই হয়নি। ভিডিয়ো কলে প্রায় প্রতিদিন কথা হয়, কিন্তু সামনাসামনি দেখা? দু'মাস পরে এমনিতেই আসত মিতদ্রু। একেবারে বিয়ে করার ছুটি নিয়ে। কিন্তু তার আগে অফিসের কাজে হঠাৎই এক বার কলকাতায় আসার সুযোগ হয়ে গেল। সময় যতই কম হোক, দেখা হতই। সেটা হয় হৈমন্তীরা শ্যামনগরে আসত অথবা হৈমন্তীদের কলকাতার বাড়িতে। এই টানাপড়েনের মধ্যেই হৈমন্তীর বাবা শান্তিনিকেতনটা ঠিক করে ফেললেন। বাবা-মাও খুশি। হৈমন্তীদের শান্তিনিকেতনের বাড়িটা সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছে। তা ছাড়া

বাবা-মাও দু’বছর শ্যামনগরের বাইরে কোথাও যায়নি।

মিতদ্রু একটা সিগারেট শেষ করতেই হৈমন্তী চলে এসেছিল। মিতদ্রুকে দেখে তার মুখ ঝলমল করে উঠেছিল। মিতদ্রুকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে বলেছিল, “অ্যাট লাস্ট!”

মিতদ্রুর ভেতরটা ভরে উঠেছিল। কিন্তু হৈমন্তী যে ভাবে ওকে জড়িয়ে ধরেছিল, একটু অস্বস্তিও হচ্ছিল। আশপাশের লোকজন দেখছিল। কিন্তু হৈমন্তী আর কবে সে সবের পরোয়া করেছে! মিতদ্রু আলতো করে হৈমন্তীর হাতদুটো ছাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, “একটু চা খেয়ে নিই। তুমি খাবে?”

“না। এখানে চা খেতে হবে না। চলো একটা জায়গায় যেতে হবে এক্ষুনি। অনেক অনেক প্ল্যান আছে।”

“কোথায়?” মিতদ্রু জিজ্ঞেস করেছিল। যদিও শান্তিনিকেতনের কিছুই চেনে না মিতদ্রু। মিতদ্রুর হাতটা ধরে টেনে হৈমন্তী গাড়ির মধ্যে নিয়ে এসে বলেছিল, “এত প্রশ্ন কোরো না তো! আমার অনেক ঝক্কাস প্ল্যান আছে। সময় বড্ড কম। কালকেই তো ফিরে যাবে।”

সত্যি একটা মাত্র রাত্রি। মিতদ্রু জিজ্ঞেস করেছিল, “এত কম সময়ে আর কী কী প্ল্যান করা আছে তোমার?”

উত্তর দেওয়ার আগেই হৈমন্তীর মোবাইলটা বেজে উঠেছিল। ফোনটা ধরে হৈমন্তী ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, “আঃ মাম্মি! আজকের দিনটা আমাদের ছেড়ে দাও না। আমি তো বলছি ওকে ব্রেকফাস্ট করিয়ে দেবো। উফ, ছাড়ো। আমি কী বললাম... আরে বাবা আমি কি ওকে না খাইয়ে রাখব? আমারও তো একটা দায়িত্ব আছে।”

হৈমন্তী মোবাইলটা ছেড়ে বলেছিল, “ধুস!”

“কী হল আবার?”

“তোমার হবু শাশুড়ি। তুমি খেয়েছ কি না সেই চিন্তায় দশ কেজি ওজন কমিয়ে ফেলেছে বোধহয়। অ্যাই নিরঞ্জনদা, সামনে যে কচুরির দোকান পাবে দাঁড়াও তো।”

মিতদ্রু আঁতকে উঠেছিল, “না, না, কচুরি নয়। আমি ফুল। খিদে পায়নি।”

“বাবুসোনা, তুমি সেটা তোমার হবু শাশুড়িকে এক বার ফোন করে বলবে প্লিজ়? আমি একটু শান্তিতে থাকি।”

মিতদ্রু মিয়োনো গলায় বলেছিল, “আমরা এখন কোথায় যেন যাচ্ছি?”

“ভুবনডাঙা...” বলে হৈমন্তী নিরঞ্জনকে প্রশ্ন করেছিল, “বুঝতে পেরেছ তো?”

“হ্যাঁ ছোড়দি।”

“বেশ,” নিশ্চিন্ত মনে সেই পরিচিত হাসিটা হাসতে আরম্ভ করে দিয়েছিল হৈমন্তী। সেই শুরু। তার পর এই এক ঘণ্টার ওপর কেন যে এলোমেলো ঘুরছে হৈমন্তী, মিতদ্রু বুঝতে পারছে না। মিতদ্রুকে পেয়ে হৈমন্তী যেন পাগল হয়ে উঠেছে। এই একটু আগে সোনাঝুরিতে গিয়েছিল। সেখানে দু’জন ফটোগ্রাফার হাজির। কিছু হাবিজাবি ছবিটবি তুলল। তারা নাকি প্রফেশনাল প্রিওয়েডিং শ্যুট করবে। এ সব পরিকল্পনার কথা কিন্তু হৈমন্তী কিছুই বলেনি আগে। মেয়েটা এ রকমই। ওর এই পাগলামির মধ্যে অদ্ভুত একটা সারল্য আছে। সেটা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না মিতদ্রু।

“তোমার কী কী প্ল্যান বলো তো হৈমন্তী?”

“অনেক অনেক প্ল্যান।”

“এখন এই রোদের মধ্যে ঘুরতে হবে আমাদের?”

“কেন তোমার খারাপ লাগছে আমার সঙ্গে ঘুরতে? এসি চলছে তো। নিরঞ্জনদা এসিটা আরও বাড়িয়ে দাও তো।”

ড্রাইভার গাড়ির এসির টেম্পারেচারটা আরও কমিয়ে দিল। মিতদ্রু বলল, “এটা একটু খারাপ দেখাচ্ছে না? এখানে এসে তোমাদের বাড়িতে এখনও মুখ দেখাইনি। তা ছাড়া উনি ভোর থেকে ড্রাইভ করছেন, ওঁরও তো একটু রেস্ট দরকার।”

মিতদ্রু ড্রাইভারের দিকে তাকাল। গাড়ি, ড্রাইভার সবই হৈমন্তীর বাবার। উনি আজ ভোরে শ্যামনগরে গাড়িটা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই ড্রাইভারেরও এত দূর গাড়ি চালিয়ে এসেও যেন কোনও ক্লান্তি নেই। সে যেন রোবট।

“কে নিরঞ্জনদা?” হৈমন্তী সামনের সিটের দিকে ঝুঁকে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, “কী গো নিরঞ্জনদা, তোমার টায়ার্ড লাগছে নাকি?”

“না,” ড্রাইভার নিরুত্তাপ গলায় উত্তর দিল।

“নিরঞ্জনদাকে তুমি চেনো না। বলো নিরঞ্জনদা, কত বার অফিস করে এসে বাবা রাতেই শান্তিনিকেতনে আসতে চেয়েছে আর তুমি নিয়ে এসেছ!”

নিরঞ্জনের কী প্রতিক্রিয়া হল মিতদ্রু বুঝতে পারল না। একই রকম নির্বিকার গলায় নিরঞ্জন বলল, “ঠিক। আমি তো তোমাদের জন্যই।”

“ভুবনডাঙার দোকানগুলো এখন খুলেছে কি নিরঞ্জনদা?”

“কিছু কিছু খুলে গিয়েছে বোধহয়। যাব?”

“চলো না একটু প্লিজ়। খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা কাজ আছে।”

মিতদ্রু সিটে মাথাটা এলিয়ে বলল, “কী কাজ আবার?”

“আর বোলো না। আমার কী আর ঝামেলার শেষ আছে? আরে আমার যে মেকআপ করে পিয়ালী, তাকে আসতে বলেছিলাম। আসবেও বলেছিল। তার মালিক, অনুরাধাদি, ফটোগ্রাফার থেকে মেকআপের সব ব্যবস্থার কন্ট্রাক্ট নিয়েছে। কিন্তু পিয়ালীর এত বড় স্পর্ধা, কাল রাতে ফোন করে বলছে আসতে পারবে না। কী সব অসুবিধে হয়েছে বাড়িতে। আমি অনুরাধাদিকে ফোন করেছিলাম। বলল, পিয়ালীর অ্যাসিস্ট্যান্টকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আরে যাকে তাকে পাঠিয়ে দিলেই হল? আমি মেনে নেব? আমার আর এক জন আছে দুর্গাপুরে, শ্যামলীদি। তাকে আসতে বলেছি।”

“সন্ধেবেলার অনুষ্ঠানটায় কী ঠিক হবে বলো তো? আমি তো জানি শুধু আমাদের পরিবার আর তোমাদের পরিবার একসঙ্গে একটু সময় কাটাব। তার জন্য এত মেকআপ...”

“আসলে সন্ধেবেলায় কিছুই নয়। ড্যাডির কিছু বন্ধুবান্ধব আসছে কলকাতা থেকে আর কিছু এখানকার। সবাই মিলে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ করবে। ভীষণ বোরিং। ছাড়ো না, আমরা আমাদের মতো থাকব। আমার প্রবলেমটা বোঝো। পিয়ালী বলেছিল কমলা রঙের শাড়ি। এত খরচা করে কলকাতার বুটিক থেকে কিনে নিয়ে এলাম। এখন শ্যামলী বলছে কচি কলাপাতা। কী ঝামেলা বলো তো? ও নিরঞ্জনদা, ভুবনডাঙার শাড়ির দোকানগুলো এখন খুলেছে?”

“এত ক্ষণে নিশ্চয়ই খুলে গিয়েছে ছোড়দি। গিয়ে দেখি।”

আট

দু’বছর আগে

স্নেহা মায়ের ফোনটা পেয়ে একটু বিরক্ত গলায় বলল, “কী থেকে থেকে ফোন করতে আরম্ভ করেছ বলো তো মা!”

“ভীষণ চিন্তা হচ্ছে রে। অত বড় বাড়িটায় তুই একা আছিস।”

“কী আর করা যাবে। ম্যাজিক করে তো আর লোক আসবে না। তোমাকে কত বার বলব, বাড়িটা বড় হলেও আটটা ফ্ল্যাট। আমি তার একটায় আছি।”

“আর অন্য কোনও ফ্ল্যাটে সত্যিই কেউ নেই? তোকে তোর বন্ধুগুলো ফেলে চলে গেল?”

“উফ! তোমার এই একই প্রশ্নের উত্তর আর দেব না মা।”

ফোনের উল্টো দিকে আরতিদেবী কেঁদে ফেললেন। মেয়ের চিন্তায় শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কীইবা করতে পারেন। স্নেহা বোঝে। মায়ের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করতে খারাপ লাগে। এই ফ্ল্যাট বাড়িটায় যে ও সম্পূর্ণ একা, এই ভাবনাটাই মনের মধ্যে আসতে দেয় না। আর মা সেটাই বারবার মনে করিয়ে দেয়।

“রতন আছে তো?”

একটু চুপ করে থেকে স্নেহা বলল, “হ্যাঁ মা, আছে।”

এই বাড়িতে শেষ লোক ছিল কেয়ারটেকার রতন। সেও কাল রাতে বাড়ি চলে গিয়েছে। এখন যদি ডাকাতও পড়ে এই বাড়িতে, চিৎকার করলেও শোনার কেউ নেই। কাল রাতে হঠাৎ করে রতন এসে চলে যাওয়ার কথাটা বলতে স্নেহা রতনকে জিজ্ঞেস করেছিল, “তুমি কেন যাচ্ছ?”

রতন কপালে হাত ঠেকিয়ে বলেছিল, “ভগবানের ইচ্ছেয় আজকে রাত্রে হাসনাবাদ যাওয়ার একটা অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গিয়েছে। এখানকার কয়েক জন যাচ্ছে। যাই, দেশের দিকটা একটু দেখে আসি। সব জায়গাতেই তো গন্ডগোল। চলে আসব। একটু মানিয়ে নাও। আশপাশের বাড়ির কেয়ারটেকাররা সব আমাদের বন্ধু। সবাইকে বলেছি খেয়াল রাখতে। হারুন রাতে এসে আমার ঘরে থাকবে। পাম্প চালিয়ে দেবে।”

দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল স্নেহা। কাউকে কি আর জোর করে আটকে রাখা যায়? শুধু এরা যে রকম ব্যবস্থা করে বাড়ি যেতে পারছে, ও নিজেও যদি সে রকম পারত! তবে রতনদা যে দেশে চলে গিয়েছে, কাল রাত থেকে হারুন এসে কেয়ারটেকারের ঘরে থাকছে, এটা আর মা-কে বলেনি। শুধু শুধু চিন্তা করে শরীর খারাপ আরও বাড়াবে।

“শোন, ফাঁকা বাড়ি। রতনকে কিন্তু ভেতরে একদম ঢুকতে দিবি না। বাজার তো যা বলছিস চার-পাঁচ দিন চলে যাবে। তোর বাবা দেখছে কী ব্যবস্থা করা যায়। চার দিকে কথা বলেছে। আচ্ছা থানার ফোন নম্বরটা তোর কাছে আছে তো?”

“হ্যাঁ মা, আছে। পুলিশের গাড়ি সব সময় টহল দিচ্ছে। বাবাকে চিন্তা করতে বারণ করো। অনুরাধাদিও দেখছে কী ব্যবস্থা করা যায়। দু’-এক দিনের মধ্যে কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।”

মায়ের ফোনটা ছেড়ে চুপ করে কিছু ক্ষণ বসে থাকল স্নেহা। বেশ বুঝতে পারছে আর ভেবেও কোনও লাভ নেই। ভাবাটা অনেক আগে উচিত ছিল। সেই অনুরাধাদি ডোবাল। অনুরাধাদির পার্লারে কাজ করে স্নেহা। আসল পার্লারটা বালিগঞ্জে। গত পুজোর আগে ব্রাঞ্চ খুলেছে নিউ টাউনে। প্রীতি আর রেশমি দু’জন নতুন মেয়েকে নিয়েছিল আর বালিগঞ্জ থেকে ট্রান্সফার করে নিয়ে এসেছিল স্নেহাকে। দু’হাজার টাকা মাইনে বাড়িয়ে স্নেহাকে করে দিয়েছিল ম্যানেজার। তবে ওটা নামেই। প্রীতি আর রেশমি যে কাজ করে স্নেহাও একই কাজ করে। তিন জনের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল এই ফ্ল্যাটে। দিব্যি চলছিল সব কিছু। খুব মজা করে থাকত তিন জনে। তার পর কয়েক দিনের মধ্যে দুম করে এ সব হয়ে গেল।

রেশমি আর প্রীতি বুদ্ধি করে গত সপ্তাহে বাড়ি চলে গিয়েছে। ও দিকে অনুরাধাদি সমানে বোঝাতে লাগল, “তুই থাক। নতুন ব্রাঞ্চটা খুলেছি। সবে রেপুটেশন হচ্ছে। পার্লার তো মানুষের জন্য একটা সার্ভিস, বল। তুই আমার বোনের মতো। দরকার হলে আমি নিজে গিয়ে থাকব তোর সঙ্গে। ঠিক সময়ে তোর বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করে দেব। ট্রেনের টিকিট না পেলে প্লেনের টিকিট কেটে দেব।”

আনুগত্য সাঙ্ঘাতিক জিনিস। দোনামনা করে ‘আর একটা দিন দেখি’ বলে স্নেহা থেকে গিয়েই এই বিপদে পড়েছে। অনুরাধাদিকে ভরসা করাই সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে। কিন্তু এখন আর এ সব ভেবে কী লাভ? এক সপ্তাহ ধরে এই বাড়িটায় একা থাকতে থাকতে এখন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।

স্নেহা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দেশ জোড়া লকডাউনের আজ প্রথম দিন। এই পাড়াটা আজ যেন আরও নিঝুম। শুনশান জনমানবহীন রাস্তা। তার মধ্যে সারবন্দি পরপর ফ্ল্যাট বাড়ি। আচ্ছা যুদ্ধ বাধলে কি এ রকমই হয়? অথবা কার্ফিউ বা দাঙ্গা হলে? না নিশ্চয়ই। মানুষের সঙ্গে মানুষের মুখোমুখি হওয়ার সেখানে কোনও বাধা নেই। এই রকম নিঃশব্দ মৃত্যুবাণের ভয়ে বাড়িবন্দি হয়ে লুকিয়ে থাকতে হয় না।

স্নেহার মোবাইলটা আবার বেজে উঠল। রতনদা। রতনদাকে এক বার ফোন করবে ভাবছিল স্নেহা। কাল রাত্রে ঠিক মতো পৌঁছেছে কি না। তার আগেই রতনদার ফোন।

“তুমি ঠিক করে পৌঁছেছ?”

“হ্যাঁ। অনেক কাণ্ড করে আসতে হয়েছে। রাস্তায় পুলিশ অনেক বার ধরেছিল। অনেক বলে কয়ে তবে ছেড়েছে। ভাগ্যিস অ্যাম্বুলেন্সটা আমাদের গ্রামের।”

“তোমাদের ও দিকে কী খবর গো?”

“খবর তো একই। সব দোকানপাট বন্ধ। লোকে ঠিক বুঝতে পারছে না। সবাই তো ওই টিভিতেই শুনছে বিপদের কথা। তুমি ঠিক আছ তো?”

“হ্যাঁ, ঠিক আছি।”

“শোনো, বাজার-টাজার যা লাগবে ওখানে কান্তা বউদিকে ফোন করে বলে দেবে। আমি বলে রেখেছি তোমার কথা।”

রতনদা মানুষটা ভাল। এই যে স্নেহাকে একা রেখে চলে গিয়েছে, তাতে ওর একটা যেন অপরাধবোধ আছে। স্নেহা হাসল, “থ্যাঙ্ক ইউ। তুমি তো কালকেই নম্বরটা দিয়ে গিয়েছ। যা বাজার আছে তিন-চার দিন চলে যাবে। আমি একা মানুষ কত খাব? আর বাবা চেষ্টা করছে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার।”

“ঠিকই তো। ম্যাডামকেও বলো। উনি তো কলকাতাতেই রয়েছেন। যদি তোমাকে ওঁর বাড়িতে নিয়ে যান, তা হলে একা একা থাকতে হবে না। ও আর একটা কথা, রাস্তার উল্টো দিকে চারটে বাড়ি পরে যে সাদা বাড়িটা আছে, যার কেয়ারটেকার গোবিন্দ, ওই বাড়িতেও এক জন দাদাবাবু আছেন। গোবিন্দও আমার সঙ্গে ফিরেছে। রাস্তায় বলছিল, খুব ভাল মানুষ। ওখানেই থাকবেন। গোবিন্দর কাছ থেকে ওঁর ফোন নম্বরটা নিয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যদি রাত-বিরেতে খুব দরকার পড়ে, কাউকে না পাও, তা হলে ফোন কোরো। তবে খুব দরকার না পড়লে দেখা করতে যেয়ো না।”

স্নেহা হাসল, “এই বলছ ভরসা করতে, আর এই বলছ দেখা করতে যেয়ো না।”

“আসলে উনিও বিদেশ থেকে এসেছেন। আর বিদেশ থেকে আসা লোকজনরাই তো রোগটা ছড়াচ্ছে। রোগটা ধরলেই বেলেঘাটা আইডি-তে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেবে। টিভিতে শুনছ না?”

“শুনে আর কী হবে? বরং আমার কী মনে হচ্ছে বলো তো রতনদা? তোমরা নিউ টাউনের এই পাড়ায় থাকো কী করে? পুরো মরুভূমি। কেউ কোথাও নেই।”

“আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ভয় পেয়ো না। আমি কয়েক দিনের মধ্যেই চলে আসব। আর তোমাকে তো বলে রেখেছি আমার ফোন সব সময় খোলা থাকবে। কোনও অসুবিধে হলেই ফোন করবে।”

“আচ্ছা, কী নাম ওই ভদ্রলোকের, যার কথা বললে উল্টো দিকের কয়েকটা বাড়ি পরে থাকেন।”

“এই রে নামটা তো জানি না। গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করে তোমাকে নাম নম্বর সব পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

রতনের সঙ্গে আরও কিছু ক্ষণ কথা বলে ঘরের ভেতর চলে এল স্নেহা। ঘরটা একটু ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তার পর দুপুরের জন্য কিছু একটা রান্না করতে হবে। রেশমি আর প্রীতি যখন ছিল, ‘এটা খাব ওটা খাব’ বলে রীতিমতো আবদার করত। স্নেহাও হাসিমুখে করে দিত। এখন একার জন্য রান্না করতে আর উৎসাহ পায় না। যা হোক একটা ভাতে ভাত করে নিলেই হবে। তারও কোনও তাড়া নেই। সারাদিন সময়ই সময়। টিভিটা চালিয়ে দিল। খবরের চ্যানেলগুলোতে শুধু লকডাউন আর করোনার খবর। ডাক্তারবাবুদের ইন্টারভিউ। হাঁফ ধরে যাচ্ছে। এলোমেলো চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতে একটা গানের চ্যানেলে এসে থিতু হল। গুনগুন করে গানে গলা মেলাল।

চান খাওয়া-দাওয়া করে দুপুরে বেশ কিছু ক্ষণ ঘুমল স্নেহা। দুপুরে ঘুমের অভ্যেস ছিল না। এই ক’দিনে হয়েছে। ঘুম যখন ভাঙল তখন বিকেল পড়ে আসছে। এ রকম পড়ন্ত বিকেলে কেমন যেন মন খারাপ করে। চা তৈরি করে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সূর্যের আলো নরম হচ্ছে। ঘরের মধ্যে গুমোট ভাব। বারান্দায় এসে দাঁড়ালে একটু মুক্তি। চায়ের

কাপে চুমুক দিয়ে যে বাড়িটার কথা বলেছিল রতনদা, তার দিকে চোখ চলে গেল। বারান্দা এখন ফাঁকা। তবে সকাল থেকে স্নেহা খেয়াল করেছে ওই বারান্দায় মাঝে মাঝে একটা ছেলে সিগারেট খেতে আসে। ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ছেলেটার নাম নম্বর রতনদা পাঠায়নি। ভুলে গিয়েছে হয়তো। তবু এক বার মোবাইলের এসএমএসগুলো দেখতেই মনটা উৎফুল্ল হয় উঠল। রতনদা ভোলেনি। ছেলেটার নাম নম্বর এসএমএস করেছে। ছেলেটার নাম মিতদ্রু সেনগুপ্ত। স্নেহা সেভ করে নিল।

এক বার ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করে রাখতে ফোন করবে কি? দোটানায় পড়ে গেল স্নেহা।

নয়

এক ঘণ্টা আগে

মিতদ্রু ঘড়ি দেখল। আড়াই ঘণ্টার ওপর হৈমন্তীর সঙ্গে ঘুরছে। এখনও ওদের বাড়ি যায়নি। এ বার বেশ ক্লান্ত লাগছে।

"চলো এ বার বাড়ি যাই নাকি?" মিতদ্রু হৈমন্তীকে জিজ্ঞেস করল।

আদুরে গলায় হৈমন্তী বলল, "বিশ্বাস করো, বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। আমি একা শুধু তোমাকে চাই।"

"পাগলি!" মিতদ্রু আলতো করে হৈমন্তীর কাঁধ চাপড়ে দিল। হৈমন্তী মাথাটা মিতদ্রুর কাঁধে এলিয়ে দিয়ে বলল, "শোনো, বাড়িতে মাম্মি অনেক কিছু রান্না করিয়েছে। তোমাকে বললাম না, মাম্মির এক জন ফেভারিট কুক আছে। তাকে ডেকে এনে রান্না করিয়েছে। যদিও আমি শিয়োর, মাম্মি বলবে ওগুলো নিজেই রান্না করেছে। আর ড্যাডিও মধুকাকাকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ফেভারিট ফুড রান্না করিয়েছে। এই যুদ্ধের মধ্যে পড়ে তোমাকে কিন্তু সব খেতে হবে। সব খেয়ে কি তুমি হাঁসফাঁস করতে চাও? তার চেয়ে এখানে একটা দুর্ধর্ষ জায়গা আছে, সেখানে গিয়ে খাবে? একটু নিরিবিলিতে কথা বলা যাবে।"

মিতদ্রু তো চায় হৈমন্তীর সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলতে। কিন্তু সেই নিরিবিলিটাই সকাল থেকে খুঁজে পাচ্ছে না। হৈমন্তী সকাল থেকে ছটফট করেই যাচ্ছে। কখনও ফটোগ্রাফারকে ডেকে ছবি তোলা, তো কখনও মনের মতো সাজগোজ করার জন্য শাড়ি কেনা।

গাড়ির মধ্যে হৈমন্তীর মাথাটা মিতদ্রুর কাঁধে। হাতের আঙুলের মধ্যে আঙুলগুলো ঢুকিয়ে রেখেছে হৈমন্তী। নিরঞ্জন গাড়ি চালাচ্ছে। সে যতই নির্বিকার নির্লিপ্ত হোক না কেন, মিতদ্রুর অস্বস্তি লাগছেই।

"আই মিস ইউ সো মাচ মিতদ্রু। তুমি কেন এত দূরে থাকো?" আবেগতাড়িত গলায় হৈমন্তী বলল।

নিচু গলায় মিতদ্রু বলল, "আমিও তোমাকে মিস করি। আর তো দুটো মাস। তার পর আমরা কেউ কাউকে মিস করব না, এক সঙ্গেই থাকব।"

এই নিয়ে কত বার যে দু'জন দু'জনকে কথাটা বলল!

"আমাদের বিয়েটা কত বাধা পাচ্ছে বলো তো?" মিতদ্রুর আঙুলগুলো শক্ত করে ধরে হৈমন্তী বলল, "লেটস কিপ আওয়ার ফিঙ্গারস ক্রসড। সামনের জুন মাসে যে ডেটটা ড্যাডি আর কাকু ঠিক করেছে, সে দিন যেন মালাবদলটা হয়ে যায়।"

"ঠিক। আবার জানো তো সামনের গ্রীষ্মে আবার ফোর্থ ওয়েভ আসার ফোরকাস্ট শুরু হয়েছে।"

হৈমন্তী আঙুল মিতদ্রুর ঠোঁটের ওপর রেখে বলল, "প্লিজ় আর এ সব কথা বোলো না। আচ্ছা এই যে তুমি এখন এলে, আবার জুন মাসে বিয়ে করতে আসার জন্য ছুটি পাবে তো?"

"এখন তো অফিসের কাজে এসেছি। সামনের সপ্তাহে ফিরে যাব জানোই তো। জুন মাসে তো বিয়ে করার ছুটি নিয়ে আসব।"

"লম্বা ছুটি নেবে কিন্তু। আমার এক বন্ধু সায়নীর বিয়ে হল। বর মাত্র আট দিনের ছুটি নিয়ে এসেছিল। বিয়ে, তার পর তিন দিনের গোয়ায় হানিমুন, অষ্টমঙ্গলা। ব্যস! সে দিন রাতেই বর ব্যাক টু আমেরিকা উইদাউট সায়নী। তুমি কত দিনের ছুটি নিয়েছ?"

"বলেছি তো তোমাকে, এক মাস।"

বাচ্চা মেয়ের মতো বায়না করতে থাকল হৈমন্তী, "এক মাস কেন? দু'মাস নাও প্লিজ়। আমরা লম্বা হানিমুন করব। ড্যাডি সব ব্যবস্থা করে দেবে।"

"দরকার হবে না। আমার ট্র্যাভেল এজেন্ট সব ব্যবস্থা করে দেবে।"

"কোথায় যাব আমরা?"

"আপাতত সারপ্রাইজ় থাক।"

"জানো, সায়নী এখনও আমেরিকায় যেতে পারেনি ভিসা হয়নি বলে। আমার আবার ও রকম হবে না তো?"

"আশা করি হবে না। তোমার ভিসার ব্যবস্থা করেই তার পর ফিরব। আচ্ছা, এ বার আমরা বাড়ি ফিরি?"

"আরে দাঁড়াও না, চলো আমরা দু'জনে ফাঁকায় ফাঁকায় গিয়ে লাঞ্চ করি। এখানে খুব ভাল ভাল খাওয়ার জায়গা আছে। বলো তোমার কী খেতে ইচ্ছে করছে?"

এ বার মিতদ্রুকে একটু কঠিন হতেই হল, "না, চলো বাড়ি যাই। এত ক্ষণ তো ঘুরলাম। সবার সঙ্গে লাঞ্চ করতে তোমার আপত্তি কোথায়? তার পর তো তুমি ঠিক করে রেখেছ, আবার বেরোব আমরা।"

"আপত্তি শুধু ড্যাডি আর মাম্মিকে নিয়ে। অন্যের হাতের রান্নাকে মাম্মি বলবে নিজে রেঁধেছি। আর কী সব রেসিপি মধুকাকাকে দিয়ে রান্না করিয়ে ড্যাডি বলবে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় রেসিপি। আরে বাবা রবীন্দ্রনাথ কি ফুডি ছিলেন? ড্যাডি শুধু রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ করবে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কী রকম অবসেসড জানোই তো।"

মিতদ্রু হাসল, "আসলে রবীন্দ্রনাথকে উনি ভীষণ আপনার জন মনে করেন। তাতে ক্ষতি কী? তুমি সব সময় পিঞ্চ করো।"

"করব না? তুমি জানো রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে কী কী চলে?"

মিতদ্রু হাসল, "কী আবার চলবে? আমি হোয়াটসঅ্যাপে রবীন্দ্রনাথের কোটেশন দিয়ে কোনও মেসেজ পেলে ওঁকে ফরোয়ার্ড করলে খুব খুশি হন। এইটুকুতেই যদি খুশি হন, ক্ষতি কী?"

"সর্বনাশ! এত দিনে বুঝলাম কেন তুমি ড্যাডির চোখে এত গুডি গুডি বয়। কিন্তু খুব সাবধান! রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ফান্ডা টান্ডা আছে তো? হোয়াটসঅ্যাপে রবীন্দ্রনাথের অনেক ভুলভাল কোটেশন ঘোরে। ও রকম কোটেশন পেলে ড্যাডি রেগে কাঁই হয়ে যায়। এক বার ড্যাডির এক ম্যানেজার ড্যাডিকে তেল মারতে ও রকম একটা গুড মর্নিং মেসেজ পাঠিয়েছিল। ড্যাডি তার চাকরিটা খেতে শুধু বাকি রেখেছিল।"

"ওরে বাবা! অত ভেবে দেখিনি। তবে এখনও বোধহয় ভুল কিছু পাঠাইনি। তাই তুমি আমি এখনও পাশাপাশি আছি।"

"ড্যাডির কিন্তু খুব আশা, তুমি আর আমি মিলে ড্যাডির বিজ়নেস দেখব আর ড্যাডি এই শান্তিনিকেতনে শিফ্‌ট করবে..." কথা শেষ করার আগেই হৈমন্তীর মোবাইলটা বেজে উঠল।

"তুমি কত দূর শ্যামলীদি? সেকি এখনও পানাগড় পৌঁছওনি... তুমিও দেখছি পুরো ডুবিয়ে দেবে আমাকে... আমাকে আর শিখিয়ো না... আমি জানি পানাগড় থেকে শান্তিনিকেতন আসতে কত ক্ষণ লাগে... তাড়াতাড়ি এসো।"

"ধ্যাত!" বলে মোবাইলটা ছেড়ে দিল হৈমন্তী। গজগজ করে বলতে লাগল, "লোকজন যে কী করে এত আনপ্রফেশন্যাল হয় বুঝি না। এক জন আসবে কথা দিয়ে শেষ মুহূর্তে তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্টকে পাঠিয়ে দিল! আর এক জন কখন যে এসে পৌঁছবে, তার ঠিক নেই। দাঁড়াও একটা ফোন করি।"

"কী হল আবার?" মিতদ্রু জানতে চাইল।

হৈমন্তী উত্তর দেওয়ার আগেই যাকে ফোন করছিল লাইনটা লেগে গেল, "হ্যালো অর্কদা, শোনো আমার হয়তো একটু দেরি হবে। শ্যামলীদি রাস্তায় একটু আটকে পড়েছে। তুমি কিন্তু ডট চারটের সময়

চলে আসবে... কী... কী বলছ?" অর্কর কথা শুনতে শুনতে মিটিমিটি হাসছে হৈমন্তী, "আচ্ছা দেখছি। তুমি রাজি করাতে পারলে করিয়ো। আমার আপত্তি নেই।"

মোবাইলটা ছেড়ে হৈমন্তী খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "বোঝো কাণ্ড! একেবারে নাছোড়বান্দা।"

মিতদ্রু জিজ্ঞাসু চোখে জানতে চাইল, "কী ব্যাপার বলো তো?"

"আরে ওই অর্ককে বলে দিলাম টাইমে আসতে। শ্যামলীদিটাও যা ঝোলাচ্ছে।"

"তোমার কি আরও কিছু প্রোগ্রাম আছে নাকি?"

"আছে তো। প্রিওয়েডিং ফটোশুট। বুঝলে না তখন কেন সোনাঝুরিতে গিয়ে অর্ককে ডেকেছিলাম। আরে আর সময় পাব কখন বলো? তুমি তো কালকেই ফিরে যাবে। আর তার পরেই ফুড়ুত করে আমেরিকায় পালাবে।"

"আবার ফটোশুট? এই তো একটু আগেই ওখানে ছবি তুলে গেল!"

"আরে ওটা ট্রায়াল! ঠিকঠাক সেজেগুজে ছবি তুলতে হবে তো। শোনো এদের ট্রাই করে দেখছি। যদি ভাল তুলতে পারে তা হলে কলকাতায় ভিক্টোরিয়ায় আসল ফটোশুটটা করাব এদের দিয়ে। ঘোড়ার গাড়ি চাপব, ফুচকা খাব। তার পর প্রিন্সেপ ঘাটে যাব। অনেক অনেক প্ল্যান আছে আমার। প্লিজ় তুমি আমেরিকা ফিরে যাওয়াটা দু'দিন পিছিয়ে দাও।"

"সেটা এ যাত্রায় কিছুতেই সম্ভব নয়। আপাতত বলো তো আজকের শুটটা কোথায়?"

"ওই তো সোনাঝুরির বনে, যেখানে ফটোগ্রাফাররা এসেছিল।"

নিরঞ্জন বলল, "আজ কিন্তু শনিবার ছোড়দি। খোয়াইয়ের হাট বসেছে।"

"জানি বাবা, জানি। আমার ভাবা আছে।"

মিতদ্রু বলল, "আমাকে এই সব ছবি টবি তোলা থেকে বাদ দাও।"

"বাদ দেব মানে? প্রিওয়েডিং শুট আমার একার তোলা হবে নাকি? বাঃ রে!"

"আচ্ছা। ওই সব ফটোগ্রাফারের কী দরকার? আমরাই তো ছবি তুলে নিতে পারি। আমার মোবাইলের ক্যামেরাটা খুব ভাল। কি নিরঞ্জনদা আপনি পারবেন না, আমাদের ছবি তুলে দিতে?"

হৈমন্তী হতাশ গলায় বলল, "কোথায় প্রফেশন্যাল ফটোগ্রাফার আর কোথায় ছাতার মাথা নিরঞ্জনদা! তুমিও না। শোনো প্রিওয়েডিং শুট যে সে তুলতে পারে না। প্রফেশন্যাল দরকার। আমার কয়েক জন বন্ধুর যা ফাটাফাটি অ্যালবাম আছে না। কলকাতায় দেখো। অনুরাধাদির সঙ্গে কথা হয়ে আছে আমার। মডেল কোঅর্ডিনেটর থেকে আরম্ভ করে বড় টিম থাকবে আমার। আচ্ছা, ভাল কথা, তোমারও কিন্তু অল্প মেকআপ দরকার।"

"বাদ দাও। কোনও দরকার নেই।"

"না, না, সিরিয়াসলি! এমনিতে শ্যামলীদি করে দিতে পারত। কিন্তু দেরি করে আসছে, টাইম পাবে কিনা জানি না।"

"ভালই হবে, বাঁচা গেল।"

"না ভাল হবে না। এক জনের মেকআপ করা আর আর এক জন কিছুই নেই, বুঝতে পারছ ছবি কেমন হবে?"

"ভালই হবে।"

"আরে শোনো না। আমি কলকাতায় যে পার্লারের মেয়েটাকে চেয়েছিলাম, পিয়ালী, তার অ্যাসিস্ট্যান্ট হাজির হয়ে বসেছে। আমি তো কন্ট্রাক্ট ক্যানসেল করে দিয়েছি। কিন্তু অর্ক খুব করে ধরেছে যদি মেয়েটাকে দিয়ে তোমার হালকা টাচ আপ মেকআপ করানো যায়। মনে হচ্ছে মেয়েটা অর্কর গার্লফ্রেন্ড হবে। না হলে বারবার বলবে কেন? প্লিজ় একটু মেকআপ করিয়ে নিয়ো। আমি বলছি বলে।"

আপাতত পরিত্রাণ পেতে মিতদ্রু বলল, "ঠিক আছে, দেখা যাবে। এখন বাড়ি চলো তো। খিদে পাচ্ছে।"

"যাব। আর একটা জায়গায় ঘুরেই যাব।"

দশ

দু'বছর আগে

হৈমন্তীর হাসি আর থামতেই চাইছে না। মিতদ্রু ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠছে। ফোনটা ধরার পর থেকে একটা শব্দও বলেনি হৈমন্তী। শুধু হেসেই চলেছে। কান থেকে মোবাইলটা হাতের চেটোয় এনে স্পিকার মোডে দিয়ে মিতদ্রু বলল, "এ বার হাসি থামাও। পাক্কা এক মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড ধরে তুমি হেসে চলেছ। এত হাসির কারণটা কী, জানতে পারি?"

হাসির দমক সামলে হৈমন্তী বলল, "আরে সুদর্শনা, ওর বাড়ির একটা ভিডিয়ো পোস্ট করেছে। সুদর্শনার বাবা খালি গায়ে বারমুডা পরে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, ন্যাতা-বালতি নিয়ে ঘর মুছছে। আবার ভিডিয়োটার সঙ্গে টেক্সট দিয়েছে, 'ঝাঁটা হাতে ঝাঁট দিতে দিতে এগোতে হয়, ন্যাতা হাতে ঘর মুছতে মুছতে পিছতে হয়।' দাঁড়াও তোমাকে ভিডিয়োটা ফরওয়ার্ড করছি," আবার হাসতে শুরু করল হৈমন্তী।

"আরে এতে হাসার কী আছে? আমিও তো এখানে মপার দিয়ে আজ ঘর পরিষ্কার করছি। আমেরিকাতেও করি। ভদ্রলোক মনে হয় মজা করে ভিডিয়োটা করেছেন।"

"না, মজা নয়। সুদর্শনা বলেছে, ওদের বাড়িতে ও রকম রুটিন সেট হয়েছে। ভাবতে পারো, আঙ্কেল একটা কোম্পানির ডেপুটি সিএফও। মার্চের ইয়ার এন্ডে ঝাঁটা ন্যাতা হাতে..." হাসি আর থামছে না হৈমন্তীর।

"তুমি যে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছ, তোমাদের বাড়ির কোনও রুটিন হয়েছে?"

অবশেষে হৈমন্তীর হাসি থামল, "আমাদের হোল টাইমার বলতে সিকিয়োরিটি গার্ড। বাড়ি পরিষ্কার, রান্না করার লোক সবাই তো বাইরে থেকে আসে। মাম্মি সবার ঢোকা বন্ধ করে দিয়েছে। এ দিকে নিজেও আর পেরে উঠছে না। উনিশ দিন আরও টানতে পারবে না। সো, রুটিন চালু হওয়া সময়ের অপেক্ষা।"

"তা হলে শিগ্গিরই একটা ভিডিয়ো দেখব মনে হচ্ছে, তোমার হাতে ঝাঁটা বালতি।"

"কভি নেহি। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছি। কাজ করতে হলে কোনটা করব। গেস করো।"

মিতদ্রু একটু ছদ্ম ভাবার ভান করে বলল, "উমম...আই গেস কুকিং। রান্না।"

"অ্যাই! রান্না করতে পারি না বলে সব সময় খোঁটা দাও কেন?"

"ও মা, খোঁটা কোথায় দিচ্ছি? আমি বলছি এই সুযোগ, রান্নার হাতটা পাকিয়ে নাও।"

"বাঃ! বেশ শয়তানি বুদ্ধি তো তোমার। আমাকে রান্না করা শিখিয়ে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে হোম মেকার করে রাখবে নাকি? আমি জব করব।"

"ঠিক আছে। তা হলে বলো, তুমি কোন কাজটার ভার নেবে?"

"ডাস্টিং!" হাসি শুরু হয়ে গেল হৈমন্তীর।

মিতদ্রু বলল, "এই যে তুমি এত হাসছ, জীবনটা পিকনিক পিকনিক মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা কিন্তু যথেষ্ট সিরিয়াস। ইউরোপে যা হচ্ছে, সেটা আমাদের দেশে হলে পরিণতি কী ভয়ঙ্কর হবে ভাবতে পারছ? শুধু ইউরোপেই আড়াই লাখ লোক আক্রান্ত। গোটা বিশ্বে বাইশ হাজারের ওপর লোক মারা গিয়েছে। আমাদের দেশেও ১৬ জন কাল পর্যন্ত মারা গিয়েছে। কতটা সিরিয়াস দিকে ব্যাপারটা যাচ্ছে বুঝতে পারছ?"

"সিরিয়াস কথা বাদ দাও তো। বলো আজ সকাল থেকে কী করলে?"

"ওই একই। এটা ওটা। টুকটাক কাজ, ফোন। টিভি দেখা। আর বেশির ভাগ সময়টাই তো তোমার সঙ্গে ভিডিয়ো চ্যাট না হলে ফোনে কথা।"

"একদম বাজে কথা বোলো না। তুমি ক'বার নিজে থেকে ফোন

করো? সব সময় আমি তো করছি।”

“কে করছে, সেটা বড় কথা নয়। কত ক্ষণ ধরে আমরা কথা বলছি সেটাই বড় কথা।”

“ইস, কবে যে দেখা হবে! এই শোনো, ড্যাডি বলছিল যদি ব্যবস্থা করতে পারে তা হলে আমাদের শান্তিনিকেতনের বাড়িতে চলে যাবে। ওখানে কাজের লোকের অতটা সমস্যা নেই। মধুকাকার ফুল ফ্যামিলি থাকে আমাদের বাড়িটা দেখাশোনা করার জন্য। যাবে?”

“আমি?” অবাক গলায় মিতদ্রু বলল।

“তুমি নয়তো কে? খুব মজা হবে। ফুল অন মস্তি। ভাবতে পারো, উই হ্যাভ নেভার কিসড।”

মিতদ্রু হাসল, “প্রথমত এই লকডাউনের সময় যাবে কী করে, সেটাই জানি না। আর তোমরা যদিও বা যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারো, আমি তো এখান থেকে বেরোতেই পারব না।”

“কেন?”

“বলেছি না কম্পালসারি কোয়ারেন্টাইনে রয়েছি। বাড়ি থেকে বেরোনোর অনুমতিই নেই। তা হলে তো শ্যামনগরেই বাবা-মায়ের কাছে চলে যেতে পারতাম।”

“কী রকম জেলখানা জেলখানা মনে হচ্ছে না তোমার?”

“তা তো মনে হচ্ছে। আসলে কী বলো তো, আগে অনেক সময় এ রকমও গিয়েছে, অফিসের কাজে এসে এই ফ্ল্যাটে থেকেছি। সারাদিন এই ফ্ল্যাটের বাইরে বেরোইনি। কিছুই মনে হয়নি। কিন্তু ওই যে ভাবনাটা, ইচ্ছে করলেও বেরোতে পারব না, গৃহবন্দি, এটা ভাবলেই ডিপ্রেশন হচ্ছে। অনেস্টলি তোমাকে সামনাসামনি দেখতেও খুব ইচ্ছে করে।”

“মন খারাপ কোরো না। আর মাত্র কয়েকটা দিন। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আচ্ছা, তোমার ও দিকে অফিসের কাজকর্ম আজ কিছু এসেছে?”

“না। ক্লায়েন্টদের অফিস সব বন্ধ। বললাম না, অদ্ভুত একটা ডামাডোল চলছে ইউরোপে। আমার ক্লায়েন্টবেস তো মূলত ইউরোপে।”

“তুমি তো প্রচুর পড়ো, পড়ছ না?”

“পড়ছি। কিন্তু ঠিক মন বসাতে পারছি না। আমার যা কিছু পাঠ্য, সবই তো পিডিএফ না হলে ইবুক। এই মোবাইলের স্ক্রিন আর কম্পিউটারে ল্যাপটপে চোখ রেখে রেখে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি। কী মনে হচ্ছে জানো? বেশ অনেকগুলো বই যদি থাকত, তা হলে ওই বারান্দায় বসে বইয়ের পাতা ওল্টাতাম।”

“বারান্দায় গরম না? এসি নেই তো?”

এ বার হেসে উঠল মিতদ্রু, “খোলা বারান্দায় এসি? অসাধারণ তোমার আইডিয়া।”

“মজা কোরো না। মাম্মি চেষ্টা করছে জানো তো?”

“কী চেষ্টা করছেন?”

“যদি কিছু রান্নাবান্না করে তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া যায়।”

“না, না। ও সব ঝামেলা করতে বারণ করো।”

মিতদ্রু ফোনটা কানে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে কথা বলছিল হৈমন্তীর সঙ্গে। নতুন কোনও কথা নেই। ঘুরে ফিরে সেই একই কথা। আজকাল বেশি ক্ষণ কথা বলতে ভাল লাগে না। এটাকে অবশ্য নিছক কথা বলা বললে ভুল হবে। প্রেমালাপ। কিন্তু সেই প্রেমালাপে ঘুরেফিরে নোভেল করোনা ভাইরাস আর লকডাউন। নিজেও বলছে, শুনছেও। বিরক্ত লাগছে।

একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল মিতদ্রু।

“হ্যালো, হ্যালো... শুনতে পাচ্ছ?” হৈমন্তী জিজ্ঞেস করল।

“হ্যাঁ, শুনছি।”

“ও আমি ভাবলাম কল ড্রপ হয়ে গেল। নেটওয়ার্কের সমস্যা আছে তো...”

আরও কিছু ক্ষণ অবান্তর কথা বলে ফোনটা ছেড়ে দিল হৈমন্তী। এটা কিছু ক্ষণের বিরতির মতো। একটু পরেই আবার ফোন করবে। ভিডিয়ো কলও করতে পারে। সেই একই কথা শুরু হবে। মিতদ্রু বুঝতে পারছে হাতে অফুরন্ত সময় নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলে যাওয়া একটা আর্ট আর এই শিল্পটা এখনও রপ্ত করে উঠতে পারেনি। এর মধ্যেই মোবাইলটা আবার বেজে উঠল। অচেনা নম্বর।

“হ্যালো।”

ও প্রান্ত থেকে ইতস্তত ভাব নিয়ে একটা মেয়ে বলে উঠল, “আপনি মিতদ্রু সেনগুপ্ত বলছেন?”

“বলছি।”

“আমার নাম স্নেহা। আমি আপনার নম্বরটা পেয়েছি রতনদার কাছ থেকে।”

“রতনদা... রতনদা কে? ঠিক চিনতে পারলাম না।”

“রতনদা আমাদের ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার। আপনার ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার গোবিন্দদা, রতনদার বন্ধু। একই গ্রামে থাকে।”

মিতদ্রু ঠিক বুঝতে পারছে না স্নেহা নামের এই মেয়েটা কেন ফোন করেছে। নিচু গলায় বলল, “ও আচ্ছা।”

“আমি যে ফ্ল্যাটটায় আছি,” স্নেহা গুছিয়ে বলার চেষ্টা করল, “সেটা আপনার ফ্ল্যাটের রাস্তার উল্টো দিকে চারটে বাড়ি পরে।”

“বুঝতে পেরেছি।”

একটু অবাক হয়ে স্নেহা জিজ্ঞেস করল, “কী করে বুঝতে পারলেন?”

“কারণ রাত্রিবেলা বারান্দায় দাঁড়ালে রাস্তার উল্টো দিকে কয়েকটা বাড়ি পরে একটা ফ্ল্যাটেই আলো জ্বলতে দেখি।”

“আসলে রতনদা বলল, আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করে রাখতে। এই তল্লাটে বোধহয় কয়েক জন কেয়ারটেকার ছাড়া আমরা দু'জনেই আছি।”

“আরও হয়তো কয়েক জন আছেন। দূরে ইতস্তত কয়েকটা বাড়িতেও আলো জ্বলতে দেখি।”

“হ্যাঁ, আমি বলতে চাইছিলাম কাছাকাছি।”

“আমার অবশ্য কারও সঙ্গেই আলাপ নেই।”

“জানি। আপনি বিদেশে থাকেন। আর এটা আপনাদের কোম্পানির ফ্ল্যাট। রতনদা বলেছে।”

মিতদ্রু ভেতরে ভেতরে একটু সতর্ক হচ্ছে। মেয়েটা কী উদ্দেশ্যে ফোন করেছে, ঠিক বুঝতে পারছে না। তবে এত সব খোঁজখবর নিশ্চয়ই গোবিন্দ দিয়েছে। গোবিন্দর ওপর মনে মনে একটু বিরক্ত হল। অনুমতি না নিয়ে এ রকম দুমদাম যাকে তাকে ফোন নম্বর দিয়ে দেওয়া যায় নাকি?

মিতদ্রুকে চুপ করে থাকতে দেখে স্নেহা আবার কুণ্ঠিত গলায় বলল, “আপনাকে বিরক্ত করছি না তো?”

“ঠিক আছে,” মিতদ্রু উৎসাহও দেখাল না, নিরুৎসাহও করল না। মেয়েটার ব্যাপারে একটা কৌতূহল হচ্ছে।

“আমি আসলে খুব বিচ্ছিরি ভাবে আটকা পড়ে রয়েছি, জানেন তো।”

“হ্যাঁ, অনেকেই তো এ রকম বিভিন্ন জায়গায় আটকা পড়ে রয়েছে চার দিকে, শুনতে পাচ্ছি।”

ম্লান গলায় স্নেহা বলল, “কী করে বুঝব বলুন এ রকম দুম করে লকডাউন হয়ে যাবে। আমরা তিন বন্ধু ছিলাম। এখানে একটা পার্লারে কাজ করি। আমাদের মালকিনের ফ্ল্যাট এটা। আমার দুই বন্ধু চলে গিয়েছে। শুধু আমি একাই আটকা পড়ে রয়েছি।”

“আপনার বাড়ি কোথায়?”

“আমার বাড়ি শিলিগুড়িতে। সেটাই তো সমস্যা। অনেক দূর। বাবা খুব চেষ্টা করছে যদি কিছু ব্যবস্থা করে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারে। আসলে আপনার সঙ্গে আলাপ করে রাখলাম কারণ যদি আপদে-বিপদে হঠাৎ করে দরকার পড়ে। রতনদাই বলেছে।”

“সে ঠিক আছে। জানেন হয়তো আমি বিদেশ থেকে এসেছি। সরকারি নিয়মে পুরো হোম কোয়ারেন্টাইনে আছি। বেরোতে চাইলেও বেরোতে পারব না। কেউ দেখা করতে এলেও বাড়ির ভেতর ডাকতে পারব না।”

“না, না। আমি আপনার বাড়ি যাব না। মানে কী বলুন তো, এই

জায়গাটা আমার একদম অচেনা আমি যদি বিপদে পড়ে আপনাকে ফোন করি, আপনি বারান্দায় একটু এসে দাঁড়াবেন প্লিজ়?”

হেসে ফেলল মিতদ্রু, “ব্যস, এইটুকুই? তা হলে বিপদ কেটে যাবে?”

লজ্জা পেল স্নেহা, “স্যরি, আপনাকে খুব বিরক্ত করছি না?”

“ঠিক আছে। সে রকম কোনও দরকার পড়লে ফোন করবেন। আফটার অল আমরা প্রতিবেশী। খাবারদাবার আছে তো আপনার?”

“সে সবের কোনও সমস্যা নেই। তা ছাড়া রতনদা এক জনের ফোন নম্বর দিয়েছে। কান্তা বৌদি। কাছাকাছিই কোথাও থাকে। দরকার হলে ফোন করে বললেই শাকসব্জি ডিম দিয়ে যাবে বলেছে।”

“জানি। আমাদের কেয়ারটেকারও ওই ভদ্রমহিলার কথা বলে গিয়েছে। ওই এক জন ভদ্রমহিলাই বোধহয় এখানকার সাপ্লাই চেনটা বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন।”

“কয়েকটা দিন তো, কেটে যাবে বলুন?” স্নেহা ভরসা খুঁজল।

“নিশ্চয়ই,” মিতদ্রু আশ্বস্ত করল, “অনন্ত কাল ধরে তো আর লকডাউন চলবে না। ঠিক আছে... দরকার হলে অবশ্যই ফোন করতে পারেন।”

ফোনটা ছেড়ে খানিক ক্ষণ চুপ করে বসে থাকল মিতদ্রু। মেয়েটার সঙ্গে কথা বলে শেষ পর্যন্ত মন্দ লাগল না।

এগারো

এখন

এলাহি খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছেন বিশ্বরূপবাবু। টেবিলের এক মাথায় জাঁকিয়ে বসেছেন। এক দিকে অসীমবাবু আর অপরূপাদেবী। উল্টো দিকে হৈমন্তী আর মিতদ্রু। অপরূপাদেবী সংযুক্তাদেবীকে বললেন, “আপনিও বসুন না দিদি।”

“না, না, আমি একটু দিয়ে নিই। নিজের হাতে রান্না করার পর নিজে পরিবেশন করতে না পারলে তৃপ্তি নেই।”

“আপনি এত সব রান্না করেছেন সকাল থেকে? খুব খাটনি গিয়েছে তো?”

“না, না। খাটনি আর কী! মধু হেল্প করেছে। কাটাকুটি জোগাড় ও করে দিয়েছে।”

অসীমবাবু চোখ বড় বড় করে দেখছিলেন শ্বেত পাথরের থালা, বাটি, গ্লাস আর পদের পর পদ এত রকম রান্না করেছেন সংযুক্তাদেবী। এত খাওয়া মানে শরীরের ওপর রীতিমতো অত্যাচার।

অসীমবাবুকে বিস্ফারিত চোখে থালাবাটিগুলো দেখতে দেখে বিশ্বরূপবাবু বললেন, “এ সবই রবিঠাকুরের ইনফ্লুয়েন্স, বুঝেছেন তো! রবিঠাকুরের কাছে খাওয়াটা শুধু খাওয়া ছিল না, একটা দর্শন ছিল। ভাবতে পারেন একটা মানুষ কতখানি নিখুঁত হতে পারেন। উনি শুধু খাওয়াই নয়, একেবারে পরিপাটি করে সাজিয়ে গুছিয়ে অতিথিকে খেতে না দিলে ভীষণ রাগ করতেন। আমার দাদুর মুখে নিজে শোনা। একটু অগোছালো করে খেতে দিয়েছেন কি রবি ঠাকুর রেগে কাঁই হয়ে উঠে যেতেন। আর তাঁকে কিছুতেই বোঝানো যেত না।”

অসীমবাবু বলে ফেললেন, “উনি কী খেতে ভালবাসতেন?”

ঠোঁট চিপে মাথাটা একটু ঝাঁকালেন বিশ্বরূপবাবু, “উনি কী খেতে ভালবাসতেন আর কী খেতে ভালবাসতেন না, এ বিষয়ে বিস্তর লেখালিখি আছে। কিন্তু কোনওটাই অথেন্টিক নয়। আসল সত্যিটা আমি খোদ দাদুর মুখ থেকে শুনেছি। উনি যে খাদ্যরসিক ছিলেন সেটা সবাই জানে। কিন্তু কী খেতে ভালবাসতেন, তার চেয়েও বড় কথা সেই সব রান্নার উপকরণ কোথা থেকে আসত! যেমন ধরুন সোনামুগ ডাল। যে সে দোকান থেকে সেই ডাল হবে না, বড় বাজারের একটা নির্দিষ্ট দোকানে সেই ডাল পাওয়া যেত। যেত মানে এখনও যায়। আপনার সামনে বাটিতে যে ডালটা দেখছেন, সেটা ওই দোকানেরই ডাল।”

ডালের বাটিটার দিকে তাকিয়ে অসীমবাবুর চোখ কপালে উঠল, “এখনও আছে সে দোকান?”

“ইয়েস। দেড়শো বছরের ওপর দোকানটার বয়স।”

হৈমন্তী মাঝখান থেকে বলে উঠল, “ড্যাডির কথা কিন্তু একটু ডিসকাউন্ট কোরো কাকু। রবীন্দ্রনাথের নাম করে ড্যাডিকে যে সে ঢপ দিয়ে টুপি পরিয়ে দেয়।”

সংযুক্তাদেবী মৃদু ধমকে উঠলেন, “আঃ হৈমন্তী! তোমার মুখের ভাষা ঠিক করো। কত বার বলেছি বাবার সঙ্গে এ সব ভাষায় কথা বলবে না। এই তোমাকে ভাল স্কুলে পড়িয়েছি?”

“আমি ভুলটা কী বলেছি? এই রবীন্দ্রনাথের নাম করে ড্যাডিকে যে যা পাচ্ছে বুঝিয়ে দিচ্ছে।”

বিশ্বরূপবাবু বললেন, “ওটা তোর মনে হয়। কোনটা খাঁটি আর কোনটা নকল সেটা বোঝার ক্ষমতা আমার আছে। আমার মেয়ে হয়ে তুই তো রবীন্দ্রনাথের কিছুই জানলি না।”

তার পর অসীমবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “ভাবতে পারেন একটা মানুষ দু-দুটো দেশের জাতীয় সঙ্গীত লিখে গিয়েছেন। গোটা পৃথিবীতে এ রকম আর একটা মানুষ দেখান তো!”

হৈমন্তী বলল, “তুমি আবার জনগণমন গাইতে আরম্ভ কোরো না। তা হলে সবাইকে উঠে দাঁড়াতে হবে।”

“রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কথায় কথায় ইয়ার্কি মারাটা বন্ধ কর। বিশ্বকবিকে শ্রদ্ধা করতে শেখ। তোদের এই বাঙালি প্রজন্মকে দেখে আমার করুণা হয়।”

অসীমবাবু বললেন, “ভাবতে পারেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আইনস্টাইনের দেখা হওয়ার কথা! দু’জন নোবেল লরিয়েট। এক জন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি আর এক জন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। এক জন লিখছেন ‘আকাশ ভরা সূর্য তারা’, আর এক জন কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে তারাদের দেখে আলো নিয়ে থিয়োরি লিখছেন ই ইকুয়ালসটু এমসিস্কোয়ার। মাস এনার্জি ইকুইভ্যালেন্স। থিয়োরি অফ জেনারেল রিলেটিভিটি। আচ্ছা, আপনার দাদু কি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তখন বিদেশ সফর করেছিলেন?”

“সেটা বড় কথা নয়। ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আইনস্টাইনের কী কথাবার্তা হয়েছিল। সেই এইটুকু বয়স থেকে সব পড়ে পড়ে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। ভাবতে পারেন, আইনস্টাইন রবীন্দ্রনাথের কাছে জানতে চাইছেন, গানের সুরে কথার গুরুত্ব। সেটা বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ আইনস্টাইনকে কীর্তন বোঝাচ্ছেন। এই দেখুন যত বার বলি গা শিরশির করে উঠে কাঁটা দেয়!” বলতে বলতে বিশ্বরূপবাবু পাঞ্জাবির আস্তিনটা গুটিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দেখিয়ে বললেন, “দাঁড়ান তা হলে। কীর্তনাঙ্গের একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাই আপনাকে। তার পর আমরা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। মধু...মধু... ‘ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে’ রেকর্ডটা চালিয়ে দে তো।”

“না ড্যাডি, এখন কোনও রেকর্ড নয়। গল্প করতে করতে খাব আমরা।”

“চুপ কর তুই। মধু চালা।”

হৈমন্তী মিতদ্রুকে বলল, “দেখেছ, কেন বলেছিলাম তোমাকে, চলো বাইরে আমরা নিজেদের মতো লাঞ্চ করি।”

অপরূপাদেবী জল খেতে গিয়ে বিষম খেলেন। সংযুক্তাদেবী বিরক্ত গলায় ধমকে উঠে বললেন, “আঃ! তোমাদের এই ঝগড়াটা বন্ধ করো তো। জানেন দাদা আমি আর পারছি না। সব সময় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাবা মেয়ের ঝগড়া লেগেই আছে।”

হৈমন্তী বলল, “আমি কোথায় ঝগড়া করি? আমি তো সত্যি কথাটাই বলি। এই যে কাকু আজকে তোমরা খাচ্ছ, এগুলো নাকি সব রবীন্দ্রনাথের প্রিয় পদ ছিল, আর সেটা একমাত্র আমার ড্যাডিই জানে।”

উত্তেজিত হয়ে বিশ্বরূপবাবু বললেন, “নিশ্চয়ই জানি। আমি দাদুর কাছে শুনেছি। রবীন্দ্রনাথ যখন খেতেন দাদু কত দিন হাত পাখা দিয়ে

বাতাস করেছেন।"

"আর রান্নার রেসিপিগুলো কি মধুকাকা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রান্নাঘর থেকে শিখে এসেছে?"

"বাজে কথা বলিস না। এইগুলো অথেন্টিক রবীন্দ্রনাথ কুইজ়িন।"

সংযুক্তাদেবী গম্ভীর গলায় বললেন, "রান্নাটা মধু নয় আমি করেছি।"

"উফ! আচ্ছা তুমি করেছ। জানো তো, কাকিমা আসলে মাম্মি এই রান্নাগুলো কোথা থেকে শিখেছে? ড্যাডি ইউটিউবে খুঁজে খুঁজে বার করে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় পদ। তার পর সেই লিংকগুলো মাম্মিকে ফরোয়ার্ড করে। এগুলোই নাকি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় কুইজ়িন।"

কথা ঘোরাতে মিতদ্রু বলল, "ইউটিউবে কিন্তু অনেক রকম রান্নার রেসিপি পাওয়া যায়। এমনকি হারিয়ে যাওয়া রান্নারও।"

"তুমি ট্রাই করেছ?" হৈমন্তী জিজ্ঞেস করল।

"কয়েক বার করেছি।"

অপরূপাদেবী বললেন, "খুব খারাপ লাগে জানেন তো, ছেলেটাকে ওখানে নিজে নিজে রান্না করে খেতে হয়। এ বার আমি নিশ্চিন্ত হব।"

হাসিহাসি মুখে অপরূপাদেবী হৈমন্তীর দিকে তাকালেন। হৈমন্তী মিতদ্রুর দিকে তাকিয়ে বলল, "দারুণ ব্যাপার তো!" তার পর চোখ টিপে বলল, "আজ রাতে তা হলে তুমি একটা ডিশ রান্না করে খাওয়াও।"

"না, না। ও কী!" সংযুক্তাদেবী চোখ পাকালেন। তার পর অসীমবাবুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নিন আপনারা খেতে শুরু করুন। ভাতটা একটু ভাঙুন দাদা, ঘি দিই।"

বিশ্বরূপবাবু আবার বলতে শুরু করলেন, "যে কথা হচ্ছিল, খাদ্যরসিক রবীন্দ্রনাথ! দেখুন মশাই রবীন্দ্রনাথ যে খাদ্যরসিক ছিলেন, সেটা তাঁর লেখাতেই প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছেন।"

কী বলবেন ভেবে না পেয়ে শুকনো গলায় অসীমবাবু আবার বলে ফেললেন, "যেমন?"

বিশ্বরূপবাবু উৎসাহী গলায় বলতে আরম্ভ করলেন, "আমসত্ত্ব দুধে ফেলি,/ তাহাতে কদলী দলি,/ সন্দেশ মাখিয়া তাতে-/

হাপুস হুপুস শব্দ/ চারিদিক নিস্তব্ধ/ পিঁপড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।"

হৈমন্তী ফুট কাটল, "তা বলে তুমি আবার হাপুস-হুপুস করে খেতে আরম্ভ করে দিয়ো না।"

বিশ্বরূপবাবু কথাটাকে পাত্তাই দিলেন না, "আহা, অপূর্ব টেস্ট মশাই! দুধ আমসত্ত্ব কলা আর সন্দেশ। দাঁড়ান কাল সকালে ব্রেকফাস্টে এটাই আয়োজন করাচ্ছি। শান্তিনিকেতনের খাঁটি গরুর দুধ আর আমার বাগানের কলা।"

অসীমবাবু ঈষৎ আঁতকে উঠলেন, "আমার আবার দুধ ঠিক সহ্য হয় না।"

সংযুক্তাদেবী আবার মৃদু ধমক দিলেন, "তুমি কি ওদের খেতে দেবে, নাকি আমার এত কষ্ট করে রান্না করা খাবারগুলো সামনে সাজিয়ে শুধু এই সব শোনাবে?"

"মধু... মধু..." গলা ছেড়ে ডাকলেন বিশ্বরূপবাবু, "আম এনেছিস?"

মধু এগিয়ে এসে বলল, "এখন তো চৈত্র মাস। এখনও পাকা হিমসাগর ওঠেনি।"

বিশ্বরূপবাবু রেগে উঠলেন, "সেটা আমাকে এখন বলছিস? আগে বলতে পারলি না হতভাগা? কলকাতা থেকে নিয়ে আসতাম।"

হৈমন্তী নিচু গলায় বলল, "কোল্ড স্টোরেজের পচা আম।"

"কিছু বললি?"

"না তো। বলছিলাম, রবীন্দ্রনাথ আম খেতে খুব ভালবাসতেন।"

"নিশ্চয়ই। সে তো সবার জানা। আর রবীন্দ্রনাথ যে সে আম খেতেন না। বিদেশে যখন গিয়েছেন, জাপানে আমেরিকায়, সব সময় আম সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছেন। আচ্ছা, তুই কি আবার ইয়ার্কি মারছিস?"

"কোথায়? আমি শুধু বলছিলাম রবীন্দ্রনাথ শুধু এই বাড়িতে কখনও খেতে আসেননি। সেটা অবশ্য ওঁর দোষ নয়। তখন বাড়িটা তৈরিই হয়নি।"

অপরূপাদেবী এত ক্ষণ ভয়ে ভয়ে কিছু বলেননি। গোলাগুলির মতো কোথা থেকে যে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ চলে আসবে বুঝতে পারছেন না। দু'বছরের ওপর আলাপ, তবে সামনাসামনি মেশার সুযোগ এই প্রথম। আর তাতেই যত দেখছেন ভেতরে ভেতরে দমে যাচ্ছেন। খালি মনে হচ্ছে বাবুসোনার বিয়েটা সুখের হবে তো? এই মেয়েকে নিয়ে বাবুসোনা ঘর করতে পারবে তো?

বিশ্বরূপবাবু বললেন, "খাওয়া দাওয়ার পরে আপনাদের এক জায়গায় নিয়ে যাব। জায়গাটায় গেলে বুঝতে পারবেন কোন পরিবেশে দাঁড়িয়ে কবি লিখতে পারেন, খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা, খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা— মনে আছে আপনার নিশ্চয়ই পরের লাইনগুলো?"

অসীমবাবু ঢোঁক গিললেন। এ তো মহা বিপাকে পড়েছেন। খেতে বসিয়ে এ বার রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে নাকি? মিয়োনো গলায় বললেন, "নিশ্চয়ই। কী অপূর্ব লাইন! ভোলা যায়?"

"কারেক্ট।" উত্তেজিত গলায় বলে উঠলেন বিশ্বরূপবাবু, "একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব অমন সুন্দর করে শেষ লাইনগুলো লেখা, দিগন্তের কোন পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা। চলুন তা হলে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়াটা সেরে দেখিয়ে নিয়ে আসি আপনাদের জায়গাটা।"

সংযুক্তাদেবী আবার চোখ পাকালেন, "কী করছ বলো তো তুমি? ওঁদের ধীরেসুস্থে খেতে দাও। আর খেয়েদেয়ে এই চত্তিরের কাঠফাটা দুপুরে কোথাও যেতে হবে না। ওঁরা বিশ্রাম নেবেন।"

হৈমন্তী বলল, "আমি আর মিতদ্রু কিন্তু খাওয়া দাওয়ার পর বেরোব।"

"কোথায় যাবি এই ঠা ঠা রোদ্দুরে?"

"আমরা একটা ফটোশুট করব সোনাঝুরির মাঠে। শ্যামলীদি মেকআপ করিয়ে দেবে বলেছে।"

"শ্যামলী মানে যে মেয়েটা দুর্গাপুর থেকে আসছে? সে তো এখনও এসেই পৌঁছল না।"

"এই তো এসে পড়বে। একটু আগে ফোন করেছিলাম। ইলামবাজারে রয়েছে।"

বারো

দু'বছর আগে

মোবাইলটা ভাইব্রেশন মোডে কাঁপছে। আর তাতেই ঘুমটা ভাঙল মিতদ্রুর। ভারী চোখ খুলে দেখল অচেনা নম্বর। তার পর মনে হল, না ঠিক অচেনা নম্বর বলা যায় না। ওই মেয়েটা স্নেহা, ওর নম্বরটা নাম দিয়ে সেভ করে রাখা হয়নি, তবে শেষ তিনটে সংখ্যা মনে আছে। ফোনটা ধরে ঘুমজড়ানো গলায় মিতদ্রু বলল, "হ্যালো।"

"গুড মর্নিং। স্নেহা বলছি। স্যরি, ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম নাকি?"

"না, ঠিক আছে। বলুন। গুড মর্নিং।"

"কী অদ্ভুত সময় কাটাচ্ছি আমরা তাই না? ঘড়ি এখন আর আমাদের তাড়া করছে না।"

"হুম, ঠিক বলেছেন," মিতদ্রু বুঝতে পারছে না স্নেহা কেন ফোন করেছে।

"আপনি বুঝি বেলা পর্যন্ত ঘুমোন?"

"না, ঠিক বেলা পর্যন্ত ঘুমোই না। সকাল সকালই উঠি। তবে আমেরিকা থেকে এসেছি তো। বায়োলজিক্যাল ক্লকটা এখনও ঠিক অ্যাডজাস্ট হয়নি। কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলাম।"

"স্যরি। আসলে আপনাকে ফোন করলাম, কান্তা বউদি বাজারে যাচ্ছে। একটু দূরে, হেঁটেই যাবে। এক বারই যায়। আপনার কিছু আনানোর থাকলে একেবারেই নিয়ে আসবে। টিভিতে বাজারের

অবস্থা দেখেছেন? মুখ্যমন্ত্রী নিজে রাস্তায় নেমে ফিজ়িক্যাল ডিসট্যান্স রাখার জন্য রাস্তায় গোল গোল দাগ কেটে দিচ্ছেন। কিছু আনানোর আছে আপনার?"

একটা হাই তুলে মিতদ্রু বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ। আমার সে রকম কিছু আনানোর নেই। বাড়িতে স্টক এখনও আছে। বাই দ্য ওয়ে, আপনিও অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন তো।"

একটু রহস্যময়ী গলায় স্নেহা বলল, "কী করে বুঝলেন?"

"একটা বদ অভ্যেস আছে জানেন তো, সিগারেট খাওয়া। বারান্দায় গিয়ে সিগারেট খাই। কালকে রাত্রি দুটোর সময় যখন বারান্দায় গিয়েছিলাম, তখন দেখলাম আপনার ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। অবশ্য আবার ভেবে বসবেন না আপনাকে স্টক করছি।"

স্নেহা হেসে উঠল, "আপনি শুনলে খুব হাসবেন, বোকা বোকা বলবেন। কী বলুন তো? আমার না একটু ভূতের ভয় আছে। একটু নয়, বেশ ভালই। কখনও ভাবিনি তো এ রকম নিঝুমপুরীতে একা একা রাত কাটাতে হবে। এত নিস্তব্ধ! দূরে কোনও খুটখাট আওয়াজ হলেও মনে হয় পাশের ঘরে কেউ আছে।"

মেয়েটা বেশ সরল। মিতদ্রুও হাসল, "তাই সব ঘরের আলো জ্বালিয়ে রেখে ঘুমোতে যান।"

"অগত্যা। কী আর করব বলুন। জানি শুধু শুধু ইলেক্ট্রিসিটির বিল বাড়াচ্ছি।"

"আপনার বাবা তো চেষ্টা করছেন বললেন আপনাকে নিয়ে যাওয়ার।"

"করছে তো। কিন্তু কিছু উপায় করতে পারছে না। পার্টি, পুলিশ সব জায়গায় চেষ্টা করছে। অনুরাধাদিও ফোন করেছিল। উনিও চেষ্টা করছেন।"

"অনুরাধাদি মানে?"

"ওই যে আমাদের পার্লারের মালকিন।"

মিতদ্রু ম্লান হাসল, "সবাই যখন চেষ্টা করছেন, ব্যবস্থা একটা হয়েই যাবে। চিন্তা করবেন না। আর আমার অবস্থাটা ভাবুন। আমি তো ইচ্ছে করলেও বেরোতে পারব না।"

"আপনার কত দিন হোম কোয়ারেন্টাইন?"

"এখনও বেশ কয়েক দিন। লকডাউন অবশ্য তখনও চলবে।"

"আজকে সকালবেলায় টিভিতে একটা খবর দেখে খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছে জানেন। দিল্লি উত্তর প্রদেশের হাইওয়ে ধরে অসংখ্য মানুষ হেঁটে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করছে। ভাবতে পারবেন না মাথায় সব বোঝা নিয়ে এই গরমের মধ্যে মাইলের পর মাইল হাঁটছে। বাচ্চাগুলোকে দেখে এত কষ্ট হচ্ছে! আমরা তো সেই তুলনায় কত আরামে আছি তাই না?"

এই ছবি মিতদ্রুও দেখেছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের ছবি। বাসু

হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছে। সেই সঙ্গে পরিসংখ্যান। দেশের সর্বত্র নোভেল করোনা বাড়ছে। চিকিৎসার ব্যাপারে এখনও কিছুটা বিভ্রান্তি আছে। আর অনেক মানুষও যেন লকডাউনের গুরুত্বটা বুঝতে পারছে না। বাসুই যেমন। পরিযায়ী শ্রমিকদের ছবি পোস্ট করার পরেই যে পোস্টটা দিয়েছে, এ বার থেকে রোজ চার ঘণ্টা মিষ্টির দোকান খোলা থাকবে।

"আপনার বাড়ি তো শ্যামনগরে বলেছিলেন, কাছেই। সে রকম হলে হেঁটেই হয়তো চলে যেতে পারবেন।"

কথাটা একটু যেন বুকে এসে লাগল মিতদ্রুর। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ফোনটা কানে চেপে স্নেহার সঙ্গে কথা বলতে বলতে টি মেকারে চায়ের জল চাপাল। চা করতে করতে বাড়ির কথা বলল, বাবা-মায়ের কথা বলল। স্নেহাও বলছিল। কথা বলতে ভাল লাগছিল। কিন্তু হৈমন্তীর কথা বলতে গিয়ে কোথায় যেন আটকে গেল মিতদ্রুর। ওটা বড্ড ব্যক্তিগত।

চায়ের কাপটা নিয়ে বারান্দায় এল মিতদ্রু। বাইরে ঝকঝকে সকাল। চোখ পড়ল রাস্তার উল্টো দিকের কোনাকুনি ফ্ল্যাটবাড়িটার ওপর। বারান্দাটায় কেউ নেই। ফাঁকা। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে স্নেহাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কত দিন কলকাতায় আছেন?"

"প্রায় চার বছর। প্রথম বছর বিউটিশিয়ানের কোর্স করেছিলাম। তার পর থেকে ওই অনুরাধাদির পার্লারেই আছি। আমাদের আসলে পার্লারের চেয়েও বেশি কাজ হচ্ছে ব্রাইডাল মেকওভার।"

"ব্রাইডাল মেকওভার, ইন্টারেস্টিং।"

"হ্যাঁ, কনেকে সাজিয়ে দেওয়া। শুধু কনেকেই নয় অবশ্য, বরকেও সাজিয়ে দেওয়া। মাঘ-ফাল্গুনে বাঙালিদের তো প্রচুর বিয়ে হয়। আমাদেরও তাই ওই সময় কাজের চাপ বেশি। এই মার্চের মাঝামাঝি চৈত্র মাস পড়ল। চৈত্র মাসে তো বিয়ে নেই। ভেবেছিলাম কয়েক দিন ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যাব। সেই দেখুন আজ কাল আজ কাল করতে করতে কেমন বিচ্ছিরি আটকে গেলাম। আচ্ছা, আপনাকে তো আমি ঘুম থেকে তুলে বকবক করিয়েই যাচ্ছি। চা খাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই?"

"আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই চা-টা তৈরি করে নিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে খাচ্ছি।"

"ও আপনি বারান্দায়?" স্নেহার গলায় অল্প উত্তেজনা ফুটে উঠল। তার কিছু ক্ষণ পরেই দূরে বারান্দায় স্নেহাকে দেখতে পেল মিতদ্রু। কিন্তু এত দূর থেকে মুখটা একেবারেই ভাল বোঝা যাচ্ছে না। তার ওপর মুখে মাস্ক। বারান্দার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে হাতটা অল্প নাড়ল মিতদ্রু। স্নেহা একই রকম ভাবে গ্রিল থেকে হাত বাড়িয়ে নাড়ল।

"যাক বাবা ভরসাটা বাড়ল।"

"কিসের ভরসা?"

"এই যে আপনাকে দেখতে পেলাম।"

"আপনি কিন্তু গল্প করতে করতে একটা জিনিস ভুলেই যাচ্ছেন। কান্তা বউদির বাজারে যাওয়ার কথা।"

"না, আসলে আমারও আজ কিছু আনানোর নেই। আপনার কিছু আছে কি না জানার জন্যই ফোন করলাম।"

"থ্যাঙ্ক ইউ। তবে নেক্সট টাইম যখন উনি যাবেন বলবেন। সিগারেট আনতে দেব। ওই স্টকটাই দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে।"

"খুব খারাপ জানেন তো। ছেড়ে দিন না। আমার দাদুর সিগারেট খেয়ে খেয়ে সিওপিডি হয়ে গিয়েছিল। শেষ জীবনে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। আর নোভেল করোনা তো দেখছি সেই লাংসেই অ্যাটাক করে।"

"ঠিক বলেছেন। খুবই খারাপ অভ্যেস। কিন্তু ছাড়তে পারছি কোথায়? কত বার পয়লা জানুয়ারি রেজ়লিউশন নিয়েছি কিন্তু হয়নি।"

"এই বার কিন্তু আপনার ভাল সুযোগ। ছেড়ে দিন। আর একটা কথা, আপনি বারান্দা থেকে দড়ি বেঁধে একটা থলি ঝুলিয়ে রাখবেন। মেন গেটের তালাটা শুধু খুলে রাখবেন। কান্তা বৌদি কিছু আনলে থলিতে দিয়ে দেবে।"

মিতদ্রু হাসল, "থ্যাঙ্ক ইউ। এটাও গোবিন্দ ব্যবস্থা করে গিয়েছে। দরকার পড়েনি বলে এখনও ঝোলাইনি।"

স্নেহার সঙ্গে কথা বলার ফাঁকেই মিতদ্রুর ফোনে পিঁক পিঁক করে আওয়াজ হতে শুরু করেছিল। স্নেহার লাইনটা ছেড়ে মিতদ্রু দেখল, হৈমন্তী। এর মধ্যেই দু'বার ফোন করার চেষ্টা করেছে। মিতদ্রু রিংব্যাক করে বলল, "গুড মর্নিং।"

"সকাল সকাল কার সঙ্গে আড্ডা মারছিলে?"

মিতদ্রু সত্যিটা এড়িয়ে বলল, "একটা কাজের ফোন ছিল। বলো।"

"বলছি, বাবুসোনা আজ কী রান্না করবে?" খিল খিল করে হাসতে লাগল হৈমন্তী।

"ভাবিনি এখনও। আপাতত ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করি।"

"কী ব্রেকফাস্ট করবে?"

"দেখি, দুধ তো আছে। ওটস কিংবা কর্নফ্লেক্স।"

"আমাদের বাড়িতে তো সকাল থেকে দক্ষযজ্ঞ চলছে।"

"কেন, কী হল আবার?"

"আরে সকালে ড্যাডি গরম গরম ফুলকো লুচি খেতে চেয়েছে। সঙ্গে সাদা আলুর তরকারি। মাম্মি বলেছে পারবে না, জাস্ট পারবে না। পাউরুটি ডিমসেদ্ধ দিয়েছে। ড্যাডি খায়নি। জেদ ধরে বসে আছে লুচিই খাবে। শেষকালে নিজেই ময়দা মাখতে গিয়ে..." খিল খিল করে হাসতে শুরু করল হৈমন্তী। মিতদ্রু জানে এই মারাত্মক হাসি সহজে থামবে না। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে পড়ে। আজ দীর্ঘশ্বাস পড়ল। হঠাৎ বাসুর হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো শয়ে শয়ে মানুষের পায়ে হাঁটা মিছিলটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

তেরো

বিশ্বরূপবাবুর বাড়িতে দুটো গেস্টরুম। তার একটায় রয়েছেন অসীমবাবু আর অপরূপাদেবী। অন্য গেস্টরুমটা মিতদ্রুর জন্য বরাদ্দ হয়েছে। দুপুরে খাওয়াদাওয়াটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছে। মধু জানালাগুলো বন্ধ করে পর্দা টেনে এসি চালিয়ে দিয়েছে। সেই কোন সকালে উঠে এত দূর সফর করে এসেছে। তার পর হৈমন্তীর সঙ্গে ঠা ঠা ঘোরা। শরীর আর দিচ্ছিল না মিতদ্রুর। এ রকম একটা ঠান্ডা ঘরে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই চোখ ভারী হয়ে আসছিল। শরীরের আর দোষ কী? খাওয়া-দাওয়ার পর একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু বিছানায় শুয়ে আর উঠতে ইচ্ছে করছে না। চোখটা বোধ হয় একটু লেগে গিয়েছিল। হঠাৎ হৈমন্তীর গলা শুনতে পেয়ে চমকে উঠল মিতদ্রু।

"তুমি ঘুমোচ্ছ?"

ভারী চোখ খুলে দেখল সামনেই হৈমন্তী দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা প্যাকেট। অল্প উঠে বসল মিতদ্রু।

"নাঃ। এই রেস্ট নিচ্ছিলাম।"

"শোনো, শ্যামলীদি চলে এসেছে। লাঞ্চ করছে। খাওয়া হয়ে গেলেই বসবে আমাকে নিয়ে। তোমার ধুতি-পাঞ্জাবিটা দিতে এলাম।"

প্যাকেট থেকে ধুতি-পাঞ্জাবি বের করল হৈমন্তী। মিতদ্রু চোখ বড় বড় করে ধুতি পাঞ্জাবিটার দিকে চেয়ে বলল, "ধুতি! আমি ধুতি পরতে পারি না। আমার জিন্স আর টি-শার্টই ঠিক আছে।"

"ধ্যাত!" হৈমন্তী মৃদু ধমকে উঠে মিতদ্রুকে অল্প ঠেলা দিয়ে বলল, "আরে আমাদের একটা ম্যাচিং ম্যাচিং ব্যাপার আছে তো নাকি?"

"বলছি তো তোমাকে ধুতি আমি পরতে পারি না।"

"জানতাম। আজকাল আর কে ধুতি পরতে পারে? কিন্তু এই একটা জিনিস সবাই বলেছে। কমন। অনুরাধাদি, পিয়ালীদি থেকে আরম্ভ করে শ্যামলীদি। ধুতি তোমাকে পরতেই হবে। মাম্মি আর আমি তাই তোমার জন্য রেডিমেড ধুতি কিনে এনেছি। ট্রাউজ়ারের মতো পরে নাও।"

পাঞ্জাবিটা মেলে ধরে হৈমন্তী বলল, "কেমন হয়েছে বলো?"

মিতদ্রু পাঞ্জাবি পরে না। শেষ যখন পাঞ্জাবি পরেছিল, তখন বোধহয় কলেজে পড়ত। আজকে হৈমন্তী জোর করে একটা বাটিকের পাঞ্জাবি কিনে দিয়েছে। এখন দেখছে শুধু সেই পাঞ্জাবিটা নয়, কলকাতা থেকে আরও একটা পাঞ্জাবি কিনে এনে রাখা আছে।

হৈমন্তী যখন পাঞ্জাবি কিনছিল তখনই মিতদ্রু হৈমন্তীকে বলেছিল, "শুধু শুধু কিনছ। পড়ে থাকবে। পয়সা নষ্ট।"

"না, তুমি পরবে। দেখো, কী সুন্দর বাটিক প্রিন্ট। শান্তিনিকেতনের এক্সক্লুসিভ। পরবে আর আমার কথা মনে পড়বে।"

"তোমার কথা আমার সব সময় মনে পড়ে। পাঞ্জাবি পরে মনে করতে হবে নাকি?"

আনমনা হয়ে মিতদ্রু পাঞ্জাবিটার দিকে তাকিয়েছিল।

"কী হল? কী ভাবছ?" হৈমন্তী জিজ্ঞেস করল।

"আচ্ছা, তোমরা কী আরম্ভ করেছ বলো তো? তখন জোর করে একটা পাঞ্জাবি কিনলে। তখন তো বলোনি, কলকাতা থেকেও একটা পাঞ্জাবি কিনে এনেছ?"

হৈমন্তী হাসল, "কলকাতা থেকে একটা নয়, দু-দুটো পাঞ্জাবি কিনেছি। একটা ফটোশ্যুটের জন্য। আর একটা রাত্রিবেলায় পরবে, পার্টির জন্য।"

"এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? আমি পাঞ্জাবি পরিই না আর তিন তিনটে পাঞ্জাবি!"

হৈমন্তী মিতদ্রুর দুটো গাল টিপে মাথাটা নাড়িয়ে বলল, "না বাবুসোনা, কিছু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না। তিনটে পাঞ্জাবি তিন রকম। ফটোশ্যুটে এ ভাবেই পরতে হয়। আচ্ছা দাঁড়াও দাঁড়াও। একটা জিনিস তো ভুলেই গিয়েছি। তুমি তো জুতো পরে এসেছ, এ মা! কী হবে? ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে কালো চকচকে জুতো!" খিল খিল করে হাসতে লাগল হৈমন্তী, "ড্যাডির চপ্পল তোমার পায়ে হবে কি? ইস! কী ভুল হয়ে গেল! তুমিও কেমন, এক বার বলবে তো। দাঁড়াও দেখছি। নিরঞ্জনদাকে পাঠাই।"

"লোকটা ভোরবেলা থেকে গাড়ি চালাচ্ছে। একটু রেস্ট নিতে দাও।"

"আরে ও প্রচুর রেস্ট নেয়। ও সব চিন্তা কোরো না তো। ব্রেকফাস্ট করার জন্য তখন দুশো টাকা দিয়েছি। কেউ দেয়? ও সব নিয়ে ভেবো না। ফটোশ্যুটটা কিন্তু জমিয়ে করতে হবে। জানো তো এটা আমার কত দিনের ইচ্ছে। ভিক্টোরিয়ায় ফটোশ্যুটের জন্য তোমার শেরওয়ানি কিনব।"

মিতদ্রু হৈমন্তীর দু'কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "তুমি ভীষণ ছটফট করছ। একটু চুপ করে বোসো তো।"

হৈমন্তী বিছানায় মিতদ্রুর পাশে বসে বলল, "জানো তো, যত সময় যাচ্ছে আমার মনটা খারাপ খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

"কেন?"

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিল্পী: **মুকুল দে** সৌজন্য: **শমীন্দ্রনাথ মজুমদার এবং অনুরাধা ঘোষ**

“খালি মনে হচ্ছে কালকে এত ক্ষণে তুমি ফিরে যাবে।”

“আরে দু'মাসের তো ব্যাপার। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।” মিতদ্রু হৈমন্তীর একটা হাত টেনে নিয়ে বলল, “আচ্ছা, তোমাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করার ছিল। রাতের পার্টিতে কত জন আসছে বলো তো?”

“ওই তো তোমাকে বললাম। বেশি নয়। ড্যাডির কলকাতার আর এখানকার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব। আমার কোনও বন্ধু এই গ্রুপে নেই। ভালই হয়েছে, বলো! তুমি আর আমি। আমরা নিজেদের মতো টাইম স্পেন্ড করতে পারব। আর ওরা পার্টিতে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ করবে।”

মিতদ্রু বলল, “মধুকাকাকে এক বার ডাকা যাবে?”

“মধুদাকাকাকে কী দরকার?”

“আমার ব্যাগটা মনে হচ্ছে বাবা মায়ের ঘরে রেখে দিয়েছে।”

“কেন তোমার ব্যাগটা এখন কী দরকার?”

মিতদ্রু হাসল, “শুধু কি তুমি আমাকে গিফ্‌ট্‌ দিতে পারো? আমি কি তোমার জন্য কিছুই আনিনি?”

হৈমন্তী ছেলেমানুষের মতো জিজ্ঞেস করে উঠল, “কী এনেছ, কী এনেছ, বলো, বলো!”

“সেই জন্যই তো বলছি, মধুকাকাকে বলো আমার ব্যাগটা একটু এই ঘরে এনে দিতে। সামান্য জিনিস অবশ্য।”

হৈমন্তী বলল, “তুমি কি জানো, কাকিমা আমাকে একটা সোনার বালা দিয়েছে। কী সুন্দর দেখতে! মাম্মি বলেছে সন্ধেবেলায় পরতে।”

মিতদ্রু জানে। গতকালই মা দেখিয়েছিল। কিন্তু এ সব ব্যাপারে ওর কোনও আগ্রহ নেই। বলল, “ও তোমার আর মায়ের ব্যাপার।”

“তোমাকে একটা সিক্রেট বলব? প্রমিস করো, এটা আমি তোমাকে বলেছি কাউকে বলবে না।”

“আচ্ছা। ট্রাস্ট করতে পারলে বলো। আমাকে এইটুকু বিশ্বাস অন্তত করতে পারো, গোটা জীবন যখন আমার সঙ্গে কাটাবে ঠিক করেছ।”

“গড প্রমিস? মাম্মির কাছে আমি প্রমিস করেছিলাম। মাম্মি তোমার জন্য একটা মোটা সোনার চেন কিনেছে আর ড্যাডি আমাদের জন্য নিউ টাউনে একটা ফ্ল্যাট। ফুল ফার্নিশড। এখন অবশ্য ইন্টিরিয়রের কাজ চলছে।”

মিতদ্রু অবাক গলায় বলল, “প্রথমত আমি সোনার চেন পরি না আর দ্বিতীয়ত, এখানে ফ্ল্যাট নিয়ে আমরা কী করব?”

“কেন, থাকব। তুমি নিশ্চয়ই ড্যাডির বাড়িতে থাকতে পছন্দ করবে না। ওই যে কী যেন বলে ঘরজামাই!” খিল খিল করে আবার হেসে উঠল হৈমন্তী।

মিতদ্রুর মনটা একটু তেতো হয়ে গেল, “তোমরা সবাই ধরেই নিচ্ছ বুঝি, আমি কলকাতায় ফিরে এসে সেটল করব? আমার কিন্তু অন্য একটা অ্যাম্বিশন আছে। আমি আমার কাজটাকে যথেষ্ট ভালবাসি। তার একটা প্রসপেক্ট আছে।”

“ঠিক, ঠিক। ড্যাডিও তাই বলে। আমাকে বলেছে তোমাকে সময় দিতে। চাপ না দিতে। ড্যাডির কথায় এক দিন তুমি ঠিকই বুঝতে পারবে রবি ঠাকুরের দেশের মহিমা। ঠিক ফিরে আসবে তুমি।”

হতাশ হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিতদ্রু বলল, “দেশে ফিরে না এলে রবিঠাকুরের মাহাত্ম্য বোঝা যায় না বুঝি?”

মিতদ্রুর অসহায় লাগছে। না পারছে হৈমন্তীর সঙ্গে আড়াই বছরের প্রেমের দুর্বার টান থেকে বেরিয়ে আসতে, না পারছে এই পরিবারের পাগলামি সামলাতে।

“কিন্তু তুমি আমার জন্য কী এনেছ, বললে না তো।”

“একটা আইপ্যাড আর সুইস চকলেট। সামান্য জিনিস।”

“সিরিয়াসলি? আমার ভীষণ পছন্দ। লেটেস্ট আইপ্যাডের মডেলটা আমার নেই। মধুকাকা...” গলা ছেড়ে হাঁক পেড়ে হৈমন্তী বলল, “যদিও মাম্মি সব সময় বলে চকলেট কোল্ড ড্রিঙ্কস না খেতে। ওয়েট বেড়ে যাচ্ছে। বাট আই লাভ আইপ্যাড।”

দরজার বাইরে থেকে মধু ডাকল, “ডাকছিলে ছোড়দি?”

হৈমন্তী উত্তর দেওয়ার আগেই মিতদ্রু বলে উঠল, “ভেতরে এসো।”

মধু ভেতরে ঢুকেই হৈমন্তীকে বলল, “ওই যে দুর্গাপুর থেকে যে দিদিমণি এসেছে, ওর খাওয়া হয়ে গিয়েছে। তোমাকে ডাকছে।”

মিতদ্রু বলল, “মধুকাকা একটা উপকার করে দেবে? মায়ের ঘরে যে নীল ব্যাগটা আছে, একটু এনে দেবে?”

মধু ঘাড় হেলিয়ে বেরিয়ে যেতেই মিতদ্রু নড়েচড়ে উঠে বসে বলল, “আমাদের তা হলে ক'টায় বেরোতে হবে?”

“সাড়ে তিনটেয় বেরোলেই হবে। সোনাঝুরি কাছেই। বেশি ক্ষণ লাগবে না যেতে। আমি যত ক্ষণে রেডি হব, তুমি রেস্ট নিয়ে নিতে পারো।”

“না, ভাতঘুমের চটকা ভেঙে গিয়েছে। যাই একটু সিগারেট খেয়ে আসি। আর ধুতি-পাঞ্জাবিটা যখন পরতেই হবে তা হলে চটিটা গিয়ে কিনে নিয়ে আসি।”

মধু ফিরে এসে বলল,“দরজা বন্ধ আছে। ওঁরা বোধহয় ঘুমোচ্ছেন।”

দরজা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে? অবাক হল মিতদ্রু। বাবা-মা তো দুপুরে ঘুমোয় না। মিতদ্রুর অবাক হওয়া মুখটা দেখে মধু বলল, “স্যরও খুব ছটফট করছেন। দুপুরে বিশ্বভারতী দেখাতে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন। কিন্তু দরজা বন্ধ দেখে আমি আর এখন ডাকলাম না।”

“বুঝেছি,” মুখ টিপে হেসে মিতদ্রু বলল।

হৈমন্তী বলল, “ঠিক আছে, তুমি যাও মধুকাকা।”

ঘরের মধ্যে এসি চলছে। মধু বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজাটাকে টেনে বন্ধ করে দিয়ে গেল। হৈমন্তী গভীর চোখে মিতদ্রুর দিকে তাকাল। তার পর মিতদ্রুর দু'গাল ধরে নাড়িয়ে গভীর একটা চুমু খেয়ে বলল, “বাবুসোনা, আই লাভ ইউ।”

চোদ্দো

গাড়িটা বড় রাস্তা থেকে সোনাঝুরি হাটের দিকে ঘুরতেই স্নেহার গলায় অস্ফুট তারিফ ফুটে উঠল, “অপূর্ব।”

অর্ক চার দিকটা দেখতে দেখতে বলে উঠল, “এই ভয়টাই করছিলাম।”

“কিসের ভয়?”

“এত ভিড়।”

ড্রাইভার বলল, “আজ শনিবার। সোনাঝুরি হাট বসে। আজকেই তো সব চেয়ে বেশি লোক হয়।”

“বুঝলাম। কিন্তু তা হলে ছবি তোলার জন্য ফাঁকা জায়গা কোথায় পাব?”

“ছোড়দি বলে দিয়েছে,” ড্রাইভার আশ্বাস দিল, “ঠিক জায়গায় নিয়ে যাব, চলুন। ওখানে প্রচুর সিনেমা সিরিয়ালের শ্যুটিং হয়।”

স্নেহা অবাক হয়ে দেখছে। কত শুনেছে সোনাঝুরি হাটের কথা, ছবিও দেখেছে। কিন্তু নিজের চোখে দেখা অন্য রকম। কিছু ক্ষণের জন্য যেন মাথা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে কী কাজে যাচ্ছে, অবশেষে দু'বছর পর কার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত দেখা হতে চলেছে।

মাস্কটা পরে নিল অর্ক। সমুদ্র জিজ্ঞেস করল, “মাস্ক পরতে হবে নাকি?”

“পরে নে। দু'ঘণ্টা কাটেনি বিয়ার খেয়েছিস। গন্ধ বেরোবে।”

স্নেহাও এত ক্ষণ মাস্ক পরেনি। হঠাৎ কী মনে হতে ব্যাগ থেকে বের করে মাস্ক পরে নিল। একটু বেশিই কি ভাবছে মিতদ্রুকে নিয়ে! সত্যিই কি নতুন করে আবার দুর্বল হয়ে পড়ছে? বুকের মধ্যে কি গুড়গুড় শব্দ হচ্ছে? পেটের মধ্যে কি প্রজাপতি ওড়াউড়ি করছে? যদি মিতদ্রু আদৌ পাত্তাই না দেয়, সহ্য করতে পারবে তো? তার চেয়ে কলকাতা ফেরার ট্রেন ধরলেই ভাল ছিল।

হাটের যত কাছাকাছি এল, মানুষের ভিড় তত বাড়তে থাকল।

মনের মধ্যে উত্তেজনাটা কিন্তু প্রশমিত করতে গিয়েও পারছে না স্নেহা। মিতদ্রু পাত্তাই দেবে না, এই আশঙ্কার পাশাপাশি মনে হচ্ছে মিতদ্রুকে সে প্রথম বার সামনাসামনি দেখবে আর মিতদ্রু রাজি হবেই। মিতদ্রুকে ছুঁয়েও দেখতে পারবে, সে ও যতই ওই হৈমন্তীর হোক না কেন।

ড্রাইভার একটা জায়গায় গাড়িটা পার্ক করল। অনেকগুলো গাড়ি পরপর পার্ক করা আছে। গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, "আপনারা একটু বসুন। আমি দেখে আসছি।"

লাল কাঁকর মাড়িয়ে ড্রাইভার পেছনের দিকে বড় বড় গাছগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। এই মেলা বেশ অন্য রকম মেলা। জানলার কাচটা নামিয়ে দিল স্নেহা। গাড়িতে বসেই দূর থেকে বাউল ঝুমুরের গান কানে আসছে, 'কারও হাতে আড়বাঁশি, কারও মুখে মুচকি হাসি...' আর তাতেই মনটা কেমন যেন করে উঠল। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সব কিছুর মধ্যেও সেই একটা খচখচানি। মিতদ্রু। মাঝে মাঝেই মনের মধ্যে ভেসে উঠছে। একটা সামান্য কাজের বাহানায় মিতদ্রুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে শেষ পর্যন্ত সম্মান থাকবে তো? মিতদ্রুকে নিজের কতটা পরিচয় দিতে হবে?

"কী ভাবছ এত?" অর্ক স্নেহার কাঁধে হাতটা রেখে জিজ্ঞেস করল।

সংবিৎ ফিরে কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে দিয়ে স্নেহা বলল, "কী অপূর্ব জায়গাটা, তাই না?"

"তা হলে একটা থ্যাঙ্কস আমাকে দাও। তুমি তো ফিরে যেতে চাইছিলে।"

"ফিরে যেতে হবেই।"

"আমার মন কিন্তু বলছে ছেলেটা রাজি হয়ে যাবে।"

"কেন এমন তোমার মনে হচ্ছে?"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অর্ক বলল, "সব কিছু ব্যাখ্যা করে বলা যায় না। গাট ফিলিংস বলে একটা জিনিস আছে। আর তা ছাড়া আমি আর একটা জিনিসও ভাবছিলাম। ধরো ছেলেটা যদি মেকআপ করতে রাজি না হয়..." একটু থেমে অর্ক বলল, "আচ্ছা তুমি ছবি তুলতে পারো?"

"ছবি, আমি? আমার ক্যামেরাই নেই।"

"আজকাল ক'টা লোকের ক্যামেরা থাকে? মোবাইলে ছবি তোলো না?"

"কাজের ছবি তুলি। তা ছাড়া সে রকম ছবি তোলা হয় না।"

"মানে তোমার মোবাইলে তোমার কাজের তোলা ছবি আছে?"

"হ্যাঁ। মেকআপ করানোর পর রেকর্ডের জন্য তুলতে হয়। পার্লারের নিয়ম। অনুরাধাদি করেছে। অনেক সময় সেই সব ছবি ক্লায়েন্টদের হোয়াটসঅ্যাপ করেও পাঠাতে হয়। অনেক সময় অন্য ক্লায়েন্টদের দেখানোর জন্য কাজে লাগে।"

অর্ক বলল, "একটু দেখতে পারি? অবশ্য যদি তোমার আপত্তি না থাকে।"

স্নেহা একটু অবাক হল। অর্ক কেন ছবি দেখতে চাইছে।

"দেখাচ্ছি," মোবাইল থেকে গ্যালারিটা খুলে অর্কর দিকে বাড়িয়ে দিল স্নেহা। ছবিগুলো দেখতে দেখতে অর্ক তারিফ করতে থাকল, "বাঃ, তুমি সত্যিকারের শিল্পী। যেমন মেকআপ করাতে পারো, তেমনই ছবি তুলতে পারো। ওয়ান্ডারফুল। ওয়ান্ডারফুল। তুমি তো আমার ভাত মেরে দিতে পারো দেখছি। জানো ফটোগ্রাফি একটা সেন্সের ব্যাপার। এটা ভেতরে থাকে। এটা শেখা যায় না। আর কিছু ছবি নেই তোমার?"

"আর কিছু মানে? এই সবই। বললাম না তোমাকে।"

"মানে আমি বলতে চাইছিলাম কোথাও বেড়াতে গিয়ে ছবি বা ভিডিয়ো তুলেছ, সে রকম কিছু ছবি।"

স্নেহা হাসল, "বেড়াতে! গত দু'বছর যা গেল। প্রথমে বাড়িতেই বসে ছিলাম। তার পর পার্লারটা খোলার পর ওই কিছু বিয়েবাড়ি আর পার্লার। সবই কলকাতার কাছেপিঠে। দু'বছর পর এই প্রথম বাইরে এলাম।"

স্নেহা বুঝতে পারছে না অর্ক কেন এ সব জিজ্ঞেস করছে। তবে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে পারছে অর্কর ওর জন্য একটা অন্য রকম অনুভূতি বোধহয় হচ্ছে। না হলে ওর জন্য এত চিন্তা করত না। আনমনে মোবাইলের গ্যালারি ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা দিনের কথা মনে পড়ে গেল। সেও দু'বছরের পুরনো। সে দিন মোবাইলে কিছু ছবি তুলেছিল।

"দাঁড়াও, দেখছি ছবিগুলো আছে কি না," আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে দু'বছর আগে ফিরতে শুরু করল স্নেহা।

সেই দিনটা বেশ মনে আছে। লকডাউনের এক বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ আকাশ কালো মেঘে ঢাকা পড়তে শুরু করেছিল। কালো মেঘের পেছনে সূর্য ফাঁকফোকর দিয়ে কমলা রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছিল। সেই বন্দি জীবনে কমলা রশ্মিগুলো কেমন যেন বাঁধনছাড়া এলো চুলের মতো হয়েছিল। খুব ছবি তুলতে ইচ্ছে করেছিল। পরে অবশ্য সেই ছবি আর দেখাই হয়নি। হঠাৎ এখন মনে পড়ে গেল। হয়তো সেই ছবিগুলো এখনও আছে।

শেষ পর্যন্ত ছবিগুলো খুঁজে পেল স্নেহা। জনমানবশূন্য রাস্তার দু'দিকে সার দিয়ে মনখারাপ মেখে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িগুলো। চোখটা যেন টানছে উল্টো দিকের কোনাকুনি বাড়িটা। সেই বারান্দাটা কি শূন্য? জুম করে দেখলেই বোঝা যাবে। তার আগেই অর্ক ঝুঁকল। তার পর মোবাইলটা স্নেহার হাত থেকে নিয়ে মুগ্ধ হয়ে বলল, "ওয়াও, ওয়ান্ডারফুল! সাধে কি বললাম, ফটোগ্রাফি মানুষের ভেতরে থাকে। শেখা যায় না। এতেই হবে। আমি বুঝে গিয়েছি তোমার চোখ কী রকম। শোনো একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। ছেলেটা যদি মেকআপ করতে রাজি না হয়, আমি তোমার জন্য অন্য একটা কাজ ভেবেছি। যখন ফটোসেশনটা চলবে, তুমি আমার মোবাইলটা দিয়ে ভিডিয়ো তুলবে। মানে ওই সিনেমায় যেমন শেষে বিহাইন্ড দ্য সিন দেখায়।"

স্নেহা প্রবল ভাবে মাথা ঝাঁকাতে থাকল, "না, না। আমি এ সব কোনও দিন করিনি। পারব না।"

অর্ক জোর করল, "পারবে, ঠিক পারবে।"

সমুদ্রও উৎসাহিত হয়ে উঠল, "এটা তো দারুণ আইডিয়া অর্কদা। স্নেহাদির তোলা ভিডিয়ো থেকে রিল ভিডিয়ো বানিয়ে দেব। পার্টি খেয়ে নেবে। পার্টি যা পাগলা।"

"যাঃ!" স্নেহা বলল।

"আরে তুমি জানো না প্রফেশন্যাল রিল ভিডিয়োর এখন কী ডিম্যান্ড!"

অর্ক স্নেহার কাঁধদুটো ঝাঁকিয়ে বলল, "তা হলে তুমিও আমাদের পার্টনার হয়ে গেলে।"

স্নেহা আলতো করে অর্কর হাতদুটো কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল।

ড্রাইভার ফিরে এসে বলল, "চলুন, ডাকছে আপনাদের।"

"কে?"

"ছোড়দি।"

গাড়ি থেকে সবাই নেমে ড্রাইভারের পেছন পেছন এগোতে থাকল। সার দিয়ে পরপর গাড়ি পার্ক করা আছে। কিছুটা এগিয়ে বড় কালো এসইউভি। জানলায় কালো কাচের ফিল্ম লাগানো। কাচগুলো তোলা। অর্ক সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে পাওয়ার উইন্ডোর বোতাম টিপে কাচটা নামাল হৈমন্তী। হৈমন্তীর মুখটা পুরো মেকআপ করা। হৈমন্তীর পাশে এক মহিলা হাতে একটা ব্লেন্ডার নিয়ে বসে আছে। বোধহয় মেকআপ আর্টিস্ট। হৈমন্তীর ছবি পিয়ালীদি মোবাইলে দেখেছে। মিষ্টি ফুলোফুলো মুখ। তবে মেকআপটা একটু চড়া মনে হচ্ছে। কিন্তু স্নেহা বলার কে? স্নেহার মনে হল ও মেকআপ করালে হৈমন্তীকে আরও সুন্দরী করে তুলতে পারত।

অর্ক বলল, "হৈমন্তী ম্যাডাম, এই আলোটা কিন্তু বেশি ক্ষণ থাকবে না। আসুন।"

হৈমন্তী জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এক দিক দেখে বলল, "যাব তো। কিন্তু ও কোথায় গেল?"

হৈমন্তী একটু ছটফট করে উঠে ড্রাইভারদের বলল, "নিরঞ্জনদা তোমরা একটু খুঁজে দেখবে, মিতদ্রু ওই দিকে কোথায় গেল?"

"দেখছি," দু'জন ড্রাইভার মেলার দুদিকে মিতদ্রুকে খুঁজতে গেল।

অর্ক সুযোগ খুঁজছিল। গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে স্নেহাকে দেখিয়ে বলল, "হৈমন্তী ম্যাডাম, ও স্নেহা। কলকাতা থেকে এসেছে। অনুরাধা ম্যাডাম পাঠিয়েছে।"

স্নেহা হাতজোড় করে নমস্কার করল। হৈমন্তী প্রতি নমস্কার করার ভদ্রতা না দেখিয়ে বলল, "আমি যা বলার অনুরাধাদিকে বলে দিয়েছি। আমার আর দরকার হবে না।"

অর্ক তাড়াতাড়ি মনে করিয়ে দিল, "আপনাকে বললাম না, যদি ও স্যারকে একটু মেকআপ করিয়ে দেয়... মানে কী বলুন তো, মুখটা একটু পরিষ্কার করিয়ে নিলে ছবিগুলো ভাল হবে। বিশেষত ক্লোজ়আপে।"

হেসে উঠে হৈমন্তী পাশের মহিলাকে অল্প ঠেলে বলল, "স্যারকে তো চেনে না। কিন্তু ও গেলটা কোথায়?" হৈমন্তী চার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে মিতদ্রুকে খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আর তখনই হৈমন্তীকে দেখে এগিয়ে এল কটা চোখের একটা মেয়ে। তার পাশে এক জন অল্পবয়স্ক বাউল।

"হৈমন্তী তুই?"

"আরে অরণ্যা, তুই এখানে?"

"জানিস তো মাঝে মাঝে শনিবারের হাটে মাল তুলতে আসি। কিন্তু তুই এত সাজগোজ করে গাড়িতে বসে কী করছিস?"

"বলছি তোকে। আগে বল আজ এখানে থাকছিস?"

অরণ্যা বাউল ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, "প্ল্যান একটা করছিলাম। কিন্তু তুই বললে তোদের বাড়িতে থাকব।"

"ঠিক আছে। সন্ধে বেলায় তা হলে চলে আয় আমার বাড়ি। সারপ্রাইজ় আছে।"

"সারপ্রাইজ়?"

"বলব তোকে। একটু পরে ফোন করছি। চলে আসিস পাক্কা কিন্তু।"

"বুঝতে পেরেছিস? আজকে হবে না," অরণ্যা বাউল ছেলেটাকে বলল।

অর্ক আকাশের দিকে তাকাল। এই সময় আলোর তারতম্য দ্রুত বদলে যায়। বলল, "দাঁড়ান। আমিও খুঁজে দেখি স্যার কোথায় গেলেন।"

ড্রাইভাররা যে দিকে গিয়েছিল সে দিকেই পা বাড়াল অর্ক। সমুদ্র আর স্নেহাও সঙ্গে চলল। হাঁটতে হাঁটতে স্নেহা বলল, "তোমাকে একটা কথা বলব অর্ক? তুমি ছেলেটাকে আমার নাম বোলো না।"

অর্ক অবাক হল, "কেন?"

"আসলে... আমাদের এই পার্লারের লাইনে অনেক ছেলে নাম ফোন নাম্বার জেনে গেলে বিরক্ত করে। এমনও হয়েছে বৌভাতের দিন কোনও ছেলের মেকআপ করেছি, রাতে ফোন করেছে।"

"সত্যি সুন্দরীদের যে কত রকম সমস্যায় পড়তে হয়। আচ্ছা আমি না হয় তোমাকে পার্টনার বলে ডাকব। কিন্তু তোমাকে ইন্ট্রোডিউস করার সময় কিছু একটা নাম তো বলতে হবে।"

"থাক না। উহ্যই না হয় থাকল।"

"এই যে দাদা, এই দিকে..." পরিচিত গলাটা শুনে সে দিকে তাকাল তিন জনে। ও দিকে একটু দূরে ড্রাইভার দু'জনের এক জন হাতটা তুলে ডাকছে। তিন জনে এগিয়ে গেল। কয়েক জন মেয়ে কোমর ধরাধরি করে মৃদঙ্গর তালে তালে নাচছে। এক জন দোতারা বাজিয়ে গান গাইছে, 'কালো জলে কুচলা তলে ডুবল সনাতন, আজ সারা না, কাল সারা না পাই যে দরশন।'

মিতদ্রু এক পাশে দাঁড়িয়ে তালে তালে হাতে তালি দিচ্ছে। অর্ক তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল, "স্যর, আলোটা পড়ে যাবে। চলুন ফটোসেশনটা শেষ করে ফেলি।"

মিতদ্রু ওদের দিকে চেয়ে হাসল, "হ্যাঁ, চলুন।"

স্নেহা একটা ঘোর নিয়ে মিতদ্রুর দিকে তাকিয়ে আছে। মিতদ্রু আর অর্ক হাঁটতে শুরু করতেই সমুদ্র স্নেহার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, "চলো দিদি।"

অর্ক বলতে থাকল, "স্যার একটা রিকোয়েস্ট, না বলবেন না। আপনার মুখে হালকা একটু টাচআপ মেকআপ দরকার। ও করে দেবে, প্লিজ় না বলবেন না, দু'মিনিটের ব্যাপার। আসলে হৈমন্তী ম্যাডাম এত শখ করে ফটোসেশনটা করাচ্ছেন... লাইফ টাইম মেমারি... আমরাও চাই কাজটা মনের মতো হোক..."

মিতদ্রু এক ঝলক স্নেহার দিকে তাকাল। অর্ক বকবক করেই যাচ্ছে। স্নেহার মাথায় একটাও কথা ঢুকছে না। মনে হচ্ছে, লাল কাঁকরের মাঠে যেন স্বপ্নের মধ্যে হাঁটছে।

পনেরো

দু'বছর আগে

গুমোট গরমে ঘুমটা ভেঙে গেল মিতদ্রুর। এসিটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অদ্ভুত নিস্তব্ধ চার দিক। খুব সম্ভবত বিদ্যুৎ নেই। আজকাল লোডশেডিং হয় না। হয়তো কোনও ফল্ট। এখন কখন আবার বিদ্যুৎ আসবে জানা নেই। দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যাস নেই মিতদ্রুর। কিন্তু একা বাড়িতে ক'দিন দুপুরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়ছে আর সেই ঘুম গিয়ে ভেঙেছে সন্ধেবেলায়। সন্ধেবেলায় ঘুম ভাঙা মানে একটা অবসাদ গ্রাস করে ফেলে। আর অবসাদে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। লকডাউনের এক একটা দিন কাটছে, পৃথিবী জুড়ে সমস্যাটা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। ভাবলেই অবসাদ আরও গভীর হয়।

ঘুম ভেঙে উঠে অভ্যেসমতো চা খেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু রান্নাঘরে গ্যাস নেই। ইন্ডাকশন হিটার আর ইলেকট্রিক কেটলি দুটোই বিদ্যুৎনির্ভর। সুতরাং অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই। বারান্দায় বেরিয়ে এল মিতদ্রু। চার দিকে সেই খাঁ খাঁ দৃশ্য। দূরে উল্টো দিকে বাড়িটার বারান্দায় চোখ পড়ল। স্নেহাও বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। এত দূর থেকে যেটুকু বোঝা যাচ্ছে, খুব সম্ভবত মোবাইল দেখছে। একটু ইতস্তত করে স্নেহাকে ফোন করেই ফেলল মিতদ্রু। দেখতে পেল স্নেহা ফোনটা ধরল।

"হ্যালো।"

"বিরক্ত করছি না তো?"

স্নেহা গ্রিলের মধ্যে থেকে হাতটা বাড়িয়ে নাড়ল, "না, বিরক্ত কিসের?"

"আসলে কারেন্ট চলে গিয়েছে। কিছু খবর পেয়েছেন? মানে আমার কাছে ইলেকট্রিক অফিসে কমপ্লেন করার ফোন নাম্বার নেই। ভাবলাম আপনি যদি ফোন করে থাকেন।"

"না, আমার কাছেও নেই। তবে এখানে তো কারেন্ট যায় না। আজই প্রথম দেখছি।"

"হ্যাঁ, সেটাই। নিশ্চয়ই কোন ফল্ট হয়েছে। ইলেকট্রিসিটি অফিসকে জানাতে হবে তো।"

"দাঁড়ান দেখছি। বাড়িতে বোধহয় ইলেকট্রিক বিল আছে। ওখানে কল সেন্টারের নাম্বার দেওয়া আছে।"

"ঠিক আছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। স্যরি।"

"আরে স্যরি কেন! ঠিকই তো বলেছেন। কমপ্লেন করা দরকার। আচ্ছা, আমার মাথায় এল না কেন বলুন তো? রতনদার কাছে তো সব নম্বর আছে। রতনদাকে একটা ফোন করে বলে দিলেই হবে।"

মিতদ্রু একটু লজ্জা পেল। সত্যিই তো! এই মেয়েটার কথা ভাবার আগে গোবিন্দর নামটা মনে পড়া উচিত ছিল। ওকে বললেই তো কমপ্লেন লজ করে দেবে।

"ঠিক বলেছেন। দাঁড়ান আমি দেখছি।"

"আমার ভয়টা কী বলুন তো, রাত্রি নেমে যাওয়ার পরও যদি কারেন্ট না আসে, এই এত বড় বাড়িতে অন্ধকারে একা থাকতে হবে! উফ! ভাবতেই পারছি না।"

"ও আপনার তো আবার ভূতের ভয়। কী করবেন?"

"সেটাই তো ভাবছি। কোথায় যাব? এই বারান্দাতেই হয়তো সারা রাত্রি দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। উফ!"

মিতদ্রু একটু চিন্তা করে বলল, "একটা উপায় ভেবে দেখত পারেন। যদি রাত্রি পর্যন্ত কারেন্ট না আসে, কান্তা বউদিকে রিকোয়েস্ট করে দেখতে পারেন, যদি রাতে আপনার ফ্ল্যাটে এসে শোন।"

"ভাল বলেছেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বাইরের লোক ঢোকানো কি ঠিক হবে? শুনেছেন তো কলকাতাতেও একটা দুটো করে কেস বেড়েই চলেছে। দশ ছুঁই ছুঁই হতে চলল।"

"হ্যাঁ সেটাই তো চিন্তার। বিদেশে একটা দুটো করে কেস দিয়ে শুরু হয়েছে আর তার পর জিপি সিরিজে বেড়েছে।"

আতঙ্কিত গলায় স্নেহা বলল, "তার মানে কয়েক দিনের মধ্যে এটা কলকাতায় একশো ছাড়িয়ে যাবে?"

"ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন সেটা যাতে না হয়।"

"খুব চিন্তা হচ্ছে জানেন। বাবা বলছে খুব চেষ্টা করছে এখানে এসে আমাকে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু আসাটা ঠিক হবে না বলুন?"

মিতদ্রু চট করে কোন মন্তব্য করতে পারল না। একটু ভেবে বলল, "ঠিকমতো প্রোটেকশন নিয়ে যদি আসতে পারেন অতটা হয়তো ভয়ের কিছু নেই।"

"কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে অনেকটা রাস্তা তো। আমার বাবা-মাকে নিয়ে খুব চিন্তা। ওঁদের বয়স হয়েছে। চিন্তা তো শুধু করোনা নিয়ে নয়, এই যে সমানে আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করে যাচ্ছে, এটাই খারাপ লাগছে। শরীর খারাপ না হয়ে যায়।"

"একদম ঠিক বলেছেন। আপনিও বাইরে থাকেন, আমিও বাইরে থাকি। আমি হয়তো অনেক দূরে থাকি, আপনি সেই তুলনায় কাছে। কিন্তু বাবা-মায়েদের নিয়ে সমস্যাটা একই।"

"আচ্ছা আপনার সময় কাটছে কী করে?"

স্নেহার এই সরল প্রশ্নটায় হেসে ফেলল মিতদ্রু, "বাংলায় একটা কথা আছে জানেন তো? শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুনে সময় কাটানো। এখনকার ফ্ল্যাটে তো সিলিংয়ের কড়িকাঠ নেই। তাই কী ভাবে সময় কাটাব ভাবতে ভাবতেই সময় কেটে যাচ্ছে।"

এ বার স্নেহাও হেসে উঠল, "কী রকম মনে হচ্ছে না আমরা চিড়িয়াখানার খাঁচায় বন্দি।"

"চিড়িয়াখানার খাঁচা হলে তাও কিছু মানুষজন দেখতে আসত। আমাদের অবস্থা তার চেয়েও খারাপ!" মিতদ্রুও হাসল।

"যা বলেছেন। কত ক্ষণ আর এর-ওর সঙ্গে ফোনে গল্প করা যায়? আর এখন তো শুধু একটাই গল্প। করোনা আর করোনা। তবে কিছু লোক খুব মজায় আছে জানেন তো। গোটা ফ্যামিলি এক সঙ্গে বাড়িবন্দি।"

"মানে পরিবারের এক সঙ্গে থাকাটা ভাল বলেছেন? এক সঙ্গে থাকতে গিয়ে অনেক কিছু হচ্ছে কিন্তু। সে দিন এক জন আমাকে বলছিল, এক কোম্পানির বড়কর্তাকে সব কাজ ফেলে ঘর ঝাড়পোঁছ করতে হচ্ছে। বাড়ির কাজের লোক কেউ আসছে না তো!"

হাসল স্নেহা, "শুধু ঘর মোছা? কাপড় কাচা, বাসন মাজা সব করতে হচ্ছে। এই গল্প তো এখন ঘরে ঘরে। তবে আপনার নিশ্চয়ই অসুবিধে হচ্ছে না।"

"কেন?"

"আপনি তো আমেরিকায় থাকেন। ওখানে শুনেছি কাজের লোক পাওয়া যায় না। সব কাজ নিজেকে করতে হয়।"

"তা করতে হয়। যস্মিন দেশে যদাচার। তবে এখানে ধুলোটা একটু বেশি, ওখানে তুলনায় কম। তা ছাড়া অনেক রকম গ্যাজেটসও আছে..."

মিতদ্রুর সঙ্গে গল্প করতে বেশ ভাল লাগছিল স্নেহার। এত ভদ্র, মার্জিত। অথচ এত কাছাকাছি রয়েছে দু'জনে কিন্তু মুখোমুখি বসে গল্প করতে পারছে না এটাই আক্ষেপ। লকডাউনের নিয়মটা যদি এ রকম হত যে কাছাকাছি বাড়িতে যাওয়া যাবে, তা হলেই তো দিব্যি সময় কেটে যেত।

স্নেহা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, "আপনি ডালগোনা কফি করতে পারেন?"

"ডালগোনা কফি! সেটা কী জিনিস?"

"ও মা! আপনি ডালগোনা কফি জানেন না? এখন তো ফেসবুকে এটা তুমুল ভাইরাল হয়েছে। আপনার ফেসবুক নেই?"

"নাঃ!" হেসে বলল মিতদ্রু।

স্নেহা শুনে অবাক হল, "সে কী! আপনার ফেসবুক নেই? আমার তো ফেসবুকেই অনেকটা সময় কেটে যায়।"

"ভাল।"

"তাই জন্য আপনি ডালগোনা কফি জানেন না। উফ! ডালগোনা কফি করা যে কী ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার।"

"আমার সত্যি কোনও ধারণা নেই।"

"ফেসবুক নেই, তা হলে নিশ্চয়ই আপনার টিকটকও নেই।"

"না আমার সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও অ্যাকাউন্টই নেই। এক বার আমার এক বন্ধু আমার ফোনে ইনস্টাগ্রামের একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিল। তখন কিছু ছবি পোস্ট করেছিলাম। তার পর ভুলেও গিয়েছি। পাসওয়ার্ডও মনে নেই।"

"সে তো পাসওয়ার্ড রিট্রিভ করে নিতে পারেন।"

"তা পারি। কিন্তু করে কী হবে বলুন তো? এখন আর কী ছবি পোস্ট করব? তবে আপনার ডালগোনা কফিটা ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। শুনি একটু।"

"ওরে বাবা, ফেসবুকে সবাই করছে দেখে আমিও এক দিন চেষ্টা করলাম। প্রচণ্ড ফেটাতে হয়। ফেটিয়ে ফেটিয়ে হাত ব্যথা হয়ে গিয়েছে।"

"ভিডিয়ো তুলেছেন নাকি?"

"না, ভিডিয়ো আর তোলা হয়নি। এক বার ভেবেছিলাম ভিডিয়ো তুলে টিকটকে পোস্ট করব। হয়ে ওঠেনি। ওই কফি করার এক দিন চেষ্টা করেছিলাম সময় কাটানোর জন্য।"

"বেশ, তা হলে এই সব ঝামেলা মিটলে সুযোগ পেলে এক দিন আপনার হাতের ডালগোনা কফি খেয়ে আসব।"

স্নেহা খুব খুশি হয়ে উঠল। আশা করেনি মিতদ্রু নিজে থেকেই কফি খেতে চাইবে। অথবা এটা কি একটা ইঙ্গিত? ইঙ্গিতও যদি হয়, খারাপ কী? সে বলল, "ডালগোনা কফি না হোক, আপনাকে ভাল কফি করেই খাওয়াব। আচ্ছা আর তো সপ্তাহ দুয়েক লকডাউন। তার পর সব ঠিক হয়ে যাবে, তাই না?"

"লেটস কিপ আওয়ার ফিঙ্গারস ক্রসড।"

"আমার না মাঝে মাঝে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে হচ্ছে। আমাকে তাও অনুরাধাদি একটা থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আপনি কাগজে পড়েছেন, বিভিন্ন রাজ্যে কত মানুষ আটকে পড়ে রয়েছেন? তারা এখনও মাইলের পর মাইল হেঁটে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করছেন। আমি তো ভাবতেই পারছি না যদি আমাকে কলকাতা থেকে হেঁটে নর্থ বেঙ্গলে..."

"একদম এ সব চিন্তা মাথায় আনবেন না। ধৈর্য ধরুন। ঠিক ব্যবস্থা কিছু একটা হবে। কত রকম সমস্যা চার দিকে। জানি না কতটা সত্যি, হোয়াটসঅ্যাপে এক কোলিগ পাঠিয়েছে দেখলাম, একটা গ্রামে বাইরে থেকে আসা মানুষদের গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তারা গ্রামের বাইরে গাছের নীচে বাস করছে।"

"আমি ও রকম একটা খবর ফেসবুকে পড়েছি। মাঝরাতে লুকিয়ে বাড়িতে ফিরেছে। তার পর থেকে ঘরবন্দি। কোনও ভাবে সেটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর গ্রামের লোকেরা চড়াও হয়ে ভাঙচুর করেছে।"

"এরকম অনেক ঘটনাই এখন ঘটছে। ডাক্তার নার্সদের কোনও কোনও পাড়ায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। প্রশাসন থেকে সাধারণ মানুষ কেউই তো এ রকম অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিল না। গোটা পৃথিবীতে একই অবস্থা। যাক্ গে ছাড়ুন, এই নোভেল করোনা নিয়ে যত আলোচনা

করবেন ততই মন খারাপ বাড়বে। তার চেয়ে সরকার ডাক্তাররা যেমন বলছেন, সে রকমই আমরা সাবধানে থাকার চেষ্টা করি।”

“ঠিক বলেছেন। দেখুন না ক’টা দিন তো পেরিয়ে গেল। আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। আমিও তাই চেষ্টা করছি পজ়িটিভ থাকার। যখন কোনও কিছু আমাদের হাতে নেই, তখন এ ছাড়া উপায় কী! তাকিয়ে আছি চৈত্র সংক্রান্তির দিকে চেয়ে। ওই দিন লকডাউন শেষ হবে। পয়লা বৈশাখ থেকে আমরা আবার ইচ্ছে মতো ঘুরতে পারব।”

বাসু হোয়াটসঅ্যাপে লিখেছে লকডাউন এক্সটেনডেড হবেই। সে কথা স্নেহাকে আর বলতে পারল না মিতদ্রু। কথায় কথায় সন্ধের অন্ধকার নেমে আসছিল। পাড়া জুড়ে অন্ধকার। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলো জ্বলছে না। তবে এই পরিস্থিতিতে দু’জনেরই দু’জনের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছিল। এর মধ্যেই বিদ্যুৎ ফিরে এল। নিঝুমপুরীতে আলো জ্বলে উঠল। এই প্রথম বোধ হয় আলো চলে আসায় মন খারাপ হল স্নেহার।

“যাক, আমাদের কমপ্লেন করার আগেই আলো চলে এল।”

মিতদ্রু বলল, “নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আপনাকে আর সারারাত অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।”

“কী করবেন এখন? মানে এর পর আপনার সময় কাটবে কী করে?”

মিতদ্রু হেসে উঠল, “ওই কড়িকাঠ বলছেন? কড়িকাঠের জায়গা নিয়েছে একটা ওয়েব সিরিজ়। ‘ডার্ক সার্কল’। খুব ইন্টারেস্টিং! চার-পাঁচ মাস আগে আমেরিকায় প্রথম এপিসোডটা দেখেছিলাম। সবক’টা এপিসোড দেখতে আট সাড়ে আট ঘণ্টা লাগবে। ওটাই দেখতে আরম্ভ করেছি।”

“বাঃ। ইউটিউবে পাব?”

“না, ইউটিউবে নেই। ওটিটি অ্যাপে আছে।”

“ওটিটি অ্যাপ মানে?”

“অ্যাপ, সাবস্ক্রাইব করে দেখতে হয়।”

একটু মেয়ানো গলায় স্নেহা বলল, “ও আচ্ছা। আমার ও সব নেই।”

“আপনি দেখবেন? আমার পাঁচটা ইউজ়ারের সাবস্ক্রিপশন করা আছে। আপনাকে লিঙ্ক, ইউজ়ার আইডি, পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দিচ্ছি। ডাউনলোড করে নিন। ভাল লাগলে বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে যাবে। আমার তো ভীষণ ইন্টারেস্টিং লাগছে।”

মিতদ্রুর ফোনে বিপ বিপ আওয়াজ হতে শুরু করেছে। কান থেকে ফোনটা নামিয়ে মিতদ্রু দেখল হৈমন্তী। স্নেহাকে বলল, “আমার একটা ফোন আসছে, ছাড়ি এখন?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ। লোডশেডিং-এর মধ্যে সময়টা কিন্তু দিব্যি কেটে গেল আপনার সঙ্গে কথা বলে।“

“থ্যাঙ্ক ইউ। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাকে অ্যাপের ডাউনলোড লিঙ্ক আর ইউজ়ার আইডি পাসওয়ার্ড, গুড নাইট।”

স্নেহার ফোনটা ছেড়ে মিতদ্রু ফোন করল হৈমন্তীকে। ফোনটা ধরেই হৈমন্তী জিজ্ঞেস করল, “কার সঙ্গে এত ক্ষণ ধরে কথা বলছিলে?”

“আরে আমাদের এখানে পাওয়ার চলে গিয়েছিল। এই ফিরল।”

ষোলো

সোনাঝুরির হাটে একটা শাড়ি কিনে ফেলল স্নেহা। পরে এসেছিল জিনস আর টি-শার্ট। সঙ্গে আছে রাতপোশাক। এ ছাড়া আর কীই-বা দরকার ছিল? কাজের সময় জিনস আর টি-শার্টেই সুবিধে। কিন্তু হঠাৎ বিশ্বরূপবাবুর বাড়িতে সন্ধেবেলার পার্টিতে নেমন্তন্ন পেয়ে শাড়িটা কিনতে খুব ইচ্ছে করল। শাড়িটা কাঁথা স্টিচের। দরদাম করার পরেও যথেষ্ট বেশি দাম। দোকানদার মেলার মধ্যে ক্রেডিট কার্ড নিল বলে রক্ষা। তবে এটা মেটাতে বেশ সময় লাগবে।

হঠাৎ এত দাম দিয়ে শাড়িটা কেন কিনে ফেলল স্নেহা? আবেগতাড়িত হয়ে কি? জানে, নিজেকে প্রশ্ন করেও উত্তর পাবে না। মানুষের মন বড় বিচিত্র। খোলা চোখেও মনের মধ্যে অনেক স্বপ্ন ভেসে বেড়ায়। দোকানদার ব্লাউজ় আর পেটিকোটও জোগাড় করে দিল। অর্ক সঙ্গে ছিল বলে দরদাম করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তবু একটু ইতস্তত লাগছিল স্নেহার। খালি মনে হচ্ছিল অর্ক বোধহয় বুঝে ফেলছে ওর মনের ভিতরের কথাগুলো।

আলো কমে আসছিল। অর্ক তাড়াহুড়ো করছিল। ঠিক মনের মতো জায়গা পাচ্ছিল না। তার পর ড্রাইভাররাই নিয়ে এল পলাশ বনে। অর্ক বলার পর মিতদ্রু স্নেহার দিকে এগিয়ে এল।

স্নেহার মনে হয়েছিল, মিতদ্রু ওর চোখের দিকে কিছু ক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিল। অনেক কাল, অনেক কথা যেন ধরা আছে এই মুহূর্তটায়। এই মুহূর্তটার জন্য স্নেহা কত দিন অপেক্ষা করেছে। মিতদ্রু কি চিনতে পারছে? স্নেহার খুব ইচ্ছে করছিল মুখের ওপর থেকে মাস্কটা খুলে মিতদ্রুকে এই প্রশ্নটা করে। আর তার পর নিজের মনেই হেসেছে। মুখোশ খুললেই বা কী, না খুললেই বা কী! কী করে চিনবে? কিন্তু মিতদ্রু ওর চোখের দিকে যে ভাবে চেয়ে ছিল, তার কি কোনও অর্থই নেই?

“জাস্ট একটু কিন্তু!” সংবিৎ ফিরিয়ে চোখটা নামিয়ে নিয়ে নরম গলায় মিতদ্রু বলেছিল।

হৈমন্তী ব্যস্ত ছিল শ্যামলীকে নিয়ে। অর্ক আর সমুদ্র স্পট দেখছিল। ব্যাকপ্যাক থেকে সামান্য সরঞ্জাম আর প্যালেট বার করে গাড়ির বনেটের ওপর সাজিয়ে নিয়েছিল স্নেহা। একটা টিসু পেপারে ক্লেনজ়ার নিয়ে মিতদ্রুর গালে ঠেকাতেই একটা শিহরন হয়েছিল। এ রকম কখনও হয়েছে কি? পেশাদার বিউটিশিয়ান হয়ে কত পুরুষের মেকআপ করিয়েছে। চোখটা তার পর বন্ধ করে নিয়েছিল মিতদ্রু। আর স্নেহাও যেন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিল।

এর পর যত ক্ষণ ফটোসেশন চলছিল, অর্কর মোবাইলে ভিডিয়ো তুলছিল স্নেহা। মিতদ্রু বেশ স্মার্ট। অর্ক যেমন যেমন ভাবে পজ়িশন দেখিয়ে দিচ্ছিল, চটপট সে ভাবেই নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছিল। সেই তুলনায় হৈমন্তী একটু এলোমেলো। হাতের মোবাইলে ভিডিয়ো স্ক্রিনে স্নেহা বিভোর হয়ে দেখছিল মিতদ্রুর হাসি কী চমৎকার। একেবারে মাপা অথচ কৃত্রিম নয়। খুব স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব। হৈমন্তীর পিঠে যখন অর্কর কথামতো হাত রাখছিল কী সাবলীল, আভিজাত্যপূর্ণ।

ভিডিয়ো তুলতে তুলতে কোথাও কি স্নেহার দীর্ঘশ্বাস পড়ছিল? মনে মনে নিজেকে বলেছে, বোকা, বোকা, বোকা। সাত জন্মের বোকা। কোথায় মিতদ্রু আর কোথায় ও। তবে পৃথিবীটা বড় আশ্চর্য জায়গা। কখনও নির্জনে দু’জনকে কাছাকাছি এনেও মুখোমুখি হতে দেয় না, আবার কখনও কেউ হারিয়ে গিয়েও ভিড়ের মধ্যে অদ্ভুত ভাবে ফিরে আসে। দু’বছর আগে এ রকমই চৈত্রের সময় অসুস্থ পৃথিবীর বুকে মিতদ্রু অনেক অলীক জাল বুনে ফেলেছিল স্নেহার মনে। তার পর সেই জাল ফেলে রেখে হঠাৎই হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জালটা যে এখনও সে রকমই আছে!

ফটোসেশন হয়ে যাওয়ার পর অর্ক ক্যামেরার এলসিডি স্ক্রিনে মিতদ্রু আর হৈমন্তীকে কিছু সদ্য তোলা ফটো দেখিয়েছিল। সেই সঙ্গে স্নেহার তোলা ভিডিয়োগুলোও। দু’জনেরই ভাল লেগেছিল। অর্ক সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে পেয়েছিল ব্যবসা।

হৈমন্তী আহ্লাদি গলায় বলে উঠেছিল, “বাঃ, কী মজার উঠেছে দ্যাখো।”

অর্ক বলেছিল, “এডিট করে দারুণ সব রিল ভিডিয়ো করা যাবে কিন্তু। ফেসবুক ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করতে পারবেন।”

“প্লিজ়, প্লিজ় অর্কদা, করে দিয়ো। গ্রেট আইডিয়া। তবে একটা কন্ডিশন। ড্যাডিকে দেখানো চলবে না। আমি পেমেন্ট করে দেব।”

মিতদ্রু হেসে ফেলেছিল, “কেন?”

“ঠিক রবীন্দ্রসঙ্গীত বসিয়ে দিতে বলবে।”

সবাই হেসে উঠেছিল, আর অর্ক পেয়ে গিয়েছিল আরও ব্যবসা, "ঠিক আছে। তা হলে না হয় দুটো ভারশন করে দেব। একটা আপনার মনের মতো গান দিয়ে আর অন্যটা স্যর যেমন বলবেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে।"

মিতদ্রু স্নেহার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেছিল, "থ্যাঙ্ক ইউ। খুব সুন্দর তুলেছেন। সন্ধেবেলায় আসছেন তো?"

নিছক ভদ্রতা? বলার জন্যই বলা? মেকআপ পছন্দ হয়েছে? ভিডিয়ো পছন্দ হয়েছে? কিছুই ভাবতে ইচ্ছে করেনি স্নেহার। শুধু মিতদ্রুর কথাগুলো কানে বেজে একটা অদ্ভুত আন্তরিকতার সুর শুনতে পেয়েছিল স্নেহা। অথবা আরও বেশি কিছু। ভেতরটা তির তির করে কেঁপে উঠেছিল।

ওরা চলে যাওয়ার পরে স্নেহা অর্ককে বলেছিল, "একটু শাড়ি দেখব। আর এক বার যাবে হাটে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। চলো না," অর্ক তৎক্ষণাৎ রাজি। ফটোসেশন হয়ে যাওয়ার পর আবার সোনাঝুরির ভাঙা হাটে গিয়ে বেগুনি রঙের কাঁথা স্টিচের শাড়িটা এত দাম দিয়ে কিনে ফেলল।

শাড়িটা কিনে ফেরার সময় অর্ক বলেছিল, "যদিও আমার মেয়েদের ব্যাপারে ফান্ডা নেই, কিন্তু ছবি তুলতে তুলতে কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। আচ্ছা আগে বলো, তুমি শাড়িটা আজকেই পরবে তাই না?"

"কেন জিজ্ঞেস করছ?"

"ওই যে বললাম কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। শাড়িটার সঙ্গে ব্লাউজ় পিস আছে দোকানদার বলল। তুমি তবুও আলাদা করে ব্লাউজ় কিনলে।"

স্নেহা চোখ পাকিয়ে বলেছিল, "তোমার বেশ ভালই অভিজ্ঞতা আছে মনে হচ্ছে। বিয়ে হয়ে গিয়েছে, না গার্লফ্রেন্ড আছে?"

"ভীষণ ইচ্ছে হয়, একটা গার্লফ্রেন্ড হোক। জমিয়ে প্রেম করি। কিন্তু কপালে জুটল না।"

"কী সমস্যা?"

"সমস্যা একটাই। কোনও মেয়েরই আমাকে পছন্দ হয় না।"

স্নেহা জানে এগুলো এক রকম ইঙ্গিত। তাই আর কথা বাড়ায়নি। অর্ক কিন্তু ফুরফুরে মনে বলেই যাচ্ছিল, "আমার অভিজ্ঞতা আর একটু বলছে, শুধু শাড়ি আর ব্লাউজে হবে না। সঙ্গে গয়না চাই। আর আমি তোমাকে সেটা কিনে দেব।"

স্নেহা আরও সতর্ক হয়ে উঠেছিল, "তুমি? তুমি কেন কিনে দেবে?"

অর্ক কথা শোনেনি। লাল পাথর বসানো টেরাকোটার লকেট আর দুলের সেট কিনে দিয়ে বলেছিল, "এটা পার্টনারশিপের অ্যাডভান্সই ধরো।"

অর্ক আর সমুদ্র এখন ভুবনডাঙা গিয়েছে। স্নেহাকেও যেতে বলেছিল। কিন্তু স্নেহা যায়নি। ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজের মতো সাজতে বসেছে। ড্রেসিং টেবিলের ওপর রয়েছে সব সাজের সরঞ্জাম। আয়নায় নিজেকে দেখে অদ্ভুত লাগছিল। বহু মানুষকে সাজিয়েছে কিন্তু নিজে কোনও দিন সাজেনি। একে একে রূপটানের সমস্ত সরঞ্জামগুলো ব্যাকপ্যাক থেকে বের করে সাজিয়ে রাখল। ফেসওয়াশ দিয়ে মুখটা পরিষ্কার করল। টোনার লাগাল যাতে মেকআপটা ভাল করে বসে। তার পর শান্ত হাতে রোজ ওয়াটার লাগাল। ব্রাইডাল মেকআপের প্রতিটা ধাপ সে আজ করবে। কেন করছে? অবচেতনে নানা রকম জিনিস মাথায় খেলা করছে। হাতের তালুতে ময়শ্চারাইজ়ার ক্রিম নিয়ে ঘষতে ঘষতে মনে হচ্ছিল, ঠিক কতটা সাজলে মিতদ্রু মুগ্ধ হবে। হৈমন্তীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকবে।

সারা মুখে টিপ টিপ করে ফাউন্ডেশন লাগিয়ে জলে ভিজিয়ে বিউটি ব্লেন্ডারটা মুখময় মসৃণ করে লাগিয়ে নিল। আয়নার আর একটু কাছে মুখটাকে নিয়ে গেল। চোখের তলায় কালি? কালো ছোপ। কবে পড়ল? আগে কখনও তো খেয়াল করেনি। স্নেহা নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে, কে যেন ভেতর থেকে বলছে, কনসিলার লাগাও। ডার্ক সার্কেল ঢাকা দাও। কেন? কেন মনে হচ্ছে, এর পর কমপ্যাক্ট লাগিয়ে মেকআপটা সেট করতে হবে যাতে অনেক রাত পর্যন্ত মেকআপটা ঠিক থাকে।

এর পর চোখ নিয়ে পড়ল স্নেহা। ব্রাশ দিয়ে ভুরু আঁচড়াল। আই লাইনার লাগাল। চোখের পাতায় মাসকারা। চোখটা বড় করে আয়নার দিকে তাকাল। যেন মিতদ্রু দেখছে ওকে। আবার ভেতরে একটা পাপবোধও হচ্ছে। এ ভাবে নিজেকে সাজিয়ে তুলে মিতদ্রুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কী চাইছে ও? হৈমন্তীর কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছে? অলীক চিন্তা। মিতদ্রু কোনও দিনই ওর হবে না। পর ক্ষণেই মনে হচ্ছে, কেন হবে না! তা হলে ভাগ্য দু'বছর পর আবার ওর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিল কেন?

নতুন উৎসাহে লিপ লাইনার দিয়ে লিপস্টিক লাগাল স্নেহা। তার পর স্প্রে করে মেকআপ ফিক্সার লাগাল যাতে এই চৈত্রের গরমে মেকআপ ঘামে গলে না যায়।

'টিং টং' করে ডোরবেলের আওয়াজ হল। স্নেহা দরজা খুলে দেখল অর্ক। অর্ক ওকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেল। স্নেহা তো ঠিক এ ভাবেই মিতদ্রুর সামনে দাঁড়াতে চায়।

সতেরো

দু'বছর আগে

"গুড মর্নিং!"

বালিশের পাশে মোবাইলটা তির তির করে কাঁপছিল। সেই কম্পনেই ঘুম ভাঙল মিতদ্রুর। স্নেহা।

"গুড মর্নিং!" মিতদ্রু ঘুম জড়ানো গলায় বলল।

গলার আওয়াজ শুনে স্নেহা বলল, "এ মা, ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম তো?"

"না ঠিক আছে। ক'টা বাজে?"

"পৌনে সাতটা।"

মিতদ্রু হেসে ফেলল, "এখন পৌনে সাতটাই বা কী, আর পৌনে দশটাই বা কী!"

"আসলে আমি আপনাকে ফোন করলাম কারণ, কান্তা বউদি বাজারে যাচ্ছে। আপনার কিছু আনতে হবে?"

"এই আপনার বেশ ভাল একটা ডিউটি হয়েছে। কান্তা বউদির বাজার যাওয়া।"

স্নেহা একটু লজ্জা পেয়ে বলল, "আসলে কান্তা বউদি রোদ উঠলে আর বাজারে যেতে চায় না। আমাকে বলল আপনাকে জিজ্ঞেস করে নিতে। সে দিন সিগারেট আনতে দিয়েছিলেন। কান্তা বউদি অবশ্য দাম একটু বেশিই নিচ্ছে। কিন্তু এখন আর কী উপায় বলুন?"

"ও সব ভাববেন না। আমার এক কোলিগ বাসু, হোয়াটসঅ্যাপে কাল একটা লিস্ট পাঠিয়েছে জিনিসপত্তরের দাম কী রকম বেড়েছে। অন্য রাজ্য থেকে সাপ্লাই কমেছে। এখানেও ট্রান্সপোর্টেশনের সমস্যা। তা ছাড়া কান্তা বৌদিও তো কিছু রাখবে, না হলে রোজ রোজ আমাদের জন্য বাজার থেকে জিনিস আনবে কেন? যাক গে, হ্যাঁ ভাবছিলাম ফ্রিজে যা স্টক করা ছিল শেষ হয়ে এসেছে। কিছু নষ্টও হয়েছে। ফ্রেশ কিছু রান্না করতে হবে। আচ্ছা, এখানে রেডি টু কুক কিছু পাওয়া যাবে? কান্তা বৌদি আনতে পারবে?"

"রেডি টু কুক খাবেন? ওগুলো তো টেস্ট ভাল হয় না।"

"আমার অভ্যেস আছে। তাড়া থাকলে ওই দিয়েই চালিয়ে নিই। তবে রান্নাও করে ফেলতে পারি। ভাত ডাল মাখন আর ডিমসেদ্ধ। তা হলে একটু গোবিন্দভোগ চাল, ডিম, আলু আনতে হবে। মাখনটা আছে। কান্তা বৌদি আনতে পারবে?"

"কেন পারবে না? আমার বাজার করতে যাচ্ছে তো, বলে দিচ্ছি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ। আপনি অ্যামাউন্টটা বলবেন। আমি ওয়ালেট পেমেন্ট করে দেব। আপনার কিন্তু খেয়াল করছি বেশ সকাল সকাল ওঠার অভ্যেস।"

"অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। বাড়ির সব কাজকর্ম করে পার্লারে বেরোতে হয়।"

"গুড। বললে হয়তো জ্ঞানের কথা মনে হবে, কিন্তু দেখেছি, সকালে উঠে পড়তে পারলে সারাদিন এনার্জি লেভেল হাই থাকে। আমিও সকালে উঠে জগিং করতে যাই। এখন অবশ্য সব রুটিনের বারোটা বেজে গিয়েছে। আজকে ভোর পাঁচটায় ঘুমোতে গিয়েছি।"

"এ মা, সে কী! কেন?"

মিতদ্রু হাসল, "ওই ওয়েব সিরিজ়, ডার্ক সার্কল। একেবারে নেশার মতো। সিজ়ন ওয়ানের লাস্ট এপিসোড পর্যন্ত দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল। গেল। বাই দ্য ওয়ে, আপনি দেখেছেন?"

স্নেহা কিছু ক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর বলল, "দেখতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু..."

"কিন্তু ভাল লাগেনি, তাই তো?"

"না তা ঠিক নয়, আসলে ইংরেজিতে তো! আমি ইংরেজি ডায়লগ ঠিক বুঝতে পারি না।"

"তাতে কী আছে? ও হো! আপনাকে বলা হয়নি। ওখানে ল্যাঙ্গুয়েজ অপশন আছে। তাতে হয়তো হিন্দি ডাবিং পেয়ে যেতে পারেন। আর তা ছাড়া ওই অ্যাপে আরও অনেক সিনেমা, ওয়েব সিরিজ আছে। হিন্দি বাংলাও।"

স্নেহা একটু অপরাধী গলায় বলল, "আমি তাই করেছি। একটা বাংলা সিনেমা দেখেছি। ওটা ইউটিউবে নেই। পেয়ে গেলাম। ভাবলাম দেখেই ফেলি।"

"বেশ করেছেন। যেটা ভাল লাগে সেটাই দেখুন।"

"আচ্ছা, সকালে ঘুম থেকে উঠলেই মনে হয় না, উফ আবার একটা গোটা দিন কী ভাবে কাটাব?"

"আপনি এভাবেও ভাবতে পারেন, মুক্তির দিকে আরও একটা দিন এগিয়ে গেলাম। আর মাত্র কয়েকটা দিন।"

"কী জানি, প্রধানমন্ত্রী কাল রাতে কী বলেছেন শুনেছেন? ৫ এপ্রিল রাত্রি ন'টায় 'অকাল দীপাবলি' পালন করতে বলেছেন।"

"'অকাল দীপাবলি' মানে?"

"রাত্রি ন'টায় সব আলো বন্ধ করে বারান্দায় এসে মোমবাতি, টর্চ বা মোবাইলের আলো জ্বালতে হবে।"

মিতদ্রু কিছু মন্তব্য করতে গিয়েও করল না। বলল, "আপনাকে একটা ভাল খবর দিই। আমেরিকার পিটসবার্গ ইউনিভার্সিটি ইঁদুরের ওপর সাকসেসফুলি ভ্যাকসিনের ট্রায়াল করে ফেলতে পেরেছে। আরও একটা জিনিস। আমেরিকায় আমার কিছু বন্ধুবান্ধব একটা ভিডিয়ো চেন করছে।"

"ভিডিয়ো চেন মানে?"

"দেখুন ওই 'অকাল দীপাবলি'র মতো সবাই তো কিছু না কিছু চেষ্টা করছে। ভিডিয়ো চেন সে রকমই। আপনাকে একটা দশ সেকেন্ডের ভিডিয়ো করতে হবে। সেই ভিডিয়োতে আপনি বলবেন, আপনি ভাল আছেন। মানুষের পাশে আছেন। এই দুঃসময় কেটে যাবে। গোটা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন দেশের বন্ধুদের কাছ থেকে এই রকম ভিডিয়ো জোগাড় করা হচ্ছে। গোটা পৃথিবীতেই তো লকডাউন চলছে। এর পরে এই ভিডিয়োগুলো জুড়ে একটা রিল বানানো হবে। তার পর সেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা হবে। আপনি একটা ভিডিয়ো শুট করে হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে ফরোয়ার্ড করতে পারেন, আমি পাঠিয়ে দেব।"

"বাঃ বেশ মজার ব্যাপার তো। আপনি করেছেন?"

"না, আমি করিনি।"

"আপনি করেননি আর আমাকে বলছেন? ভারী মজা তো।"

"সবাই আসলে সব কিছু পারে না বুঝেছেন তো। আমাদের দেশের কোটাটা আমি আপনাকে দিচ্ছি।"

"তা হলে আপনি কী করে বুঝলেন যে, আমি পারব?"

মিতদ্রু হেসে বলল, "আপনার সঙ্গে কথা বলেই বুঝেছি আপনি বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারেন। তা ছাড়া আপনি ভীষণ কাইন্ড অ্যান্ড কেয়ারিং।"

"কী করে বুঝলেন যে, আমি কাইন্ড অ্যান্ড কেয়ারিং?"

অনেক ক্ষণ ধরে স্নেহার সঙ্গে কথা বলছে। শুয়ে শুয়ে কথা বলতে ভালই লাগছিল। তবে এ বার উঠে চা খেতে ইচ্ছে করছে। টি-মেকারে চায়ের জল চাপিয়ে মিতদ্রু বলল, "অবভিয়াসলি আপনি কাইন্ড অ্যান্ড কেয়ারিং। আর কেয়ারিং না হলে এত সকালে আপনি আমাকে ফোন করে কান্তা বউদির কথা বলতেন না।"

"সে তো আপনিও কাইন্ড অ্যান্ড কেয়ারিং। না হলে কাল আপনি আমায় অ্যাপের ইউজ়ার নেম আর পাসওয়ার্ড পাঠাতেন না।"

হাসল মিতদ্রু, "দেখেছেন তো আমরা দু'জনেই কিন্তু দু'জনের প্রশংসা করছি। আমার বন্ধুরা এই ব্যাপারটা নিয়েই রিল ভিডিয়ো বানাতে চাইছে। পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ যদি কাইন্ড অ্যান্ড কেয়ারিং হয়ে ওঠে, তা হলে এই দুঃসময় খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাবে। আমরা সবাই সবার পাশে আছি এই বার্তাটা গোটা পৃথিবীর পক্ষে খুব জরুরি।"

"বাবা একটা কবিতার লাইন খুব বলে। সকলের তরে সকলে আমরা..."

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেউ অবনী পরে, সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। ওয়ান্ডারফুল, ওয়ান্ডারফুল। এটাই রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিন।"

মিতদ্রুর গলায় আবৃত্তি শুনে স্নেহা মুগ্ধ হয়ে বলল, "আপনি জানেন?"

"কামিনী রায়ের কবিতা। ছোটবেলায় মা আমাকে আবৃত্তি শেখাতে পাঠাত, সেখানে শিখেছিলাম।"

"এই তো আপনি বেশ পারেন, আর আমাকে বলছেন।"

"না, আপনি আরও ভাল পারবেন।"

"কী করে বুঝলেন?"

"সে দিন আপনি বললেন আপনি টিকটক করেন। আমি তো ও সব কিছুই করি না।"

"আমিও করি না। অনেক বার ভেবেছি করব। কিন্তু শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠেনি।"

"অনেকেই করেনি। এবার না হয় করবেন। বিশেষ কঠিন কিছু তো নয়। মোবাইলের ফ্রন্ট ক্যামেরায় ভিডিয়োটা তুলে নেবেন। ছোট্ট দশ সেকেন্ডের ক্লিপ লাগবে। যা আপনার মনে হয়।"

"আর একটা সমস্যা আছে। আমি কিন্তু ইংরেজি সেরকম বলতে পারি না।"

"কে বলেছে আপনাকে ইংরেজি বলতে? স্পেনের লোকরা স্প্যানিশে বলছে, ফ্রান্সের লোকরা ফরাসি ভাষায় বলছে, বিভিন্ন দেশের লোকেরা তাদের মাতৃভাষায় বলছে। হ্যাঁ, সবার বোঝার জন্য ইংরেজিতে একটা সাবটাইটেল করে দেওয়া হবে। সে আমি তৈরি করে দেব। ইচ্ছে করলে গানও গাইতে পারেন।"

মিতদ্রু টি-ব্যাগ ডুবিয়ে চা করে বারান্দায় এল। মনের মধ্যে একটা আশা জন্মেছিল যার সঙ্গে এত ক্ষণ কথা বলছে, তাকে হয়তো বারান্দায় দেখতে পাবে। কিন্তু বারান্দাটা ফাঁকা। ফোনে অবশ্য এখনও মেয়েটা রয়েছে। 'কই আপনাকে বারান্দায় দেখতে পাচ্ছি না তো!' বললেই হয়তো বারান্দায় এসে দাঁড়াবে। কিন্তু সেটা বলতে শিষ্টাচারে বাধল।

স্নেহা বারান্দায় না দাঁড়ালেও যে ঘরে ছিল, তার জানলা দিয়ে মিতদ্রুকে বারান্দায় আসতে দেখতে পেল। মিতদ্রু চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল, সেটা কি ওর জন্য?

মিতদ্রু স্নেহার তন্ময়তা ভাঙিয়ে বলল, "উইথ ইয়োর পারমিশন, তোমাকে আমি তুমি বলছি। তুমিও আমাকে তুমি বলো। আপনি আপনিটা বড্ড ফরম্যাল, তাই না?"

স্নেহার মনটা ভাল হয়ে উঠল। বলল, "ঠিক আছে।"

"তোমাকে একটা কাজের কথা বলার ছিল। কাল রাত্রেই বাসুর

কাছে জেনে কনফার্ম করেছি। আমি জানি না ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ম্যাচিওর করবে কি না। আসলে আমাদের কোম্পানির একটা মেয়ে শিলিগুড়িতে থাকে। সেও এখন কলকাতায় আটকে আছে। কোম্পানি থেকে চেষ্টা করছে কোনও ব্যবস্থা করে ওকে যদি শিলিগুড়ি পৌঁছে দেওয়া যায়। তুমি যদি রাজি থাকো, তা হলে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি কথা বলে, যদি ওর সঙ্গে তুমি চলে যেতে পারো।"

'তুমি তা হলে চাও আমি ফিরে যাই?' হঠাৎ কথাগুলো মনের মধ্যে বেজে উঠল।

কথাগুলো গিলে ফেলে স্নেহা একটু চুপ করে থেকে বলল, "তুমিই সত্যি সত্যি কাইন্ড আর কেয়ারিং।"

"না না, এখন যা অবস্থা সবার চেষ্টা করা উচিত, যদি ছোট ছোট চেষ্টায় অন্যদের কিছু সাহায্য হয়। ওই যে, সকলের তরে সকলে আমরা।"

"একটা সত্যি কথা বলব? আমার খুব ইচ্ছে করছে এক বার তোমার সঙ্গে দেখা করার।"

"নিশ্চয়ই আমরা দেখা করব। আর ক'টা মাত্র দিন। আমার হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার পর্বটা শেষ হোক। এই তো দ্যাখো আমরা কী সুন্দর বন্ধু হয়ে গিয়েছি। কিন্তু এখন কয়েক দিন সত্যিই সাবধানে থাকা উচিত। আমি এত দূর ফ্লাই করে এসেছি। সত্যি তো জানি না আমি ভাইরাসটা ক্যারি করছি কি না। চোদ্দো দিন কেটে যাক। তার পর তোমার সঙ্গে দেখা করে জমিয়ে আড্ডা দেব। এখানে তো আর কাউকে চিনিই না তোমাকে ছাড়া।"

"আমিও। একটা কথা বলব? আমি যদি আজ তোমাকে রান্না করে পাঠাই, তুমি খাবে?"

"আরে খাব না কেন? কিন্তু এটা ঠিক হবে না। তুমি কেন শুধু শুধু আমার জন্য রান্না করবে?"

"আমি তো আমার জন্য রান্না করবই। না হয় দু'জনের জন্য করলাম। আমার কাছে প্লাস্টিক কন্টেনার আছে। আমি কান্তা বউদিকে বলব তোমার কাছে পৌঁছে দেবে। তুমি থলি নামিয়ে নিয়ে নিয়ো।"

"সো কাইন্ড অব ইউ। কিন্তু আমার কী খারাপ লাগছে বলো তো? তুমি আমার জন্য রান্না করবে, আর আমি তোমার জন্য কী করতে পারব?"

"সব সময় কি গিভ অ্যান্ড টেক হিসেব করতে হবে?"

হেসে ফেলল মিতদ্রু, "তা নয়। আচ্ছা ঠিক আছে। ডান। আজ তোমার হাতের রান্না খাব।"

"ফোনটা তা হলে ছাড়ি। এ বার কান্তা বউদিকে ফোন করতে হবে।"

"আমার গোবিন্দভোগ চাল, ডিম, আলু তা হলে..."

মিতদ্রুকে থামিয়ে স্নেহা বলল, "আমার রান্নার উপর তোমার ভরসা নেই তা হলে?"

মিতদ্রু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না, না। স্যরি। কিন্তু প্লিজ়, আমি খুব অল্প খাই।"

ফোনটা ছেড়ে দিল মিতদ্রু। স্নেহার মনটা খুব ভাল হয়ে উঠল। এই লকডাউনে মনের মধ্যে যে গুমোট ভাবটা ছিল সেটা যেন কিছু ক্ষণের জন্য কেটে গেল। কান্তা বউদিকে ফোন করল, "বউদি, বাজারে যাচ্ছ তো?"

ভাবলেশহীন গলায় কান্তা বলল, "কী ব্যাপার বলো তো তোমার? বেলা হয়ে যাচ্ছে তো। তোমার জন্য আমি দাঁড়িয়ে থাকব নাকি? তাড়াতাড়ি বলো।"

স্নেহা তখন যেন উত্তেজনায় ফুটছে, "হ্যাঁ শোনো, এক কেজি পেঁয়াজ, পাঁচশো টম্যাটো, একশো আদা, পঞ্চাশ রসুন, কাঁচা লঙ্কা, গোটা গরম মশলা..."

কান্তা স্নেহাকে থামিয়ে বলল, "এত জিনিস, কী রান্না করবে?"

"বলছি, বলছি। খাসির মাংস পাওয়া যাবে?"

"যাবে। দাম কিন্তু বেশি পড়বে।"

"পড়ুক। আর বাসমতী চাল আনবে। লকডাউনের মধ্যে আর তো কিছু করার নেই, একটু না হয় রান্নাই করি।"

আঠারো

বিশ্বরূপবাবুর বসার ঘরটা ঝলমল করছে। বেশ কয়েক জন অতিথি এসেছেন। দু'জন কলকাতার বন্ধু। সস্ত্রীক সমীর ভট্টাচার্য আর বাসুদেব হালদার। এ ছাড়া আরও তিন দম্পতি। এঁরা স্থানীয়। এই কয়েক জনকে নিয়েই আজকের সান্ধ্য আসর। অসীমবাবু আর অপরূপাদেবীর সঙ্গে অতিথিদের আলাপ করিয়ে দিয়ে বিশ্বরূপবাবু বললেন, "আমার হবু বেয়াই মশাই আর বেয়ান ম্যাডাম। হবু বলব না, বেয়াই বেয়ান হয়েই গিয়েছি আমরা ধরে নাও।"

বাসুদেববাবুর স্ত্রী সুস্মিতাদেবী বললেন, "হৈমন্তীর রেজিস্ট্রি হয়ে গিয়েছে বুঝি, বলেননি তো দাদা।"

"না হয়নি। জুনের সাত তারিখে একেবারে বিয়েটাই হবে। সবাইকে আসতেই হবে। আজ শুধু পরিচয় পর্ব। বুঝেছেন অসীমবাবু, এই যে দেখছেন আমার বন্ধুরা, এরাই আমার প্রাণ। আজকাল বাঙালি বিয়েতে কী হয়েছে বলুন তো, যত অবাঙালি কালচার। মেহেন্দি, সঙ্গীত। আমাদের কালচারে কিন্তু শুধুই রবীন্দ্রসঙ্গীত।"

"ঠিক! ঠিক!" কয়েক জন সায় দিয়ে উঠলেন।

এক বন্ধু সুদর্শনবাবুকে দেখিয়ে বিশ্বরূপবাবু বললেন, "এই সুদর্শনের প্রতিভা দেখবেন অসীমবাবু, আঙুলে আঙুলে রবীন্দ্রনাথ।"

অসীমবাবু ভ্যাবাচাকা মুখে বলে ফেললেন, "মানে?"

"মানেটা তুমি দেখিয়ে দাও সুদর্শন।"

সুদর্শনবাবু উঠে গিয়ে পিয়ানোর সামনে স্টুলে বসলেন। তার পর পিয়ানোর সুর তুললেন, 'মনে রবে কি না রবে আমারে সে আমার মনে নাই। ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে, অকারণে গান গাই...'

মধু একটা ট্রে-তে করে হুইস্কির বোতল গ্লাস নিয়ে এসে সেন্টার টেবিলে রাখল। অসীমবাবু একটু টানটান হয়ে উঠলেন। অন্যদের চোখ বাঁচিয়ে অপরূপাদেবী অসীমবাবুকে ইশারায় আঙুল দেখিয়ে 'না' বললেন। অসীমবাবুর মুখটা একটু বিমর্ষ হয়ে গেল। পিয়ানোয় রবীন্দ্রসঙ্গীত চলছে, 'তোমার মুখের চকিত সুখের হাসি দেখিতে যে চাই অকারণে গান গাই।'

বিশ্বরূপবাবু চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "সমীর ড্রিঙ্কটা তুমি বানাও। ওটা বরাবর তোমারই দায়িত্ব।"

মধু চিকেন পকোড়া আর কাজু বাদাম দিয়ে গেল। গ্লাসগুলোয় হুইস্কি ঢালতে ঢালতে সমীরবাবু অসীমবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার জল না সোডা?"

"নাঃ!" অসীমবাবু এক বার স্ত্রীর দিকে তাকালেন। অপরূপাদেবী চোখটা বড় বড় করে তাকালেন অসীমবাবুর দিকে। একটা ঢোঁক গিলে অসীমবাবু বললেন, "কোল্ডড্রিঙ্ক হলেই চলবে।"

"কোল্ডড্রিঙ্কস?"

"না, মানে আমার শুগার আছে তো।"

অন্যরা এ ওর মুখের দিকে চাইল। কেউ কেউ মুখ টিপে লুকিয়ে হাসল। বিশ্বরূপবাবু বললেন, "শুগার নিয়ে একদম চিন্তা করবেন না। এটা স্কটল্যান্ড থেকে আনিয়েছি। কিচ্ছু হবে না। আজ তো আপনাদের সম্মানেই এই রবীন্দ্রসন্ধ্যা।"

অসীমবাবু আবার স্ত্রীর দিকে তাকালেন। চোখে একটা মৃদু অসহায় নিমরাজির মৃদু লক্ষণ। ইশারাটা বুঝলেন। তার পর ঝলমল মুখে দু'আঙুলে এক চিমটে দেখিয়ে বললেন, "একটু কিন্তু। জাস্ট..."

সবার হাতে হাতে গ্লাস উঠে যাওয়ার পর বিশ্বরূপবাবু নিজের গ্লাসটা তুলে ধরে বললেন, "উল্লাস।" তার পর এক চুমুক দিয়ে বললেন, "আজ তা হলে আর এক বার হয়ে যাক রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্তাক্ষরী।"

সুস্মিতাদেবী বললেন, "না দাদা। ওটা বড্ড কঠিন হয়ে যায়। এমনি হোক।"

সমীরবাবুর স্ত্রী বাসবদত্তাদেবী অপরূপাদেবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আজ আপনার সম্মানে এই সন্ধে। আপনার গলায় কিন্তু একটা গান শুনব।"

অপরূপাদেবী আঁতকে উঠলেন, "আমি?"

বিশ্বরূপবাবু বললেন, "ঠিক ঠিক বেয়ান ম্যাডাম। আপনার গলায় একটা গান শুনতে হবে।"

অপরূপাদেবী অসীমবাবুর কানে ফিসফিস করে বলে উঠলেন, "এ কোথায় এনে ফেললে গো, বাবুসোনাটার কী হবে বিয়েটা হলে? টিকবে তো?"

অসীমবাবু গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, "গাও না, গাও। তুমি তো গাইতে।"

বিশ্বরূপবাবু সুদর্শনবাবুকে বললেন, "ম্যাডামের জন্য একটা সুর লাগাও তো।"

সুদর্শনবাবু পিয়ানোয় একই সুর বাজিয়ে চলেছেন, "মনে রবে কি না রবে আমারে সে আমার মনে নাই। ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে, অকারণে গান গাই।"

বিশ্বরূপবাবু বেসুরো গলায় গাইতে থাকলেন, "তোমার মুখের চকিত সুখের হাসি দেখিতে যে চাই– তাই অকারণে গান গাই... গান ম্যাডাম গান।"

অসহায় গলায় অপরূপাদেবী বললেন, "জানি না।"

অসীমবাবু বললেন, "তা হলে তুমি আয় তবে সহচরীটাই গাও, ওটা তো জানো।"

এ বার একটা হাসির রোল উঠল। অপরূপাদেবী চাপা গলায় অসীমবাবুকে ধমকে উঠলেন, "পেটে এক চুমুক পড়ল কি পড়ল না, শুরু হয়ে গেল। এই জন্য বলেছিলাম খাবে না।"

সুদর্শনবাবু পিয়ানোয় নতুন সুর তুললেন, 'নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল...'

ঠিক এই সময়েই অর্ক, সমুদ্র আর স্নেহা ঢুকল। বিশ্বরূপবাবু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে বললেন, "এইজন্য বাঙালি জাতিটার কিছু হল না। কোনও সময় জ্ঞান নেই। কখন আসার কথা তোমাদের? আমি কি তোমাদের পেমেন্ট কম দিচ্ছি?"

অর্ক একটু ছোট মুখ করে বলল, "সরি স্যর, ভুবনডাঙায় গিয়েছিলাম একটু দেরি হয়ে গেল।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। ছবি তুলতে আরম্ভ করো। মনে আছে তো? আজ কিন্তু বিশেষ দিন। হৈমন্তী আর মিতদ্রুর ছবি তো তুলবেই আর প্রত্যেকের ছবি তুলবে। আমার একদম এ-ক্লাস একটা অ্যালবাম চাই। প্রথম পাতায় থাকবে গুরুদেবের ছবি," দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিটাকে দেখিয়ে বললেন বিশ্বরূপবাবু।

সাজগোজ করে চোখে পড়ার মতো সুন্দরী লাগছে স্নেহাকে। সুস্মিতাদেবী স্নেহার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এই মেয়েটি কে গো?"

অর্ক বলল, "আমার পার্টনার। খুব ভাল মেকআপ আর্টিস্ট। আর খুব ভাল ভিডিয়ো তোলে।"

এই সময় হাতে অনেকগুলো প্যাকেট নিয়ে সংযুক্তাদেবী ঢুকলেন।

"তুমি কোথায় ছিলে এত ক্ষণ?" সমীরবাবুর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

"এই আজকে একটু নিজের হাতে রান্না করে তোমাদের খাওয়াতে ইচ্ছে করল।"

"জামাইয়ের জন্য বলো।"

আবার হাসির রোল উঠল। প্যাকেটগুলো অভ্যাগত ভদ্রমহিলাদের হাতে দিতে দিতে সংযুক্তাদেবী বলতে থাকলেন, "আজকের শুভ দিনে সবাইয়ের জন্য একটু বিদায়ী উপহার। দেখো,

তোমাদের পছন্দ হয় কি না।”

প্যাকেট থেকে বেরোতে লাগল শাড়ি। অসীমবাবু আর অপরূপাদেবীর অস্বস্তি ক্রমশ বাড়ছে। অপরূপাদেবী অসীমবাবুর কানে ফিসফিস করে বললেন, “দেখেছ, কেন তোমাকে বলেছিলাম একটু তত্ত্ব নিয়ে আসি। তা নয় নিয়ে এলে শক্তিগড় থেকে এক হাঁড়ি ল্যাংচা। কিপটের জাশু।”

“আরে বালা দিয়েছ তো!” অসীমবাবু বললেন।

ভদ্রমহিলারা শাড়ি দেখতে ব্যস্ত। সমুদ্র নিচু গলায় বলল, “এদের অনুষ্ঠানটা ঠিক কী বলো তো অর্কদা?”

“ছাড় না, ছবি তোলার কাজ। যা পারিস ছবি তোল। পেমেন্ট পাওয়া নিয়ে কথা।”

“কিন্তু যাদের নিয়ে অনুষ্ঠান, তারা কোথায়? আর স্নেহাদি কি ভিডিয়ো তুলবে?”

অস্বস্তি লাগছিল স্নেহারও। এত সেজেগুজে যেন অনাহূত অতিথি হয়ে এসেছে। ভেবেছিল ঢুকেই দেখতে পাবে মিতদ্রুকে। মিষ্টি হেসে অভ্যর্থনা করবে। আর এক বার সুযোগ পাবে মিতদ্রুকে মেকআপ করানোর। তখন মিতদ্রুর চোখে দেখবে নিজেকে কেমন দেখতে লাগছে। তার পর এক সময় হয়তো বলেই ফেলবে দু'বছর আগের সেই দিনগুলোর কথা। কাছাকাছি থেকেও একে অন্যকে না দেখে ভরসা জানানোর কথা। হয়তো বা মনের দুর্বলতার কথাও। লকডাউনের সেই প্রথম দিন পনেরোর কথা, যে দিনগুলোয় শুধু অনিশ্চয়তা, আতঙ্কই ছিল না, কিছু রঙিন কাচের টুকরোয় সাজানো ভাল লাগাও ছিল, যা আজও অমলিন।

“থ্যাঙ্ক ইউ সংযুক্তা, বিশ্বরূপদা,” ভদ্রমহিলারা বলতে থাকলেন।

বিশ্বরূপবাবু বললেন, “আরে আমাকে আবার থ্যাঙ্কস কিসের। সবই সংযুক্তার ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, আমাকে যখন জিজ্ঞেস করেছিল কী শাড়ি কিনবে, শাড়ির কিছু না বুঝেও আমি বলেছিলাম, যাই কেনো বাংলার শাড়ি কিনবে। এই অবাঙালিদের ইনফ্লুয়েন্সে বাঙালি সংস্কৃতি তো হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ চিন্তা করে দ্যাখো, রবীন্দ্রনাথ বাঙালি সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে কী করেননি! গানে বলো, কবিতায় বলো, নাচে বলো... কিন্তু আজকের প্রজন্ম সেটা নিয়ে চর্চা করছে কোথায়?”

তার পর অর্কদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “এই ইয়ং জেনারেশনদের জিজ্ঞেস করো, রবীন্দ্রনাথের ‘অ’ দিয়ে শুরু পাঁচটা গান বা ‘ক’ দিয়ে শুরু পাঁচটা কবিতা, কিচ্ছু বলতে পারবে না। বুকের ভেতরটা বড্ড বাজে যখন মনে হয় কবিগুরুর সেই কবিতাটাই বোধহয় সত্যি হতে চলেছে, আজি হতে শতবর্ষ পরে কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি কৌতূহলভরে...” হুইস্কির গ্লাস হাতে তুলে নিলেন বিশ্বরূপবাবু, মুখে ‘চুক চুক’ শব্দ করতে থাকলেন।

খালি হয়ে যাওয়া হুইস্কির গ্লাসটা আর এক বার ভরে নিয়ে পিয়ানোর টুলে ফিরে গিয়ে বসে সুদর্শনবাবু বললেন, “চিন্তা করছ কেন, অন্তত তোমার আমার ছেলেমেয়েদের ছোট থেকে যে সংস্কৃতির শিক্ষা আমরা দিয়েছি, তাতে ওরা বাঙালি সংস্কৃতি ভুলবে না। হৈমন্তী বিয়ের পর আমেরিকা চলে যাবে। কিন্তু দেখো, ঠিক বাঙালিয়ানা ধরে রাখবে।”

পিয়ানোতে সুর তুললেন সুদর্শনবাবু, ‘পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়...’

অর্ক আর সমুদ্র ছবি তুলছিল। সমুদ্র চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, “ব্যস, এই ক'জনের জন্য এত কাণ্ড!”

অর্ক চাপা গলায় বলল, “চুপ থাক। ছবি তোল।”

“আচ্ছা, আজকের নায়ক নায়িকারা কোথায়?” কেউ এক জন জানতে চাইলেন।

“হৈমন্তী সাজগোজ করে বেরিয়েছে একটু মিতদ্রুকে নিয়ে। চলে আসবে,” সংযুক্তাদেবী বললেন।

বসার ঘরের এক পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতলায়। স্নেহা সিঁড়ির দিকে তাকাল। সিঁড়িটা বড্ড ফাঁকা দেখাচ্ছে।

উনিশ

দু'বছর আগে

“কী অসাধারণ তোমার রান্নার হাত স্নেহা।”

“সত্যি বলছ?”

“একদম সত্যি। চেটেপুটে খেয়েছি। জানো আমি কত দিন পর মাটন খেলাম।”

“খাও না কেন?”

“তেমন কোনও কারণ নেই। আসলে শেষ যে বার হেল্‌থ চেকআপ করিয়েছিলাম, তাতে কোলেস্টেরল বর্ডারলাইন হাই বেরিয়েছিল। ডাক্তার বলেছিল মাটন, ডিমের হলুদ অংশ ইত্যাদি অ্যাভয়েড করতে।”

“এ মা! জানলে আমি চিকেন করতে পারতাম।”

“আরে না না। পুরো বারণ তো করেনি। আসলে আমি একটু হেল্‌থ ফ্রিক বলতে পারো। ডাক্তার যা বলে মেনে চলার চেষ্টা করি।”

“তাই বুঝি কাল মাখন ডিম কান্তা বউদিকে দিয়ে আনার কথা ভাবছিলে?”

“তা নয়। ওটাই আসলে সোজাসাপ্টা ব্যাপার। আলু ডিম সেদ্ধ করে, একটু মাখন আর বিটনুন দিয়ে ভাতে ভাত খেয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু তোমার রান্না অসাধারণ।”

“সত্যি ভাল লেগেছে?”

“কী করে বোঝাব তোমাকে? অনেস্টলি দারুণ লেগেছে। সত্যিই অসাধারণ।”

“জানো, এই রেসিপিটা আমার ঠাকুমার। আমি আমার মায়ের কাছ থেকে শিখেছি। তুমি শুনলে হাসবে। মায়ের কাছে শুনেছি এক সময় আমাদের বাড়িতে চিকেন নিষিদ্ধ ছিল। মুরগির ডিম পর্যন্ত আসত না। কিন্তু মাটনের ব্যাপারে কোনও বাধা ছিল না। আমরা যেখানে থাকি সেখানে একটা কালী মন্দির আছে। সেখানে পাঁঠা বলি হয়। আর ওই পাঁঠার মাংস এই রকম ভাবে রান্না হয়।”

“রেসিপিটা কি তোমাদের ফ্যামিলি সিক্রেট?”

“সিক্রেট কিছুই নয়। আমার মা ঠাকুমার কাছে শিখেছিল, আমি মায়ের কাছে শিখেছি। কয়েক বার রান্না করেছি। তবে মায়ের মতো হয়নি। কিন্তু বাবার খুব পছন্দ হয়েছে। বাবা বলে, ‘মামন, তোর হাতের রান্না খেয়ে আমার মায়ের কথা মনে পড়ে যায়।’ এত মন খারাপ হয় না বাবার জন্য! দেখো, বাবাও কী রকম ছটফট করছে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু কিছুই করতে পারছে না।”

“তুমি নিশ্চয়ই বাবার খুব আদরের?”

“তা বলতে পারো। আমি যাই করি বাবা খুশি। এক বার কাবাব বানাতে গিয়ে আমি পুরো পুড়িয়ে ফেলেছিলাম। বাবা সেইগুলোই খেয়ে বলেছিল দারুণ হয়েছে। আসলে বাবারা এ রকমই। সব সময় বলে, ‘মামন, এত কষ্ট করছিস কেন? একটা বিয়ে করে নে।’ যেন বিয়ে করে নিলেই সব কষ্ট থেকে মুক্তি।” বলে হা হা করে হেসে উঠল স্নেহা।

মিতদ্রু বলল, “যদিও খুব ব্যক্তিগত প্রশ্ন, কিন্তু উনি যখন চাইছেন, বিয়ে করছ না কেন?”

“দাঁড়াও সময় আসুক। আর একটু পয়সাকড়ি জমিয়ে নিই। এই তো দেখো, এখন আর হাতে কোনও কাজই নেই। আচ্ছা, তোমার কোনও গার্লফ্রেন্ড আছে?”

মিতদ্রু চুপ করে গেল। হৈমন্তীর কথা বলবে কি? বললেই অনেক কথা হয়তো বলে ফেলবে। হয়ত বলতে হবে, আমার এক জনের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। ম্যাট্রিমনিয়াল সাইট থেকে ঠিক হয়েছে। কিন্তু আমরা দু'জনে দু'জনকে খুব ভালবাসি। তাকে কি গার্লফ্রেন্ড বলা যায়? শি ইজ় অব ডিফারেন্ট টাইপ। ওর কাছে এই লকডাউন একটা ফান, মজা। বাবা-মা সবাই চব্বিশ ঘণ্টা বাড়িতে আছে, এই জিনিসটাই ও কখনও দেখেনি। ও সব সময় দেখেছে সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট টেবিলে বাবা ব্যস্ত অফিস যাওয়ার জন্য, মা ব্যস্ত স্কুল যাওয়ার জন্য,

নিজে ব্যস্ত কলেজ যাওয়ার জন্য। আর আজ যখন দেখছে সবাই বাড়িতে, বাবার অফিস যাওয়ার তাড়া নেই, মায়ের স্কুল যাওয়ার তাড়া নেই, ওর কলেজ বন্ধ, ওর কাছে গোটা ব্যাপারটাই খুব মজার। ওর জীবনে তোমার মতো স্ট্রাগল নেই। যেখানে একটা মেয়ের জীবনে শুধুই ফুর্তি, স্ট্রাগল করে যাওয়া আর একটা মেয়ের কাছে তার কথা বলা যায় কি?

মিতদ্রুকে চুপ করে থাকতে দেখে স্নেহা বলল, "স্যরি, এ বার আমি বোধহয় তোমাকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে ফেললাম।"

"না, ঠিক আছে। আসলে বলার মতো আমার কিছু নেই। ভাবছিলাম এ দিকে আমাদের এই অবস্থা আবার কারও কারও কাছে লকডাউনটা শুধুই মজা।"

"আমার কাছে, আমার বাবা মায়ের কাছে কিন্তু এই লকডাউনটা মজা নয়। ওরা আমার জন্য চিন্তায় চিন্তায় শরীর খারাপ করে ফেলছে। আর আমি আমার উপার্জনের খানিকটা বাড়িতে পাঠাই। বাবার খুব একটা উপার্জন নেই। এখন তো সেটুকুও বন্ধ।"

"আমি জানি স্নেহা। সেটাই স্বাভাবিক। আসলে বিভিন্ন মানুষ এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ভাবে রিঅ্যাক্ট করছে। ছাড়ো, আমরা কিন্তু সেই ঘুরেফিরে লকডাউন নিয়ে কথা বলছি। আচ্ছা, আমার ভিডিয়ো ফাইলটার কী হল?"

একটু চুপ করে থেকে স্নেহা বলল, "হচ্ছে না।"

"হচ্ছে না মানে? চেষ্টা করেছিলে?"

"করেছিলাম। কিন্তু নিজেরই পছন্দ হয়নি।"

"পছন্দ অপছন্দটা আমার ওপর ছেড়ে দাও না। কী রেকর্ড করেছিলে?"

"একটা গান। ছোটবেলায় আমি শিপ্রাদি বলে এক জনের গানের স্কুলে শিখতাম। সেই একটা গান। আচ্ছা তুমি কার কাছে আবৃত্তি শিখেছিলে?"

"নিখিলেশকাকা বলে এক জনের কাছে। আকাশবাণীতে কাজ করতেন। সে দিন জানো তো কী হয়েছে, সন্ধের মুখে এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে মাকে ফোন করছিলাম। মা জিজ্ঞেস করছিল লকডাউনের সময় এই জায়গাটা কেমন। আমার অমনি নিখিলেশকাকার শেখানো একটা আবৃত্তির কয়েকটা লাইন মনে পড়ে গিয়েছিল। সন্ধে হল, সূর্য নামে পাটে, এলেম যেন জোড়াদিঘির মাঠে। ধূধূ করে যে দিক-পানে চাই, কোনোখানে জনমানব নাই..."

"দারুণ, দারুণ। কোন কবিতা যেন? খুব শোনা। ইস, কিছুতেই মনে পড়ছে না।"

মিতদ্রু হাসতে হাসতে বলল, "মনে করার চেষ্টা করো। একটা কন্ডিশন কিন্তু। আজকাল কারও কিছু মনে না পড়লেই সোজা গুগলে দেখে নেয়। তোমাকে কিন্তু গুগল না করে ব্রেন সেলকে অ্যাক্টিভ করে মনে করতে হবে।"

"কথা দিলাম, চিটিং না করে মনে করে বলব। বলতে পারলে কী দেবে?"

"কী চাও বলো?"

একটু চিন্তা করে স্নেহা বলল, "তোমার একটা আবৃত্তি পাঠাতে হবে।"

হেসে উঠল মিতদ্রু, "বেশ, আমিও কথা দিলাম। কিন্তু আসল কথাটা তো হারিয়ে গেল। তুমি শিপ্রাদির শেখানো একটা গান রেকর্ড করেছিলে। ওয়ান্ডারফুল। ভিডিয়োটা ফোনে আছে নিশ্চয়ই। পাঠাও। আর কোনও অজুহাত শুনতে চাই না।"

মিতদ্রুর সঙ্গে কথা বলে ফোনটা ছেড়ে দেওয়ার পর মনটা যথারীতি ভাল হয়ে উঠল স্নেহার। আজকাল প্রতিবার এ রকমই হচ্ছে। ফোনটা হাতে নিয়ে খানিক ক্ষণ গুনগুন করে গান গাইল স্নেহা। যে গানটা রেকর্ড করেছিল সেটা দু'বার শুনল। তার পর একটু দোনামনা করে ভিডিয়োটা হোয়াটসঅ্যাপে পোস্ট করেই দিল। কিন্তু পরক্ষণেই একটু লজ্জা করল। মনটা অস্থির হয়ে উঠল। ভিডিয়োটা 'ডিলিট ফর অল' করে দিল। যদি গান পাঠাতেই হয়, আরও সুন্দর করে গেয়ে পাঠাবে। স্নেহার কাছে গোটা পৃথিবীর জন্য নয়, মিতদ্রুর জন্য গান। গানটা শুনে মিতদ্রু মুগ্ধ হয়ে বলবে, 'ছাড়ো তো এই সব লকডাউনের নিয়ম। চলো আমরা দেখা করি। তোমার হাতের কফি খেতে খেতে তোমার আরও গান শুনব।'

স্নেহাও বলবে, 'একদম মনের কথা বললে। তোমার কাছে যেতে খুব ইচ্ছে করছে।'

'আমারও খুব ইচ্ছে করছে। এই দ্যাখো এক্ষুনি 'টিং' করে তোমার ডোরবেলটা বেজে উঠবে। আর দরজা খুলে তুমি দেখবে, আমি দাঁড়িয়ে আছি।'

স্নেহার সঙ্গে কথা বলার পর মিতদ্রু বাথরুমে গিয়েছিল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে মোবাইলটা খুলে দেখল স্নেহা হোয়াটসঅ্যাপে কিছু একটা পাঠিয়েছিল, তার পর সেটা আবার ডিলিট করে দিয়েছে। একটু আশ্চর্য হল মিতদ্রু। দেখতে পারছে স্নেহা অনলাইন। আর এক বার ফোন করে জিজ্ঞেস করবে? একটু দ্বিধা করে হোয়াটসঅ্যাপেই মেসেজ করল, "কী হল?"

মেসেজে দুটো নীল টিক পড়ল। কিন্তু কোনও উত্তর এল না। ঠিক তখনই বাসুর একটা মেসেজ এসে ঢুকল। অকাল দেওয়ালি করতে গিয়ে হঠাৎ দেশ জুড়ে বিদ্যুত অফ করা হলে গ্রিডের ফ্রিকোয়েন্সি সামলানো যাবে কী করে, ভেবে গোটা দেশের বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থাগুলো গভীর চিন্তিত। বড় টেকনিক্যাল মেসেজ। সেটা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে পড়তে মিতদ্রু খেয়াল করল না, স্নেহা আর একটা অডিয়ো ফাইল পোস্ট করেও ডিলিট করে দিল।

কুড়ি

বাসুদেববাবু স্কচের গ্লাসে চুমুক দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে বুকটা দু'বার চাপড়ে দুঃখী দুঃখী মুখে বললেন, "কোথায় লাগে জানো তো বিশ্বরূপ, রবীন্দ্রনাথের নোবেলটা আর পাওয়া গেল না। আমাদের এখন ওই রেপ্লিকা দেখে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হয়। আমি তো তাই যাওয়া ছেড়েই দিয়েছি। ও জিনিস চোখে সহ্য হয় না। ঠাকুরের স্পর্শ কোথায়!"

অসীমবাবু জড়ানো গলায় বললেন, "ঠিক বলেছেন দাদা, অসহ্য। অথচ দেখুন, আইনস্টাইনের নোবেলটা কিন্তু চুরি যায়নি।"

অপরূপাদেবী অসীমবাবুর হাতটা চেপে ধরে কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন, "তুমি দেখেছ কেন বারবার বলছি আর খেয়ো না। এ বার কিন্তু আমি উঠে চলে যাব।"

"কোথায় যাবে?"

"স্টেশনে, জাহান্নামে যেখানে হোক।"

বিশ্বরূপবাবু বললেন, "আরে ধুস বাসুদেব! কত বার বলেছি তোমাদের, রবীন্দ্রনাথকে কি নোবেল দিয়ে মাপা যায়? এই প্রশ্নটা আমি জর্জদাকে পর্যন্ত করেছিলাম।"

"কী বলেছিলেন জর্জদা?"

"কী আর বলবেন? প্রশ্নটা করাই তো ধৃষ্টতা। আমার দিকে আগুন চোখে তাকিয়ে ছিলেন। তার পর একটা গান ধরেছিলেন। কী যেন গানটা... কী যেন গানটা..."

অর্ক স্নেহাকে বলল, "বুঝতেই পারছ, আর ছবি তোলার দরকার নেই। সবক'টা আউট।"

"জর্জদা কে?" বেমক্কা জিজ্ঞেস করে বসলেন অসীমবাবু।

হো হো করে হেসে উঠলেন সমীরবাবু, "আপনি কিন্তু বেশ রসিক লোক মশাই। জিজ্ঞেস করছেন জর্জদা কে? নাকি সত্যিই জানেন না?"

অপরূপাদেবী সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেন, "ঠিক বলেছেন। ও মাঝে মাঝে এ রকম মজা করে।"

"মজাই তো," বিশ্বরূপবাবু বলতে থাকলেন, "আরে মশাই, নোবেল

কমিটি ধন্য হয়ে গিয়েছে রবীন্দ্রনাথকে প্রাইজটা দিয়ে। ভাবতে পারেন এক জন কবির কতখানি প্রতিভা থাকলে এমন সব গান, কবিতা লিখতে পারেন?”

বেসুরো গলায় বিশ্বরূপ বাবু গেয়ে উঠলেন, “প্রাণ চায় চক্ষু না চায়, মরি একি তোর দুস্তর লজ্জা...”

বিশ্বরূপবাবুর বেসুরো গান শুনে সুদর্শনবাবু বললেন, “তুমি বরং গানটা থামাও, আমি পিয়ানোতে শোনাই।”

পিয়ানোর অপূর্ব মূর্ছনায় ভরে উঠল ঘরটা। আর সেই সুরের মধ্যেই ভেতরে এল মিতদ্রু আর হৈমন্তী। অনেক ক্ষণ পর ছেলেকে দেখে অপরূপাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, “কোথায় ছিলি বাবুসোনা?” তার পর হৈমন্তীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,“বাঃ কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।”

সুদর্শনবাবুর স্ত্রীও বললেন, “কী সুন্দর সেজেছিস রে হৈমন্তী? কে সাজিয়ে দিল?”

“শ্যামলীদি, দুর্গাপুর থেকে এসেছে।”

পিয়ানো বাজানোর মধ্যে এ রকম অমনোযোগী মন্তব্য শুনলে খুব বিরক্ত হন সুদর্শনবাবু। বাজানো বন্ধ করে বললেন, “আঃ! আজ ওদের ওদের মতো ছেড়ে দাও না, আমরা আমাদের মতো থাকি।”

অপরূপাদেবী আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। চুপ করে গেলেন। বিশ্বরূপবাবু বললেন, “আরে মিতদ্রু বোসো, বোসো। আমার বন্ধুদের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। উনি হচ্ছেন সুদর্শনকাকু, পিয়ানোতে বসে আছেন আর তোমার সামনে সুস্মিতা কাকিমা, তার পাশে বাসবদত্তা কাকিমা, শ্রীতমা কাকিমা...”

বিশ্বরূপবাবু একে একে পরিচয় করালেন। মিতদ্রু সবাইকে হাতজোড় করে নমস্কার করল। হৈমন্তী ছটফট করে উঠল, “আমরা একটু পরে আসি ড্যাডি?”

“পরে নয়, এখনই। আমি অসীমবাবুকে বলেছিলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের গলায় গান শোনাব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠস্বর এই ঘরে প্রতিধ্বনিত হবে, সেটাই হবে তোমাদের কাছে আশীর্বাদ। মধ... মধু... মধু...”

সদাপ্রস্তুত মধু এগিয়ে এসে বলল, “আজ্ঞে।”

“চালিয়ে দে।”

বাবু কখন কী চান মধুর নখদর্পণে। গ্রামোফোন রেকর্ডের কাছে এগিয়ে গেল মধু। তার পর চালিয়ে দিল একটা রেকর্ড, ‘তবু মনে রেখো...যদি দূরে যাই চলে। যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজালে...’

অর্ক ছবি তুলে যাচ্ছে। তার সামান্য খচখচ আওয়াজেও বিশ্বরূপবাবু বিরক্ত হয়ে ঠোঁটের উপর আঙুল ছোঁয়ালেন। অর্ক ছবি তুলছে ঠিকই। কিন্তু সমস্ত মনটা দখল করে বসে আছে স্নেহা। মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা স্নেহাকে দেখছে, কিন্তু মনের ক্রমশ আরও গভীরে ঢুকে যাচ্ছে মেয়েটা। সাজগোজ করা অবস্থায় ওকে দেখতে দেখতে পাগল পাগল লাগছে। মনে হচ্ছে সবাইকে ছেড়ে শুধু স্নেহার ছবি তুলতে। আজকে রাত্রিটাই সুযোগ। মনে যা হচ্ছে স্নেহাকে বলে ফেলতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে পুরো গানটা শেষ হল। বিশ্বরূপবাবু বলে উঠলেন, “যত বার শুনি শুধু বুকে এসে লাগে। বুকে এসে লাগে।”

সাজগোজ করে বেগুনি শাড়ি পরে স্নেহা ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। যত ক্ষণ রেকর্ডে গান চলছিল সুস্মিতাদেবী স্নেহার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। যে ছেলেটা ফটো তুলছে সে পরিচয় দিয়েছিল, ওর পার্টনার, মেকআপ করায়, আবার ভিডিয়োও তোলে। হৈমন্তী তো বলল দুর্গাপুর থেকে অন্য একটা মেয়ে এসে ওকে সাজিয়েছে। তা হলে এই মেয়েটা এত সাজগোজ করে এসেছে কেন?

হৈমন্তীর দিকে ঝুঁকে ইঙ্গিতে স্নেহাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “মেয়েটার নাম কী রে?”

হৈমন্তী ঠোঁট ওল্টাল। নাম মনে করতে না পেরে বলল, “আমি তো ক্যান্সেল করে দিয়েছিলাম। তাও চলে এসেছে। কী করি বলো!”

এক কোণে দাঁড়িয়ে স্নেহার চোখটা বারবার চলে যাচ্ছে মিতদ্রুর দিকে। শান্ত হয়ে বসে আছে মিতদ্রু। এক বারও ওর দিকে তাকায়নি। স্নেহার মনে হচ্ছে এত সাজগোজ সব যেন বৃথা হল।

যে ক’টা হুইস্কির গ্লাস খালি হয়েছিল, মধু এসে ভরে দিল। অপরূপাদেবী অসীমবাবুর বাজু খামচে ধরে চাপা গলায় বললেন, “আর এক ফোঁটাও খাবে না।”

“না না, এটাই লাস্ট। না হলে ভাল দেখায় না। এ সব ব্যাপারে সমানে সমানে থাকতে হয়। আমি হাতে ধরে রাখব। চুমুক দেব না। বুঝতে পারছ না একটা ইয়ে মেনটেন করতে হয়।”

বিশ্বরূপবাবু এ বার নড়েচড়ে উঠে বললেন, “আমাদের সেই খেলাটা এবার শুরু হয়ে যাক তা হলে?”

“কোন খেলাটা দাদা?” সুস্মিতাদেবী জিজ্ঞেস করলেন।

“রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে অন্তাক্ষরী। তুমি শুরু করো সুস্মিতা।”

আঁতকে উঠলেন সুস্মিতাদেবী, “না না দাদা, বললাম না ওটা বড্ড কঠিন হয়ে যায়। তার চেয়ে সবাই নিজের মতো একটা করে গান গাক।”

“বেশ। বেশ। ও, আচ্ছা বেয়ান ম্যাডাম, আপনার গলায় তো গান শোনাই হল না।”

অসীমবাবু বললেন, “তুমি আয় তবে সহচরী-টাই গাও না।”

অপরূপাদেবী অসহায় চোখে ছেলের দিকে তাকালেন। মিতদ্রুর মুখে মুচকি হাসি। অপরূপাদেবীর খুব রাগ হল। স্বামী না হয় মাতাল হয়ে গিয়েছে। ছেলেটাও বিয়ের আগে পর হয়ে গেল?

“তুই বরং রবীন্দ্রনাথের একটা আবৃত্তি শোনা,” অপরূপাদেবী মিতদ্রুকে বললেন।

“আমি?” চোখ বড় বড় করে বলে উঠল মিতদ্রু।

“কেন, তোকে ছোটবেলায় আবৃত্তির স্কুলে পাঠাইনি! নিখিলেশের কাছে আবৃত্তি শিখে স্কুলে আবৃত্তিতে প্রাইজ় পেয়েছিস তো। শোনা ওটা, মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে, মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে, তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে, দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে... মনে নেই তোর?”

উল্লসিত হয়ে উঠলেন বিশ্বরূপবাবু। সংযুক্তাদেবীকে বললেন, “দেখেছ, এই হচ্ছে শিক্ষা। তবে না মিতদ্রু স্কুলে প্রাইজ়টা পেয়েছে। এক দিকে সবাই বলে ইয়াং জেনারেশনের জন্য রবীন্দ্রনাথ হারিয়ে যাচ্ছেন। আর বেয়ান ম্যাডামকে দ্যাখো, ঠিক শিক্ষাটা দিয়েছেন। শোনাও মিতদ্রু।”

হৈমন্তী মিতদ্রুর পরিত্রাতা হয়ে এগিয়ে এল, “আজ ওকে ছেড়ে দাও না ড্যাডি, কাল শোনাবে। চলো মিতদ্রু, ওপরে যাই। আমার এক বন্ধু ওপরে ওয়েট করছে।”

মিতদ্রুর হাতটা টেনে হৈমন্তী উঠে দাঁড়াল। মাথা ঝাঁকাতে থাকলেন বিশ্বরূপবাবু। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, “দেখেছিস তো, এই আফসোস তোকে সারাজীবন বইতে হবে। কত চেষ্টা করলাম, কত মাস্টার রাখলাম, তোর মাকে কত বোঝালাম, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতটা তুই শিখলি না।”

সুস্মিতাদেবী হৈমন্তীকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুই শিখলি না কেন রে মেয়ে?”

হৈমন্তী এমনিতেই বিরক্ত হয়ে ছিল। এরা সব ড্যাডিকে তেল মারতে এসে ফুট কাটে। মেজাজ হারিয়ে ফেলে বলল, “মাইন্ড ইয়োর ওন বিজ়নেস কাকিমা। পার্টিতে এসেছ, নিজের মতো পার্টি এনজয় করো।”

সুস্মিতাদেবীর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। বাসুদেববাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “চলো, এ বার তা হলে আমরা উঠি।”

বিশ্বরূপবাবুর কথা শুনে আগেই মুখ থমথমে হয়ে উঠেছিল সংযুক্তাদেবীর। এ বার পরিস্থিতি সামাল দিতে বলে উঠলেন, “আঃ! হৈমন্তী। আন্টিকে স্যরি বলো। যেমন বাপ তেমন মেয়ে।” তার পর সুস্মিতাদেবীকে বললেন, “সুস্মিতা প্লিজ় কিছু মনে কোরো না। ওর কথাবার্তাই এ রকম। কোথায় কী বলতে হয় জানে না। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।”

হঠাৎ করে পরিবেশটা গম্ভীর হয়ে উঠল। অপরূপাদেবী স্থাণু হয়ে ভাবছিলেন, কী দেমাকি মেয়ে! বাবুসোনাটার কী হবে! গম্ভীর পরিবেশটা কাটাতে বিশ্বরূপবাবু উদাস গলায় বললেন, "তাই বলছিলাম, আজকালকার জেনারেশন এ রকমই।" তার পর অর্কর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি তো ছবি তোলো। রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে কোনও গান গাইতে বা কবিতা আবৃত্তি করতে পারো?"

অর্ক মনে মনে একটা গালাগাল দিয়ে বলল, "না স্যার।"

"আমি পারি। ক'টা শুনতে চাও? তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লিখা। ওই-যে সুদূর নীহারিকা, যারা করে আছে ভিড় আকাশের নীড়..."

তার পর স্নেহার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি তো সাজগোজ করাও। রবীন্দ্রনাথের সাজগোজ নিয়ে কোনও গান বা কবিতা বলতে পারো?"

হৈমন্তীর হাত ধরে মিতদ্রু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। স্নেহা এক দৃষ্টে কিছু ক্ষণ মিতদ্রুর দিকে চেয়ে চোখটা বন্ধ করল। চোখের পেছনে ভেসে উঠল শিপ্রাদি হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাইছে। একটা ঘোরের মধ্যে গলায় ফুটে উঠল, 'মহারাজ, একি সাজে এলে হৃদয়পুরমাঝে! চরণতলে কোটি শশী সূর্য মরে লাজে...'

একুশ

দু'বছর আগে

চান করে বেরিয়ে স্নেহা দেখল মোবাইলে মিতদ্রুর দু'-দুটো মিসড কল। বাথরুম থেকেই মোবাইল বাজার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। চুল আঁচড়ানোর আগেই মিতদ্রুকে কলব্যাক করল।

"হ্যালো, খুঁজছিলে? চান করতে গিয়েছিলাম।"

"না, সে রকম কিছু নয়। তোমার ফ্ল্যাটের তলায় গিয়েছিলাম।"

"ও মা! ওপরে এলে না কেন?"

"সেই উপায় তো এখনও নেই স্নেহা। আর জাস্ট কয়েকটা দিন। আসলে তোমাকে একটা জিনিস দিতে গিয়েছিলাম।"

"জিনিস, আমাকে?" স্নেহা অবাক হল।

"সামান্য। যাই হোক থলিটা ভাগ্যিস ঝোলানো ছিল। ওটার মধ্যে রেখে দিয়েছি।"

একটা কৌতূহল নিয়ে স্নেহা বারান্দায় এল। দড়িটা ধরে থলিটা ওপরে উঠিয়ে নিল। ভেতরে একটা বিদেশি চকোলেটের প্যাকেট। উল্টো দিকে দূরের বারান্দায় চোখ পড়ল। মিতদ্রু বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। কানে মোবাইল।

"আমি প্যাকেটগুলো স্যানিটাইজ করে দিয়েছি। তাও তুমি এক বার করে নিয়ো।"

"এত চকলেট?"

"খাও না বুঝি?"

"না না, চকলেট খেতে খুবই ভালবাসি," স্নেহার ভেতরে একটা অনাবিল আনন্দ বইছে। দিনটাই এখন অন্য রকম মনে হচ্ছে। কত দিন পরে কেউ ওকে চকোলেট দিল। আগেও কখনও কেউ দিয়েছিল কি? মনে পড়ে না। আবেগে চোখ ভিজে উঠল। আবেগমথিত গলায় স্নেহা বলল, "এত চকলেট দেওয়ার কারণটা জানতে পারি?"

মিতদ্রু হাসতে থাকল, "আসলে আমি তো মাংস রান্না করতে পারি না।"

কপট রাগের গলায় স্নেহা বলল, "বুঝেছি, রিটার্ন। মানে ওই যে ছোটবেলা থেকে দেখেছি কারও বাড়িতে রান্না করে পাঠালে সেই পাত্রটা খালি ফেরত পাঠানো হত না, পাল্টা কিছু রান্না করে ফেরত দেওয়া হত।"

"আমি কিন্তু তোমার কন্টেনারটা ফেরত দিইনি।"

"এ মা, আমি সেটা বলতে চাইনি। আর তা ছাড়া ওটা ডিসপোজেবল কন্টেনার। তাও আবার পুরনো।"

"সে যাই হোক। ওর মধ্যে একটা ইম্পর্ট্যান্ট ইনফর্মেশন আছে।"

"ইনফর্মেশন? কী রকম?"

"বিরিয়ানি খেতে খুব ভালবাস, তাই তো?"

গলা খুলে হেসে উঠল স্নেহা, "আমি একা নই। আমার রুমমেটরাও। কিছু একটা অকেশন হলেই আমরা বিরিয়ানি আনিয়ে সেলিব্রেট করতাম, আর এই দোকানের বিরিয়ানি সবার খুব পছন্দ।"

"ঠিক আছে। কন্টেনারটার ঢাকনায় বিরিয়ানির দোকানের ফোন নম্বর লেখা আছে। লকডাউন উঠে গেলে তা হলে এক দিন বিরিয়ানি আনানো যাবে।"

"কিসের সেলিব্রেশনের জন্য?"

"আপাতত এই লকডাউনের থেকে মুক্তি পাওয়ার সেলিব্রেশন ধরো।"

আক্ষেপের গলায় স্নেহা বলল, "সত্যি খুব খারাপ লাগছে জানো তো, তুমি আমার ফ্ল্যাটের তলা থেকে ফিরে গেলে। আসবে এখন?"

"আজকে আর নয়। তা ছাড়া এটাই ঠিক। যখন এত দিন ধরে এতটাই মানছি, তখন আর আইন অমান্য করা ঠিক নয়।"

শেষপর্যন্ত মনের একটা কথা বলেই ফেলল স্নেহা, "সত্যি তুমি এখানে আছ, দেখা হোক বা না হোক, তুমি একটা বড় ভরসা আমার। কখনও একা লাগে না। মনে হয়, এইতো সামনেই তুমি আছ। আমার ভাবতে ভাল লাগে যে, আমি একা নই। যখন তখন তোমাকে ফোন করতে পারি।"

"আচ্ছা, আচ্ছা হয়েছে। ভিডিয়োটার কী হল? কালকে তো দেখলাম দু'বার কিছু পাঠিয়েও ডিলিট করে দিয়েছ।"

"পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তার পরেই মনে হল, ওগুলো পাঠানোর মতো নয়। গোটা পৃথিবীর সঙ্গে ভিডিয়োটা কমপাইল হবে।"

"ছোট দশ সেকেন্ডের ভিডিয়ো তো! মাথায় রাখবেই না যে কোনও একটা কারণের জন্য ভিডিয়োটা করছ। বেশি সচেতন হয়ে গেলেই আটকে যায়।"

"ঠিক আছে দেখছি। একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত হলেই ভাল হয়। ভাবছি এক বার শিপ্রাদিকে জিজ্ঞেস করে নেব। যদিও অনেক দিন যোগাযোগ নেই। আচ্ছা, তোমার আবৃত্তির প্রথম লাইনগুলো বলা যাবে? নামটা এখনও মনে পড়ছে না। আমি কিন্তু গুগল করিনি।"

"সে বুঝতেই পারছি। কিন্তু প্রথম লাইনগুলো বলা যাবে না। তাহলেই তোমার মনে পড়ে যাবে। ব্রেন সেলগুলোকে আরও অ্যাক্টিভ করো।"

"ঠিক মনে করে ফেলব। আচ্ছা, তুমি তো একেবারেই ঘরবন্দি ছিলে। আজকেই প্রথম বেরোলে। কেমন লাগল?"

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে মিতদ্রু বলল, "খোলা আকাশের নীচে দু'পা হাঁটতে যে এত ভাল লাগে, আগে বোধহয় কোনও দিন বুঝিনি।"

"একটা কথা জিজ্ঞেস করব? এই যে তুমি আমাকে এত চকলেট দিলে, নিশ্চয়ই তুমি এগুলো অন্য কারও জন্য এনেছিলে?"

"স্পেসিফিক কারও জন্য নয়। আমি যখনই আসি সুপার মার্কেট থেকে চকলেট নিয়ে আসি। আমার বরং খারাপ লাগছে এত ভাল মাংস খাওয়ার পরে তোমায় সামান্য কয়েকটা চকলেট দিলাম।"

"সামান্য কোথায়? এত্ত দিয়েছ! আচ্ছা তুমি আমেরিকায় কোথায় থাকো?"

"আপাতত নিউ ইয়র্কে। তবে আমেরিকার অনেকগুলো শহরে থাকতে হয়েছে।"

"তুমি কি ওখানেই পাকাপাকি সেটল করে যাবে?"

"সে ভাবে ভাবিনি এখনও। তবে আপাতত ওখানে থাকা ছাড়া আমার সে রকম কেরিয়ার প্রস্পেক্ট নেই। তুমিও যেমন কলকাতায় সেটল করেছ। তোমারও কিন্তু পৃথিবীর যে কোনও শহরে সেটল করার সুযোগ আছে।"

"কেন বলছ?"

"তুমি বিউটিশিয়ান। আর পৃথিবীর কোন মেয়ে সাজতে ভালবাসে

না বলো?”

“এই যে মশাই, শুধু মেয়েদের সাজার কথা বোলো না। আজকাল ছেলেরাও যথেষ্ট রূপ সচেতন। ওরাও কিন্তু গ্রুমিং করতে আসে। তোমাকে ছবি পাঠিয়ে দেখাতে পারি ছেলেরা গ্রুমিং করে নিজেদের লুক কী ভাবে চেঞ্জ করে। তুমি কখনও যাওনি পার্লারে?”

“নাঃ।”

“কখনও ফেশিয়াল পর্যন্ত করাওনি?”

“না,” হাসল মিতদ্রু, “কখনও মনে হয়নি আমার। ওই হেয়ার কাট পর্যন্তই ঠিক আছে।”

“গুড বয়-গুড বয় হেয়ার কাট। মানে সাইড পার্টিং করে আঁচড়ানো চুল।”

বিস্মিত গলায় মিতদ্রু বলল, “তুমি কী করে জানলে?”

“কেন? তোমার ছবি দেখে।”

“আমার ছবি? আমার ছবি কোথায় দেখলে?”

গলাটা রহস্যময় করে স্নেহা বলল, “আছে। আছে। গেস করো।”

“নাঃ!” চিন্তা করেও ধরতে পারল না মিতদ্রু।

“তোমার হোয়াটসঅ্যাপের ডিপিতে। আমাদের পার্লারটা খুলুক, তোমাকে এক দিন নিয়ে যাব।”

“ওহো হোয়াটসঅ্যাপের ডিপি! দেখেছ, খেয়ালই করিনি। আরে একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। আমার হোয়াটসঅ্যাপের ডিপিতে কোনও ছবি ছিল না। এক দিন আমার এক কোলিগ আমার ফোনটা নিয়ে ছবি তুলে ডিপিতে সেট করে দিল। ওর নাকি খুব অসুবিধে হয় হোয়াটসঅ্যাপের ডিপিতে ছবি না থাকলে।”

একটু থেমে স্নেহা বলল, “তোমাকে একটা কথা বলব? প্লিজ় আপত্তি কোরো না।”

“আপত্তি করার মতো কিছু বলবে নাকি?”

“আমার কাছে খুব সিম্পল। দেখো আমি যখন নিজের রান্নাটা করছি, তখন দু’জনেরটাই করি না। কেন তুমি ভাতে ভাত করবে?”

“না তা হয় না। এটা হতে পারে না স্নেহা।”

“কেন নয়?” অবুঝ গলায় স্নেহা বলল, “আমার তো এক্সট্রা কিছু খাটনি হবে না। আর তা ছাড়া একার জন্য রান্না করে কোনও উৎসাহ পাই না। বরং তোমার যদি খুব খারাপ লাগে, বাজার খরচটা আমরা শেয়ার করে নেব।”

মিতদ্রু কিছুতেই রাজি হল না, “না স্নেহা প্লিজ়, আমার অভ্যেস খারাপ করে দিয়ো না। আবার তো আমেরিকায় ফিরে যেতে হবে। নিজের রান্নাটা নিজেকেই করতে হবে। তার চেয়ে এই সব মিটে যাক, এক দিন তোমার কাছে গিয়ে জমিয়ে খেয়ে আসব।”

স্নেহা আরও কিছু ক্ষণ মিতদ্রুকে বোঝানোর বৃথা চেষ্টা করল। মিতদ্রু কিছুতেই রাজি হল না। ফোনটা ছেড়ে সেই একই রকম ভাললাগার রেশটা অনেক ক্ষণ থেকে গেল স্নেহার মনের মধ্যে। হোয়াটসঅ্যাপটা খুলে মিতদ্রু ডিপির ছবিটা বড় করে আলতো একটা চুমু খেল। হঠাৎ একটা গান মনে পড়ল। শিপ্রাদিই শিখিয়েছিল, ‘ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে’। কী মনে হতে ফোনের সাউন্ড রেকর্ডারটা অন করে গানটা রেকর্ড করে অডিয়ো ফাইলটা মিতদ্রুকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিল।

স্নেহা মেয়েটাকে বেশ লেগেছে মিতদ্রুর। এটাও যেন জীবনের একটা অভিজ্ঞতা বা লকডাউনের অভিজ্ঞতা বলা উচিত। গোটা পৃথিবী জুড়ে এরকম দৃষ্টান্ত প্রতিনিয়ত আরও হয়তো অনেক তৈরি হচ্ছে। অচেনা মানুষরা পারস্পরিক নির্ভরতায় বন্ধু হয়ে উঠছে। বা হয়তো বন্ধুত্বের গণ্ডি ছাড়িয়ে সম্পর্ক আরও গভীর হয়ে যাচ্ছে।

মিতদ্রু সারাদিন কী ভাবে কাটায় তার বিশদ বর্ণনা হৈমন্তীকে দেয়। কিন্তু স্নেহার কথা কখনও বলেনি। কেন বলতে গিয়েও বলে উঠতে পারেনি, জানে না। নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় খুচরো আলাপ বলে, নাকি হৈমন্তী ব্যাপারটা কী ভাবে নেবে, অবচেতন মনে সেটা ভেবেই এড়িয়ে গিয়েছে? কারণটা নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়। অন্তত মেয়েটা যে এত ভাল মাংস রান্না করে খাওয়াল, সেটা বলতে পারত। আর মেয়েটা বুদ্ধিমতী। মিতদ্রুর ছবি হোয়াটসঅ্যাপের ডিপি থেকে ঠিক দেখে নিয়েছে। অথচ ও যে কেমন দেখতে, মিতদ্রু এখনও আন্দাজ করতে পারেনি। উল্টো দিকের কোনাকুনি বাড়ি বারান্দাটা এতটাই দূরে যে, ঠিক মতো দেখা যায় না। তা ছাড়া মেয়েটা বারান্দায় যখনই দাঁড়ায়, মুখে মাস্ক লাগানো থাকে।

মিতদ্রু হোয়াটসঅ্যাপটা খুলে অবাক হল। আরে! স্নেহা কখন একটা ভয়েস ফাইল পাঠিয়েছে! সেটা শোনার আগে স্নেহা কেমন দেখতে ডিপির ছবি থেকে দেখার ইচ্ছে হল। আঙুল ছুঁইয়ে মিতদ্রু ছবিটাকে বড় করল। এক ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার মাঝখানে একটা বাচ্চা মেয়ে। মিতদ্রু আন্দাজ করল এটা স্নেহার বাবা-মায়ের সঙ্গে একটা পুরনো ছবি। যদি মাঝের বাচ্চা মেয়েটা স্নেহা হয়ে থাকে, তা হলে ওর বয়স তখন পাঁচ বা ছয়। বাচ্চা মেয়েদের মতো মিষ্টিমুখ। এই মুখ দেখে কখনওই আন্দাজ করা যায় না, এখন ওকে কেমন দেখতে।

স্নেহার পাঠানো অডিয়ো ফাইলটা চালালো মিতদ্রু। গানটা শুরু হল— ‘ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে...’ মুগ্ধতায় চোখ বন্ধ হয়ে গেল মিতদ্রুর।

বাইশ

‘পলক নাহি নয়নে, হেরি না কিছু ভুবনে- নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে...’

মিতদ্রু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, “বাঃ! মেয়েটা খুব সুন্দর গাইছে তো। আর সুদর্শনকাকু দারুণ পিয়ানো বাজাচ্ছেন। শুনে এলে হত।”

“কী এই বুড়োদের মধ্যে বসে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনবে বলো তো? আর ওই যারা এসেছে দেখছ, সবাই শুধু ড্যাডিকে তেল মেরে আহা উহু করতে এসেছে। সব জানা আছে আমার। সাধে রেগে যাইনি।”

“যাই হোক, সবার মাঝখানে তোমার ও ভাবে বলা উচিত হয়নি।”

“ছাড়ো তো।”

“আমি অবশ্য আর একটা কারণে নীচে থাকতে চাইছিলাম। বাবা বেশি ড্রিঙ্ক ক্যারি করতে পারে না। এখন দলে পড়ে খেয়ে নিয়েছে। এর পর যদি বেসামাল হয়ে পড়ে সেটা খুব সম্মানের হবে না। বিশেষ করে তোমাদের বাড়িতে এত জন অপরিচিতর সামনে। আর মায়ের অবস্থাও একটু করুণ। মাকে যে ভাবে সবাই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে বলছে, মা কুঁকড়ে যাচ্ছে।”

“চিন্তা কোরো না। কিচ্ছু হবে না। এরা এ রকমই।”

যে মেয়েটা বিকেলে মেকআপ করে দিয়েছিল, আর এখন একটা সুন্দর বেগুনি শাড়ি পরে অপূর্ব একটা গান গাইছে, কেন যেন মেয়েটাকে অনেক দিনের চেনা মনে হচ্ছে মিতদ্রুর। এই কথা মিতদ্রু হৈমন্তীকে কিছুতেই বলতে পারছে না। এ রকম হয়তো হয় কখনও কখনও। কিন্তু মেয়েটাও যে ভাবে মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকাচ্ছে, কিছু যেন একটা বক্তব্য রয়েছে মেয়েটার চোখে।

হৈমন্তী মিতদ্রুকে নিজের ঘরে নিয়ে এল। ঘরে ঢুকে মিতদ্রু দেখল, হৈমন্তীর খাটে আর একটা মেয়ে আধশোয়া হয়ে আছে। তাকে দেখিয়ে হৈমন্তী জিজ্ঞেস করল, “দেখো তো চিনতে পারো কি না?”

এক এক সময় দুমদাম হৈমন্তী এমন প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়, অস্বস্তিতে পড়তে হয়। না, এই মেয়েটাও অচেনা। মেয়েটার চোখের রং কটা। সেটা কনট্যাক্ট লেন্সও হতে পারে। মুখে মিটিমিটি হাসি। মেয়েটা উঠে বসে শরীরটা একটু দুলিয়ে বলল, “গেস করো।”

কোনও ভাবেই মেয়েটাকে চিনতে পারল না মিতদ্রু। নিশ্চয়ই হৈমন্তীর কোনও বন্ধু। মেয়েটা এ বার উঠে দাঁড়িয়ে মিতদ্রুর সামনে এগিয়ে এসে বলল, “হৈমন্তী কখনও আমার ছবি পাঠায়নি তোমার কাছে?”

এই সব প্রশ্নের কোনও উত্তর হয় না। মেয়েটা অবশ্য বলে যেতে লাগল, "জানি পাঠাবে না। ভয়। জেলাসি। যদি তুমি আমার প্রেমে পড়ে যাও?"

হৈমন্তী ওর স্বভাব মতো খিল খিল করে হাসতে থাকল আর মেয়েটাও মিতদ্রুর দিকে চেয়ে চোখ মটকাল। হৈমন্তীর হাসি থামতে যথারীতি সময় লাগল। সেটা সামলে বলল, "ও অরণ্যা। আমার ওয়ান অব দ্য বেস্ট ফ্রেন্ডস। কলকাতায় একটা বুটিক আছে। সব কিন্তু এখানকার হাট থেকে কিনে নিয়ে যায়।"

"হাই!" নিচু গলায় মিতদ্রু বলল। এই আড়াই বছরে হৈমন্তীকে এটুকু বুঝেছে, ওর বন্ধু হতে যত ক্ষণ বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ হতে তত ক্ষণই। কত জন বেস্ট ফ্রেন্ডের কথা যে বলেছে। তবে অরণ্যার শরীরের ভাষা একটু উগ্র। উদ্ধত। বিশেষ করে ওর কটা চোখগুলোর দিকে তাকালে অস্বস্তি হয়।

"তুমি এত আড়ষ্ট কেন?" অরণ্যা মিতদ্রুকে জিজ্ঞেস করল।

"না, আসলে একটু টায়ার্ড লাগছে।"

"টায়ার্ড? দুপুরে একলা ঘরে পেয়ে কত বার করেছিস তুই হৈমন্তী?"

"যাঃ!" হৈমন্তী খিল খিল করে হাসতেই থাকল।

অরণ্যা গভীর চোখে এক বার মিতদ্রুকে দেখে বলল, "সামলে রাখতে পারবে তো আমার বেস্ট ফ্রেন্ডকে? ওর কিন্তু ভীষণ খিদে।"

এবার আর অস্বস্তি নয়, বিরক্তি লাগতে থাকল মিতদ্রুর। ঠান্ডা গলায় বলল, "আমরা অন্য কিছু নিয়ে কথা বলতে পারি?"

"নিশ্চয়ই। আমি তো এসেছি পার্টি করতে। এসে শুনলাম সাজুগুজু করে তোমরা বাইরে গিয়েছ।"

"আরে নিজেরা একটু সেলফি তুলতে বেরিয়েছিলাম," হৈমন্তী বলল।

"সেলফি তুলতে বাইরে? তোর কাণ্ড বুঝি না।"

"চাঁদের আলোয়। বাইরে আজ দারুণ জ্যোৎস্না।"

"আর আমি এসে দেখি নীচে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে যথারীতি। ছাদে চলে গেলাম সিগারেট ফুঁকতে। ছাদও জ্যোৎস্নায় ভাসছে। কোথায় সত্যি গিয়েছিলি বল তো? অ্যাই হৈমন্তী, এটাই বা আমাদের কেমন সেলিব্রেশন হচ্ছে? রঙিন জলটল আনা।"

হৈমন্তী বলল, "আরে ও খায় না। পিউরিটান।"

"পিউরিটান। মানে গুড বয়। ও খায় না তো কী হয়েছে? আমরা খাব। মাতাল হব। মাতাল হয়ে আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে গুডবয়কে স্পয়েল করে ব্যাডবয় করে দিতে। তো গুডবয়, তোমার নাম শুনেছি বাবুসোনা। আজ থেকে খাওয়া শুরু করবে নাকি?"

"না, তোমরা খেতে পারো। আমার কোনও আপত্তি নেই।"

"ওরে বাবা হৈমন্তী, এতো মেল শভিনিস্ট দেখছি। আপত্তি নেই! আর কিসে কিসে তোমার আপত্তি নেই?" হেসে উঠল অরণ্যা।

হৈমন্তী তাড়াতাড়ি মিতদ্রুকে বলে উঠল, "অ্যাই শোনো, আমিও কিন্তু খাই না। ওই মাঝে মাঝে। আমি যদি একটু ওকে কোম্পানি দিতে খাই, তোমার সত্যিই আপত্তি নেই তো?"

যথাসম্ভব বিরক্তি লুকিয়ে মিতদ্রু বলল, "বললাম তো, আপত্তি নেই।"

হৈমন্তী বলল, "কী খাবি বল অরণ্যা? মধুকাকাকে বলি, একটা ওয়াইনের বোতল আনতে।"

"ও সব তুই যখন হানিমুনে যাবি, ক্যান্ডেল লাইট ডিনার করার সময় খাবি। অবশ্য সেটাও তোকে একাই খেতে হবে পিউরিটানের সঙ্গে। আমার জন্য স্ট্রং কিছু বল। হুইস্কি কিংবা রাম। রামটা হলেই ভাল হয়। সঙ্গে কোলা আনতে বল।"

"দাঁড়া দেখছি।"

হৈমন্তী বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘরে শুধু মিতদ্রু আর অরণ্যা। অরণ্যার সামনে মিতদ্রুর থাকতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। শুধু ভদ্রতার খাতিরে উঠে যেতে পারছিল না।

"হাউ ইজ় মাই ফ্রেন্ড ইন বেড?" অরণ্যা চোখ মটকে জিজ্ঞেস করল। মিতদ্রু মুখে কিছু না বললেও স্পষ্ট বিরক্তি দেখাল।

"রেগে যাচ্ছ নাকি আমার ওপর? আরে আমি এ রকম অনেক বন্ধুর বয়ফ্রেন্ডকে স্পয়েল করেছি। শুধু খুঁজে নিতে হয়।"

মিতদ্রু আবার কথা ঘোরানোর চেষ্টা করল, "তুমি কি আজ থাকছ?"

"গুড, গুড, গুড কোশ্চেন। মানে অ্যাট লাস্ট তুমি বোঝার চেষ্টা করছ, সুযোগ পাওয়া যেতে পারে কি না? নেভার মাইন্ড।"

"প্লিজ়। ডোন্ট মেক মি আনকম্ফর্টেবল।"

"আচ্ছা, বেডের কথা আর জিজ্ঞেস করব না, তুমি ভার্জিন কি না, এই বোকা বোকা প্রশ্নটাও করব না। হৈমন্তী আমাকে ফোনে বলল দুপুরবেলায় ও নাকি তোমায় কিস করেছে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। মাই গড, দু'বছরের ওপর রিলেশনশিপ তোমাদের। আর আজকে ফার্স্ট টাইম চুমু খেলে তোমরা? কেমন লাগল?"

মিতদ্রু উঠে দাঁড়াল। এই মেয়ের সঙ্গে ভদ্রতা দেখানোর আর কোনও প্রয়োজন নেই। হৈমন্তীই বা কেমন? একেবারে ব্যক্তিগত মুহূর্ত বন্ধুদের বলে বেড়াচ্ছে। অরণ্যাকে আর কিছু না বলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। পেছন থেকে অরণ্যার গলা শুনতে পেল, "এইটুকুতেই মাইন্ড করলে নাকি? আরে বন্ধুদের সঙ্গে একটু নন-ভেজ লেগপুল করতে পারব না?"

মিতদ্রু দু'পা এগোতেই দেখা হয়ে গেল হৈমন্তীর সঙ্গে। হাঁফাতে হাঁফাতে হৈমন্তী বলল, "উফ! ম্যানেজ করেছি। মধুকাকা আনছে। কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবে? আমি ফিশ ফ্রাইও আনতে বলেছি।"

"আমি আসছি।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

"দেখি ছাদে যাই। সিগারেট খেয়ে আসি।"

"তুমি ঘরেই স্মোক করতে পারো।"

"ঘরে এসি চলছে। সব দরজা জানলা বন্ধ। আসছি।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ছাদে এল মিতদ্রু। ছাদের দরজায় দাঁড়াতেই মন ভরে উঠল। সুন্দর ঠান্ডা হাওয়া বইছে। এটা এসির ঠান্ডার চেয়ে অনেক বেশি মনোরম। চাঁদের আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে ছাদটা। তার মধ্যে একটা মিষ্টি সুরে মৃদু একটা গান ভেসে আসছে, 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে বসন্তের এই মাতাল সমীরণে...'

দরজার মুখে দাঁড়িয়েই মিতদ্রু দেখতে পেল বেগুনি শাড়ি পরা মেয়েটাকে। এক কোণে হাত দুটো পাঁচিলে রেখে বাইরের দিকে চেয়ে আপনমনে গেয়ে যাচ্ছে গানটা।

মিতদ্রু পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করেও থেমে গেল। এখন সিগারেট ধরালে তার গন্ধ মেয়েটার নাকে যাবে। তা হলে গানটা হয়তো থেমে যাবে। মিতদ্রু অপেক্ষা করল মেয়েটার গানটা শেষ হওয়া পর্যন্ত। তার পর মৃদু হাত তালি দিয়ে উঠল। মেয়েটা ঘুরে মিতদ্রুর দিকে তাকিয়ে একটু যেন চমকে উঠল।

এগিয়ে গেল মিতদ্রু, "ওয়ান্ডারফুল গলা আপনার। নীচেও খুব সুন্দর গাইছিলেন। আপনার গলাটা আগে শুনেছি। আপনি কি প্রফেশনাল সিঙ্গার? ইউটিউবে গান আছে আপনার?"

বিকেলবেলায় মেয়েটা যখন মেকআপ করাচ্ছিল, তখন মুখে মাস্ক ছিল। এখন নেই। চাঁদের আলোয় অদ্ভুত সুন্দর দেখতে লাগছে মেয়েটাকে। কিন্তু মেয়েটার চোখে জল টলটল করছে। কেন যেন মনে হচ্ছে, মেয়েটা অনেক দিনের চেনা।

মিতদ্রু জিজ্ঞেস করল, "আমাদের কখনও দেখা হয়েছিল কি?"

মেয়েটা মাথা নাড়ল। চোখের জলটা আরও টলটল করে উঠল। মিতদ্রু পকেট থেকে রুমালটা বার করে এগিয়ে দিয়ে বলল, "স্যরি। জানি না আপনার কেন মন খারাপ। জানেন আমার বার বার মনে হচ্ছে কিছু একটা কানেকশন রয়েছে আমাদের মধ্যে।"

মেয়েটা অনেক ক্ষণ চুপ করে মিতদ্রুর চোখের দিকে চেয়ে থাকল। তার পর বলল, "আমাদের কখনও দেখা হয়নি। কিন্তু আমরা পরস্পরকে চিনতাম।"

বিস্মিত গলায় মিতদ্রু বলল, "মানে?"

"আমি স্নেহা।"

"স্নেহা? মানে তুমিই সেই স্নেহা?" চোখ চকচক করে উঠল মিতদ্রুর। কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না, "তুমি সেই স্নেহা নিউ টাউনে লকডাউনের সময় আমরা ছিলাম কোনাকুনি উল্টো দিকের দুটো ফ্ল্যাটে?"

"মনে আছে তা হলে?"

কাউকে যেন হারিয়ে খুঁজে পেয়েছে মিতদ্রু। এক একটা মুহূর্ত আসে, যখন জগৎ-সংসার বোধ সব এলোমেলো হয়ে যায়। মিতদ্রুর ইচ্ছে করছিল পৃথিবী ভুলে স্নেহাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। লকডাউনের সেই প্রথম দুটো সপ্তাহ অনিশ্চিত সময়ে এই মেয়েটার জন্যই জীবনে একটা অন্য রকম সুখস্মৃতি রয়ে গেছে তার। মেয়েটাকে সুনীতা শিলিগুড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। মিতদ্রু সে দিন যেমন নিশ্চিন্ত হয়েছিল, সে রকমই তার পরে আরও দু'দিন নিউ টাউনের ফ্ল্যাটে থাকার সময় অসহ্য ফাঁকা লেগেছিল। যোগাযোগ ছিল আরও কিছুদিন। কিন্তু প্রথম সুযোগেই আমেরিকায় ফিরে পরে যোগাযোগটা ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গিয়েছিল।

স্নেহার দুটো হাত ধরে মিতদ্রু বলল, "তুমি এত ক্ষণ বলোনি কেন?"

"বলতে তো চেয়েছিলাম। কিন্তু বলতে পারিনি। ভয় হয়েছিল, যদি তুমি আমাকে আর চিনতে না পারো। সেটা আমি সহ্য করতে পারতাম না।"

মিতদ্রুর ভেতর যেন একটা ঝড় বইছে, "স্নেহা... স্নেহা তোমার মনে আছে, দু'বছর আগে এই সময়ে আমরা কী রকম দু'জনের নির্ভরতায় বেঁচে ছিলাম! তোমার মনে আছে তুমি আমাকে রান্না করে পাঠিয়েছিলে। যে দিন অকাল দীপাবলি হয়েছিল সে দিন তুমি আর আমি অন্ধকার বারান্দায় মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম..."

অনেক অনেক কথা বলার আছে। মিতদ্রুর কথা যেন শেষ হতেই চাইছে না।

তেইশ

দু'বছর আগে

হৈমন্তী ফোন করে খুব উত্তেজিত গলায় বলতে আরম্ভ করল, "যাক অবশেষে ড্যাডি ব্যবস্থা করতে পেরেছে।"

মিতদ্রু বুঝতে না পেরে বলল, "কিসের ব্যবস্থা?"

"ওই যে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার। ড্যাডি স্পেশ্যাল পাস বের করতে পেরেছে। একটা বড় গাড়িতে করে আমরা সবাই চলে যাব। তোমার জিনিসপত্র সব প্যাক করে নাও।"

মিতদ্রু অবাক হয়ে বলল, "শান্তিনিকেতন?"

"ও মা! ভুলে গেলে? তোমাকে বলেছিলাম না আমাদের শান্তিনিকেতনে একটা বড় বাড়ি আছে, ড্যাডি লকডাউনে ওখানে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সেটারই ব্যবস্থা হয়েছে। তোমাকে তো বলেছিলাম ওখানে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেলে আমরা সবাই মিলে ওখানে চলে যাব। মধুকাকা আছে, মধুকাকার পুরো ফ্যামিলি আছে। কোনও কিছু অসুবিধে হবে না।"

মিতদ্রু বোঝানোর চেষ্টা করল, "বলেছিলে, কিন্তু বোঝার চেষ্টা করো, আমার কোয়ারেন্টাইন থাকার আরও দু'দিন বাকি আছে। আজ আর কাল।"

"আরে তোমাকে কি আজকেই যাওয়ার কথা বলছি নাকি? পরশুই না হয় যাব। চলো, চলো খুব মজা হবে।"

"তা হয় না। তুমি বোঝার চেষ্টা করো। শ্যামনগরে বাবা-মা রয়েছেন, এখনও বাবা মায়ের সঙ্গে এক বারও দেখা করার সুযোগ হয়নি। সুযোগ মানে উপায়। আমার কোম্পানি থেকেও চেষ্টা করছে স্পেশ্যাল পাস নিয়ে আমাকে শ্যামনগরের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার।"

হৈমন্তী জোর করতে থাকল, "না, না, শ্যামনগরে গিয়ে কি থাকবে! শান্তিনিকেতনে চলো প্লিজ়।"

মিতদ্রু অসহায় গলায় বলল, "বোঝার চেষ্টা করো।"

"আমি কিছু বুঝতে চাই না। তুমি ড্যাডির সঙ্গে কথা বলো।"

"ড্যাডি...ড্যাডি..." বলে হৈমন্তী ফোনটা বিশ্বরূপবাবুকে দিতে দিতে বলল, "ড্যাডি দেখো মিতদ্রু কী বলছে... রাজি হচ্ছে না। শ্যামনগরে যাবে বলছে। তুমি কথা বলে রাজি করাও।"

বিশ্বরূপবাবু ফোনটা নিয়ে বললেন, "হ্যালো মিতদ্রু, কেমন আছ?"

"ভাল আছি।"

"না, তুমি মোটেই ভাল নেই। একা একা আছ। তোমাকে হৈমন্তী বলেছে তো, আমরা শান্তিনিকেতনে যাচ্ছি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ব্যবস্থা করে ফেলেছি। তুমিও চলো।"

"না কাকু, আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।"

বিশ্বরূপবাবু চাপাচাপি করতে থাকলেন, "কেন সম্ভব নয়? তোমার ওই কোয়ারেন্টাইনে থাকা কবে যেন শেষ হচ্ছে?"

"কাল।"

"বেশ, পরশুই আমরা যাব। আর চৈত্র সংক্রান্তির দিন তো লকডাউনটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। একেবারে পয়লা বৈশাখ কাটিয়ে ফিরে আসব।"

"লকডাউনটা শেষ হচ্ছে কি? মনে হয় না। যেভাবে কেস ক্রমশ বাড়ছে, লকডাউনটা মনে হয় এক্সটেন্ডেড হবে।"

"হলে হবে। এটা তো আর আমাদের হাতে নেই। সরকারি ব্যাপার। কিন্তু হাতে যে সুযোগটা রয়েছে, সেটার সদ্ব্যবহার করো। তুমি তো কখনও আমাদের শান্তিনিকেতনের বাড়ি, মানে 'খেলাঘর'-এ যাওনি। ওখানে গেলেই অপার শান্তি। আকাশে বাতাসে রবীন্দ্রনাথ। তোমাকে বলেছিলাম তো, আমার দাদু রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের ছায়াসঙ্গী ছিলেন। এমন অনেক ঘটনার সাক্ষী উনি যেগুলো কেউ জানে না। কোনও বইতে নেই। সব তোমাকে শোনাব।"

"সে ঠিক আছে। কিন্তু কী বলুন তো, এই লকডাউনে কিন্তু আমাদের অফিস ছুটি নয়। ইউরোপ আমেরিকায় ডামাডোল চলছে ঠিকই, কিন্তু আস্তে আস্তে বিজনেসেও ফিরছে। ক্লায়েন্ট সাপোর্ট দিতে হচ্ছে।"

"কী ভাবে দিচ্ছ?"

"এখন মোস্টলি অনলাইনে। এটা ওয়ার্ক ফ্রম হোম মডেল।"

"মিটিং-এ, মানে স্কাইপে?"

"হ্যাঁ ও রকমই ধরতে পারেন। আরও প্ল্যাটফর্ম আছে, ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক আছে..."

"ওরে বাবা, অত বুঝি না। যেটা বুঝছি, কোনও সমস্যাই নেই। তুমি শান্তিনিকেতন থেকে স্কাইপে মিটিং করবে।"

"না কাকু, তা হবে না। আমাদের কোম্পানির এইচআরের কড়া নিয়ম। আমি তো এখানে কোম্পানির অ্যাকোমোডেশনে আছি। নিজের বাড়ি ছাড়া এখান থেকে অন্য কোথাও গেলে আমাকে কোম্পানি পারমিশন দেবে না। তাই শুধু শ্যামনগরে যাওয়ার জন্য এই পারমিশনটা পাব নিজের বাড়ি বলে।"

একটু চুপ করে থেকে বিশ্বরূপবাবু বললেন, "তোমাকে একটা কথা অনেক দিন ধরে বলব ভাবছিলাম মিতদ্রু। তোমাকে আমেরিকায় ফিরে যেতেই হবে?"

"যেতে তো হবেই। তবে কবে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি হবে এখনও কেউ বুঝতে পারছে না।"

"না, আমি তোমাকে একটা অন্য কথা বলছি। দেখো আমার এত বড় ব্যবসা। হৈমন্তী আমার একমাত্র মেয়ে। বহু দিন ব্যবসা করলাম। আমার তো ইচ্ছে ব্যবসা থেকে এবার রিটায়ারমেন্ট নিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবিঠাকুরের শীতল ছায়ায় থাকব। কিন্তু এত বড় ব্যবসাটা দেখবে কে? তুমি তো আপনজন হয়ে গিয়েছ। তুমি আর হৈমন্তী মিলে ব্যবসাটা দেখো।"

এই ইঙ্গিতটা আগেও ছিল। আজ বিশ্বরূপবাবু সরাসরি বললেন। মিতদ্রুও কিছু ক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আপনার যে ধরনের ব্যবসা,

তাতে আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই।”

“আরে আমি সব বলে দেব। শিখিয়ে দেব। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। ঠিক পারবে। তাড়াহুড়ো নেই। এখন তো চিন্তা ভাবনা করার অঢেল সময়। ভেবে দেখো।”

মিতদ্রু আর কথা বাড়াল না।

“তা হলে শান্তিনিকেতনটা হবে না কিছুতেই?”

“দেখুন আমি আমার অফিসকে চিনি। অফিস থেকে কিছুতেই পারমিশন পাওয়া যাবে না। সবাই যদি লকডাউনে বাড়িতে না থেকে এ দিক ও দিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়, সেটা অফিসের পক্ষেও একটা সমস্যা। লকডাউনটা উঠে যাক। সব কিছু একটু স্বাভাবিক হোক। তার পর আমেরিকা ফেরার আগে এক বার নিশ্চয়ই মা-বাবাকে নিয়ে শান্তিনিকেতন ঘুরে যাব।”

বিশ্বরূপবাবু শেষপর্যন্ত বুঝলেন, “ঠিক আছে। তোমাকে তা হলে আর জোর করব না। বিশ্বভারতীও বন্ধ আছে। ক্যাম্পাস খুলে যাক। আমি নিজে তোমাকে রবিঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত সব জায়গাগুলো ঘুরিয়ে দেখাব।”

ফোনটা রেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল মিতদ্রু। কিছু কিছু মানুষ আছেন তারা ভাবেন, তাঁরা যেটা ভাবছেন সেটাই শেষ কথা। বিশ্বরূপবাবু সে রকম। মিতদ্রুর যে বিষয় নিয়ে পড়াশোনা, যে বিষয় নিয়ে কাজ, যে কাজটা করতে খুব ভাল লাগে, তার সঙ্গে বিশ্বরূপবাবুর ব্যবসার দূর দূরান্ত পর্যন্ত কোনও সম্পর্ক নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় হৈমন্তীর সঙ্গে ওর বিয়েটা শেষ পর্যন্ত সুখের হবে তো? কিন্তু মেয়েটাকে যে বড্ড ভালবেসে ফেলেছে। মেয়েটা যতই ছেলেমানুষ হোক, যতই বড়লোকের আহ্লাদি মেয়ে হোক, ওর সারল্যকে অবজ্ঞা করতে পারে না। মিতদ্রু বোঝে বিয়ের পর কিছু প্রাথমিক সমস্যার সৃষ্টি হবে, কিন্তু মিতদ্রুর স্থির বিশ্বাস সেটা ওরা কাটিয়েও উঠতে পারবে।

আরও একটা ব্যাপার হৈমন্তীর মনেই নেই। পরশু মিতদ্রুর জন্মদিন। সে দিন মা-বাবার কাছে ফিরে যাওয়ার খুব চেষ্টা করবে।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে সিগারেট খেতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বারান্দায় এসে দাঁড়ালে এখন অবধারিত প্রথমেই চোখ চলে যায় স্নেহার বারান্দাটার দিকে। বারান্দাটা এখন ফাঁকা। মিতদ্রু জানে একটা ফোন করলেই স্নেহা এসে দাঁড়াবে বারান্দায়। কিন্তু সেটাও কি উচিত?

স্নেহার সঙ্গে কথা বলে বা হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট করে মনটা এখন অদ্ভুত হাল্কা হয়। মেয়েটা একদম অন্য রকম। কিন্তু বন্ধুত্বের গণ্ডিটা বন্ধুত্বের মধ্যেই রাখা উচিত। সেটা সচেতন ভাবে চেষ্টা করে মিতদ্রু। ফোন করে বারান্দায় ডাকলে তার হয়তো অন্য মানে হবে। লকডাউনের বন্ধু লকডাউনের বন্ধুত্বের ঘেরাটোপেই থাকুক। তাই মেয়েটা আবার রান্না করে পাঠানোর চেষ্টা করলেও মিতদ্রু রাজি হয়নি। কিন্তু নিজের একটা প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়ে গেল। ব্যাপারটা আর খোঁজ নেওয়া হয়নি। বাসু কিন্তু যা ব্যবস্থা করার করেছে। বাসু ফোন করে যতই বাজে বকবক করুক, দরকারে কিন্তু খুব করিতকর্মা। ঠিক খোঁজ নিয়েছে কোম্পানি সুনীতা বলে একটা মেয়েকে শিলিগুড়িতে তার বাড়ি পাঠাচ্ছে। সুনীতাকে মিতদ্রুও চেনে। ওকে একটা ফোন করা দরকার।

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি সুনীতাকে ফোন করল মিতদ্রু, “এই তোর শিলিগুড়িতে ফেরার দিন ঠিক হয়েছে?”

“আরে হ্যাঁ, তোর কোন এক আত্মীয়ের কথা বাসু বলছিল। বাসু কথাবার্তা বলে এইচআরকে রাজি করিয়েছে।”

“তোর কোনও অসুবিধে নেই তো?”

“না, কিসের অসুবিধে? একটা মেয়ের যদি উপকার হয় তো ভালই। আমি তোর আগেই দেশে ফিরেছি। আমার কোয়ারেন্টাইন পিরিয়ড শেষ। অফিস থেকে ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা, পাস পেতে দেরি হচ্ছিল। বাট অ্যাট লাস্ট সব ব্যবস্থা হয়েছে। খুব সময়ে ফোন করেছিস। মেয়েটা যাবে?”

একটু ইতস্তত করে মিতদ্রু বলল, “শোন, আমি কিন্তু বাসুকে একটু মিথ্যে কথা বলেছি। মেয়েটা কিন্তু আমার আত্মীয় নয়, প্রতিবেশী। এটা শুনলে এইচআর হয়তো রাজি হত না। তোকে সত্যি কথাটা বললাম। মেয়েটা এমনিতে বাড়িতে আছে। শারীরিক কোনও অসুবিধে নেই।”

হেসে ফেলল সুনীতা, “প্রতিবেশী? তুই তো নিউ টাউনে কোম্পানি অ্যাকোমোডেশনে আছিস। তোর সঙ্গে তা হলে মেয়েটার আলাপ হল কী করে?”

মিতদ্রু একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে বলল, “সে এক কাহিনি। যখন দেখা হবে বলব। আপাতত বলি এই নির্জন পাড়ায় ধরতে পারিস এখন শুধু ও আর আমি আছি। তাই নিজেদের মধ্যে আলাপ করে একটু যোগাযোগটা রেখেছি, কিছুটা পারস্পরিক নির্ভরতাও আছে। কিন্তু মেয়েটা খুব বিপদে পড়ে রয়েছে। খুবই সাধারণ মেয়ে, কিন্তু খুব ভাল মেয়ে।”

“বুঝেছি, এখানে জব করে?”

“বিউটিশিয়ান। এখানে একটা পার্লারে কাজ করে,” মিতদ্রু আবার জিজ্ঞেস করল, “তোর কোনও অসুবিধে হবে না তো?”

“অসুবিধের কিছু নেই। অফিস থেকে বড় গাড়ি দেবে বলেছে। এইট সিটার, তিন রো। মাঝে যদি আমি বসি আর পেছনে মেয়েটা, তা হলে ডায়াগনালি সোশ্যাল ডিসট্যান্সটা রাখতে পারব।”

“থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ সুনীতা। মেয়েটার খুব উপকার হবে।”

“ঠিক আছে, অত বলতে হবে না। তুই কনফার্ম করে দে। ওকে বলে রাখ কাল ভোরে বেরোব। ভোরে মানে ভোর চারটে সাড়ে চারটে নাগাদ। তা হলে তোর ওখানে গিয়ে মেয়েটাকে তুলে নেব। তুই আমাকে ওর নাম্বারটা একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে দে। আর ওকেও বলে রাখ, রেডি হয়ে থাকে যেন।”

মিতদ্রু ফোনটা ছেড়েই একটা তৃপ্তির শ্বাস নিয়ে স্নেহাকে ফোন করল, “হ্যালো স্নেহা, ভেরি গুড নিউজ়।”

স্নেহা প্রাণবন্ত গলায় বলল, “গুড মর্নিং। সকাল সকাল কী গুড নিউজ়?”

“তোমার শিলিগুড়িতে ফেরার একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছি। তোমাকে বলেছিলাম না আমার এক কোলিগ শিলিগুড়িতে থাকে। অফিস থেকে ওর ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছিল, সেটা ম্যাচিওর করেছে। কাল ভোরবেলায় ও রওনা দেবে। ভোর চারটেয়। তুমি সব গোছগাছ করে নাও।”

স্নেহার মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। অথচ সামান্য সামর্থ্য নিয়ে এই বাড়ি ফেরার জন্য কী চেষ্টাই না করছে বাবা। এমনকি অনুরাধাদি এখান থেকে ওর বাড়িতে নিয়ে গেলেও হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে ভেবেছিল। আর এ একেবারে বাড়ি ফেরার দারুণ ব্যবস্থা করে দিল মিতদ্রু। তবু মনটা কেন খারাপ হয়ে যাচ্ছে? মিতদ্রুকে ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে কি? ছেলেটার সঙ্গে এক বারও তো দেখাও হল না।

“কী ভাবছ?” স্নেহাকে চুপ করে থাকতে দেখে মিতদ্রু জিজ্ঞেস করল।

স্নেহা আনমনা গলায় বলল, “আর তুমি? তুমি কবে যাবে শ্যামনগরে?”

“কালকে শেষ হচ্ছে আমার কোয়ারেন্টাইন। ব্যবস্থা হলে পরশুই হয়তো। জানো পরশু আমার জন্মদিন। ওই দিন বাড়ি ফিরতে পারলে মা বাবা ভীষণ খুশি হবে। যাক বাবা, শেষ পর্যন্ত আমরা এ বার যে যার বাড়ি ফিরতে পারব।”

দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে স্নেহা বলল, “ফিরে যাওয়ার আগে দেখা হবে না আমাদের?”

“কেন হবে না? এই তো বারান্দায় এসো। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়েই তো তোমার সঙ্গে কথা বলছি।”

স্নেহা বারান্দায় এল। মিতদ্রু গ্রিলের মধ্যে থেকে হাত বার করে হাত নাড়ল। স্নেহা গ্রিলের মধ্যে থেকে হাত বার করে হাত নাড়ল। কিন্তু আজ দু'জনেরই হাত বড্ড ক্লান্ত আর ভারী লাগল।

চব্বিশ

দু'বছর আগে

সারা রাত্রি ঘুম হয়নি স্নেহার। খানিকটা বাড়ি ফিরে যাওয়ার উত্তেজনায়, আর খানিকটা এই পাড়া ছেড়ে, বিশেষ করে মিতদ্রুকে ছেড়ে চলে যাওয়ার চোরা একটা বেদনায়। গোছগাছের জন্য কতটুকুই বা জিনিস ছিল? যা ছিল কাল দুপুরের মধ্যেই গোছগাছ হয়ে গিয়েছিল। মেয়ে ফিরে আসতে পারছে জেনে বাবা-মা খুব খুশি। শুধু একটু চিন্তায় আছে অচেনা অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে গাড়িতে এতটা পথ পেরিয়ে আসবে বলে। স্নেহা বুঝিয়েছে, এটা একটা বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির গাড়ি। তাদের যথাযথ অনুমতি নেওয়া আছে আর ভোর চারটেয় বেরিয়ে দিনে দিনে পৌঁছে যাবে শিলিগুড়ি। এখন লকডাউনের জন্য রাস্তাঘাট সব ফাঁকা। যে মেয়েটার সঙ্গে যাবে তার সঙ্গে আলাপ না হলেও সেও শিলিগুড়ির মেয়ে। অনুরাধাদিও খুশি। দায়িত্ব খানিকটা ওরও ছিল। স্নেহা যে নিজেই বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করে ফেলতে পেরেছে, তাতে অনুরাধাদি নিশ্চিন্ত।

কাল থেকে তিন বার মোবাইলে কথা হয়েছে মিতদ্রুর সঙ্গে। স্নেহার খুব ইচ্ছে করেছিল এক বার যদি মিতদ্রুর সঙ্গে সামনাসামনি দেখা করা যায়। ওর ফ্ল্যাটে না হয় না-ই যেত। রাস্তায় বেরিয়ে আসত। দূরত্ব রেখে দু'জন দু'জনকে দেখে বিদায় নিত। অচেনা ছেলেটার সঙ্গে মনের দূরত্ব তো কবে মুছে গিয়েছে। আকারে-ইঙ্গিতে-সরাসরি মিতদ্রুকে এই দেখা করার কথাটা কত বার বলেছে। মানুষ যে একদম রাস্তায় বেরোচ্ছে না, তা তো নয়। নিজেদের মধ্যে দূরত্ব রেখে মানুষ রাস্তায় নামছে। মিতদ্রু কিন্তু কোনও রকম সাড়া দেয়নি। হয় স্নেহার মনের ইচ্ছের কথাটা বুঝতে পারেনি, আর না হলে বুঝতে পেরেও এড়িয়ে গিয়েছে।

মিতদ্রু ছেলেটা আসলে খুব সিরিয়াস। স্নেহাকে বারবার বুঝিয়েছে, "দ্যাখো, এই ভাইরাসের ব্যাপারে এখনও তেমন কিছু জানা যায়নি। কবে এর ভ্যাকসিন বেরোবে কেউ জানে না। লোকে এখন বলছে এটা ডিএনএ ভাইরাস নয়, আরএনএ ভাইরাস। আমি আমেরিকা থেকে এত মাইল উড়ে এসেছি। কত দেশের কত লোক ফ্লাইটে ছিল। সত্যিই তো জানি না, অজান্তে কোনও বিপদ বয়ে বেড়াচ্ছি কি না। হয়তো আমার কোনও সিম্পটম নেই, কিন্তু কারও যদি আমার থেকে সংক্রমণ হয়, তার তো বড়সড় ক্ষতি হয়ে যেতেই পারে।"

স্নেহা ডিএনএ, আরএনএ বোঝে না। শুধু বোঝে মিতদ্রুর সঙ্গে এক বার দেখা হওয়া খুব জরুরি। পাল্টা যুক্তি দিয়ে বলার চেষ্টা করেছিল, "কিন্তু তোমার যে বন্ধুর সঙ্গে আমি শিলিগুড়ি যাব সেও তো আমেরিকা থেকেই এসেছে।"

"এসেছে। কিন্তু ওর কোয়ারেন্টাইন পিরিয়ড শেষ হয়ে গিয়েছে। সুস্থ আছে। আমার তো কোয়ারেন্টাইন পিরিয়ডটাই কাটেনি। ডাক্তাররা যখন ঠিক করেছে চোদ্দো দিন, সেটা নিশ্চয়ই অনেক রিসার্চ করেই ঠিক করেছে। আর আমাদের দেশের স্বার্থে এটা মানতেই হবে স্নেহা। আর মাত্র দুটো দিন।"

আর তর্ক করেনি স্নেহা। এ ভাবে জেদ করে কোনও ছেলের সঙ্গে দেখা করা যায় কি? ও কী মনে করবে? তবু বলেছিল, "আমাদের কি তা হলে কোনও দিন দেখা হবে না?"

"কে বলেছে, দেখা হবে না? তুমি কি মনে করো এই দুঃসময়, লকডাউন চিরদিন থাকবে? আমরা বন্ধু হয়ে গিয়েছি। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর নিশ্চয়ই দেখা হবে। আর আমার তো অনেক কিছু ডিউ আছে তোমার কাছে। ওই যে কথা ছিল এক দিন কব্জি ডুবিয়ে তোমার হাতের রান্না খাব, আর আমি তোমাকে এক দিন বিরিয়ানি খাওয়াব।"

মিতদ্রুর পরশু জন্মদিন, খবরটা উৎসাহের আতিশয্যে বলে ফেলেছিল মিতদ্রু। আর তখনই স্নেহা মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল। কান্তা বউদিকে দিয়ে ময়দা, বেকিং পাউডার থেকে কেক তৈরির সমস্ত উপকরণ আনিয়ে নিয়েছিল। কাল বিকেলে একটা কেক তৈরি করেছে স্নেহা। শুধু আইসিং করার জিনিসগুলো এই লকডাউনের বাজারে পাওয়া যায়নি। যদি যেত, তা হলে আইসিং এর ওপর খুব সুন্দর করে একটা ভালবাসার বার্তা লিখত।

স্নেহার মোবাইলটা বাজতে আরম্ভ করল। সিএলআইতে দেখল মিতদ্রুর বন্ধু সুনীতা। ঘড়িতে এখন চারটে বাইশ।

"হ্যালো স্নেহা, আর ইউ রেডি?"

"হ্যাঁ নামছি!" ফোনটা ছেড়ে শেষ বারের মতো বারান্দায় এল স্নেহা। মিতদ্রুর ফ্ল্যাটটায় অন্ধকার। রাস্তার আলো যেটুকু বারান্দায় পড়ছে, তাতে দেখা যাচ্ছে বারান্দাটা ফাঁকা। মিতদ্রু তো অনেক ভোররাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকে। একটু ইতস্তত করে মিতদ্রুকে ফোন করল শেষ বারের মতো। ফোনটা ধরলে মিতদ্রুকে বারান্দায় আসতে বলবে। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে বিদায় নিয়ে যাবে। বাড়ির ঠিক নীচে বড় এসইউভি-টা অপেক্ষা করছে। অন্যের অনুগ্রহ নেওয়া। তাকে অপেক্ষা করানো চলে না।

ফ্ল্যাটটা বন্ধ করে নীচে নেমে এল স্নেহা। সঙ্গে একটা সুটকেস আর দুটো ডাফেল ব্যাগ। স্নেহাকে দেখে ড্রাইভার আর সুনীতা দু'জনেই গাড়ি থেকে নেমে এলো। ড্রাইভার মালপত্রগুলো পেছনে ডিকিতে তুলল। সুনীতা জিজ্ঞেস করল, "আপনার পেছনে বসতে কোন অসুবিধে হবে না তো?"

"না।"

"ঠিক আছে। তা হলে আমরা একটু দূরত্ব রেখে বসি।"

"এক মিনিট," স্নেহা অনুনয়ের গলায় বলল, "আমায় একটু সময় দেবেন প্লিজ়?"

"হ্যাঁ বলুন।"

"মিতদ্রুকে একটা জিনিস দেওয়ার ছিল। ওই বাড়িটা দেখছেন, ওই বাড়ির চার তলার ফ্ল্যাটে মিতদ্রু আছে।"

"হ্যাঁ, জানি তো। এটা আমাদের কোম্পানির গেস্ট হাউস," সুনীতা ঘড়ি দেখে বলল, "অনেক ক্ষণ সময় লাগবে কি? আমরা কিন্তু অলরেডি লেট।"

"না, না। আমি ফ্ল্যাটে যাব না। ওর ফ্ল্যাট থেকে ওই থলিটা ঝোলানো আছে, ওখানেই জিনিসটা রেখে চলে যাব।"

স্নেহা দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। মিতদ্রু অ্যাপার্টমেন্টের সামনে কী মনে হল, আর এক বার মিতদ্রুকে মোবাইলে ফোন করল। ফোনটা এ বারও বেজে-বেজে থেমে গেল। স্নেহা গেটটা ঠেলে ঢুকে কেকটা থলির মধ্যে রেখে দিল।

মিতদ্রুর ঘুমটা ভাঙল একটু বেলা করে। কাল রাত্রে 'ডার্ক সার্কল' ওয়েব সিরিজ়ের সিজ়ন টু-টা দেখতে আরম্ভ করেছিল। তবে সিজ়ন ওয়ান-এর মতো সিজ়ন টু-টা অত জমাটি মনে হয়নি। দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখন ফোনটা তুলে দেখল স্নেহার দুটো মিসড কল। একটা চারটে একুশে আর পরেরটা চারটে সাতাশে।

ফোনটা রেখে ক্লান্ত পায়ে রান্নাঘরে এসে চা তৈরি করল মিতদ্রু। চা-টা নিয়ে স্বভাব মতো বারান্দায় এসে দাঁড়াল। প্রথমেই চোখ পড়ল উল্টো দিকের কোনাকুনি বারান্দাটায়। বারান্দাটা খালি। আরও যেন বিষণ্ণ নির্জন হয়ে গিয়েছে পাড়াটা।

একটা সিগারেট ধরাল মিতদ্রু। কয়েকটা টান দিয়ে সেটাও কেমন বিস্বাদ লাগল। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে স্নেহাকে ফোন করল, "স্যরি স্নেহা, তুমি সকালে ফোন করেছিলে। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

"বুঝতে পেরেছি। তোমার তো ফোন সাইলেন্ট মোডে থাকে।"

"হ্যাঁ, আসলে আমি ভেবেছিলাম যদি ঘুমিয়ে পড়ি, অ্যালার্ম দিয়ে রাখব যাতে তোমরা বেরোনোর সময় এক বার দেখা করতে পারি। কিন্তু ভেবেও কী করে যে অ্যালার্ম দিতে ভুলে গেলাম। তোমরা কত দূর?"

"এই কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি।"

"ফোনটা এক বার স্পিকারে দেবে? সুনীতার সঙ্গে একটু কথা

বলি।”

স্নেহা ফোনটা স্পিকার মোডে দিয়ে সুনীতার দিকে এগিয়ে ধরল।

“গুড মর্নিং মিতদ্রু।”

“গুড মর্নিং সিস। খারাপ লাগছে, সকালবেলা তোদের সঙ্গে দেখা হল না।”

“সকালবেলা নয়, ভোররাত। আর সেটাই ন্যাচারাল। আমরা কিন্তু খুব এনজয় করছি। বাড়ি ফেরার মজাটাই আলাদা বল! যখন কলকাতায় ফিরি, তখন ফ্লাইট থেকে শহরটাকে দেখতে দেখতে মনে হয় না, এটাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহর। আচ্ছা, স্নেহা তোর নিউ নেবার হলেও আমার কিন্তু ওল্ড নেবার। আমার বাড়ি থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে ওদের বাড়ি। আমরা শুধু শিলিগুড়ি নিয়েই গল্প করছি। জানিস এখন লকডাউনের জন্য কোনও পলিউশন নেই। শিলিগুড়ি থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।”

কিছু ক্ষণ কথা বলে ফোনটা স্নেহাকে ফিরিয়ে দিল সুনীতা। ফোনটা ছাড়ার আগে স্নেহা বলল, “তোমার বারান্দা থেকে ঝোলানো থলিটার মধ্যে আমি একটা জিনিস রেখে এসেছি। প্লিজ় তুলে নিয়ো।”

ফোনটা ছেড়ে থলিটাকে উঠিয়ে আনল মিতদ্রু। ভেতরে একটা প্লাস্টিক কন্টেনার। কন্টেনারের ঢাকা খুলে দেখল একটা কেক। আর সঙ্গে একটা চিরকুট। চিরকুটে লেখা আছে ‘হ্যাপি বার্থডে, টনস অব লাভ।”

সুন্দর একটা গন্ধ বেরচ্ছে কেকটা থেকে। এটাই বোধহয় ভালবাসার গন্ধ। অদ্ভুত অনুভূতি হতে শুরু করল মিতদ্রুর আর সেই সঙ্গে মনে হল, এই নির্জন পাড়াটা সাহারা মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করছে।

পঁচিশ

প্রান্তিক স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে আছে স্নেহা। প্ল্যাটফর্মটা এখনও ফাঁকাই। ট্রেন আসতে দেরি আছে। তবু অনেক আগেই প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছে গিয়েছে স্নেহা। কাল সারা রাত্রি ঘুম হয়নি। আর ঘুম হবেই বা কী করে? যা গিয়েছে কাল!

অর্ক অনেক বার বলেছিল ওদের সঙ্গে ফিরতে। ওদের গাড়ি আছে। কিন্তু স্নেহা রাজি হয়নি। আসলে নিজের জন্য একটু সময় খুঁজছিল। একেবারে একা। কেউ থাকবে না কাছে। কেউ অনুকম্পা দেখাবে না। একা একা স্নেহা হয়তো কাঁদবে। হাউ হাউ করে কাঁদবে। সেই কান্নার কোনও সাক্ষী থাকবে না।

প্রান্তিক স্টেশনের ফাঁকা প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে বসে সেই একান্ত নিজের জায়গাটাকেই খুঁজে পেয়েছিল স্নেহা। চৈত্র মাসের নরম সকালটাও যেন লজ্জা পেয়ে আছে। স্নেহাকে কিছু বলতে পারছে না। সারা রাত্রি ঘুমতে না পারার ধকল। ক্লান্তিতে যেন শরীর ভেঙে আসছে। চোখের জল বেরোতে না পেরে চোখ দুটো টাটিয়ে আছে। আর পারছে না স্নেহা। বেঞ্চে মাথা হেলিয়ে চোখদুটো বন্ধ করে ফেলল। বন্ধ করতেই সিনেমার রিলের মতো ভেসে উঠল কাল রাতে বিশ্বরূপবাবুর বাড়ির ছাদটা।

জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে ছাদটা। পূর্ণিমা কি? না হলে এত জ্যোৎস্না কেন? মিতদ্রুর দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে আছে স্নেহা। জ্যোৎস্নার আলো বোধহয় মদের চেয়েও বেশি মাতাল করে। নীচে বসার ঘরে ওই যারা রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ করে বেসুরো গান গেয়ে রবীন্দ্রনাথকে অপমান করে রবীন্দ্রপ্রেম দেখাচ্ছিল, তাদের চেয়েও বেশি মাতাল মনে হচ্ছিল নিজেকে। না হলে অত অক্লেশে কি মিতদ্রুর বুকে হাত রাখতে পারত? আর মিতদ্রুও মাতাল হয়ে গিয়েছিল। সেটা জ্যোৎস্নায়, না দু’বছর পর স্নেহাকে ছোঁয়ার দূরত্বে পেয়ে— সে জানে না।

“তোমার মনে আছে স্নেহা, তুমি আমাকে মাটন রান্না করে পাঠিয়েছিলে? পৃথিবীর বহু দেশে ঘুরেছি আমি। বহু রেস্তরাঁয় খেয়েছি। কিন্তু অমন রান্না আমি কোথাও খাইনি।”

“তোমার মনে আছে তুমি আমাকে যে কবিতার লাইনে ‘ধূ ধূ করে যে দিক-পানে চাই, কোনোখানে জনমানব নাই’ কবিতাটার নাম মনে করতে বলেছিলে? রবীন্দ্রনাথের বীরপুরুষ। তা হলে যেটা প্রমিস করেছিলে, সেটা দাও এ বার?”

“কী যেন প্রমিস করেছিলাম?”

“একটা আবৃত্তি।”

“মনে পড়েছে। কন্ডিশন ছিল গুগল করতে পারবে না।”

“করিনি তো। চিটিং করলে সে দিনই তো বলে দিতাম।”

“এই যে একটু আগে মা প্রথম লাইনগুলো বলে দিল।”

“সেটা তো কন্ডিশনে ছিল না।”

দু’হাত দিয়ে স্নেহার দুটো কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে মিতদ্রু বলেছিল, “বেশ, তুমি জিতলে।”

মিতদ্রুর বুকের ওপর হাল্কা করে একটা হাত রেখে স্নেহা বলল, “তোমার মনে আছে মিতদ্রু, এক দিন বিকেলে কারেন্ট চলে গিয়েছিল। অন্ধকার নেমে আসছিল। আমার ভূতের ভয়। তুমি বলেছিলে আলো না এলে বারন্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে। তুমি আমার জন্য সারারাত্রি দাঁড়িয়ে থাকবে বলেছিলে। সত্যি থাকতে?”

“থাকিনি? যে দিন অকাল দীপাবলি হল, রাত্রি ন’টার সময় মোবাইলের টর্চ হাতে তোমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম। তুমি কিন্তু সেই দশ সেকেন্ডের ভিডিয়োটা আর পাঠাওনি।”

“কিন্তু একটা গানের অডিয়ো ফাইল পাঠিয়েছিলাম।”

“আছে, আছে...” মিতদ্রু মোবাইলটা খুলে একটু খুঁজে স্নেহার দু’বছর আগে পাঠানো গানের ফাইলটা চালাল,‘ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো-তোমার মনের মন্দিরে।’

স্নেহা অবাক গলায় বলেছিল, “তুমি এখনও রেখে দিয়েছ?”

মিতদ্রু হেসেছিল, “ডিলিট করে দেওয়ার কোনও কারণ আছে কি?”

“তুমি আমাকে সুইস চকলেট পাঠিয়েছিলে। এক বাক্স। জানো আমি কত দিন রেখে দিয়েছিলাম। একটু একটু করে খেতাম। যেদিন শেষ চকলেটটা খেয়েছিলাম খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।”

“স্যরি। তোমাকে আরও দেওয়া উচিত ছিল।”

“সত্যি কথা বলবে? তুমি ওই চকলেটগুলো হৈমন্তী ম্যাডামের জন্য এনেছিলে, তাই না?”

মিতদ্রু কোনও উত্তর দিতে পারেনি। স্নেহা বলেছিল, “ভারী অন্যায়। তুমি অন্যের জিনিস এনে আমাকে দিয়ে দিয়েছিলে। আচ্ছা, হৈমন্তী ম্যাডামের সঙ্গে তো তোমার অনেক দিনের সম্পর্ক। তোমার সঙ্গে কত গল্প হয়েছে। কোনও দিন বলনি তো।”

“কী জানি কেন বলতে পারিনি। হয়তো ভয়ে।”

মিতদ্রুর বুকে হাল্কা করে হাত রেখে স্নেহা জিজ্ঞেস করেছিল, “কিসের ভয়ে?”

“হয়তো দু’জনকেই হারানোর ভয়ে।”

হেসে উঠেছিল স্নেহা, “কার সঙ্গে কার তুলনা? কোথায় হৈমন্তী ম্যাডাম আর কোথায় আমি? সামান্য এক জন পার্লারের বিউটিশিয়ানের সঙ্গে ওঁর কোনও তুলনা হয়!”

“নিজেকে এত ছোট করে দেখো কেন?”

“কারণ আমি তাই।”

“না, তুমি তা নও। আমার জন্মদিনের কেকের সঙ্গে কী লিখেছিলে মনে আছে?”

স্নেহা আনমনা হয়ে পড়ল। মুহূর্তরা যেন একটু একটু করে পিছিয়ে পড়ছে। স্নেহা জানে না, হয়তো নিজের অজান্তেই গেয়ে উঠেছিল, “এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে আনন্দ বসন্ত সমাগমে...”

জ্যোৎস্না সত্যি নেশা ধরায়। মানুষকে পাগল করে তোলে। মিতদ্রুর যে কী হয়েছিল! প্রশ্নটা করে স্থির দৃষ্টিতে খানিক ক্ষণ চেয়েছিল স্নেহার দিকে। তার পর স্নেহার দুটো গাল ধরে কাছে টেনে নিয়ে ঠোঁটের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়েছিল।

বিপত্তিটা হয়েছিল ঠিক তখনই। হৈমন্তীকে সঙ্গে নিয়ে অরণ্যা ছাদে এসেছিল সিগারেট খেতে। আর দেখে ফেলেছিল দু’জনকে। হৈমন্তী

এগিয়ে এসে স্নেহার চুলের মুঠি ধরে মিতদ্রুর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেতাই বলতে আরম্ভ করেছিল, "ইউ ব্লাডি হোর! ফিলদি বিচ! আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল তোর মতলব। কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেল করে দেওয়ার পর জোর করে এসেছে। মিতদ্রুকে মেকআপ করাবে। আর এখন..."

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে আর অকথ্য গালিগালাজ করতে করতে এলোপাতাড়ি হাত চালাচ্ছিল হৈমন্তী। মিতদ্রু থমকে গেছিল, হৈমন্তীর মতো একটা মেয়ের মুখ থেকে এ রকম নোংরা গালাগালি এমন অনর্গল বেরিয়ে আসতে পারে, সে ভাবতেও পারেনি। তার পর তাকে থামানোরও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওকে টেনে সরিয়ে নিয়েছিল অরণ্যা। চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিল, "আমার বেস্ট ফ্রেন্ডকে ছেড়ে শেষ পর্যন্ত এই চিপ মেয়েটাকে! বিয়ের আগেই স্বাদ বদল চাও? সে জন্য আমি তো ছিলাম..."

প্রতিবাদ করতে পারেনি মিতদ্রু। একটা অদ্ভুত অপরাধবোধে কুঁকড়ে ছিল। এক দিকে হৈমন্তী, অন্য দিকে স্নেহা— মিতদ্রু দু'জনের কাছ থেকেই দু'জনের কথা গোপন করেছে, কেন তা তার নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। আজ দু'জনের কাছেই সব পরিষ্কার। তাকে স্পষ্ট করে কোনও এক পক্ষ নিতে হবে। তার কেন যেন মনে হচ্ছে, হৈমন্তীর পক্ষ নিলে আসলে দু'জনকেই ঠকানো হবে, সঙ্গে নিজেকেও। ঘটনার আকস্মিকতায় সে হতভম্ব, বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। আর সেই অবসরে হৈমন্তী স্নেহাকে ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে নীচে নামিয়ে এনেছিল। বাড়ির পুরুষমানুষগুলো তখন বেহেড হয়ে এলিয়ে পড়ে আছে। শুধু যিনি পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন, তিনি নিখুঁত সুরে বাজিয়ে যাচ্ছিলেন, 'আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও...'

গন্ডগোল দেখে মহিলারা এগিয়ে এসেছিলেন। হৈমন্তী কাউকে আসতে দেয়নি। স্নেহাকে একেবারে বাড়ির বাইরে বার করে দড়াম করে দরজাটা মুখের ওপর বন্ধ করে দিয়েছিল।

বাইরে তখনও জ্যোৎস্না। অকৃপণ জ্যোৎস্না। বাগানের এক কোণে বসেছিল অর্ক। কোথা থেকে ও একটা মদের বোতল জোগাড় করে আকণ্ঠ খেয়ে ফেলেছে। স্নেহাকে ওই অবস্থায় দেখে ভারী চোখ খুলে জিজ্ঞেস করেছিল, "কী হয়েছে, ডার্লিং?"

কথা বলার মতো অবস্থাতেই ছিল না স্নেহা। অসহায়ের মতো বলেছিল, "আমাকে একটু স্টেশনে পৌঁছে দেবে?"

"এখন? এত রাতে?"

"প্লিজ়!"

"ঠিক আছে, চলো," উঠে দাঁড়াতে গিয়েই পা টলমল করে উঠেছিল অর্কর, সে আবার ধুপ করে বসে পড়েছিল। কোথায় যেন সমুদ্র ছিল। একমাত্র এই ছেলেটাই মদ খায়নি। কাছে এগিয়ে এসে বলেছিল, "স্নেহাদি চলো।"

"আই লাভ ইউ স্নেহা," অর্ক জড়ানো গলায় চিৎকার করে উঠেছিল। স্নেহা আর ফিরেও তাকায়নি। সমুদ্রের সঙ্গে হেঁটে ফিরেছিল থাকার জায়গায়। যদিও সেটা বিশ্বরূপবাবুর ঠিক করে দেওয়া জায়গা, তাই একটুও ইচ্ছে ছিল না ওখানে পা রাখার। শুধু সমুদ্র বুঝিয়েছিল বলে আর নিজের ব্যাকপ্যাকটা ছিল বলে যেতেই হয়েছিল। অপমানে থমথমে মুখে বাকি রাত্রিটুকু চেয়ারে বসেই কাটিয়েছিল। বুকের ভেতর ঝড় বইছিল, কিন্তু চোখ থেকে এক ফোঁটা জল বেরোয়নি। ভোর হতে শাড়ি ছেড়ে মেকআপ ধুয়ে যে পোশাক পরে এসেছিল সেই পোশাক পরে নিঃশব্দে প্রান্তিক স্টেশনে চলে এসেছিল। সমুদ্র তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। অর্কও সারা রাত্রি ফেরেনি।

"স্নেহাদি!" নিজের নামটা শুনে স্নেহা চোখ খুলে দেখল সামনে সমুদ্র দাঁড়িয়ে আছে।

"তুমি কখন স্টেশনে এলে?" সমুদ্র জিজ্ঞেস করল।

স্নেহা কোনও উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসল। সমুদ্র একটা প্যাকেট স্নেহার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, "এইটা তোমার জন্য।"

"কী রে?"

"জানি না। মিতদ্রু স্যর দিয়েছেন। ওঁরা ফিরে যাচ্ছেন। তবে পার্টির গাড়িতে নয়। এখান থেকেই একটা গাড়ি ভাড়া করেছেন। যাওয়ার আগে এটা দিতে এসেছিলেন। বললাম তোমাকে হয়তো স্টেশনে পাবে। আমার হাতে দিয়ে বলল, তোমাকে দিয়ে দিতে।"

প্যাকেটটা নিয়ে খুব মৃদু গলায় স্নেহা বলে, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

সমুদ্র চলে যেতে ক্লান্ত হাতে স্নেহা প্যাকেটা খুলল। একটা সুইস চকলেটের বাক্স। তার ওপর একটা চিরকুট, "স্যরি। ভুল আমার তরফেও ছিল। নিজের কাছেই নিজে স্পষ্ট হতে পারিনি। সে কারণে অহেতুক অনেকটা অপমান আর কষ্ট তোমায় সহ্য করতে হল। যদি ক্ষমা করে দিতে পারো, অপেক্ষায় থাকব। আমার নম্বরটা বদলে যায়নি।"

স্নেহার মোবাইলটা খুলে দেখল কখন যেন হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজ এসে জমে রয়েছে। সঙ্গে একটা অডিয়ো ফাইল। মেসেজটা দেখতে গিয়ে স্নেহা অবাক হয়ে গেল। মিতদ্রুর মেসেজ। কত দিন পরে এই নম্বর থেকে মেসেজ এলো। লিখেছে, "কথা রাখলাম।" ঠিক তখনই কোকিলটা সেই গোপন জায়গা থেকে আবার 'কুহু কুহু' ডেকে উঠল আর মোবাইলে বাজতে শুরু করল মিতদ্রুর গলায় আবৃত্তি—

"প্রহরশেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস—
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ॥
এ সংসারের নিত্য খেলায় প্রতিদিনের প্রাণের মেলায়
বাটে ঘাটে হাজার লোকের হাস্য-পরিহাস—
মাঝখানে তার তোমার চোখে আমার সর্বনাশ॥..."

অঙ্কন: কুনাল বর্মণ

একটি গানের মানে

বি না য় ক ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়
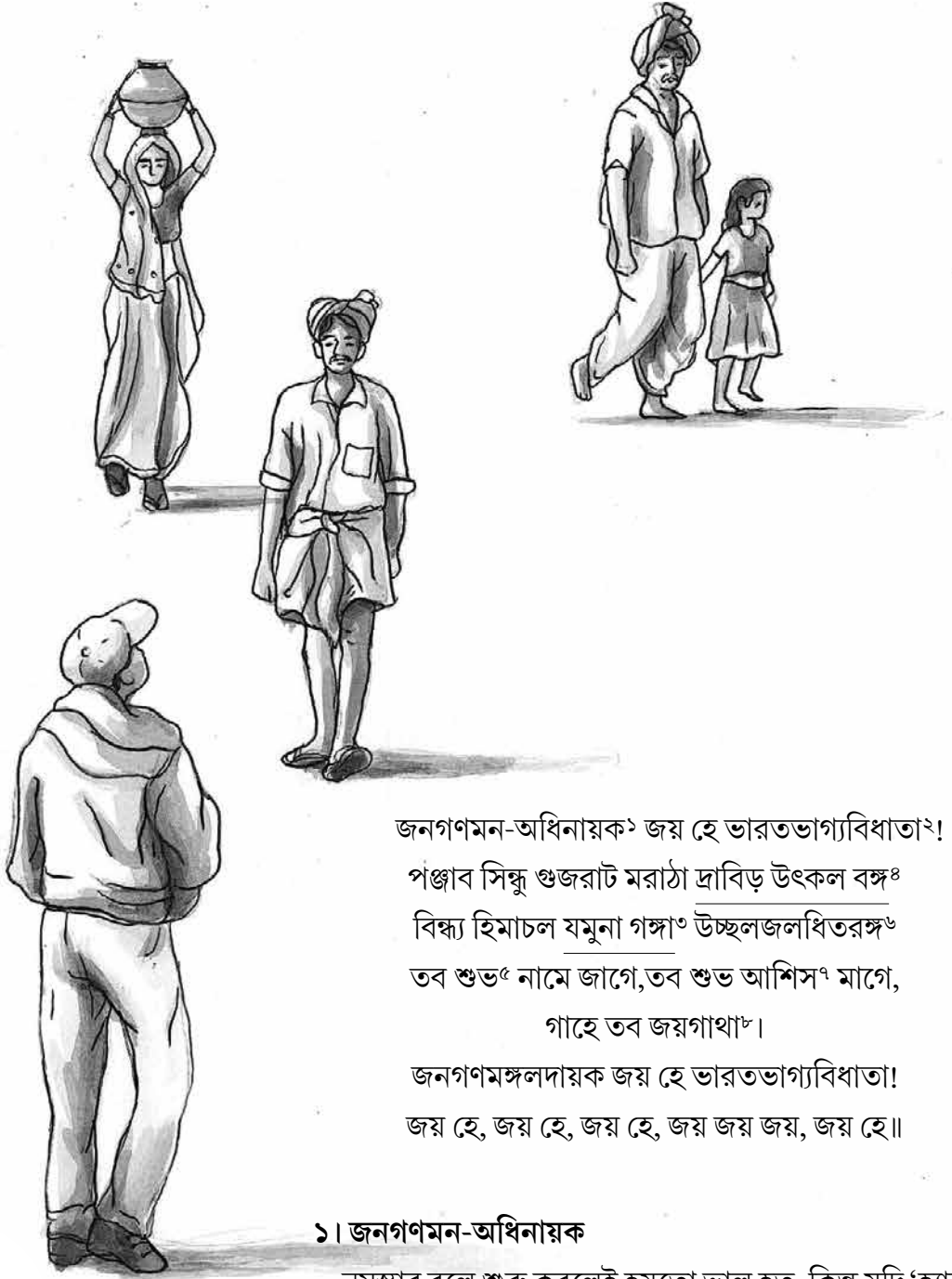
জনগণমন-অধিনায়ক[১] জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা[২]!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ[৪]
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা[৩] উচ্ছলজলধিতরঙ্গ[৬]
তব শুভ[৫] নামে জাগে,তব শুভ আশিস[৭] মাগে,
গাহে তব জয়গাথা[৮]।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

১। জনগণমন-অধিনায়ক

নমস্কার বলে শুরু করলেই হয়তো ভাল হত, কিন্তু যদি ‘হ্যালো’ বলে শুরু হয়? বহু বার বহু বিদেশি চ্যানেলে ‘হ্যালো’র উৎপত্তি ও বিস্তৃতি নিয়ে অনুষ্ঠান দেখেছেন নিশ্চয়ই, তবু আজকের জিজ্ঞাসার পিছনে পাশ্চাত্যের প্রভাব আছে বলে ধরে নেবেন না। আসলে,

নমস্কার তো নমস্কারই, কিন্তু 'হ্যালো' শব্দটা ভিন্ন ভিন্ন কায়দায় উচ্চারিত হয়, তাই না? তিরিশ বছর যদি পিছিয়ে যাই, যখন কেবল ল্যান্ডলাইনই ছিল, তবে দেখতে পাব কত রকম 'হ্যালো' শোনা যেত একটা বাড়ি থেকেই। দিদিমা কিংবা ঠাকুমার গলায় শব্দটার সঙ্গে মিশে থাকত একটা আতঙ্কের আভাস। যেন প্রতি বার ওই কালো যন্ত্রটার বেজে ওঠা কোনও খারাপ খবর দেওয়ার জন্যই। বড়মামি আর মেজপিসি প্রবল পরিশ্রমে ডুবে থাকতেন সারাদিন, ওঁদের গলার 'হ্যালো'র মধ্যে একটা 'যা বলার তাড়াতাড়ি বলে ফেলো বাপু' ভাব। সারাদিন, একটা কবিতার আশায়, দাঁতে কলম চেপে বসে থাকা ছোটমামার 'হ্যালো'র ভিতরে সুদূরের ডাক, আবার সদ্য কলেজ পাশ করা ভাগ্নির 'হ্যালো'য় পিয়ানোর রিডের উপর দিয়ে দ্রুত ছুটে যাওয়া আঙুলের কম্পন। নতুন বৌদির 'হ্যালো'য় তরকারির নুন আর চিনির মতো, জড়তা আর স্পষ্টতা সমান-সমান। বাবা-জ্যাঠার 'হ্যালো' খুব গম্ভীর আর হামেশাই বিরক্তিকর, তবে বাড়ির সবচেয়ে ছোট সদস্য তুলতুলির গলায় 'হ্যালো' যেন জিভে দেওয়া স্পঞ্জ রসগোল্লা, রিসিভারের ভিতরেই এমন গলতে শুরু করে যে গোটা ইথার তরঙ্গই মিষ্টি হয়ে যায়। আর আজ যার গল্পে ঢুকব আমরা, সেই মানুষটার 'হ্যালো'র ভিতরে যে খুব কিছু বিশেষত্ব ছিল তা নয়, তবে সে কথা বলবে আর শুনবে বলেই বাঁচত। তাই ক্রস-কানেকশন হয়ে গেলেও কমপক্ষে দশ মিনিট লাগত লোকটার, ফোন ছাড়তে। হলই বা ভুল নম্বর, বলুন না, যা বলতে চান।

আজ আপনাদের তার কথাই বলতে চাই। কথাই তো সেই বিনিসুতোর মালা, যা এই হিংসা-দ্বেষ-ঘৃণা-সন্ত্রাসের পৃথিবীতে ভালবাসা ছড়িয়ে যায়। আচ্ছা, কথার ভিতর দিয়ে হিংসা-দ্বেষ ছড়ায় না বুঝি? উত্তরটা, একইসঙ্গে, 'হ্যাঁ' এবং 'না'। সোশ্যাল মিডিয়ায় যে দু'জন পরস্পরের প্রাণ নেবে বলে উদ্যত তাদের মুখোমুখি বসিয়ে দিন এক ঘণ্টা, পাঁচ বারের মধ্যে চার বার একে অপরের গলা জড়িয়ে বেরিয়ে আসবে। আসলে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটারে মানুষ মুহূর্তে সংযুক্ত হয়, আবার সংযোগ-বিচ্ছিন্নও হয় মুহূর্তেই। লগ-ইন আর লগ-আউটের খেলা চলতেই থাকে। বাস্তবে তা হয় না। মেছুনির গায়ে মাছের গন্ধের মতো, মানুষের আত্মায় লেগে থাকে মানুষের গন্ধ। তাই মেশিনের ভিতর দিয়ে মানুষ যত কটু কথা বলতে পারে, মুখোমুখি তত পারে না।

আপনারা যারা আজ আমার সামনে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে, আপনাদের সবার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমি পেয়েছি আমার মোবাইলে। কিন্তু এই এখন যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, রোদ যেখানে কুয়াশা পোড়াতে পোড়াতে এগিয়ে আসে আর বৃষ্টি পাথর গিলে উগরে দেয় মাটি, সেখানে মানুষের পরিচয় ছাপা অক্ষরের কালিতে ধরা যায় না। যেখানে বিজলি বাতি জ্বলে না সন্ধ্যায়, বাথরুমে গিজ়ার বলে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির নীচে চলে গেলেও, সেখানে মানুষ ল্যাপটপ খুলে অন্যের সঙ্গে আলাপ সারে না! ধরুন, হালকা তুষারপাত হচ্ছে আর তার ভিতর দিয়ে পাহাড়িয়া রাস্তা ধরে নীচে নামছে একটা লোক। বন্ধ বাড়ির ভিতর থেকে অন্য একটা লোক তখন হাঁক দেয় জোরে আর রাস্তায় থাকা লোকটা উত্তর দেয়, গলা তুলে। সে কে, কোত্থেকে আসছে, যাচ্ছেই বা কোথায়, সব পরিষ্কার হয়ে যায় শব্দে-শব্দে। পরিচয়টাই হয়ে ওঠে তার পাথেয়, এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিরাপদে যাওয়ার।

আমাদের আখ্যানের নায়কও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে পারত প্রয়োজনে। 'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনও খানে' ছিল তার অনুচ্চারিত মন্ত্র। তবু সে এইখানে এসে থেমে গিয়েছিল। আবার চলতে শুরু করলেও এখান থেকে খুব দূরে যায়নি আর। যেন এই ধেমাজিতেই সে পেয়েছিল এমন ঘাসের জমি, যেখানে হাতের উপর মাথা দিয়ে শেষ ঘুমটাও ঘুমিয়ে নেওয়া যায়।

সামান্য একটা দেশের জন্য পৃথিবীকে ছেড়ে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না, এমন কথা তো অনেকেই কবিতায় পড়েছি, কিন্তু মাস্টারদা সূর্য সেন থেকে সর্দার ভগৎ সিং, দেশের জন্য হাসিমুখে ঝুলে গিয়েছেন ফাঁসিকাঠে। আচ্ছা, এই দুই বিপ্লবীর মধ্যে, ভগৎ এর নাম গোটা দেশ যে ভাবে জানে, মাস্টারদার নাম সে ভাবে জানে না কেন? কেন ভাষা, জাতি, অঞ্চলের নিরিখে তারতম্য ঘটে যায় স্বীকৃতির? এই প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। বরং একটি প্রতিপ্রশ্ন আছে। আজ এখানে আসার আগে অবধি আপনারা কি 'ধেমাজি' বলে জায়গাটার কথা জানতেন? উত্তর-পূর্ব ভারতের ভ্রমণসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত উজানি অসমের এই ছোট্ট শহর, বাষট্টি সালের চৈনিক আগ্রাসনের সময় যা ভারত-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল প্রায়, আপনাদের কারও মনের মানচিত্রে ছিল?

মাপ করবেন, কোনও গাইড এ রকম করে প্রশ্ন করে না আমি জানি। কী করব বলুন, আমার কাছে আপনারা কেবলমাত্র পর্যটক নন। আপনারা প্রত্যেকে এই দেশের জল, মাটি আর আগুন দিয়ে তৈরি, তা হলে কেন জানবেন না সেই ধেমাজির কথা, আজ থেকে বছর কুড়ি আগে যেখানে ভারতের স্বাধীনতা দিবসের দিন পনেরোটা গোলাপ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল? মোট মারা গিয়েছিল কুড়িজনের মতো আর তার মধ্যে অধিকাংশই ছিল স্কুলের ছাত্রছাত্রী। শৈশব পেরোয়নি এমন সব ছাত্রছাত্রী, 'জনগণমন' গাওয়ার জন্য যারা গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকছিল। তাদের আগে পরে ঢুকেছেন বেশ কয়েক জন শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্থানীয় প্রশাসনের বেশ কয়েক জন, বিউগল এবং ড্রাম্‌স নিয়ে বাজনদারের দল এবং অবশ্যই পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা। তবু ওই বাচ্চাগুলো যখন একযোগে কলেজ গেট পেরোচ্ছিল, তখনই বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে আর তার পর কেবল লাশ, ছিন্নভিন্ন লাশ। লুকিয়ে থাকা কোনও বোমা, হতে পারে তাকে নিরীহ ট্র্যানজিস্টর কিংবা টর্চের মতো দেখতে, ফেটে গিয়েছিল সশব্দে আর একটু আগেও 'লজেন্স চাই', 'কেক চাই', 'চকোলেট চাই' বলতে থাকা কচিকাঁচারা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল ছাইয়ে। কেউ জানে না, কী ভাবে ঘটল ঘটনাটা কিংবা বলা ভাল কোনও মানুষ জানে না। এক বা একাধিক হিংস্র শ্বাপদ তো জানতই, ন'টা বাজার ঠিক ক'মিনিট, কত সেকেন্ড আগে রিমোটে আঙুল দিলে, মরবে মূলত বাচ্চারাই।

আমরা কেউ বাচ্চা নই, তাই আমরাও আমাদের এই আখ্যানের নায়ক সৈকতেশের মতো চিৎকার করে প্রশ্ন করতেই পারি, কোথায় ছিল আধা-সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা? এমনি সময়ে যাদের দাপটে লোকে তটস্থ, বন্দনার পাশাপাশি অভিযোগও যথেষ্ট যাদের নিয়ে, তারা কোথায় উবে গিয়েছিল সেই ব্লাস্টের সময়? কেন দেশের মানুষের ট্যাক্সের টাকায় বেতন পাওয়া গোয়েন্দার দল একটা আঁচ অবধি পেল না এই ঘটতে চলা নারকীয়তার? প্রশ্ন করেই যেত সৈকতেশ কিন্তু এক দিন প্রশ্নের ভিতর থেকেই উত্তর এসে ঝাপ্টা মেরেছিল ওর মুখে। ও বুঝতে পেরেছিল, এই প্যারা-মিলিটারি কিংবা ইন্টেলিজেন্সের কাজটাই এমন যে, পঞ্চাশ বার পঞ্চাশটা ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচালেও সেটা কখনও শিরোনামে আসে না। কিন্তু এক বার ব্যর্থ হলেই এত প্রবল মূল্য শোধ দিতে হয় দেশের মানুষকে যে, সেই ব্যর্থতাই কালের কষ্টিপাথরে খোদাই হয়ে থাকে।

বড় বড় শহরে হয়তো এখন আর দেখা যায় না, কিন্তু এই ধেমাজি কিংবা তার আশপাশে আজও 'শিল কটাও' বলে ঘুরে বেড়ায় বিহার থেকে আসা কিছু মানুষ। যে শিলে মশলা বাটা হয় সেই শিল কোটাতে হয় মাঝে মাঝে, না হলে মশলা বাটা যায় না। এই যেমন যে-দেশে আছি, সেটার এ ধার-ও ধার ঘুরে দেখতে হয় নয়তো সবটাই অচেনা লাগে। অচেনাকে চেনাব আর অজানাকে জানাব বলেই তো আপনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি কিন্তু আসল কথাই বলতে ভুলে গিয়েছি। যে উপলক্ষে আজ এত কথা বলার সাহস পাচ্ছি, সেই উপলক্ষের কথা আপনাদের স্মরণে আছে তো? ভুলক্রমে কেউ ভুলে গিয়ে থাকলে পরে মনে করিয়ে দিই, আজ চোদ্দোই অগস্ট আর আগামী কালই ৭৫ বছর পালিত হবে আমাদের স্বাধীনতার। অনেকে হীরক জয়ন্তীও বলেন তাকে।

সে দিন একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল, যেখানে সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে মাটির ভাঁড়ে চা খেতে, কারণ দেশের মাটিকে অনেক চুমু না খেলে দেশকে ভালবাসা যাবে কেমন করে? এ বার আসল শব্দটা যখন মাটি, তখন জয়ন্তীর আগে রৌপ্য-স্বর্ণ-হীরক বসাবার যৌক্তিকতা কী? অবশ্য যুক্তি মেনে কাজ আমাদের দেশে কবে আর হয়েছে? হলে, 'হিরের-টুকরো ছেলে' কিংবা 'সোনা-মেয়ে' বলত না কেউ। বলত না যে কাজটা মাটি হয়েছে। তবু জীবনে মাটিকে যত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যই করা হোক, মৃত্যুর পর

সেই মাটির হাঁড়িতে ভরেই অস্থি ভাসিয়ে দিতে হয় গঙ্গা কিংবা ব্রহ্মপুত্রে।

সৈকতেশ বারণ করেছিল। বিস্ফোরণের শিকার যখন বারো থেকে চোদ্দ হয়ে সতেরোয় পৌঁছে, কুড়ি ছাড়িয়ে গেল অবশেষে, তখন সে বলেছিল যদি বাচ্চাগুলোকে অন্তত শুইয়ে দেওয়া যায় দেশের মাটির কোলেই। কিন্তু দু'-তিন জন ছাড়া তার কথা মানেনি কেউই। প্রচলিত সংস্কারের বশে চিতাভস্ম নদীতে ভাসানো জরুরি হয়ে উঠেছিল আর যাদের কাগজের নৌকো ভাসানোর বয়স তাদের অবশেষ ভেসে গিয়েছিল। বাধা দিয়েছিল বলে সৈকতেশের দিকে প্রশ্ন ধেয়ে এসেছিল, সে কেন সাংবাদিকের স্বভাবে ঘুমিয়ে ছিল বেলা করে, যখন ছোট-ছোট শিশুদের হাত-পা শরীর থেকে আলাদা হয়ে ছিটকে পড়ছে ধেমাজির মাটিতে? আর ঘুমিয়েই যদি থাকবে, তবে তার আগের দিন অবধি অত উৎসাহী কেন ছিল স্বাধীনতা দিবস পালনের ব্যাপারে?

প্রশ্নগুলি উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই। ওই অভিশপ্ত সকালের আগের দশ-পনেরো বছর গোটা উত্তর-পূর্ব, বিশেষ করে অসমের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে স্বাধীনতা দিবস পালনের কোনও রেওয়াজই ছিল না। পনেরোই অগস্ট লোকে লুকিয়ে থাকত ঘরের মধ্যে আর বাইরে রাস্তায় সি আর পি এফ-এর ভারী বুটের শব্দ শোনা যেত শুধু। যেখানে বাহিনীর উপস্থিতি থাকত না সেখানে জাতীয় পতাকা মাটিতে ফেলে পোড়ানোর উল্লাসে মেতে উঠত এক দল বেপথু; তাদের মধ্যে আরাকানের জঙ্গল থেকে ওই কাজ নিয়েই আসা জঙ্গি যেমন থাকত, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার ক্ষমতাহীন সদ্য গোঁফ গজানো কিশোরেরও অভাব ছিল না। ব্যতিক্রম যে ঘটত না তা নয়, তবে ব্যতিক্রমের চড়া মাশুল দিতে হত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। নগাঁওয়ের সেই মাস্টারমশাইয়ের কথা কে ভুলতে পারবে, যিনি নিজের বাড়ির ছাদে জাতীয় পতাকা তুলেছিলেন তিন-চার জন ছাত্রছাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে? তিন দিনের মাথায় সেই শিক্ষকের গলার নলি কাটা লাশ উদ্ধার হয়েছিল একটা নর্দমার পাশ থেকে। তেজপুরের ঘটনাও কম ভয়াবহ নয়। সেখানে পনেরোই অগস্ট উপলক্ষে আয়োজিত ঘরোয়া ফাংশনে গান করা এক দম্পতিকে খুন করে ফেলা হয় প্রকাশ্য দিবালোকে। খুনের আগে দু'জনের চোখই খুবলে তুলে নেওয়া হয়েছিল। ডিব্রুগড় বড় শহর, সারাক্ষণই দেশ-বিদেশের চা ব্যবসায়ীরা আসতেই থাকে, সেখানেও যে ভাদ্র সংখ্যার প্রচ্ছদে জাতীয় পতাকার ছবি এবং ভিতরে স্বাধীনতা দিবসের সেকাল-একাল নিয়ে খবর ছাপার অপরাধে একটি সাময়িকীর সম্পাদকের ছেলেকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হবে কে জানত? দিন সাতেক পর সেই কিশোরের পচে ফুলে ওঠা শরীর পড়ে থাকতে দেখা যায় শহরের বিখ্যাত রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের কাছেই। লাশের গায়ে আটকানো চিরকুটে লেখা ছিল, যে শহরে বড়ুয়ার জন্ম সেই শহরে তেরঙ্গা ওড়ানো বারণ, ভুলে গেলে এই রকম পরিণতিই হবে।

এই বড়ুয়া এবং তার সঙ্গীরা ছিল সারা অসমের ত্রাস আর উজানি অসম যেহেতু হাজার হাজার কোটি টাকার পেট্রল আর প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাঁড়ার, তাই ওই অঞ্চলে বছরের পর বছর ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্যই দানবিক কিছু বাইরের শক্তি ব্যবহার করত এদের।

কিন্তু এই পরিস্থিতির ভিতরেই স্থানীয় প্রশাসন স্বাধীনতা দিবস আয়োজনের সাহস দেখাল কেন? কেন সিদ্ধান্ত নিল যে, পনেরোই অগস্টের সকালে ধেমাজি কলেজ প্যারেড গ্রাউন্ডে, শহরের ছোট ছেলেমেয়েরা মার্চপাস্টে অংশ নেবে?

বিষয়টা নিয়ে একটি সভায় উৎসাহব্যঞ্জক কথা বললেও প্রথম দিকে যথেষ্ট সন্দিহান ছিল সৈকতেশ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপারটার আয়োজন করছিলেন যিনি, তার সঙ্গে কথা বলতে ছুটে গিয়েছিল ও।

সেই ভদ্রলোক তখন চরম ব্যস্ত। কথায় কথায় কেবল জানালেন যে নিরাপত্তার জন্য প্যারামিলিটারি ফোর্স তো থাকবেই।

সৈকতেশ কথাটা শুনে নিঃসংশয় হতে পারেনি, তবে চার পাশের আবহাওয়া দেখে ওর মনে হয়েছিল, 'জনগণ'র সঙ্গে তো 'মন' শব্দটাও আছে। এতগুলো মন যখন এত করে চাইছে, তখন স্বাধীনতার উদ্‌যাপন হোক না ধেমাজিতেও। সেই কারণেই, প্রশাসনের অনুরোধে, ধেমাজির স্কুলের ছেলেমেয়েদের মার্চপাস্টে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে যে সভা হয়েছিল, তাতে বক্তব্য রেখেছিল সৈকতেশও। সমবেত জনতার উত্তাল করতালিতে আরও স্পষ্ট করে বুঝেছিল ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবরুদ্ধ হয়ে থাকা মানুষ কী চাইছে।

স্বাধীনতা দিবসের ঠিক তিন দিন আগে অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা সেই মানুষটি সৈকতেশকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, স্বাধীন দেশে আর কত দিন পরাধীন হয়ে থাকব আমরা, কতগুলো সন্ত্রাসীর ভয়ে?

সৈকতেশ চুপ করে শুনেছিল, কারণ ওর মনে হচ্ছিল যে অনেকের স্বপ্ন জাগিয়ে তোলা ওই মানুষটার স্বপ্ন ও স্পর্শ করতে পারছে। আর স্বপ্নের সঙ্গে তো ঝগড়া চলে না। ও নিজেই তখন অল্প কয়েক দিন হল অসমে পা রেখেছে, একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি সাপ্তাহিকের নর্থ-ইস্টের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট হয়ে। নামেই উত্তর-পূর্ব, আসলে ওকে অসমের দায়িত্ব দিয়েই পাঠানো হয়েছিল। অন্য এক জন প্রতিনিধি আগে থেকেই এখানে ছিল, সে অসমের নিম্নভাগের দায়িত্ব ছাড়তে চায়নি। আসলে গৌহাটিকে কেন্দ্র করে তার জীবন খুবই স্বস্তির ছিল, তাই সৈকতেশকে ঠেলে দিয়েছিল শিবসাগর, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, ডিগবয়ের দিকে।

মাস দুয়েক পরে যখন ভৃগু নামের সেই ছেলেটির সঙ্গে গৌহাটিতে দেখা হয়, তখন সে অবাক হয়ে যায় সৈকতেশের চওড়া হাসি দেখে।

"আমি তো ভেবেছিলাম তুমি পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলবে এত দিনে। কী মধু পেলে উজানি অসমে যে, চিউয়িংগামের মতো সেঁটে গেলে?"

"ডিগবয় নামটা কোত্থেকে এসেছে জানো তো?" সৈকতেশ হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করেছিল।

"জানব না কেন? সাহেব ইঞ্জিনিয়ার রেলের লাইন পাতার তদারকি করছিল। সেই সময়ের যে-কোনও কনস্ট্রাকশনের কাজেই হাতিরা ব্যবহৃত হত মালপত্র বওয়ার কাজে। অধস্তন কেউ সাহেবকে দেখায় যে হাতির পায়ের ছাপে খনিজ তেল লেগে আছে। সেই সূত্রেই খননের কাজ শুরু আর সাহেবের মুখের কথা, 'ডিগ বয়, ডিগ' থেকে শহরের নাম।"

"একদম দশে দশ, ভৃগু। তেল মানে তো এনার্জি, শক্তি! আমার এই অসমের জীবনে আমি যত ভিতরে ঢুকছি, তত যেন শক্তি পাচ্ছি।"

"কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি, তাতে ওখানকার বিট করা যে কোনও সাংবাদিকের পক্ষেই খুব কঠিন কাজ।"

"যা সহজ, তাতে স্বস্তি কত দিন? আর যে শক্তির কথা বললাম একটু আগে, সেখান থেকেই তো সাহস আসে," সৈকতেশ জবাব দিয়েছিল।

আসলে জবাব দেয়নি, বাঁশির ভিতর দিয়ে হাওয়া বয়ে গেলে যে রকম সুর বেরিয়ে আসে, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল কথাগুলো। সেই স্বতঃস্ফূর্ততার রাস্তা খুলে দিয়েছিল প্রকৃতি। ডিব্রুগড়কে কেন্দ্রে রেখে যখন চরকিপাক খেতে শুরু করেছিল তখনই উত্তর-পূর্বের প্রকৃতি নিজের রূপ খুলে দিয়েছিল ওর সামনে। এখানে বৃষ্টি শুধু বৃষ্টি নয়, সে যেন এক উদ্দাম বালিকার নাচ, যার গায়ে পড়ে তাকেও নাচিয়ে ছাড়ে। 'বটলগ্রিন' শব্দটাকে, এখানে এসে, নতুন করে আবিষ্কার করেছিল সৈকতেশ। বৃষ্টিতে স্নান করে ঘাস কিংবা গাছের পাতা যে এত উজ্জ্বল হতে পারে, আগে কখনও দেখেনি তো!

ডিব্রুগড় লাগোয়া অসংখ্য চা-বাগান, তার একটার ম্যানেজারের সঙ্গে খুব খাতির হয়ে গিয়েছিল কাজের সূত্রে। সেই ভদ্রলোকই সৈকতেশকে গেরুকামুখে নিয়ে যান ব্রহ্মপুত্রের সবচেয়ে বড় শাখা নদী সুবানসিরি দেখাতে। মানুষ যেমন ভাড়াবাড়িতে থাকলেও কাজ থেকে ফেরার সময়, 'বাড়ি ফিরছি' বলে, 'ভাড়াবাড়িতে ফিরছি' বলে না, তেমন শাখানদী বলেও কিছু হয় না। সুবানসিরিও একটা নদী যা সমুদ্রে শেষ না হয়ে ব্রহ্মপুত্রেই বিলিয়ে দিয়েছে নিজেকে। ওর বয়ে চলাটা অনেকটা সেই চঞ্চলা বালিকার মতো যে স্কিপিং করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। বালি আর নুড়িপাথর দিয়ে তৈরি নদীর বুক, গ্রীষ্ম কিংবা শীতে জল যখন কম, উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাওয়া যায় বেশ খানিকটা পথ।

আপনারা যাঁরা এই আবক্ষ মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরাও হয়তো যাবেন গেরুকামুখ। মাটির সবুজ আর আকাশের নীল যেখানে একাকার হয়ে যায়, চোখের বাইরে ও ভিতরে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার সময় অতীত আর অনাগতর কত কথা পাক খেতে থাকবে মনের মধ্যে। তাই

আপনাদেরও জেনে রাখা প্রয়োজন সেই উপকথা যা তিব্বতের পোরোম পাহাড়ে জন্ম নেওয়া সেই নদীকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল, ভারতের অরুণাচল প্রদেশে পা রাখার পর যার নাম হয় সুবানসিরি। শোনা যায় যে নদীটা জুড়ে একটা বিরাট বড় মাছ ছিল আর সেই মাছটাই একদিন আকাশজোড়া এক পাখিতে রূপান্তরিত হয়। আপাত ভাবে কল্পনা কিন্তু যদি মাছটাই হয় জল আর পাখিই হয়ে থাকে বৃষ্টি? খাল-বিল-নদী-সমুদ্রের বুক থেকে উঠে যাওয়া বাষ্পই তো বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে পৃথিবীতে, তাই না? আচ্ছা, বলেছি কি, সুবানসিরির দুই পারের কাদা এমন যে গায়ে লাগলে একটা ছাপ লেগে থাকে ধুয়ে ফেলার পরও? কেউ কেউ বলে যে, এই কাদা নাকি আসলে এক রকম আবির। প্রথম শুনে, সৈকতেশের মনে হয়েছিল, আহা পৃথিবীর সব কাদাই যদি এ রকম হত তবে আর বসন্তের আবির তৈরি করার জন্য ফুল চটকাতে কিংবা কেমিক্যাল গুলতে হত না। যে অক্লান্ত মৌসুমি বাতাস দাক্ষিণাত্যকে ভাসিয়ে, মধ্য-উত্তর-পশ্চিম ভারতকে ভিজিয়ে, পূর্ব উপকূলকে ডুবিয়ে দিয়ে উত্তর-পূর্বে আসে, তার না-ফুরনো তেজে তৈরি হয়ে যেত কত নতুন নতুন রং! ঘাসজমির প্রজাপতি থেকে আকাশের সূর্য, সবাই বাঁধা পড়ে যেত সেই মায়াডোরে।

সে বছরও বৃষ্টি হয়েছিল প্রচণ্ড। বেশি বৃষ্টি মানে ভাল চাষ, তাই আপাত অসুবিধে হলেও উজানি অসমের মানুষ খুশিই হন তাতে। হয়তো প্রবল বর্ষণের তোড়ে চা-বাগানের কাজ বন্ধ থাকে দু'-এক দিন কিন্তু পাহাড়িয়া ঢাল বেয়ে জল গড়িয়ে গেলে বাগানের গাছের পাশাপাশি বাগানের শ্রমিকদেরও দিলখুশ হয়ে যায়। জনশ্রুতি, দার্জিলিঙের চায়ের পাতা যত ঠান্ডা সহ্য করতে পারে অসমের চায়ের পাতা তত পারে না, তার উষ্ণতা লাগে। এই তিনসুকিয়া, শিবসাগর, ধেমাজির মানুষজনও খুব উষ্ণ আর আন্তরিক, কানে যে কথা লাগে তাই নিয়ে নয়, মরমে যা পশে তাই নিয়েই বেশি ভাবনা তাদের।

"সৌন্দর্যকে নিজেকে খুলে দেখাতে হয়, কারণ সে নিজেকে মেলে না ধরলে প্রশংসার জন্ম হবে কোত্থেকে?" বাগচী স্যর বলতেন ওদের ক্লাসে প্রায়শই।

সৈকতেশ তখন আর্কিটেকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র। যে-কোনও ফাঁকা জমির দিকে তাকালে একটা না একটা স্থাপত্য খেলা করে মাথার ভিতরে। মনে হয় খাজুরাহো থেকে কোনার্ক, তাজমহল থেকে ভুলভুলাইয়া সব কিছুকে আবারও জন্ম দিতে সক্ষম সে। কিন্তু তখনই বাগচী স্যরের অন্য একটা কথা বাজতে শুরু করে মাথায়।

"এই আমাদের যাদের দেখছ, আমরা কেউই বিশুদ্ধ আর্কিটেক্ট নই, আমাদের স্থপতি সত্তার সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার শব্দটাকে ঠিক সেই ভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে যেভাবে কুকুরের লেজের সঙ্গে কালী পটকা বেঁধে দেওয়া হয়। এ বার সেই কালী পটকা যখন ফাটতে শুরু করে তখন কুকুর প্রাণপণে শব্দটার থেকে দূরে পালাতে চেষ্টা করে, বুঝতে পারে না যে শব্দটা ওর শরীরের সঙ্গেই বাঁধা।"

হাসির হিল্লোল উঠত ক্লাস জুড়ে। সেই হাসির ঢেউ মিলিয়ে যাবার আগেই স্যর বলে উঠতেন, "আজকের যুগে মিকেলাঞ্জেলোকেও গ্যালারির চাহিদা মেনে সৃষ্টি করতে হত, তবে আর আমরা কোন হনু? আমাদের খেয়াল রাখতেই হবে যে যাই করি, নির্মাতার চার পয়সা যেন আট পয়সা হয়ে ঘরে ঢোকে। না হলে তোমার অঙ্ক থেকে থার্মোডায়নামিক্স, শিল্প থেকে সিমেন্ট সব কিছুরই জলাঞ্জলি হয়ে যাবে।"

তবু এই বাগচী স্যর যখন সবার মধ্য থেকে সৈকতেশকে বেছে নিয়েছিলেন, ফ্লোরিডায় গিয়ে হাতেকলমে নির্মাণ আর সৃষ্টির ভিতরকার দ্বন্দ্ব-সমঝোতা আরও খানিকটা শিখে আসার জন্য, তখন তিনি কোনও পাটোয়ারি বুদ্ধির ধার ধারেননি।

"সবার মধ্যে থেকে আমাকে কেন স্যর? আমি তো তেমন কিছু ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টও নই, আর তা ছাড়া আমি ওই বিল্ডারের কত কড়ি খসছে আর কত আসছে-র হিসেব রাখতেও পারব না। নদী, পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র, মরুভূমি কিছুই ক্যালকুলেশন করে তৈরি নয়। সত্যিকারের স্থাপত্যেও ওই ঝোঁকটা থাকে বলে আমার বিশ্বাস।"

সৈকতেশের কথা শুনে মিটিমিটি হেসেছিলেন স্যর। তার পর ওকে অবাক করে দিয়ে বলেছিলেন, "দু'বছরের বেশি হয়ে গেল, সিসিএফসি গ্রাউন্ডে তোমার সেঞ্চুরিটার কথা মনে আছে? প্রতিপক্ষের সবাই শুধু নয়, নিজের দলের অনেককেও হারিয়ে দিতে চাইছে, সেই অবস্থায় তুমি ম্যাচটা কী ভাবে বের করেছিলে, আমার কিন্তু মনে আছে।"

কুন্তল বাগচীর চেম্বারের ভিতর দাঁড়িয়ে মুহূর্তটা মাথার মধ্যে ফ্রিজ শটে ঢুকে গিয়েছিল সৈকতেশের। সেই শীতের দুপুর, সেই প্রবল বাগ্‌বিতণ্ডা ড্রেসিং-রুমের মধ্যে আর তার পর এক সময় ওর প্রিয় ব্যাটটা ঘোরাতে ঘোরাতে সৈকতেশের মাঠে নামা। স্যর সে দিনের ইনিংসটার দর্শক ছিলেন, ও তো খেয়াল করেনি। অবশ্য সে দিন সে অন্য কোনও কিছুই খেয়াল করার মতো অবস্থায় ছিল কি?

ছোট থেকেই খুব ভাল ব্যাট করত সৈকতেশ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ক্রিকেট ওর নেশা ছিল না। শুধু সেই স্কুলে পড়ার দিনগুলো থেকে মাঠে নামলে কিছু করে আসতে চাইত। কলকাতায় এসে প্রথম যে মেসে থাকত, তার সামনের গলিতে সৈকতেশকে ব্যাট করতে দেখে এক রকম জোর-জবরদস্তি ওকে নিজের টিমের হয়ে খেলতে নিয়ে গিয়েছিলেন ক্রিকেট-কোচ দীপক রায়চৌধুরী।

"আপনি ভুল করছেন, আমি মূলত ক্যাম্বিস বলের প্লেয়ার," সৈকতেশ সাধ্যমতো বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

"ইমিটেশনের গয়না যে তৈরি করতে পারে, সে সোনার গয়না বানাতে পারবে না কেন? ব্যাপারটা ধাতু কিংবা বলের নয়, টেকনিকের। সেইটে তোমার আছে আর ক্লাবটাকে ফার্স্ট ডিভিশনে তোলার জন্য আমার সেইটেই দরকার," দীপকদা এমন ভাবে বলেছিলেন যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে বক্তৃতা দিচ্ছেন।

টেকনিক কী ছিল না ছিল সৈকতেশের জানা নেই, কিন্তু থাকার মধ্যে একটা জিনিস ছিল, লাল বলটা সম্ভবত একটু বেশি স্পষ্ট দেখতে পেত ও। বোলারের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গোলাকৃতি জিনিসটা যখন হাওয়ায় তখনই ঠিক করে নিতে পারত কোন শট খেলবে। স্পিনের ক্ষেত্রে সামান্য দুর্বলতা ছিল কিন্তু জোরে বল খেলার ব্যাপারে খুব দ্রুত ময়দানের প্রথম সারির ব্যাটসম্যানদের মধ্যে নিজের নাম করে নিচ্ছিল সৈকতেশ। অরুণ পাল মেমোরিয়াল ট্রোফিতে বড় দলের বিরুদ্ধে ওর তিপ্পান্ন বলের সেঞ্চুরি রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছিল পোড় খাওয়া সাংবাদিকদেরও। পরদিন একটা বিখ্যাত দৈনিকের খেলার পাতায় ওর ছোট একটা ছবি ছাপা হয়েছিল, দ্বিতীয় ডিভিশনের খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে যা স্বপ্নেরও বেশি।

দীপকদা ক্লাবের প্রাচীন ফোনটা থেকে বহু চেষ্টায় খবর কাগজের ক্রিকেট-লিখিয়েকে ধরতে পেরেছিলেন, কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য।

ভদ্রলোক কৃতজ্ঞতার পরোয়া না করে বলেছিলেন, "ছেলেটাকে ভাল করে নার্চার করবেন। আগামী দিনে বাংলার ভবিষ্যৎ হতে পারে ও।"

ভবিষ্যৎ ভীষণ মজার বস্তু। যে-লোকটা কোনও ক্লাবের, রাজ্যের মায় দেশের ভবিষ্যৎ হতে পারে, এক দিন তার নিজের ভবিষ্যৎ যে এক পলকেই বদলে যাবে না, কে বলতে পারে? হস্টেলে থাকলে তো ক্লাবে ক্রিকেট খেলার প্রশ্নই উঠত না, নেহাত শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত বলে সময় চুরি করে খেলা চালিয়ে যেতে পারত সৈকতেশ। কানে আসত ওকে নিয়ে দীপকদার বিরাট প্রত্যাশা, কিন্তু তা যে ওকে খুব প্রভাবিত করত এমনটা নয়। ক্রিকেটার হতে হবে এমন কোনও স্বপ্ন ছিল না বলেই ওর কাছে মাঠ ছিল সারাদিনের সব গ্লানি থেকে মুক্তির জায়গা।

মুক্তির পাশাপাশি মাঝে মাঝে কিছু টাকাও মিলত অবশ্য। দীপকদা লেকচার দেওয়ার সময় খেপ খেলার বিরুদ্ধে বললেও, সৈকতেশের কাছে খেপ খেলার প্রস্তাব এলে বাধা-টাধা দিতেন না। হয়তো ভাবতেন অল্প একটু ইনসেন্টিভ না পেলে হবু ইঞ্জিনিয়ার এই সেকেন্ড ডিভিশন টিমের হয়ে ঘাম ঝরাতে আসবে কেন? আর সৈকতেশের অভ্যেস ছিল খেপ খেলতে গিয়ে অল্প রানে আউট হয়ে গেলে এক টাকাও না নিয়ে চলে আসা।

"টাকা না নিয়ে চলে এসেছ কেন, জাগরণীর কর্তারা খুঁজছে!" দীপকদা এক দিন জিজ্ঞেস করেছিলেন ওকে।

"তিন রানে আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে চলে এসেছি, টাকা নেব কেন?"

"কত রানে আউট হয়েছ সেই বিচার তোমার হাতে নয়। গলা ভাঙা ছিল, পারফরম্যান্স ভাল হয়নি বলে গায়ক কখনও টাকা না নিয়ে নেমে আসে স্টেজ থেকে?"

"আমি তো আর প্রফেশন্যাল নই, দীপকদা।"

"পেশাদার কিংবা অপেশাদার যাই হও না কেন, টাকার সঙ্গে ইয়ার্কি নয়। জীবনে ভুগতে হবে!" দীপকদা তর্জনী তুলেছিলেন, যেমন তুলতেন।

অথচ সেই দীপকদাই বরুণ সেন ট্রোফির ফাইনালে হেরে যেতে বললেন, সৈকতেশকে। কথাটা উনি টিম মিটিংয়েই বলেছিলেন, কিন্তু সৈকতেশ যেহেতু ক্যাপ্টেন তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে ওকেও প্রয়োজন ছিল।

"জিতলে আমরা পাঁচ হাজার টাকা পাব, আর আপনি জিততে বারণ করছেন?"

"জিতবই সে কথা বলল কে, ক্যালকাটা লায়ন্স খুব জবরদস্ত টিম।"

"আমাদের টিমের নাম কী দীপকদা? ব্রেভ হার্টস। আমাদের মনের জোরের কাছে ওই লায়ন-ফায়নরা একদম নেংটি ইঁদুর হয়ে গর্তে ঢুকে যাবে, কয়েক দিন আগেই ভারতের সামনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেমন গেল।"

"কথায় কথায় বিশ্বকাপের উদাহরণ দেওয়াটা আগের বছর ভারত বিশ্বকাপ জেতার পর থেকে খুব চালু হয়েছে, কিন্তু তোমরা কেউ ওয়ার্ল্ডকাপার হয়ে যাওনি তাই বলে। তোমাদের খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে, এটা ভুলে যেয়ো না।"

"খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য চাকরি করব, ব্যবসা করব, চাই কি ফুটপাথে হকারি করব, নিজেদের মানসম্মানের সঙ্গে আপস করতে যাব কেন? আপনার কথা আমার মাথায় ঢুকছে না দীপকদা।"

"তোমার মাথায় ঢুকবেও না সৈকতেশ। কারণ কয়েক দিন পরই তুমি সার্টিফায়েড ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গিয়ে রাস্তা বানাবে, ব্রিজ বানাবে, রইস লোকদের বাংলো বানাবে। আমার এই ছেলেগুলোর ভবিষ্যৎ কে বানাবে বলতে পারো? প্রতুলের বাবা বাস-অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন, বাড়ি বন্ধক দিয়ে চলছে ওদের; মৃণালের তো বাবাই নেই, মামাবাড়ির স্টোররুমেই জীবন কাটিয়ে দিল ছেলেটা; ফিরোজের পারিবারিক মুদি-স্টেশনারির দোকান গতবারের টানা বৃষ্টিতে বরবাদ হয়ে গেছে; কী হবে এই ছেলেগুলোর বলবে আমায়?"

"আজ জিতলে তিন-চারশো টাকা করে প্রত্যেকের পকেটে আসবে, সেটাই বা কম কী? আমি আমার ভাগের টাকা টিমকে দিয়ে দেব, মৈনাক আর সিদ্ধার্থকেও একই অনুরোধ করব। যাদের দরকার বেশি তারাই নিক টাকাটা, কিন্তু ট্রোফিটা থাক ক্লাবের ঘরে!"

"ওই ট্রোফি ধুয়ে আমরা তো জল খাব না! দীপকদা ঠিকই বলছেন। আজকের ম্যাচে ওর টিম যদি হেরে যায় তবে লালওয়ানি আমাদের কেরিয়ারের দফারফা করে দেবে এমনিতেও; উল্টো দিকে আমরা যদি হারি, তবে টিমের তিন জনকে অন্তত নিজের বিভিন্ন প্রজেক্টে ফিট করে দেবে লোকটা, প্লাস টিমকে হাজার দশেক তো দেবেই। প্রাইজের ডবল!" মৃণাল আর বলরাম বলে উঠল।

"ওরে বাবা, ডিল ফাইনাল হয়ে গেছে আমাকে না জানিয়েই? তবে আর আমি এখানে বসে আছি কেন? আপনারা অন্য কাউকে ক্যাপ্টেন করে টিম নামিয়ে দিন, আমি বিদেয় হই। এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা আমি করতে পারব না, সরি।"

"কার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা সৈকতেশ? কোন মহাভারত অশুদ্ধ হবে আমাদের বদলে লায়ন্স ট্রোফিটা জিতলে? লালওয়ানি নিজের নতুন জামাইকে ক্লাবটা প্রেজেন্ট করেছে, ওর কাছে এই ফাইনাল ম্যাচটা একটা ইগোর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের স্ট্রাগল করে বেঁচে থাকতে হয়, আমরা ওই ইগো-ফিগোর চক্করে পড়ব কেন?"

সৈকতেশের ইচ্ছে হচ্ছিল চিৎকার করে বলে যে, বিশ্বাসঘাতকতা হাতের ওই ব্যাটের সঙ্গে, ডাইভ দিয়ে বাউন্ডারি লাইনের আগেই আটকে দেওয়া বলের সঙ্গে, বিশ্বাসঘাতকতা সেই স্পোর্টিং স্পিরিটের সঙ্গে যা এক জন খেলোয়াড়ের যথাসর্বস্ব। কিন্তু আর তর্ক করতে ভাল লাগছিল না বলে ও দুটো হাঁটুর ভিতরে মুখ গুঁজে চুপ করে বসে রইল।

দীপকদা এগিয়ে এসে মাথায় হাত রাখলেন সৈকতেশের, "সেই আদ্যিকাল থেকে কোন যুদ্ধটা একদম নিয়ম-নীতি মেনে হয়েছে? দুর্যোধনের সঙ্গে ভীমের গদাযুদ্ধের সময় কৃষ্ণ যে ভীমকে ইঙ্গিত করেছিলেন, কোমরের নীচে গদার আঘাত করতে, সেটা কী? যখন যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যকে 'অশ্বত্থামা হত' বলে গলা নামিয়ে 'ইতি গজ' বলেছিলেন তখন কোন নীতি মেনেছিলেন ধর্মপুত্র? এ রকম হাজার উদাহরণ দেওয়া যায় কিন্তু আমি তার মধ্যে যাব না। শুধু বলব যে..."

"আপনাকে আর কিচ্ছু বলতে হবে না দীপকদা, আমি সবটাই বুঝেছি। আমাকে বাদ দিয়ে টিম নামিয়ে দিন আপনি।"

"সে রকম ভাবলে তো এত কথা বলতামই না। বিশ্বনাথ কিংবা ফিরোজকে ক্যাপ্টেন বানিয়ে টস করতে পাঠিয়ে দিতাম।"

"তাই দিন। তাতেই সবার ভাল হলে আমার আপত্তিতে কী এসে যায়?"

"সবার ভালর মধ্যে তোমার ভাল নেই কে বলল? লালওয়ানির সঙ্গে আজ পালিত থাকবে, ভুনাওয়ালাও থাকবে সম্ভবত। তুমি শূন্য রানে আউট হয়ে ফিরে এলেও তোমার রঞ্জি টিমে জায়গা পাকা।"

"যদি আজ সেঞ্চুরি করে ফেলি আমি?"

দীপকদা হাসলেন, "জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করা যায় না সৈকতেশ। বড় বড় বিপ্লবীরাও দু'পা এগিয়ে, তিন পা পিছিয়ে আসার কথা বলেছেন। আর আমাদের তো এই ময়দানেই টিকে থাকতে হবে। ভেবে দেখো, খেলা থেকে যায় কিন্তু প্লেয়াররাই মাঠ থেকে সরে যায়, ঝরে যায়। তার পর তাদের যাতে দলে পিষে না দিতে পারে কেউ, তাই এইটুকু কম্প্রোমাইজ়। তুমি আজ রান না করলেও তোমার কোয়ার্টার ফাইনালের সেঞ্চুরি, সেমিফাইনালের অপরাজিত ছিয়াশি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আর তার ভিত্তিতে তোমার সিলেকশন হলে কেউ আঙুলও তুলতে পারবে না।"

"আমার অন্তরাত্মা আঙুল তুলবে আমার দিকে!" সৈকতেশ বিড়বিড় করে বলল বলে কেউ শুনতেই পেল না।

মাঠে যখন লং-অনের উপর দিয়ে একটা ছয় মেরে পরের বলটাই মিড-উইকেট বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে দিল সৈকতেশ, আর দু'টো বল পরেই স্কোয়ার লেগ বাউন্ডারি হাঁকিয়ে, ওভারের শেষ বলটা ফার্স্ট স্লিপের মাথার উপর দিয়ে থার্ডম্যানের সীমানা পার করে দিল তখন ব্যাট আর বলের ঠোকাঠুকির আওয়াজ সবাই শুনেছিল।

তার আগে প্রতুল, মৃণাল, সিদ্ধার্থদের বদান্যতায় তিরিশ ওভারে দুশো সাতাশ রান তুলে ফেলেছে লায়ন্স। ফিরোজ আর বিক্রম মোটামুটি ভাল বোলিং করেছিল কিন্তু সৈকতেশকে চমকে দিয়েছিল দলের সবচেয়ে জুনিয়র খেলোয়াড় প্রদ্যুম্ন। সিলি পয়েন্টে এক হাতে একটা অবিশ্বাস্য ক্যাচ নেওয়ার পরে অন্তত তিনটে নিশ্চিত বাউন্ডারি বাঁচিয়ে দিল ছেলেটা।

"আমাদের হারতে দিয়ো না, ক্যাপ্টেন!"

সৈকতেশ খেলার ফাঁকে ওর পিঠ চাপড়ে দিলে ওই একটা কথাই বলেছিল প্রদ্যুম্ন।

যে-টিমের কোচ সমেত চার-পাঁচজন প্লেয়ার হেরে যেতেই চাইছে, সেই টিমকে জেতানো যে কী দুঃসাধ্য তা যে চেষ্টা করে, সেই শুধু জানে। তবু অন্য দিন শুরুতেই ব্যাট করতে নামা সৈকতেশ যখন একত্রিশ রানে তিন উইকেট পড়ে যেতে ব্যাট করতে নামল, তখন প্রদ্যুম্নর বলা কথাটাই কানে বাজছিল ওর।

খুব যে কিছু আশা করেছিল তা নয়, তবে পরপর দু'ওভারে আটত্রিশ রান তুলে ফেলার পর যখন তৃতীয় ওভারটায় বিশ্বনাথ একটা ছক্কা আর দু'টো চার হাঁকাল তখন আচমকাই খেলা ঘুরে যাচ্ছে মনে হল।

"তোর ব্যাটিং দেখে আর পারলাম না নিজেকে কন্ট্রোল করতে। না হলে আমিও তো হেরে যাওয়ার দলেই ছিলাম!" বিশ্বনাথ হাসল।

"দল পাল্টালি কেন?" নতুন ওভার শুরু হবার আগে জানতে চাইল সৈকতেশ।

"প্রথমত লালওয়ানি কথা রাখবে না, ওরা কথা রাখে না। আর যদি

রাখেও, এই ম্যাচটা এ ভাবে হারলে আমাদের কারওই আত্মবিশ্বাস বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। বাকি জীবনটা চলবে কী দিয়ে?"

বিশ্বনাথের কথাগুলোকে সমর্থন জানাতেই পরের ওভারেও মিড-উইকেটের উপর দিয়ে একটা ছক্কা মারল সৈকতেশ আর তার পরই চিরকুট হাতে মাঠে ছুটে এল দীপকদার দূত গোপাল। তীব্র ঘৃণায় ওকে চলে যাওয়ার ইশারা করল সৈকতেশ। গোপাল তবু ঠায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে এগিয়ে গিয়ে চিরকুটটা হাতে নিল, দীপকদাকে দেখিয়ে ছিঁড়ে ফেলবে বলেই। কিন্তু ছেঁড়ার আগে চিরকুটটায় এক বার চোখ বোলাতেই হতবাক হয়ে গেল। পেন্সিলে এক লাইন লিখে পাঠিয়েছেন দীপকদা, "সার্কাসে আটকে রাখলেও বাঘ যে বাঘই, সেটা প্রমাণ করতে তুমিই পারো।"

সৈকতেশ ক্রিজে ফিরতে ফিরতে এক বার তাকাল মাঠের কিনারে, চোখের ইশারায় কৃতজ্ঞতা জানাবে বলে। কিন্তু দীপকদাকে চোখে পড়ল না।

প্রথম বলটা মিস করে দ্বিতীয় বলটাই উঁচুতে তুলে ক্যাচ আউট হয়ে যখন ফিরে যাচ্ছে বিশ্বনাথ ততক্ষণে জায়গা বদলাবদলি হয়ে গেছে। ম্যাচের শেষ চার বলে রান দরকার বারো, সৈকতেশ প্রথম বলটাই এক্সট্রা কভার ড্রাইভে সীমানা পার করে দিল। দ্বিতীয় বলটা ফ্লিক করেছিল কিন্তু ডিপ ফাইন লেগের ফিল্ডার ডাইভ দিয়ে বাউন্ডারি আটকে দেওয়ায় দু'রানেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। শেষ দু'বলে ছয় রান চাই জিততে, সিনেমা হলে পরে প্রথম বলটা মিস করে লাস্ট ডেলিভারিতে ছক্কা মেরে জেতাত ব্যাটসম্যান। কিন্তু মাঠের মধ্যে এক বল বাকি থাকতেই এক পা এগিয়ে এসে ইয়র্কারটাকে ফুলটস বানিয়ে মাঠ পার করে দিল সৈকতেশ। আর মাঠে উপস্থিত অল্প কিছু দর্শক চিৎকার করে উঠল খুশিতে।

তাদের ভিতরে বাগচী স্যরও ছিলেন। কত আন্তর্জাতিক ম্যাচ বেমালুম ভুলে যায় লোকে আর এই মানুষটা সে দিনের সেই স্মৃতি আঁকড়ে রেখেছেন! বিস্ময়ের পাশাপাশি শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে এল সৈকতেশের।

"ইউ প্লেড আ ক্যাপ্টেনস নক দ্যাট ডে। কেউ আশাই করেনি যে তুমি জিতবে। আমিও নয়, কারণ আমি বুঝতে পারছিলাম, কেবল বাইরে নয়, ভিতরেও লড়তে হচ্ছে তোমায়। জাহাজের কয়েক জন নাবিক জাহাজ ডোবাতে চাইলেও, ক্যাপ্টেন কীভাবে জাহাজকে বন্দরে ভেড়াতে পারে, তোমার সে দিনের ব্যাটিং তারই একটা জ্বলন্ত উদাহরণ। খেলার পর আমার খুব মনে হয়েছিল তোমার সঙ্গে গিয়ে কথা বলি কিন্তু তুমি তখন অনেকের সঙ্গে মিলে উচ্ছ্বাসে ব্যস্ত। তাও আমি যেতাম, কিন্তু আমার তো ঠোঁটকাটা। তোমার যে টিমমেটরা সেই মুহূর্তে উচ্ছ্বাস করছিল তাদের কারও কারও মুখের উপর বলে ফেলতে পারতাম যে, তোমরাই তো একটু আগে ম্যাচটা হারিয়ে দিচ্ছিলে বাছাধন! সেটা সেই বিকেলের পক্ষে খুব তিক্ত হত বলেই আর তোমার কাছে ঘেঁষিনি। তবে আমার অল্প বয়স থেকেই খুব ব্যাটের নেশা। তুমি সে দিন যে ব্যাটটা দিয়ে খেলছিলে, কী সব শট বেরোচ্ছিল ওখান থেকে। শোনো সৈকতেশ, ভাল সেতার ছাড়া যেমন রবিশঙ্কর হয় না, ভাল ব্যাট ছাড়া সুনীল গাওস্করও হয় না। ওই ব্যাটটা আমার একটু নেড়েচেড়ে দেখার ইচ্ছে আছে। ওটা দিয়ে তুমি খেলো তো এখনও?"

সৈকতেশ অনেক কথা বলতে গিয়ে একটাও বলতে পারল না। ওর মাথার ভিতরে সেই ট্রোফি জেতার বিকেলটা রিপ্লে হতে শুরু করল।

সেদিন ট্রোফি হাতে নেওয়ার পর ঠিক হয়েছিল, দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখতে সবাই মিলে খেতে যাওয়া হবে। তখন মৈনাক নিজের বাপের দেওয়া গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যেতে চাইল যত জনকে সম্ভব। কিন্তু সে প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল অচিরেই।

"এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন?" বলে উঠল বিশ্বনাথ।

ওই কথার সূত্রেই দুটো ট্যাক্সি করে পার্ক স্ট্রিটের বেশ নামী একটা হোটেলে যাওয়া হল সবাই মিলে। সেখানকার সাহেবি কেতায়

অনেকেরই খুব অতিষ্ঠ লাগছিল, তার পর একসময় কে দেখছে তার তোয়াক্কা না করে ওই মাখন ভাতে ডিমের পোচ সহ মাংস আর সবজি দেওয়া কাবাব হাত দিয়ে মেখেই খেতে শুরু করল প্রায় সবাই।

“আচ্ছা, তোরা যারা চাইছিলি আমরা ম্যাচটা হেরে যাই তারা আমার উপর রেগে নেই তো?” সৈকতেশ একটু মজা করেই জিজ্ঞেস করল।

“আমরা কেউ মন থেকে হারতে চাইনি রে বিশ্বাস কর, হারার কথা মুখে বলেছিলাম শুধু,” প্রতুল জবাব দিল।

“তোর বাড়ি মর্টগেজের ব্যাপারটা কী?” মৈনাক জিজ্ঞেস করল।

“দিতে হয়েছে বন্ধক, বোনটার বিয়ে দিতে গিয়ে। অবশ্য এখন তো লোক বলতে শুধু আমি আর মা, ছাড়িয়ে নেব কোনও ভাবে,” প্রতুল বড় একটা গ্রাস মুখে পুরে বলল।

“লোক কমে গেছে মানে তো বাড়ির ঘরও ফাঁকা? আমাদের পাড়ার এক ভদ্রলোক, ভাইয়ের জন্য ঘর খুঁজছেন। ছেলেটা শিলিগুড়ির, ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়ে কলকাতা আসছে। পেয়িং গেস্ট রাখবি?” বলরাম বলল।

“মেঘ না চাইতেই জল আসছে দেখছি আজ!” প্রতুল হেসে উঠল।

সেই হাসি সংক্রামক ছিল, কিন্তু তার ভিতরেই ফিরোজ বলে বসল, “দীপকদা বোধহয় ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি।”

“এটা তোর ভুল ধারণা। খেলার মধ্যেই গোপালের হাত দিয়ে চিরকুট পাঠিয়েছিলেন দীপকদা আমায়।”

“সে তো হেরে যাওয়ার জন্য?” অনেকে সমস্বরে বলে উঠল।

“না। জিতে ফেরার জন্য!” প্যান্টের পকেট থেকে বের করে চিরকুটটা সবার সামনে মেলে ধরল সৈকতেশ।

একটা চাপা উল্লাস, হুল্লোড় হয়ে ফেটে পড়ল পার্ক স্ট্রিটের রেস্তরাঁর ভিতর। সবার বুক থেকেই একটা ভারী পাথর নেমে গেল যেন।

“কিন্তু দীপকদা আমাদের সঙ্গে এলেন না কেন তবে?”

“দীপকদাকে আমরা কেউ আসতে অনুরোধ করেছিলাম নাকি?”

“যে লোকটার স্বপ্নে এই ‘ব্রেভ হার্টস’ তৈরি, সেই লোকটাই সেলিব্রেশনের সময় নেই?”

“গোপালকেও নিয়ে আসা উচিত ছিল সঙ্গে করে। সারা বছর আমাদের ফাইফরমাশ খাটে ছেলেটা, নেট প্র্যাকটিসের সময় এটা ওটা এগিয়ে দেয়, আজ সে থাকবে না?”

অনেকের অনেক প্রশ্ন চুপ করে শুনতে শুনতে অবশেষে কথা বলে উঠল সৈকতেশ, “দীপকদাকে ম্যাচ শেষ হওয়ার পর কেউ দেখেছে কি? আমি কিন্তু বেরিয়ে আসার সময় দীপকদা আর গোপাল দু’জনেরই খোঁজ করেছিলাম। পাইনি কাউকেই।”

“তুই শিয়োর, দীপকদা সত্যিই আঘাত পাননি? চিরকুট পাঠিয়েছিলেন ঠিক আছে, কিন্তু...”

সিদ্ধার্থকে থামিয়ে দিয়ে সৈকতেশ বলে উঠল, “এত পারমুটেশন কম্বিনেশন করে লাভ নেই। দীপকদার বাড়িটা আমি চিনি, তোরা এনজয় কর, আমি একটু দেখে আসছি।”

“তুই একা যাবি কেন?” বলরাম বলল।

“আমাকে একাই যেতে হবে, কারণ কতগুলো কথা একা না দাঁড়ালে বলা হবে না।”

“সৈকতেশ ঠিকই বলছে, ও একাই যাক। আমরা বরং আসছে রোববার আবার মিট করব। আর এ বার আমাদের বাড়িতে। কারও আপত্তি নেই তো?” মৈনাক বলল।

“ক্যাপ্টেন কী বলছে, ক্যাপ্টেন?” আবারও অনেকে একসঙ্গে বলে উঠল।

সৈকতেশ রেস্তরাঁ থেকে বেরোনোর আগে বলল, “ক্যাপ্টেন আপাতত একটাই কথা বলছে, ট্রোফিটা খুশির চোটে এখানেই ফেলে যাস না!”

চার ঘণ্টা পর গড়িয়া স্টেশন রোডের একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সৈকতেশের নিজেকে চাবুক মারতে ইচ্ছে করছিল। কোথায় ফেলে এসেছিল ও নিজের বোধবুদ্ধি যে, এক বারও দীপকদার দিক থেকে ম্যাচ ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারটা ভাবেনি!

তার পর প্রায় এক সপ্তাহ প্রতিদিন আট-দশ ঘণ্টা করে হাসপাতালেই পড়ে ছিল সৈকতেশ। কিন্তু শেষে যা হওয়ার তাই হল, দীপকদার উনিশ বছরের মেয়েটা বাঁচল না।

“আপনি আমায় এক বার কেন বললেন না যে, মেয়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা দিয়েছে লালওয়ানি?”

“মেয়ের অসুখের কথা বলেছি নাকি?”

“সেটা না বলাও ঠিক হয়নি। কিন্তু তাই বলে এটা অন্তত...”

“বললে কি আর তোর ওই ইনিংস দেখতে পেতাম?” দীপকদা শ্মশানে দাঁড়িয়ে ‘তুমি’র বদলে ‘তুই’ করে বললেন সৈকতেশকে।

এর আগে বহু বার দীপকদাকে অনুরোধ করেছে আর সবার মতো ওকেও ‘তুই’ বলে ডাকতে। কোনও অজানা কারণে দীপকদা ওর সেই অনুরোধ রাখেননি। আজ রাখলেন দেখে একটু ভাল লাগবে, কোথায় তার বদলে কান্না উথলে উঠল। সেই কান্না গলায় চেপে সৈকতেশ বলল, “আপনি নিজেকে ক্ষমা করলেও, আমি ক্ষমা করতে পারব না।”

“প্রলাপ বকিস না তো! আমার মেয়ের ব্লাড ক্যান্সার হয়েছিল, লালওয়ানির পয়সায় প্রাইভেট কোনও নার্সিং হোমে ভর্তি হলেই সেরে যেত সেই রোগ? হ্যাঁ, শেষ কয়েকটা দিন কষ্ট একটু কম পেত। বাবা হিসেবে সেইটুকু চেয়েছিলাম বলেই লালওয়ানির কাছে গিয়েছিলাম। ও আমার বিপদ বুঝে টোপ দেয় আর আমিও বোকার মতো...”

“বোকার মতো নয় দীপকদা...”

“আলবাত বোকার মতো! আমার মেয়ে জীবনেও স্ট্রাগল করেছে, মরণেও করল। আমি বাবা হিসেবে গর্বিত আজ। ফাইটার বাবার মেয়ে হিসেবে ও এই যুদ্ধটায় হেরে গেছে, সবাইকেই হারতে হবে আজ নয় কাল। কিন্তু যদি একটা বিক্রি হয়ে যাওয়া লোকের মেয়ে হিসেবে বেঁচে থাকত, লজ্জা ওর চেয়ে আমার বেশি হত।”

“তবু তো থাকত দীপকদা, এই পৃথিবীতে থাকত।”

“আমার হৃদয়ে আছে তো, বুক চিরে দেখালে দেখতে পেতিস। আমার হৃদয়টা কি পৃথিবীর বাইরে নাকি রে শালা?” দীপকদা শ্মশানে দাঁড়িয়েই হেসে উঠলেন জোরে।

হাসিটা কান্নায় বদলাবার মুহূর্তেই সৈকতেশ সরে এসেছিল। আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়েছিল, শ্মশানের বাইরের চায়ের দোকানের সামনে।

সেখানেই ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছিল গোপাল। সৈকতেশকে দেখে ম্লান হেসে বলল, “দাদা সবাইকে ‘তুই’ করে ডাকলেও, তোমাকে ‘তুমি’ কেন বলত জানো? দাদার মনে একটা স্বপ্ন ছিল, তুমি দাঁড়িয়ে গেলে তোমাকে নিজের জামাই করবে। আমাকে এক দিন বলে ফেলে দিব্যি করিয়ে নিয়েছিল, কাউকে যেন না বলি।”

হাতে-ধরা চায়ের ভাঁড় থেকে চা চলকে গেল একটু। সৈকতেশ কিছু না বলে তাকিয়ে রইল গোপালের দিকে। এই কথাটাও আজই শোনার ছিল, আজই?

ভোর প্রায় হয়ে আসছিল, সৈকতেশের মনে পড়ল দীপকদার বাড়িতে খেতে যাওয়ার দিনটার কথা। কী অপূর্ব সব রান্না! তার মধ্যে বড়ি দিয়ে পাবদা মাছের ঝাল আর কাতলা-ভাপা যেন আজও জিভে লেগে আছে।

“আমার যখনই ইলিশ-ভাপা খাওয়ার ইচ্ছা হয়, মা এই কাতলা-ভাপা বানিয়ে দেয়।”

দীপকদার স্ত্রী লজ্জা আর বেদনায় মাখামাখি হাসি দিয়েছিলেন কথাটা শুনে, “ইলিশ-ভাপা চাইলেই তো আর বানাতে পারি না, কী করব!”

“যা বানিয়েছেন, সেটাই ইলিশ-ফিলিশের কান কেটে দেবে!” সৈকতেশ বলার পর খেয়াল করেছিল মা আর মেয়ে দু’জনের মুখই ঝলমল করছে।

উপরে অ্যাসবেস্টস আর নীচে খড়ি ওঠা মেঝেয় পিঁড়ি পেতে বসে খাওয়ার স্মৃতি এমন চোখের সামনে ভাসছিল যে, মাসখানেক পেরিয়ে অবশেষে যখন মৈনাকের বাড়িতে ওদের টিমের গেট-টুগেদার হল, তখন অনেক উপরোধেও বিশেষ কিছু খেতে পারল না সৈকতেশ। ওর বারবার মনে পড়ছিল শেষ লগ্নে দীপকদার মেয়ে স্বর্ণালীর সেই লাউয়ের খোসার চাটনি পাতে ঢেলে দিয়ে বলা যে, ওটা ওই বানিয়েছে। আমের চাটনি,

টম্যাটোর চাটনি, জলপাইয়ের চাটনি, প্লাস্টিক চাটনি, কত জায়গায় কত রকম চাটনি খেয়েছে, কিন্তু ওই লাউয়ের খোসার টক জীবনে এক বারই চেখে দেখার সুযোগ হয়েছিল। স্বর্ণালী খুব উদ্‌গ্রীব ছিল, চাটনিটা কী ভাবে করেছে তা সৈকতেশকে শোনাতে। কেমন করে কচি লাউয়ের খোসা কুচিয়ে নিয়ে বেটে নিতে হয় আগে, আর পোস্ত বেটে নিতে হয় আলাদা করে, কড়াইতে সর্ষের তেল দিয়ে হালকা আঁচে কত ক্ষণ নাড়াচাড়া করতে হয়, চিনির বদলে গুড় আর তেঁতুলের জায়গায় পাতিলেবু ব্যবহার করলে কী ইতরবিশেষ হয় ইত্যাদি, ইত্যাদি। সৈকতেশ সে দিন শুনেও শুনছিল না কিন্তু মৈনাকদের বাড়ির ডাইনিং টেবিলে থরেবিথরে সাজানো পদগুলির দিকে তাকালেই স্মৃতিতে জেগে উঠছিল সেই চাটনি।

খাওয়াদাওয়ার পরে আসল বোমাটা ফাটাল বিশ্বনাথ, "ইডেন গার্ডেন্সের এক জন কর্তাব্যক্তির ছেলেকে অঙ্ক করাতে যাই আমি, তোরা হয়তো জানিস। অবশ্য নামে কর্তাব্যক্তি হলেও চায়ের সঙ্গে থিন অ্যারারুট বিস্কুট ছাড়া আর কিছু পাইনি কখনও। তবু টিউশনিটা যেহেতু দীপকদার রেফারেন্সেই পাওয়া তাই..."

"দীপকদার অঙ্ক, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের লোকেদের উপর একটু বেশিই দুর্বলতা," সিদ্ধার্থ বিশ্বনাথের কথার মাঝখানে বলে উঠল।

"কিন্তু অঙ্কে দুর্বল ছাত্র পঁচাশি পেয়েছে ক্লাস সিক্সে, তাতেও মা খুশি নয়। তার ওসকানিতেই ছাত্রের বাবা আমাকে ডেকে বলল, 'তুমি ভাল করে পড়াও-টড়াও। তুমি তো আর রঞ্জিতে চান্স পাচ্ছ না, তোমাদের সৈকতেশের মতো।'"

"শিয়োর?" ঘরের ভিতর অনেকের আওয়াজ মিলে গেল।

"হান্ড্রেড পারসেন্ট। এই সপ্তাহেই রঞ্জির স্কোয়াড ঘোষণা করা হবে, আর আমাদের সৈকতেশ সেখানে থাকছে। সেদিনের লা জবাব ইনিংস সত্যিই কাজে দিয়েছে," বিশ্বনাথ সিগারেট ধরাল।

সৈকতেশ নিচু কিন্তু তীক্ষ্ণ গলায় বলল, "কাজে দিলেও কিছু নয়, না দিলেও নয়। কারণ আমি আর ক্রিকেটের মধ্যে নেই।"

"কী বলছে ক্যাপ্টেন?" একটা সমবেত বিস্ময় ভেসে এল।

"যা শুনছিস তোরা। যে ক্রিকেট মেয়ের চিকিৎসার টাকা যোগাতে পারে না বাবার হাতে, বাবার জীবনটাকে নিংড়ে নিয়েও, কী হবে তাই দিয়ে?"

ঘরে তখন পিন পড়লেও শব্দ হবে, মৈনাক গলা খাঁকারি দিয়ে বলতে গেল কিছু।

সৈকতেশ হাতের ইশারায় ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "যে ব্যাট দিয়ে সে দিন ফাইনালে খেললাম সেই ব্যাটটা আমি সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছি। প্রদ্যুম্নকে দিয়ে যাব বলে। ও চাইলে পরে খেলবে ওটা দিয়ে। কিন্তু ক্রিকেট ব্যাট আর আমার জন্য নয়।"

সেদিন একটা নিষ্কৃতির আনন্দই পেয়েছিল ব্যাটটা হাতছাড়া করতে পেরে, কিন্তু বাগচী স্যর ব্যাটটা দেখতে চাওয়ায় বিপুল বেদনা এসে ভিড় করল বুকে। সৈকতেশ অনেক কষ্টে মুখ তুলে বলল, "ব্যাটটা মিসপ্লেসড হয়ে গেছে স্যর। অনেক দিন আমি আর খুঁজে পাচ্ছি না ওটা।"

একটা ব্যাট খুঁজে না পাওয়ার কথা বানিয়ে বলতে গিয়ে গলা ধরে এসেছিল সৈকতেশের, আর যে-মায়েরা, যে-বাবারা সেই অভিশপ্ত পনেরোই অগস্টের পর থেকে নিজেদের সন্তানকে খুঁজে পাননি আর? টুকরো-টুকরো হয়ে যাওয়া হাত-পা-মাথাগুলোকে ওদের আঁকড়ে ধরতে দেখেছিল সৈকতেশ, পিতৃত্ব আর মাতৃত্বের শেষ স্মারক হিসেবে। কিংবা কে জানে, ওরাও হয়তো পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বিস্মিত কোনও পর্যটক। অষ্টম নাকি প্রথম? সন্তানের ছিন্নভিন্ন লাশের চাইতে বড় আশ্চর্যের বাবা-মার কাছে আর কী হতে পারে? বেদনার সেই কালস্রোতে, সভ্যতার বধ্যভূমিতে, অনেকগুলো মুখের কনট্যুরে বিস্ময় খুঁজে পাচ্ছিল সৈকতেশ, যা ঘটে গেছে তাই নিয়ে বিস্ময়।

ধেমাজির কলেজ প্যারেড গ্রাউন্ডে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের ব্যাপারটার সঙ্গে এতটাই সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল সৈকতেশ যে, ডিব্রুগড়ের অফিস ছেড়ে সাত দিনের জন্য ধেমাজিতে এসেই ডেরা বেঁধেছিল, খবরের ভিতরের স্পন্দনটাকে ধরবে বলে। বিশেষ করে ওর ভাল লেগেছিল সেই ব্যাপারটা যে কোনও মন্ত্রী-সান্ত্রী আসছেন না, বাচ্চারাই ভি আই পি ওই পনেরোই অগস্টের। দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি যে, সেই বাচ্চারাই স্পন্দনহীন হয়ে পড়ে থাকবে কলেজের মাঠে আর তাই নিয়ে খবর করার জন্য দিল্লি থেকে নির্দেশ আসবে ওর কাছে।

পরিস্থিতির সন্তান সকলেই, মর্গের ডাক্তার তাই লাশ কাটাছেঁড়া করতে করতেও গুনগুন চালিয়ে যায়, পুলিশ আর উকিলেরও নরম-সরম হয়ে গেলে চলে না কোনও পরিস্থিতিতেই। সাংবাদিকের কাজটা হয়তো আরও কঠিন। এ রকম অবস্থায়, নিজে দ্রব না হয়ে গিয়ে, আগুন-ঝরানো লেখা লিখতে হয় তাকে— যা পড়ে ক্রোধে ফেটে পড়বে লোকে, কান্নায় নুইয়ে যাবে।

সবটাই কেতাবি শিক্ষা, অ্যালার্ম ঘড়ির মতো সময়ে বেজে উঠে, সময় পেরিয়ে গেলেই থেমে যাওয়া। কিন্তু বিপুল অনিশ্চয়তার মুহূর্তে কোন কাজে লাগে সেই শিক্ষা? অ্যালার্ম পারে সব ঘুম থেকে সময়ে ডেকে তুলতে? পারলে তো বিস্ফোরণের সময় সৈকতেশ অকুস্থলে থাকত, কলেজ-গেট থেকে পাঁচ-সাত মিনিটের দূরত্বে নয়। তবু একটা আওয়াজ পেয়েছিল ও বাইকে বসেই, কিন্তু সেটা কিসের এবং কেন, তা আন্দাজ করতে পারেনি আদৌ। যখন পারল, তখন টের পেল যে শিশুদের এই শবদেহের ভিতর দিয়ে স্বাধীনতা নয়, বাঁধনহারা জিঘাংসা জন্মাতে পারে শুধু। সন্তানশোক এতটাই মৌলিক যে, সে আদিম হিংস্রতাকে জ্বালিয়ে তুলতে পারে মানুষের মনে, একটা দেশলাই কাঠি ছাড়াই। মনে হচ্ছিল, আশপাশের প্রত্যেক ক্রন্দনরতা মা দ্রৌপদী কিংবা সুভদ্রা অথবা হিড়িম্বা। গান্ধারীই বা নয় কেন?

ওই কান্নার কলরোল, ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর পোড়া মাংসের গন্ধের মধ্যে দাঁড়িয়ে, কে জানে কেন, বাবার সঙ্গে কলকাতা এসে ধর্মতলার সিনেমা হলে গিয়ে ইংরেজি ছবি দেখার কথা মনে পড়ে গেল সৈকতেশের। রবিবার সকালের শো দেখে ফেরার পথে একটা রেস্তরাঁয় নিয়ে গিয়েছিলেন বাবা আর সৈকতেশের চোখ আটকে গিয়েছিল দেওয়ালে লটকানো সেই বাঁধানো ফলকটায়। সেখানে ইংরেজিতে লেখা, "এই হোটেল ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিন আত্মপ্রকাশ করেছিল।"

ওই হোটেলে বসেই বাবা বলেছিলেন, "জাতীয় সঙ্গীতের জন্য বাহান্ন কিংবা চুয়ান্ন সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকা বিরাট ব্যাপার নয়, আসল কথা হল আজীবন দেশের জন্য, দেশের হয়ে দাঁড়ানো।"

"কেমন করে বাবা? সীমান্তে সৈনিকরা যেরকম ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে?" সৈকতেশ জানতে চেয়েছিল।

সৈকতেশের বাবা হেসে ফেলেছিলেন, "প্রত্যেকের জীবনই একটা সীমান্ত, তার এক প্রান্তে আলো তো অন্য প্রান্তে অন্ধকার।"

আসলে সিনেমা হলে জাতীয় সঙ্গীত শুরু না হতেই লাফঝাঁপ শুরু করে দিয়েছিল সৈকতেশ। বাড়ির কাছের কোনও হল হলে হয়তো বাবার কিছু মনে হত না, কলকাতা বলেই অন্য ভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। এমন একটা কথা বলেছিলেন, যার ব্যঞ্জনা ছেলের মনে থেকে যাবে আজীবন।

মনে হওয়ার জন্য যে মনটাকে দরকার হয়, সে কি ক্রিকেট-ব্যাট না বাবার কণ্ঠস্বর? দুটোর কোনওটাই নয় বোধহয়। যদি দুটোর একটাও হত কিয়দংশে, তবে এতখানি পরাভব সে স্বীকার করে নিচ্ছে কী করে? কেমন করে ভুলে থাকছে, মৃত্যু উপত্যকায় যারা-যারা জীবিত তাদের কথা? সৈকতেশ বুঝতে পারছিল যে ওই এক সকালের স্মৃতি জীবনের বাকি সব ক'টা সকালে ওকে ছিঁড়ে খাবে। অশ্বত্থামা লুকিয়ে পাঁচটি সন্তানকেই খুন করে ফেলার পর, পাণ্ডবদের সামনে সিংহাসনে হেঁটে যাওয়ার রাস্তাও মহাপ্রস্থানের রাস্তাই হয়ে গিয়েছিল, ওর ক্ষেত্রেও এই ঘটমান বর্তমান ভবিষ্যতের সামনে একটা কালো পর্দা হয়েই ঝুলবে। কিন্তু সে তো আগামীর কোনও মুহূর্তে— এই সেকেন্ড আর তার পরেরটায়, যে মিনিট বয়ে যাচ্ছে— তার ভিতরে কিছু করছে না কেন ও?

প্রশ্নটা এমন বল্লম হয়ে উঠল যে, প্রথম মৃতদেহ পার হয়ে দ্বিতীয়টার কাছে গেল সৈকতেশ। আর তৃতীয় দেহটির কাছে এসে যখন টের পেল

যে, প্রাণ আছে তত ক্ষণে ওর রক্তলাগা শরীরের নিয়ন্ত্রণ মস্তিষ্কের কাছে নেই আর, আবেগের আওতায় চলে গেছে। অসংখ্য মৃত মানুষের মধ্যে থেকে জীবিতদের চিহ্নিত করে সরিয়ে আনতে আনতে ওর মনে পড়ছিল কয়েক দিন আগে ধেমাজির অদূরেই মালিনীথান যাওয়ার পথে রাস্তার ধারের হাটে বসা এক তরমুজ বিক্রেতার কথা। সে বলছিল যে, কাছেই নাকি একটা মৃত আগ্নেয়গিরি আছে, আর তাকে ঘিরে অজস্র জোনাকি পাক খায় আজও।

"আগ্নেয়গিরির আগুন ফুরিয়ে গেলে জোনাকিরা পাক খাবে কেন?" জানতে চেয়েছিল সৈকতেশ।

সামনে তরমুজ সাজিয়ে বসে থাকা লোকটি বলেছিল, "ওরা গন্ধ পায়। গন্ধকের গন্ধ। যেখানে ওই গন্ধ মিলবে, জোনাকিরা তাকে ঘিরে পাক খাবে।"

সৈকতেশের মনে হচ্ছিল, হাজারো মৃত্যুর ভিতরে নিঃশ্বাস ফেলা আর প্রশ্বাস নেওয়ার শব্দটাই, গন্ধক। ওই গন্ধ যত দিন আশপাশে পাওয়া যাবে, তত দিন আগ্নেয়গিরিকে মৃত বলে ঘোষণা করা যাবে না। আলো আর আগুনের মিলবার আশা থাকবেই। ধেমাজির স্কুলে এই নারকীয় বিস্ফোরণের পরও যেমন অনেকের বেঁচে থাকার আশা ছাড়তে পারেনি অনেক পরিবার। খুঁজছে, কেবল খুঁজছে, যদি লাশের স্তূপ থেকে জীবন্ত ঘরে ফিরে আসে ঘরের সন্তান।

কেবল বাচ্চারাই নয়, স্কুলের এক জন দারোয়ান আর কয়েক জন অভিভাবকও মারা গিয়েছেন, খবর পেল সৈকতেশ। কিন্তু সেই মুহূর্তে ওর পৃথিবী খবর-শূন্য হয়ে গিয়েছে। কী হবে 'ব্রেকিং নিউজ়'এ? এখানে খবর তো একটাই, মৃত নয় জীবিত।

মুখে কিছু দেওয়ার মতো ইচ্ছে বা অবকাশ ছিল না। এক সময় মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল ও। উঠে যখন দাঁড়াল ফের, খানিকটা সময় চলে গেছে। খণ্ড-বিখণ্ড মৃতদেহগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে, রক্তের বড় বড় ছোপ দেখা যাচ্ছে ইতিউতি। চুপ করে কয়েক পল দাঁড়িয়ে রইল সৈকতেশ, তার পর প্রায় চিৎকার করে গাইতে শুরু করল জাতীয় সঙ্গীত।

"পাগল নাকি?" কেউ একটা বলে উঠল।

"গান থামা এখনই!" বলে উঠল অন্য কেউ।

কিন্তু সৈকতেশ গান থামাল না। অসম হোক বা কাশ্মীর, পথচলতি মানুষ অথবা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের খুন করে 'জনগণমন' বন্ধ করে দেওয়া যায় না, সেই কথাটা কাউকে না কাউকে তো জানান দিতে হতই।

২। ভারতভাগ্যবিধাতা

"লোহা থেকেই ইস্পাত হয়। ফ্লোরিডায় তোমায় পাঠাচ্ছি কারণ, বাইরের প্রতিপক্ষের পাশাপাশি সতীর্থদের সঙ্গে লড়াই করার যে অভিজ্ঞতা তোমার আছে, সফল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার লড়াইতেও ওটা কাজে আসবে," কুন্তল বাগচী, ছাত্রকে ভবানীপুরের একটা গলিতে খেতে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন।

সৈকতেশ মাথা নাড়ছিল আর সামনের ডিশ থেকে অমৃতোপম একটি বস্তু সলজ্জ ভঙ্গিমায় জিভে এনে ফেলছিল।

আশির দশকে কলকাতার যে কয়েকটা দোকানের ফিশ ফ্রাইয়ের জন্য নামডাক ছিল, এইটে তার মধ্যে একটা। তবে নামডাক দিয়ে মানুষ চেনা যায়, এদের সৃষ্ট বস্তুটির ক্ষেত্রে একটিই শব্দ প্রযোজ্য, 'অনবদ্য'।

"আমার কথাটা তুমি না বুঝেই মাথা নাড়লে, কিন্তু কথাটা তত কঠিন কিছু নয়। কাজে নেমে পড়লে দেখবে মাটি-মেশানো সিমেন্ট, ড্যাম্প ধরা ইঁট, পলকা লোহার বার গছিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর তাই দিয়েই তোমাকে তোমার স্বপ্নপূরণের কথা বলা হচ্ছে।"

সৈকতেশ মুখ ভর্তি স্বর্গসুখ নিয়েই দু'দিকে মাথা নাড়ল, "আমি রিফিউজ় করব প্রথমেই।"

"হয়তো রিফিউজ় করার পরও ওই দিয়েই কাজ হচ্ছে, দেখতে হবে তোমায়। পরিস্থিতি কী হবে তা তোমার জানা নেই হে বালক। কিন্তু আজ ওই কথা বাদ দাও, এই ফিশ ডায়মন্ড ফ্রাই কেমন লাগছে বলো?"

"এটা একটা জিজ্ঞেস করার মতো কথা হল স্যর?" সৈকতেশ হেসে ফেলল।

"আর একটা অর্ডার করি তবে? অবশ্য না করলেও প্রশান্ত ঠিকই পাঠিয়ে দেবে। ও জানে আমি যাদের নিয়ে আসি এখানে তারা কেউই একটা খেয়ে বাড়ি যায় না। অবশ্য যাওয়া যায়ও না। চার পাশের এত পরিবর্তনের ভিতরও কী রকম ভাবে স্বাদটা ধরে রেখেছে, সত্যিই অবাক লাগে ভাবলে!

"আপনি অনেক দিন চেনেন এই দোকানের..."

সৈকতেশের কথার মাঝখানেই কুন্তল বাগচী বলে উঠলেন, "আজ পঁচিশ বছর। তখন ও লেক মার্কেটের বাজারের সামনে একটা উনুন পেতে বসত।"

"উনি তো বোধহয় ওড়িশার..."

"প্রশান্তর ঠাকুরদা কার্তিক সারেঙ্গি কটক থেকে কলকাতায় এসেছিলেন মোটামুটি নেতাজি সুভাষচন্দ্র কটক থেকে কলকাতায় আসার সময়ই। উনি আর ওঁর ছেলে, দু'জনেরই রান্নার ঠাকুর হিসেবে খুব সুখ্যাতি ছিল কলকাতায়। প্রশান্ত ম্যাট্রিকে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিল, কিন্তু বাবা দুম করে মরে যাওয়ায় পড়াশোনা ছেড়ে কারও একটা বাড়িতে রান্নার কাজে ঢোকে। আর সেখানেই ওর ভাগ্য ঘোরে।"

"কী ভাবে?"

"ব্যাপারটা হয়েছিল এই রকম, মিষ্টি ডাল খেত ওই বাড়ির এক কর্তা। এ বার প্রশান্ত বোধহয় বলেছিল, 'অত চিনি দিলে ডালটা নষ্ট হয়ে যাবে। আপনার দরকার হলে পাতে চিনি ঢেলে মিশিয়ে নিন'।"

"ভুল কী বলেছে?"

"ভুল এটাই যে, রান্নার ঠাকুর হয়ে গৃহকর্তার মুখে মুখে জবাব দিয়েছে। লোকটি একটি চড় কষিয়ে দেয় প্রশান্তর গালে আর প্রশান্তও 'রইল তোদের চাকরি' বলে ফুটপাথে এসে দাঁড়ায়।"

"আপনি এত কিছু জানলেন কী করে?"

"প্রশান্ত আমার এক বছর জুনিয়র ছিল স্কুলে। আমারই মতো অঙ্ক কষতে ভালবাসত ছেলেটা। পিতৃহীন না হলে আজ হয়তো ও-ও ইঞ্জিনিয়ার হত। ভেবে মনখারাপ হয়, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কোন দেশোদ্ধার করত! প্রশান্ত কিছু না হলেও পঞ্চাশটা লোকের রুজিরুটির ব্যবস্থা করছে, আমি ক'জনের করছি?"

সৈকতেশ কিছু না বলে ডান হাতটা উপরে তুলল, 'প্রেজ়েন্ট প্লিজ়' বলার সময় মানুষ যে ভাবে তোলে।

"না, না, তোমার ব্যবস্থা কিছু করছি না আমি, একটা দরজা খোলা আছে, সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি মাত্র। আর সেটুকু তো প্রশান্তর জন্যেও করেছি। ও যখন ফুটপাথের একটা দোকানে উবু হয়ে বসে তেলেভাজা ভাজছে, তখন আমি আর সহ্য করতে পারিনি।"

"মানে, প্রশান্তবাবুর স্টার্টিং ক্যাপিটালটাও আপনারই দেওয়া?"

"সেটা বড় কথা নয়, সৈকতেশ। আমি না দিলেও কোথাও না কোথাও থেকে পুঁজি জোগাড় করে ফেলত প্রশান্ত। ওর ভিতরে একটা ইস্পাত কঠিন জেদ ছিল আর তার সঙ্গেই বেতের মতো নমনীয়তা।"

"দুটো একসঙ্গে সম্ভব?"

"অবশ্যই সম্ভব। প্রশান্তর ফিশফ্রাই যখন লোকের মুখে মুখে জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে, তখন ও নিজে-নিজেই একটা টিজ়ার তৈরি করে নিজের প্রোডাক্টের জন্য।"

"আচ্ছা?"

"হ্যাঁ গো। খুব ইন্টারেস্টিং ছিল সেটা, 'হাতে গরম/ জিভে নরম'। বেশ একটা ক্রেজ় হয়ে গিয়েছিল ওই শব্দগুলোর। আমি কলেজের মেয়েদের প্রশান্তর সামনে এসে, 'ওই হাতে গরম জিভে নরম চারটে দিন তো,' বলতে শুনেছি। আর শুনতে শুনতে এক সময় দেখতেও শুরু করলাম। প্রথমে রাস্তায় বেঞ্চ পেতে তার পর ঘর ভাড়া নিয়ে আর অবশেষে এই দোকান। সাদার্ন অ্যাভিনিউতে একটা বাড়ি কিনেছে প্রশান্ত, কয়েক বছরে ওখানেও রেস্তরাঁ খুলবে। প্লাস ওর কেটারিং তো আছেই। মনে জোর আর কাজে নিষ্ঠা থাকলে প্রতিকূল পরিস্থিতি কাউকে শেষ করে দিতে পারে না

সৈকতেশ। কয়েক দিন দমিয়ে রাখতে পারে মাত্র। আমি প্রশান্তর মধ্যে এটা দেখেছি, তোমার মধ্যে দিয়েও দেখতে চাই।"

ভবানীপুরের রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল দু'জনেই।

সৈকতেশের মনে হচ্ছিল জীবনে সব হারিয়েছে মনে যখন হয়, তখনও সব হারায় না মানুষ। ও নিজেই তার উদাহরণ। নিচু হয়ে একটা প্রণাম করল ও নিজের শিক্ষককে, "আপনার আশীর্বাদ থাকলে পারব স্যর।"

"পারতেই হবে। আগামীর ভারত তোমার অপেক্ষা করছে," কুন্তল বাগচী জড়িয়ে ধরলেন সৈকতেশকে।

ট্যাম্পায় মৃদু গর্জনরত অন্ধকার সমুদ্রের সামনে রোজ়ালিয়া যখন জড়িয়ে ধরেছিল, ওর দুটো ভারী ঠোঁটের ভিতর বিলীন করে দিচ্ছিল সৈকতেশের ঠোঁট দু'টোকে, জিভ দিয়ে শুষে নিচ্ছিল সৈকতেশের মুখের ভিতরকার সবটুকু আর্দ্রতা, তখন ভারতের কথা মনে পড়েনি অবশ্য। ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে যাওয়ার অভিঘাতটুকু কাটিয়ে উঠতে যে পাঁচ-দশ সেকেন্ড লাগে, তার পরই মনে হচ্ছিল চোরাবালিতে তলিয়ে যাওয়া এত সুখকর হলে লোকে চোরাবালিকে ভয় পায় কেন?

মায়ের মুখে 'ধলাকুচ্ছিত' শব্দটা বহু বার শুনেছে সৈকতেশ। কথাটার মানে হল, রং যাদের ক্যাটকেটে ফর্সা, কিন্তু মুখচোখ পাথরের মতো। আমেরিকায় এসে সে রকম অনেক চেহারা আশপাশে দেখেছে নিত্য। কিন্তু রোজ়ালিয়া ল্যাটিনো। তার ফর্সার ভিতর লাল নয়, হলদেটে ভাব আর মুখে অনেকখানি কমনীয়তা। তার পাশাপাশি গলার ভাঁজে, বুকের ক্লিভেজে, সর্বোপরি দুই চোখের অপ্রতিরোধ্য আদিম ইশারা, যা স্যুটেড-বুটেড লোককেও ছাল-বাকল পরে শিকার করতে বেরোনোর আগের মুহূর্তে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাতে পারে।

বেড়ে ওঠার দিনগুলিতে, প্রেম অনেক দূরের কথা, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলারই সুযোগ মেলেনি। লেখাপড়া ছিল একদম কড়া শাসনের বোর্ডিং স্কুলে আবার সেখানে নিজের বাবাই এক জন শিক্ষক। কখনও-সখনও সরস্বতী পুজো কিংবা অষ্টমীর অঞ্জলি দিতে গিয়ে কারও সঙ্গে হয়তো একটু চোখাচুখি হয়েছে, কিন্তু তা আর একে অপরের সঙ্গে পরিচয় অবধি অগ্রসর হতে পারেনি। এক বার দোলের দিন একটি মেয়ে ওর গালে রং দেওয়ার পর সৈকতেশও তাকে রং দেবে ভেবেছিল, কিন্তু কাছে আবির না থাকায় মুখ ফুটে মেয়েটির কাছ থেকে চাইতে লজ্জা করেছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ঢোকার পর এই গল্পটা কাউকে একটা করেছিল আর সে ওকে দুয়ো দিয়ে বলেছিল, "মেয়েদের রঙেই তো মেয়েদের রাঙাতে হয় রে বুরবক। না হলে আমাদের নিজের রং কোথায়?"

সৈকতেশ চুপ করে শুনে গিয়েছিল, উত্তর দিতে পারেনি। রোজ়ালিয়ার সঙ্গেও ও যেচে কথা বলতে যায়নি, কিন্তু মেয়েটা নিজেই কাজ করতে এসে অদ্ভুত সব ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সংলাপ বলত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। স্প্যানিশ ভাষায় বলা কথাগুলোর বিন্দুবিসর্গ বুঝত না সৈকতেশ, কিন্তু ওর বলার কায়দা, ময়দার ভিতর পুরের মতো করে শব্দের মধ্যে আবেগ ভরে দেওয়ার নিপুণতা মুগ্ধ করত ওকে।

কথায় কথায় রোজ়ালিয়ার সামনে আড়ষ্টতা কেটে গিয়েছিল সৈকতেশের। তার অন্যতম কারণ ছিল মেয়েটা কিউবার। আমেরিকায় আসার আগে কলকাতায় কিউবার জন্য চাল সংগ্রহের একটা হিড়িক দেখেছিল সৈকতেশ। ওই চাল অত দূর যায় কোন জাহাজে, জানতে ইচ্ছে করত ওর। যারা সংগ্রহ করত তাদেরই কেউ কেউ ইয়ার্কি মেরে বলত, যে ভাল চালগুলো মেজ আর সেজ নেতাদের বাড়ি চলে যায়, বাকিটা কে জানে কোন চুলোয়। কিন্তু সৈকতেশের সেটা শুনে তত কিছু মনে হয়নি। ওর খালি খারাপ লাগত যখন দেখত যে কিউবায় সবাই এক খাবার খায়, এক রকম ঘরে শোয় বলে যে লোকটা গলা ফাটাচ্ছে, শরিকি বাড়িতে মাংস রাঁধার সময় সেই লোকটাই দরজায় ছিটকিনি তুলে দিচ্ছে যাতে জ্ঞাতিগুষ্টি খেতে না চলে আসে, গন্ধে গন্ধে।

"কিউবায় সবাই এক খাবার পেলে আমি অভিনয় ছেড়ে দিয়ে ফ্লোরিডায় এসে ল্যাট্রিন সাফ করার কাজ করতাম? ওই সব গল্প, গল্পেই ভাল লাগে। বাস্তবে সর্বত্রই যার ক্ষমতা আছে, সে ক্ষমতাহীনকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে।"

"তুমি অভিনয় করতে?"

"তা না হলে কাজের ফাঁকে আমি কী আওড়াই? সব সেই নাটকগুলোর সংলাপ, হাভানায় যেগুলোর মহড়া দিতাম, মঞ্চে পারফর্ম করতাম।"

"এক জন অভিনেত্রী শেষে কি না মেথরানির কাজ করছে?"

"তাতে অসুবিধের কী আছে? এই সার্ভিস দেওয়ার লোক এখানে কম, আর আমি সেটা দিতে পারি বলেই তোমরা আমায় হায়ার করছ।"

সৈকতেশের লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল কথাটা বলে ফেলে, কিন্তু ও স্বস্তি পাচ্ছিল এটা ভেবে যে ওর প্রশ্নটার ভিতরের লজ্জা, সংস্কৃতির কারণেই রোজ়ালিয়া অবধি পৌঁছয়নি। ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়া আর কোথাওই ঘর-বাথরুম-নর্দমা সাফাইয়ের সঙ্গে কোনও সামাজিক গ্লানি জড়িয়ে নেই। লোকের থেকে চাল ভিক্ষে নিতে পারে, কিন্তু সম্মান ভিক্ষে করে ঘুরতে হয় না এই রোজ়ালিয়াদের।

একটি নাটকের একটা খণ্ডদৃশ্য অভিনয় করে দেখাতে শুরু করল রোজ়ালিয়া, সৈকতেশকে চুপ করে থাকতে দেখে। ভাষার মাধ্যমে সেতু সম্ভব না হলেও আবেগের সেতু রচনা যে সব সময়ই সম্ভব, প্রমাণ করে দিল পাঁচ মিনিটে। তার পর হাততালি দিয়ে ওঠা সৈকতেশকে ওর এবড়োখেবড়ো ইংরেজিতে বলল, "সে ইট উইথ আ কিস।"

সৈকতেশের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু রোজ়ালিয়া যখন নিজেই এগিয়ে এসে ওকে চুমু খায় এক দিন কাজ সেরে বেরিয়ে যাওয়ার আগে আর ওকে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে, "ম্যানার্সও জানো না নাকি?" তখন সৈকতেশ একটা ঝটকায় ওকে কাছে টেনেছিল আর তৎক্ষণাৎ ধনুকের ছিলার মতো শরীরটা বাঁকিয়ে দিয়েছিল রোজ়ালিয়া। সেই ধনুকের অর্গলমুক্ত হয়ে মদনের অসংখ্য বাণ বিদ্ধ করছিল সৈকতেশকে যত ক্ষণ না ও নিজের মুখ নামিয়ে দিয়েছিল রোজ়ালিয়ার বুকের গভীরে।

"আমি যেখানে অভিনয় করতাম, সেই মঞ্চটায় এখন ঝুল জমতে শুরু করেছে। তার নীচে, আশপাশে ক্ষয়াটে চেহারার বেড়ালরা ঘুরে বেড়ায় রাত্রিদিন।" আদরের ক্লান্তি যখন নির্ভরতার শান্তি এনে দিয়েছে একটু, রোজ়ালিয়া বলল।

"কিন্তু কেন?"

"কেন নয়? ধরা যাক, দশ জনকে নিয়ে নাটক শুরু করা হল, এ বার এক মাস হতে না হতেই এক জন বেপাত্তা। তিন মাস যেতে না যেতেই দু'জন লাপাতা, চার মাসের মাথায় তিন জন। এ ভাবে কি কোনও কাজ করা যায়? আর তার পর যখন আমেরিকা থেকে বেপাত্তাদের ফোন আসতে থাকে, তখন মহড়ায় আসা প্রত্যেকে অন্য সবাইকে সন্দেহ করতে শুরু করে। এ ভাবে ও পালিয়ে যাবে কাল, ও ভাবে সে পালিয়ে যাবে।"

"কিন্তু পালিয়ে যায় কেন? একটা স্বাধীন, স্বাবলম্বী দেশ ছেড়ে..."

রোজ়ালিয়া সৈকতেশকে থামিয়ে দেয়, "একটু স্বাধীন ভাবে আর একটু আরামের একটা জীবন কাটাতে চায় বলে পালিয়ে আসে। না হলে পালাতে গিয়ে কত লোকের প্রাণ যায় তার ইয়ত্তা আছে? হাভানা থেকে ছোট ডিঙিনৌকোয় চেপে যারা পালাতে চেষ্টা করে, তারা অনেকেই কি-ওয়েস্টে পৌঁছবার আগেই জলে ডুবে মরে, নয়তো হাঙরের পেটে যায়। আর আমেরিকার ভূখণ্ডে পা রাখলেও হয় পুলিশে তাড়া করে, নয়তো ডিটেনশন সেন্টারে ভরে দেয়। সারা পৃথিবীকে মানবাধিকারের লেকচার দেওয়া আমেরিকা নিজে তো আর সেই নীতি মেনে চলে না!"

"তবুও তো আসে লোকে..."

"হাড়ভাঙা খাটনি সারা জীবন খাটতে পারে না বলে আসে। সমানাধিকারের নামে কেউ অনেক আর কেউ সামান্য পাবে, কাঁহাতক সহ্য করা যায়? তার চেয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এক বার চেষ্টা করা ভাল নয় কি? আমি নিজে অবশ্য তিন বারের চেষ্টায় পালাতে পেরেছিলাম। প্রায় আট মাইল সাঁতার কাটার পর একটা স্পিডবোট আমায় তুলে নিয়েছিল। গলাকাটা দাম নিয়েছিল অবশ্য তার। মায়ামির নৌকা ধরতাম যদি, তবে খরচ একটু কম হত, কিন্তু ওখানে ভয়ঙ্কর তল্লাশি চলে। তিন বছর থাকার পরও মায়ামি থেকে ভাগিয়ে দিয়েছে পুলিশ, এমন অনেক ঘটনা আছে। ট্যাম্পায় একটু হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচা যায়।"

“তা তুমি বাঁচছ এখানে, হাত-পা ছড়িয়ে?”

রোজ়ালিয়া শেষ প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে ওর অভিনীত একটি নাটকের একটা অংশ অভিনয় করে দেখাতে থাকে। সেখানে, ষোলো বা আঠারো বছরের যুবতী পেরোনেলের সঙ্গে এক বৃদ্ধ কবির প্রেম হয়ে যায়। এক দিন প্রেমিকাকে চুম্বন করতে যাবেন কবি, কিন্তু তার ঠোঁটের উপর রাখা একটি গাছের পাতা। শর্তও সে রকমই। পাতাটিকে চুম্বন করলেই প্রেমিকার ঠোঁটে চুম্বন দেওয়া হবে। ঠোঁট অবধি পৌছনোর অনুমতি নেই। কিন্তু একটা হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যায় সে পাতা, আর তখন কী করেন কবি? ওষ্ঠ স্পর্শ করেন ওষ্ঠ দিয়ে, নাকি তার আগেই থেমে যান?

প্রশ্ন নিজে যখন উত্তরের চেয়ে মনোমুগ্ধকর, তখন কে চায় উত্তর? রোজ়ালিয়ার অসামান্য অভিনয়ে বার্ধক্য আর যৌবনের বিপুল দূরত্ব মিটে গিয়ে যুগলবন্দি শুরু হয়ে যেত। মনে হত যেন সেই সব প্রেমিক হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে যারা একটু হাসি, এক বারের চাওয়া, প্রেমিকার এক গুছি চুল মুখে বুলিয়ে সারা পৃথিবীর মানচিত্র আঁকতে প্রস্তুত।

পুরুলিয়ার রুক্ষ মাটিতে প্রবল দাবদাহ সর্বাঙ্গে নিয়ে বেড়ে ওঠা সৈকতেশের। গরমের দিনগুলোয় কুয়োর সামনে গিয়ে বসলে, বড় কোনও দাদা এক বালতি বরফ-শীতল জল গায়ে ঢেলে দিত আর সেই ছিল স্নান। এত আরামদায়ক ছিল ওই গায়ে জল পড়ার মুহূর্তটা যে, গা প্রায় কখনই গামছা দিয়ে মুছত না সৈকতেশ। গায়েই জল শুকিয়ে ফেলার অনুভূতি, অপরিসীম আনন্দের ছিল যে! রোজ়ালিয়ার মুহূর্তের স্পর্শটুকুও সে ভাবেই অনুভবে জারিয়ে নিচ্ছিল ও, এক দিন-প্রতিদিন। নিতে নিতে টের পাচ্ছিল যে, এমন কোনও ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ও করে আসেনি যে, আবারও দেশে ফিরতেই হবে। কে ওর জন্য প্রদীপ জ্বালিয়ে, বরণডালা সাজিয়ে অপেক্ষা করছে দেশে? যে দিন নেওয়ার্ক এয়ারপোর্টে পা রেখেছিল প্রথম, সে দিন মনে হচ্ছিল কত ক্ষণে কলকাতায় ফিরে যাবে, কিন্তু বছর ঘোরার আগেই মনে হতে লাগল যে, ও এক জন আর্কিটেক্ট। যেখানে উন্মুক্ত জমি পাবে সেখানেই গড়ে উঠতে পারে ওর স্থাপত্য। তবে আর নিজের জীবনের ক্ষেত্রে সীমারেখা টেনে লাভ কী?

দেশ থেকে বাগচী স্যারের চিঠি আসত লম্বা খামগুলোয়। প্রথম প্রথম চিঠি পড়েই উত্তর লিখতে বসে যেত সৈকতেশ। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, চিঠিগুলো পড়ে থাকতে শুরু করল টেবিলের ড্রয়ারে।

শেষ একটা চিঠি পড়তে গিয়ে সৈকতেশ দেখল, বাগচী স্যার লিখেছেন,

“আমাদের দেশে ভূতের গল্পের ছড়াছড়ি। বর্ষাকালে প্রায় প্রতিটি পত্রিকা ‘গা-ছমছমে ভূতের গল্প’ বলে সংখ্যা বের করে। সেই গল্পগুলোর অধিকাংশতেই কোনও সাহেব ভূত কিংবা জমিদার ভূতের কথা। আরে বাবা ভূত যদি সত্যিই থাকত, তবে কোটি ভূত থাকত এখানে। একটা দুটো নয়। এই যে শতাব্দীর পর শতাব্দী লক্ষ লক্ষ লোক, ‘একটু ফ্যান দাও’ বলে চিৎকার করতে করতে মরে গেল কত দুর্ভিক্ষে, তাদের সবার তো ভূত হওয়ার কথা। ভূত না হয়ে আমরা যারা দিব্যি বেঁচেবর্তে আছি, তিন বেলা খাচ্ছি, তাদের গলা টিপে ধরার কথা। কিন্তু কই, সে রকম কিছু হয় না তো!

সেই সমস্ত ভূতের সন্ধানে লোকে শ্মশানে যায়, পরিত্যক্ত রাজবাড়িতে যায় আর আমি ফুটপাথে গিয়ে বসে থাকি মধ্যরাতে, কখনও সখনও শুয়েও পড়ি বাসিন্দাদের পাশেই। ওরা আমাদের মতো নয়, নিজেদের ছেঁড়া কম্বলের ভাগ দেয় গায়ে জড়াবার জন্য কিন্তু তাও আমার ঘুম আসে না সারারাত। আমি ভাবতে থাকি, আমি তো স্থপতি, কিন্তু আমার অঙ্ক, আমার স্ট্যাটিস্টিক্স কোন কাজে লাগল? আমি যে আবাসগুলো বানালাম তার একটাও তো এই ফুটপাথের মানুষগুলো অবধি এসে পৌঁছল না! মাঝপথেই লুঠ হয়ে গেল সব। দালালেরা আরও বড়লোক হল, গরিবরা ভিখিরি হয়ে গেল। আমার সব বিদ্যে মিথ্যে, কারণ আমি ওই মানুষগুলোর মাথার উপর ছাদের ব্যবস্থা করতে পারিনি। হয়তো আমার সাধ্যের ভিতরও ছিল না, কিন্তু আমার কর্তব্যের ভিতরে তো ছিল!

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে দেশে যখন কাজে লাগবে, তখন এই কথাটা মনে রেখো। যা তোমার কর্তব্যের তালিকায় তা অধিকাংশ সময়ই তোমার সাধ্যের বাইরে হবে। তবু সেই দুস্তর ব্যবধান মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করে যেতে হবে তোমাকেই।”

এই রকম চিঠি আগে হলে উদ্দীপ্ত করত সৈকতেশকে, কিন্তু সে দিন সকালে ক্লান্ত করল। মনে হল বাগচী স্যার নিজের সম্পত্তি নয়, লেকচারের বোঝা চাপিয়ে যেতে চাইছেন সৈকতেশদের ঘাড়ে। কিন্তু কেন এক প্রজন্মের বোঝা কাঁধে নেবে পরবর্তী প্রজন্ম? একটাই তো জীবন পৃথিবীতে, প্রত্যেকের অধিকার আছে নিজের মতো করে বাঁচার।

সেই নিজের মতো করে বাঁচার লোভেই স্প্যানিশ শিখতে শুরু করেছিল সৈকতেশ, কাউকে কিছু না জানিয়ে। ও উদ্দাম নয়, তাই ঢের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রোজ়ালিয়ার সঙ্গে সঙ্গমে মেতে ওঠেনি। বরং পল-অনুপলগুলো উপভোগ করতে করতে অপেক্ষা করছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণের, সংযোগ যখন সেতু হয়ে ওঠে, আদর বদলে যায় আশ্লেষে।

এক দিন সেই মুহূর্তটা দরজা থেকে ঘরে ঢুকে এল অযাচিত ভাবেই। সে দিন রোজ়ালিয়া সকালে নয়, সন্ধ্যায় এসেছে বাথরুম সাফ করতে। আর প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে বাইরে। সৈকতেশের কী মনে হল, খিচুড়ি রাঁধতে শুরু করল ঘরের মাইক্রো-ওভেনে। দেশে থাকতে এই জিনিস তেমন পছন্দের না হলেও আমেরিকায় ওটাই হয়ে উঠেছিল অঙ্গের অঙ্গী। সেই পুরুলিয়ায় থাকতেই খিচুড়ি রাঁধতে জানত ও। বোর্ডিং স্কুলে সরস্বতী পুজোর ভোগ রান্নাতেও হাত লাগাতে হত ওকে। সৈকতেশের মনে হচ্ছিল, আজ আর এক সরস্বতী ওর ঘরের ভিতর এসে দাঁড়িয়েছে। হলই বা তার জীবিকা বাথরুম পরিষ্কার; ওইটেই তার পরিচয় নয়। সে যখন নানা মুদ্রায় এক-একটা সংলাপ বলে ওঠে, তখন শব্দগুলোর গায়ে যেন নটরাজের স্পর্শ এসে লাগে। তাদের সুর-তাল-লয় দ্রুত হয়, ধীর হয়। সৈকতেশের হৃদস্পন্দনও দ্রুত হচ্ছিল, ধীর হচ্ছিল; ও আন্দাজ করতে পারছিল কী অপেক্ষা করছে সময়ের ও পারটাতেই।

রান্না যখন শেষ হয়ে আসছে আর প্রবল ভাবে একটু তেজপাতার অভাব বোধ করছে সৈকতেশ, তখন রোজ়ালিয়া ওই এক চিলতে কিচেনে ঢুকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল ওকে, কামড় দিল ওর কানের লতিতে। সেই কামড় শিহরন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সৈকতেশের সর্বাঙ্গে, ওর মনে হতে লাগল সেই ক্রিকেট ব্যাট যেন ওর ভিতরেই জাগ্রত হয়ে উঠেছে; এ বার সব সংশয় সীমানার বাইরে বের করে দেওয়ার জন্য চালিয়ে খেলতেই হবে। রোজ়ালিয়ার জিভ যখন ওর চোখ ছুঁয়ে গালের উপর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে গলায় এসে নামল, মনে হচ্ছিল রুক্ষ দুপুরে কলতলার প্রতীক্ষা এ বার ফুরল। এখন থেকে বালতির পর বালতি জল এসে স্নান করিয়ে যাবে ওকে, আর সেই জলের বহতা ধারায় সব আগুন, সমস্ত আক্রোশ, অনেক আস্ফালনের মুখে অসংখ্য অপারগতা, ধুয়ে যাবে চিরতরে। নতুন একটা মানুষ হয়ে উঠবে সৈকতেশ, বলা যায় নতুন এক পুরুষ। ওর পৌরুষের বেগে জাতি-ধর্ম-জীবনযাত্রা-ভাষার সব বিভেদ ঘুচে যাবে, একটিই আলিঙ্গনের মধ্যে অবিভাজ্য হয়ে থাকবে পৃথিবীর দুই চরম একক, আদম আর ইভ; জন্ম নেবে পৃথিবীর পরম যুগল, রাধাকৃষ্ণ।

“তোমার ফেরার তাড়া নেই তো? আমার খিচুড়ি হয়ে এসেছে প্রায়।”

“তুমি কী করছ আমি জানি না, কী রাঁধছ আমার সে ধারণাও নেই, আমি কেবল জানি যে আমার সময়ের বোধটাই আমি ভুলে গিয়েছি আজ, তোমার জন্য। আজকের ঘড়ির সেকেন্ড-মিনিট-ঘণ্টার কাঁটা তোমার ইচ্ছে অনুযায়ী চলবে। আমি তোমার ফোনটা এক বার ইউজ় করতে পারি ডার্লিং? আমার একটা ফোন করার আছে,” রোজ়ালিয়া আদুরে গলায় বলল।

“আমার ঘর থেকে হাওয়ায় ভেসে ভেসে তোমার কথা ট্যাম্পার সমুদ্র পার হয়ে কিউবায় চলে যাচ্ছে, ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার। একটা কেন, একশোটা ফোন করো তুমি,” সৈকতেশ এগিয়ে গিয়ে একটা চুমু খেল রোজ়ালিয়ার ঠোঁটে।

রোজ়ালিয়া সেই চুমুর উত্তরে দাঁত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল সৈকতেশের ঠোঁট। লড়াই করতে থাকা মানুষ যে ভাবে মাটি কামড়ে ধরে।

রোজ়ালিয়া জানত না যে, সৈকতেশ বিগত তিন মাস ধরে স্প্যানিশ শিখছে। সৈকতেশ নিজের স্বাভাবিক সঙ্কোচে জানায়নি। তাই ইন্ডিয়ানটা ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, বলার পাশাপাশি ও যে তার পাসপোর্ট চুরি করে নেবে আজ রাতেই, সেটা ফোনে বলার সময় একটুও শঙ্কা গ্রাস করেনি রোজ়ালিয়াকে। মোবাইলের আবির্ভাব হয়নি তখনও পৃথিবীতে, মনের

কথা লিখতে গেলে কাগজ-কলমের দরকার পড়ত, যন্ত্রের মাধ্যমে মনের কথা লেখা যেত না। অন্য অনেক দিন যন্ত্রের মতো কাজ করে যাওয়া রোজ়ালিয়া, ল্যান্ডলাইন ফোনের ভিতর দিয়ে নিজের সব আবেগ উজাড় করে দিচ্ছিল মহাসমুদ্রের অন্য প্রান্তে থাকা কারও কাছে। আশু সাফল্যের দরজায় দাঁড়িয়ে খরগোশ যেমন দৌড়নোর বদলে ঘুমিয়ে পড়ে, ওর মনেও একটা নিশ্চিন্তি চলে এসেছিল, ওই ফ্ল্যাটে উপস্থিত অন্য মানুষটার বিষয়ে।

"অ্যালবার্তো কে? কী করবে সে আমার পাসপোর্ট নিয়ে?"

ফোন শেষ করে রান্নাঘরে উঁকি দিতেই সৈকতেশের মুখ থেকে স্প্যানিশে প্রশ্ন শুনে মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল রোজ়ালিয়ার।

নিজের মতো করে এটা-ওটা বোঝাবার চেষ্টা করল তিন-চার মিনিট, তার পর হাল ছেড়ে দিল রোজ়ালিয়া, "অ্যালবার্তো আমার স্বামী, পেড্রো আমাদের ছেলে। ওদের ছাড়া থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে আমার তাই..."

"তুমি আমার পাসপোর্ট চুরি করে ওদের নিয়ে আসতে চাও?"

"লোসিয়েন্তো স্যর, লোসিয়েন্তো।"

"'স্যরি' বলতে হবে না। এ রকম কেন করবে সেইটুকু শুধু বলো।"

"ও এখানে একটু সেটল করে গেলে তোমার পাসপোর্ট তোমায় ফিরিয়ে দিতাম আমি।"

"কিন্তু আমার পাসপোর্টে অ্যালবার্তোর লাভ কী হত?"

"আমরা ককেশান নই, ল্যাটিনো। আমরা নিজেদের ইন্ডিয়ান বলে চালিয়ে দিতে পারি, অসুবিধে হয় না। আর রিসেন্টলি আমেরিকার পুলিশ খুব বাড়াবাড়ি করছে, গুলি করে মেরে ফেলেছে দু'জন ইল্লিগাল ইমিগ্রান্টকে, তাই একটু সেফ সাইডে থাকার জন্য..."

"আমায় সিডিউস করতে শুরু করেছিলে?"

"তুমি সিডিউসড হলে কেন?"

"বিকজ় আই ফেল ইন লাভ উইথ ইউ। ভালবেসে ফেললে মানুষের নিজের হাতে আর ব্যাপারটা থাকে না, তাই না? কিন্তু আমার কথা বাদ দাও। তুমি তো অ্যালবার্তোর সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করলে। ও আর স্বীকার করবে তোমায়?"

"কী বলতে চাইছ তুমি?"

"এই যে তুমি ক্লোজ় হয়েছ আমার সঙ্গে, আজ রাতে থেকে গেলে হয়তো..."

"সো হোয়াট? আমি সেটা নিজের ইচ্ছেয় করেছি। অ্যালবার্তোকে আমি ভালবাসি বলে ও আমার স্তন, যোনির মালিক নয়। আমিও ওর লিঙ্গের মালকিন নই। এগুলোকে পাত্তা দিই না আমি কিংবা অ্যালবার্তো। হ্যাঁ, তোমার বিশ্বাস আমি রাখতে পারিনি, কারণ তোমাকে বললে কি তিন মাসের জন্য তোমার পাসপোর্টটা তুমি দিতে আমায়?"

"তিন মাসের মধ্যে যদি আমার পাসপোর্ট তলব করত অথরিটি?"

"বলতে হারিয়ে গেছে!"

"আর ওরা আমাকে জেলে ভরে দিলে?"

"মোটেই জেলে দিত না, কিন্তু সে কথা তোমায় বোঝাতে পারব না আমি। কারণ তোমার চোখে আমি বিশ্বাসঘাতক হয়ে গেছি।"

"তা হয়েছ। তবে তুমি যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারো, সেটা প্রথম দিনই বোঝা উচিত ছিল আমার। যে বিনা কারণে নিজের দেশ ছেড়ে একটা শত্রু দেশে চলে আসে..."

রোজ়ালিয়া থামিয়ে দিল সৈকতেশকে, "আমি কি আমার দেশের প্রতিরূপ? মাই কান্ট্রি পারসোনিফায়েড? যত দিন আমি ওই দেশের অংশ, তত দিন আমি আমেরিকার স্যাংশনের ভুক্তভোগী আর যে মুহূর্তে আমি মার্কিন নাগরিক, আমি এই দেশটার সব সুবিধে পাওয়ার অধিকারী! আমি তো আমিই। আমি তো আর দেশ নই।"

"জুডাসও সম্ভবত এ রকমই ভেবেছিল।"

রোজ়ালিয়া হেসে উঠল, "সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে, আমরা সবাই জুডাস। আমরা কেউ তিরিশ, কেউ বা তিনশো সিলভার কয়েনের বিনিময়ে জেসাসকে ধরিয়ে দিয়ে থাকি। তুমি নিজেও তো তাই। না হলে দেশ ছেড়ে এখানে চলে এসেছ কেন? কেন এই দেশে থেকে যাওয়ার কথা বলতে?"

"যা বলেছি সেগুলো কথার কথা, আর যদি তোমায় দেখে আমার সে রকম কিছু মনে হয়েও থাকে, তবে তা রোদের তাতে বাষ্পের মতো উবে গেছে এখন। আমি এই দেশে পড়তে এসেছিলাম, শিখতে এসেছিলাম, আর অল্প কয়েক মাস পরই ফিরে যাব। আমাকে আমার দেশের রাস্তা বানাতে হবে, ব্রিজ বানাতে হবে, বলতে গেলে দেশটাকেই নতুন করে বানাতে হবে।"

"সেই কারণে স্প্যানিশ শিখছিলে?" রোজ়ালিয়া কেমন একটা অদ্ভুত গলায় জিজ্ঞেস করল।

সৈকতেশ ভিতরের সমস্ত যন্ত্রণা গিলে ফেলে বলল, "স্প্যানিশ শিখছিলাম তোমায় ভালবেসে। কিন্তু তুমি বুঝিয়ে দিয়েছ যে, আমার ভালবাসার কোনও মূল্য নেই। মূল্য শুধু আমার পাসপোর্টটার। তুমি নতুন করে আমাকে আমার 'ইন্ডিয়ান' পরিচয়টা ফিরিয়ে দিয়েছ রোজ়ালিয়া। অনেক অনেক ধন্যবাদ তার জন্য।"

রোজ়ালিয়া এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল সৈকতেশকে, "পেরদন, পেরদন। আমি আমার ছেলে আর বরকে ভীষণ ভালবাসি। তাই বলে আমি তোমাকে ভালবাসি না, এমনটা মনে কোরো না প্লিজ়। আমার ভান্ডারে যা আছে, সেই সমস্ত সংলাপ তোমার সামনে আউড়ে আমি যে কী শান্তি পেয়েছি, তা তুমি জানবে না কোনও দিন।"

"এখনই তো জানলাম। জানলাম যে, তুমি অভিনেতা আর আমি এক জন দর্শক। কিন্তু এখন তো আমি তোমার ভাষাটাও বুঝে গেছি, তাই তোমার আসল অভিনয় দিয়ে আর আমাকে বোকা বানাতে পারবে না।"

রোজ়ালিয়ার চোখগুলো জ্বলছিল। সৈকতেশের কথা শেষ হতেই দুটো হাত দিয়ে শক্ত করে সৈকতেশের মুখটা ধরে একের পর এক চুমু খেতে শুরু করল ও। কিন্তু একটু আগে যে স্পর্শ চন্দনের মতো মনে হচ্ছিল, এখন তাকেই অ্যাসিডের মতো মনে হতে লাগল সৈকতেশের। ওর বলতে ইচ্ছে করছিল যে, ও আসলে একটা পরিকাঠামো। যেখানে রাস্তা আছে, জল আছে, গাছপালা আছে। রোজ়ালিয়া সেই পরিকাঠামো ব্যবহার করে নিজের ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নিতে চায়। ওদের সম্পর্ক স্রেফ এটুকুই। কিন্তু তাতে সৈকতেশের কী লাভ? যদি পরিকাঠামো হতেই হয়, ও ওর দেশে ফিরে গিয়ে হবে। যেখানকার অর্ধভুক্ত, অভুক্ত মানুষের ট্যাক্সের টাকায় ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, পরিষেবা তাদের দেবে। রোজ়ালিয়াকে কেন দেবে?

"উইল ইউ গিভ মি আ পার্টিং কিস? জাস্ট একটাই? আর চাইব না কিছু তোমার থেকে, কখনও।"

"কেন চাইবে না? লাস্ট দু'বার পরিষ্কার করার টাকা ডিউ আছে তোমার। তোমাকে সেটা নিতেই হবে।"

রোজ়ালিয়া যখন উত্তর দিল, বোঝা গেল যে ও কাঁদছে, "প্লিজ় আমাকে আর অপমান কোরো না, প্লিজ়। আই অ্যাম অ্যান আর্টিস্ট। আমাকে চুমুও দিতে হবে না তোমায়, লেট মি গো।"

"তুমি চেয়েছ যখন, আমি দেব," একটা অপরাধবোধ থেকেই বলে উঠল সৈকতেশ।

কিন্তু চুমু দেওয়া তো ভিক্ষে দেওয়া নয়, ভিক্ষে নেওয়াও নয়। ক্ষণিকের জন্য দুটো ঠোঁটের তরঙ্গ তাই ছুঁয়ে গেল অন্য দুটো ঠোঁটকে।

কোনও ঢেউ জাগল না। কোনও প্রেম জন্মাল না।

কে বলতে পারে, সেই সময়টুকু রোজ়ালিয়া হয়তো ভেবে গেল কী ভাবে অ্যালবার্তো আর পেড্রোকে মার্কিন মুলুকে নিয়ে আসবে।

সৈকতেশ ভাবছিল, কত তাড়াতাড়ি ভারতে ফিরবে।

৩। যমুনা গঙ্গা

"আচ্ছা, তুমি জানো আমি তোমায় প্রথম দেখার আগে কবে দেখেছিলাম? হেসো না প্লিজ়। আর হাসবেই যদি, তবে কথাটা শুনে তার পর হেসো। হস্টেলে থাকতে আমাদের তো পালা করে বাজারহাট করতে হত, এ বার আমি যেহেতু ভোরে উঠে প্র্যাক্টিসে যেতাম, তাই খাটাল থেকে দুধ আনার ভার ছিল আমার উপর। ছিল কিছু লোকজন, তাদের নাকি সামনে দাঁড়িয়ে দুইয়ে আনা দুধ ছাড়া হজম হয় না। তখনও কলকাতা

থেকে খাটাল উচ্ছেদ হয়নি, তাই এই সব খেয়াল চালিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু আমার কাজটা খারাপ লাগত না। কারণ ওই ভোরের খাটাল-যাত্রা আমাকে আমার শৈশবের পুরুলিয়ায় নিয়ে যেত। স্কুল থেকে আমরা দুধ-দই-ছানা সবই পেতাম। তখনই প্রায় আড়াইশো গোরু আমাদের আবাসিক স্কুলের গোয়ালঘরে কিন্তু তার পরও এক-একটা ফ্যামিলির একটু বেশি লাগে বলে আমায় ভোরে বেরোতে হত। তবে কলকাতার সঙ্গে সেই বেরোনোর তফাত ছিল। কলকাতায় এসেই আমি প্রথম জানতে পারি যে, গোয়াল আর খাটাল এক নয়। প্রথমটায় পোষ্য প্রাণীরা থাকে, দ্বিতীয়টায় পণ্য উৎপাদকরা। সেই উৎপাদকদের ইনজেকশন দিয়ে দুধ পাতলা করে দেওয়া হয়, আলাদা করে জল মেশানোর দরকার পড়ে না আর। শহর আমাকেও ও রকম অদৃশ্য ইনজেকশন দিয়ে পাতলা করে দিচ্ছিল অনবরত, আমি নিজের অজান্তে স্রোতের সঙ্গে বয়ে যেতে চাইছিলাম। তখনই এক দিন ভোরবেলার খাটালে সেই মেয়েটিকে চোখে পড়ে আমার। তার চোখ দুটো যেন সাগরপারের কোনও পাখি, তার সাধারণ কথা বলার ভিতরেও ঢেউয়ের কলতান। শীতের হাওয়ায় যখন সবার মুখ রুক্ষ, তখন এক আশ্চর্য লাবণ্য খেলে বেড়াচ্ছে তার প্রতিটি বিভঙ্গে। সে যেন ইরেজ়ার দিয়ে আমার সব বেদনা মুছে দিতেই এসেছে, শুধু এক বার আমার বলার অপেক্ষা। কিন্তু আমার কিছু বলার সাধ্য ছিল না। তুমি তো সেই শ্লোকের কথা জানো, মৈথুনরত দুই বিহঙ্গের দিকে তির চালিয়ে দেওয়া ব্যাধের উদ্দেশে যা বেরিয়ে এসেছিল আদিকবি বাল্মীকির মুখ দিয়ে। কলকাতায় পড়তে আসার বছরখানেক আগে পুরুলিয়াতেই এমন কিছু ঘটে, যা আমার কাছে আমাকে ব্যাধ করে তোলে। আর যে ব্যাধ, সে প্রেমের কথা বলবে কোন মুখে?

ঘটনাটা কী ঘটেছিল, একটু বলি। সন্তুদা তখন আমাদের ওখানকার জনপ্রিয় এক যুবক। রক্তদান শিবির থেকে বয়স্কদের ছানি কাটানো, সব কিছুতেই সবার আগে যে এগিয়ে আসত, তার নাম সন্তুদা। দোষের মধ্যে একটাই, বাড়ি থেকে গানের ক্যাসেট নিয়ে গেলে ফেরত দিতে খুব গড়িমসি করত, দিতও না এক-এক সময়। এক বার তো সেই কী রকম ফিতে-টিতে জড়ানো অবস্থায় ফেরত এল ক্যাসেট, চালাতেই চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় আর সুচিত্রা মিত্রের গলায় একশো মাতাল হুক্কাহুয়া করে উঠল। আমার মা রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া কিছুই শুনত না তেমন, তাই খুব কষ্ট পেত ও রকম ঘটলে। অথচ ওকে মুখের উপর বারণ করাও যেত না। আমি তাই একটা বুদ্ধি করেছিলাম। কোনও ক্যাসেট সন্তুদার কাছে এক সপ্তাহের বেশি থাকলেই আমি অন্য একটা ক্যাসেট নিয়ে পৌঁছে যেতাম ওর বাড়িতে। নতুন বন্ধক দিয়ে পুরনোটা ছাড়িয়ে আনতে।

সে বারও গরমের ছুটি চলাকালীন একটা দুপুরে আমি চলে গিয়েছিলাম সন্তুদার বাড়ি। দুপুর মানে বিকেল চারটে হবে, কিন্তু পুরুলিয়ায় ওই তিন-চার মাস বেলা বারোটা থেকে বিকেল পাঁচটা পারতপক্ষে বাইরে বেরোত না কেউ। সেই অবস্থাটা ঠিক ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না তোমায়, মেঝেয় জল ঢেলে তার উপর শোবার আধ ঘণ্টার ভিতর জায়গাটা থেকে গরম ভাপ উঠত। তা ওই রকমই একটা দিনে আমি সাগর সেনের ক্যাসেট দিয়ে দেবব্রত বিশ্বাস ফেরত আনব বলে সন্তুদার বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। দরজায় ধাক্কা দিতে হয়নি, কারণ খিড়কি দরজা ভেজানোই থাকত ওদের আর একতলার বড় ঘরটায় শীতলপাটি পেতে সন্তুদার মাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে ডাকাডাকি না করেই উঠোনের ওই দিকে সন্তুদার ঘরের সামনে গিয়ে হাত দিয়ে চাপ দিয়েছিলাম দরজাটায়।

সে দিন যে ফুলের মধ্যে ফুলঝুরি ছিল জানব কী করে? দরজাটা হাট হয়ে যেতেই আধো অন্ধকারে একটা গোঙানি শুনি, যা মুহূর্তের মধ্যে চাপা চিৎকারে বদলে যায়। চোখ সয়ে গেছে তত ক্ষণে, তাই প্রায় স্ট্যাচু হয়ে গিয়ে আমি দেখতে থাকি সন্তুদা আর রত্নাদিকে। অত গরম বলেই বোধহয় ওরা একটা চাদরও রাখেনি কাছে যা দিয়ে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে নিজেদের আব্রু রক্ষা করতে পারে। ওই 'আব্রু' শব্দটার সঙ্গে আমার অবশ্য পরিচয় ছিল না তখনও, তবে সেই মুহূর্তে সন্তুদার ঘরের ছোট তক্তপোশ আমাকে বড় বিস্ময়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

হয়তো বা পনেরো-কুড়ি সেকেন্ড, তার পরই রত্নাদি তক্তপোশ থেকে প্রায় লাফ দিয়ে নেমে দাঁড়াল মেঝেতে। সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় মেঝের কোণের দিকে ছেড়ে রাখা শাড়িটা ঝটপট কুড়িয়ে নিতে গিয়ে ধপাস করে পড়ল মেঝেয়। উঠে দাঁড়িয়ে কোনওমতে শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, সন্তুদা বলে উঠল, 'তোমার ব্লাউজ়'। পিছন ঘুরে দু-পা হেঁটে এসে রত্নাদি ব্লাউজ়টা নিল এক হাতে আর অন্য হাত দিয়ে ঠাস করে চড় কষিয়ে দিল সন্তুদার গালে।

ওই চড়টা বোধহয় রত্নাদি আমায় মারতে চেয়েছিল। পারেনি। তার কিছু দিনের মধ্যেই ও রেলে চাকরি করা একটা লোককে বিয়ে করে মুজফফরপুর চলে যায়। আমাদেরও নেমন্তন্ন ছিল সেই বিয়েতে। একদম সন্ধেবেলা বিয়ের লগ্ন ছিল, যখন ঢুকলাম তার একটু পরেই একটা অচেনা লোক সিঁথিতে সিঁদুর টেনে দিল রত্নাদির। সিঁদুর তো মাকে রোজ পরতে দেখতাম স্নানের পর, কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল এই সিঁদুর সেই সিঁদুর নয়। এটা একটা অন্য দাগ, যা আমি রত্নাদি ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার পর সন্তুদার ঘরের মেঝেয় দেখেছি।

'তোর জন্যেই আমার জীবন থেকে রত্না চলে গেল। তুই ও ভাবে দাঁড়িয়ে না থাকলে আমার সর্বনাশ হত না। আমি অভিশাপ দিলাম, কোনও দিন প্রেম আসবে না তোর জীবনে, এলেও থাকবে না। রত্নার এত চোখের জল মিথ্যা হবে না!' রত্নাদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার কয়েক দিনের মাথায় সন্তুদা রাস্তায় দেখা হতে, বলল আমাকে।

'কিন্তু রত্নাদি তো বিয়ের সময় হাসছিল। গীতা মাসিমা যখন বললেন যে রেলের অফিসারের সঙ্গে ঘুরবে, বেড়াবে, সুখে সংসার করবে, তখন আমি ওর মুখে হাসি দেখলাম।'

'ওটা পাঁজর ভাঙা হাসি, ওই হাসির মানে কান্না, তুই বুঝবি না। তুই ব্যাটা তেঁতুল, টকিয়ে দিস সমস্ত কিছু। বাঙালির প্রেমের কী বুঝিস তুই যে না বলে ঘরে ঢুকে গেলি?'

'বরাবর তো ওভাবেই...'

আমার উত্তর শেষ হওয়ার আগেই সন্তুদার স্কুটার চলতে শুরু করে দিয়েছিল, আমার কথা দিয়ে আর ওর নাগাল পাইনি।

তবে ওর কথাগুলো আমার ভিতরে থেকে গেছে। পুরুলিয়ার মাটির অনেক গভীরে যেমন জল সে ভাবেই হয়তো। নয়তো সেই খাটালে দুধ নিতে আসা মেয়েটি যখন এক-আধদিন জিজ্ঞেস করত 'কটা বাজে?' তখন সময় বলেই চুপ না করে গিয়ে কথা বাড়িয়ে নিয়ে যেতাম। কিন্তু ওই যে অভিশাপ! আশ্চর্যের ব্যাপার, রত্নাদির বিয়ের বছর ঘুরতেই সন্তুদা বিয়ে করে নিয়েছে, ঝালদা না রঘুনাথপুরের কোন মেয়েকে, ছেলে-মেয়েও হয়েছে শুনেছি। অথচ ওর অভিশাপ মাথায় নিয়ে ঘুরছি আমি। পরশু বিকেলে যে তোমার সঙ্গে আলাপ হবে, তা তো কল্পনাতেও ছিল না। কিন্তু যা হবার তা হয়ই। এ বার গতকাল রাতে তোমার থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তুমি যখন বললে যে, আমার মতো বাঙালি তুমি নাকি আর দেখোনি, তখন প্রথমে তো আনন্দ হয়েছিল খুব, কিন্তু তার পরই মনে হল, বাঙালিয়ানার আমি কি বুঝি? তাই ভাবলাম তোমাকে এই চিঠিটা লিখি। আমি কিন্তু বাঙালি হয়েও বাঙালি নই মালবিকা। কে জানে, হয়তো আমি তেঁতুলই..."

সৈকতেশের ড্রয়ার থেকে এই না-পাঠানো চিঠিটা পাওয়া গিয়েছিল, অপারেশনের আগে ওর চেকবই খোঁজার সময়। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা, আগে আপনাদের জানা দরকার মালবিকার সঙ্গে ওর পরিচয় হল কী ভাবে।

একটু লম্বা গল্প, কিন্তু আমাদের এই আখ্যানের জন্য ভীষণ জরুরি। তাই দেরি না করে শুরু করে দেওয়া যাক...

সৈকতেশ তো আর মহামানব নয়। কিন্তু ওর ভিতরে ছিল এক আকাঁড়া আবেগ আর তলিয়ে যদি ভাবেন, তবে এই আবেগটাই স্বাধীনতা। না হলে বিশ্বের সর্বত্র, যে-কোনও বিদেশি শাসনে কিছু মানুষ কেন কমবেশি শান্তির জীবন যাপন করে, আর কয়েক জনের কেন মনে হয় যে এই নাগপাশ থেকে মুক্তি না পেলে আর শ্বাস নেওয়াই সম্ভবপর নয়?

সেই আবেগের জায়গা থেকেই এক রাতে আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সৈকতেশ, না হলে ও যে প্রশিক্ষণ নিতে

গিয়েছিল তাতে ভিসার মেয়াদ চেষ্টাচরিত্র করলে বাড়িয়ে নেওয়া যেত। সেই সময়টা আশির দশকের মাঝামাঝি, আমেরিকা তখন আরও বেশি করে তৃতীয় বিশ্বের যাবতীয় মেধা গিলে খেতে চাইছে, তাই ক্লাসে কাউকে ভাল করতে দেখলে তার কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া হত যে, চাইলে আমেরিকার দরজা তোমার জন্যেও খোলা। সেই রকম ইঙ্গিত সৈকতেশও পেয়েছিল, ও বুঝতে পেরেছিল এই ধনকুবের রাষ্ট্রের যাবতীয় রাগ রোজ়ালিয়ার মতো খেটে খেতে আসা ভিনদেশি শ্রমিকদের উপর। অক্টোপাস আকৃতির সিস্টেমটাকে যারা আরও প্রসারিত হতে সাহায্য করবে, তাদের জন্য লাল কার্পেট পাতাই আছে।

দেশে ফেরার প্লেনে বসে সৈকতেশের প্রবল বাসনা হচ্ছিল ফিরে গিয়ে কতক্ষণে প্রশান্ত সারেঙ্গির দোকানে বসে সেই অবিস্মরণীয় ফিশফ্রাইয়ের স্বাদ নেবে আরও এক বার। কিন্তু খোঁপা খুলে যাওয়া অবস্থায় একটি মেয়ে তার চুলের ঢাল সামলাতে সামলাতে চিৎকার করছে যে, সে দরকার হলে দোকানের তাক খালি করে, বন্ধ করে দেবে স্টল তবু চাপের কাছে নতিস্বীকার করবে না, এমন একটি দৃশ্যের সামনে পড়ে গিয়ে সৈকতেশের মনে হল যে, তারও ওই দোকানের কার্পেটে পা রেখে দাঁড়ানো উচিত। ব্যাপারটা কী ঘটছে জানা দরকার।

"আচ্ছা, ওই রকম ঝামেলায় যদি একটা মেয়ে না হয়ে ছেলে পড়ত, তবে কি একই ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে তুমি?" সৈকতেশকে পরে জিজ্ঞেস করেছিল মালবিকা।

"যারা দেশকে মা বানিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তারা দেশকে বাবা বানিয়ে একই কাজটা করল না কেন?" সৈকতেশ জবাব দিয়েছিল।

কিন্তু সে দিনের বিকেলটা সওয়াল-জবাবের ছিল না। বরং খুব ক্লান্ত লাগছিল সৈকতেশের। নিজের পরিচয়ের সঙ্গে পদবির, স্বপ্নের সঙ্গে সামর্থ্যের, বাসনার সঙ্গে বাস্তবের এত দুস্তর ফারাক হতে পারে, ও কল্পনা করেনি কখনও। আমেরিকার কাজের পরিবেশ মুহূর্তের জন্য হাতছানি দিয়ে গেল ওকে, কিন্তু ও তাতে এতটুকু লজ্জিত বোধ করল না। ওই একটা বেলায় ওর অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে যে কাজ করবার ব্রত নিলেই চলে না, কাজের পরিবেশ থাকা চাই। ভারতে সেই পরিবেশ খোঁজা কি খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার সমতুল হয়ে দাঁড়াল? প্রশ্নটা চাপা দিতে পারছিল না আবার প্রশ্নটার সম্ভাব্য উত্তরের মধ্যে যে বিপুল হতাশা, তাকে গ্রহণ করতেও পারছিল না।

কলকাতায় ফিরে একটা জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে গিয়েই ভাল লাগেনি আর একটায় তিন মাস কাজ করেই বুঝে গিয়েছিল যে, এরা কাজের লোক অপছন্দ করে। তৃতীয় একটা জায়গা মন্দের ভাল, সেখানেই মানিয়ে নিয়ে ছিল প্রায় বছর দুই, কিন্তু যা শিখেছে তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জেদ, সৈকতেশকে তাড়িয়ে ফিরছিল। সেই জেদ থেকেই দিল্লির ট্রেনে চেপে বসে ও, একটি নামী প্রতিষ্ঠানে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য। সৈকতেশের মনে হচ্ছিল যে, ওখানে যোগ দিলে সুযোগ পাবে নিজের দক্ষতা প্রমাণের।

ইন্টারভিউ চমৎকার হল। বাইরে বেরিয়ে ভেন্ডিং মেশিন থেকে একটা কফি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছে, পিঠে টোকা পড়ল।

টোকা যে দিল সে নিজের পরিচয় দিল, মাথুর হিসেবে। তার পর গলা একটু নামিয়ে বলল, "মুথুরামন আলাদা করে কথা বলবে তোমার সঙ্গে।"

মুথুরামন ওই কোম্পানির এক জন হর্তাকর্তা এবং নির্বাচিত হলে সৈকতেশ যে প্রজেক্টে কাজ করবে, তার সম্পূর্ণ দায়িত্বে।

সৈকতেশ ঘরে ঢুকতেই মুথুরামন বলে উঠলেন, "কলকাতা থেকে যারা আসে তারা চা নেয়, তোমাকে কফি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি বুঝে গেলাম যে, তোমার তামিলিয়ান স্পিরিট একদম অটুট।"

"স্যর, আমার কফি খাওয়ার অভ্যেস আমেরিকায় গিয়ে। তা না হলে আপনি আমাকে বাঙালি বলেই ধরতে পারেন," সৈকতেশ, মুথুরামনের ইশারা অনুযায়ী ওর মস্ত বড় টেবিলের উল্টো দিকের চেয়ারে বসতে বসতে বলল।

"তোমার নাম, এস কৃষ্ণন, তোমাকে বাঙালি বলে ধরতে যাব কেন?" মুথুরামন চোখ নাচালেন।

"নামে কী আসে যায়? আমার ইতিহাস শুনলে আপনি বুঝবেন যে..."

"শোনো ছোকরা, আমরা এখানে ইতিহাস নিয়ে পড়ে থাকলে ইন্ডিয়া আবার স্টোন-এজে ফিরে যেত। ইতিহাস নিয়ে ভাবার সময় আমাদের নেই। আমরা শুধু ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি। আর আমাদের ফিউচার মানেই তোমারও ফিউচার।"

"আই আন্ডারস্ট্যান্ড স্যর," তেতো গলায় বলল সৈকতেশ।

"তুমি সেই জোকটা জানো তো? না জানলে শুনে নাও। এক বার তামিলনাড়ুর এক জন ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে গেছে দিল্লির এক ইঞ্জিনিয়ার। এ বার তামিলনাড়ুর ইঞ্জিনিয়ার, দিল্লির ইঞ্জিনিয়ারকে গাড়ি করে কাবেরী দেখাতে নিয়ে গিয়ে একটা ব্রিজ দেখিয়ে বলল, 'নদী আর নদীর উপর ব্রিজটা দেখলেন তো স্যর? পুরো প্রজেক্ট থেকে আমাদের ফিফটি পারসেন্ট থাকে।' এর পর তামিলনাড়ুর ইঞ্জিনিয়ার দিল্লিতে গেলে সেই একই কায়দায় তাকে গাড়ি করে যমুনার সামনে নিয়ে যায় দিল্লির ইঞ্জিনিয়ার। নদী দেখিয়ে বলে, 'নদী দেখলেও উপরে ব্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন না তো? পাবেন কী করে? এই প্রজেক্ট থেকে আমাদের হান্ড্রেড পারসেন্টই থাকে।' মুথুরামন বিকট জোরে হেসে উঠলেন।"

ইন্টারভিউয়ের পর চনমনে হয়ে ওঠা মনটা নুইয়ে পড়েছিল সেই মুহূর্তেই, কারণ বোঝা গিয়েছিল যে ইন্টারভিউ নয়, স্পেশ্যাল ইন্টারভিউই ঠিক করে দেবে চাকরি হবে কি না। আর চাকরি হলেও ওই ফিফটি পারসেন্ট আর হান্ড্রেড পারসেন্টের হিসেব মাথায় রেখে কাজ করতে হবে।

'দেশের নয়, জনসাধারণেরও নয়, ব্যক্তির খিদমত খাটতে পারবে তুমি?' সৈকতেশের মন ওকে জিজ্ঞেস করল।

'আর সবাই যদি পারে তবে আমাকেও পারতে হবে। আমি একাই তো দেশের হয়ে লড়ার গুরুদায়িত্ব নিয়ে আসিনি,' সৈকতেশ জবাব দিল ওর মনকে।

'সিসিএফসি মাঠের সেই খেলোয়াড়টা কোথায় গেল?'

'মারা গেছে। দীপকদার মেয়ের সঙ্গেই।'

'নাকি বিক্রি হয়ে গেছে?' মন প্রশ্ন করা থামাল না।

"কিছু বিক্রি করা মানে, কারও একটা মন জিতে নেওয়া। যে তোমার প্রোডাক্ট কিনছে, তোমার তৈরি জিনিস তার মন জিতে নিতে পেরেছে বলেই সে পয়সা খরচ করছে তার উপর," আমেরিকার ক্লাসে শুনেছিল সৈকতেশ।

পরে অনেক ভেবেছে এই নিয়ে। আর্কিটেকচারাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ওর কি তবে কাজ শুধু এমন ডিজ়াইন তৈরি, যা একটা বাড়ি বা স্থাপত্যের দিকে আকৃষ্ট করবে লোকজনকে? ক্রেতাকে টেনে আনবে বিক্রেতার দিকে?

"সে দিক থেকে দেখতে গেলে সব শিল্পীর ওটাই কাজ। বালুচরীর জমিতে যে শিল্পী রাধাকৃষ্ণের প্রেম ফুটিয়ে তোলে, তার তৈরি শিল্পটা দোকানের দরজার সামনে এমন ভাবে ঝোলানো হয় যাতে বাইরে থেকে দেখে একটা লোক ভিতরে ঢুকে আসে। গায়কের গানের ক্যাসেট যে-কোম্পানি বের করে সে তো এই আশা নিয়েই করে যে, পাবলিক হটকেকের মতো ক্যাসেটটা কিনে নেবে," মালবিকা প্রশ্নটা শুনে বলেছিল।

"আমাদের মতো লোকেরা তবে, 'যে জন আছে মাঝখানে' হয়ে বেঁচে থাকতেই বাধ্য?" সৈকতেশের গলায় কী যেন পাকিয়ে উঠেছিল।

"বাধ্য কেন বলছ? এটা তো আমাদের সৌভাগ্য। আমার বুকের মাঝখানে তুমি, তোমার বুকের মাঝখানে আমি। আচ্ছা, সত্যি করে আমিই ওখানে আছি তো, না অন্য কেউ?" বলতে বলতে মালবিকা এগিয়ে এসেছিল, অসম্ভব দ্রুততায় শার্টের দুটো বোতাম খুলে ফেলে, মুখ ঘষতে শুরু করেছিল সৈকতেশের বুকে।

সে অবশ্য, সময় গড়িয়ে যাওয়ার পর। প্রথম পরিচয়ের দিন,

মাঝখানে নয়, খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে ছিল মালবিকা। সুন্দরী বলা যায় এমন কোনও মেয়েকে বিপন্ন অবস্থায় দেখলে খুশি হয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে যায় অনেক পুরুষই, কিন্তু সৈকতেশ নিজেই তখন ডুবছে। মুথুরামনের চেম্বার থেকে বেরিয়ে ও টের পায় যে ওর খিদে পেয়েছে। মুথুরামন ওকে এক সঙ্গে লাঞ্চ করার কথা বলেছিল, কিন্তু একে তো চোরের স্যাঙাত হবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে না-থাকা আর দ্বিতীয়ত দুপুরবেলা ইডলি-দোসা-উপমার কথা ভাবতেও না চাওয়া, ওকে ঠেলে দিয়েছিল পথে। পুজো আসছে এমন সময়ে কলকাতার জলহাওয়া যেমন থাকে, দিল্লির তেমন নয়। তবে পুরুলিয়ার অভিজ্ঞতা ছিল বলেই ঠা ঠা রোদে পথ হাঁটতেও তত অসুবিধে হত না সৈকতেশের। একে-ওকে জিজ্ঞেস করছিল বাঙালি হোটেল ধারেকাছে কিছু আছে কি না। একটা অটো বলল, চেপে বসলে নিয়ে যেতে পারে। সেই অটোতে চেপে প্রায় দুই কিলোমিটার চলে এসে দেখা গেল বাঙালি হোটেলটা বন্ধ হয়ে গেছে।

'যে দিন কপাল মন্দ/ সে দিন ফুলেও গুয়ের গন্ধ'— ছোটবেলায় কথাটা খুব শুনত ওদের স্কুলের ক্লার্ক রমেনদার মুখে। চড়া রোদে খামোখা ঘুরিয়ে মারা অটোওয়ালাকে টাকা মেটানোর সময় মনে পড়ে গেল প্রবাদটা।

তবে কপাল সত্যিই মন্দ হলে কি একটা ধাবায় তড়কা-রুটি খেয়ে উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে হাঁটতে পিতমপুরার রামলীলা ময়দানে ঢুকে পড়ত সৈকতেশ? সেখানে তখন বিরাট মেলা চলছে, নবরাত্রি আসার আগের সময়টায় দিল্লির অনেক জায়গাতেই যেমন চলে। তাতে নাগরদোলা, মেরি-গো-রাউন্ডের পাশাপাশি গরম জলেবি কিংবা ছোলে-বাটুরে খাওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু মেলার মূল আকর্ষণ বিরাট সংখ্যায় শাড়ি আর অন্যান্য ড্রেস-মেটেরিয়ালের দোকান। মেয়ে চলে যাওয়ার পর থেকে পুজোয় দীপকদার বৌকে যে-শাড়িটা দেয়, সেটা এখান থেকেই কিনবে কি না ভাবছে, এমন সময় সৈকতেশের কানে এক মহিলাকণ্ঠের চিৎকার আসে। কোত্থেকে আসছে দেখতে গিয়েই মালবিকার চোখে চোখ পড়ে ওর।

'বঙ্গজ' বলে খুব চালু একটি আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল, অধুনা প্রায় লুপ্তই বলা যায়। সেই 'বঙ্গজ' মূলত ধনেখালি আর ফুলিয়ার তাঁতের শাড়ি বিক্রি করত। তার পাশাপাশি রেশমের শাড়ি কিংবা আদ্দির পাঞ্জাবি অথবা মিহি সুতোর ধুতিও তাদের বিক্রির তালিকায় থাকত। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি ছিল ওই ধনেখালি আর ফুলিয়ার শাড়ির জন্যই। ভারতের বড় বড় শহরে বিশেষ করে দিল্লিতে যে এগজ়িবিশনগুলো হত তাতে অংশ নিতে যেত 'বঙ্গজ'। সে বারও গিয়েছিল, কিন্তু কোনও একটা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছিল বলে প্রগতি ময়দানের বদলে পিতমপুরায় ঠেলে দেওয়া হয়েছিল ওই বস্ত্রমেলা। আর তাতেই যত বিপত্তি।

অফিসের বড় কেউ না আসায় দিল্লিতে জুনিয়র অফিসার মালবিকাই সর্বময় দায়িত্বে ছিল। এ বার প্রগতি ময়দানের মতো পাকা স্টল না হওয়ায় পিতমপুরায় জিনিসপত্র সামলে রাখার চ্যালেঞ্জ ছিল অনেক বেশি। মেলা শেষ হওয়ার আগের দিন দুপুরে মাঠে আসতেই অধস্তন দু'-তিন জন মালবিকাকে বলতে থাকে যে, স্টল লাগোয়া গুদামের উপরের টিন ফুটো করে অনেক শাড়ি হাপিস হয়ে গেছে, ও যেন একটুও সময় নষ্ট না করে অবিলম্বে থানায় চলে যায় রিপোর্ট লেখাতে। বলবার সময় ওদের তাড়াহুড়ো এবং বাইরে থেকে গুদামের অবস্থা দেখে মালবিকা বুঝে যায় যে হাপিস তেমন কিছু হয়নি। কেউ এক জন আট-দশটা ঢিল মেরে টিনের চালে সামান্য ফুটো করিয়েছে একটা। কত শাড়ি লুঠ হওয়া সম্ভব তার মধ্যে দিয়ে? সেই সময়ই বয়স্ক এক কর্মচারী ইশারায় ওকে জানিয়ে দেয়, মালবিকা যে মুহূর্তে ডায়েরি করতে থানায় যাবে তখনই শুরু হয়ে যাবে খেলা। চুরি যে হয়েছে, এটা যদি স্টলের ইন-চার্জ মেনে নিয়ে থাকে, তা হলে একটার বদলে একশোটা শাড়ি হাওয়া হয়ে গেলেই বা অসুবিধে কোথায়?

ছকটা ধরে ফেলে মালবিকা জেদ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, বলতে থাকে যে ও গুদামের তালা খুলে গুনে দেখবে ক'টা শাড়ি লুঠ হয়েছে, তার পর থানায় যাবে প্রয়োজনে। যারা প্ল্যান করেছিল, মালবিকা পিতমপুরার মাঠ থেকে বেরোলেই কাঁড়ি কাঁড়ি শাড়ি পাচার করে দেবে স্থানীয় দালালদের মাধ্যমে, তারা অপরিসীম ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ করতে থাকে ওর এই সিদ্ধান্তের। আর সংঘাত যখন চরমে তখনই সৈকতেশের অকুস্থলে আবির্ভাব।

পুরো ব্যাপারটা বুঝে নিতে ওর মিনিট পাঁচেক লেগেছিল, তার পরই মালবিকা এবং মালবিকার সঙ্গে ঝগড়া করতে থাকা লোকগুলোর মাঝখানে গিয়ে সৈকতেশ নিদান দেয়, "আমার কাছে ভিডিয়ো ক্যামেরা আছে। ম্যাডাম বললে আমি গুদামের তালা খোলা থেকে বন্ধ করা পর্যন্ত পুরো সময়টা রেকর্ড করে রাখতে পারি। তাতে সংশয়েরও কোনও জায়গা থাকবে না আর ভবিষ্যতে তদন্তেরও সুবিধে হবে।"

মালবিকার হাতে চাঁদ পাওয়ার অবস্থা হয় কথাটা শুনে। ও বলে ওঠে, "এখনই ক্যামেরা চালু করুন।"

সৈকতেশের কাছে ভিডিয়ো ক্যামেরা নয়, একটি অতি সাধারণ স্টিল ক্যামেরা ছিল। কিন্তু কথাটা শুনেই মালবিকাকে থানায় যাওয়ার জন্য জোর করতে থাকা লোকগুলো কী রকম চুপসে গেল। স্টলের লাগোয়া গুদামের দরজা খুলে লিস্ট মিলিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা গেল, একটিমাত্র শাড়ির খোঁজ মিলছে না।

"একটা ধনেখালি মিসিং। সম্ভবত ওই চাল যে ফুটো করিয়েছে, সে কোনও আঁকশি-ফাকশি দিয়ে তুলে নিয়েছে। বাদবাকি সব শাড়ি যেমন ছিল তেমনই আছে। সেটা এ বার এই নতুন লিস্টে লিখব আমি আর আপনারা প্রত্যেকে তার তলায় সই করবেন। তার পর, একটা শাড়ি যে খোয়া গিয়েছে আমি সেটা ডায়েরি করতে যাব। আর আমি যত ক্ষণ না ফিরি, আপনি কাইন্ডলি থাকতে পারবেন এখানে?" মালবিকা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল, সৈকতেশের দিকে।

আর যে কারও মতোই সৈকতেশও হয়তো খুশি হত অফিসার ভদ্রমহিলা ওকে নিয়েই থানায় গেলে। অ্যাডভেঞ্চারে থ্রিলের স্পর্শ লাগত তবে। কিন্তু ওই পেয়াদার মতো স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, কাঁহাতক ভাল লাগে? ঘণ্টাখানেক পরে তাই স্টল ছেড়ে বেরিয়ে গেল সৈকতেশ আর চিত্তরঞ্জন পার্কের কাছাকাছি যে-হোটেলটায় উঠেছিল সেখানে যাওয়ার বাস খুঁজতে শুরু করল রাস্তার মোড়ে এসে।

রাতে ঘুম আসছিল না এ পাশ ও পাশ করেও। বন্ধ চোখের সামনে আচমকাই ভেসে উঠল একটি মুখ। খুলে যাওয়া চুল টেনে বেঁধে নেওয়ায় সামান্য চওড়া কপাল, টিকলো নাক আর হাসলে অদ্ভুত একটা টোল পড়ে বাঁ-গালে। কিন্তু অত ঝামেলার মধ্যে মেয়েটি হাসল কখন? আর তার চাইতেও জরুরি প্রশ্ন, মেয়েটির নাম কী।

নাম জিজ্ঞেস করবার জন্যই পর দিন দেড় ঘণ্টা উজিয়ে আবার বঙ্গজ-র স্টলে গেল সৈকতেশ। আর যাকে দেখতে যাওয়া সে ওকে দেখেই ঝাঁঝিয়ে উঠল।

"আপনি কাল না বলে চলে গেলেন কেন? থানা থেকে ফিরে এসে কত খুঁজলাম আপনাকে।"

"কেন, টিনের চাল আবারও ফুটো করে আরও শাড়ি চুরি করে নিয়ে গেছে কেউ?"

"তার জন্য খুঁজছিলাম না। আপনার নামটা অবধি জানা হয়নি তাই..."

"আমিও তো আপনার নাম জানব বলেই আজ ফের উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে এলাম। না হলে চিত্তরঞ্জন পার্ক থেকে এই পিতমপুরা কি কম দূর?"

"আপনি চিত্তরঞ্জন পার্কের কোথায় আছেন? সি আর পার্কের কালীবাড়ির খুব কাছেই আমার মাসির বাড়ি। এ বার এত ঝামেলায় ছিলাম যে যাওয়াই হল না। কাল ডেফিনিটলি এক বার যাব, আপনি থাকবেন তো?"

"আমি ব্যাগ নিয়েই বেরিয়েছি। আজ রাতেই আমার কলকাতা ফেরার ট্রেন।"

"কাল আমার, আই মিন আমাদের সঙ্গেই ফিরুন না। কিসের এত তাড়া আপনার? বাই দ্য ওয়ে আমার নাম মালবিকা মজুমদার। আপনি?"

সৈকতেশ উত্তর দেওয়ার আগেই স্টলের ভিতরে এক ভদ্রমহিলার হাত থেকে দিল্লির ওই বড় চায়ের ভাঁড় স্লিপ করে যায়। অন্তত দু'-তিনটে শাড়ি নষ্ট হয়ে যেত যদি না রিফ্লেক্সে হাত বাড়িয়ে দিত সৈকতেশ। কিন্তু শাড়িগুলো বাঁচলেও ওর দু'হাতের তালুই প্রায় পুড়ে যায় ব্যাপারটায়।

ভদ্রমহিলা একটা ঝুটো 'সরি' বলেন শুধু। মালবিকা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সৈকতেশকে বলে, "আপনি আর কত ভাবে বাঁচাবেন বলুন তো আমায়? আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে জানাতে তো শেষ হয়ে যাব দেখছি।"

"কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে একটু জল যদি ঢালতেন হাতে, ভাল হত খুব!" সৈকতেশ কাতর চোখে তাকায় ওর দিকে।

মালবিকা স্টলের ভিতরে থাকা একটা ভর্তি জলের বোতল নিয়ে সৈকতেশকে স্টলের বাইরে নিয়ে গিয়ে ওর দু'হাতের উপর ঢেলে দেয়। তাও বেশ লাল হয়ে থাকে জায়গাটা, যেন ফোসকা পড়বে এখনই।

"এত তো জল ঢাললাম কিন্তু এফেক্ট কিছু হবে কি? আচ্ছা, এক মিনিট, আপনি তো প্যাক করেই বেরিয়েছেন, টুথপেস্ট নেই আপনার সঙ্গে?"

"টুথপেস্ট দিয়ে কী হবে?"

"সব কিছুতে প্রশ্ন না করে বের করুন এক্ষুনি পেস্টের টিউবটা।"

সৈকতেশ পিঠের ব্যাগ হাতড়ে টিউবটা বের করতেই টিপে টিপে প্রায় পুরোটা বাইরে এনে ওর দু'হাতের তালুতে লাগিয়ে দিয়ে মালবিকা বলে, "ভয় নেই, আর ফোসকা পড়বে না।"

সে দিন কে জানে কেন, মেলা শেষ হওয়া অবধি ওই পিতমপুরার রামলীলা ময়দানেই রয়ে গেল সৈকতেশ। এমনিও স্টেশনে গিয়েই টিকিট কাটত, আসার সময় যেমন অসংরক্ষিত একটা জেনারেল কামরায় উঠে পড়েছিল, সে রকমই কোনও কামরায় উঠে পড়ত ফেরার সময়ও। শোয়ার জায়গা ঠিক পেয়ে যেত আর না পেলেও বসে ঘুমোনো অভ্যেস আছে ওর।

"আমি আপনাকে অত কষ্ট করে ফিরতে দেব না। আমার সঙ্গেই ফিরবেন। একটা টিকিট ট্রেনে উঠে ব্যবস্থা করে নেওয়া যাবে।"

"কিন্তু খামোখা এসি টু টায়ারের টিকিট কাটবেন কেন?"

"এই সুযোগে আপনার নামটা তো জানা যাবে!" মালবিকা হেসে উঠল।

সৈকতেশ লজ্জা পেয়ে নাম বলল নিজের, কিন্তু কোনও এক অজানা সঙ্কোচে পদবিটা উচ্চারণ করতে পারল না। একটু চুপ করে থেকে বলল, "কোনও দরকার ছিল না কিন্তু।"

"আপনার কি দরকার ছিল অবলা এক জন নারীর পাশে দাঁড়ানোর?" মাধুর্যের সঙ্গে ঠাট্টা মিশিয়ে বলল মালবিকা।

"আমি আপনার পাশে দাঁড়াতে যাইনি।"

"তবে?" ভুরু নাচাল মালবিকা।

"বাংলার সেই প্রত্যন্ত গ্রামের কারিগরের পাশে দাঁড়াতে গিয়েছিলাম, ঘরের মাকুটার মতোই যে লোকটা সারাদিন ছুটে মরছে, একটু চালের আশায়। 'বঙ্গজ' যদি বেঁচে থাকে, তা হলে ও নিজের তৈরি শাড়ির ন্যায্য দাম পাবে, মহাজনের থেকে টাকা ধার করে সুতো কিনে তৈরি করে শাড়িটা আবার মহাজনকেই বেচার বাধ্যবাধকতায় থাকবে না অন্তত। সেই লোকটা, সেই লোকগুলো, নদিয়ার হোক, হুগলির হোক, বাঁকুড়ার হোক, আমারই সহনাগরিক।"

"আর আমার সহকর্মীদের মধ্যে তো এমনও লোক আছে যারা বঙ্গজ-য় চাকরি করে তার মাল সরিয়ে কালোবাজারে পাচারে করে দিতে চাইছে! আমার ক্ষমতা থাকলে রাস্তায় চাবুকপেটা করতাম, কিন্তু এখন ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁত কেলিয়ে হাসা ছাড়া আর কী করতে পারি বলবেন আমায়?" অফিসের গাড়িতে করে সৈকতেশকে সি আর পার্কের মুখে নামিয়ে দেওয়ার সময় বলল মালবিকা।

"এই সমস্যাটা শুধু আপনার সংস্থার নয়, চতুর্দিকে। যে মাটি আমায় খাইয়ে রেখেছে আমি সেই মাটিটাকেই অ্যাসিড ঢেলে পুড়িয়ে দিতে চাই।"

"আপনি তো চান না। অবশ্য আপনি ব্যতিক্রম," সৈকতেশের সঙ্গে মালবিকা নিজেও নেমে দাঁড়াল গাড়ি থেকে।

"আমি ব্যতিক্রমী নই, হওয়ার সাধ্যও নেই। কিন্তু ছোটবেলায় আমার বাবা মাঝে মাঝেই আমায় একটা নার্সারিতে নিয়ে গিয়ে হাতেকলমে কাজ করাতেন। বলতেন যে, আমি কোদাল কেমন চালাতে পারি তার উপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।"

"দিনমজুর বানানোর প্ল্যান ছিল নাকি?" মালবিকা হেসে ফেলল।

"হাসবেন না। ফুল আমি ফোটাতে পারিনি হয়তো, কিন্তু ব্যাটসম্যান হিসেবে আমার যেটুকু নাম হয়েছিল কলকাতা ময়দানে, তা ওই ছোটবেলায় কোদাল চালানোর জন্যই। না হলে থার্ডম্যানের মাথার উপর দিয়ে মারতে গেলে স্লিপে ক্যাচ হয়ে যেত। আর অফসাইডের বল পুল করে স্কোয়্যার লেগের উপর দিয়ে ছক্কা মারা, জীবনে হত না।"

"আপনি ক্রিকেটারও? ব্যাটিং করে দেখান আমায়।"

"আজ এই রাতে, এখানে কীভাবে দেখাব?"

"তাও তো ঠিক। তা ছাড়া আজ তো আবার আমার জন্যই হাত পুড়ে গেছে।"

"আপনার জন্য একেবারেই পোড়েনি। কোনও গুজরাতি মহিলা ভাঁড় উল্টে দিলে আপনি কী করবেন?"

"গুজরাতি কি না আপনি জানলেন কী করে?"

"ওই কেলোর কীর্তিটি ঘটিয়ে উনি হাসিমুখে অল্প একটু সময় দাঁড়িয়ে ছিলেন আমার সামনে। তখনই বাইরে থেকে দু'জন, 'মিসেস পারেখ' বলে ডাকল আর শুনেই বেরিয়ে গেলেন।"

"'পারেখ'রা গুজরাতি হয় বুঝি? আমি নন-বেঙ্গলিদের পদবি শুনে বুঝতে পারি না, কে কোথাকার। সাউথ ইন্ডিয়ান হলে বোঝা যায় তাও। আমাদের পাড়ায় একঘর ছিল। বড়ভাইয়ের নাম, আন্নামালাই। ছোট দুই ভাইয়ের নাম জানতাম না বলে আমি বলতাম, আন্নামালাই, কান্নামালাই, রসমালাই!" মালবিকা হেসে উঠল।

সৈকতেশ গম্ভীর হয়ে গেল, "দক্ষিণ ভারতীয় হলেই ও রকম নাম হয় না।"

"সে হয় কি হয় না আমি জানি না আর ওই নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছেও করছে না। আপনি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন বরং। কোদাল চালিয়ে আপনার হাতে তো অনেক জোর, আমাকে একটা ফুল ফুটিয়ে দেবেন?"

"কী করবেন ফুল দিয়ে?"

"বাজারে বেচতে নিয়ে যাব না নিশ্চয়ই। খোঁপায় গুঁজে রাখব মশাই। দেবেন?"

"সেই ক্ষমতাও কি আর আছে ম্যাডাম?"

"নেই? তা হলে বাঁশি বাজিয়ে শোনাতে পারবেন কৃষ্ণের মতো? যমুনা তো এখান থেকে খুব দূরে নয়।"

"আমি বাঁশি-টাশির থেকে অনেক দূরে।"

"তবে আপনি কী দেবেন আমায়?"

"ওই যে আইসক্রিমের গাড়ি ঠেলে ঘরে ফিরছে ছেলেটা, ওর থেকে একটা আইসক্রিম এনে দিতে পারি। চলবে?"

"চলবে মানে? দৌড়বে! উফ, আপনি কী করে বুঝলেন, ফুল কিংবা বাঁশির থেকে আইসক্রিম আমার অনেক বেশি প্রিয়?"

"আন্দাজে ঢিল মারলাম।"

"ওই শাড়িচোরদের মতো?" মালবিকা বলে উঠল।

দু'জনেই হেসে উঠল প্রশ্নটার উত্তরে।

হাসতে হাসতেই মালবিকা বলল, "আমার ভাগ্য খুব ভাল যে, আজ আপনি আপনার নাম বলার জন্য ফিরে এলেন আবার। আমি আপনার মতো..."

"প্রশংসা পরে শুনব। আগে আইসক্রিমটা নিয়ে আসি।"

শুধু আইসক্রিম নেওয়ার জন্য নয়, সৈকতেশ মালবিকার সামনে থেকে দ্রুত সরে গিয়েছিল যাতে মালবিকা ওর চোখ দেখে পড়ে ফেলতে না পারে, ও সত্যিই কেন ফিরে এসেছিল।

যে সস্তার হোটেলটায় একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকছিল দিল্লিতে,

সে দিন রাতে ফিরে সেখানে আর নতুন করে ঘর পায়নি। অল্প একটু টাকার বিনিময়ে ছাদের একটা অপরিষ্কার ঘরে শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল হোটেলের ম্যানেজার। শেষরাতে বৃষ্টি নামায় ছাঁট আসতে শুরু করে ভাঙা দরজা সম্বল সেই ঘরটায়। ঘুম ভেঙে যেতে, উঠে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সৈকতেশের মনে হচ্ছিল ও যেন রাজা পঞ্চম জর্জ, যার অভ্যর্থনার জন্য বৃষ্টির ব্যবস্থা করেছে দিল্লির জলবায়ুর দেবতা। খুবই সুন্দর ব্যবস্থা কিন্তু এমন ধারালো পিনের মতো ফুটছিল গায়ে যে, সরে যাওয়ার জায়গা না থাকলেও সরে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল সৈকতেশ।

পরদিন রাতের ট্রেনে মুখোমুখি সিটে বসেও কোথাও সরে যাওয়ার উপায় ছিল না। তাই মালবিকা যখন জিজ্ঞেস করল সৈকতেশের পেশা কী, ওকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেই হল যে ও এক জন আর্কিটেকচারাল ইঞ্জিনিয়ার।

কানপুর সেন্ট্রালে ট্রেন বেশ খানিক ক্ষণ দাঁড়াবে জেনে ট্রেন থেকে নেমে খবরের কাগজের স্টল অবধি গেছে, হঠাৎ কানের কাছে মালবিকার নিঃশ্বাস টের পেয়ে চমকে পিছু ফিরল সৈকতেশ।

“আমিও খুব ভেঙেচুরে আছি ইঞ্জিনিয়ার। আমাকে নতুন করে গড়ে নেওয়া সম্ভব কি না বলতে পারবেন?” মালবিকা ওর চোখে চোখ রেখে জানতে চাইল।

লটবহর সমেত একটা ভিড় ওদের প্রায় গায়ের উপর এসে পড়ায় প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার হাত থেকে তখনকার মতো বেঁচে গিয়েছিল সৈকতেশ। কিন্তু ট্রেনে ফিরে আসার পর বুঝতে পেরেছিল যে প্রশ্নটা মালবিকার মুখে জেগে আছে।

হানিমুনে গিয়ে নতুন বর আর নতুন বৌ নিজেদের শরীরের সীমারেখা ভুলে গিয়ে একে অন্যের শরীরকে নিজের বলে ভাবতে শুরু করে, সৈকতেশ একটি হলিউডি সিনেমার সংলাপে শুনেছিল। সে ভাবেই ওর অধিকার আর অনুভূতির সীমারেখা মুছে যাচ্ছিল। ও বলতে চাইছিল যে প্রথম দেখার মুহূর্তেই নিজের মন ওই একঢাল চুলে লুকিয়ে রেখে এসেছে, যেভাবে শমীবৃক্ষে অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিল পাণ্ডবরা। কিন্তু এখন আবার সেই মনের খাজনা দাবি করার মতো সাহস ওর নেই।

সাইড বার্থের দু’জন ভদ্রলোক জাপানের কর্মসংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। জাপানের এক দোকানের সেল্‌সগার্ল নাকি ফোনে, প্রোডাক্ট কেমন কাজ করছে জানতে গিয়ে জানতে পারে যে ওদের নতুন কাস্টমার ভদ্রমহিলা অসুস্থ এবং একা। জানার পর সে দিন বিকেলেই ওই কাস্টমারের কাছে আপেল, কমলালেবু ইত্যাদি নিয়ে পৌঁছে যায় সেই সেল্‌সগার্ল।

“আমি যে শোরুমগুলোর চার্জে সেখানে ওই শাড়ি নামানোর আগে, ‘দাম বলুন, ডিজ়াইন বলুন, রং বলুন’ কালচার দূর করতেই অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। আসলে যে-মুহূর্তে সরকারি বা আধা-সরকারি দোকানের কর্মচারী হয়ে যায়, তখনই তো আর সে সেল্‌সগার্ল বা সেল্‌সম্যান থাকে না আমাদের দেশে। জয়পুরের মহারানি কিংবা মাইহারের মহারাজা হয়ে যায়। আমি এক বার সদ্য চাকরি পাওয়া তিন-চারটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে গড়িয়াহাট, হাতিবাগানের কয়েকটা দোকান ভিজিট করেছিলাম। ওদের দূর থেকে দেখতে বলেছিলাম যে, কী ভাবে গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করছে ওই দোকানের কাউন্টারে দাঁড়ানো লোকগুলো, যারা জানে যে পরপর সাত দিন শাড়ি বিক্রি করতে না পারলে আট দিনের দিন চাকরিটা আর থাকবে না।”

“সাত দিন বাড়িয়ে বললেন। ওটা তিন বা চার হবে বেশি হলে,” সৈকতেশ বিষণ্ণ গলায় বলল।

“ইউ আর রাইট। কিন্তু কী উপায় বলুন তো? নিরাপত্তা যদি পারফরম্যান্সের শত্রু হয়, তা হলে তো কারও চাকরি পাকা করা যাবে না এখানে।”

“যাবে। যদি তার ভিতরে এই বোধ জাগ্রত করা যায় যে ওই দোকানে সে কাজ করে না, দোকানটা তার নিজের।”

“সম্ভব সেটা কখনও? সে তো কাজে আসছে ছুটি কম কেন ভাবতে ভাবতে আর কাজ থেকে ফিরছে, ডি এ কম কেন বলতে বলতে।”

“সমস্যার মূল ওটাই, কর্মচারী ভাবছে নিজেকে। অংশীদার ভাবলে জান লড়িয়ে দিত।”

সৈকতেশের কথা শুনতে শুনতেই সিটের উপর কাগজ বিছিয়ে টিফিন-বাক্স খুলে ফেলেছিল মালবিকা। তরকারি ভর্তি রুটির রোল ওর দিকে এগিয়ে দিল একটা টিস্যু পেপার সমেত।

সৈকতেশ অপ্রস্তুত হল সামান্য, “আপনি খান। আমার খিদে নেই তত।”

“এই খাবারে আপনার অংশ নেই বলছেন?” জিজ্ঞেস করার সময় অপূর্ব এক টোল পড়ল মালবিকার গালে।

হাত বাড়িয়ে রুটির রোল নিতে নিতে সৈকতেশের মনে হল এই মেয়েটাকেই ও খুঁজছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মাথার ভিতর হস্টেলের ভোম্বলদা জাগ্রত হল। ভোম্বলদা বছরের পর বছর ড্রপ করত আর জুনিয়রদের ধরে ধরে সতর্ক করত প্রেমের ব্যাপারে। ভোম্বলদার বাণী ছিল যে, পুরো তদন্ত করে তার পর প্রেমের ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া উচিত কারণ অনেক মেয়েই নাকি, একই জমি তিন জনকে বিক্রি করা মালিকের মতো, দু’-তিন জনকে এক সঙ্গে মন দিয়ে রাখে।

“ওই অত সাবধানী হতে গিয়েই ভোম্বলদার প্রেম আর হল না!” গল্পটা সংক্ষেপে বলে সৈকতেশ শেষ কথাটা জুড়ে দিল।

মালবিকা খেতে খেতেই বলল, “আপনার হবে?”

একটা নুড়ি এমনি গায়ে লাগলে এক রকম, কিন্তু সেই নুড়িটাই যদি গুলতির ভিতর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে গায়ে এসে লাগে?

সৈকতেশ বোবা হয়ে গেল কিছু ক্ষণের জন্য। ওর মাথার মধ্যে পরস্পর সংযোগহীন কয়েকটা দৃশ্য ভেসে বেড়াতে লাগল। তার মধ্যে একটা ওই হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার দিনগুলোয় দ্বৈপায়নকে ওর গার্লফ্রেন্ডের কমলালেবু খাওয়াতে আসা। ওই মুহূর্তটায় অন্য সবাই কী রকম একটা চোখে জ্বালা নিয়ে তাকিয়ে থাকত সেই মেয়েটার দিকে। যেন প্রত্যেকের যা পাওয়ার তা কেবল এক জন নিয়ে চলে যাচ্ছে। সৈকতেশ নিজে একটা আশ্রমিক পরিবেশে পড়াশোনা করে এসেছে বলে ওর হয়তো ততটা ক্ষোভ জাগ্রত হত না, আবার দু’বছর শহরের জল পেটে পড়ার ফলে একদম উদাসীন যে থাকতে পারত, তাও নয়।

“কী ভাবছেন এত?” মালবিকা জিজ্ঞেস করল।

“ভাবছি যে আপনার সঙ্গীসাথীরা কেউ কিছু মনে করছেন না তো?”

“কী বিষয়ে?”

“এই যে আমি চেনা নেই, জানা নেই, চলেছি আপনার সঙ্গে।”

“আপনাকে যারা চেনবার তারা গত দু’দিনে খুব ভাল করে চিনে গেছে, আপনি যা করেছেন তার ফলে।”

“এই রে! তবে তো আরও বেশি করে নজর থাকবে আপনার উপর।”

“কিন্তু তাতে আপনার কী অসুবিধে? আপনি নিশ্চয়ই আমাদের কোনও শোরুমে শাড়ি কিনতে আসেন না?

“গিয়েছি তো এক আধবার। মানে যেতে হয়েছে।”

“কার জন্য? মা? নাকি...”

“মা নেই। থাকাকালীন একটা শাড়িও কিনে দিতে পারিনি।”

“এক্সট্রিমলি সরি। আমি জানতাম না।”

“আপনার জানার কথাও নয়। আর আপনি দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা না করেও করলেন, তার উত্তরেও ‘না’ই বলতে পারব।”

“পরিবারে লোক বলতে আপনি আর বাবা তা হলে?”

“বাবাও চলে গেছেন চার বছর হল। এখন আমি এবং আমিই,” সৈকতেশ হাসল একটু।

মালবিকা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, “ভাববেন না আমি মৃত্যু দেখিনি। আমার মাসতুতো দিদি রুনি, এক সঙ্গেই বলতে গেলে বড় হয়েছি আমরা, তার যে হার্টে ফুটো ছিল জানত না কেউ। লছমনঝোলায় রোপওয়ে চড়ে এ দিক থেকে ও দিক যেতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাক হয়ে মরে গেল। আমি যদি সঙ্গে থাকতাম কিছুতেই মরতে দিতাম না।”

“কিন্তু এই তো বললেন যে আপনি জানতেনই না।”

"না জানলেও বুঝে নিতাম ঠিক। আপনার ব্যাপারটা বুঝলাম কী করে?"

"কী বুঝলেন?"

"এক্সট্রা এক দিন দিল্লিতে থেকে গেলেও আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।"

"তা হবে না। অপেক্ষা করে কেউ বসে তো নেই।"

"কেউ যদি অপেক্ষা করতে চায়?"

"আমাকে কতটুকু চেনেন যে এত বড় কথা বলছেন মালবিকা? আপনার ইমোশনকে হার্ট করতে চাই না আমি, তাই আপনি নিজের থেকে আমার এসির টিকিটের টাকা মেটালেন, বাধা দিলাম না একটুও। কিন্তু আমি একটা চালচুলোহীন বাউন্ডুলে, আমার ঘর বলতে কিছু নেই, কোনও শহরে, রাজ্যে বা দেশেও।"

"তাই এই সবগুলোই জয় করতে পারেন আপনি, মন চাইলে। আর আমি তো রইলামই। আপনার জিতে নেওয়া সাম্রাজ্য।"

"আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, আপনার লেভেলের একটা মেয়ে এই কথাগুলো বলছে আমায়। আমার জীবনে এ রকম অভিজ্ঞতা নেই আসলে। কিন্তু আপনার পিছনে তো গণ্ডায় গণ্ডায় লোক ঘুরে বেড়ায় নিশ্চিত।"

"তাদের এক জনের সঙ্গেও পথ চলতে ইচ্ছে করে না।"

"তবু..."

"কোনও তবু নেই। কোথাও একটা পড়েছিলাম বা শুনেছিলাম, হোয়াট ইজ় লাভ উইদাউট ম্যাডনেস? আজ উত্তরটা দিচ্ছি, জাস্ট নাথিং। আমাকে পাগলামি পেয়ে বসেছে সৈকতেশ, তাই নির্লজ্জের মতো এত কথা বলে যাচ্ছি আপনাকে। কিন্তু ভয় পাবেন না, আমার পাগলামির দায় আপনাকে নিতে হবে না।"

"আমি নিতে চাই। কিন্তু বুঝতে পারছি না আমার সেই যোগ্যতা আছে কি না।"

"বিচারের ভার আমার উপর ছেড়ে দিন। পছন্দ আমার, ঠকলে আমি ঠকব," মালবিকা অস্বাভাবিক দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

"চৈত্র সেলের জিনিসপত্রে ছেঁড়াফাটা থাকে সেটা জানেন নিশ্চয়ই।"

"এটা চৈত্র নয়, আশ্বিন। চৈত্রের ভিখিরি আশ্বিনে শিব হয়ে যায় আর আমার, আপনার সঙ্গে, অষ্টমীর অঞ্জলি দেওয়ার ইচ্ছে পূর্ণ হবে না?"

সৈকতেশ আর কথা বলতে পারেনি। রাতে মালবিকাকে উপরের বাঙ্কে তুলে দিয়ে নিজে নীচে শুয়েছিল। মালবিকার উল্টো দিকের বাঙ্কে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছিলেন আর নীচের একটা বাঙ্ক ফাঁকা। আগাথা ক্রিস্টির 'ডেথ অন দ্য নাইল' বের করে চোখের সামনে ধরেছিল সৈকতেশ তবে অক্ষরগুলো কালো পিঁপড়ের মতো চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, গল্পের ভিতরে টেনে নিতে পারছিল না। কী করে টানবে? জীবন যখন এমন ছন্দে ছন্দে রং বদলায় তখন মৃত্যুর কথা ভাবার ফুরসত কার? মিশরের নীলনদে লিনেট নাকি সাইমন, কে মরবে আর কে মারবে তার থেকে সহস্রগুণ বড় হয়ে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল, সৈকতেশের কালকের বেঁচে থাকা আজকের থেকে কতখানি পাল্টাবে।

বইটা হাতে নিয়েই চোখটা লেগে গিয়েছিল সামান্য। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে যেতে সৈকতেশ দেখল, মালবিকা ওর বাঙ্কের ধার ঘেঁষে বসে আছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল ও।

"উপরে লোকটার ভীষণ নাক ডাকছে। আমার একটুও ঘুম আসছে না। আমি এই নীচের বাঙ্কে ঘুমোই?"

নীচের দুটো বাঙ্কই ফাঁকা। কোনও এক মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সাক্সেনার ওঠার কথা ছিল, তারা ওঠেনি। সৈকতেশের টিকিট করে দিতে তাই অসুবিধে হয়নি টিটি-র। অবশ্য মালবিকা ও রকম হেসে হেসে কথা বলায় টিটি-র কাজ আরও সহজ হয়ে গিয়েছিল! সুন্দরী নারীর অনুরোধ আর হাসির সামনে কোন কাজ আর কঠিন মনে হয় পুরুষের?

ওদের হেডস্যর স্কুল শেষ করে বেরিয়ে যাওয়া ছাত্রদের বলতেন, "ভাললাগা তোমায় মানুষ না অমানুষ বানাচ্ছে সেদিকে খেয়াল রেখো। সতেরো বছরের একটি মেয়েকে বাসের সিট ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ানো খুব সোজা কিন্তু সাতাত্তর বছরের কোনও দিদিমা বাসে উঠলে, তাঁকেও সিট ছেড়ে দিতে পারবে তো?"

মালবিকার জন্য যেটুকু পারল, ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন কারও জন্য তা পারবে কি না, সেটা তো সময় বলবে! কিন্তু উঠে বসার পর মালবিকার আলগা খোঁপায় যখন হাত লাগছিল, সৈকতেশের মনে পড়ছিল দার্জিলিঙের রবার্টসন হাউসের সেই অর্কিডগুলোর কথা যারা প্রায় এ রকমই নরম আর মসৃণ।

মালবিকা হঠাৎ করে ওর দিকে ঘুরে দু'ইঞ্চি এগিয়ে এসে মুখটা উঁচু করে জিজ্ঞেস করল, "আমার মুখটা কি এত অসুন্দর যে একটা চুমু খেতেও ইচ্ছে করবে না কারও?"

"ক্-কে বলেছে?" তুতলে গেল সৈকতেশ।

"তুমিই বলছ, বলে যাচ্ছ। কী বই তোমার হাতে দেখি, আগাথা ক্রিস্টি? আচ্ছা নীল নদের থেকে এই চলন্ত ট্রেনের নীল আলো কী এমন খারাপ যে তুমি ও রকম বাংলার পাঁচের মতো মুখ করে বসে আছ?"

"আপনি ভুল করছেন..."

"একদম আপনি-আজ্ঞে করবে না। আমার বাবা বলে, অপ্রয়োজনে যারা বেশি সম্মান দেয় তারা আসলে মনে মনে অসম্মান করে।"

"আই সি। একটি অপরিচিত ছেলে তাঁর মেয়েকে চলন্ত ট্রেনের কামরায়, গভীর রাতে, চুম্বন করলে ঠিকঠাক সম্মান জানানো হবে তো?"

"তুমি যদি এখনও অপরিচিত হয়ে থাকো, তবে এই পৃথিবীতে কাউকে কোনও দিন চিনিনি আমি।"

"এক দিনের একটা ঘটনায় এতখানি ভরসা করে ফেললে?" সৈকতেশ আর আপনি করে বলতে পারল না।

"আমাদের জন্মও তো এক মুহূর্তের ঘটনা। অবিরত পাক খেতে খেতে এক পলকে শুক্রাণু আর ডিম্বাণু যদি মিলে যেতে পারে তবে দুটো মন কেন মিলতে পারে না? আর মন যদি মিলে গিয়ে থাকে তবে দুটো..."

"ঠোঁট আজকে নয়। প্লিজ় আজ নয়।"

"কেন নয়, সৈকতেশ? তোমার বিচ্ছিরি লেগেছে আমাকে?"

"সেটা সম্ভব? তুমি নিজেকে নিজে আয়নায় দেখো না?"

"আমি নিজেকে তোমার চোখের তারায় দেখতে চাইছি। তাই, নিজের মুখে নিজের চাওয়া এ ভাবে বলে চলেছি আর তুমি কী অবলীলায় অপমান করে যাচ্ছ আমাকে!" মালবিকার গলা ভেঙে গেল শেষদিকটায়।

"তোমাকে অপমান করার কল্পনাও করতে পারি না। আমি তোমার জন্যই বারণ করছিলাম তোমাকে।"

"মানে?"

"গতকাল রাতে, আজ সকালে এবং আজ রাতেও দাঁত মাজিনি আমি। তাই তোমার খারাপ লাগবে ভেবে ভয় পাচ্ছি।"

"দাঁত ব্রাশ করোনি কেন?"

"কী করে করব? তুমি তো পুরো পেস্টটাই আমার দু'হাতে মাখিয়ে দিলে কাল সন্ধেয়।"

"তাতে কী? দুনিয়া থেকে টুথপেস্ট উবে গিয়েছিল নাকি?"

"আমি যে হোটেলে আছি সেটা ফোর্থ ক্লাস বললেও প্রশংসা করা হয়, অবশ্য কম পয়সায় ওই মেলে। সে যাক, ওই হোটেল যে গলির ভিতর সেটা যেন একটা ভাগাড়। সেখানে দোকান খুঁজে বেড়ানো সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে," সৈকতেশ সারেন্ডার করল।

"তুমি সত্যিই খুব কিউট। পুরুলিয়া কিংবা কলকাতায় যে চুমুগুলো খেয়েছ সব ভাল করে দাঁত মেজে, মাউথওয়াশ দিয়ে কুলকুচো করে?"

"আমি কলকাতা কিংবা পুরুলিয়ার কাউকে চুমু খাইনি কখনও।"

"মাই গুডনেস! তবে তো তোমাকে ছাড়া যাবে না।"

"খেতেই হবে?"

"আমার জেদ কত সাঙ্ঘাতিক পরশু স্টলে দাঁড়িয়ে দেখলে তো। এই জেদ, সেই জেদ নয় তবু তুমি এক বার নয় একটু হারলেই।"

একটা কোনও স্টেশন আসছিল। ওদের কথার ভিতরেই কামরার দু'-তিন জন কথা বলতে বলতে প্যাসেজ ধরে এগিয়ে গেল।

পর্দা টানা ছিল বলে একই বেঞ্চে মুখোমুখি বসে থাকা দুই নারী-পুরুষ পর্যন্ত বাইরের দৃষ্টি পৌঁছল না। তবু স্টেশনে ট্রেন থামা থেকে স্টেশন ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত থেমেই রইল ওরা। এসি কামরার বন্ধ জানলার ভিতর দিয়ে প্ল্যাটফর্মের ব্যস্ততা দেখতে দেখতে সৈকতেশের মনে হচ্ছিল যদি কোনও 'রিজার্ভেশন এগেনস্ট ক্যান্সেলেশন' করা যাত্রী এই স্টেশন থেকেই ট্রেনে উঠে ওদের কামরার ফাঁকা জায়গাটা অধিকার করে নিতে চায়?

ভাবতেই বুকটা কেমন টনটনিয়ে উঠল সৈকতেশের। মনে হতে থাকল, পুরুলিয়া আর কলকাতায় কাউকে চুমু না-খাওয়ার ভিতর যেমন সুপ্ত রয়েছে কিউবা, আমেরিকা, রোজালিয়া এবং একটি পাসপোর্ট, তেমনই কাল সকালে হাওড়া স্টেশনে নেমে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর হয়তো দু'জনের স্মৃতিতে রয়ে যাবে একটা বিকেল, একটা চুরির অপচেষ্টা, অনেক শাড়ি আর খানিকটা প্রতিরোধ।

স্মৃতিতে যখন রয়েই যাবে তখন না-খাওয়ার বেদনা মনে জমিয়ে রেখে কোন চতুর্বর্গ লাভ হবে? সূর্যের রথ আর কয়েক ঘণ্টা পরে ছুটতে শুরু করবেই, একটা ঘোড়া কম থাকবে কেন তাতে?

বড় কোনও ব্রিজের উপর দিয়ে যাচ্ছিল ট্রেনটা। সৈকতেশের বোধ হল, ওই ব্রিজের নীচে যে নদী রয়েছে, তার মনকেমন করছে ট্রেনটার জন্য। সে নিজের ঢেউ দিয়ে যোগাযোগ করতে চাইছে ট্রেনের চাকার তৈরি গুমগুম শব্দের সঙ্গে। সামান্য দুলতে থাকা মালবিকার চুলের ভিতর হাত ভরে দিয়ে বিলি কাটতে শুরু করল ও। মালবিকা খানিকটা বিস্ময়ে আর খানিকটা বিহ্বলতায় চোখ মেলে তাকাল।

দ্রুত, ওদের দূরত্ব আরও কমে গেল। মালবিকার হাঁ হয়ে যাওয়া মুখে নিজের মুখ ডোবাল সৈকতেশ, যেভাবে নদীতে মুখ ডোবায় সিংহ। স্রোত যেখানে তীব্র সেখানে টুথপেস্টের অভাব অনুভূত হয় না।

ভারতবর্ষের গাঙ্গেয় উপত্যকার ভিতর দিয়ে ছুটতে থাকা একটি মেলট্রেনের, একটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরায় দু'জন মানুষের চারটে ঠোঁট আর দু'টো জিভ বিনিসুতোর মালায় পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে গেল।

৪। দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ

ধেমাজির থেকে একশো মাইলেরও কম দূরত্বে অরুণাচল প্রদেশের দু'টি গ্রামের সন্ধান পেয়েছিল সৈকতেশ এখানে এসে। গ্রাম দুটোর বৈশিষ্ট্য এই যে ওখানে কারও কোনও নাম নেই। তা হলে মানুষ মানুষকে ডাকে কী করে? উত্তরটা জেনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সৈকতেশ, আনন্দ আর বেদনা একসঙ্গে বইতে শুরু করেছিল শিরা-উপশিরায়। ওই দুটো গ্রামের প্রতিটি মানুষের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে একটি সুর, সেই সুরটি কেউ গেয়ে উঠলেই সাড়া দেবে সেই মানুষটি যদি সে শুনতে পায়। পাহাড়িয়া দু'টি গ্রাম, একটা আচমকা বাঁকের ফলে খানিকটা দুর্গম আর সাকুল্যে শ'তিনেক লোকের বাস দু'টি গ্রাম মিলিয়ে। তবু সেই দুই গ্রামের মধ্যবর্তী ক্ষীণতোয়া ঝোরায় পা ডুবিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসেছিল সৈকতেশ, ঝোরার জল ছিটিয়েছিল মুখে-চোখে, নিজের অশ্রুকেও অজান্তে মিশে যেতে দেখেছিল ওই জলে।

হলই বা তিনশো লোক, আলাদা আলাদা সুর দিয়ে প্রত্যেকের নাম মানে অন্তত তিনশো সুরের ব্যাপার। চাট্টিখানি কথা নাকি, কে বানাল এত সুর? এক জনের পক্ষে তো সম্ভব নয়, কারণ দুই গ্রামেই পাঁচ বছরের বাচ্চা থেকে পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ অবধি সবাইকেই সুরে সুরে ডাকা হয় আর যাকে ডাকা হচ্ছে, সেও যে ডাকল তাকে সুরেই জবাব দেয়। অর্থাৎ প্রজন্মের পর প্রজন্ম সুরের উপর ভরসা করে বেঁচে আছে ওই দুই গ্রাম। সৈকতেশ খোঁজ করেছিল, ওই সব সুরের কোনও স্বরলিপি আছে কি না। কিন্তু না, ওখানকার লোকের পেশা ভেড়া আর চমরি গাই পালন, তা ছাড়া টুকটাক হস্তশিল্পের কাজের সঙ্গেও জড়িত কেউ কেউ। এক জনও জানে না কী ভাবে স্বরলিপি করতে হয়, সুরগুলো সবই বেঁচে আছে স্মৃতিতে। যদিও আস্থায়ীর পর অন্তরা আর অন্তরার পর সঞ্চারীর যাত্রাপথ জানা নেই ওখানে কারও, সুরগুলোতেও এক বা দু'লাইন বাক্যই বসানো যাবে মাত্র, তবু প্রতিটি সুর যে মৌলিক সে বিষয়ে সংশয় প্রায় নেই। না থাকার হেতু, ওখানে এখনও বিদ্যুতের সংযোগ এসে পৌঁছয়নি, কানে হেডফোনের তার গুঁজে কোনও মিউজ়িক স্টেশনের জগঝম্প শুনছে না কেউ। উল্টে বলিউডের কোনও সুরকার ওই দুই গ্রামের একটাতেও পা রাখলে তার পোয়াবারো, ফোকটে অনেক সুর পেয়ে যাবে লোকটা।

সৈকতেশও পেয়েছিল। কিন্তু ফেরার পথে সব সুর মিলিয়ে গিয়ে একটাই সুর জেগে ছিল ওর মানসে। সেই সুরের নাম শৈশব। সেই শৈশব যেখানে মা প্রত্যেকদিন ভাতের সঙ্গে নিম-বেগুন খাওয়া একদম বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিল আর বাবার নির্দেশে আর কিছু করুক না করুক ইংরেজি থেকে বাংলায় একপাতা ট্রান্সলেশন করতেই হত। সেই সময়ের পুরুলিয়া শহরে পয়সাওলারাও এয়ার কন্ডিশনারের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। দারুণ অগ্নিবাণে কমবেশি জর্জরিত ছিল সকলেই। কিন্তু পেরিয়ে আসা সময় মিষ্টি হয়ে যায় বলে সৈকতেশের স্মৃতিতে পুরুলিয়া নাতিশীতোষ্ণ হয়ে বিরাজ করত। হয়তো ওই না-শীত, না-গরম মেদুরতার অন্য নামই নস্ট্যালজিয়া।

সৈকতেশের বাবা শিবশঙ্কর কৃষ্ণন তামিলনাড়ুর মাদুরাই থেকে পড়তে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। ওঁর ঠাকুরদা দীর্ঘকাল কলকাতা জিপিওর উঁচুপদে চাকরি করেছেন। অল্প বয়সে স্ত্রীবিয়োগের পর বিয়েও করেননি আর। কিন্তু সে কারণে নয়, মাতৃহীন পুত্রকে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত আবাসিক স্কুলে ভর্তি করার পিছনে ওঁর যুক্তি ছিল এই যে, পরাধীন ভারতবর্ষে এমন স্বাধীনতার শিক্ষা আর দ্বিতীয় কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব ওখান থেকে পাশ করে বেরোলে ছেলে কেবল স্বনির্ভরই হবে না, সত্যপ্রিয়, দৃঢ়চেতাও হবে। সেটা উনিশশো পঁয়ত্রিশ সাল, শিবশঙ্করের বয়স তখন মাত্র দশ। কিন্তু ছেলের বয়স পনেরো পেরোতে না পেরোতে হঠাৎ করে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন বাবা। তারপর হয়তো মাদুরাইতেই ফিরে যেতে হত কিন্তু শিবশঙ্করের কাকা চাননি যে মাঝপথে পড়া ছেড়ে দিয়ে শিবশঙ্কর চলে আসুন দেশের বাড়িতে, তাই ওঁর পড়ার খরচ তিনিই জুগিয়ে গেছেন পরের চার-পাঁচ বছর।

দশ থেকে পনেরোর মধ্যে তবু বছরে দু'বার করে দেশে আসা হত, কিন্তু পনেরো থেকে বাইশের গ্রীষ্মাবকাশ আর পুজোর ছুটিগুলোও শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে বাইশ বছরের যুবক শিবশঙ্কর যখন মাদুরাইতে পা রাখলেন কাকার পারলৌকিক কাজকর্মের অংশীদার হতে, তখন তিনি রসম আর সম্বর কোনওটাতেই রুচি না রাখা এক বাঙালি। তাঁর তখন দু'বেলাই ভাতের প্রয়োজন আর তার সঙ্গে প্রয়োজন রবীন্দ্রসঙ্গীতের, শৈলজানন্দের প্রিয় ছাত্রী অজন্তা সান্যালের কণ্ঠে যা ছাতিমতলা বা কোপাইয়ের ধারে কিংবা প্রান্তিক স্টেশনের বাইরের ধূসর রাস্তায় শুনতে পেতেন প্রায়শই। সেই সব গানের সুর আর বাণী এসে ঘিরে ধরতে থাকে শিবশঙ্করকে, স্থানীয় কোনও উৎসবে ভরতনাট্যম দেখতে দেখতে মন চলে যায় 'শ্যামা' কিংবা 'চিত্রাঙ্গদা'র পরিবেশনায়। স্থিতির থেকে শিল্প, সম্পর্কের থেকে সৌকর্য বড় হয়ে ওঠে।

আসলে, ওই সোনাঝুরি, ওই গৌড়প্রাঙ্গণ আর ওই নীল দিগন্তে ফুলের আগুন, অহরহ টানছিল শিবশঙ্করকে। তাই কাকার ছেলেরা যখন বলল যে ওঁর পিছনে গত কয়েক বছরে অনেক খরচ হয়ে যাওয়ায় উনি আর উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু পাবার হকদার নন, তখন স্মিত হেসে বলতে পেরেছিলেন কিছুই দাবি নেই তাঁর।

শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার পর হন্যে হয়ে যখন চাকরি খুঁজছেন তখনই পুরুলিয়ায় ভূমিষ্ঠ হওয়া আবাসিক স্কুলের খোঁজ মেলে। ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন ভাবধারাও হয়তো, তবু অজন্তাই সাহস জোগায় সেই মুহূর্তে।

"'রজনী নিদ্রাহীন, দীর্ঘ দগ্ধ দিন' গানটা তুমি জানো তো অজন্তা।"

"জানি। কিন্তু রজনী নিদ্রাহীন হবে বলে ভয় পাচ্ছি না আমি তত। গল্পে গল্পে কেটে যাবে রাত। আর কে বলতে পারে এক সহস্র এক রজনীর পরেও এক সহস্র দুই রজনী জানলায় এসে দাঁড়াবে না আমাদের গল্প শুনতে?"

"তুমি শাহজাদি আর আমি শাহজাদা হলে হয়তো তাই হত। কিন্তু

আমি যে নেহাতই খেটে খাওয়া মানুষ হবার যোগ্যতা নিয়ে এসেছি তোমার কাছে। আমার সঙ্গে থাকতে হলে তোমায় যে অনেক, 'দীর্ঘ দগ্ধ দিন'-এর ভিতর দিয়েও যেতে হবে অজন্তা। বৈশাখের দিন, জ্যৈষ্ঠের দিন, কে জানে কত দিন।"

"আমাকে শ্রাবণ-সন্ধ্যা করে নিয়ো," মুখ নামিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন অজন্তা।

মায়ের মুখ থেকেই এই গল্পগুলো শুনেছিল সৈকতেশ। জেনেছিল, স্বাধীনতার সাত-আট বছর পার হয়েছে এমন এক সময়ে, বৈচিত্রের ভিতরে বিভেদ এতটাও চাড়া দেয়নি যে অজন্তা আর শিবশঙ্করের বিয়ে হতে বিরাট কিছু সমস্যা হবে।

বিয়ের অল্প কয়েকদিন আগে জামাইষষ্ঠী পড়ে যাওয়ায় হবু জামাইকে ঘরে ডেকে অজন্তার মা পাখার বাতাস দিয়েছিলেন। তার পর জানতে চেয়েছিলেন যে ঠিক কী কী খাওয়ালে সমস্যা হবে না ওই তামিল যুবকের।

শিবশঙ্কর উত্তরে বলেছিলেন, "কে কী খায় তাই দিয়ে তার পরিচয় হয় না। কে কতটা খাওয়ায় তাই দিয়েই তার পরিচয়। আপনি মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডাল থেকে লাউ চিংড়ি বা মেটে চচ্চড়ি যা রেঁধেছেন সবই খাব আমি।"

নিজের জীবনকে নতুন ছাঁচে ঢেলে নিয়েছিলেন শিবশঙ্কর আর অনেকটা সেই কারণেই কলকাতায় থাকা ওঁর আত্মীয়স্বজনের কাছে ব্রাত্য হয়ে ওঠেন উনি এবং ওঁর পরিবার। সৈকতেশের মনে আছে, এক বার বাবার দিকের এক আত্মীয়ের মেয়ের বিয়েতে কলকাতায় এলে ওকে আর দাদাকে নিয়ে মা বাইরের ঘরে বসে কাটিয়েছিল। একে বাঙালি বৌ, তার পর তার পাল্লায় পড়ে ঘরের সবাই আমিষ খায়, এই অপরাধে শিবশঙ্করের পরিবারকে আবশ্যিক সব রীতিপ্রথায় অংশগ্রহণ করতে দেয়নি কলকাতার সেই তামিলীয়রা।

তাতে অবশ্য ওদের বিশেষ কিছু এসে যায়নি। ফিরতি পথে মোগলাই পরোটা আর কষা মাংস খেয়ে দুই ভাই নাচতে নাচতে ট্রেনে চেপে বসেছিল।

যত দিন বেঁচে ছিল, দাদা ওরকম নাচিয়ে রাখত, মাতিয়ে রাখত। মাঝে মাঝে মা যদি বলত যে নতুন-নতুন ছাত্র গড়ার নেশায় বাবা পুরুলিয়ায় পড়ে না থেকে কলকাতার কলেজের চাকরি নিয়ে নিলেই ভাল হত, দাদা বলে উঠত, "কলকাতায় কি জয়চণ্ডী পাহাড় আছে মা? আমরা যেমন ইচ্ছে করলেই পাহাড়ের কাছে চলে যেতে পারি, কলকাতার লোক পারে?"

ওই পাহাড়ই নিয়ে নিল দাদাকে। স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছিল যে বার পুরুলিয়াতে, তখনই পাহাড়ে যাওয়ার দরকার পড়েছিল ওর।

আসলে ওদের আবাসিক স্কুলের শিক্ষাই ছিল, সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, বিশেষ করে প্রতিকূল অবস্থায় রয়েছে যারা তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। পুরুলিয়া শহর থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দূরের জয়চণ্ডী পাহাড়ের পাদদেশে অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত কিছু মানুষের বাস ছিল।

অসামাজিক হলেও সমাজের মধ্যে তো? এই বিশ্বাস থেকেই স্কুলের এক জন শিক্ষক আর জনাচারেক ছাত্র গিয়েছিল ওই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে তাদের কিছু ত্রাণ পৌঁছে দিতে। ত্রাণ বলতে শুকনো চিঁড়ে, গুড়, প্লাস্টিক, নুন-চিনি, আরও যা যা লাগে প্রাণধারণের জন্য। কিন্তু ফিরতি পথে প্রাণের ভিতর থেকেই দু'টো কম পড়ে গেল। যে দু'টি গাড়িতে করে যাওয়া হয়েছিল ত্রাণ দিতে তার একটা, রাস্তা কোথায় বানের জলে ভেসে গিয়ে বিরাট অতল তৈরি করেছে, তার হদিস পায়নি। ফলে মুহূর্তের মধ্যে ড্রাইভার আর তিন জন সওয়ারি নিয়ে গাড়ি তলিয়ে যায়। বেশ কয়েক দিন পর দু'টি লাশ উদ্ধার হয়, যাদের চেহারা দেখে শনাক্ত করার উপায় নেই আর। ওই দু'টির একটি, সৈকতেশের পাঁচ বছরের বড় দাদা অমৃতেশের।

"যে আস্তিক হয় সে বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পরও ফিরে আসবে নতুন কোনও জন্মের ভিতর দিয়ে। কিন্তু যে নাস্তিক সেও থাকে, মৃত্যু হলেও থাকে। তার ভেসে যাওয়া দেহ কোনও মাছের খাদ্য হয় হয়তো। তার সমাধিস্থ শরীর থেকে পুষ্টি পায় কত কীট, সার পায় কত উদ্ভিদ। ফুরোয় না, সব শেষ হয়ে গেলেও কিছুই ফুরোয় না..." দাদা চলে যাওয়ার পর সৈকতেশকে সামনে বসিয়ে মাঝে মাঝেই বলতেন বাবা।

কিন্তু মা কী রকম যেন চুপ করে গিয়েছিল। কেবল মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব কথা বলে উঠত। যেমন এক দিন ঘুম থেকে উঠে বলল যে স্বপ্নে দেখেছে, "দাদার পায়ে চটি ছিল বলে দাদা জলে ভেসে গেছে, জুতো পরে থাকলে কিছুতেই তলিয়ে যেত না।"

"তোমার ছেলে গাড়ির ভিতরে ছিল অজন্তা, সেখানে পায়ে চটি ছিল নাকি জুতো, সেটা ম্যাটার করে না।"

"করে, তুমি জানো না। কিংবা জানলেও মানতে চাও না।"

"কথায় যুক্তি থাকলে মানব না কেন?"

"যুক্তি ধুয়ে কোন জল খাব আমি? যুক্তি আমাকে মুক্তি দেবে এই দুর্বিষহ যন্ত্রণা থেকে?" বলতে বলতে রান্নাঘরের আনাজ কাটা ছুরিটা হাতে তুলে নিত মা আর আতঙ্কে কাঁটা হয়ে যেত সৈকতেশ।

ওদের দুই ভাইকে, বাবাকে 'আপনি' করে বলা মা নিজেই শিখিয়েছিল। সেই সময় মফস্সলে বা শহরেরও কোথাও কোথাও চল ছিল ও রকম। মায়ের মতে ওতে নাকি 'পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ' মন্ত্রের পালন হয় দৈনন্দিন জীবনে। শ্রদ্ধা আর ভালবাসা একসঙ্গে উচ্চারিত হয়।

"মায়ের ক্ষেত্রে নিয়ম আলাদা কেন তবে?" দাদা জিজ্ঞেস করেছিল।

"মায়ের কাছে কোনও আড়াল রাখতে নেই," মা ওদের দুই ভাইয়ের মাথা টেনে নিয়েছিল নিজের দিকে।

দাদা চলে যাওয়ার পর বিষাদের এক চোরাস্রোত মাকে টানতে শুরু করল। সৈকতেশ এক দিন শিউরে উঠল, মাকে বাড়ির তোলা উনুন থেকে জ্বলন্ত কয়লার একটা টুকরো হাতে তুলে নিয়ে আনমনে নাচাতে দেখে।

সৈকতেশকে এগিয়ে আসতে দেখে মা বলে উঠল, "দেখছিলাম যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার সময় কতটা জ্বালা করেছিল তোর দাদার।"

সৈকতেশ একটা ঝটকায় মায়ের হাত থেকে ওই কয়লার টুকরো ফেলে দিয়ে বলেছিল, "এ রকম কোরো না মা, দয়া করে এ রকম কোরো না।"

"আমাকে 'তুমি' করে বলিস কেন? তোর বাবাকে যেমন 'আপনি' করে বলিস, আমাকে বলতে পারিস না?" কেমন একটা ঘোলাটে চোখে বলে উঠেছিল মা।

মায়ের সেই চোখের দিকে তাকিয়ে কথা হারিয়ে ফেলেছিল ও। মনে হয়েছিল যে শূন্যতায় তলিয়ে গেছে দাদা, সেই শূন্যতা ওদের ঘরের মাঝখানে এসে হাঁ করেছে।

তখনও ইলেকট্রিকের আলো এত সস্তা, এত সহজলভ্য, এত সর্বজনীন হয়ে ওঠেনি। ঘরে যে লণ্ঠনগুলো থাকত তার মধ্যে বারান্দার লণ্ঠনটা নিবুনিবু হয়ে জ্বলত, কেউ এলে ওই অ্যালুমিনিয়ামের প্যাঁচ ঘুরিয়ে উঁচু করে তোলা হত শিখাকে, যে এসেছে তার মুখ দেখার জন্য। মায়ের রান্নাঘরের লণ্ঠনের শিখাও মাঝবরাবর থাকত। উঁচু শিখা থাকত কেবলমাত্র বাবার ঘরের লণ্ঠনে, যেখানে বাবা আর ওরা দুই ভাই, যে যার পড়াশোনা করত।

তিন-চার বছর আগেই বিদ্যুতের সংযোগ এসে গিয়েছিল। ভোল্টেজ খুব ওঠানামা করলেও টিউবলাইটের নীচে বসেই পড়াশোনা করত ওরা। কিন্তু দাদা চলে যেতে, মা ওই টিউবলাইট জ্বালাতে না দিয়ে লণ্ঠন জ্বেলে রাখত ঘরের মধ্যে। মায়ের বক্তব্য ছিল, দাদা যদি ফেরে তবে তো ছোট হয়েই ফিরবে। আর দাদার ছোটবেলায় যেহেতু বিজলিবাতি ছিল না ওদের ঘরে, দাদা ওই টিউবলাইট জ্বলতে দেখলে ভয় পাবে খুব, ফিরতে পারবে না আর।

কত দুর্ঘটনা ঘটে পৃথিবীতে, খবরের কাগজে, টিভি কিংবা রেডিয়োর মাধ্যমে জানা যায় এক বছরে কত লোক মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্টে তার বিবরণ। কিন্তু কে আর সেই সমস্ত ঘরের ভিতরে ঢুকে খোঁজ নিয়েছে

কী হয়? সমাজের কাছে যা পরিসংখ্যান, কারও না কারও কাছে সে তো সন্তান! সেই সন্তান হারাবার বেদনার সঙ্গে কেমন করে যোঝে এক জন বাবা, এক জন মা? একটি বোন অথবা ভাই?

বাবার পারা না-পারা বাইরে থেকে বোঝা যেত না কিন্তু মা খুব বেশি দিন লড়াই করতে পারল না বড় ছেলের চলে যাওয়ার শোকের সঙ্গে। সৈকতেশের মাধ্যমিকের শেষ দুটো পরীক্ষা তখনও বাকি, বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারাল আচমকা। সৈকতেশ যখন পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এল, তখন মাকে একটা ঘরে শুইয়ে রাখা হয়েছে, মাথার চোট পাওয়া জায়গায় ব্যান্ডেজ করে।

"তুমি কালকের পরীক্ষা দিতে পারবে তো?" বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন রাতে।

"আপনি বলে দিন, কী করব!" সৈকতেশ বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে ছিল বাবার দিকে।

"বছর নষ্ট করে তো আর তোমার মাকে সুস্থ করা যাবে না। আমার কথা যদি শোনো তবে বলব, পরীক্ষা দাও তুমি।"

সৈকতেশ সেই মতো পরদিনের জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষা দিতে যায় আর পুরো সময়টা ওর চোখের সামনে ভাসতে থাকে একটা ব্যাঙ, যার পৌষ্টিকতন্ত্র চেনার জন্য তাকে কেটে ফেলা ছাড়া অন্য উপায় নেই। ছোটবেলায় মায়ের মুখেই সেই ব্যাঙ রাজকুমারের গল্প শুনেছে যাকে এক রাজকুমারী চুমু দিয়ে শাপমুক্ত করেছিল। বলার সময় 'চুমু'র বদলে 'মিষ্টি খাইয়ে' করে দিয়েছিল মা। জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষা দিতে বসে হলের বাইরেই সেই রাজকুমারীর অস্তিত্ব টের পাচ্ছিল সৈকতেশ। কিন্তু মনে হচ্ছিল যে সে এবার চুমু দিয়ে মানুষ থেকে ব্যাঙ বানিয়ে দেবে সৈকতেশকে, উঁচু ক্লাসের ছেলেরা যাকে ল্যাবরেটরিতে দাঁড়িয়ে কাটে।

সে দিন বিকেলে বাড়ি ফিরতে শোনে যে মাকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সৈকতেশের আবাসিক স্কুলের অন্য কয়েক জন মাস্টারমশাই, তাঁদের স্ত্রীরা, ওকে ঘিরে রেখেছিল তবু সৈকতেশ বুঝতে পারছিল ঘটনা কোন দিকে যাচ্ছে। ওর সে বার মাধ্যমিকে প্রথম দশের মধ্যে থাকার একটা ভাল সম্ভাবনা ছিল বলে বাবার দু'-তিন জন সহকর্মী ওঁকে অনুরোধ করেন যে, সৈকতেশ ড্রপ দেবে কি না সেই ব্যাপারটা ভেবে দেখতে।

বাবা তখন কিছু বলেননি, কিন্তু রাতে সৈকতেশকে বলেন যে, "আগুনের কুয়ো হয় পেরিয়ে যেতে হয়, নয়তো তাতে নামতেই নেই। আগুনের কুয়োর মধ্যে দাঁড়িয়ে পরে পেরোবার পরিকল্পনা করতে গেলে পুড়ে মরতে হয়।"

সৈকতেশ শেষ পরীক্ষা দিতে গেল তাই। আর প্রতিটি অঙ্ক কী অসম্ভব চেনা আর সহজ লাগছিল ওর পরীক্ষা দিতে বসে।

পরদিন দুপুরে মায়ের মুখটাও খুব চেনা লাগল। চেনা, কিন্তু অসম্ভব শান্ত আর ঘুমন্ত। হাজার ডাকলেও সাড়া দিচ্ছে না।

মায়ের অগ্নিসংস্কার করে আসার পর রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে সৈকতেশ দেখতে পেয়েছিল, ছোট ছোট নক্ষত্ররা মুছে গিয়ে জ্বলে উঠেছে একটাই অপার্থিব তারা, তার জ্যোতিতে ভেসে যাচ্ছে সমগ্র চরাচর। দৈনন্দিনের ভিতরেই নান্দনিক, লৌকিকের ভিতরে অলৌকিক, মৃত্যুর মধ্যে জীবন আর নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে মায়ের অস্তিত্ব অনুভব করে চমকে উঠছিল ও।

পরীক্ষার রেজ়াল্ট যখন বেরোল, তখন দেখা গেল অন্যান্য বিষয়ে এমনকি মায়ের স্ট্রোকের পরদিন হওয়া জীবনবিজ্ঞানে লেটার পেলেও, অঙ্কে একশোয় সত্তর পেয়েছে সৈকতেশ। টেস্টে যে ছেলে আটানব্বই পেয়েছিল, একশোয় একশো পাওয়ারই কথা যার সে কোথায় হারিয়ে এল তিরিশ নম্বর?

তার আগের বছরই ওদের স্কুল উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়েছে। হোম-স্টুডেন্ট হিসেবে সৈকতেশ ওখানেই এগারো ক্লাসে ভর্তি হয়ে যাক, এমনই ইচ্ছা ছিল স্কুলের প্রধানশিক্ষক থেকে শুরু করে বেশ কয়েকজন সহশিক্ষকের। কিন্তু বেঁকে বসলেন সৈকতেশের বাবা। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, যে স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য কলকাতা-হাওড়া-হুগলি-বর্ধমান, মায় কুচবিচার, জলপাইগুড়ির ছেলেরা জান লড়িয়ে দেয়, সেই স্কুলের একটি সিট, কর্মরত শিক্ষকের ছেলে বলেই কেউ দখলে রাখবে কেন? সৈকতেশ কী অবস্থার মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছে, তা পুরুলিয়ার অনেকেই জানে কিন্তু যে ছেলেগুলো দূরদূরান্ত থেকে ভর্তি হতে আসছে তারা যে আরও বেশি প্রতিকূলতা পেরিয়ে আসছে না, কী গ্যারান্টি তার?

"সে রকম মনে করলে যে ছেলেরা ভর্তি হওয়ার পরীক্ষা দিতে আসছে তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, কার কার মাতৃবিয়োগ হয়েছে পরীক্ষা চলাকালীন," হেডস্যর বলেছিলেন।

"আমি সৈকতেশের ভর্তির ব্যাপারে কলকাতার একটি কলেজে কথা বলেছি।"

"কলেজে? এই আবাসিক স্কুলের নিষ্ঠায় বেড়ে ওঠা একটা ছেলে কলকাতার কলেজে গিয়ে ঠিক কোন পরিবেশ পাবে ভেবে দেখেছেন?" হেডস্যর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

"অনেক বখাটে ছেলে, চাই কি নেশাড়ুদের মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু স্কুলে ভর্তি করলে ও তো হস্টেলের সুবিধে পাবে না। তা ছাড়া আমি চাই যে, সৈকতেশ এই অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে যাক, যদি খারাপের টানে ভিড়ে যায় তবে বুঝতে হবে যে ওর ভিতরেও ওই প্রবৃত্তি ছিল।"

"যে সময়টা চারাগাছের চার দিকে বেড়া দেওয়ার দরকার..."

"জঙ্গলে যে হাজার হাজার গাছ তার কোনটা বেড়ার আড়ালে বেড়ে ওঠে? বেড়া থাকে শুধু বাড়ির গাছে। যে ছেলে ষোলো বছর বয়সে নিজের দাদার মৃত্যু, মায়ের মৃত্যু পেরিয়ে এল, পৃথিবীকে ঘর বানিয়েই বাঁচতে হবে তাকে," শিবশঙ্কর উঠে দাঁড়ালেন।

ওই ভাবেই বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন শিবশঙ্কর, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার দোরগোড়ায় দাঁড়ানো সৈকতেশের প্রশ্ন শুনে।

"বাবা বসুন, বসেও কথা বলা যাবে।"

"এই কথাটা আমাকে দাঁড়িয়েই বলতে হবে। তুমি কী করে ভাবলে যে, আমার স্কুলের দু'মাইলের মধ্যে কোনও আড়তদার চাল-চিনি-কাপড়ের আড়ালে মেয়ে পাচারের কারবার করবে আর আমি তা ঠেকাতে যাব না?"

"কিন্তু আপনি তো রিটায়ার করেছেন।"

"হ্যাঁ, তিন মাস হল। তা বলে জীবন থেকে রিটায়ার করিনি। আর সেটা যত দিন না করছি তত দিন..."

কথা শেষ না করেই ধপ করে মাটিতে বসে পড়লেন শিবশঙ্কর। সৈকতেশ হাত বাড়িয়ে না ধরলে হয়তো আরও বিপত্তি হত।

পুরুলিয়াতেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যা পাওয়া গেল তাতে আর কলকাতা নিয়ে গিয়ে সময় ব্যয় করার পক্ষপাতী ছিল না সৈকতেশ। বাবাকে নিয়ে সোজা চলে এসেছিল ভেলোর। কিন্তু মাথার টিউমারটার আকার সম্বন্ধে যতটা জানা গেল, প্রকার সম্বন্ধে ততটা নয়। হতে পারে ম্যালিগন্যান্ট, হতে পারে বিনাইন। কোনটা তা হয়তো অপারেশনের পরই বোঝা যাবে। কিন্তু অপারেশনের ধকল রোগী সইতে পারবে কি?

"জীবনের প্রতিটা মুহূর্তই হয় ম্যালিগন্যান্ট, আর নয়তো নয়। অতিরিক্ত ভেবে করবি কী? তার চেয়ে ভাব, এই উপলক্ষে আমার জন্মভূমিতে আসা হল কত বছর পরে। অবশ্য আমার জন্মস্থান এখান থেকে অনেকটা দূরে। যদি যাওয়া হয় তোমার কল্যাণে, তবে ওই মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে আসব আর এক বার।"

ভেলোর থেকে মাদুরাই প্রায় তিনশো মাইল রাস্তা, ছ'-সাত ঘণ্টা লাগে যেতে। তবে ওই যাত্রায় না বেরোলে দেখা হত না, গাড়ির জানলার ধারে বসে কী রকম শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিলেন শিবশঙ্কর। ভেলোর থেকে মাদ্রাজ পৌঁছে, তিন-চার ঘণ্টার বিরতি নিয়ে সোজা শিবগঙ্গা। শিবগঙ্গা থেকে মাদুরাইয়ের পথে যেতে যেতে বালকবেলার স্মৃতি গ্রাস করে নিচ্ছিল মানুষটাকে; কথা বলছিলেন সেই ভাষায় যার বিন্দুবিসর্গ শেখাননি নিজের ছেলেকেও।

"মহাদেবের জটা থেকে যেখানে গঙ্গা নেমেছে, শুধু সেখানেই শিবের পুজো হয় এমনটা নয়, এখানেও প্রচুর শিবমন্দির," গাড়ি মাদুরাই পৌঁছে গেছে প্রায়, এমন সময় বললেন শিবশঙ্কর।

থুঙ্গানগরম মানে যে শহর কখনও ঘুমোয় না। ভাইগাই নদীর তীরবর্তী আড়াই হাজার বছরের পুরনো শহর মাদুরাইকে ওই নামেই ডাকা হয় তামিল ভাষায়। কিন্তু রাত্রি ন'টাতেই কী আশ্চর্য নিঝুম হয়ে যায় শহর। মীনাক্ষী মন্দিরের দর্শন সেরে রাতের আস্তানায় ফেরার পথে শিবশঙ্কর সৈকতেশকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কী ভেবেছিলি, কলকাতার মতো কিছু দেখবি?"

সৈকতেশ মাথা নাড়ল, "ঠিক তা নয়।"

"অন্য একটা ব্যাপার এই সূত্রে বুঝতে হবে। ঘুমোয় না মানেই হুল্লোড় করে, তা কিন্তু নয়। সারারাত জেগে যে জপতপ করে, সেও না ঘুমিয়েই কাটায়।"

বাবার ইচ্ছেতেই মাদুরাই থেকে কন্যাকুমারী যাওয়া হল। আবারও একশো সত্তর-একশো আশি মাইলের জার্নি কিন্তু শিবশঙ্কর যেন ক্লান্তিহীন।

"শিবগঙ্গার লাল মাটি পেরিয়ে মাদুরাইয়ের কালো মাটিতে পা রেখেছিলাম আমরা। এবার আবার মাদুরাই ছেড়ে চলে যাচ্ছি যখন তখন দেখ, কালো মাটি কেমন লাল হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। কন্যাকুমারীর মাটি অবশ্য পলিমাটি। আর পলিমাটির বিচার রং দিয়ে হয় না। তার বিচার হয় সে কতটা আঁট হয়ে বসছে তাই দিয়ে। গঙ্গাতীরের মাটি যেমন। এমন আঁট হয়ে বসল যে..."

শিবশঙ্কর বাক্য সম্পূর্ণ করলেন না।

কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ রক-মেমোরিয়ালে এসে বাবা দু'হাত বাড়িয়ে সমুদ্রকে আহ্বান করছিলেন। সেই আহ্বানের ভিতর কান্না মিশে আছে বুঝতে পেরে একটু সরে গিয়েছিল সৈকতেশ। অল্প দূরে দাঁড়িয়ে মহাসাগরে ঢেউয়ের জন্ম আর বিলুপ্তি দেখতে দেখতে ওর মনে হচ্ছিল, ওই নোনা জল আসলে পৃথিবীর অবিশ্রান্ত অশ্রুর প্রতীক। পৃথিবী জুড়ে স্থলভাগকে ফেনিল জল এ ভাবে ঘিরে রাখে বলেই হয়তো জীবনভর এত কাঁদতে পারে মানুষ!

"শান্তিনিকেতনের সঙ্গে নাড়ির টান আবার পুরুলিয়ায় বিবেকানন্দ সেবা সমিতির কুড়ি বছরের উপর সেক্রেটারি। স্বামীজী আর রবীন্দ্রনাথ দু'জনকে এক সঙ্গে কী ভাবে মেলালেন জীবনে?" ব্যক্তিগত বেদনার তীব্রতা থেকে মন একটু ঘুরিয়ে দেবে বলে, ফিরতি পথে বাবাকে জিজ্ঞেস করল সৈকতেশ।

"মিলেই তো আছেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা, ইংল্যান্ডে গিয়ে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার ঝড় তুললেন বলেই না পনেরো-সতেরো বছর পর গীতাঞ্জলি অমন প্রবল ভাবে গৃহীত হল ইওরোপ, আমেরিকায়? না হলে পাশ্চাত্যের পাথুরে হৃদয় কি কখনও 'আমারে তুমি অশেষ করেছ'র মর্ম বুঝত? ওরা তো শুধু শুরু আর শেষ বোঝে। 'ট্রুথ ইজ় বিউটি' আর 'বিউটি ইজ় ট্রুথ' বললেই কি সব বলা হয়ে যায়? সত্য আর সুন্দরের ভিতরে শিব রয়েছেন, সেইটে অনুভব করতে হবে তো!"

"এই রকম কথা শুনলে কিন্তু অনেক পণ্ডিত বিষম রেগে যাবে আপনার উপর," সৈকতেশ হাসল।

"যেন আমি তাতে খুব মত পরিবর্তন করে ফেলব!" শিবশঙ্কর হাসলেন।

"করবেন না। জানি। আপনি তো আমাদের সক্রেটিস।"

"তা বটি। স্বেচ্ছায় হেমলক খেতে পিছপা তো হইনি কখনও..." বলার পরই শিবশঙ্কর গাইতে শুরু করলেন।

সৈকতেশ প্রথমটা চমকে গিয়েছিল। মাকে গাইতে শুনেছে ছোটবেলা থেকে, কিন্তু বাবা তো কখনও গাইতেন না। দাদার স্মরণসভায় কোনও এক পুরনো বন্ধু মায়ের পাশাপাশি বাবাকেও গাইতে অনুরোধ করছিল, মনে পড়ে গেল। বাবা উত্তরে বলেছিলেন যে, ওঁর বড় ছেলে যদি ফ্রেমের ভিতর থেকে এসে গাইতে বলে, তবে গাইবেন।

ওই বেদনার আবহে খেয়ালই হয়নি যে বাবাও গান জানতেন বলেই বাবাকে গাইতে বলেছিল কেউ, গান শিখতেন বলেই নিবিড় পরিচয় হয়েছিল মায়ের সঙ্গে।

"...ভীষণ আমার, রুদ্র আমার, নিদ্রা গেল ক্ষুদ্র আমার—/ উগ্র ব্যথায় নূতন করে বাঁধলে আমার ছন্দ।/ যে দিন তুমি অগ্নিবেশে সব-কিছু মোর নিলে এসে/ সে দিন আমি পূর্ণ হলেম ঘুচল আমার দ্বন্দ্ব।/ দুঃখসুখের পারে তোমায় পেয়েছি আনন্দ।"

সব সুখের খেলা তুচ্ছ করে সৈকতেশকে অনাস্বাদিত এক আনন্দে পৌঁছে দিচ্ছিল, ওর বাবার কণ্ঠের ওই গান। সমুদ্রের হাওয়া এসে যখন গায়ে লাগছিল, মনে হচ্ছিল যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই হাওয়ার রূপ ধরে জানিয়ে যাচ্ছেন, তিনি নিকটেই আছেন।

সেই রাত্রে চব্বিশ বছরের আগল ভেঙে গেল। বাবার বুকে মাথা রেখে শুয়ে সৈকতেশ জানতে চাইল, "গাইলে না কেন বাবা? কেন বঞ্চিত করলে শ্রোতাদের?"

"রবীন্দ্রসঙ্গীত এমনই সঙ্গীত যে গাওয়ার সময়, শ্রোতার কান নয়, নিজের হৃৎপিণ্ড অবধি পৌঁছে দিতে হয় সুর," শিবশঙ্কর ছেলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন।

"নিজেকে কেন বঞ্চিত করলে তবে?"

"করতে চাইনি তো। কিন্তু কোথাও গাইতে গেলেই বিস্তর লোকে বলত, 'দেখেছ তেঁতুল হয়েও কী চমৎকার বাংলা উচ্চারণ করছে!'"

"তেঁতুল বলত?" ভীষণ রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করল সৈকতেশ।

"'তামিল'ও বলত। তবে, 'তেঁতুল'টাই বেশি শুনতাম।"

"আমিও শুনি," গলা নামিয়ে বলল সৈকতেশ।

পাঁচ সেকেন্ড নীরবতা। তার পরই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ছেলে আর বাবা!

আনন্দের ঢেউয়ের দোলায় কেটে গিয়েছিল দিনটা, কিন্তু পরদিন কন্যাকুমারী থেকে মাদুরাই ফেরার পথে একদম বিনা নোটিশে শরীর খারাপ করতে শুরু করল শিবশঙ্করের।

রাতে অবস্থা গুরুতর হলে, স্থানীয় একটি হাসপাতালে বাবাকে ভর্তির চেষ্টা শুরু করে সৈকতেশ। সেই সময় থেকে বাবার চলে যাওয়া অবধি চারটে দিন অন্য এক লড়াই শুরু হয়ে যায়, পরিস্থিতির সঙ্গে। নাম এস কৃষ্ণন, অথচ তামিল বলতে বা বুঝতে পারে না একবর্ণ এ কেমন রঙ্গ? প্রতিবার বাবার শরীরের হালহকিকত জানতে গেলেই ডাক্তার বা নার্স গড়গড়িয়ে যা বলে যেতে থাকেন তা সৈকতেশের মাথা ভোঁ-ভোঁ করানো ছাড়া অন্য কোনও কাজেই লাগে না। উল্টো দিকে প্রতি মুহূর্তে হাত কামড়াতে ইচ্ছে হয়, ভেলোরের হাসপাতালে বাবাকে রেখে না দিয়ে সঙ্গে করে দেশভ্রমণে বেরনোর জন্য।

"তুমি আমাকে একটুও তামিল শেখালে না কেন বাবা?" যতটা সময় বাবার কাছে বসে থাকত, মনে মনে, কখনও আওয়াজ করেও, এই কথাই বলত সৈকতেশ।

"যা শিখেছিস তাতেই তোর কাজ চলে যাবে," দ্বিতীয় দিন গভীর রাতের মাথায় উত্তর দিলেন শিবশঙ্কর।

সৈকতেশের প্রথমে মনে হচ্ছিল ও স্বপ্নে কিছু শুনছে, তার পর যখন দেখল যে স্বপ্নটাই বাস্তব, চোখের জল বাঁধ মানল না আর। মাদুরাইয়ের হাসপাতালে মৃত্যুপথযাত্রী বাবার বেডের পাশে শব্দ জুড়ে যাচ্ছিল ওর কান্নায়, সৈকতেশ ঠেকাতে পারছিল না।

"আমার গান মনে থাকলে এটাও মনে রাখিস যে, ঈশ্বর ছোট থেকে অগ্নিবেশে এসেছেন তোর কাছে। দাদাকে নিয়ে যেতে, মাকে নিয়ে যেতে, এ বার আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে হয়তো। কিন্তু তুই তাই বলে, অগ্নিবেশধারী ঈশ্বরকে ভয় পাস না যেন, ওই আগুনের আলোই পথ চলতে সাহায্য করবে তোকে।"

সেই সময় ভেলোরে কিছু বাঙালি যেত, পুরো দক্ষিণ ভারতটাই বাঙালির চিকিৎসা-ভ্রমণের নন্দনকানন হয়ে ওঠেনি। বাবার চলে যাওয়ার মুহূর্তে সৈকতেশের মনে হয়েছিল ওই মাদুরাই শহরে বোধহয় দু'জনই বাঙালি কেবল, এক জন মৃত আর জীবিত এক জন। কী আশ্চর্য, দু'জনেরই পদবী 'কৃষ্ণন'।

এটিএম তখনও সময়ের গর্ভে, হাসপাতালের বিল সহ বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য পনেরো বছরের জন্মদিনে মায়ের দেওয়া সোনার চেন বিক্রি করতে গিয়ে হাত কেঁপে গেছে সৈকতেশের। তবু অসুবিধে

পাহাড় হতে পারেনি, ভাষার ব্যবধান ডিঙিয়ে পাশে পেয়েছে মানুষকে। শান্তি পেয়েছে ভেবে যে, মাদুরাইতে জন্ম নেওয়া মানুষটা মাদুরাই থেকেই পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন। তবু ওখানেই বাবার শ্রাদ্ধশান্তি করতে মন সায় দেয়নি। বাবার অস্থিভস্মের অর্ধেকটা ভাইগাই নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে বাকিটুকু নিয়ে ফিরে এসেছে কলকাতায়, হাওড়া থেকেই বিশ্বভারতী ধরে চলে গেছে বোলপুর। পূর্বপল্লী শেষ হয়ে আসছে এমন একটা বিন্দুতে মাটির গভীরে সেই সম্বলটুকু মিশিয়ে দেওয়ার পরে একটা ল্যাংড়া আম হাত দিয়ে চেপে সব রসটুকু বের করে দিয়ে আঁটিটা পুঁতে দিয়েছে মাটির গভীরে। বাবা আম খেতে ভালবাসতেন তো!

কলকাতার মঠে শ্রাদ্ধশান্তির কাজ সেরে একদম মুক্তপুরুষ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন এক দিন দীপকদার সঙ্গে গড়িয়াহাটে দেখা। বিহারের একটা ক্লাবকে ট্রেনিং দিতে চার মাস বোকারোয় ছিলেন দীপকদা। নিজেই বললেন।

"তোমার বৌদিকেও নিয়ে গিয়েছিলাম। বেচারি একা-একা কী করবে এখানে?"

"জানি, বাড়ি গিয়েছিলাম এর ভিতরেই।"

"বাড়িতে গিয়েছিলে? জরুরি কোনও ব্যাপার?"

"মিটে গেছে," নিজের অল্প চুল ওঠা মাথায় হাত বোলাল সৈকতেশ।

"বাবাও চলে গেলেন?" আঁতকে ওঠা গলায় জিজ্ঞেস করলেন দীপকদা।

"আজ্ঞে, এখন আমি ছাড়া আমার ফুল ফ্যামিলি ও পারে।"

"বিয়ে করতে হবে তোমায়। খুব শিগগির বিয়ে করতে হবে।"

"কিন্তু কেন দীপকদা?"

"কেন মানে? দাদা, তার পর মা, এ বার বাবা! তোমাদের বাড়িতে কি কেবল শ্রাদ্ধই হয়ে যাবে নাকি? বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন কিচ্ছু হবে না?"

বিপুল যন্ত্রণা বিপুলতর হাসি হয়ে বেরিয়ে এল। সৈকতেশ আটকাতে পারল না।

দীপকদা সেই হাসিতে যোগ দিয়েই গম্ভীর হয়ে গেলেন, "আমার মেয়েটাকেও তো ক্রিজে রাখতে পারলাম না। পারলে রঞ্জি ট্রোফি আজই শুরু করে দিতাম।"

কথাটা শুনে মুহূর্তের জন্য চুপ করে গেল সৈকতেশ। তার পর প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টায় বলে উঠল, "আগে তো চাকরি-বাকরি জোটাই, ট্রোফি তো অনেক পরের ব্যাপার দীপকদা।"

হেলমেট পরতে অস্বস্তি হত সৈকতেশের। কী রকম যেন দৃষ্টি বিঘ্নিত হচ্ছে বলে মনে হত। জোরে বোলারদের বিরুদ্ধেও একটা টুপি পরে কিংবা একদম খালি মাথায় ব্যাট করতে পছন্দ করত ও। মালবিকাদের বাড়ি প্রথম বার গিয়ে অবশ্য মনে হয়েছিল যে হেলমেট নয় কেবল, পায়ের প্যাড আর হাতের গ্লাভস ছাড়াই নিধিরাম সর্দার হয়ে ক্রিজে দাঁড়িয়ে গেছে।

সেই সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন নড়বড় করছে; মালবিকার বাবা, অর্থনীতির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, মৌলিনাথ মজুমদার, সৈকতেশকে খুব যত্ন নিয়ে বোঝাচ্ছিলেন সমাজতান্ত্রিক ধারণার সঙ্গে পুঁজিবাদী বাস্তবতা যেহেতু বর্তমানে মিলে যাচ্ছে, তাই সমাজবাদের পতন পুঁজিবাদের পক্ষেও খারাপ সময় আনছে।

সৈকতেশের মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল সবটাই কিন্তু উনি সেটা বুঝে বা না-বুঝে বকে যাচ্ছিলেন আরও, এমন সময় মালবিকার মা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন।

সেই আবির্ভাব সৈকতেশকে রক্ষাকবচ দেয়, কারণ অর্থনীতিকে তেল আনতে পাঠিয়ে সৈকতেশদের পারিবারিক রবীন্দ্রচর্চা নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয় এবার। চেনা পিচ পেয়ে সৈকতেশও একটু চালিয়ে খেলতে শুরু করে। কিন্তু সন্ধে হলেই যে বাঘের ভয়, কে জানত!

স্কুলে থাকতে আবৃত্তিতে বেশ কয়েক বার প্রাইজ় পেয়েছে সৈকতেশ। তার অন্যতম কারণ ছিল, ও বড় কবিতাও নির্ভুল বলে যেতে পারত। মালবিকা আর ওর মায়ের অনুরোধে সেই রকম বড় একটি কবিতাই মধ্যে মধ্যে বাদ দিয়ে বলতে শুরু করল ও। 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা/ আঁধারে মলিন হল—যেন খাপে ঢাকা/ বাঁকা তলোয়ার;' যত ক্ষণ বলছিল তত ক্ষণ কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু যে মুহূর্তে, 'হে হংস-বলাকা/ আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।' উচ্চারণ করল গভীর আবেগে, মালবিকার বাবা সোফায় বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে "বন্ধ করো, বন্ধ করো" বলতে বলতে এগিয়ে এসে জামার কলার চেপে ধরলেন সৈকতেশের।

হতভম্ব সৈকতেশ পুরো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে গেল, বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকাল ঘরে উপস্থিত অন্যদের দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে মালবিকার জামাইবাবু সম্রাট, মৌলিনাথকে সৈকতেশের থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, ওপরচালাকি ঢঙে বলে উঠল, "ওটা কোনও ব্যাপার নয়, বাবার একটা মাইনর অ্যাটাক হয় মাঝেমাঝে। ইউ কন্টিনিউ উইথ দ্য কবিতা। গ্রেট হচ্ছে।"

মালবিকার মা একটু থতমত গলায় বললেন, "আসলে ওর সর্বস্ব ও ভাবে চলে গেল তাই..."

সৈকতেশ কিছু বুঝতে না পেরে মালবিকার চোখে চোখ রাখতেই দেখল মালবিকা কাঁদছে। একটির পর একটি অশ্রুবিন্দুর সমন্বয়, অশ্রুধারার রূপ নিয়ে গড়িয়ে নামছে মালবিকার দুই গাল বেয়ে।

মালবিকার বাবাকে নিজের ঘরে দিয়ে আসবার নাম করে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল মালবিকার জামাইবাবু। মৌলিনাথ আর ওই ঘরে এলেন না কিন্তু সম্রাট ফিরে এসে রাজনীতি, ব্যবসা, প্রফিট, প্রোমোশন নিয়ে অনর্গল বকতে থাকল।

সৈকতেশ শুনছিল কিন্তু জবাব দিচ্ছিল না বিশেষ।

আসলে তাল কেটে গিয়েছিল সেই সন্ধ্যার। এ তো আর সৈকতেশের দিদিমার হবু জামাইকে ডেকে পঞ্চব্যঞ্জন খাওয়ানোর ধ্রুপদী নয়, হাই-টি'র আধুনিক আয়োজন। তাও হয়তো ঘণ্টা তিনেক চলত আলাপ-আলোচনা কিন্তু মৌলিনাথের ওই আকস্মিক বিস্ফোরণের অভিঘাতে দু'ঘণ্টার আগেই ড্রপ সিন পড়ে গেল।

"তুমি কাঁদছিলে কেন? একে আমার চালচুলো নেই, তায় তেঁতুল না আমড়া সেই কনফিউশন তো রয়েছেই। একমাত্র মেয়ের জন্য কোন বাপ এরকম বকচ্ছপ পাত্র চায় বলো তো?" মালবিকাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরিস্থিতি একটু হালকা করার জন্য বলল সৈকতেশ।

মালবিকা ওর সঙ্গেই হেঁটে আসছিল। গলির মুখে থমকে গিয়ে বলল, "তুমি ভুল করছ। বাবা ইকনমিক্সের নামকরা প্রফেসর ছিল, সাউথ ইন্ডিয়ান, নর্থ ইন্ডিয়ান, নাগা-মিজো-নেপালি অনেক ছাত্র পড়তে আসত বাবার কাছে।"

"আমি যে কোন ইন্ডিয়ান সেটা নিয়েও তো সংশয়, তাই না?"

"ও রকম কোনও ব্যাপার নেই। আমাদের আশি বছরের পুরনো বাড়ি, যেখানে এক সময় পাড়ার পুজোর নাটক আর নাচের রিহার্সাল হত একই সঙ্গে, প্রোমোটারের হাতে চলে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটা বাবা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না।"

"কিন্তু যাচ্ছে কেন?

"যাচ্ছে কারণ 'বলাকা' চিটফান্ডে বাবার আজীবনের রোজগার জলাঞ্জলি গিয়েছে। তোমার মুখে ওই শব্দটা শুনে, বাবা আর নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি তাই।"

মালবিকার বাবার ওই আচরণে যত বিস্মিত হয়েছিল, তার চেয়েও বেশি অবাক হল সৈকতেশ, কথাটা শুনে। যে 'বলাকা' নিয়ে গত এক-দেড় বছর ধরে অজস্র লেখালিখি কাগজে-কাগজে, যেখানে চটের তলা থেকে কুড়ি টাকা বের করে দেওয়া সব্জিবিক্রেতা, কোমরের গেঁজে থেকে দশ টাকা দিয়ে দেওয়া রিকশাওয়ালা বেশি সুদের লোভে টাকা রেখে ডুবেছে, অর্থনীতির নামজাদা অধ্যাপকও টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন সেখানে? কিসের যুক্তিতে?

"মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে তখন তো সে যুক্তি-ফুক্তির ধার ধারে না তাই না? তা ছাড়া ব্যাপারটা যে এ রকম হবে কেউ ভাবতেই পারেনি," সৈকতেশকে চুপ করে থাকতে দেখে মালবিকা বলল।

"যে কেউ আর তোমার বাবা এক?"

"বাবা তো আর প্রথমে অনেক টাকা রাখেনি। কিন্তু যখন তিন-চার মাস ধরে ওরা চব্বিশ পার্সেন্ট সুদ দিয়ে গেল, তার পর সেটা সাতাশ পার্সেন্ট অবধি তুলে দিল তখন আর সামলাতে পারেনি।"

"কী সামলাতে পারেননি? লোভ?"

"কেন, মানুষের লোভ থাকা কি অন্যায়?"

"এটা কোন মালবিকা কথা বলছে?"

"যে মালবিকা ডাকাতি আটকেছিল, সেই বলছে। মানুষের লোভ থাকবে না? একটু ভাল খাওয়ার লোভ, ভাল ভাবে থাকার লোভ, ভাল-ভাল জায়গায় ঘোরার লোভ, কার নেই?"

"আমারই নেই। আশা করি তুমি সেটা মানো।"

"নেই কারণ তোমার অসম্ভব ভালমানুষির লোভ আছে। সেই লোভ থেকেই তো..."

"তোমায় পটাতে দোকানে ঢুকেছিলাম। পুরো কথাটা বলো," সৈকতেশ শান্ত গলায় বলল।

"না বলব না, আমি আর ঝগড়া করতে পারছি না। ইনফ্যাক্ট আমি আর সহ্যই করতে পারছি না, বাবার পাগলামি, মায়ের উদাসীনতা আর দিদির বরের চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা। বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট যে তুলবে সেই প্রোমোটারটাকে ওই সম্রাটদাই ধরে এনেছে কোত্থেকে যেন, লোকটার সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলেই বোঝা যায় যে চিটিংবাজ। সব মিলিয়ে আমার দমবন্ধ লাগছে পুরো। তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো, আমাকে নিয়ে চলো এখান থেকে।"

"আমি তো থাকি একটা দেড়কামরার ভাড়াবাড়িতে। সেখানে কি এই আশি বছরের হাভেলিতে বড় হওয়া মেয়ে গিয়ে থাকতে পারবে?"

"টন্ট কোরো না সৈকতেশ, প্লিজ়।"

"টন্ট করছি না। আমি শুধু বলছি যে..."

"কিছু বলতে হবে না। তুমি আমাকে রাস্তার ওপারে ওই ফুচকাওয়ালার কাছে ছেড়ে দিয়ে যেখানে যাওয়ার চলে যাও।"

মিনিট দশেক পর একটা ফুচকা মুখে আর একটা হাতে নিয়ে মালবিকা জিজ্ঞেস করল, "তেঁতুল-জল ছাড়া ফুচকা হয় ভাইয়া?"

ফুচকাওয়ালা হেসে ফেলল, "ইমলি বিন ফুচকা ক্যায়সে হোবে দিদি?"

"দেখেছ, এক জন ফুচকাওয়ালার অবধি তেঁতুল ছাড়া চলে না।"

"তাতে কী?"

"আমার কী ভাবে চলবে তবে?" বলতে বলতে বাবার মতো করেই সৈকতেশের শার্টের কলার চেপে ধরল মালবিকা।

আর এ বার খারাপ লাগার বদলে আনন্দের স্রোতে ভেসে গেল সৈকতেশ।

স্রোতের সৃষ্টি মস্তিষ্কে না হলেও মস্তিষ্কের ভিতরের স্রোত যখন থেমে যায় তখন গোটা মানুষটাই একটা বদ্ধ ডোবায় রূপান্তরিত হয়। অজস্র চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ওর আর মালবিকার বিয়ের তারিখ যখন পাকা হল, তখন সবার আগে বাগচী স্যরকে জানাতে ছুটে গিয়েছিল সৈকতেশ। কয়েক মাসের জন্য কানাডার মন্ট্রিয়লে থিতু মেয়ের কাছে থাকতে গিয়েছিলেন স্যর। কিন্তু শরীর খারাপ হওয়ায় ওখানে প্রায় দেড় বছরের মতো থেকে যান। যাওয়ার আগে একটা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে গিয়েছিলেন সৈকতেশকে, সেখানে করা কাজের সূত্রে আরও একটা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি ওর কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসে। যে চাকরি করত, সেটা ছেড়ে দিয়ে বর্তমানে দুটো কোম্পানির কাজ করছিল সৈকতেশ আর বলা বাহুল্য তাতে রোজগার বেশি বই কম হচ্ছিল না।

স্যর ফিরে এসেছেন শুনে, নিজের জীবনের বড় খবরের পাশাপাশি আর এক বার প্রণাম জানানোর জন্য মন ছটফট করছিল ওর। কিন্তু স্যরের বাড়িতে গিয়ে পাঁজরে বড় ধাক্কা খেল। স্যর চিনতেও পারলেন না ওকে।

"তুমি দুঃখ কোরো না। ও আমাকেও সিকিভাগ চিনতে পারছে," কুন্তল বাগচীর বিছানার পাশে একটা বেতের চেয়ারে বসে থাকা প্রশান্ত সারেঙ্গি বললেন।

"সিকিভাগ মানে?"

"মানে, ষাটের দশকের একদম গোড়া অবধি মনে আছে কুন্তলদার। কিন্তু তার পরের আঠাশ-তিরিশ বছরের ইতিহাস কেউ স্লেটে জলন্যাতা টেনে মুছে দিয়েছে।"

"নাম কি এই অসুখটার? ডিমেনশিয়া নাকি অ্যালঝাইমার্স?"

"অতশত আমি বলতে পারব না তবে এখানকার এক বড় ডাক্তার দেখছেন, তিনি আমাকে সহজ ভাবে বোঝালেন ব্যাপারটা।"

"কী রকম শুনি।"

"ডাক্তারবাবু বললেন যে, কুন্তলদার মাথার ভিতরটা এখন সেই আদ্যিকালের দেওয়ালঘড়ির মতো যার কাঁটাগুলো বারোর ঘর থেকে ছয়ের ঘর অবধি যায়, আবার ছয় থেকে বারোয় ফিরে আসে। সার্কল কমপ্লিট করতে পারে না।"

"তাই বারো থেকে ছয় অবধি, মানে আপনাকে মনে আছে কিন্তু ছয়ের পরে আট-নয়-দশে যা কিছু ছিল, অর্থাৎ আমার মতো ফালতুদের, ভুলে গেছেন।"

"আমাকেও পুরো মনে নেই। নিজের যৌবনটুকু মনে আছে, সেই সূত্রে আমার ওই সময়টাও মাথায় গেঁথে আছে। আর আছে বলেই এখন আমাকে দেখলে অদ্ভুত আচরণ করতে থাকেন। মানে, কুন্তলদার কাছে যেহেতু অতীতটাই বর্তমান এখন তাই আমাকে দেখলেই ওর মনে হতে থাকে যে প্রশান্ত নিশ্চয়ই খুব ক্ষুধার্ত, রাস্তায় চপ ভাজছে খালিপেটে, ওর জন্য এখনই কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।"

কথাগুলো হাসিমুখেই বলছিলেন প্রশান্ত সারেঙ্গি কিন্তু চশমার ফাঁক গলে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল ওঁর চোখ দিয়ে।

"কিন্তু সে ক্ষেত্রে উনি কানাডায় থাকলেই বোধহয় ভাল হত, তাই না? আমি চিকিৎসার দিক দিয়ে বলছি।"

"এই অসুখের বিরাট কোনও চিকিৎসা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। আর হলেও কুন্তলদাকে ভেড়া চরাতে দেখতে পারছিলাম না আমি।"

"মানে?"

"মানে, আমার ছোট ছেলে আপস্টেট নিউইয়র্কের আলবেনি শহরে থাকে। এই গরমে ওর কাছে গিয়েছিলাম যখন, তখনই কুন্তলদার মেয়ের সঙ্গে ফোনে কথা হয় আমার। আলবেনি থেকে মন্ট্রিয়ল তিন ঘণ্টার রাস্তা, বর্ডারে পাসপোর্ট-ভিসা চেক করতে আরও এক ঘণ্টা। এ বার মন্ট্রিয়লে কুন্তলদার মেয়ে কাজরী আর তার ড্যানিশ স্বামী বালতির বাড়িতে গিয়ে দেখি, কুন্তলদা ভেড়ার পালের পিছনে পিছন হেঁটে চলেছে।"

"কিছু বুঝতে পারছি না। আর একটু খোলসা করুন।"

"আরে ওই বালতির বাড়ি তিন একর জমির উপর। আর ওদের পঞ্চাশটার উপর ভেড়া আছে। বাড়ির সবাইকে ওই ভেড়ার দেখভাল করতেই হবে এমনটাই নিয়ম। আর যদি কেউ তা করতে পারার মতো সক্ষম না হয়, তবে আমেরিকার রীতি অনুযায়ী সেই বুড়ো কিংবা বুড়ি ওল্ড-এজ হোমে চলে যাবে। কুন্তলদার মেয়ের মুখেও যখন একই কথা শুনি, তখনই ঠিক করি যে ওকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনব। ওই কাজরী আর বালতির ভরসায় রাখলে..."

"স্যরের জামাইয়ের নাম বালতি?"

"হ্যান্স বাকেট। আমি বালতি বলে ডাকি। কুন্তলদা অবশ্য নিজের

মেয়েকে দু'বছরের ভাবে এখন। স্মৃতি ওখানেই থেমে আছে তো।"

ওদের কথার ভিতরেই যেন গা ঝটকা দিয়ে উঠলেন কুন্তল বাগচী, "এই যে প্রশান্ত, তুমি এসে গেছ দেখছি। সঙ্গে এই ছেলেটি কে? চলো, ওকেও নিয়ে চলো।"

"কোথায় যাব আমরা এখন?" প্রশান্ত জানতে চাইলেন।

"কেন, রোজ বিকেলে আমরা রেড রোডে ঘুরতে যাই, তুমি জানো না?"

"জানি তো। কিন্তু কেন যাই?"

"এটা একটা প্রশ্ন হল প্রশান্ত? যাই প্রতিবাদ করতে।"

"কিসের প্রতিবাদ?"

"ঘোড়ার উপর চড়া গোরা পুলিশ আমার কোমরে লাথি মেরেছিল, নেটিভ হয়েও আমি রেড রোড ধরে হাঁটছিলাম বলে সে তো তোমার জানা। তার পর আমি দেড় মাস বিছানায় পড়ে রইলাম আমার মাজার হাড়ে চিড় ধরায়, তোমার মনে নেই?"

"একটু একটু আছে।"

"আজ যখন ভারত স্বাধীন হয়েছে, তখন রেড রোড ধরে প্রত্যেক দিন হাঁটতে হবে আর চিৎকার করে বলতে হবে যে, এটা আমাদের দেশ। আমরা তার যে-কোনও রাস্তা ধরে হাঁটতে পারি, যত দূর খুশি, যত ক্ষণ খুশি হাঁটতে পারি।"

সহ্য করতে না পেরে উঠে দাঁড়াল সৈকতেশ। টের পেল যে ওর দু'চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে।

প্রশান্ত সারেঙ্গিও বুঝতে পেরেছিলেন, সৈকতেশ কাঁদছে। গলা একটু নামিয়ে বললেন, "এ বার বলো, ওই সাত সমুদ্রের পারে, একা মরার জন্য এই মানুষটাকে ফেলে আসা যায়?"

"আমার নিজের সম্পর্কে মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানেন?" সৈকতেশ রাস্তায় বেরিয়ে স্বগতোক্তি করল।

"কী মনে হয়?"

"মনে হয়, পঁচিশ পেরনোর আগেই যে ছেলেটা নিজের বাবা-মা-দাদাকে হারিয়েছে, যার আত্মীয় নেই কোনও, যে নামে তামিল, সংস্কৃতিতে বাঙালি, ডিগ্রিতে ইঞ্জিনিয়ার তার পরিচয়টা আসলে কী?"

"তার পরিচয় এই যে, সে খেয়ে মুখ মুছে ফেলতে পারে না। পারলে আজ নিজের স্যরকে দেখতে আসত না।"

"উনি আমার জন্য যা করেছেন..."

"কুন্তলদা অনেকের জন্যই করেছেন সৈকতেশ। কিন্তু আর কে আসছে খোঁজ নিতে?"

"যা করার আপনিই করছেন, আমি জানি। তবে স্যরের জন্য সব সময় আমি আছি এইটুকু জানবেন। খেয়ে মুখ মুছে ফেলতে শিখিনি। কিন্তু..."

"কিন্তু কী সৈকতেশ?"

"আজ তো আপনি আমাকে ফিশ-ফ্রাই খাওয়াননি। মুখ মুছতামই বা কী করে?"

সৈকতেশের কথা শেষ হতেই প্রশান্ত সারেঙ্গির অট্টহাসি পথচলতি মানুষদেরও চমকে দিল।

সৈকতেশ নিজে অবশ্য অনেক বেশি চমকে গিয়েছিল ওর বিয়ের মেনুকার্ড দেখে। গলদা চিংড়ি কোত্থেকে এল, ভেটকি পাতুরির বরাত কে দিয়েছে?

ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে, সৈকতেশ আর মালবিকার বিয়ের ঠিক এগারো দিন আগে মালবিকার দিদির বর সম্রাটকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। তখনই মজুমদার বাড়ির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে সম্রাটের কীর্তিকলাপ শুনে। ব্যাঙ্ককর্মী সম্রাট প্রতিদিন নিজের ব্রাঞ্চের ক্যাশিয়ারের সহযোগিতায় পাঁচ-সাত লাখ নগদ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে চালান করে দিত হাওড়া আর বড়বাজারের দুটো মস্ত সাট্টার ঠেকে। ওর ব্রাঞ্চ থেকে দুটো জায়গাতেই সহজে পৌঁছে দেওয়া যেত আর ব্যাঙ্কের এক পিয়নের তত্ত্বাবধানে দুপুর বারোটা, সাড়ে বারোটার মধ্যে বেরিয়ে যেত টাকা।

ওই টাকাটাই বিকেল সাড়ে চারটে, পাঁচটা নাগাদ ঘুরে আসত ব্যাঙ্কে, পঁচিশ-তিরিশ হাজার অতিরিক্ত সমেত। সেই অতিরিক্তটাই ছিল এই দু'নম্বরির সঙ্গে জড়িতদের লাভ।

ব্যাঙ্কের দৈনন্দিন কাজের কোনও চোখে পড়ার মতো সমস্যা না করে প্রতিদিন কারও পকেটে পাঁচ, কারও তিন, কারও দুই ঢুকছিল। হয়তো অনন্তকাল এ ভাবেই চলত কিন্তু সাত দিনের চোরা এক দিন ধরা পড়েই, তাই কোনও এক বৃহস্পতিবার টাকাটা ব্যাঙ্কে ফেরত দিতে আসছিল যে দু'জন, তাদের এক জনের বুকে বুলেট এসে লাগে আর এক জনের হাত থেকে স্যুটকেস ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় দেয় আরও একটু বড় মাপের মাফিয়ারা। ওদিকে ঘড়ির কাঁটা পাঁচটা পেরিয়ে ছ'টা, ছ'টা পেরিয়ে সাতটা ছুঁইছুঁই হলেও হিসেব মেলানো যায় না ব্যাঙ্কের টাকার।

ম্যানেজার নিরুপায় হয়ে পুলিশে ফোন করেন। পুলিশ আসার আগেই বাথরুমে যাওয়ার নাম করে কেটে পড়ার চেষ্টা করেছিল সম্রাট কিন্তু ওদের পাপের সঙ্গী সেই পিয়নের ইশারাতেই চার-পাঁচ জন সহকর্মী ওকে পাকড়াও করে ফেলে।

ক্যাশিয়ার এবং সম্রাট সমেত ব্রাঞ্চের আরও তিন জনকে কোমরে দড়ি বেঁধে ভ্যানে তোলে পুলিশ; বেসরকারি সব টিভি চ্যানেলের জন্ম হতে তখনও দশ বছর দেরি ছিল বলেই ব্যাপারটা 'ব্রেকিং' হয় না সেই মুহূর্তে। তবে পরদিন অন্তত দু'টি খবরের কাগজের তৃতীয় পৃষ্ঠায় বড় করে বেরোয় খবরটা, সম্রাটের ছবি এবং নাম দিয়েই।

মালবিকার বাবার যেটুকু সুস্থতা অবশিষ্ট ছিল, এই এক খবরেই চৌপাট হয়ে গেল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে চার দিনের মাথায় 'মনবাউল' বলে মনোরোগীদের সুস্থ করে তোলার একটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করতেই হল মৌলিনাথকে।

মালবিকার দিদি মধুরা পুরো ব্যাপারটাকেই 'চক্রান্ত' বলে অভিহিত করে বড় উকিল লাগানোর জন্য মা এবং বোনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগল।

সবচেয়ে অবাক করা কাণ্ডটি ঘটালেন মালবিকার মা নিজে। তিনি ছোট মেয়েকে বিয়ের পর দেবেন বলে যে টাকাটা রেখেছিলেন সেটা মধুরাকে দিয়ে দিলেন আর তার পর 'মন ভেঙে গেছে'র অজুহাতে হরিদ্বারে গুরুদেবের আশ্রমে চলে গেলেন এক মাসের জন্য।

ফলে যা দাঁড়াল, মালবিকা আর সৈকতেশ ছাড়া ওদের দু'জনের বিয়ে সুসম্পন্ন করার জন্য আর কেউ রইল না ধারেপাশে। গোদের উপর বিষফোড়া, প্রায় এক লাখ টাকা সম্রাটের হাতে দিয়ে এক রকম নিশ্চিন্ত ছিল সৈকতেশ, বৌভাতের বাড়ি ভাড়া নেওয়া, ডেকরেশন, কেটারিং ইত্যাদি বিষয়ে, সেটা জলে গেল বলতে গেলে।

"তোমাদের আমার কাছে আর একটু আগে আসার কথা মনে হল না?" সৈকতেশের সঙ্গে মালবিকাকে দেখে প্রশ্ন করলেন, প্রশান্ত সারেঙ্গি।

"আমাদের বিয়ে আর বৌভাত যদি এক সঙ্গেই করে দেওয়া যায়..."

মালবিকাকে থামিয়ে দিলেন প্রশান্ত, "নেমন্তন্নের চিঠি যখন চলে গেছে তখন বিয়ে এবং বৌভাত দুটোই হবে। আলাদাই হবে।"

"কিন্তু বৌভাতের বাড়িই এখনও..."

"সেটার দায়িত্বও আমি নিলাম, চিন্তা কোরো না," প্রশান্ত সারেঙ্গি হাসলেন ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে।

সেই হাসিতে একটা অনন্ত ভরসা ছিল কিন্তু তাই বলে গলদা-চিংড়ি? বৌভাতে সাদামাটা ফ্রায়েড রাইসের বদলে বাদশাহি পোলাও? আবার খোদ লখনউয়ের কারিগর এনে বানানো কাকোরি কাবাব?

"কী আরম্ভ করেছেন এগুলো? নিজের ব্যবসা লাটে তুলবেন নাকি আমাকে অফিসের পর জুতোপালিশ করতে বসাবেন রাস্তায়?"

"ভাবছি দ্বিতীয়টাই। কিন্তু তার বদলে তুমি আমার অফিসেও স্বেচ্ছাশ্রম দিতে পারো সৈকতেশ।"

"ইয়ার্কি নয়, আপনি পরপর দু'দিন আমার কথা না শুনে যা নিজের খুশি তাই খাওয়ালেন? ঠিক কতটা লস হবে আপনার কোনও আন্দাজ আছে?"

"আমি কি তোমার হুকুমের চাকর নাকি যে সব কথা শুনতে হবে? আমার ছেলে আর আমার মেয়ের বিয়েতে যা ইচ্ছে হয়েছে তাই করেছি, কাউকে জবাবদিহি করব না। আর শোনো বেয়াদব ছোকরা, সন্তানের বিয়েতে মানুষ খেলে বাপ-মায়ের লস হয় না জানবে!"

"আমি তো অনাথ, আমায় এমন মায়ায় কেন জড়ালেন আপনি?" সৈকতেশ অনেক কষ্টে বলতে পারল।

প্রশান্ত সারেঙ্গির গলাও কেমন বুজে এল, "না করলে বদনাম হত না? কিন্তু এখন তামিল জামাই আর ওড়িয়া কেটারারকে একটাও মন্দ কথা বলতে পারবে না বাঙালিরা। ফাটিয়ে খেয়েছে তো দু'দিনই।"

"তার পরও বলবে। একশো বার বলবে। আমরা পিএনপিসি ছাড়া থাকতে পারি না, জানেন না?" মালবিকা নিঃশব্দে ওদের দু'জনের কাছে চলে এসে বলল।

মালবিকার গলাও কী রকম যেন ভারী। এই বিয়ে আর বৌভাতে মালবিকাও তো সৈকতেশের মতোই একা ছিল। সৈকতেশের কেউ নেই আর মালবিকার থেকেও নেই। ভাগ্যের মার আর ভাগ্যের ফেরও যেন বাঁধা পড়ল ওদের বিয়ে উপলক্ষে।

"খুব টায়ার্ড লাগছে গো," ঘণ্টাখানেক পর মালবিকা বলল।

ক্লান্ত সৈকতেশেরও লাগছিল। নিজের বিয়ে আর বৌভাত উপলক্ষে নিজেকে এত খাটতে হবে কে জানত! কিন্তু ক্লান্তি দূর করার জন্য ফুলশয্যার রাত ঘুমিয়ে কাটায় কে? এই তো সেই রাত, যখন বিন্দু বিন্দু জল জমতে জমতে জলাধার পূর্ণ হয় আর লকগেট খুলে গেলে স্রোতই প্লাবন হয়ে ওঠে।

কথার পিঠে কথার যাবতীয় মুসাবিদা কর্পূরের মতো উবে গিয়ে নৈঃশব্দ্যই হয়ে ওঠে সঙ্কেত; অবিরল বৃষ্টিধারা নেমে আসতে থাকে মরুগোলাপের গায়ে। স্নানে সমৃদ্ধ হতে হতে, স্নানে সম্পূর্ণ হতে হতে তার প্রতিটি পাপড়ি তখন মরুভূমির বালির বদলে আকাশের মেঘের দিকে হাত বাড়ায়।

'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে...' গাইতে গাইতে মা বলত যে, আকাশপানে হাত 'কাহার তরে' বাড়াতে হয়, 'কিসের তরে' নয়। মায়ের কথার অনুরণন হচ্ছিল সৈকতেশের ভিতর-বাহিরে, মনে হচ্ছিল আকণ্ঠ-তৃষ্ণা না থাকলে যেমন কেউ গায়ক হতে পারে না, আজন্ম-তৃষ্ণা না থাকলে প্রেমিক হতে পারে না কেউ।

সেই তৃষ্ণা গাছের গুঁড়ির মতো তামাটে, গাছের পাতার মতো সবুজ আর ফলের মতো লাল হয়ে মাটির ভিতর থেকে রস টানে, টানতেই থাকে। আঙুলের স্পর্শে ভেঙে যায় বাঁধ, তলিয়ে যায় ঘাট। একাকার হয়ে যায়, নিমেষ আর অনিমেষ, শরীর আর সত্তা, চিৎকার আর শীৎকার। নতুন সম্পর্কের ভিতরে এসে পুরনো শব্দও নতুন রূপ নেয়।

কিন্তু মালবিকা সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সৈকতেশ দেখছিল যে, সময় এক আশ্চর্য মাত্রাকে ছুঁয়েছে, যখন চাঁদ ঘুমন্ত কিন্তু সূর্য জন্ম নেয়নি।

জেগে থেকে ওই আলোর অল্পই অনুভব করা যাবে বুঝতে পেরে সৈকতেশ ঘুমোবার চেষ্টা শুরু করল মালবিকাকে জড়িয়ে ধরে। আর ঘুমিয়েও পড়ল এক সময়।

ছাদের দেওয়াল ফাটিয়ে দেওয়ার আগে আলসের মধ্যে বটচারা যেভাবে ঘুমোয়।

৫। শুভ

"মায়ের গর্ভে সন্তান কি জেগে থাকে?"

"জেগে না থাকলে লাথি মারে কী করে?"

"সে তো অনেকেই ঘুমের ঘোরে হাত-পা ছোড়ে।"

"অনেকে, মানে?"

"তোমার কথাই বলছি। তুমি তিন-চার বার অন্তত লাথি, নয় ধাক্কা মেরেছ আমায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে।"

"মোটেই নয়।"

"আমি মিথ্যে বলছি নাকি?"

"তাও বলিনি।"

"তবে?"

"দেখো, এখন আমার প্রেগন্যান্সির অ্যাডভান্সড স্টেজ, আমি যাহা বলিব সত্যই বলিব। লাথি মেরেছি সেটা সত্যি, তবে ঘুমের ভান করে মেরেছি, যাতে দোষটা ঘুমের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে।" মালবিকা দু'হাত দিয়ে আলতো করে নিজের কান পাকড়ে জিভ কাটল।

টেনশন ভুলে গিয়ে হেসে উঠল সৈকতেশ। একটু আগে অবধি ওর মন খচখচ করছিল এই অবস্থায় মালবিকাকে নিয়ে দার্জিলিং বেড়াতে আসা ভুল হয়েছে ভেবে।

মালবিকা সেই খচখচানির কথা জানতে পেরে বলল, "তুমি তো আর নিজের ইচ্ছেয় নিয়ে আসোনি আমায়। আমি জোর করেছি তাই..."

"তবু, রেসপন্সিবিলিটি তো আমার, তাই না?"

"আমার যেন নয়?"

"বুঝলে পাহাড়ে আসার জন্য এ রকম জেদ করতে না।"

"ওই জেদটাই তো আমি গো। ওটা না থাকলে পরে যে প্রলয় চলছিল বাড়িতে তার ভিতরে তোমায় বিয়ে করতে পারতাম? ওই শাড়ি বেচার চাকরির প্রবল চাপ সামলে কলেজ সার্ভিস কমিশনের কঠিন ইন্টারভিউতে উতরোতে পারতাম?"

'শাড়ি বেচার চাকরি' কথাটা কানে লাগল সৈকতেশের। কলেজে চাকরি পাওয়ার আগে অবধি ওটাই তো 'সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং'-এর চাকরি ছিল, মালবিকার কাছে।

"ওই চাকরি না করলে পিতমপুরার মেলায় দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করতে না তুমি, আর তোমার সঙ্গে আমার আলাপও হত না।"

"আলাপ হওয়া ভাগ্যে থাকলে আলাপ হয়েই যায়। দিল্লিতে না হয়ে কলকাতায় পরিচয় হত হয়তো।"

"জানি না হত কি না তবে এটুকু বুঝতে পারছি যে, তোমার আগের চাকরির সম্মান কমে গেছে তোমার কাছে," সৈকতেশ বলা দরকার মনে করল।

"সেটাই স্বাভাবিক নয় কি? বাবার সঙ্গে ছোটবেলায় যখন বাবার কলেজে যেতাম তখন কেউ যদি একটা সাদা চক ধরিয়ে দিত আমার হাতে, তবে আমি আর পাঁচটা বাচ্চার মতো ওই চক নিয়ে খেলতাম না বা মুখেও দিতাম না। যে-কোনও একটা ফাঁকা ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ডে ঢুকে কিছু না কিছু লিখতে চাইতাম। কিন্তু চার-পাঁচ বছরের একটা মেয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের নাগাল পাবে কী করে? বাবা কিংবা বাবার কোনও কোলিগ আমায় কোলে তুলে নিত তাই আর আমি হাবিজাবি একটা কিছু লিখে আসতাম, অ্যাট লিস্ট কয়েকটা দাগ কেটে আসতাম ব্ল্যাকবোর্ডে। মনে হয় তখনই ঠিক হয়ে গিয়েছিল যে আমিও অধ্যাপিকা হব। সবটাই তো পূর্বনির্ধারিত, তাই না?" বার্চহিল রোডের অর্কিড এগজ়িবিশন দেখে ফিরে আসার সময় মালবিকা নিজেকেই প্রশ্ন করল যেন।

দাদা চলে যাওয়ার পর বাবা নিজের পড়াশোনা আর সমাজসেবার বাইরে বেরিয়ে ওকে আর মাকে একটু বেশি সময় দিতেন। কলকাতায় বেড়াতে গিয়ে সৈকতেশকে নিয়ে রোববার সকালের ইংরেজি সিনেমা দেখতে যাওয়া কিংবা গরমের ছুটিতে দশ দিন দার্জিলিঙে এসে থাকা, সেই সময়ের ঘটনা। মালবিকা যখন গোঁ ধরে রইল যে স্বপ্নে যখন দেখেছে, তখন ওই অবস্থাতেই এক বার মহাকাল মন্দিরে পুজো দিতে যেতেই হবে, তখন প্রাথমিক ভাবে অনেক বাধা দিয়েছিল সৈকতেশ। বিকল্প হিসেবে হাজির করেছিল, পুরী অথবা চিল্কার নাম। কিন্তু শেষ অবধি যখন মালবিকার ইচ্ছেই জিতল তখন ওই পনেরো-যোলো বছর আগের অভিজ্ঞতাকে আবার ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে পেয়ে বসল ওকে।

মনে পড়ল, দার্জিলিং গিয়ে সবাই টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে কিন্তু বাবা হাজার বললেও মায়ের তাতে কোনও আগ্রহই ছিল না। মেঘ কেটে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনালি শিখর পিকচার পোস্টকার্ডের মতো স্থায়ী হয়ে রইল পর পর দু'দিন, কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে

পাগলের মতো ছোটাছুটি শুরু করল কত টুরিস্ট, কিন্তু মা কয়েক মিনিট জানলা দিয়ে ওই স্বর্গীয় দৃশ্যের দিকে তাকিয়েই সরিয়ে নিল চোখ। মা ভালবাসত সূর্য ডুবে যাওয়ার পরে ম্যালকে কেন্দ্রে রেখে এক চক্কর, দুই চক্কর হাঁটতে। আর হাঁটতে হাঁটতে নিচু গলায় আবৃত্তি করত, "আঁধার রাতে চলে গেলি তুই/ আঁধার রাতে চুপিচুপি আয়..."

সেই সময়ের দার্জিলিঙে দিন আর রাত্রির মধ্যে স্পষ্ট ফারাক ছিল, অনেক আলো জ্বালিয়ে কারও প্রার্থিত অন্ধকারকে কেড়ে নেওয়া হত না।

পাহাড় নিজে স্থবির বলেই জায়গার স্মৃতি জায়গায় রেখে দেয় বোধহয়। বহু বছর পর দার্জিলিং এসে সেই স্মৃতিগুলোকেই ফ্রিজের দেওয়ালে থাকা চকোলেটের মতো পুনরাবিষ্কার করছিল সৈকতেশ। জিভে নিয়ে দাঁতে কামড়ে বুঝতে পারছিল যে ভিতরটা শক্ত হয়ে গেলেও, স্মৃতির স্বাদ একই রকম মিষ্টি থাকে।

মিষ্টির সঙ্গে মাধুরী মিশলে কি মোহ তৈরি হয়? সন্তান ভিতরে আসার কয়েক মাস পর থেকেই গ্লো করতে থাকা মালবিকাকে দেখে প্রশ্ন জাগত ওর। স্বতঃস্ফূর্ততার মুহূর্তে যখন সাবধানতার কথা মাথায় রাখতে হয়, তখন যা বেশি করে দরকার পড়ে তা যত্ন। রাতে ঘুমোবার আগে, প্লাস্টিকের গামলায় ঈষদুষ্ণ জলে মালবিকার পা ধুইয়ে দেওয়া থেকে ওই সময়ে ঝরে পড়া চুলের থেকে নজর ঘোরাতে ওর পনিটেল বেঁধে দেওয়া, সবই করত সৈকতেশ। ওর আদরের ভিতরের যত্ন পাথরের মধ্যে থাকা রত্নে রূপান্তরিত করত মালবিকাকে।

ঝলমলিয়ে ওঠা মুখে মালবিকা জানতে চাইত, "আমাকে এখন আগের চেয়ে অনেক সুন্দর লাগে না দেখতে?"

সৈকতেশের চোখ আটকে যেত মালবিকার চুলের ফাঁসে জড়িয়ে যাওয়া কানের দুলটায়। মনে হত, ওভাবেই অনেক মৃত্যু পেরিয়ে এসে ও আবার জড়িয়ে গেছে প্রাপ্তি আর প্রেমে।

মালবিকাকে মায়ের গল্প করলে ও কেমন গুটিয়ে যেত, হয়তো স্বপ্ন আর সম্ভাবনার ঝুলনে দুলতে থাকা মনে শোকের ছায়া পড়ুক তা চাইত না। এক জনের কাছে যা স্মৃতি অন্যের কাছে তাই ভার, বুঝতে পেরে অন্য রাস্তা খুঁজতে শুরু করে সৈকতেশ। সেই রাস্তাই ওকে পায়ে পায়ে টেনে নিয়ে যায় রবার্টসন রোডের সেই বাড়িতে, যেখানে রবিন, ক্যানারি, ম্যাগপাই পাখির পাশাপাশি বিরল প্রজাতির সব অর্কিড চোখ জুড়িয়ে দিয়েছিল ওর, আগের বার যখন এসেছিল। কিন্তু তার পর অনেক জল বয়ে গেছে তিস্তা দিয়ে। এ বার একটা দুপুরে একা হাঁটতে বেরিয়ে ও জানতে পারে যে, ওই বাড়ির মালিক স্কটিশ সাহেব, বাড়ি বিক্রি করে চলে গেছেন স্কটল্যান্ডে, বাড়িটা এখন একটা হোটেল। কে জানে কেন, বুকটা মুচড়ে ওঠে কথাটা শুনেই; মালবিকাকে, নিজের কৈশোরের একটা আনন্দময় বাঁক দেখাতে না পারার ব্যর্থতা বিন্দু হয়ে টলমল করে চোখে।

"আচ্ছা ক্যানারি, ম্যাগপাই, রবিনরাও কি স্বাধীন ভারতে জায়গা নেই মনে করে ফিরে গেছে নিজেদের দেশে?" দু'দিন পর সকালের ট্রেনে ঘুম যাওয়ার সময় সৈকতেশ জানতে চাইল, রবার্টসন রোডের বাড়িটায় ও কী রকম অনেক ক্ষণ সময় কাটাত, সেই গল্প শুনিয়ে।

"পাখিদের আবার দেশ হয় নাকি, আকাশটাই তো ওদের দেশ," মালবিকা জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতেই জবাব দিল।

আগের দিন মহাকাল মন্দিরের সামনে গিয়ে আর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে চায়নি মালবিকা। সৈকতেশকে বলেছিল গিয়ে পুজো দিয়ে আসতে। কিন্তু জলাপাহাড়ের জাপানি বৌদ্ধমন্দিরে সৈকতেশের সঙ্গে গিয়ে বসেছিল চুপ করে।

বাবা-মার সঙ্গে যখন এসেছিল, তখন এই মন্দির তৈরি হয়েছিল কি না কে জানে! তবে ওই নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যে বসে স্কুল-জীবনের ধ্যানের অভ্যেস ফিরে এল সৈকতেশের। আর সেই ধ্যানের ভিতরেই অন্য রকম উপলব্ধি হল ওর। আগের বছর কালীপুজোর রাতে মালবিকার খেয়ালেই ওরা কালীঘাটে মন্দিরে মায়ের দর্শন করতে চলে গিয়েছিল। গিয়ে টের পেয়েছিল, ভিড় কাকে বলে। কুম্ভমেলা ইত্যাদিতে তো জায়গা অনেক বেশি থাকে শুনেছে কিন্তু ওই সরু গলিতে কম করে দশ হাজার লোক, সৈকতেশের মাথা কাজ করছিল না। গর্ভগৃহে, প্রদক্ষিণের সময় মালবিকা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল ওর থেকে, সৈকতেশ এদিক-ওদিক মাথা ঘুরিয়ে কেবল কালো নয়তো সাদা মাথা দেখছিল। গলা তুলে মন্ত্র বলে যাচ্ছিলেন পুরোহিত, কিন্তু সৈকতেশ, "কালী কালী, মহাকালী..." ব্যতিরেকে আর কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না। ওর দুই চোখ তখন মালবিকাকে দেখতে চাইছে, কান মালবিকার কণ্ঠস্বর শুনতে চাইছে আর হাত চাইছে মালবিকার আঙুল স্পর্শ করতে।

বুদ্ধমন্দিরের নির্জনতায় সৈকতেশের বোধ হল যে, সে দিন কালী মন্দিরের গর্ভগৃহে মালবিকা ওর থেকে দূরে ছিল না; যেমন আজ ওর পাশে চোখ বন্ধ করে বসে থাকা মালবিকা, বিরাট কিছু কাছে নেই। যে মানুষ মহাকালীর সন্তান, সেই মানুষই মহাকালের রচয়িতা। প্রতিটা 'আজ'কে 'গতকাল' আর প্রতিটি 'আগামী'কে 'আজ' করে তোলার প্রক্রিয়ার ভিতরে যখন সবাই রয়েছে তখন 'দূরে' এবং 'কাছে' দুটো শব্দই আপেক্ষিক। সত্য কেবল মহাকালী আর মহাকালের ভিতর জেগে থাকা 'বোধি', যাঁকে ধারণ করে গৌতম হয়ে ওঠেন বুদ্ধ।

মানুষের মধ্যে একটা রক্তের সমুদ্র থাকে বলেই কি সমুদ্রের তরঙ্গ দোলা দেয় তাকে? উত্তর যাই হোক, সেই সমুদ্রের মাঝে মাঝে নদীর জল দরকার হয়, বিশেষ করে ইমার্জেন্সির সময়। মালবিকার পেটের ভিতরে থাকা বাচ্চার গলায় নাড়ি পেঁচিয়ে গিয়েছিল, ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে বলে, 'কর্ড অ্যারাউন্ড দ্য নেক'। কিন্তু সময় কখনও-সখনও সমস্যাগুলোকে সময় দিয়েই সমাধান করে দেয় তাই নার্সিং হোমের সরু একটা প্যাসেজে একটু ঝিমিয়ে থাকা সৈকতেশের কাঁধ চাপড়ে ডাক্তারবাবু যখন বললেন যে, ও একটি পুত্রের পিতা হয়েছে সদ্য তখন ঘড়ির কাঁটা একইসঙ্গে ক্লকওয়াইজ় আর অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ় ঘুরতে শুরু করল। বর্তমান থেকে অতীতে, কলকাতা থেকে পুরুলিয়ায়, ডিউজ়-বল থেকে ক্যাম্বিসে; আবার অতীত থেকে ভবিষ্যতেও, অধিকার থেকে উত্তরাধিকারে, বাবার ছেলে থেকে ছেলের বাবায়।

"একটু বেশিই ব্লিডিং হয়েছে, ওই লোকটি সময়ে এসে রক্ত দেওয়ায় অনেক উপকার হয়েছে আমাদের। ওকে বাইরে নিয়ে গিয়ে কিছু খাইয়ে দিয়ো," ডাক্তারবাবু গলা নামিয়ে বলে গেলেন সৈকতেশকে।

ডাক্তারবাবু চলে যেতেই লোকটির দিকে তাকিয়ে সৈকতেশ বুঝতে পারল যে, ও চেনা কারও দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু কী ভাবে চেনা?

"তুমি ডাক্তার হওনি?" লোকটা সৈকতেশের দিকে এগিয়ে এল।

তখনই এক ঝটকায় সব মনে পড়ে গেল। প্রতাপ দত্ত। পুরুলিয়া থেকে মাধ্যমিক পাশ করে কলকাতার যে কলেজে এসে ভর্তি হয়েছিল সৈকতেশ, সেখানেই ওর ক্লাসমেট ছিল।

"সেই তুমি ব্যাঙ ডিসেকশন করেছিলে আর মাইতি স্যর সবাইকে ডেকে দেখাচ্ছিলেন যে কত নিখুঁত ভাবে কাজটা করা যায়; সে দিনই আমরা সবাই ভেবে নিয়েছিলাম যে তুমি ডাক্তার হবে।"

সৈকতেশ চিৎকার করে বলতে চাইল যে, সে দিন আরও এক বার নিজেকে ব্যাঙ বলে অনুভব করেছিল আর করেছিল বলেই অত নিখুঁত ভাবে চিরে ফেলতে পেরেছিল নিজেকে। সত্যব্রত মাইতি স্যর খুব স্নেহ করতেন ওকে। যখন মাথায় হাত রেখে বললেন, "আমার ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে ছিল, হয়নি। তুই হবি আমি জানি," তখনই নিঃশব্দে 'না' বলে উঠেছিল ওর অন্তরাত্মা।

"আমি এইচ এস পাস করতে পারিনি। তার পর টেকনিক্যাল লাইনে পড়াশোনা করেছিলাম কিছু দিন কিন্তু..."

প্রতাপের শেষ কথাগুলো শুনতে পায়নি সৈকতেশ। কী করে পাবে? উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রতাপের সিট যে ঠিক ওর পিছনেই পড়েছিল। অন্য দিনগুলো তাও মাঝেসাঝে বিরক্ত করছিল কিন্তু অঙ্ক পরীক্ষার দিন একদম শুরু থেকে ওর পিঠে খোঁচা দিতে শুরু করে প্রতাপ। সৈকতেশ জানত যে, মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষার মতো তিরিশ নম্বর হলে ফেলে এলে ওখানেই ওর কেরিয়ারের ইতি, জানত যে ও ঘুরে দাঁড়াতে পারবে, নাকি কোনও খাদে তলিয়ে যাবে, তার চূড়ান্ত ফয়সালা ওই তিন আর

তিন ছ'ঘণ্টাতেই হয়ে যাবে। কোনও ঝুঁকি না নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাই বলেছিল যে, ওর অসুবিধে হচ্ছে ওখানে বসে পরীক্ষা দিতে, ও কি ফাঁকা ফার্স্ট বেঞ্চে চলে যেতে পারে?

কলেজে এগারো ক্লাসে ভর্তি হওয়ার চল সেই সময়ে ভালই ছিল, তবু সেরা ছেলেরা সবাই স্কুলেই পড়ত বলে কলেজ থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিতে আসা ছাত্রদের খুব একটা উঁচু নজরে দেখা হত না। কমবেশি সকলেই হল কালেকশন করে পরীক্ষা দেবে, এমন একটা ধারণা থাকত যাঁরা গার্ড দিতেন তাঁদের। সৈকতেশের আর্জি শুনে তাই হলের ভিতরে থাকা দুই অধ্যাপক খানিকটা অবাকই হন এবং প্রায় তৎক্ষণাৎ ওর প্রথম বেঞ্চে বসার ব্যবস্থা করে দেন। সে দিন টিফিনে প্রতাপের সঙ্গে মুখোমুখি হলে ও বলেছিল, "তোকে বাঁচাতে গিয়ে আমি নিজে মরতে পারি না।"

অঙ্কের প্রথম পত্রে ছিয়ানব্বই পেয়েছিল সৈকতেশ আর দ্বিতীয়টায় নিরানব্বই। অন্তত একটা পেপারে একশো না পাওয়ার দুঃখের ভিতরও মাধ্যমিকের ওই তিরিশ নম্বর হারানোর দুঃস্বপ্ন বয়ে বেড়াবার গ্লানি থেকে মুক্ত হয়েছিল। ওকে পাশে দাঁড় করিয়ে ওর বাবা সহকর্মীদের বলতে পেরেছিলেন যে ছেলে জিতে ফিরবে সেই বিশ্বাস ওঁর ছিল।

কিন্তু এক যুগ পেরিয়ে এসে, প্রতাপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সৈকতেশের মনে হল ও চিরতরে হেরে গেছে। যাকে সাহায্য করতে না-পারার কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিল, সেই লোকটাই, চরম বিপদে ত্রাতা হিসেবে অবতীর্ণ হয়ে, কেবল ঋণী নয়, লজ্জিতও করে গেল। সৈকতেশ কথা বলতে পারছিল না, শব্দ আটকে যাচ্ছিল ওর গলায়।

প্রতাপ নিজেই সহজ করে দিল ব্যাপারটা, চা খেতে চেয়ে।

কোনও ফাইভ-স্টার হোটেল সামনে থাকলে সেখানেই প্রতাপকে নিয়ে যেত, কিন্তু বিকল্প হিসেবে যেখানে বসে কচুরি আর ছোলার ডাল খেল ওরা সেটাও কম যায় না।

ছ'টা খাওয়ার পর আরও তিনটে কচুরি নিয়ে প্রতাপ বলল, "ভাগ্যিস আজ খোঁজ নিতে এসেছিলাম এখানে, রক্ত লাগবে কি না।"

"এ ভাবে হাসপাতাল আর নার্সিং হোমে ঘুরে ঘুরে রক্ত ফিরি করে কত দিন চলবে? আমি একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিলে করবে?" প্রতাপ ওকে আর 'তুই' বলতে পারবে না বুঝেই সৈকতেশ 'তুমি'তে আটকে রইল।

"চাকরি হলে তো ভালই হয়," এক সঙ্গে দুটো কচুরি মুখে পুরে দেওয়ায় প্রতাপের মুখটা কেমন বেলুনের মতো ফুলে গিয়েছিল।

"তবে চলো আমার সঙ্গে।"

"তোমার কোম্পানিতেই চাকরি করে দেবে আমার?" প্রতাপ সরল বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল।

এক মুহূর্ত আগেও ওর নিজের কনসালটেন্সিতেই প্রতাপকে একটা কোনও ফুরনের কাজে লাগিয়ে দেবে ভাবছিল সৈকতেশ। কিন্তু ওর প্রশ্নটা শুনে থমকে গেল। মালবিকার বাঁচার সহায় হয়েছে যে, তাকে নিজের অফিসের পিওন বানিয়ে অর্ডার দেওয়া কেবল অশোভন নয় অশালীন।

"কোথায় তোমার কোম্পানি? ডালহৌসিতে?" পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে কচুরির পর রসগোল্লা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল প্রতাপ।

"আমি ডাক্তার না হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছি তোমাকে তো বললামই। আমার কোনও নার্সিং হোম যেমন নেই, কোনও কোম্পানিও নেই। তবে আমি যে কোম্পানিগুলোর হয়ে বাড়ি ডিজাইন করি তাদের একটায় তোমার ব্যবস্থা করে দিতে পারব বলেই বিশ্বাস করি।"

"আজই যেতে হবে?"

"কাল থেকে আমি আরও ব্যস্ত হয়ে পড়ব, আর ছেলেকে নিয়ে ছেলের মা ঘরে ফিরলে তো দম ফেলার সময় পাব না। তাই আজই তোমায় ইন্ট্রোডিউস করে দিয়ে আসতে হবে। তুমি চিন্তা কোরো না, ফেরার পথে আমি গাড়িতে খানিকটা এগিয়ে দেব তোমাকে।"

"আমি কোথায় থাকি তুমি জানো?"

"জেনে নেব। এখন আর দেরি কোরো না প্রতাপ..."

"কিন্তু আমি তো আজ যেতে পারব না," গ্লাসের জলটা আলগা করে খেয়ে বলে উঠল প্রতাপ।

"কেন আজ কোন রাজকার্য আছে?" অত্যন্ত বিরক্ত হল সৈকতেশ।

"আর এক জায়গায় রক্ত দিতে যেতে হবেই আমাকে। একটু রেয়ার গ্রুপ তো, আচমকা দরকার হওয়ায় খুব অসুবিধেয় পড়ে গেছে পেশেন্ট পার্টি।"

"অসুবিধেয় পড়েছে জানলে কী করে?"

"তুমি দোকানে খেতে নিয়ে যাওয়ার সময়, এক জন ডেকে সাইডে নিয়ে গেল না আমায়? লোকটা সেই নার্সিং হোমে কাজ করে। এরা আসলে জানে আমি থাকলে কোথায় থাকব।"

"সে খুব ভাল কথা। তাই বলে এক দিনে দু'বার রক্ত দেবে?"

"তিন বারও দিয়েছি। দরকার যখন হয় তখনই শিরা এগিয়ে দিতে হয়। চাকরি অপেক্ষা করতে পারে, যম তো করবে না," প্রতাপ লাজুক হাসি হাসল।

সৈকতেশের অসম্ভব রাগ হচ্ছিল। কারও উপকার চেয়ে না পাওয়ার থেকে, তাগিদ থাকলেও কারও উপকার করতে না পারা যে কম হতাশার নয় বুঝতে পারছিল ও। কিন্তু ওর রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবার বিন্দুমাত্র সুযোগ পাচ্ছিল না, কারণ প্রতাপের কোনও কথাতেই ওর প্রতি অভিযোগের তির ছিল না। দ্বিতীয়ত প্রতাপ যেমন কিছু চাইছিল না ওর থেকে, তেমনই ও খাওয়াতে নিয়ে যেতে চাইল যখন, প্রত্যাখ্যানও করেনি।

চাইব না, দিলে ফেরাব না আবার জীবন যে দায়িত্ব দিয়েছে তাকে সবার উপরে রাখব, সৈকতেশের বাবা দেখলে বলতেন যে, এটিই আদর্শ মানুষের লক্ষণ। ও মানতে পারছিল না কেন? ওর দেওয়া ভিজিটিং কার্ড না নিয়েই প্রতাপ এগিয়ে গেছে বুঝতে পেরে কেন সৈকতেশের মনে হল যে প্রতাপ ওকে শিখিয়ে যেতে চাইল, যখন দরকার তখন না বাড়ালে, পরে হাত বাড়িয়ে লাভ হয় না আর?

হতেও পারে যে, একেবারেই এ রকম কিছু ভাবেনি প্রতাপ। হয়তো পয়সার বিনিময়ে হলেও বিষয়টা যখন রক্তদান, নিজের কাজটার ভিতর অনেকখানি প্রশান্তি অনুভব করত প্রতাপ। ওর কথাতেও তার ছাপ পড়ে থাকবে।

গাড়ি চালিয়ে বাড়িয়ে ফেরার পথে নবজাতকের চেয়েও বেশি করে এক জন না-হওয়া বন্ধুর কথা ভিড় করে আসছিল মাথায়। সৈকতেশ নিরুপায় বোধ করছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল যে চাকরি কিংবা চেয়ারের চাইতে অনেক উঁচুতে সংকল্পের জায়গা। সেই সংকল্প প্রতাপের জীবনে থাকলেও, ওর জীবনে কোথায়?

বাহাত্তর ঘণ্টা পর মালবিকার কেবিনে ঢুকে সৈকতেশ যখন জানাল যে, কাল মালবিকা বাড়ি ফিরতে পারবে তখন অবশ্য মাথা থেকে ভূত অনেকটাই নেমে গেছে।

"সব ব্যবস্থা করে ফেলেছ তো ঠিকঠাক?"

গত পনেরো দিন কাজে তত মন দিতে পারেনি বলে অনেক জটিলতা ঘাড়ে চেপে বসেছিল। মালবিকার কথার অর্থ ধরতে না পেরে তাই অন্যমনস্ক গলায় জানতে চাইল, কিসের ব্যবস্থা।

অন্য সময় হলে রেগে যেত মালবিকা। কিন্তু সেই মুহূর্তে খুব নরম করে বলল, "আর এক জনের কথা বলছিলাম; বাড়ি তো আর আমি একাই ফিরব না।"

সৈকতেশ পলকে বাস্তবে ফিরে এল। মালবিকার বুকে লেগে থাকা ছোট্ট অবয়বটির দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে গেল, কাকে সব দিতে হবে, সর্বস্ব দিতে হবে।

তিন মাস আগে, ঘুম স্টেশনের কাছেই যে তিব্বতি মঠ, সেখান থেকে বেরোবার সময় ও মালবিকাকে বলেছিল যে ছেলে হলে তার নাম রাখতে চায়, তথাগত কিংবা সিদ্ধার্থ। নার্সিং হোমের বেডে ছেলে কোলে আধশোয়া মালবিকাকে সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কোনটা পছন্দ?"

মালবিকা পাঁচ সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "দুটোর একটাও নয়। আমার ছেলের নাম আমি এমন রেখেছি যেখানে তামিলও আছে, বাংলাও আছে।"

কুয়াশাচ্ছন্ন সেই সকালে মনাস্টারির ভিতরে ঢুকে একটা বড় মোমবাতি দেখতে পেয়েছিল সৈকতেশ। সেই মোমবাতিই ওকে টানছিল, তার শিখার সামনে হাঁটু গেড়ে বসেই সৈকতেশের ভাবনায় নিজের অনাগত সন্তানের নাম ভেসে ওঠে। সামান্য একটু ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিল তখন যে কারণে ফিরতি পথে মালবিকার ধাতানি খেতে হয়েছিল। ঘুম স্টেশনে নামা ইস্তক সৈকতেশ নাকি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলছে, এমনই অভিযোগ ছিল মালবিকার। ঘুম হোক অথবা কলকাতা, অভিযোগ শুনতে সমস্যা নেই কিন্তু সৈকতেশের এক-আধটা অনুরোধও কি রাখতে পারে না মালবিকা? প্রতিটা ক্ষেত্রেই নিজে যা মনে করবে তাই করতে হবে?

"বলো তো কী সেই নাম?" নিজের মুখটা ছেলের কপালে নামিয়ে আনল মালবিকা।

"জানি না," ক্লান্ত ভাবে মাথা নাড়ল সৈকতেশ।

"সমুদ্র," সদ্যোজাত সন্তানের মুখ তার বাবার দিকে ফিরিয়ে হাসিমুখে বলে উঠল মালবিকা।

৬। উচ্ছলজলধিতরঙ্গ

পাখির পালক দিয়ে তৈরি শালের দাম সুতোয় বানানো শালের থেকে অনেক বেশি। তার কারণ শুধু এই নয় যে, পাখির পালক দুষ্প্রাপ্য। কারণ এটাও যে, পাখির পালক দিয়ে শাল বুনতে অনেক দক্ষ কারিগর লাগে, যেহেতু সুতো যত নমনীয় পালক ততটা নয়।

"পালক দিয়ে কিছু বোনা যার-তার কম্মো নয়," বহুকালের একটি শতচ্ছিন্ন শালের বদলে বাসন কেনার পর সেই শালের জন্যই দুঃখ করছিলেন মালবিকার মা মৌসুমী।

"আপনার মেয়েও কি পাখির পালক দিয়ে বানানো?" মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল সৈকতেশের।

মৌসুমী এমন একটা হাসি হাসলেন যার ভিতরে সম্মতি আর অসম্মতি দুইই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তার পর উঠে দাঁড়ালেন, "একটু চা করে আনি তোমার জন্য।"

শুনেই এমন ভাবে মাথা নাড়াল সৈকতেশ, যার ভিতরে অসম্মতির কোনও জায়গা নেই।

মালবিকার মা কিচেনে যেতে ড্রয়িংরুমের জানলার ধারে এসে দাঁড়াল সৈকতেশ। পড়ন্ত সূর্যের আলো মুখে পড়তে খানিকটা খুশিই হয়ে উঠল নিজের উপর। এমন ভাবে নকশা করেছিল ও এই বাড়িটার, যাতে পশ্চিমমুখো ঘরও সূর্যের আলো যতটা পাবে, তাত ততখানি নয়। কয়েক ডিগ্রির তফাতে আরও খানিকটা আরামপ্রদ হয়ে উঠতে পারে মানুষের জীবন, আর সেই কাজটা যে করতে পারে তার অল্প একটু শ্লাঘা হওয়া কি অস্বাভাবিক? আমেরিকা, ইওরোপে কাজ করার কত সুবিধে, আলাদা আলাদা চৌহদ্দি তৈরি করে দেয় ওরা, আলাদা কাজের জন্য। রেসিডেনশিয়াল আর্কিটেক্ট সেখানে কেবলমাত্র সেই সব বাড়ি বানায় যার আর জুড়ি নেই কোথাও; রেস্টোরেশন আর্কিটেক্ট প্রাচীন সব স্থাপত্যকে ভিতর থেকে নতুন করে তোলে, বাইরের প্রাচীনতায় টোকা না দিয়ে। হাউজিং আর্কিটেক্ট এক সঙ্গে অনেক মানুষের থাকার সুবন্দোবস্ত করে বিরাট কোনও কমপ্লেক্সের ভিতরকার সব ফ্ল্যাটে সুবিধের সমবণ্টন করে। কিন্তু এখানে একটি গালভরা শব্দ 'আর্কিটেকচারাল ইঞ্জিনিয়ার' বাতাসে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটা লোককে দিয়ে জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবটুকু করিয়ে নেওয়া চাই বলে।

কখনও সখনও অবশ্য জীবনই অনেকটা করিয়ে নেয়। এমন ভাবে করায় যে বোঝাও যায় না।

নিম্ন আদালতের রায়ে সম্রাটের সাত বছর জেল হয়ে গিয়েছিল, হাইকোর্টে লড়াই করে সেটাই যখন পাঁচ বছরে নামল, সৈকতেশের মনে হয়নি যে এক জন ক্রিমিনালের শাস্তি কমছে। বরং, জুলি আর মিলির বাবা দু'বছর আগে ফিরে আসবে, আনন্দ পেয়েছিল সেইটে ভেবে।

"ফিরবে কোথায়? আমাদের বাড়ি বিক্রি করেই তো মামলার খরচ চলছে," মধুরা কড়া গলায় বলেছিল।

"তা হলে এখন কী করণীয়?" মালবিকা জানতে চাইল।

"করণীয় সেটাই যেটা সম্রাট অনেক দিন আগেই করতে চেয়েছিল। এই বাড়িটা সেই প্রোমোটারের হাতে তুলে দেওয়া..."

"প্রোমোটার কি পৃথিবীতে ওই একটাই?" মধুরাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল মালবিকা।

"নতুন প্রোমোটার তোরা ধরে আন তবে। কিন্তু আগের প্রোমোটার কেসের সময় সত্তর হাজার টাকা দিয়েছে আমায় আর এর আগেও সম্রাট ওর থেকে আশি কিংবা এক কিছু একটা নিয়েছে। সেই টাকাটা নতুন প্রোমোটারকেই মিটিয়ে দিতে হবে, আমার কাছে কানাকড়িও নেই।"

"সেটা কি তোদের ভাগ থেকে বাদ পড়বে?" মালবিকা গলা সামান্য নামিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"খুব ভাগ শিখেছিস তাই না? যখন বিপদে পড়েছিলি তখন এত ভাগ জানতিস?" মধুরা চেঁচিয়ে উঠল।

"তোদের বাবা তো মরে বাঁচল, আমার না মরা পর্যন্ত কি ঝামেলা চালিয়েই যাবি তোরা?" মালবিকার মা বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

"বাবাকে ওই পাগলাগারদে দেওয়া হল কেন, মালু জবাব দিক।"

"ওটা পাগলাগারদ নয় দিদিয়া, ওটাকে রিহ্যাব বলে।"

"যে রিহ্যাবে গিয়ে ছ'মাসের মধ্যে মরে যায় লোকে, সেটাকে ডাস্টবিন বলি আমি।"

"বাবা দেড় বছর বেঁচে ছিল রিহ্যাবে যাওয়ার পর, আর গিয়েছিল বড় জামাইয়ের মহান কীর্তি সহ্য করতে না পেরেই।"

"জেলে যখন আছে তখন সব দোষ তো সম্রাটের হবেই। কিন্তু এই সম্রাটই এক দিন বাঁচিয়েছিল তোকে।"

"আবার তুই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে বসলি কেন বল তো মধু?" মালবিকার মা ফের মুখ খুললেন।

এ রকম একটা পরিস্থিতি প্রায় দিনই হচ্ছিল বলে বাধ্য হয়ে আসরে নামে সৈকতেশ। আর সেই সময়ই মুন্দোলিয়ার সঙ্গে আলাপ। অল্পবয়সি চিরাগ মুন্দোলিয়ার সঙ্গে কথা বলে ভাল লেগেছিল ওর। চিরাগই ওকে বোঝায় যে কলকাতা শহর জুড়ে অনেক আধা-বস্তি ছড়িয়ে আছে, যেগুলোর মালিকরা নিজেরাও ওই বস্তিতেই থাকে কিংবা অন্যত্র থাকলেও নেহাতই গরিব। ঠিকা-টেনান্সি নামে এক বিদঘুটে আইনের জেরে ওই রকম বস্তিতে তিন-চারতলা বাড়ি তুলতে পারে মালিকরা ইচ্ছে করলে, তবে জমি বিক্রি করার অধিকার ওদের নেই।

"মাল্টিস্টোরিড তুলবে যে তার পয়সা কোথায়?" সৈকতেশ জানতে চেয়েছিল।

"সেখানেই তো আমরা এন্ট্রি নিচ্ছি। ঠিকা প্রজার নামে বাড়িটা উঠবে ঠিকই কিন্তু বাড়ি তুলব আমরা।"

"এতে আপনাদের লাভ?"

"লাভ কি সব সময় টাকার অঙ্কেই হয় মিস্টার কৃষ্ণন? অসংখ্য বস্তিবাসী মাথার উপর ছাদ পাবে আমাদের এই ইনিশিয়েটিভের জন্য। এ বার ওই যে ওরা টু বেডরুম ফ্ল্যাট পাবে, তার ফলে আমাদের কতটা গুডউইল তৈরি হবে মার্কেটে, ইম্যাজিন করতে পারছেন?"

"মাপ করবেন। আপনি এই ভাবে ভাবছেন, আমি সেটা আন্দাজ করতে পারিনি।"

"আপনার পারার কথাও নয়। আমার সারনেম দেখেই আপনি হয়তো অন্য কিছু ভেবে নিয়েছেন আমার সম্পর্কে। কিন্তু একটা কথা বলি আপনাকে, উত্তম-সুচিত্রা বা মিস্টার রে'র অনেক সিনেমার ফাইনান্সার কিন্তু আমার দাদাজি, চমনলাল মুন্দোলিয়া। তবে টাইটেল কার্ডে ওঁর নাম পাবেন না। দেখবেন, বনশল, ভুতোড়িয়া, খেমকার নাম।"

"বুঝতে পারলাম না ঠিক।"

“প্রোডিউসারের নাম দেখা যায় পর্দায়, কিন্তু পিছন থেকে টাকা ঢালে যে ফাইনান্সার তার নাম দেখা যায় না। এই ঠিকা-টেনান্সির জমিতে যে মাল্টিস্টোরিডগুলো উঠবে সেখানেও যেমন, টাকা আমরাই ঢালব কিন্তু নাম আমাদের থাকবে না।”

“বুঝতে পেরেছি। তবে যেটা বুঝিনি, আপনি আমার খোঁজ পেলেন কোথায়?”

“কাচ কাটার কারবার যে করে, সে হিরের খোঁজ রাখবে না?” চিরাগ হেসে উঠল।

“ধন্যবাদ, কমপ্লিমেন্টের জন্য। কিন্তু আমি আমার ফ্যামিলির একটা বিষয় নিয়ে এত ঝামেলায় আছি যে...”

“কী ঝামেলা? আপনার সমস্যা না থাকলে শেয়ার করবেন একটু?”

“সমস্যা আমার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে। আই মিন, বাড়িটা নিয়েই সমস্যা।”

“আমি এক বার দেখতে পারি?”

“ওটার বয়স আশি পেরিয়েছে তবে অ্যান্টিক ভ্যালু কিছু নেই। বলতে পারেন, সাড়ে চার কাঠা জমির উপর, বেখাপ্পা একটা বাড়ি।”

“শ্বশুরবাড়ি কখনও বেখাপ্পা হয় না মিস্টার কৃষ্ণন, ওটাই পৃথিবীর সবচেয়ে আর্টিস্টিক বাড়ি। ইউ টেক ইট ফ্রম মি, আমার পার্টনারও বাঙালি।”

“আপনি তো তবে আমার দলেই,” সৈকতেশ হেসে ফেলল।

“আমিও তো আপনাকে আমার দলেই চাইছি,” চিরাগ সৈকতেশের ডান হাত চেপে ধরল নিজের দুটো হাত দিয়ে।

সেই আলাপের ছ’মাসের মাথায়ই ওর একটা আঙুলের ইশারায় মালবিকাদের পুরনো বাড়ি ভেঙে সৈকতেশের নকশা অনুযায়ী নতুন বহুতল উঠতে শুরু করল। সম্রাট যে প্রোমোটারকে নিয়ে এসেছিল, সে গলায় তাগড়া সোনার চেন ঝুলিয়ে হুমকি দেওয়ার ভঙ্গিতে কথা বলত। চিরাগের একটা ফোনেই লোকটা অমন বৈষ্ণব বিনয় দেখিয়ে সরে গেল কেন, কে বলবে!

ওর দিদিমা একটা কথা বলতেন আর সেটা মায়ের মুখেও খুব শুনত, ‘টাকায় করে কাম/ মরদের হয় নাম’।

চিরাগের সঙ্গে কাজ শুরু করার পর কথাটার মানে আরও প্রাঞ্জল হয়ে গেল সৈকতেশের কাছে। যে কাজে চার দিন লাগার কথা, তাতে দেড় দিন লাগত চিরাগের, কারণ ও কেবল ঘোড়াকে দানা খাওয়াত না, গাড়ির চাকাতেও যথেষ্ট গ্রিজ় মাখিয়ে রাখত। অতএব স্যাংশন যারা দেয়, লাইসেন্স যারা ইস্যু করে, তারা অন্য অনেক ফাইল ওয়েটিংয়ে রেখে চিরাগের ফাইল পাশ করে দিতে ব্যস্ত থাকত।

ধর্মতলায় একটা নিভৃত বার কাম রেস্তোঁরা ছিল চিরাগের। সৈকতেশ ড্রিঙ্ক করে না জেনেও এক দিন ওকে ওখানে নিয়ে যায় চিরাগ। যে লোকগুলো ঢুকছিল, বেরোচ্ছিল, কেউ একা আর কেউ বা সঙ্গে সহচরী নিয়ে, চিরাগ তাদের কাউকে কাউকে ওকে চিনিয়ে দিচ্ছিল। তাদের কে কে বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করে, কে অ্যাসেসমেন্টে আছে আর মিউটেশন করায় কে, জানছিল সৈকতেশ। বুঝতে পারছিল যে শহরের প্রতিটা অট্টালিকা বানাবার জন্যই এক জন ময়দানবের প্রয়োজন, মানুষের পৃথিবীর নিয়ম-কানুন মেনে নির্মাণ হয় না এখানে।

“সবটাই কি তবে ঘুষের উপর দাঁড়িয়ে আছে?” প্রবল হতাশায় হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল সৈকতেশ।

“আমি ওটাকে ঘুষ বলব না, বলব স্পিড-মানি। লালবাড়ি, সাদাবাড়ির যে লোকগুলো আসছে এখানে, খেয়েদেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, কাউকে পয়সা দিতে হয় না। বলতে পারো, আমি পয়সা নিই না। বিনা পয়সায় ওদের ফুর্তির জন্য একটা লাস ভেগাস তৈরি করে দিয়েছি আমি। যাতে শহরের মধ্যে যখন আমি আমার লাস ভেগাসগুলো বানাব, ওরা সাহায্য করবে শুধু; প্রশ্ন তুলবে না।”

“পুরো ব্যাপারটাই একটা ইন্দ্রজাল তার মানে?” এমনিতে প্রায় কখনওই মদ না ছোঁয়া সৈকতেশ দ্রুত দুটো পেগ শেষ করে ফেলল।

“পুরো জীবনটাই তাই, মাই ফ্রেন্ড। তুমি আধঘণ্টায় যে হুইস্কিটা খাচ্ছ, সেটা বারো বছরের পুরনো। কোনও ওক কাঠের ব্যারেলে ঘুমিয়ে ছিল, এখন তোমার-আমার গ্লাসে টলমল করছে।”

“কিন্তু তার সঙ্গে বাড়ির...” গলা সামান্য জড়িয়ে গেছে সৈকতেশ টের পেল।

“রিলেশন আছে। মানুষের একটা নিজের বাসস্থানের ইচ্ছে ও রকম দশ কিংবা বারো অথবা আঠেরো বছর ঘুমিয়ে থাকে। আমি সেই ইচ্ছেটাকে গ্লাসে ঢেলে সামনে এগিয়ে দিই। তখন সে আর কিছুর কথা ভাবে না, কেবল গ্লাস আর ঠোঁটের দূরত্বটা ঘুচিয়ে দিতে চায়।”

“তুমি তো কবি হে!” সৈকতেশ আরও একটা পেগ খেল।

“আমার পার্টনার কবি।”

“আই সি। পত্রপত্রিকায় বেরোয় তোমার বৌয়ের কবিতা?”

“অ্যারিস্টোক্র্যাটরা মদ খেতে খেতে বৌকে নিয়ে আলোচনা করে? আমি আমার পার্টনারের কথা বলছি, তুমি নাম শুনে থাকবে।”

“উনি তো অভিনয় করেন। অবশ্য আবৃত্তিও শুনেছি,” নামটা কানে যেতে সৈকতেশ বলল।

“আমি যখন ওর মুখ থেকে শায়েরিগুলো শুনি তখন ও একাই শায়র আমার কাছে। আমার প্রজেক্টে যেমন অনেক লেবারার কাজ করে, ওর প্রজেক্টে অনেক কবি-ফবি থেকে থাকবে। বাট শি ইজ দ্য গডেস, দ্য ভয়েস বিলংস টু হার,” বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল চিরাগ।

“কী হল?” সৈকতেশ শেষ পেগের নাম করে আরও একটা নিল।

“এক জন টপ পলিটিশিয়ান, পুলিশের এক বড়কর্তার সঙ্গে ঢুকছে। আমি একটু ওদের কাছে যাচ্ছি, তুমি শেষ হলে তার পর উঠো।”

শেষ কিছু হয়নি, ম্যাজিশিয়ানের দেখানো অফুরান ওয়াটার অব ইন্ডিয়ার মতো, চিরাগের একটার পর একটা প্রজেক্টের নকশা করে গেছে সৈকতেশ। মালবিকাদের পুরনো বাড়ির জায়গায় শিল্পসম্মত অ্যাপার্টমেন্ট উঠেছে আর তার দুটো ফ্ল্যাট মিলিয়ে একটা বড় ফ্ল্যাটে শিফ্ট করে গেছে সপরিবার। সেই ফ্ল্যাটের অর্ধেকটা মালবিকার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, বাকিটা সৈকতেশের কেনা, তাই ‘ঘরজামাই’ শব্দটি প্রযোজ্য নয় ওর ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, মালবিকা শহরের চাকরি ছেড়ে শহরতলির কলেজে পড়াতে যায়, সেই সময় বাচ্চা উপরের ফ্লোরে থাকা শাশুড়ির প্রযত্নে থাকে। কিন্তু সেটা দোষের হবে কেন?

সে ভাবে দেখতে গেলে দোষের কিছুই নয়, বোট্যানিকালের বটগাছের শিকড় কে কবে খুঁজে পায়? ওই ঝুরিগুলোই গাছ, নিজেকে না ভেঙে যেখানে যতটা প্রসারিত হওয়া যায়, ততটাই জীবন।

সাবেক দুটো চ্যানেলের পাশাপাশি টিভিতে এখন আরও তিন-চারটে চ্যানেল এসেছে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে মন্দ লাগে না। যে যে দিকে পারে প্রসারিত হোক, রিমোট হাতে নিয়ে চায়ের অপেক্ষা করতে করতে ভাবল সৈকতেশ।

যে-চ্যানেলে ওর চোখ ছিল সেখানে তখন কয়েকটি কিশোর-কিশোরী যোগব্যায়াম দেখাচ্ছে। একটি কিশোরী শরীরটাকে বাঁকিয়ে দিয়েছে পিছন দিকে, বৃত্ত বড় হচ্ছে দেখা যাচ্ছে...

“কাঁকুলিয়ায় নাকি অর্ধেক তৈরি হওয়া বাড়ি ভেঙে পড়েছে?” মালবিকার মা চা হাতে ঘরে ঢুকে বললেন।

ওঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই সৈকতেশ চ্যানেল পাল্টে দিয়ে দেখল, একটা ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে অনেক লোক চিৎকার করছে।

কী হয়েছে আর কীভাবে হয়েছে বোঝার জন্য ছুটে বেরোতে যাচ্ছিল সৈকতেশ, সমুদ্র এসে জড়িয়ে ধরল ওকে।

“আমি একটু যাই গুড্ডু, জরুরি কাজ আছে। চকলেট নিয়ে আসব তোমার জন্য,” ছেলের থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে রাস্তায় বেরিয়ে সৈকতেশের খেয়াল হল, ‘বাবা’ বলার বদলে আজ ও ডাকনাম ধরে ডেকেছে ছেলেকে।

কাঁকুলিয়ায় ওই কাঠামো ধসে পড়ায় তখনও অবধি যে তিন জন মারা গিয়েছে, তাদের ভিতরে এক জনের ছেলে গুড্ডুর থেকেও ছোট। পিতৃহীন সেই বালকের নাক থেকে শিকনি গড়াচ্ছে আর সে ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে আছে, সৈকতেশ খেয়াল করল। ওর খুব ইচ্ছে হল বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নেয় তখনই কিন্তু ওর নিজেকেও দায়ী মনে

হচ্ছিল। চিরাগের চাপে পড়ে, বস্তিবাসীদের ঘর আর একটু বড় হবে জেনে, নিয়মমাফিক জায়গা না ছাড়ার বন্দোবস্ত ছিল ওর ড্রয়িঙে। চিরাগ ওকে বলেছিল যে, গ্রাউন্ড ফ্লোর আর ফার্স্ট ফ্লোরে বস্তির লোকেরাই থাকবে কেবল এবং এখনও যারা প্রজেক্টের অংশ হয়নি তারা ওই বড় ঘর দেখে নিজেদের দরমার বেড়া আর টালির চালের আস্তানাগুলো বিলীন করে দিতে চাইবে আকাশচুম্বী ইমারতে।

বুক চাপড়ে কাঁদতে থাকা দু'-একজনের মুখ থেকে 'রদ্দি জিনিস' কথাটা কানে আসায় ধসে যাওয়া বাড়ির গুঁড়ো হাতে নিয়ে দেখছিল সৈকতেশ। তখনই নিজের নাম শুনতে পেয়ে সামনে তাকিয়ে প্রতাপকে দেখতে পায় ও। ভীষণ খারাপ চেহারা হয়ে গেলেও এবার ওকে এক বার দেখেই চিনতে পারে সৈকতেশ। ও কি এখনও রক্ত বেচে জীবনধারণ করে?

সৈকতেশ কিছু বলার আগেই প্রতাপ জানায় যে, ওই বস্তিটার অদূরে একটা বস্তিতেই ওর বাস।

"তুমি আর এলে না তো?"

"এখন আমার কথা বাদ দাও, এই বাড়িটা কি তোমার কোম্পানির বানানো?"

"আমার কোম্পানি নেই, বলেছি তো!" রেগে গেল সৈকতেশ।

"ডিজ়াইন তোমারই ছিল, তাই তো?" প্রতাপের চোখদুটো কী রকম জ্বলছিল।

"তাতে কী এসে যায়?"

"এসে যায়, কারণ তোর ডিজ়াইনের বাড়ি ভেঙে গিয়ে আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধুর প্রাণটা চলে গেছে। আমার যেটুকু রক্ত অবশিষ্ট, তা দিয়ে চাইলেও আর বাঁচাতে পারব না ওকে।"

"আমি কী করব তার? আমি তো আর..."

"কিচ্ছু করতে পারবি না যদি, তবে আমাদের মরে যাওয়ার নকশাগুলো আঁকিস কেন? মানুষ মারার জন্য ফার্স্ট-সেকেন্ড হোস?" বলতে বলতে, প্রতাপ এগিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে বুকে ধাক্কা মারতে শুরু করল সৈকতেশের।

কী অসম্ভব জোর ওই ক্ষয়াটে চেহারার প্রতাপের দু'হাতে, নাকি ওই জোর আক্রোশের, স্বজন-হারানো বেদনার?

সৈকতেশ পিছোতে পিছোতে পড়ে গেল মাটিতে। ওকে পড়ে যেতে দেখে প্রতাপ হাত উঁচু করে কাউকে ডাকল। ঠিক তখনই পুলিশের আরও একটা গাড়ি এসে পৌঁছল ওখানে।

রি-ইনফোর্সড কংক্রিটের জায়গায় কত পরিমাণ সাধারণ কংক্রিট ব্যবহার করা হয়েছে, রি-ইনফোর্সড বললেও স্টিল আর সিমেন্টের অনুপাতে কী ভীষণ গড়বড় ছিল, কোথায় রিফ্র্যাক্টরির স্পেশাল ইট বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে ইটভাটার সাধারণ ইট, সব তথ্য জোগাড় করে ফাইল বানাচ্ছিল সৈকতেশ।

লোকের হাঁড়ির খবর বের করে আনা আর তার পর তাকে চমকে অথবা লোভ দেখিয়ে নিজের কাজ করানো, এই ছিল চিরাগের স্ট্র্যাটেজি। কিন্তু ওর হয়ে কাজ করতে করতে সৈকতেশ যে ওর কাজের পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে যাচ্ছে, খেয়াল করেনি চিরাগ। কিংবা করলেও পাত্তা দেয়নি, কারণ এক বার আলেয়ার নেশায় জলাভূমিতে নেমে গেলে আবার শক্ত ডাঙায় উঠতে পারে কে?

"তুমি যা করছ আদৌ তার কোনও দরকার আছে কি?" মালবিকা কলেজ থেকে ফিরেই জিজ্ঞেস করল এক দিন।

"কী করছি বলো তো?"

"ন্যাকামি কোরো না, তোমার ফোনগুলো আমার কানে আসে আর ওই ফাইলে কী জমা করছ আমি দেখেছি।"

"তবে আর জিজ্ঞেস করছ কেন? কাল রাত অবধি ছ'জন মারা গেছে, জানো নিশ্চয়ই।"

"খুব দুঃখের ঘটনা। কিন্তু এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট।"

"না, অ্যাক্সিডেন্ট নয়।"

"তবে, নেগলিজেন্স। কিন্তু তোমার নেগলিজেন্স তো নয়, তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন?"

"কারণ আমি নিজেকেও দোষ দিচ্ছি ওই লোকগুলোর মৃত্যুর জন্য।"

"কী ভাবে দোষী? বিল্ডিংয়ের ড্রয়িংটা করার জন্য?"

"ড্রয়িংয়ে, বিল্ডারের সুবিধে হবে এমন কয়েকটা জিনিস রাখার জন্য। প্লাস এইটে না দেখার জন্য যে, আমার নকশার উপর ভিত্তি করে ওরা যে ইমারত খাড়া করছে, ঠিক কোন স্তরের মাল ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে।"

"সেগুলো দেখা কি কোনও আর্কিটেক্টের কাজ?"

"আমি তো এক জন ইঞ্জিনিয়ারও। অবশ্যই আমার দেখা উচিত ছিল।"

কোনও জবাব না দিয়ে তখনকার মতো চুপ করে গেল মালবিকা। কিন্তু রাতে নিজেই ওদের দুটো শরীরের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে উদ্যোগী হল।

"ওরা সাক্ষীগুলোকে কিনে ফেলবে আমি জানি, যারা বিক্রি হতে চাইবে না তাদের হ্যারাস করবে..."

"হ্যারাসড আমরাও হব সৈকতেশ।"

"নিজের হ্যারাসমেন্ট নিয়ে ভাবি না।"

"নিজের নয়, নিজেদের। আমি আর গুড্ডু কি তোমার অস্তিত্বের অংশ নই? যারা মরে গেছে তাদের কথা এত ভাবছ, আর যারা বেঁচে আছে?"

"আমি পারছি না মালবিকা, কিছুতেই পারছি না। দিনরাত্রি ওই লোকগুলোর মুখ আমাকে তাড়া করছে। ওরা আমাকে ক্রমাগত বলছে যে, ব্যাকডোর দিয়ে আমি পালিয়ে যেতেই পারি তবে..."

"কেউ কিচ্ছু বলছে না সৈকতেশ। আর ব্যাকডোর দিয়ে কি মানুষ শুধু পালিয়েই যায়? আজ তুমি ব্যাকডোর দিয়েই আমার কাছে আসবে।"

"মানে?"

"আমি কত দিন বলেছি, কত চেয়েছি, তুমি কি কিছুই বোঝো না? সেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোদ্ধারা যে রকম ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে অগ্নিবাণ, লৌহবাণ নিক্ষেপ করত তুমি আজ সে ভাবে এসো। আমার মুখ বালিশে লুকোনো থাক, তুমি আমাকে খুঁজে নাও।"

"আমি পারব না মালবিকা, আমার এখন মুড নেই..."

সৈকতেশের বুক খিমচে ধরল মালবিকা, "আমি ভিক্ষে চাইছি না তোমার কাছে। এটা আমার অধিকার। সারাক্ষণ অন্যের অধিকার নিয়ে বাতেলা দাও, ঘরে যে মানুষটা আছে তার বেলা? ট্রেনের অমানুষিক ভিড়ে চিঁড়েচ্যাপ্টা হতে হতে বাড়ি ফিরে পরদিন আবার একই রুটে বেরোনোর ঝক্কি তুমি জানো?"

"বহু বার গাড়ি নিয়ে যেতে আসতে বলেছি তোমাকে।"

"ট্রেনে যেখানে এক ঘণ্টায় পৌঁছই, গাড়িতে সেখানে যেতে আড়াই ঘণ্টা লাগবে।"

"এখানে আমি কী করতে পারি?"

"কিচ্ছু না। যেখানে পারো, সেখানে করছ না কেন? দেখো সৈকতেশ, তোমার তো নামেই সৈকত, কিন্তু, আসলে আমরা সবাই এক-একটা সি-বিচ। অহরহ সাগরের ঢেউ এসে ধাক্কা মারবেই।"

"সৈকতেশের মানে সৈকতের থেকে আলাদা। মা বলত, সিকতা নির্মিত ঈশ্বর।"

"মানে কী? যে ঈশ্বর বালিতে তৈরি? যিনি সারাক্ষণ ভিজে ভিজে?" বলতে বলতে বরের উপরে চড়ে বসল মালবিকা।

"আমি কষ্ট দিতে চাই না তোমায়..."

"সুখ দাও তবে..." উন্মত্তের মতো সৈকতেশের গলায়, গালে, ঠোঁটে, কপালে, বুকে চুমু খেতে থাকল মালবিকা।

হয়তো বা প্রতিবর্ত ক্রিয়াতেই সৈকতেশ জড়িয়ে ধরল ওকে।

বিমান আকাশে চলার সময় যাত্রীদের অনেক সময়ই মনে হয়, সব যেন থেমে আছে একেবারে। আদরের ভিতরেও তাই ঘটে বলেই মালবিকা কথা বলতে শুরু করল আবারও, "দিদার কথা তোমায় বলেছি তো?"

"বলেছ, তবে সেই বড়ি দিয়ে পাটপাতার ডাল রেঁধে খাওয়াওনি একদিনও।"

"ভালই করেছি। আমি মরে গেলেও দিদার মতো পারতাম না।"

"তোমার মতো পারতে।"

"ওখানেই সমস্যা। দিদার দেখাদেখি ওই ডাল রেঁধেছি আমি দু'-তিনদিন, কিন্তু দিদা যা বানাত তার ধারেকাছে আসেনি। নিজে রাঁধতাম, নিজেই খেতাম আর তার পর কাঁদতামও নিজেই। আমাকে কাঁদতে দেখে বাবা বলেছিল যে ওই রান্নার পিছনে দিদার চল্লিশ বছরের খুন্তি নাড়ার অভিজ্ঞতা আছে। আমি তিন দিনে সেটা আয়ত্ত করতে পারব না কিছুতেই। ঠিক সে ভাবেই আন্দোলন যারা করে তাদেরও একটা ট্রেনিং থাকে; বহু দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যা, 'মানছি না, মানব না' বলতে বলতে পথ হাঁটার অভিজ্ঞতা থাকে।"

"কী বলতে চাইছ?"

"বলতে চাইছি, যারা যা জানে তাদের তাই করতে দাও। তুমি যা জানো, তুমি তাই করো।"

"টেকনিক না জানলে প্রতিবাদ করা যাবে না?"

"রাতের এই প্রেমটাই তোমার প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ তোমায় রোজ করতে হবে, না করে উপায় নেই তোমার। ভাবতে পারো না এ ভাবে?"

সৈকতেশ যেন ভিতরে কোথাও কাঠ হয়ে গেল। ওর ভাবনার গতিপথও নির্ধারণ করে দিতে চাইছে মালবিকা। ওকে বলে দিতে চাইছে যে ও যেন ২৪/২৯ ট্রামের মতো কেবল লাইন ধরেই চলে। নাম-লেখা কেক-কে চেরিফল দিয়ে সাজায়, আবেগকে উচ্ছ্বাস দিয়ে সম্পূর্ণ করে। যা সিক্ত তাকে নিষিক্ত করে, যা আপ্লুত তাকে পরিপ্লুত করে তোলে। ব্যস, তা ছাড়া অন্য কোনও কর্তব্য নেই ওর। নেই অন্য কোনও অঙ্গীকার।

মন বিরুদ্ধে থাকলেও শরীর সাড়া দিয়ে ফেলতে পারে। পাভলভের কুকুরের মতো ঘণ্টা বাজলেই ছুটে যাওয়া অভ্যেস তার। সেই অভ্যেসের মাত্রায় পরিবর্তন এনে, গাছ থেকে ফল পাড়ার মতো করে নয়, মাটি থেকে ধান তুলে নেওয়ার মতো করে সৈকতেশকে পেতে চাইছিল মালবিকা। কত পুণ্যের তটে, বিপরীত রতি ঘটে, সৈকতেশেরও অজানা ছিল না অবশ্য।

তবু, বিপরীত সব কিছুর সমারোহে ন্যায় আর নিয়তি একাকার হয়ে যেতে চায়, সময় সময়।

গভীরে যাওয়ার আর একটা অর্থ বোধহয় অন্তরালে যাওয়া। রাতের তারার মতো রাতের প্রেম কী ভাবে যে অন্তরালে চলে যায় আর সম্পর্কের অযোজ্যতা খর রৌদ্রের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কেউ বলতে পারে না।

'প্রোমোটিং-এর নামে মানুষ খুনের কারবার' শিরোনামে বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে যখন কাঁকুলিয়া কাণ্ড নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন বেরোচ্ছে, তখনই এক দিন অবাক হয়ে সবাই দেখল যে প্রথম পাতায় তিন কলাম জুড়ে সৈকতেশ কৃষ্ণনের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। লেখাটির বিষয়বস্তু কেবল সাধারণ মানুষ নয়, এক জন আর্কিটেক্ট অথবা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এমনকি রাজমিস্ত্রিও সেই দুষ্টচক্রের কাছে অসহায়, যার ত্রিভুজের একটা বাহু চরম দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকরা তো আর-একটি বাহু অনেক লম্বা হাতওয়ালা রাজনীতিবিদরা। তৃতীয় এবং সবচেয়ে শক্তিশালী বাহুটি যে স্বয়ং প্রোমোটারের তা তো বলাই বাহুল্য।

লেখাটা অসম্ভব সাড়া ফেলে দেওয়ায় দু'দিনের মাথায় আরও বড় করে একটি লেখা বেরোয় সৈকতেশের। এবারের লেখায়, কী ভাবে মানুষের চোখে ধুলো আর আইনের চোখে পর্দা দিয়ে বিল্ডিং-রাজের নামে মাফিয়া-রাজ চলছে, শহর জুড়ে, তার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে।

দুর্ঘটনাটা ঘটার সময় ছেলে-মেয়ে নিয়ে ইওরোপে ছুটি কাটাতে গিয়েছিল চিরাগ মুন্দোলিয়া। ও কলকাতায় ফেরার আগের দিন খবরের কাগজে সৈকতেশের প্রথম কিস্তি বেরিয়ে গেছে। দ্বিতীয় কিস্তি বেরোবার দিন দুপুরে যে ফোনটা পায় সৈকতেশ তার ও দিকের গলা সেই অভিনেত্রী তথা আবৃত্তিশিল্পীর, সৈকতেশ শুনেই বুঝতে পারে। সৈকতেশকে হোল্ড করতে বলেন ভদ্রমহিলা আর ফোনে পিয়ানো বাজতে শুরু করে। চিরাগের অফিসের ফোনে এ রকমই ব্যবস্থা, বাজনা শুনতে শুনতে সৈকতেশের মনে হচ্ছিল যে কোথাও কোনও অঘটন ঘটেনি, সব তোফাই আছে।

"পিঠে ছুরি মেরে দিলে এ ভাবে?" চিরাগ কথা শুরুই করল প্রশ্ন দিয়ে।

"পিঠে ছোরা তুমি মেরেছ। কেবল আমার নয়, ওই আটটা লোক যারা এখন অবধি মারা গেছে তাদের সবার পিঠে। কী মেটেরিয়ালস ইউজ় করছিলে? কোন সিমেন্ট?"

"আমি বস্তিবাসীদের জন্য দয়া করে ঘর বানিয়ে দিচ্ছিলাম। আইফেল টাওয়ার বানাচ্ছিলাম না যে, কতখানি স্টোনচিপ্‌স আর কতটা গ্র্যাভেল তার হিসেব করে এগোব।"

"দয়া মোটেই করছিলে না। আর আমি জেনে গেছি যে, ওই ঘরগুলো তুমি নামেই বস্তির লোকদের দিচ্ছ। দু'দিন পর ওদের দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে, ওগুলোও বিক্রি করে দেবে। কেবল আইনি ঝামেলা বাঁচাতে বিক্রির জায়গায় লিজের বন্দোবস্ত করবে।"

"তোমার ঘরও তো আমি বানিয়ে দিয়েছি, কী প্রবলেম হয়েছে তাতে?"

"ঘরের নকশা আমার, বানিয়েছে মিস্তিরিরা। টাকা ঢাললেই ক্রেডিট মেলে না।"

"ভেরি গুড। তা হলে ট্র্যাজেডি যে সাইটে ঘটেছে, সেখানকার সব ডিসক্রেডিট আমার হবে কেন? ডিজ়াইন তুমি করেছ, দায় তোমার। মেটিরিয়ালসের দায়িত্বে যারা ছিল দায় তাদের। আমাকে ফাঁসাতে এসে নিজে কীভাবে ফাঁসো, জাস্ট দ্যাখো।"

"এত দিন দেখেছি আর শুনেছি বলেই তো আজ বলতে পারছি।"

"বলছ কেন? তোমার চেক ক্লিয়ার হয়নি?"

"মাই কনশেন্স নিডস টু বি ক্লিয়ার অলসো।"

"দুনিয়া থেকে ক্লিয়ার হয়ে যাও যদি এই সব করতে গিয়ে?"

"পরোয়া করি না। তোমার লোভের বলি হয়ে যাওয়া মানুষগুলোর হয়ে কাউকে না কাউকে মুখ খুলতেই হত।"

"বৌ-বাচ্চার কিছু হয়ে গেলে এত দম থাকবে তো?"

"বৌ-বাচ্চা তোমারও আছে।"

"কিন্তু আমার সঙ্গে তো পুরো পাওয়ার স্ট্রাকচারটাও আছে," চিরাগ হেসে উঠল।

"আমার সঙ্গে ঈশ্বর থাকবেন," সৈকতেশ ফোনটা রেখে দিল।

সেদিনই বিকেলের দিকে কলকাতা পুলিশের লোক এসে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল সৈকতেশকে।

পুলিশ যখন এসেছিল, রিফ্রেশার কোর্স করতে কৃষ্ণনগর গেছে মালবিকা। দু'দিন পরের এক বিকেলে গরাদের ভিতর থেকে ওর দিকে তাকিয়ে সৈকতেশ আবিষ্কার করল যে, মালবিকার ডান কানের উপরের তিন-চারটে চুল পেকে গিয়েছে।

"বাবা বেঁচে থাকলে ভীষণ খুশি হত। বড় এবং ছোট দুই জামাই-ই জেল-খাটা আসামি, জানলে সুস্থ হয়ে যেত একদম।"

সৈকতেশ হেসে ফেলল, "আমি জালিয়াতি আটকাতে গিয়ে ভিতরে ঢুকেছি, করতে গিয়ে নয়।"

"জানি না কী করতে গিয়ে কী করেছ! তবে আমার একটাই সান্ত্বনা, আমি বারণ করেছিলাম।"

"মানুষ হতে বারণ করেছিলে?"

"লকআপের ভিতরে থেকেও লেকচার দিতে ইচ্ছে হচ্ছে? এক বার মনে হচ্ছে না যে মানুষ-অমানুষ-দেবতা-রাক্ষস সব কিছুর আগে তুমি একটা ছেলের বাবা আর আমি সেই ছেলেটার মা?"

"সেই কর্তব্যে দু'দিন আগে অবধি কোনও অবহেলা করেছি?"

"আগামী দু'বছরের কথা ভাবো। ও স্কুলে গেলেই ওর বন্ধুরা যখন বলবে..."

"বাবা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য ছেলেকে যদি কথা

শুনতে হয়...”

“দুনিয়ার সব ন্যায়-অন্যায়ের বিচার তোমার হাতে নাকি? আমার যা রেজ়াল্ট তাতে ওই ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরের কলেজে আমি যদি সারাজীবন ঘষটাই তবে সেটাও একটা অন্যায়।”

“তুমি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করো। কে বারণ করেছে?”

“যার বর জেলে পচছে, তাকে কে বিশ্ববিদ্যালয়ে এন্ট্রি দেবে? ইন্টারভিউ বোর্ডে তুমি থাকলে দিতে? অবশ্য তোমার মস্তিষ্ক সুস্থ নয়...”

“একমাত্র আমার মস্তিষ্কই সুস্থ। তাই আমি বরের অবস্থা দিয়ে বৌয়ের যোগ্যতা বিচার করতাম না। আর তার চেয়েও বড় কথা আছে একটা। আমার মাথা স্বার্থচিন্তায় খারাপ হয়ে যায়নি বলেই চোখের সামনে মানুষ মরতে দেখে চুপ করে থাকতে পারিনি। যারা মারা গেছে তাদের ভিতর দুটো বাচ্চাও আছে, ভুলে যেয়ো না।”

“হাজার বার ভুলে যাব দরকার পড়লে। তারা কি আমার বাচ্চা নাকি?”

“তুমি কি সেন্সে আছ মালবিকা? কী বলছ এগুলো?”

“যে কথাগুলো বললে লকআপের বাইরে থাকা যায় এই দুনিয়ায়, সেগুলো বলছি আমি,” চিৎকার করে উঠল মালবিকা।

পুলিশের দুটো লোক এসে ওকে সরিয়ে নিয়ে গেল তখনই।

ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গ্যালন-গ্যালন কান্না গলায় দলা পাকিয়ে উঠল। সেই কান্নাগুলোকে উগরে দিতে দিতে সৈকতেশ বলে উঠল, “লকআপের বাইরে যেতে চাই না আমি, চাই না।”

দিন সাতেকের মধ্যেই অবশ্য সৈকতেশকে ছেড়ে দিয়ে চিরাগ মুন্দোলিয়াকে গ্রেফতার করতে এক রকম বাধ্য হল পুলিশ। গণমাধ্যমের রমরমা শুরু হয়নি তখনও, তবু খবরের কাগজে প্রকাশিত সৈকতেশের ওই দুটো লেখাই এমন বিপুল ভাবে ছড়িয়ে গিয়েছিল যে বিষয়টা নিয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার একটি হাইকোর্ট শুনবেন বলে ঠিক করেন।

“উনি নিজে ব্যাপারটার সঙ্গে ইনভলভড হয়েও খবরের কাগজে লিখতে গেলেন কেন?” চিরাগের উকিল জহর আঢ্য জানতে চাইলেন।

“ওঁকে প্রশ্ন করতে করতে আমারই মনে হয় যে, সৈকতেশবাবুর যা বলার তা যদি নিজের জবানিতেই বলেন তবে পাঠক আরও ভাল ভাবে বিষয়টা বুঝতে পারবেন। কথাটা আমার সম্পাদককে গিয়ে বলায় তিনিও আমার সঙ্গে একমত হন। তার পর আমরা ওঁকে অনুরোধ করি লিখতে,” তরুণ সাংবাদিক প্রাণেশ ধর স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আদালতে এসে বলে।

“লেখাটা কি আপনারাই কেউ লিখে দিয়েছিলেন?”

“আজ্ঞে না। তার দরকার হয়নি।”

“কিন্তু পদবি দেখে সৈকতেশ কৃষ্ণনকে তো কেউ বাঙালি বলবে না।”

“সে তো চেহারা দেখে আপনাকেও সবাই মানুষই বলবে।”

প্রাণেশের উত্তরে হাসির হুল্লোড় ওঠে আদালতে।

এমন সময় সবাইকে চমকে দিয়ে বিচারপতি বলে ওঠেন, “সংবাদপত্রে না লিখলে সৈকতেশ নিজের কথাগুলো বলতেন কোথায় গিয়ে? উচ্চপদে এমন কে বসে আছেন যিনি কথাগুলো শুনতেন?”

“এক্সকিউজ় মি মাই লর্ড, এক জন ইনসাইডার হিসেবে উনি ট্রেড-সিক্রেট পাবলিক করায় আমার মক্কেলের অনেক ক্ষতি হয়েছে,” দুঁদে উকিল জহর আঢ্য বললেন।

“আট জন লোক যে মারা গেল, তাতে কোনও ক্ষতি হয়নি আপনার মক্কেলের? নাকি চালু ভাষায়, অমনটা হয়েই থাকে! আর দ্বিতীয় যা বলার তা হল, নিম্নমানের মালপত্র ব্যবহার করে মানুষ মেরে ফেলার প্রক্রিয়াটাকে ট্রেড সিক্রেট বলা যায় না। তৃতীয়ত, আমি পুলিশের কাছে জানতে চাইব যে, তারা কি গ্রীষ্মকালের মোষের মতো পুরোটাই পাঁকে ডুবে আছে? না হলে কোন যুক্তিতে সৈকতেশ কৃষ্ণনের বিরুদ্ধে

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৮ ধারায় প্রতারণার জন্য জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছে? কাকে প্রতারণা করেছেন উনি, কোথায় জালিয়াতি করেছেন? একই রকম অন্যায়, মিস্টার কৃষ্ণনকে ৪৭১ ধারায় অভিযুক্ত করা। উনি একটি ভুয়ো নথিকেও আসল বলে চালানোর চেষ্টা করেননি বরং ওঁর পেশ করা জেনুইন ডকুমেন্টগুলোকেই পুলিশ ভুয়ো প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে। আবার ২১১ ধারাতেও অভিযুক্ত মিস্টার কৃষ্ণন? কার ক্ষতিসাধনের জন্য মিথ্যে অভিযোগ করেছেন উনি? চিরাগ মুন্দোলিয়ার? এখনও পর্যন্ত কী ক্ষতি হয়েছে তার?"

"মাই লর্ড,আমার মক্কেলের সুনামের ব্যাপারটা..."

"আপনি থামুন, মিস্টার আঢ্য। আটটা মানুষ খুন হয়ে যাওয়ার পিছনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা যার, তার সুনাম নিয়ে আদালত চিন্তিত নয়। আদালত উল্টে পুলিশের কাছে জানতে চাইছে, এখনও তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন?" বিচারপতি কড়া গলায় বললেন।

বাইরে বেরিয়ে মালবিকাকে এক বার দেখবে ভেবেছিল কিন্তু কোথাও ওকে চোখে পড়ল না সৈকতেশের।

"আপনি তো এখন হিরো, সৈকতেশদা!" এগিয়ে এসে একটা ফুলের তোড়া ওর হাতে তুলে দিয়ে প্রাণেশ বলল।

"আমি হিরো হতে চাইনি ভাই, এতগুলো লোকের মৃত্যুর বিনিময়ে..."

"আরও লোক যাতে না মরে, তার জন্য তোমার হিরো হওয়া দরকার," সৈকতেশের কথার ভিতরে যিনি কথাগুলো বলে উঠলেন, সৈকতেশ তাকে দেখবে বলে আশা করেনি।

"আপনার না শরীর খারাপ?"

"কে বলেছে?" প্রশান্ত সারেঙ্গি হেসে উঠলেন জোরে।

ঘণ্টাখানেক পর অন্য একটি রেস্তোরাঁয় সৈকতেশের মুখোমুখি বসে অবশ্য রীতিমতো গম্ভীর গলায় বললেন, "ওরা তোমার বিরুদ্ধে অনেক ঝুটো এফ আই আর করিয়ে রাখবে, তুমি যেন আগাম জামিন নিতে ভুলো না।"

"প্রাণেশ বলছিল যে, এখন বাইরে জনতার সেন্টিমেন্ট যেরকম তাতে ফের আমাকে গ্রেফতার করার সাহস হবে না পুলিশের।"

"তবু সাবধানের মার নেই।"

"মারেরও সাবধান নেই। কিন্তু আপনি আমায় এই খাজা হোটেলটায় নিয়ে এলেন কেন? সাদার্ন অ্যাভিনিউতে আপনার নতুন..."

"আমার বলে আর কিছু নেই। নতুনটা বড় ছেলের, পুরনোটা ছোট ছেলের আর ক্যাটারিংটা এত দিনের সব কর্মীদের নামে করে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি। এখন আমি শান্তিনিকেতনের একটা ওল্ড এজ হোমে থাকি। অবশ্য সেখানেও শান্তি নেই। কোপাইয়ের পাড় দখল করে নিচ্ছে গুন্ডারা রিসর্ট বানাবে বলে।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনি আজ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা এসেছেন?"

"হ্যাঁ, খবরের কাগজে দেখলাম যে আজই ছাড়া পাচ্ছ তুমি। কুন্তলদা তো আর ইহলোকে নেই, আমি ছাড়া আসবে কে?"

"আপনি আচমকা বৃদ্ধাশ্রমে চলে গেলেন কেন?"

"তোমার বৌদি পরলোকে চলে গেলেন তাই..."

"বৌদি নেই?" ওর আর মালবিকার বিয়েতে আসা এক সদাহাস্যময়ীর মুখশ্রী ঝলসে উঠল সৈকতেশের দুই চোখের মাঝখানে।

"না। এক বছর হতে চলল।"

"আমাকে এক বার..."

"জীবনের সব সম্পর্কেই জোয়ারের মতো ভাটাও আসে। বাড়ি পাল্টালে ফোন নম্বর পালটায়, তুমি তোমার নতুন নম্বর দাওনি আমায়। বিজয়ার ফোনটাও করোনি আর আমি যে করব সে রাস্তাও রাখোনি।"

"অপরাধ হয়েছে আমার। আসলে, গুড্ডুর অন্নপ্রাশনের কাজটা আপনিই করবেন বলার পরও মালবিকার জেদে ওর এক বন্ধুর হাজ়ব্যান্ডকে দিয়ে করালাম। সে ছাইভস্ম যা খাওয়াল তা খাওয়াল, কিন্তু আপনাকে ওই 'অনুষ্ঠানটা আপাতত হচ্ছে না' বলার ফেরেব্বাজি আমার ভিতরে এই হাজতে থাকার ক্ষতর থেকেও বড় ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না।"

"বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরে গিয়ে একটা কথা বলব। মালবিকার সঙ্গে ভুল-বোঝাবুঝি থাকলে মিটিয়ে নাও। স্ত্রীর স্বামী আর স্বামীর স্ত্রী; এর চাইতে বড় আশ্রয় পৃথিবীতে হয় না।"

সৈকতেশের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল, চুপ করে বসেছিল ও।

প্রশান্ত সারেঙ্গি আঙুল দিয়ে সেই চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন, "তোমার বৌদিকে নিয়ে সুন্দরবন যাওয়ার সময় আমি যদি সঙ্গে করে অ্যান্টাসিডের একটা পাতা নিয়ে যেতাম..."

"মানে?"

"বদহজম হয়ে গিয়ে বমি করছিল শুধু, আর ওই রাতে জঙ্গলে আর সব ছিল শুধু দরকারি ওষুধটাই ছিল না আমার কাছে। পরদিন কলকাতা ফেরার আগেই যা হওয়ার হয়ে গিয়েছিল।"

"আপনাকে কি দায়ী করছিল সবাই?"

"কেউ নয়। কিন্তু আমি নিজেকে নিজে মাপ করতে পারিনি। পারব না কখনও। ভাল কথা, তুমি তোমার বাবার চিতাভস্ম যেখানে সমাধিস্থ করেছ বলেছিলে, আমি সেই জায়গাটা লোকেট করতে পেরেছি বলে মনে হয়। তিন-তিনটে আমগাছ ওখানে। তুমি এক বার দেখলে বুঝতে পারবে, কোনটা তোমার পোঁতা?"

দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল সৈকতেশ। অস্ফুটে উচ্চারণ করল, "বাবা!"

গুড্ডুর নাম ধরে প্রচুর চিৎকার করার পরও অবশ্য ওর আক্রোশ থামল না, হাজতবাস করে এসে ছেলেকে এক বার দেখতে না পেয়ে। বিছানার উপর মালবিকার একটা চিঠি পড়ে ছিল। পেপারওয়েটে চাপা দেওয়া। চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়ল সৈকতেশ। ছিঁড়ে ফেলে দেবে বলে আরও একবার পড়ল। ছিঁড়ে ফেলতে না পেরে, বারবার পড়তে থাকল।

"মা মায়ের ফ্ল্যাটে নিজের মতো থাকবে কিংবা আশ্রমে যাওয়ার ইচ্ছে হলে চলে যাবে। কিন্তু আমি গুড্ডুকে নিয়ে আর ওই ফ্ল্যাটে থাকব না। আমি জানি যে, ফ্ল্যাটের অর্ধেকটা আমার কিন্তু নিজের ভাগ বুঝে নেওয়ার বদলে শান্তি চাই আমার। শান্তি তখনই আসবে যখন তোমার থেকে আলাদা থাকব আমি।

গুড্ডু যেহেতু সাড়ে পাঁচ বছরের একটি বাচ্চা তাই পৃথিবীর সব আইনই বলবে যে ওর মায়ের সঙ্গে থাকা উচিত। তুমি চাইলে আবার বিয়ে করতে পারো কিংবা একা থেকে সমাজ-উদ্ধার করতে পারো, আমার পক্ষে আর তোমার সঙ্গে থাকা সম্ভব নয়।

আমি ভয় পাচ্ছি। তোমাকে, তোমার মানসিকতাকে ভয় পাচ্ছি। তা ছাড়া তুমি নিজে, মুখে আলো পড়েছে ভেবে যত আহ্লাদেই থাকো না কেন, বাস্তবে তোমার সঙ্গে জড়িত লোকেদের অবস্থা বেশ খারাপ। যেহেতু তোমার তিন কুলে কেউ নেই, মরে বেঁচেছে সবাই, যাবতীয় প্রশ্ন আমার দিকেই ধেয়ে আসে। আমি ওই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে চাই না; উত্তর আমার কাছে নেই। আমার কেবল ইচ্ছা আছে, আরও কয়েক দিন বাঁচার। তোমার ত্রিসীমানায় থাকলে তা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠবে।

আশা করি, আমার নতুন ঠিকানার খোঁজ করে কিংবা আমার কলেজে গিয়ে সিন-ক্রিয়েট করে আমার জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে না। যদি করো, আইনি ব্যবস্থা নিতে বাধ্য থাকব।

পুনশ্চ: গুড্ডুকে আমি একটা অন্য স্কুলে ভর্তি করে দেব। সেই স্কুলের নাম তোমার এখন না জানলেও চলবে।"

চিঠিটা হাতে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল, বারবার ডোরবেল বেজে ওঠার শব্দে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখল, সম্রাট দাঁড়িয়ে আছে।

"কী বলতে এসেছ, তুমিও ছাড়া পেয়ে গেছ আর আমিও পেয়েছি, অতএব আমাদের স্ট্যাটাস সমান এখন?"

"খচে আছ কেন?"

"কারণটা তুমি জানো না?"

"জানি বলেই তো তোমায় বলতে এলাম যে, মালবিকার জন্য জীবনটা নষ্ট কোরো না। ও আগেও আর এক জনের বৌ ছিল, হয়তো পরেও হবে। এ রকম মেয়েরা হোল লাইফের জন্য কোনও এক জনের হয় না।"

"তুমি কি ইতরামি করার জন্য এসেছ এখানে? তা হলে..."

"তা হলে কী করবে? বের করে দেবে? তাতে মালবিকা যে সাত-আট মাস জয়ব্রতর ওয়াইফ ছিল, সেটা মিথ্যে হয়ে যাবে?"

"কে জয়ব্রত?"

"জয়ব্রত রায়, পেন্টার, ভাল নাম হয়েছে এখন।"

"আমি জানি না।"

"শোনো, মালু আর মধুর মাকে যে তোমাদের বিয়েতে পাওনি, তার এটাও একটা কারণ। মেয়ের ওই দুম করে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া মেনে নিতে পারেননি উনি। আর আমার শ্বশুর তো ওকে ফিরিয়ে নেওয়ারও পক্ষপাতী ছিলেন না, স্রেফ আমার আর মধুরার রিকোয়েস্টে..."

"এগুলো আগে বলোনি কেন?"

"বলিনি কারণ মালুর ভাল চেয়েছি। হারামজাদা জয়ব্রত ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল যখন, কে ওকে উদ্ধার করে আনল আপার ফোরশোর রোডের ওই বাড়ি থেকে? পুরো এরিয়াই নন-বেঙ্গলি, তার ভিতরে একটা বাড়িতে বসে কাঁদছেন উনি। উফ, এই সম্রাট না থাকলে..."

"আমাকে এখন বলছ কেন?"

"বলছি কারণ আমি তোমারও ভাল চাই। মালবিকা আবার লিভইন শুরু করেছে জয়ব্রতর সঙ্গে। এখন তার ছবি বিক্রি করে অনেক টাকা, আরামেই আছে নিশ্চয়ই।"

"আমি বিশ্বাস করি না।"

"চলো তবে আমার সঙ্গে," সম্রাট ঘরে ঢুকে এসে, সৈকতেশের হাত ধরে টান দিল।

সেই টান যেন নিশির ডাক, বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা হচ্ছে এমন সময়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দিল সৈকতেশকে। ট্যাক্সি যেখানে থামল সেখান থেকে পঞ্চাশ পা উত্তর নাকি দক্ষিণ, ঈশান নাকি নৈর্‌ঋত কোন দিকে হেঁটে গেল, সৈকতেশ জানে না। শুধু একটা অ্যাপার্টমেন্টের ভিতরে ঢুকে লিফ্টে তিনতলায় উঠে সম্রাট যখন বলল যে, ওটাই জয়ব্রতর স্টুডিয়ো, মালবিকা যত দূর সম্ভব ওখানেই আছে এখন, সৈকতেশ দেখল যে ফ্ল্যাটের দরজা ভেজানো। দেখামাত্র একটা ঝটকায় সম্রাটকে সামনে থেকে সরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ছুটে নামতে থাকল ও। চিরাগ মুন্দোলিয়ার হয়ে কাজ যেমন আর করতে পারবে না, ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরেও আর ঢুকতে পারবে না। সন্তুদা ঠিকই বলেছিল, "প্রেম যে ভেঙে দেয়, প্রেম তার কাছে আসে না, এলেও থাকে না।" না থাকল; কিন্তু যদি ওই দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে মালবিকাকেও রত্নাদির অবস্থায় দেখে, সৈকতেশ অন্ধ হয়ে যাবে। আর অন্ধ লোক আঁকবে কী করে? জয়ব্রতর মতো ছবি আঁকতে ও জানে না, কিন্তু ওকেও তো বাড়ির নকশা এঁকেই খেতে হবে।

সাত দিনের জন্য ডুয়ার্সে চলে গিয়েছিল সৈকতেশ, সেখান থেকে ফিরে সুন্দরবনে গেল চার দিনের জন্য আর তার পর মায়াপুরে গিয়ে থেকে এল দু'দিন। বুকের আগুন এক ছটাকও নিবল না। কিন্তু পেটের আগুন বলে যে একটা পদার্থ আছে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল হতেই হল কারণ আর যে দুটো সংস্থার হয়ে ডিজ়াইন করত, তারা ওর সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী নয় বলে জানিয়ে দিল।

"চিরাগ মুন্দোলিয়া মার্ডারার হলেও সে তো প্রোমোটিং বিরাদরির এক জন লোক। এ বার যে-আর্কিটেক্টের কারণে সেই প্রোমোটার এখন জেলবন্দি, অন্য প্রোমোটাররা তাকে কাজ দেবে কেন?" প্রাণেশ ওর উল্টো দিকের চেয়ারে বসে বলল।

ভবানীপুরের একটা সস্তায় পুষ্টিকর বারে বসে কথা বলছিল ওরা। এখন যে আর মদ খেলে শরীরে বাগড়া দেয় না, এই ব্যাপারটা কি পজ়িটিভ? মুখে একটা আদার কুচি পুরে প্রাণেশকে প্রশ্নটা করবে ভাবল সৈকতেশ।

প্রাণেশ তার আগেই জিজ্ঞেস করে বসল, "কেসের অবস্থা কিছু জানেন?"

"তুমি বলো, তোমার থেকেই তো জানি।"

"চিরাগ ছাড়া পেয়ে যাবে।"

"এতগুলো লোক মরার পরও?"

"প্রশাসনের বেশ কয়েক জন সস্তায় ফ্ল্যাট পেয়েছে ওর থেকে আর পুলিশে তো ওর বিশাল হাত, আপনি দেখেই এসেছেন।"

"কী করব বলো তো? আত্মহত্যা?"

"ছিঃ! এই শব্দটা আপনার মুখে মানায়?"

"আমি সুপারম্যান নই প্রাণেশ। আমি..."

"আপনি এক জন সেনসিটিভ মানুষ।"

"কিন্তু তার বেঁচে থাকার কী উপায় রেখেছে দুনিয়া?"

"দুনিয়া অনেক বড়, আর উপায় আমরা যা দেখতে পাই, তার বাইরেও আছে। আপনি কখনও ভেবেছিলেন যে, আপনি খবরের কাগজের প্রথম পাতায় লিখবেন?"

"সে তো তুমি বলেছিলে বলে, না হলে ইংরেজিতে অনেক ড্রাফ্ট করলেও বাংলায় লেখার অভ্যেস চলে গিয়েছিল।"

"চিঠি-ফিঠি লিখতেন না?"

"বাবা-মা-দাদা সবার নামের আগে চন্দ্রবিন্দু বসে গেছে, লিখবটা কাকে বলো তো?" সৈকতেশ পরপর দুটো বড় চুমুক দিল গ্লাসে।

"আমাকে লিখবেন? অসম থেকে?"

"চিঠি? অসম? তোমাকে? আমার মাথা আর গুলিয়ে দিয়ো না প্রাণেশ।"

"আপনার মাথা এখন ঠান্ডা রাখতে হবে সৈকতেশদা। সর্বভারতীয় একটা মিডিয়া একটু অন্য ফিল্ড থেকে লোক রিক্রুট করতে চাইছে। আমি আপনার বিষয়ে লিখে মেল করেছিলাম। ওরা আগ্রহী। আপনি কবে যেতে পারবেন ওদের কলকাতার অফিসে?"

"আমাকে দিয়ে কী করাবে ওরা?"

"ওরা করাবে না। আপনি করবেন। ইংরেজিতে সাংবাদিকতা।"

"তুমি নিজে অ্যাপ্লাই করলে না কেন?"

"কারণ আমি ইংরেজিতে অত পোক্ত নই। তা ছাড়া আমার মনে হল যে দাদার হলেই ভাইয়ের হবে," প্রাণেশ হাসল।

সৈকতেশের বোধ হল যে, ওর দাদা সময়কে কাঁচকলা দেখিয়ে ফিরে এসেছে। জয়চণ্ডী পাহাড় থেকে ভবানীপুরের বারে বসে থাকা ভাইয়ের সামনে ফিরে এসেছে। এখন এখানে শরীর দুটো কিন্তু আত্মা তিনটে। অমৃতেশ, সৈকতেশ, প্রাণেশ। নামেও কত মিল, আহা!

"কী ভাবছেন এত? ভয় করছে?"

"ভয়? আমার?" সৈকতেশ হাত বাড়িয়ে প্রাণেশের গালে হাত রাখল।

৭। আশিস

একটা পুজোকে কেন্দ্র করে যেমন বিরাট মেলা বসে যায়, এক জন মানুষকে ঘিরেও জমে ওঠে কত গল্প। গল্পগুলোর ভিতর দিয়ে আমরা যে কেবল সেই মানুষটা সম্বন্ধে জানতে পারি তা কিন্তু নয়; তার চার পাশের আরও বহু মানুষ, সাদা কাপড়ে আলো ফেলে দেখানো সিনেমার চরিত্রদের মতো, ঘুরতে, ফিরতে, কথা বলতে থাকে। আর কখনও-সখনও সংলাপের চাইতে নীরবতা, জ্ঞাতর থেকে অজ্ঞাতর ভূমিকা বড় হয়ে ওঠে।

সৈকতেশ নিজেই যেমন কখনও জানতে পারেনি যে, ডিব্রুগড় চলে যাওয়ার আগে দীপকদা অসুস্থ জেনে ও যে দেখা করতে গিয়েছিল, জীবনের প্রথম এবং শেষ ক্রিকেট কোচের সঙ্গে, সেটা একটা চিত্রনাট্যের

অংশ ছিল।

"একটা মেয়েকে হারিয়েছি কিন্তু দশটা ছেলে আর মেয়েকে খাওয়াতে হয় রোজ," সাত-আটটা পথ-কুকুরের সামনে নিচু হয়ে ভাত দিতে দিতে দীপকদা বলেছিলেন।

"এই বয়সে এতটা ঝক্কি নেওয়ার দরকার কী?"

"দরকার একটাই। খেলোয়াড় মরে যায় কিন্তু খেলা মরে না, সেই কথাটা প্রমাণ করা।"

বুকে গেঁথে যাওয়া ওই বাক্যটার সঙ্গে নিজের পুরনো ব্যাটটা হাতে নিয়ে ডিব্রুগড়ের প্লেনে উঠেছিল সৈকতেশ।

"প্রদ্যুম্ন ব্যাঙ্কে চাকরি করে, গোয়ালিয়রে বদলি করে দিয়েছে ওকে। চলে যাওয়ার আগে এই ব্যাটটা ফিরিয়ে দিয়ে বলে গেল যেন তোমার হাতে তুলে দিই," দীপকদা বলেছিলেন।

সত্যিটা ছিল, সৈকতেশের হয়ে মামলা লড়া উকিলের সঙ্গে ময়দান সূত্রেই দীর্ঘদিনের পরিচয় দীপকদার। সৈকতেশ বিব্রত হতে পারে ভেবে আদালত চত্বরে যাননি উনি কিন্তু প্রদ্যুম্নর সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যাটটা চেয়ে নিয়েছিলেন।

"না হলে যে কলকাতা থেকে একদম খালি হাতে চলে যেতে হবে ছেলেটাকে!" উকিল বন্ধুকে বলেছিলেন দীপক রায়চৌধুরী।

একই ভাবে সৈকতেশ কখনও জানতে পারত না যে, মালবিকার চিঠিটা আসলে অর্ধসত্য। আর সম্রাটের ওই নাটকটাও অনেকটাই বানানো। কিন্তু মালবিকা বাধ্য হয়েছিল একটা কাজ করতে আর অন্যটা করাতে। না করিয়ে কী করত ও? বিচারপতির রায় সৈকতেশের দিকে যাচ্ছে আন্দাজ করেই সমুদ্রকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে ফোনের পর ফোন আসতে থাকে। পুলিশে জানিয়ে এলে, খবর পৌঁছে যায় হুমকি দেওয়া লোকগুলোর কাছেই। তারা পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, ছেলেকে আর ছেলের মাকে বাঁচাতে চাইলে, সৈকতেশকে চুপ করাতেই হবে।

তার পরও হয়তো লড়াই দিত মালবিকা কিন্তু বুঝতে পারছিল যে ন্যায়ের হয়ে লড়াইয়ের নেশা পেয়ে বসেছে সৈকতেশকে, ওকে চুপ করানোর ক্ষমতা কারওই নেই আর। তা হলে গুড্ডুকে যাতে চিরতরে চুপ করিয়ে না দেয় মাফিয়ারা সেটা নিশ্চিত করতে আর কী করার ছিল ওর?

"তার মানে কি জয়ব্রতর সঙ্গে আমার রিলেশন মিথ্যে?" ফোনের ও পার থেকে বলেছিল মালবিকা।

দশ বছর হয়ে গেছে ততদিনে ওদের সেপারেশনের কিন্তু কেউ ডিভোর্স চায়নি আর দেয়ওনি কেউ। জীবন দু'জনকে দু'পারে ঠেলে দিলেও মাঝে কেবল সেতু নয়, স্রোতও রেখেছিল।

"তোমার জানতে ইচ্ছে করছে না ব্যাপারটা সত্যি না মিথ্যে? তবে শোনো, সম্রাটদা ওর প্রথম হার্ট-অ্যাটাক হওয়ার পর থেকেই, হয়তো মনের ভার কমাতে চেয়ে জ্বালিয়ে মারত আমায়, সব সত্যি তোমায় বলে দেওয়ার জন্য। আজ ও পৃথিবীতে নেই, আমিও কিছু আশা করে নেই, জীবনের প্রাইম-টাইম চলে গেছে। কিন্তু এত কাঠখড় পুড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য আমার, তুমি সবটা জানো। হ্যাঁ, প্রথম আলাপের দিনই এই জানিয়ে দেওয়াটা উচিত ছিল আমি স্বীকার করি। কিন্তু তোমায় হারিয়ে ফেলার ভয়ে বলতে পারিনি গো, পারলে ক্ষমা কোরো। এটা সত্যিই যে ছ'মাস জয়ব্রতর সঙ্গে ছিলাম আমি, কিন্তু কনসিভ করেছি জেনেও ও যখন বলতে পারল যে মিলিটারির 'শর্ট সার্ভিস কমিশন'-এর মতো ওরও কেবল, 'শর্ট, সুইট, কম্প্যানিয়নশিপ' চাই, ঘেন্নায় বমি পেয়ে গিয়েছিল আমার। তুমি চাইলেও, 'সিদ্ধার্থ' না রেখে 'সমুদ্র' নাম কেন রেখেছিলাম জানো গুড্ডুর? সমুদ্র তো সব কিছু ফিরিয়ে দেয়; আমার মনে হচ্ছিল যে আমিও যা হারিয়েছি তা হয়তো ফিরে পাব। জানি, একের ভিতর দিয়ে অন্যকে পাওয়া যায় না তবু আশা না করে পারে মানুষ? আর কী ভাগ্য দেখো, সে দিন যদি তুমি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে, তা হলেই নিশ্চিত হয়ে যেতে যে, জয়ব্রতর সঙ্গে আমার নতুন করে কিছুই গড়ে ওঠেনি। কথাই ওঠে না তার। কিন্তু তুমি তো বন্ধ দরজার বাইরে থেকেই অনেক কিছু কল্পনা করে পালিয়ে এলে। তোমাকে সরিয়ে দেওয়ার প্ল্যান করার সময়, তোমায় আবার কাছে পাব এমন একটা স্বপ্নও কি জাগেনি? কিন্তু নিয়তির পরিকল্পনা অন্য রকম ছিল, আর কী বলব বলো..." মালবিকার কান্নার আওয়াজ ভেসে এল ফোনের ভিতর দিয়ে।

সৈকতেশ নির্বাক রইল তবু।

"কেন কথা বলছ না, কেন চুপ করে আছ? এখনও এত ঘেন্না আমার উপর?"

বিহু সৈকতেশের কাছ থেকে নিজের মোবাইলটা নিয়ে বলে দিতে যাচ্ছিল যে, সৈকতেশ আর কথা বলতে পারে না। কিন্তু সৈকতেশ ইশারায় ওকে বারণ করল কিছু বলতে।

সৈকতেশের কথা অমান্য করবে না বলেই বিহু বলে দিল যে, সৈকতেশ এখন ঘুমোবেন।

"এক সময় আমি ঘুমোলে ও জেগে থাকত," স্পিকারে থাকা ফোনের থেকে মালবিকার বলা শেষ কয়েকটা শব্দ ভেসে এল।

বিহু দেখল, সৈকতেশের চোখে জল।

বিহুর ইচ্ছে করল যে সৈকতেশকে বলে, সময়ে ফিরে যাওয়া সম্ভব না হলেও, সম্পর্কটায় ফিরে যেতে। কিন্তু বিহুর ভয় হল, সৈকতেশকে নতুন করে কিছু বলতে।

এক বার তো বলেছিল।

সৈকতেশ তখন অবাক হয়ে বিহুর দিকে তাকিয়ে ভাবছে, এই মেয়েটাই গত পরশু ওকে বলেছিল যে নর্থ-ইস্টের ইন-চার্জ হিসেবে এখন ও চাইলেই গৌহাটিতে শিফ্ট করে যেতে পারে! এই মেয়েটাকেই সৈকতেশ উত্তরে বলেছিল যে বড় শহরে থাকলে কেবল রাজনৈতিক খবর পাওয়া যায়, প্রাণের খবর নয়!

"বিহুর দিকে তাকিয়ে থেকে কোনও লাভ হবে না, ও মাস্টার্স করার পর আপনার অফিসে ডিটিপি অপারেটরের কাজ করতে গিয়েছিল, কারণ আমরা ওকে খবর নেওয়ার জন্য ওখানে পাঠিয়েছিলাম," যে লোকটা বলল তার মাথাটা কামানো আর চোখ দুটো চশমার ভিতর দিয়ে চিতাবাঘের মতো জ্বলছে।

"কিসের খবর?"

"শিলং আর গৌহাটিতে আমার ফ্ল্যাট আছে, এই খবর আপনি পেলেন কোত্থেকে?" লোকটা খেঁকিয়ে উঠল।

"আপনি কে আমি জানি না, আমার আর্টিকলে কারও নামও করা হয়নি। কেবল লেখা হয়েছে যে ভারত দেশটা যদি এতই খারাপ, তবে সন্ত্রাসীরা ভারতের বিভিন্ন শহরে বেনামে ফ্ল্যাট কিনে রাখে কেন?"

"রাখে কারণ তাদেরও পরিবার আছে। তাদেরও বিশ্রাম নেওয়ার দরকার হয়।"

"দুটো খুনের মাঝখানে?"

সৈকতেশের প্রশ্নটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা এগিয়ে এসে একটা চড় কষিয়ে দিল ওর গালে।

"দুটো খুন নয়, যার সঙ্গে কথা বলছেন তিনি একশোর উপর খুনের মাস্টারমাইন্ড। ধেমাজির ব্লাস্টের পর পুলিশের কুকুররা যার খোঁজ পায়নি হাজার চেষ্টা করেও, উনিই সেই ভারালি।"

বিহুর কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল সৈকতেশ। এই লোকটা? এই লোকটাই?

ভারালি তখনই চেঁচিয়ে উঠল, "কে তোমাকে আমার নাম-ধাম বলতে বলেছে বিহু? বেশি কথা বলতে গিয়েই ইন্ডিয়ান আর্মির হাতে নিকেশ হয়েছে তোমার ভাই।"

"এই লোকটারও তো লাশ হতে বাকি নেই কম্যান্ডার।"

"যত ক্ষণ না হচ্ছে তত ক্ষণ..."

"লোকটার হাতে একটা ব্যাট ছিল, যখন ওকে ধরেছিলাম। এই বয়সেও ক্রিকেটার হওয়ার শখ আছে হয়তো!" ভারালির পিছনের লোকটা বলল।

সৈকতেশ একদৃষ্টে তাকিয়ে চিনতে পারল লোকটাকে। প্রতিদিন সকালের মতো আজও যখন 'নাগা ডেলিকেসি' রেস্তরাঁর পিছনের ছোট

মাঠটায় বাচ্চাদের ক্যাচিং প্র্যাকটিস দিচ্ছিল তখন এই লোকটাই সামনে এসে 'ক'টা বাজে' জিজ্ঞেস করছিল বারবার।

তার পর অন্য কেউ পিছন থেকে মুখ চেপে ধরে ওর, ক্লোরোফর্ম কিংবা ওই জাতীয় কিছুর প্রয়োগে অচেতন হয়ে পড়ে সৈকতেশ। যখন জ্ঞান ফেরে তখন ওর হাত দুটো বাঁধা, চোখেও একটা পট্টি। এখানে এনে যখন চোখের পট্টির পাশাপাশি ওর হাতের বাঁধনও খুলে দেওয়া হয়, একটু অবাকই হয় সৈকতেশ। একটু পরে বুঝতে পারে, বিহু ছাড়া যে তিনটে লোক ওখানে উপস্থিত তাদের দু'জনের হাতে ইনস্যাস নয়তো এ কে ৪৭ মজুত। নিজেকে বাদ দিয়ে বাচ্চাগুলোর চিন্তা পেয়ে বসে ওকে তখনই।

"বাচ্চাগুলোর কোনও ক্ষতি হয়নি তো?" ভয়ঙ্কর উদ্বেগের গলায় জিজ্ঞেস করে সৈকতেশ, "ইন্ডিয়া টিম থেকে ডেকেছে ওদের সবাইকে। সামনের জুনিয়র ওয়ার্ল্ড-কাপে খেলবে সবাই।" ভারালি ব্যঙ্গের হাসি হাসে কথাটা শুনে।

"সবাই না খেললেও এক-আধজন খেলতেই পারে, ভবিষ্যতে।"

"কেউ খেলবে না, কেউ না। নর্থ-ইস্ট থেকেও কেউ যদি খেলতে পারত তবে আমি খেলতাম। আমার পেসের সামনে দাঁড়াতে পারে, এমন কেউ ছিল না তখন!" পকেট থেকে একটা রবারের বল বের করে হাওয়ায় ছুড়ে দেয় ভারালি।

প্রাণের মায়া অনেক দিনই নেই, সৈকতেশ হেসে উঠল।

"হাসছ যে?" ভারালি 'আপনি-আজ্ঞে' থেকে নেমে এল।

"রবারের বল হাতে ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করার ইচ্ছে রাখতে শুনে আর কী করব বলে দেবে?" পাল্টা দিল সৈকতেশ।

"পারবে আমার ডেলিভারি ফেস করতে?"

"বোমা ছোড়া যার কাজ, সে বলও ছোড়ে, সে তো ভাল কথা। কিন্তু সরি, আমি রবারের বলে খেলি না।"

ভারালি যেন খেপে উঠল কথাটা শুনে। বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে থাকা দুই স্যাঙাতের এক জনকে কী একটা বলল, সে বন্দুক রেখেই বেরিয়ে গেল।

সৈকতেশ নির্বিকার তাকিয়ে আছে, ভারালি বলল, "দশ মিনিট সময় দাও ডিউস বল আসছে তোমার জন্য। হেলমেট ছাড়া খেলতে পারবে তো?"

"হেলমেট তো পরিনি জীবনে। ওই শিরস্ত্রাণ পড়ার কথা ভাবলেই সাফোকেটিং লাগত," স্বগতোক্তি করল সৈকতেশ।

ভারালি তখন কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে শুধু।

সৈকতেশের হাতে তুলে দেওয়ার আগে ওর ওই পঁচিশ ছুঁইছুঁই ব্যাটটা ভাল করে পরীক্ষা করল ভারালি। তার পর নিজের দৌড় শুরু করার বিন্দুতে গিয়ে দাঁড়াল।

স্যাঙাত তত ক্ষণে তিনটে উইকেট এনে পুঁতে দিয়েছে।

"তোমার মতো আরশোলাদের টাইট দেওয়ার পাশাপাশি আমরা ক্রিকেটও খেলে থাকি এখানে," ভারালি বলল।

"এই তিন জনে?" সৈকতেশ বলে ফেলল।

"একটা শিস দিলে এখনই পঞ্চাশ জন চলে আসবে এখানে। কিন্তু এখন তোমাদের পুলিশ আর প্যারামিলিটারি খুব সক্রিয় তাই অনেক সাক্ষী রেখে মারতে চাই না তোমায়।"

"আই সি। কিন্তু আমায় খুন করে কী লাভ হবে সেটা..."

"লাভ এটাই যে নর্থ-ইস্টের টেররিস্টদের পার্সোনাল লাইফ নিয়ে খবর করার সাহস পাবে না আর কেউ।"

"নিজেকে সন্ত্রাসী বলে স্বীকার করো তবে?"

"হ্যাঁ, করি। কিন্তু এখন আমি এক জন পেসার। এক ওভারের ছ'টা বলের মধ্যে তিনটেয় আউট করব তোমাকে।"

"একটাতেও পারবে না। আমার চ্যালেঞ্জ," কেবল নিজেকেই বলল সৈকতেশ।

এ রকম চ্যালেঞ্জ তেইশ বছর আগের এক শীতেও নিয়েছিল, সিসিএফসি গ্রাউন্ডে। কিন্তু সে দিন মাঠের কোথাও মারণাস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে ছিল না কোনও জল্লাদ। হাওয়া বইছিল ধীরে কিন্তু সেই হাওয়ার কামড় থেকে বোঝা যাচ্ছিল, যেখানে ওকে নিয়ে আসা হয়েছে সেই বাগানবাড়িটা সুবানসিরি নদীর কাছাকাছি। হয়তো ওই উঁচু পাঁচিলটার অল্প দূরেই...

"কী হল, রেডি নও?" ভারালি জিজ্ঞেস করল।

সৈকতেশ খেয়াল করল যে বাইশ গজ নয়, আঠেরো-উনিশ গজ দূর থেকে ছুটবে বলে রেডি হচ্ছে ভারালি।

"হেলমেট না পরলে পেসারের সামনে এই রকম স্টান্স নেবে। এই স্টান্স নিলে, নরি কন্ট্রাক্টরের মাথায় চার্লস গ্রিফিথের ওই গোলা এসে লাগত না..." দীপকদা বলতেন। দীপকদার শেখানো স্টান্সের কথা ভাবতে ভাবতেই অন্য একটা শব্দ বিদ্যুৎচমকের মতো ছুটে গেল মাথার ভিতর দিয়ে, 'চান্স'।

সুযোগ সহসা আসে না। আর যখন আসে?

মাটি-ঘেঁষা শট মারতে হলে হ্যান্ডলের উপরের অংশে থাকবে হাত, যাকে বলে 'টপ হ্যান্ড গ্রিপ'; আর হাওয়ায় তুলে মারতে চাইলে হ্যান্ডেলের নীচের অংশে থাকবে হাত, 'বটম হ্যান্ড গ্রিপ' বলে যাকে।

কত আগে শোনা কথা সব, 'জীবন গিয়েছে চলে কুড়ি-কুড়ি বছরের পার', প্রতিটা শব্দ কানে বাজে তবু। ভারালির প্রথম বলটা ছুটে এল সৈকতেশের দিকে।

বলটা মুঠোর মধ্যে থেকে ছাড়া হয়েছে, এই এত অবধি দেখতে পেল সৈকতেশ কিন্তু তার পর কীভাবে যে ওকে চুক্কি দিয়ে কোথায় চলে গেল, টের পেল না।

ইনস্যাস নামিয়ে রেখে উইকেট-কিপারের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল, সৈকতেশকে পাকড়াও করে আনা লোকদু'টোর এক জন। গ্লাভস ছাড়া বলটা ধরতে বোধহয় রীতিমতো লাগল ওর। ককিয়ে ওঠার আওয়াজ পাওয়া গেল।

সন্ত্রাস আর স্পোর্টসের এই তফাত। প্রথমটা একটা আনফিট লোকও করতে পারে। ভারালির দ্বিতীয় বলটা গুড লেংথ তবে অফ স্টাম্পের বেশ খানিকটা বাইরে। সৈকতেশ ব্যাট উপরে তোলার আগেই বেরিয়ে গেল।

তৃতীয় বলটা ইন-স্যুইং করাতে চেয়েছিল ভারালি। কিন্তু এই উপমহাদেশে ব্যবহৃত এসজি বল, জোরে বোলারদের খুব একটা সহায়তা করে না। বলটা যতখানি ঢুকলে সৈকতেশ এলবিডব্লু হয়ে যেত, তার সিকিভাগও ঢুকল না।

"ছ'টা বলের মধ্যে অন্তত দু'টোয় আউট করবই তোমাকে," ভারালি আবারও রান-আপ শুরু করার আগে চিৎকার করল।

"একটাতেও পারবে না!" এবার গলা তুলে বলল সৈকতেশ।

বলল তো বটে, তবে তেইশের রিফ্লেক্সের কিছুই কি অবশিষ্ট আছে ছেচল্লিশে এসে? চোখ বলের সেলাই দেখতে পেত তখন, এখন হাওয়ায় ভেসে আসা বলটাই অস্পষ্ট। কিন্তু মায়ের মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠল আচমকা। "সে শকতি নাহি আর নুয়ে পড়ে দেহভার/ অন্তর লুটায় ছিন্ন তরুর মতন..." মা বলত, শেষদিকটায়। সৈকতেশ কান পেতে শুনত আর ভাবত অন্তর কী ভাবে কাটা গাছের মতো লুটোতে পারে?

চতুর্থ বল করার জন্য দৌড় শুরু করেও মাটিতে বসে পড়ল ভারালি। শিরার উপর শিরা উঠে গেছে ওর, যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছে তাই। এইটুকু যন্ত্রণা যে নিজে নিতে পারে না, সে এত যন্ত্রণা দিয়ে যেতে পারে, অত বাবা-মাকে?

বন্দুক ছাড়া স্যাঙাত ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি ভারালির পায়ে মালিশ শুরু করল।

বিহু চেঁচিয়ে উঠল তখনই, "গেট আপ প্লিজ়। ধেমাজির মতো ব্লাস্ট চাই আবার।"

কথাটা কানে যেতেই ছোটবেলার প্রশ্নটার উত্তর পেয়ে গেল সৈকতেশ। ওই বাচ্চাগুলোই তো সভ্যতার অন্তর। আর 'ছিন্ন তরুর মতন' ওরাই লুটোচ্ছিল বিস্ফোরণের পর। সৈকতেশের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি আগুনের স্রোত বইতে শুরু করল।

ভারালির চতুর্থ বলটা লেগ-গ্লান্স করতে পারল, যদিও ডিপ ফাইন-লেগে পাঠাতে গিয়ে স্কোয়্যার-লেগের দিকে চলে গেল। ভাল গতি ছিল বলটায়, সন্ত্রাসী না হয়ে সুপার-ফাস্ট এক্সপ্রেসও হতে পারত ছেলেটা। কিন্তু ওর পৈশাচিক কর্মকাণ্ড যেমন ঘৃণ্য সত্য, পূর্ব আর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ধারাবাহিক বঞ্চনা যে সেই কাজ করার সুবিধে করে দেয়, সেটাও তো মিথ্যা নয়।

বিহুর শেষ কথাটা ফিরে আসছিল মাথায়। ঠিক যে ভাবে বলের গতি ব্যবহার করেই গ্লান্স করা যায়, ভারালির শক্তিটাকেই ব্যবহার করতে হবে ওর বিরুদ্ধে। আবারও ব্লাস্ট হওয়ার আগেই।

পঞ্চম বলটা করার আগে কোমরে হাত রেখে দম নিচ্ছিল ভারালি। ফলো-থ্রু'তে মাথাটা দেড় সেকেন্ড মতো বেশি ঝুঁকে থাকে ওর। বয়স ওরও বেড়েছে, প্র্যাকটিস ওরও নেই। কিন্তু ওই ছিদ্রটুকু দিয়েই কি শত্রুর নিউক্লিয়াসে ঢুকে পড়া যাবে?

খেলার জন্য আলাদা করা জায়গা ছোট হলেও বাগানবাড়ি বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে। কত রংবেরঙের ফুল ফুটে আছে ও দিকটায়। সাধু কিংবা সন্ত্রাসী, কার জন্য ফুটছে, তাতে ফুলের কিছু এসে যায় না। সৈকতেশের তেষ্টা পাচ্ছিল, কিন্তু ও ওই 'একের বেশি আর দুইয়ের কম' ফ্রেম থেকে বেরোতে চাইছিল না। ভারালি ব্যাটসম্যান আর বোলারের দূরত্ব আরও দু'পা কমিয়ে নিল তার মধ্যেই। সৈকতেশ খুশিই হল দেখে। আসছে, আরও কাছে আসছে।

পঞ্চম বলটা ইয়র্কার দেওয়ার চেষ্টা করল ভারালি। সহজেই ব্লক করে দিল সৈকতেশ। আর এই বলটা খেলামাত্র একটা আত্মবিশ্বাস এল ওর মনে। দেখতে পাচ্ছে, এখন অনেকটা ভাল দেখতে পাচ্ছে বল। যেমন মালবিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর মালবিকাকে আরও ভাল করে দেখতে পায়।

'টপ হ্যান্ড গ্রিপ' থেকে 'বটম হ্যান্ড গ্রিপ'এ চলে এসেছিল সৈকতেশ। ভারালির ষষ্ঠ বলটা যখন শর্ট-পিচড হয়েও, কোমর নয়, হাঁটু অবধি উঠল, এক আর দুই সেকেন্ডের অন্তর্বর্তী সেই পল এসে কালের চিরচঞ্চল গতি থমকে দিয়ে দাঁড়াল। কামানের গোলার মতো একটা শট, এক সেকেন্ডের কুড়ি কিংবা তিরিশ ভাগ সময়ে ব্যাট আর বলের মিলনে যার জন্ম, মিসাইলের মতো ছুটে গিয়ে আঘাত করল ভারালির ঝুঁকে থাকা মাথায়, কানের সামান্য উপরে।

মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ভারালি। উইকেট-কিপার তো বটেই, বন্দুক ধরে থাকা স্যাঙাতও বন্দুক নামিয়ে ছুটে এল, ওর কাছে। দু'জনই নিচু হয়ে দেখল, ভারালির ভয়-পাওয়ানো দৃষ্টি কীরকম যেন স্তিমিত আর ওর কান থেকে রক্তধারা বইতে শুরু করেছে। ঠিক তখনই বিহুর পিস্তল থেকে এক-দুই-তিন-চারটে গুলি ছুটে গেল। কাটা কলাগাছের মতো ভূমিশয্যা নিল লোকদুটো, ভারালির ডাইনে আর বাঁয়ে।

"ওরা মায়ানমারের জঙ্গলে আমার ভাইকে খুন করে পুঁতে দিয়েছে, ন্যায্য প্রশ্ন করার অপরাধে। আর এখানে এসে আর্মির কাঁধে দোষ চাপাচ্ছে!" বিহু জিন্সের পকেটে ছোট্ট পিস্তলটা ভরে রাখতে রাখতে বলল।

"কিন্তু আমাদের কাঁধে কেউ দোষ চাপাবার আগেই পালিয়ে যেতে হবে!" সৈকতেশ দশ সেকেন্ডের মধ্যে সামলে নিয়ে বিহুর হাত ধরে টানল।

বিহু হাতটা ছাড়িয়ে না নিয়ে হাসল, "দোষ চাপানোর জন্য দোষীদের বাঁচিয়ে রাখিনি। সংগ্রামীর ছদ্মবেশে শয়তানরা যে-অস্ত্র চালাতে শিখিয়েছিল আমায়, আজ ওদেরই খতম করে দিয়েছি তাই দিয়ে।"

"কিন্তু ভারালি?" বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে মাস্টারমাইন্ডের শ্বাস চলছে কি না দেখতে গেল সৈকতেশ।

তখনই চাকুটা এসে গলায় বিঁধল ওর।

বিহুর ছোড়া বুলেটে ফালাফালা হয়ে যাওয়া একটা লোক, মৃত্যুর আগের মুহূর্তে প্রতিশোধ নিয়ে গেল।

সৈকতেশের গলা বেয়ে রক্তধারা গড়িয়ে নামছিল। কিন্তু শ্রান্তি ছাপিয়ে শান্তি জাগছিল তাও। মনে হচ্ছিল যে, ফুলের ভিতরের সাপকে সরিয়ে দেওয়ার পুরস্কার হিসেবে আশিস ঝরে পড়ছে। ওর সারা শরীরকে ভিজিয়ে দিচ্ছে, সেই অফুরান আশিস; দেশ আর দেশের এক জন মানুষকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে একসঙ্গে।

৮। জয়গাথা

কী ভাবে সুবানসিরির হিল্লোল থেকে ডিব্রুগড়ের কলরোলে, সৈকতেশকে নিয়ে পৌঁছেছিল বিহু, সে এক আলাদা ইতিহাস। গল্পে এটুকুই থাক, বিহু আর এক দিনের জন্যেও ছেড়ে যায়নি সৈকতেশকে। সম্পৃক্ত হবার জন্য সম্পর্কের দরকার হয়নি ওর। কষ্টের ভাগ নেওয়ার জন্য, দরকার হয়নি কথোপকথনের।

অবশ্য কথা না বলার কষ্ট কি সত্যি করেই আর পেত সৈকতেশ? না হলে এক দিন এক টুকরো কাগজে বিহুকে—"কথা বলার মানে যদি নিজের মুখে হ্যালোজেনের আলো ফেলা হয়, তবে বলতে হবে যে আমি মুক্তি পেয়েছি"— লিখে দিয়েছিল কেন?

মুক্তির ভিতরে বাঁধন থাকে বলেই তো বিহুর বারণ না শুনে ধেমাজির লোকেরা জীবিত সৈকতেশের এই আবক্ষ মূর্তি বানিয়েছিল! জাতি-উপজাতি লয় হয়ে যায় যেখানে সেই মালিনীথানে পুজো দিয়ে ফেরার পথে এই মূর্তির সামনেও একটা ফুল রাখে কেউ কেউ। আবার কাকও এসে বসে মূর্তির মাথায়। অখণ্ড মণ্ডলাকার হবে কী করে না হলে?

অখণ্ড মণ্ডলাকার হয়নি এখনও। হবে যখন আমার সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছেন তাদের ভিতর থেকে সমুদ্র এগিয়ে এসে একটা ফুল রাখবে ওর বাবার কাছে। আর ওয়ার্সান শায়ারের সেই কবিতাটার কয়েকটা লাইন নিজের অনুবাদে শোনাবে, আমেরিকা, ইংল্যান্ড কিংবা পৃথিবীর যে-কোনও জায়গায় স্কুলের বাচ্চাদের উপর গুলি চললে যা শুকতারার মতো বেদনায় কেঁপে ওঠে।

"...সেই রাত্রে/ আমি আমার কোলে অ্যাটলাস নিয়ে/ সারা পৃথিবীর উপর আঙুল বুলোলাম/ আর ফিসফিসিয়ে জানতে চাইলাম,/ কোথায় ব্যথা লাগছে? /সে উত্তর দিল,/ সর্বত্র/ সর্বত্র/ সর্বত্র!"

আমি সময়ের স্বর, অসময়ের ঝড়, আপন এবং পর। তবে বিদায় নেওয়ার আগে বলে যাই, আমি কাহিনির ঘর।

সেই ঘরে শুয়ে সৈকতেশ শুনতে পাচ্ছে ওর ছেলের গলা। অ্যাটলাসের পৃষ্ঠা ময়ূরের পালকের মতো ছুঁয়ে যাচ্ছে ওকে। কিন্তু কোথাও আর ব্যথা করছে না। এ বারের পনেরোই অগস্ট ওর ভেজানো চোখের ভিতর জন্ম নিচ্ছে বিশ্বরূপ; এক হয়ে যাচ্ছে ধেমাজি আর ধরিত্রী। সর্বদেশে সর্বকালে হেঁটে স্কুলে যাচ্ছে বাচ্চারা, বাড়ি ফিরছে দৌড়তে দৌড়তে।

ওদের মায়েরা অপেক্ষা করছে যে।

সৈকতেশের মায়ের অপেক্ষাও কি কম?

একটা ব্যাট আর কয়েকটা গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত-বসন্ত গল্পের তাকে সাজিয়ে রেখে সৈকতেশ এ বার রওনা হবে।

সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে যাওয়ার মানে কী ও জানে না।

অজ্ঞানে, ভারতবর্ষে মিশে যাবে তাই।

অঙ্কন: বৈশালী সরকার

বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিজ়ে নির্মিত প্রথম ট্রানজ়িস্টরের একটি নকল

বিজ্ঞান, না ম্যাজিক?

প থি ক গু হ

জানুয়ারি ২৫, ১৯১৫। সানফ্রানসিসকো শহরে প্যাসিফিক টেলিফোন অ্যান্ড টেলিগ্রাফ কোম্পানির অফিস। ভিড় করেছেন বহু মানুষ। কী ব্যাপার? টেলিফোন লাইন পাতা হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের জলের তলা দিয়ে। কথা বলবেন টেলিফোনের আবিষ্কর্তা আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল। তাঁর সহকারী টমাস ওয়াটসন-এর সঙ্গে। বেল বসে আছেন নিউ ইয়র্ক শহরে, এটি অ্যান্ড টি-বেল টেলিফোনের অফিসে। আর ওয়াটসন সানফ্রানসিসকো শহরে। আমেরিকার দু'প্রান্তে দুই শহর। দু'জায়গার দূরত্ব ৪১৩৯ কিলোমিটার। ওই দূরত্ব অতিক্রম করে স্বাভাবিক কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া? যেন সামনাসামনি বসে কথোপকথন। টেলিফোনের এমনই মহিমা! তখন টেলিফোনের প্রযুক্তি পুরনো হয়ে গেছে। কিন্তু সাগরের জলের তলা দিয়ে লাইন, এবং তার মাধ্যমে কথা বলা? তা নতুন। নতুন প্রযুক্তির কামাল দেখতে তাই জড়ো হয়েছেন বহু মানুষ।

নিউ ইয়র্কে বেল বললেন, 'মিস্টার ওয়াটসন কাম হিয়ার। আই ওয়ান্ট ইউ।' টেলিফোনে সে কথা শুনলেন ওয়াটসন, সানফ্রানসিসকোয় বসে। তিনি উত্তরে বললেন, 'ইট উইল টেক মি ফাইভ ডেজ় টু গেট দেয়ার নাউ।' পাঁচ দিনের পথের দূরত্ব ঘুচে গেল। বেল আর ওয়াটসনের ওই কথোপকথন ঐতিহাসিক হয়ে আছে। সামনাসামনি যে-কথা বলতে পাঁচ দিন সময় লেগে যায়, সে কথা নিমেষে সেরে ফেললে প্রথম কথোপকথন তো ঐতিহাসিক হয়ে থাকারই কথা।

এরকম আর একটি ঘটনার সাক্ষী নিউ ইয়র্কে বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিজ়। ১৯৪৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর। ওই পরীক্ষাগারে তৈরি হয়েছিল ট্রানজিস্টর। আধুনিক সভ্যতার এক বড় উপকরণ। আবিষ্কর্তা ওই ল্যাবরেটরির তিন বিজ্ঞানী জন বারডিন, ওয়াল্টার হাউসার ব্রাটেন এবং ওঁদের বস উইলিয়াম ব্রাডফোর্ড শকলি। বলা ভাল, ট্রানজিস্টর 'আবিষ্কারে' বারডিন এবং ব্রাটেনের সঙ্গে শকলি হাত লাগাননি। যদিও ওরকম একটা জিনিস তিনি তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ১৯৩৯ সাল থেকে। সে অন্য কথা।

গত একশো বছরে বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ উপহার কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে দ্বিমত থাকতে পারে, তবে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ উপহার যে ট্রানজিস্টর, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বিজ্ঞান গবেষণা যে কী ভাবে প্রযুক্তির আশীর্বাদ হয়, ট্রানজিস্টর তারও উদাহরণ। ট্রানজিস্টর এসে যাওয়ায় ভ্যাকুয়াম টিউবের প্রয়োজন মেটে। আগে এক-একটা কম্পিউটারের আয়তন হত ঘর-জোড়া। এখন আর তা লাগে না। এখন এসেছে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (আই সি) এবং

(বাঁদিক থেকে) জন বারডিন, উইলিয়াম শকলি এবং ওয়াল্টার ব্রাটেন

মাইক্রোপ্রসেসর। ফলে এখন আমাদের হাতে ডেস্কটপ এবং হালফিল ল্যাপটপ কম্পিউটার। সেমিকন্ডাক্টর শিল্প সর্বত্র ছেয়ে গেছে। এখন বাৎসরিক বিক্রি ২,০০,০০০ কোটি ডলার। এর সঙ্গে যোগ করুন ইন্টারনেট বা আন্তর্জাল প্রযুক্তি। ট্রানজিস্টর আসার আগে এসব সম্ভব ছিল না। এখন ইনফরমেশন এজ বা তথ্য যুগ। ট্রানজিস্টরকে কেন যে এ যুগের নার্ভ সেল বা নাভিকেন্দ্র বলা হয়, তা বেশ বোঝা যায়।

আগেই বলেছি, ট্রানজিস্টর বিশুদ্ধ গবেষণার উপহার, বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ফসল। কেন কিছু কিছু মৌল বিদ্যুতের সুপরিবাহী, আর কোনও কোনও মৌল তা নয়, সেসব খোঁজ নিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন, বিদ্যুৎ হল পারমাণবিক কণা ইলেকট্রনের প্রবাহ। মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে নিউক্লিয়াস। নিস্তড়িৎ নিউট্রন এবং পজ়িটিভ চার্জবিশিষ্ট প্রোটনের বাসা। নিউক্লিয়াসের চারপাশে নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট ইলেকট্রন এক-একটা কক্ষপথে বিন্যস্ত। বেশির ভাগ মৌলের পরমাণু একেবারে বাইরের কক্ষপথে আটটা ইলেকট্রন রাখতে চায়। এই চাওয়ার পরিণাম বিভিন্ন মৌলের পরমাণু যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন। যেখানে বাইরের কক্ষপথে আটটা ইলেকট্রন হওয়ার জন্য অন্য মৌলের পরমাণুর বাইরের কক্ষপথ থেকে অনেকগুলো ইলেকট্রন ধার করতে হয় (অর্থাৎ, যে-ক্ষেত্রে মূল পরমাণুর বাইরের কক্ষপথে দু'-একটা ইলেকট্রন থাকে), সে ক্ষেত্রে মৌলেরা সুপরিবাহী হয়। যেমন, তামা— এর পরমাণুর বাইরের কক্ষপথে একটা করে ইলেকট্রন। এরকম ধাতুর ইলেকট্রনগুলো মোটামুটি ভাবে স্বাধীন থাকে, নিউক্লিয়াসের তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে না। ফলে, এরকম ধাতুর বাইরের কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলোর প্রবাহে বাধা প্রায় নেই। এরকম ধাতুরা বিদ্যুতের সুপরিবাহী। পক্ষান্তরে সালফার। এই মৌলের পরমাণুর বাইরের ইলেকট্রনগুলো সেরকম স্বাধীন নয়। সেজন্য সালফার মোটেই বিদ্যুতের পরিবাহী নয় (কুপরিবাহী)।

সুপরিবাহী আর কুপরিবাহী যেন দুই প্রান্তবিন্দু। এ দুয়ের মাঝখানে আছে সেমিকন্ডাক্টর বা আধাপরিবাহী। যেমন সিলিকন বা জারমেনিয়াম মৌল। এই ধরনের মৌলে প্রতি হাজার পরমাণুতে একটা স্বাধীন ইলেকট্রন থাকে, যা বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে পারে। তামার মতো প্রতি পরমাণুতে একটা স্বাধীন ইলেকট্রন নয়। গবেষকরা সেমিকন্ডাক্টর ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন, কারণ দেখা যায়, তারা কোনও অবস্থায় পরিবাহী, আবার কোনও অবস্থায় কুপরিবাহী। আধাপরিবাহীর এই রহস্যময় চরিত্রের সম্পর্কে গবেষণা করেই বিজ্ঞানীরা ট্রানজিস্টরের সন্ধান পান।

বিজ্ঞানীরা দেখেন, সিলিকন বা জারমেনিয়ামের পরমাণুর বাইরের কক্ষপথের চারটি ইলেকট্রন অন্য মৌলের সঙ্গে যুক্ত হতে কাজে (ওগুলোর নাম ভ্যালেন্স ইলেকট্রন) লাগে। কিন্তু যদি ইমপিউরিটি বা ভেজাল মৌল ওদের মধ্যে মেশানো হয়, তাহলে মূল মৌলের বিদ্যুৎ পরিবহণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। ভেজাল মৌল মেশালে কী হয়? যেমন ধরুন ফসফরাস। এর ভ্যালেন্স ইলেকট্রন পাঁচটা। চারটে সিলিকন বা জারমেনিয়ামের ভ্যালেন্স চারটে ইলেকট্রনের সঙ্গে যুক্ত হয়। বাকি থাকে ফসফরাসের একটা ইলেকট্রন। সেটা স্বাধীন। সেটা তখন বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে পারে। অথবা ভেজাল বোরন মৌল। এর পরমাণুর বাইরের কক্ষপথে তিনটে ইলেকট্রন। সিলিকনের পরমাণু থেকে একটা কম। সিলিকন বা জারমেনিয়াম কেলাসের মধ্যে বোরন মৌল ঢোকালে সিলিকন বা জারমেনিয়াম পরমাণুর ভ্যালেন্স ইলেকট্রনগুলো নড়েচড়ে যায় বটে, কিন্তু সেই 'ফাঁকের' মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।

বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিজ়ে বসে বারডিন এবং ব্রাটেন ওইসব নিয়েই পরীক্ষানিরীক্ষা করছিলেন। ওঁরা সেইসঙ্গে পরীক্ষা করছিলেন আধাপরিবাহীর পৃষ্ঠতলের ধর্ম নিয়ে। আধাপরিবাহীর কেলাসের পৃষ্ঠতল

একটু বেশি বিদ্যুৎ পরিবহণ করে। ওঁরা তৈরি করেন ট্রানজিস্টর। একটা জারমেনিয়াম স্ল্যাব, পাতলা প্লাস্টিক, হাল্কা একটা সোনার পাত, আর একটা পেপার ক্লিপ দিয়ে। বিদ্যুতের সিগনাল ১০০ গুণ বেড়ে গেল এতে। ১৯৪৭ সালের আবিষ্কার। ৭৫ বছর পূর্ণ হল এবার। বছরটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এত বড় আবিষ্কার! নয় বছরের মাথায় নোবেল পুরস্কার। পেলেন বারডিন, ব্রাটেন আর শকলি তিনজনেই।

আবিষ্কারের পরের ঘটনায় ফিরে আসি। আবিষ্কার যখন, তখন তো তা ছাপাতে হবে বড় জার্নালে। প্রসিদ্ধ জার্নাল *ফিজ়িকাল রিভিউ*-র এডিটর তখন জন টেট। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন শকলি। ছাপতে দিলেন তিনটে পেপার। 'দ্য ট্রানজিস্টর: আ সেমিকন্ডাক্টর ট্রায়োড', লেখক বারডিন এবং ব্রাটেন; 'দ্য নেচার অফ দ্য ফরওয়ার্ড কারেন্ট ইন জারমেনিয়াম পয়েন্ট কনটাক্টস', লেখক ব্রাটেন এবং বারডিন; 'মডিউলেশন অফ কনডাকট্যান্স অফ থিন ফিল্মস অফ সেমিকন্ডাক্টর্স বাই সারফেস চেঞ্জেস', লেখক শকলি এবং বিজ্ঞানী জেরাল্ড পিয়ারসন। পেপার তিনটের গুরুত্ব বিবেচনা করে টেট ১৫ দিনের মাথায় সেগুলো ছাপলেন *ফিজ়িকাল রিভিউ* জার্নালে।

সেই তৎপরতা কিন্তু দেখা গেল না সাংবাদিক মহলে। হ্যাঁ, বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিজ়-এর প্রধান প্রেস কনফারেন্স ডাকলেন ১৯৪৮ সালের ৩০ জুন। র‍্যালফ বাউন ঘোষণা করলেন আবিষ্কৃত যন্ত্রের নাম। তিনি বানান করে বললেন, T-R-A-N-S-I-S-T-O-R। কারণ, এই কুপরিবাহী বা আধাপরিবাহী মুহূর্তে বিদ্যুৎ পরিবহণকে সুগম করে তোলে। পরদিন ১ জুলাই, ১৯৪৮। *দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস* প্রেস কনফারেন্সের খবরটা ছাপল ৪৬ নম্বর পাতায়। কয়েক প্যারাগ্রাফে। ওই দৈনিকের পক্ষে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ খবর নিউ ইয়র্ক মেট্রোর ভাড়াবৃদ্ধি, ইয়াংকি দলের বস্টন রেড সক্স-এর কাছে হার এবং আইডলওয়াইল্ড এয়ারপোর্ট (পরে যার নাম হয় জন ফিটজ়েরাল্ড কেনেডি এয়ারপোর্ট) খুলে যাওয়া। প্রথম পাতায় খবরের মধ্যে আছে বার্লিন ব্লকেড। হ্যাঁ, তখন কোল্ড ওয়ার তুঙ্গে। সোভিয়েত ফৌজ অবরোধ করে রেখেছে পশ্চিম বার্লিন শহর। কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে সে সব খবর। ট্রানজিস্টর এখনও বর্তমান। ভবিষ্যৎ কে বুঝতে পারে?

ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। আইবিএম কোম্পানির চেয়ারম্যান থমাস জন ওয়াটসন ১৯৪৩ সালে বলেছিলেন, পৃথিবীতে মোটে পাঁচটা কম্পিউটার বিক্রি হবে। তিনি অবশ্য ভ্যাকুয়াম টিউবওয়ালা কম্পিউটারের কথা বলেছিলেন। যখন একটা কম্পিউটারের জন্য জায়গা লাগত একটা হলঘরের সমান। আর আজ?

ওয়াটসনের মন্তব্যে মনে পড়ছে, ভুল পূর্বাভাসের একটা লিস্ট হয়েছিল। তাতে উপরের দিকে ছিল দুই ভবিষ্যদ্বাণী। এক, সিগারকে ছোট করে যে সিগারেট, তা জনপ্রিয় হবে না। দুই, বিমানযাত্রা মানুষ পছন্দ করবে না।

ভবিষ্যতের আলোচনা করতে গেলে এ কালের কথা মনে পড়বেই। গর্ডন আর্ল মুর। ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে *ইলেকট্রনিক্স* ম্যাগাজিনে তিনি এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাচ্ছে, তা নিয়ে। আইসি কোন দিকে যাচ্ছে? মুর লিখেছিলেন, কম্পিউটার চিপ-এর মধ্যে সস্তায় ভরে দেওয়া আইসি-র সংখ্যা প্রতি দুই বছরে দ্বিগুণ হচ্ছে। এই ট্রেন্ড ১৯৫৯ সাল থেকে চলে আসছে। মানে, ১৯৫৯ সাল থেকে কম্পিউটার ক্রমশ জটিল হচ্ছে। মুর ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, ১৯৭৫ সালের মধ্যে কম্পিউটারের উপাদান যে-মাইক্রোচিপ আছে, তার মধ্যে ৬৫,০০০ আইসি কম খরচে ভরে দেওয়া যাবে। ওই প্রবন্ধে মুর লিখলেন, 'আইসি এমন ভেলকি দেখাবে যে, বাড়ির কম্পিউটার অথবা কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত

উইকিমিডিয়া কমন্স
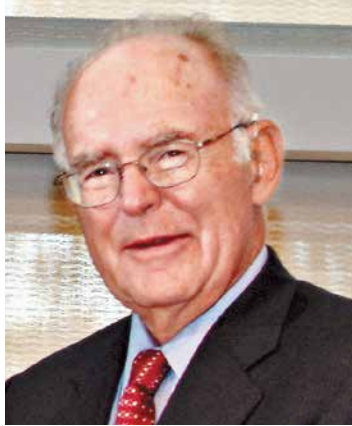
গর্ডন আর্ল মুর

টারমিনাল— মোটর গাড়িতে রাখা বহনযোগ্য ব্যক্তিগত কমিউনিকেশন সিস্টেম জলভাত হয়ে দাঁড়াবে।' এই মুর তখন ফেয়ারচাইল্ড সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানির গবেষণা-প্রধান। পরে তিনি ইন্টেল কোম্পানির একজন প্রতিষ্ঠাতা হন।

১৯৬৫ সালে পার্সোনাল কম্পিউটার বা পিসি কোথায়! আমেরিকায় ঘরে ঘরে পিসি এসেছে ১৯৮৩ সালে। যখন আইবিএম কোম্পানি অপেক্ষাকৃত সস্তা দামে পিসি বাজারে ছাড়ে। তার ১৮ বছর আগে ঘরে ঘরে পিসি-র আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করাটা চাট্টিখানি কথা নয়। কথায় বলে, বিজ্ঞানের পথ রোধ করার ক্ষমতা কারও নেই। এই বাংলায় একদা সিপিআই (এম) পার্টি কম্পিউটারের বিরোধিতা করার জন্য কুখ্যাত হয়েছিল। ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পর ওই দল ভেবেছিল, বুঝি বা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে গেছে। বুঝি ওই দলের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় পৃথিবী চলবে। যেমন, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ইংরেজি ভাষা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। ফল এখন মারাত্মক। পার্টি ক্যাডাররা এখন জানে না তাদের হাতে যে স্মার্টফোন, তা আসলে এক-একটা কম্পিউটার!

১৯৬৫ সালে মুর ভুল গণনা করেছিলেন। ৬৫,০০০ ট্রানজিস্টরের চিপ আসতে আসতে ১৯৭৫ সাল নয়, ১৯৮১ সাল হয়ে গিয়েছিল। তবে ওঁর মূল বক্তব্য— ওই কম্পিউটার চিপের মধ্যে ট্রানজিস্টরের সংখ্যা প্রতি দু'বছরে দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া—ওটা ঠিক ছিল। পরে ওটা দু'বছরে নয়, দেড় বছরে এসে দাঁড়ায়। এই যে চিপের মধ্যে প্রতি ১৮ মাস অন্তর ট্রানজিস্টরের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া— এটাকে এখন মুর'স ল বা মুরের নিয়ম ধরা হয়। কম্পিউটারের ক্ষমতা যাচাইয়ের একটা উপায় হল, যত তার মধ্যে ট্রানজিস্টর, তত তার ক্ষমতা। চিপে ট্রানজিস্টর ভরতে ভরতে এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, নতুন করে ট্রানজিস্টর ভরা যাচ্ছে না। ট্রানজিস্টর ভরারও তো একটা সীমা আছে। সেই সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে ব্যাপারটা। তাহলে এখন উপায়? অথচ আমাদের কাছে কম্পিউটারের চাহিদা বাড়ছে। আমরা চাই কম আয়তনে বেশি কাজ। এক সময় কম্পিউটারের জন্য জায়গা লাগত হলঘর জুড়ে। এখন এসেছে ল্যাপটপ, ট্যাব। জায়গা কম, কাজ বেশি। এখন মিনিয়েচারাইজ়েশনের যুগ। ১৯৯০-এর দশকে 'ওয়ান মাইক্রন বেরিয়ার'-এর কথা খুব শোনা যেত। এক মাইক্রন হল এক মিলিমিটারের ১০০০ ভাগের এক ভাগ। ১ মাইক্রন জায়গার কমে একটা ট্রানজিস্টর তৈরি করা যায় না— এই কথা শোনা যেত। কেন ১ মাইক্রনকে একটা বাধা ধরা হত? তাহলে সিলিকন চিপের মধ্যে ট্রানজিস্টর কেমন ভাবে খোদাই করা হত, তা বলতে হয়। সিলিকন চিপের মধ্যে ট্রানজিস্টর খোদাই করা হত লেজ়ার আলো দিয়ে। লেজ়ার আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য আধ মাইক্রনের কাছাকাছি। সেই আলো দিয়ে তার চেয়ে কম জায়গায় ট্রানজিস্টর তৈরি করা যায় না। এখন অবশ্য ট্রানজিস্টর তৈরি করার উন্নত পদ্ধতি বের হয়েছে। সেই পদ্ধতি দিয়ে পরে ০.১৩ মাইক্রন, ০.০৮ মাইক্রন জায়গাতেও ট্রানজিস্টর তৈরি করা গেছে। এভাবে ট্রানজিস্টরের জায়গা কমছে। কিন্তু কত দিন? জায়গারও তো একটা শেষ আছে। ট্রানজিস্টরের জন্য কোনও জায়গাই লাগবে না, তা তো হতে পারে না। যত

সামান্যই হোক, জায়গা একটু লাগবেই। মিনিয়েচারাইজ়েশনের যুগে জায়গার সমস্যা মেটানো যাবে কী করে?

সমস্যা মেটানোর একটা উপায় হল নতুন জাতের কম্পিউটার বানানো। এক ট্রানজিস্টর দিয়ে একাধিক কাজ করানো। কোন কম্পিউটার করতে পারে তেমন কাজ? কোয়ান্টাম কম্পিউটার। মানে, এমন কম্পিউটার, যা কাজ করবে পদার্থবিদ্যার অন্যতম শাখা কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুযায়ী।

বিজ্ঞানের ছাত্রেরা জানেন, কোয়ান্টাম মেকানিক্স অদ্ভুতুড়ে। ওই শাখার নিয়মকানুনগুলো আলাদা। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। দু'-একটা নিয়মের কথা বললে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। যেমন কোয়ান্টাম মেকানিক্সে কণার আছে তরঙ্গ ধর্ম, আবার তরঙ্গেরও আছে কণার চরিত্র। যখন যে ধর্ম পরীক্ষার জন্য যন্ত্রপাতি সাজিয়ে বসা যায়, তখন সে ধর্ম শনাক্ত হয়। কোয়ান্টামের আর-একটা চরিত্র হল যাকে ইংরেজিতে বলা হয়, নো ইভেন্ট ইজ় আ ফেনোমেনন, আনলেস ইট ইজ় আ রেকর্ডেড ফেনোমেনন। শনাক্ত করার আগে কোনও ঘটনাই ঘটনা নয়। একটা কণা কোনও জায়গায় শনাক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত তা একাধিক জায়গায় আছে।

ব্যাপারটা কী রকম? জঙ্গলে ঝড় হল। ভাঙল গাছ। এই গাছ ভাঙার শব্দ হল কি? সে শব্দ শোনার জন্য কান থাকলে, শব্দ হল, তা নইলে নয়। জঙ্গলে যদি কোনও প্রাণী না থাকে— আসলে, কান যদি না থাকে— তাহলে শব্দ হল না। এ জন্য কোয়ান্টামের বড় প্রবক্তা নিলস বোর-এর সঙ্গে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের তর্ক বাঁধত কোয়ান্টাম নিয়ে। বোর বলতেন, কোয়ান্টামের প্রতিপাদ্য শুনে যে চমকে উঠবে না, সে বুঝবে না এর কিছু। আর আইনস্টাইন? তাঁর কাছে এটা মানা অসম্ভব ছিল যে, একটা কণা কখন কোথায় থাকবে, তা আমরা না জানতে পারি, কিন্তু সেই অজ্ঞানতা আমাদের অক্ষমতা। কণাটার কোনও মুহূর্তে অবস্থান কোথাও একটা থাকবে। কোয়ান্টামে বলা হয়, পরমাণুর মধ্যে একটা ইলেকট্রন এক কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ হঠাৎ লাফ দেয় অন্য কক্ষপথে। লাফ দেওয়ার বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এক কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষপথে যাওয়ার সময়টা ওই ইলেকট্রন কী করে, তা বোঝা যায় না। অর্থাৎ, কী ভাবে সে তা যায়— যাওয়ার পথটা— বোঝা যায় না। এক কক্ষপথে ডুব, এবং অন্য পথে ভেসে ওঠা, এই দুটো কাজ হয় এক সঙ্গে। এই জন্য আইনস্টাইন বলতেন, এক কক্ষপথ থেকে আর-এক কক্ষপথে ইলেকট্রনটা কোন পথে যায়! এ জন্য সময়ই বা লাগে না কী করে?

আইনস্টাইনের জীবনীকার *সাটল ইজ় দ্য লর্ড: দ্য সায়েন্স অ্যান্ড লাইফ অফ অ্যালবার্ট আইনস্টাইন* গ্রন্থের লেখক আব্রাহাম পায়াস নিজেও একজন পদার্থবিজ্ঞানী। কাজ করতেন আমেরিকায় প্রিন্সটনে বিখ্যাত ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি-তে। যেখানে জীবনের শেষ তিন দশক কাটিয়েছিলেন আইনস্টাইন। পায়াস বয়সে অনেক ছোট আইনস্টাইনের চেয়ে। তিনি আইনস্টাইনের মতোই ইউরোপ থেকে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন আমেরিকায়। পায়াস জার্মান ভাষা জানতেন বলে আইনস্টাইনের সঙ্গে ভাব জমে গিয়েছিল।

একদিনের বর্ণনা দিয়েছেন পায়াস। লিখেছেন, আমি আর আইনস্টাইন ফিরছি ইনস্টিটিউট থেকে। আইনস্টাইনকে তাঁর কোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ে আমি ফিরে যাব
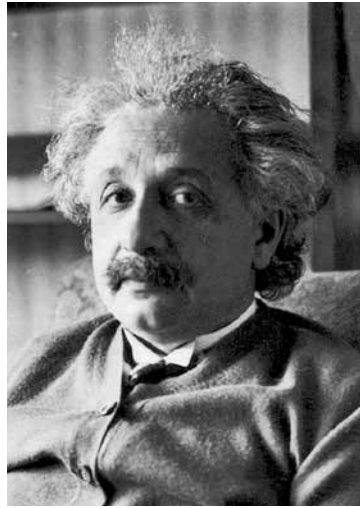
অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

আমার কোয়ার্টারে। পথে হঠাৎ আমাকে থামিয়ে আইস্টাইন জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, তুমিও কি বিশ্বাস করো যে, আমি তাকিয়ে না-দেখলে চাঁদটা ওখানে নেই? অর্থাৎ, আইনস্টাইন বলতে চাইতেন, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রতিপাদ্য নো ইভেন্ট ইজ় আ ফেনোমেনন আনলেস ইট ইজ় আ রেকর্ডেড ফেনোমেনন সম্পর্কে জানতে। ওই দাবি কি ঠিক? 'দেখা' কাজটা একটা রেকর্ডেড ফেনোমেনন। সেই দেখার উপর নির্ভর করেছে চাঁদের অস্তিত্ব? দেখলে আছে, না দেখলে নেই। এও কি মানা সম্ভব?

কোয়ান্টাম মেকানিক্স নব্য বিজ্ঞান। নিলস বোর ছাড়া এর সাপোর্টার যারা, তারা বয়সে নবীন। এ কারণে কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে তখন বলা হত 'বয়েজ় ফিজ়িক্স'। পায়াস বয়সে তরুণ বলে তাঁর কাছে আইনস্টাইন জানতে চাইলেন কোয়ান্টাম মেকানিক্স নির্ভুল মেনে নিলে তো মানতে হয় যে না-দেখলে চাঁদটা আকাশে নেই। আইনস্টাইনের প্রশ্ন শুনে পায়াস থ। লিখেছিলেন, ওঁর প্রশ্ন শুনে কী উত্তর দেব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। বারবার ভাবছিলাম এত বড় বিজ্ঞানী, তা সত্ত্বেও কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে এমন চোখে দেখেন।

একটা কথা কিন্তু বলতেই হয়। কোয়ান্টাম মেকানিক্স কিন্তু আবিষ্কৃত হয়েছিল পদার্থকণা সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে। বলা হয়, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রতিপাদ্যগুলো কণারাজ্যে একেবারে নির্ভুল, তা প্রমাণিত হয়েছে। কণার চেয়ে বড় যে বস্তুগুলো, তাদের ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম মেকানিক্স প্রযোজ্য কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বস্তু কী সাইজ়ের হলে, তার ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম মেকানিক্স প্রযোজ্য হবে, তা এক মস্ত গবেষণার বিষয়। এ ব্যাপারে প্রচুর গবেষণা, পরীক্ষানিরীক্ষা হচ্ছে। চাঁদ মোটেই কণা সাইজ়ের বস্তু নয়। সুতরাং, তার ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম মেকানিক্স প্রযোজ্য না-হওয়ারই কথা। আবার বলাও যায় না, কেউ একদিন হয়তো পরীক্ষা করে প্রমাণ করে ছাড়বেন যে, না-দেখলে সত্যিই চাঁদটা আকাশে নেই। মুশকিল হল, কোনও কিছুর থাকা বা না-থাকা প্রমাণ করা যায় কীভাবে? প্রমাণ করতে গেলে তো শনাক্তকরণ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। শনাক্তকরণ মানেই তো সেই আবার কোয়ান্টাম মেকানিক্স এসে পড়ছে।

কোয়ান্টামের সবচেয়ে বড় অদ্ভুতুড়ে ব্যাপার হল এনট্যাংগলমেন্ট। শব্দটা জার্মান শব্দ ভারশ্রানগুং থেকে এসেছে। এর বাংলা কী হতে পারে! অদ্ভুতুড়ে বা অতীন্দ্রিয় গাঁটছড়া। এর একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। ১৯৩৫ সাল। আইনস্টাইন তখন আমেরিকায়। ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি-তে কর্মরত দুই বিজ্ঞানী বরিস পোডলস্কি এবং নাথান রোজ়েন-এর সঙ্গে তিনি এক পেপার লিখলেন। *ফিজ়িকাল রিভিউ* জার্নালে ওই পেপারের শিরোনাম 'ক্যান কোয়ান্টাম-মেকানিক্যাল ডেসক্রিপশন অফ ফিজ়িকাল রিয়ালিটি বি রিগার্ডেড অ্যাজ় কমপ্লিট?' বাস্তব জগতের কোয়ান্টাম বর্ণনা কি স্বয়ংসম্পূর্ণ? ও রকম প্রশ্ন তুলে তিন বিজ্ঞানী ওঁদের পেপারে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন বাস্তবের কোয়ান্টাম বর্ণনা সম্পূর্ণ নয়। এই তিন বিজ্ঞানীর আদ্যক্ষরে বিখ্যাত ওই প্রবন্ধকে 'ইপিআর পেপার' বলা হয়।

অস্ট্রিয়ার নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী আরউইন শ্রয়েডিংগার আইনস্টাইনের মতোই কোয়ান্টামের বিরোধী ছিলেন। পরমাণুর ভিতরে ইলেকট্রনের এক কক্ষপথ থেকে আর-এক কক্ষপথে যাওয়াকে বলে কোয়ান্টাম জাম্প। এই কোয়ান্টাম জাম্পের ভেলকি আগেই বলেছি। এই ভেলকি লক্ষ করে শ্রয়েডিংগার তাই বলেছিলেন, আমি জীবনে

কখনও কোয়ান্টাম গবেষণার সঙ্গে জড়াতে চাই না। কিন্তু এমনই কপাল যে, কোয়ান্টাম গবেষণার সবচেয়ে বিখ্যাত থট এক্সপেরিমেন্ট বা কাল্পনিক পরীক্ষার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে আছে। তিনি নিজে ওই থট এক্সপেরিমেন্টের কথা বলেছিলেন।

বিজ্ঞানে থট এক্সপেরিমেন্টের গুরুত্ব আছে। হাতেকলমে পরীক্ষা না-করে, অনেক সময় কাল্পনিক পরীক্ষায় বিভিন্ন দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়। *ফিজ়িকাল রিভিউ* জার্নালে কোয়ান্টাম নস্যাৎ করে আইনস্টাইন, পোডলস্কি এবং রোজ়েন যে প্রবন্ধ লেখেন, তাও একটি থট এক্সপেরিমেন্ট। সে প্রবন্ধ পড়ে উৎসাহিত হলেন শ্রয়েডিংগার। জার্মান ভাষায় অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখলেন আইনস্টাইনকে। ওই চিঠিতে 'ভারখ্রানগুং' শব্দটা ব্যবহার করলেন শ্রয়েডিংগার। পরে ইংরেজিতে তিনি 'এনট্যাংগলমেন্ট' শব্দটা ব্যবহার করেন। তিনি লেখেন এক পেপার। যা প্রকাশিত হয় *প্রসিডিংস অফ দ্য কেমব্রিজ ফিলোজ়ফিক্যাল সোসাইটি* জার্নালে। প্রবন্ধের শিরোনাম 'ডিসকাশন অফ প্রোবাবিলিটি রিলেশন বিটুইন সেপারেট সিস্টেমস।'

ভারখ্রানগুং বা এনট্যাংগলমেন্ট বলতে কী বোঝায়, তা এবার ব্যাখ্যা করা দরকার। ধরা যাক, দুটো কণা। ঘর্ষণে বা যে-কোনও কারণে হোক, পরস্পর মিলিত হয়েছে। এবার, তারা যে যার দিকে চলে গেছে। যত দূরে যাক তারা, যতক্ষণ সময় কাটুক, কণা দুটোর মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাবে। সম্পর্ক মানে ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক। একটা কণা যে ধর্ম দেখাবে, অন্য কণাটা তার উল্টো ধর্ম দেখাবে। এ যেন অতীন্দ্রিয় গাঁটছড়া। এনট্যাংগলমেন্টের মূল কথা হল এই। তাঁর প্রবন্ধে শ্রয়েডিংগার লিখলেন, 'এটাকে আমি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটা লক্ষণ না-বলে বরং বলব একমাত্র লক্ষণ। যা তত্ত্বটাকে সাবেকি বিজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়ার পর পরমাণু দুটোর কোয়ান্টাম দশা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে যায়।' এই অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত বোঝাতে শ্রয়েডিংগার ইংরেজি 'এনট্যাংগলড' শব্দটি ব্যবহার করেন। এনট্যাংগলড থেকে এনট্যাংগলমেন্ট। দু'টি কণা বা বস্তুর মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী, এক অদ্ভুতুড়ে গাঁটছড়া। আইনস্টাইনের ভাষায় 'স্পুকি অ্যাকশন অ্যাট আ ডিসট্যান্স'। দূর থেকে ভূতুড়ে প্রভাব।

কতটা ভূতুড়ে? তা বোঝাতে তাঁর পেপারে শ্রয়েডিংগার বর্ণনা করলেন এই থট এক্সপেরিমেন্ট। যাতে তিনি কণারাজ্যের ব্যাপারস্যাপার চালান করলেন বড়সড় বস্তুর বা আমাদের চারপাশের জগতে। যে-কাল্পনিক পরীক্ষার বর্ণনা তিনি দিলেন, তা সহজ করে বললে এ রকম: একটা বিড়াল ডালাবন্ধ স্টিলের বাক্সে। তার পাশে রাখা সামান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ, একটা হাতুড়ি এবং এক শিশি হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড। তেজস্ক্রিয় মৌলের পরমাণু যখন ভাঙে, তখন তা থেকে বেরোয় ক্ষতিকর রশ্মি। কিন্তু কোনও পরমাণু কখন ভাঙবে, তা আগাম বলা যায় না কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী। শুধু বলা যায়, ওই ভাঙার সম্ভাবনা কতটা। হ্যাঁ, এটা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটা বড় দিক। কোয়ান্টাম তত্ত্বে কোনও কিছু নির্দিষ্ট নয়, সম্ভাবনার ব্যাপার। এই যে কোনও ঘটনা ঘটবেই, এমন বলা যাচ্ছে না, বলা যাচ্ছে শুধু ঘটার সম্ভাবনা কতটা, তাও আইনস্টাইনের অপছন্দ ছিল। যা-হোক, ফিরে আসি শ্রয়েডিংগারের থট এক্সপেরিমেন্টে। স্টিলের বাক্সের ভেতরে ব্যবস্থা এমন যে, যদি একটা পরমাণু ভাঙে,

ছবি: উইকিমিডিয়া কমন্স

এরউইন শ্রয়েডিংগার

তবে নড়বে হাতুড়ি। সজোরে ঘা পড়বে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডের শিশিতে। ভাঙবে সেটা। ডালাবন্ধ বাক্সের ভেতরে ছড়াবে ওই অ্যাসিডের বিষাক্ত গ্যাস। মরবে বেচারা বিড়াল।

তো, এরকম অবস্থায় বাক্সের ডালা বন্ধ রইল এক ঘণ্টা। এই সময়টা জুড়ে ডালাবন্ধ বাক্সের ভিতরের পরিস্থিতি কী রকম? হ্যাঁ, কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী, তেজস্ক্রিয়তা যেহেতু সম্ভাবনার ব্যাপার, এবং শনাক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত সব সম্ভাবনা পাশাপাশি বিরাজ করে, সেহেতু মৌলের একটা পরমাণু ভেঙেছে এবং ভাঙেনি— এই উভয় দশা বর্তমান। এবার পরমাণুটার সঙ্গে হাতুড়ি যদি এনট্যাংগলমেন্টে যুক্ত থাকে, তাহলে পরিস্থিতি বিচিত্র। পরমাণু যেমন ভেঙেছে এবং ভাঙেনি— এই উভয় দশায়, তেমন হাতুড়িও নড়েছে এবং নড়েনি। হাইড্রোসায়ানিক শিশিতে ঘা পড়েছে এবং পড়েনি। বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়েছে এবং ছড়ায়নি। সুতরাং? হ্যাঁ, বিড়ালটা মরেছে এবং মরেনি— এই দুই দশায় রয়েছে এক ঘণ্টা।

এক ঘণ্টা পরে বাক্সের ডালা খুললে কি আমরা একটার বদলে জীবিত ও মৃত দুটো বিড়াল দেখব? ডালা খোলা মানে তো শনাক্ত করা। তখন তো আমরা জীবিত কিংবা মৃত একটা বিড়ালই পাব। কিন্তু উদাহরণ দিয়ে শ্রয়েডিংগার বোঝালেন, পরমাণু থেকে এনট্যাংগলমেন্ট যদি বড় বস্তুতে (হাতুড়িতে) চালান করা যায়, তা হলে পরিস্থিতি কেমন বিচিত্র হয়। ডালাবন্ধ বাক্সে একটা বিড়াল বনে যায় দুটো বিড়াল। একটা জীবিত, অন্যটা মৃত। ডালা খুললে, দুটো থেকে ফের একটা বিড়াল। হয় জীবিত, নয় মৃত।

শ্রয়েডিংগারের এই থট এক্সপেরিমেন্টের সুবাদে বিজ্ঞানে 'শ্রয়েডিংগার'স ক্যাট' কথাটা চালু হয়েছে। কথাটার সাধারণ অর্থ দোদুল্যমান দশা। ওই জীবিত এবং মৃত। ও দুই দশা যে একসঙ্গে হয় না— অথচ কোয়ান্টাম মেকানিক্স সত্যি বলে মানলে হয়— সেটাই তাঁর কাল্পনিক পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন শ্রয়েডিংগার। এটা তাঁর কোয়ান্টামের ফ্যালাসি বোঝানোর প্রয়াস। তার আগে *ফিজ়িকাল রিভিউ* জার্নালে আইনস্টাইন, পোডলস্কি এবং রোজ়েনও এক থট এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে ওই ফ্যালাসি বোঝানোর চেষ্টাই করেছিলেন। ফ্যালাসি বলতে— দেখো, কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে সত্যি বলে ধরে নিলে কেমন উল্টোপাল্টা ব্যাপার হয়।

যতই আইনস্টাইন কিংবা শ্রয়েডিংগার কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভুল ধরার চেষ্টা করুন, তত্ত্বটা কিন্তু নির্ভুল। এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্স সম্পর্কে সমস্ত বিরূপ সমালোচনা সহ্য করেও তত্ত্বটা আজও টিকে আছে। এ ব্যাপারে যিনি সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন, তিনি জন স্টুয়ার্ট বেল। আয়ারল্যান্ডের এই বিজ্ঞানী ১৯৬৪ সালে *ফিজ়িক্স* জার্নালে এক প্রবন্ধ লেখেন। পেপারের শিরোনাম 'অন দ্য আইনস্টাইন পোডলস্কি রোজ়েন প্যারাডক্স'। অবশ্যই ১৯৩৪ সালে লেখা ওই তিন বিজ্ঞানীর পেপার নিয়ে। ওঁদের পেপারের ভুল ধরে। তাঁর পেপারে কী লিখলেন বেল? বলা বাহুল্য এটিও এক থট এক্সপেরিমেন্ট। তবে, ওই তিন বিজ্ঞানী যে পরীক্ষার বর্ণনা দিয়েছিলেন, তা শুধু কল্পনায় সম্ভব। বেল যে থট এক্সপেরিমেন্টের কথা বললেন, তা কিন্তু ল্যাবরেটরিতে করে দেখা যায়। সহজ করে বোঝালে বলতে হয়, বেলের কাল্পনিক পরীক্ষাটি যেন কোনও শহরে জনগণনার মতো ব্যাপার। বেল যেন দেখালেন, কোয়ান্টাম মেকানিক্স মিথ্যে হলে শহরে লাল চুলওয়ালা
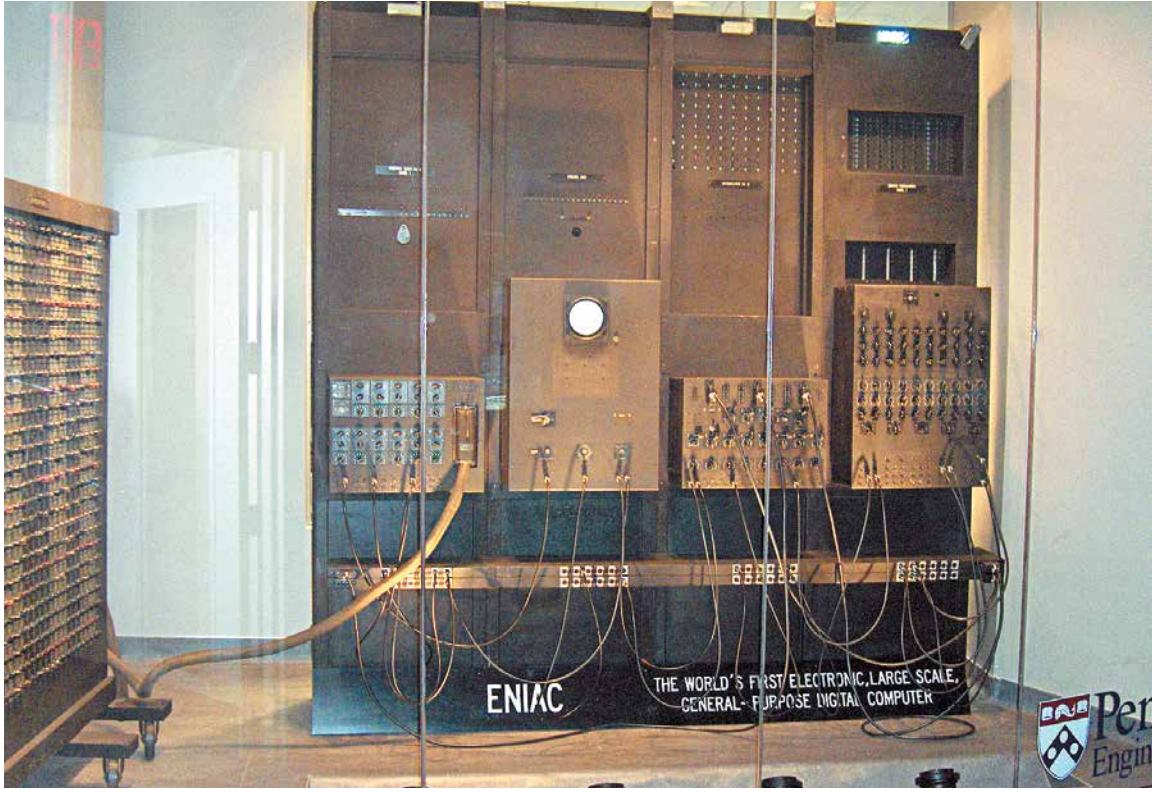
'এনিয়াক' কম্পিউটার, প্রথম যুগের দানবাকৃতি যন্ত্রগণক। পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখা নমুনা

মানুষের সংখ্যা ওখানকার মোট জনসংখ্যার কম হবে। আর, কোয়ান্টাম মেকানিক্স সত্যি হলে, লাল চুলওয়ালা মানুষ থাকবে মোট জনসংখ্যার বেশি। সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় জনগণনা করে। বারবার জনগণনা করা হয়। দেখা যায়, লাল চুলওয়ালা মানুষের সংখ্যা সত্যিই মোট জনসংখ্যার বেশি! সুতরাং, কোয়ান্টাম মেকানিক্স ঠিক। আইনস্টাইন, শ্রয়েডিংগারের আপত্তি সত্ত্বেও! বেলের কৃতিত্ব বড় কম নয়। কোয়ান্টাম সত্যি। হ্যাঁ, সত্যি এনট্যাংগলমেন্টও। বেল মারা যান ১৯৯০ সালে। ৬২ বছর বয়সে। ১৯৯০ সালে তিনি নোবেল প্রাইজের জন্য মনোনীত হন। বেঁচে থাকলে তিনি ওই পুরস্কার পেতেন।

শুধু তত্ত্বের কচকচি নয়, কোয়ান্টাম দস্তুরমতো ব্যবহারিক প্রয়োগের বিজ্ঞান। কাজে লাগানোর বিজ্ঞান। প্রযুক্তির উপাদান। ট্রানজিস্টরের উদাহরণ তো আগে দিয়েছি। সত্যি কোয়ান্টাম মেকানিক্স সীমাবদ্ধ থাকেনি শুধু গবেষণা কিংবা বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জনের বিষয় হিসেবে। সেই গবেষণা এবং জ্ঞান নানা সাফল্য এনেছে রসায়ন, জীববিদ্যা কিংবা চিকিৎসাজগতে। ইলেকট্রনিক্স শিল্প কিংবা তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব সম্ভব হত না কোয়ান্টাম চর্চা বিনে। সিডি প্লেয়ারে লেজার, হাসপাতালে এমআরআই স্ক্যান— এ সবই কোয়ান্টামের আশীর্বাদ। বলা হয়, ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রির যাট শতাংশই নাকি কোয়ান্টামের দান। কোয়ান্টামের ব্যবহারিক প্রয়োগে দুনিয়া জুড়ে চলেছে কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা।

কোয়ান্টামের সবচেয়ে চমকপ্রদ প্রয়োগ নাকি দেখা যাবে কোয়ান্টাম কম্পিউটারে। আর এ রকম কম্পিউটার নাকি কাজ করবে ওই শ্রয়েডিংগার'স ক্যাট নীতিতে। হ্যাঁ, কোয়ান্টামের সমালোচক শ্রয়েডিংগার যে থট এক্সপেরিমেন্টের বর্ণনা দিয়েছিলেন কোয়ান্টাম তত্ত্ব কতটা আজগুবি, তা বোঝাতে।

আজগুবিই সত্যি। এবং তা প্রমাণ করবে কোয়ান্টাম কম্পিউটার। উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। ধরা যাক, সাধারণ কম্পিউটার, যাতে সুইচ আছে মাত্র দুটো। প্রতিটি সুইচ অন কিংবা অফ করে কম্পিউটার তার কাজ করে। অন মানে ধরা হয় ১, আর অফ মানে ০। যে কম্পিউটারে দুটো সুইচ, তার ক্ষেত্রে হতে পারে প্রথম আর দ্বিতীয় সুইচ মিলে অবস্থা এ রকম: ০০, ১০, ০১ অথবা ১১। এ রকম দশা কিন্তু এক-এক বারে হতে পারে। এক বারে নয়। আর কোয়ান্টাম কম্পিউটারে (যে কম্পিউটারে মাত্র দুটো সুইচ) এক বারেই হতে পারে ওই চার দশা। ডালাবন্ধ স্টিলের বাক্সে যেমন জীবিত অথবা মৃত বিড়ালের পরিবর্তে জীবিত এবং মৃত বিড়াল— এও ঠিক তেমনই। অথবা নয়, এবং। কোয়ান্টাম কম্পিউটারের রহস্য এটাই। তিন সুইচওয়ালা সাধারণ কম্পিউটারে এক-এক বার দশা হতে পারে এ রকম: ০০০, ০০১, ০১০, ০১১, ১০০, ১০১, ১১০ অথবা ১১১। তিন সুইচওয়ালা কোয়ান্টাম কম্পিউটারে একবারেই ওই আটরকম দশা হতে পারে।

$২^{২}$ = ৪। $২^{৩}$ = ৮। এভাবে দেখানো যায়, সুইচের সংখ্যা যত বেশি হবে, কোয়ান্টাম কম্পিউটারে একবারে তত বেশি দশা হতে পারে। সুইচের সংখ্যা ৪ ($২^{৪}$ = ১৬), ৫ ($২^{৫}$ = ৩২), ৬ ($২^{৬}$ = ৬৪), ৭ ($২^{৭}$ = ১২৮), ৮ ($২^{৮}$ = ২৫৬) হলে, কোয়ান্টাম কম্পিউটারে একবারেই দশা হতে পারে যথাক্রমে ১৬, ৩২, ৬৪, ১২৮ এবং ২৫৬ রকম। ১০টা সুইচওয়ালা কোয়ান্টাম কম্পিউটারে একবারে দশা হতে পারে ১০২৪ রকম। ($২^{১০}$= ১০২৪)। আর ৬৪টা সুইচওয়ালা কোয়ান্টাম কম্পিউটারে একবারে কতগুলো দশা হতে পারে? $২^{৬৪}$= ১৮৪৪৬৭৪৪০৭৩৭০৯৫৫১৬১৬। যেহেতু কম্পিউটারে একবারে দশা মানে একটা গণনা, তাই কোয়ান্টাম কম্পিউটারে গণনা করায় অনেক সুবিধা। কম্পিউটারকে বলা হয় যন্ত্রগণক। কম্পিউটার কাজ করে চলে গণনা করে করে— এটা হলে, ওটা করতে

হবে— তাই সাধারণ কম্পিউটারের তুলনায় কোয়ান্টাম কম্পিউটারে অনেক, অ-নে-ক, বেশি সুবিধা। সাধারণ কম্পিউটারের তুলনায় কোয়ান্টাম কম্পিউটারের এই যে নিমেষে অনেক বেশি গণনা করার ক্ষমতা— এটাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে কোয়ান্টাম সুপ্রিমেসি।

এই কোয়ান্টাম সুপ্রিমেসি অর্জনের জন্য— আসলে, কোয়ান্টাম কম্পিউটার বানানোর জন্য— অনেক কোম্পানি চেষ্টা করছে। গুগল, আইবিএম, মাইক্রোসফট, কমপ্যাক, ডি-ওয়েভ। কারও চেষ্টাই ফলপ্রসূ হচ্ছে না। ২০১৯ সালে গুগল কোম্পানি ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করেছিল, তারা নাকি কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরি করে ফেলেছে। এখন শোনা যাচ্ছে, প্রকৃত কোয়ান্টাম সুপ্রিমেসি বলতে যা বোঝায়, তা তারা অর্জন করতে পারেনি। সুতরাং, কোয়ান্টাম কম্পিউটার হল গাছের মগডালে ঝোলা পাকা ফলের মতো। সকলেই তার নাগাল পেতে চাইছে, কিন্তু কেউ পাচ্ছে না। এখনও পর্যন্ত।

হ্যাঁ, এখনও পর্যন্ত। কোয়ান্টাম কম্পিউটার যে ভবিষ্যতে বানানো যাবেই, সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মনে এখন কোনও সন্দেহ নেই। সেই সম্ভাবনা চিন্তার উদ্রেক করেছে এক শ্রেণির মানুষের কাছে। তাঁরা হলেন ক্রিপ্টোগ্রাফার। শব্দটা এসেছে ক্রিপ্টোগ্রাফি থেকে। ক্রিপ্টোগ্রাফি হল সাংকেতিক ভাষা। যে-ভাষায় কথা বললে, শুধু যাঁকে উদ্দেশ করে বলা, তিনি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবেন না। মানে, ভাষাকে হযবরল করে দেওয়া। আগে রাজারাজড়া কিংবা গুপ্তচরদের শুধু ক্রিপ্টোগ্রাফি প্রয়োজন হত। এখন ই-মেল, ই-ব্যাঙ্কিং এবং ই-কমার্স এসে যাওয়ায় আম জনসাধারণের প্রয়োজন হয়েছে ক্রিপ্টোগ্রাফি। অন্যের গচ্ছিত টাকা হাতিয়ে নেওয়া আটকাতে, অন্যের চিঠি পড়ে ফেলা বন্ধ করতে কিংবা অন্যের কেনা মাল নিজের বগলদাবা করা ঠেকাতে ক্রিপ্টোগ্রাফি ব্যবহার করা ছাড়া উপায় কী? ক্রিপ্টোগ্রাফির প্রয়োজন দিনে দিনে বাড়ছে।

ক্রিপ্টোগ্রাফিতে কী করা হয়? আগেই বলেছি, অক্ষরগুলোকে হযবরল করে দেওয়া। নানা উপায়ে এ কাজটা করা হয়। quantum এই শব্দটায় q-এর বদলে r, u-এর বদলে v (মানে, যে অক্ষরগুলো ওখানে আছে, ইংরেজি বর্ণমালায় তার পরের অক্ষর বদলে নিলে) বনে যায় rvbouvn। যা দেখে চেনা যায় না ওটা quantum। এভাবে মূল লিপির অক্ষরগুলোকে পাল্টে হযবরল করা যেত। কিন্তু মুশকিল হল, লিপি দীর্ঘ হলে, ইংরেজি বর্ণমালায় কোন অক্ষর লিপিতে কত বার উপস্থিত থাকবে, তার একটা পরিসংখ্যান আছে। একে বলে ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানালিসিস। যেমন, ইংরেজি শব্দমালায় সবচেয়ে বেশি আসে e অক্ষর। তার পর আসে t অক্ষর, তার পর a। সুতরাং, কোনও হযবরল-এ যদি r অক্ষর সবচেয়ে বেশি আসে, আসল লিপিতে ওই অক্ষর হল e। এভাবে rvbouvn থেকে quantum পেতে দেরি হবে না।

তা হলে উপায়? ১৯৭৭ সালে তিন গণিতজ্ঞ রোনাল্ড রিভেস্ট, আদি শ্যামির এবং লিওনার্ড এডেলম্যান এক ফন্দি বের করেন। পরে জানা যায়, ১৯৭৩ সালেই ওই ফন্দিটা নাকি আবিষ্কার করেছিলেন ব্রিটিশ সরকারের গভর্নমেন্ট কমিউনিকেশনস হেডকোয়ার্টার্স (জিসিএইচকিউ)। যেহেতু সরকারি দফতরে এরকম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার গোপন রাখার নিয়ম, তাই ওই আবিষ্কারের খবর কেউ জানতে পারে না।

ফন্দিটা কী? গুণিতক থেকে গুণ্য আর গুণক বের করা। ৩ আর ৫ গুণ করলে কী হয়, তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু, সেই ১৫ থেকে ৩ আর ৫-এ যাওয়া কঠিন। এ ক্ষেত্রে সোজা, কারণ ১৫ বড় সংখ্যা নয়। বড় সংখ্যার ক্ষেত্রে সমস্যা বড়। ১৮৩১৩ × ২২৩০৭ = ৪০৮৫০৮০৯১। অথবা ২৩১৮৯ × ৫০০২১ = ১১৫৯৯৩৬৯৬৯। এখন, ৪০৮৫০৮০৯১ থেকে কি তার উৎপাদক দুটো ১৮৩১৩ এবং ২২৩০৭, কিংবা ১১৫৯৯৩৬৯৬৯ থেকে কি তার উৎপাদক দুটো ২৩১৮৯ এবং ৫০০২১ বের করা সহজ? যত সহজে গুণফল নির্ণয় করা যাচ্ছে, তত সহজে উৎপাদক বের করা যায় না। একটা কাজ সহজ, উল্টোটা কঠিন। এই কঠিন কাজের উপরই দাঁড়িয়ে আছে ই-মেল, ই-ব্যাঙ্কিং বা ই-কমার্স।

দেখেশুনে মনে পড়ছে ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ গডফ্রে হ্যারল্ড (জি এইচ) হার্ডি-র কথা। ভারতীয়রা তাঁকে মনে রাখবে এ কারণে যে, শ্রীনিবাস রামানুজনের সুপ্ত গণিত প্রতিভা তিনিই ঠিক চিনতে পেরেছিলেন। রামানুজন একে-তাকে চিঠি লিখে ক্লান্ত, তখন এই হার্ডি রামানুজনের চিঠি পড়ে তাঁকে কেমব্রিজে নিয়ে এসেছিলেন। হার্ডি ছিলেন প্যাসিফিস্ট। শান্তিকামী। যুদ্ধ ঘোর অপছন্দ ছিল তাঁর। গবেষণা করতেন নাম্বার থিওরি বিষয়ে। অর্থাৎ, যে বিষয়ে সংখ্যাদের ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেই হার্ডি প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে হিংসা থেকে দূরে থাকতেন, শান্তি পেতেন, শুধু সংখ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। নাম্বার থিওরি গবেষণায় ডুব দিয়ে। হার্ডি এখন বেঁচে থাকলে দেখে যেতেন, সংখ্যা শুধু অলস গবেষণার বিষয় নয়, শুধু শান্তির আশ্রয় নয়, রীতিমতো বাস্তবে প্রয়োগের ব্যাপারও। আধুনিক সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ। সংখ্যা এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, তা বিনে সভ্যতা ভেঙে পড়বে।

ক্রিপ্টোগ্রাফির লোকেরা কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ভবিষ্যৎ ভেবে চিন্তায় কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে ফিরে যেতে হবে ১৯৯৪ সালে। ওই বছর পিটার শর নামে বেল ল্যাবরেটরির এক বিজ্ঞানী কোয়ান্টাম কম্পিউটারের এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আবিষ্কার করেন। উৎপাদক নির্ণয়ের কাজ। তিনশো-চারশো অঙ্কের সংখ্যার উৎপাদক নির্ণয়।

কোয়ান্টাম কম্পিউটার যেহেতু নিমেষে প্রচুর গণনা করতে পারে, তাই উৎপাদক নির্ণয়ের কাজটাও সহজ। কোয়ান্টাম কম্পিউটার উৎপাদক নির্ণয় করবে ট্রায়াল-অ্যান্ড-এরর সিস্টেমে। উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৫-র উৎপাদক নির্ণয় করতে হবে। ২ × ১ ≠ ১৫; ২ × ২ ≠ ১৫; ২ × ৩ ≠ ১৫; ২ × ৪ ≠ ১৫; ২ × ৫ ≠ ১৫; ২ × ৬ ≠ ১৫; ২ × ৭ ≠ ১৫; ২ × ৮ ≠ ১৫; ৩ × ৪ ≠ ১৫; ৩ × ৫ = ১৫। যেহেতু কোয়ান্টাম কম্পিউটার অনেক গণনা একসঙ্গে করে ফেলতে পারে, সেহেতু বড় সংখ্যার উৎপাদক এভাবে ট্রায়াল-অ্যান্ড-এরর পদ্ধতিতে বের করতে পারে, মূল কথা হল, একবারে অনেক গণনা করতে পারা এবং না-পারা। ১৫-র উৎপাদক বের করতে যদি অতগুলি গণনা লাগে, তা হলে ৪০৮৫০৮০৯১ এবং ১১৫৯৯৩৬৯৬৯-এর উৎপাদক নির্ণয় করতে কতগুলি গণনা লাগবে, তা সহজেই বোঝা যায়।

ক্রিপ্টোগ্রাফিতে ৪০৮৫০৮০৯১ এবং ১১৫৯৯৩৬৯৬৯ সংখ্যা দুটো জানা থাকলেও কিছু লাভ নেই। যতক্ষণ না ওই দুটো সংখ্যার উৎপাদক (যথাক্রমে ১৮৩১৩ এবং ২২৩০৭, ২৩১৮৯ এবং ৫০০২১) জানা যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যের ই-মেল, ই-ব্যাঙ্কিং, ই-কমার্স সাইটে ঢোকা যাবে না, এমনই ব্যবস্থা থাকে। ইন্টারনেটে ৪০৮৫০৮০৯১ এবং ১১৫৯৯৩৬৯৬৯-এর মতো নয় অঙ্কবিশিষ্ট বা দশ অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা ব্যবহার করা হয় না, হযবরল সৃষ্টির জন্য কাজে লাগানো হয় তিনশো-চারশো অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা। ই-মেল, ই-ব্যাঙ্কিং, ই-কমার্স সাইটকে সুরক্ষিত করার জন্য।

প্রশ্ন হচ্ছে, কোয়ান্টাম কম্পিউটার এসে গেলে, বড় বড় সংখ্যার উৎপাদক নির্ণয় যখন সহজ কাজ হয়ে যাবে, তখন ই-মেল, ই-ব্যাঙ্কিং, ই-কমার্স সাইটগুলো এখনকার মতো সুরক্ষিত থাকবে তো? প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান-লেখক স্যর আর্থার চার্লস ক্লার্ক বলেছিলেন, এনি সাফিশিয়েন্টলি অ্যাডভান্সড টেকনোলজি ইজ় ইনডিস্টিংগুইশেবল ফ্রম ম্যাজিক। কোয়ান্টাম তো সাফিশিয়েন্টলি অ্যাডভান্সড টেকনোলজি। তো তার প্রযুক্তি যে ম্যাজিক-সদৃশ হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! সেই ম্যাজিক কি সব লন্ডভন্ড করে দেবে? দুনিয়া যাবে রসাতলে?

হিমবাহে ঢাকা সোয়ালবার্ড

সুমেরু বৃত্তের ওপারে

নি বে দি তা ঘো ষ

মরা ড্রেক প্যাসেজ পেরিয়েছ? জেন-এর গলায় বিস্ময়ের সুর।

'নিশ্চয়ই!'

'সি সিকনেস হয়নি?'

'বেয়াড়া রকমের হয়েছিল। দেড় দিন বিছানা থেকে মাথা তুলতে পারিনি।'

'এত কষ্টের পুরস্কার পেলে অ্যান্টার্কটিকা পৌঁছে?'

'অ্যান্টার্কটিকার ঘোর এখনও কাটেনি আমাদের, এই সাত বছরেও।'

কথা হচ্ছিল জেন আর জর্জের সঙ্গে। আমেরিকার ফ্লোরিডা থেকে এসে উপস্থিত হয়েছেন কর্তা-গিন্নি, এই ইসফিয়োর্ডেন জেটিতে। জেন বেশ গল্পবাজ মহিলা। এর মধ্যেই আড্ডা জমিয়ে দিয়েছেন। যদিও ওঁর অর্ধেক কথাই বোধগম্য হচ্ছে না। বড্ড জড়ানো উচ্চারণ। অ্যান্টার্কটিকা ওঁদের যাওয়া হয়ে ওঠেনি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ড্রেক প্যাসেজ পেরনোর ভয়ে। আমরা ওঁদের যারপরনাই সাহস জোগালাম, 'ড্রেক প্যাসেজের দাপট সয়ে নিতে পারলেই পৃথিবী হাতের মুঠোয়! সারা জীবনের সঞ্চয়!' ভাল লাগল এই জুটির সঙ্গে আলাপ হয়ে। এরকম দুর্গম, অজানা যাত্রাপথে এক জাহাজ অচেনা সহযাত্রীর মধ্যে যত এমন আলাপি লোক পাওয়া যায় ততই ভাল।

জেটিতে দাঁড়িয়ে আছে সাততলা বিশাল

জাহাজটা। দেখলেই কেমন সম্ভ্রম জাগে! একটু দূরে দাঁড়িয়ে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর একটা জাহাজ। এও চলেছে সুমেরু অভিযানে। জাহাজের গ্যাংওয়ে দিয়ে আমাদের মালপত্র তোলা হচ্ছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জেটি ছাড়বে আমাদের জাহাজ, 'এম. ভি হনডিয়াস', (*MV Hondius*)। যাত্রা করবে উত্তর মেরুর দিকে, আশি ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে।

দিনটা আজ অসম্ভব উজ্জ্বল। ঝকঝকে নীল আকাশ। হাওয়ার গতিবেগও তেমন তীব্র নয়। এমনিতেই এখানে, এই জুন মাসের গোড়ায়, চব্বিশ ঘণ্টায় কখনওই সূর্য অস্ত যাচ্ছে না। দিগন্তরেখা থেকে প্রায় ২০-২১ ডিগ্রি ওপর দিয়ে পুব থেকে পশ্চিমে একবার চক্কর খেয়ে আসছে। দিনে রাতে এতটুকু বিশ্রাম নেই সুয্যিমামার! আমাদেরও তথৈবচ অবস্থা। কতক্ষণ ঘুরে বেড়াব, কখন বিশ্রাম নেব, সব হিসেব গুলিয়ে গেছে। 'দিন রাত' বলে কিছু নেই যে! শরীরে ক্লান্তি এলে কী হবে, রাত বারোটাতেও চোখ গোলগোল হয়ে আছে, চকচকে দিনের আলোয়। আমার ইচ্ছে সারারাত জেগে দেখি আলোর কমা-বাড়া! ছেলের প্রবল আপত্তি, 'মা, পর্দা টেনে ঘর অন্ধকার না করলে ঘুমবো কী করে? আমরা তো অন্ধকারেই ঘুমোতে অভ্যস্ত!' অগত্যা মধুসূদন! সূর্যের মুখের ওপর জানলা বন্ধ করে দিতে হল।

ভৌগোলিক উত্তর মেরুবিন্দু থেকে খুব কাছেই আছি আমরা। ৭৮ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে, লংইয়ারবিয়েন (Longyearbyen) নামে এক ছোট্ট জনপদে। শহর একেবারেই বলা যায় না। সব মিলিয়ে মোটে ২২০০ লোকের বাস। গাড়ি যাওয়ার রাস্তা বাদে পিচের রাস্তা নেই বললেই চলে। তবে শহর তৈরি হচ্ছে ক্রমাগত। আজব জায়গা! এখানে রোমশ হাস্কি কুকুর স্লেজ গাড়ি টানে, বেপরোয়া পর্যটক বরফের ওপর দিয়ে স্নো বাইক ছোটায়। সান্টা ক্লজের রেন ডিয়ার ইতিউতি চরে বেড়ায়। মেরু ভাল্লুকের ভয়ে বন্দুকধারী গার্ড ছাড়া লোকালয়ের বাইরে যাওয়া নিষেধ, বিশেষত ট্যুরিস্টদের। 'ম্যারি অ্যান'স পোলারিগ' হোটেলে রেস্তোরাঁর মেনু কার্ড দেখে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ! বলে কী! বল্গা হরিণের মাংস, সিল আর তিমির মাংস নাকি এখানকার স্পেশ্যাল মেনু! ফুড ডেলিকেসি।

'তিমি আর সিল শিকার নিষিদ্ধ নয় এখানে?' মেনু কার্ড হাতে স্মিত মুখে দাঁড়িয়ে থাকা ঝকঝকে, স্মার্ট ইনগ্রিডকে জিজ্ঞেস করতেই হল।

ছবি: সুবীর ঘোষ

'এই মাংস গ্রিনল্যান্ড থেকে আসে। ওদের দেশে এখনও শিকার পুরোপুরি বেআইনি নয়।'

'সিলের মাংস তো খুব শক্ত, তাই না?' ভয়ে ভয়ে ইনগ্রিডকে জিজ্ঞেস করি।

'মোটেই না! সিলের মাংস নরম তুলতুলে, ওর ফ্যাটের জন্য। একবার খেয়ে দেখতে পারো।'

আমরা এমনিতে সর্বভুক। বিভিন্ন জায়গার রকমারি খাবার চেখে দেখতে ভালই বাসি। কিন্তু তা বলে তিমি! সিল! বিবেকেও যেন বাধল কোথাও।

ইওরোপ থেকে উত্তর মেরুর দিকে এলে লংইয়ারবিয়েন পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরের মানুষের বসতি এলাকা। এর ওপারে ধু ধু বরফের গ্লেসিয়ার আর বরফের চাদরে ঢাকা সুমেরু মহাসাগর। পুরু গ্লেসিয়ারে ৬০ শতাংশ ঢাকা সোয়ালবার্ড (Svalbard) বা স্পিটসবার্গেন নামের এই দ্বীপমালা, যার রাজধানী লংইয়ারবিয়েন। নরওয়ে দেশের অন্তর্গত, রাজনৈতিক ভাবে। নরওয়ের রাজধানী অসলো থেকে অনেকটাই উত্তরে। ঠিকমতো উচ্চারণই হতে চায় না এসব জায়গার নাম।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এয়ারলাইন্সের প্লেনটা অসলো থেকে ট্রমসো হয়ে সোয়ালবার্ড এয়ারপোর্টে যখন নামছে, নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি ধু ধু বরফ চারধারে। মাঝে মাঝে কিছু খোঁচা খোঁচা কালো পাহাড়ের চুড়ো মাথা উঁচু করে আছে। বিমোহিত হয়েছিলাম, কিন্তু পেটে একটা ভয়ের গুরগুরানি টের পাচ্ছিলাম। গরম দেশের মানুষ আমরা, হঠাৎ এক ডিগ্রি তাপমাত্রায় এসে নামতে কলজের জোর লাগে বইকি!

২০২০ সালের মে মাসে ডাচ সংস্থা ওসেনওয়াইড এক্সপিডিশনস-এর জাহাজে আমাদের এই অভিযান হওয়ার কথা ছিল। এদের সঙ্গে যথারীতি আমাদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিল আমাজন অ্যাডভেঞ্চারস-এর জিম ম্যাকড্যানিয়েল। আচমকা করোনা ভাইরাস এসে সব বরবাদ করে দিল। করোনার প্রকোপ সারা বিশ্বেই কমে আসায় আবার সুযোগ এসেছে। যাত্রীরা স্বভাবতই উত্তেজিত। এত বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে জাহাজ অবধি এসে পৌঁছতে পেরেছে, এতেই সবাই

ক্রনিক'স গিলেমট পাখি

আইসবার্গ, আর্কটিকের আইসক্রিম

আহ্লাদে আটখানা। মাস্কের বালাই নেই এই দেশে। অভিযানের নিয়মাবলিতেই লেখা আছে, মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক নয়। তবে কেউ পরতে চাইলে তাকে সম্মান দিতে হবে।

'ওয়েলকাম আবোর্ড', জাহাজে উঠতেই উষ্ণ অভ্যর্থনা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল আমাদের। অচিরেই জাহাজটা যেন আপনার হয়ে উঠল। রিসেপশন কাউন্টার থেকে প্রত্যেককে একটা করে নিজের নাম লেখা কার্ড আর কার্ড-হোল্ডার রিং দেওয়া হল। এই কার্ড দিয়ে কেবিনের দরজা খোলা যাবে। তাছাড়া ঘর থেকে বেরলেই প্রত্যেককে এই কার্ড সর্বদা জ্যাকেটের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখতে হবে, যাতে দৃশ্যমান থাকে। বুঝলাম, এই ক'দিন জাহাজ এবং জাহাজের বাইরে সর্বত্র নজরবন্দি থাকতে হবে আমাদের। তা নিশ্চয় নিরাপত্তার স্বার্থেই!

ঘরে ঢুকে দেখি স্যুটকেস এসে পৌঁছে গেছে। ঘরের দু'দিকে দুটো খাট, আর ওপরের বাঙ্কে একটা। একটা সোফাও আছে দেখছি। এ ছাড়া তিনজনের তিনটে কাবার্ড। ডেস্ক, চেয়ার, আয়না। তোয়ালে, সাবান-শ্যাম্পু-হেয়ার ড্রায়ার। আর্কটিকেও স্নান! বাড়াবাড়ি না? এ তো বাদশাহি আয়োজন! তবে নরম বিছানায় ইচ্ছে থাকলেও একটু গড়িয়ে নেওয়া গেল না। কাবার্ড থেকে ক্যাটক্যাটে কমলা রঙের গাবদা লাইফ জ্যাকেট নিয়ে হুড়মুড় করে তখনই উঠে যেতে হল অবজার্ভেশন লাউঞ্জে, পাঁচতলায়।

'সোলাস' (Safety of Lives at Sea)-এর নিয়ম অনুযায়ী জাহাজে উঠলেই বোট সেফটি ড্রিল বাধ্যতামূলক। মাঝসমুদ্রে জাহাজ কখনও বিপদে পড়লে অ্যালার্ম বেল বেজে উঠবে। তখনই আমাদের সবরকম গরম জামাকাপড় পরে, কেবলমাত্র ওষুধপত্র সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্ট ডেকে গিয়ে জাহাজের সেকেন্ড অফিসার আর থার্ড অফিসারের নির্দেশে লাইফ বোটে উঠে যেতে হবে একে একে। লাউঞ্জের সামনে দু'টি বিশাল পর্দায় এবং বিভিন্ন কোণে লাগানো টিভিতে দেখানো হল, কীভাবে লাইফ জ্যাকেট আর শূন্যের নীচে তাপমাত্রায় জলে ভেসে থাকতে পারার জন্য ফ্লোটেশন স্যুট পরতে হবে। দড়ি টানাটানি করে প্রত্যেককে যার যার লাইফ জ্যাকেট পরে দেখে নিতে হল তখন। থার্ড অফিসার ডন বুরেন জানালেন, লাইফ বোটে তিনদিনের খাবার আর পানীয় জল মজুত থাকবে। কিন্তু তারপর? যদি তিনদিনের মধ্যে উদ্ধার না করতে পারে আমাদের? আর ভাবতে পারলাম না। এরপর অ্যালার্ম বেজে উঠল বিপ বিপ শব্দে, পরপর সাতবার। শুনেই পিলে চমকে উঠল! এ যেন অভিযানের শুরুতেই মৃত্যুঘণ্টা শুনে নেওয়া! লাইফ জ্যাকেটের খাঁচার ভেতর তখন লাবডুবের তীব্র গতি রোধ করে সাধ্য কার!

এই সময় মনটা বড় দুর্বল হয়ে পড়ে। দেশে প্রিয়জনের মুখগুলো একে একে চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। ক্রিস্টোফার কলম্বাসের একটা উক্তি মনে পড়ল, কোথায় যেন পড়েছিলাম, 'You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.' ঠিক সন্ধ্যে সাতটায় জাহাজের ভেঁপু বেজে উঠল। জেটি ছেড়ে, মানুষের লোকালয় ছেড়ে, মাটি ছেড়ে অজানা উদ্দেশে সাগরে ভেসে পড়ল আমাদের জাহাজ।

আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা লাইফ জ্যাকেট খুলে তবে শান্তি। আবার লাউঞ্জে ডাক পড়েছে। গিয়ে দেখি লাউঞ্জ সরগরম। নানারকমের সুগন্ধি চা, কফি, মিল্ক চকোলেট, এসপ্রেসো কফি, চকোলেট কফি, মেশিন খুললেই পাওয়া যাচ্ছে। লাউঞ্জের কাউন্টারে সাজানো রয়েছে অনেক রকমের কুকি আর টার্ট। ঝুড়ি-ভর্তি টাটকা ফল— আপেল, আঙুর, কমলালেবু, প্লাম, পিচ। সবাই এর মধ্যেই গরম চা-কফি-কুকি নিয়ে সোফায় বসে পড়েছে। মানুষজন কিছুটা ধাতস্থ। দলনেতা এদোয়ার্দো রুবিও আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন তাঁর দু'পাশে অভিযানের বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যদের সঙ্গে। মিরিয়ম ভেরমেজি, হুয়ান বেরেনস্টেইন, অ্যান্ড্রু ক্রাউডার, মেইকে শোয়ের, লরা মনি, হেজেল পিটউড, কুন জনগারলিং, জর্জ কেনেডি, সারা জেনার, ক্লডিও ঘিগলিওনে। আর আছেন জাহাজের ডাক্তারবাবু রজার স্টেইনস। এঁরা কেউ ভূতত্ত্ববিদ, কেউ জীববিজ্ঞানী। কেউ পরিবেশবিদ, তো কেউ আবার পক্ষীবিদ বা উদ্ভিদবিদ। আমাদেরই মতো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে জড়ো হয়েছেন।

এদুয়ার্দো নিজে পদার্থবিদ, জ্যোতির্বিদ্যা ওঁর বিষয়। গুয়াতেমালার লোক। কলেজে পড়াতেনও। কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যা বিষয় হলে কী হয়, এই পৃথিবী আর তার বিচিত্র প্রকৃতি ওঁকে

নিশির ডাকের মতো টানে। কলেজে পড়ানো ছেড়ে পাকাপাকি ভাবে যোগ দিয়েছেন ওসেনওয়াইড এক্সপিডিশনস সংস্থায়। যেমন করে ছাত্রদের ক্লাসে পড়াতেন, তেমন করেই আমাদের বোঝাচ্ছেন এই অভিযানের গুরুত্ব। 'উত্তর মেরুর মরু প্রকৃতির আনাচেকানাচে আমরা খোঁজ চালাব এখানকার প্রাণিকুলের সন্ধানে। আগামী সাতদিনে একবারও যেন ভুলে না যাই, আমরা এখানে মাত্র কয়েকদিনের অতিথি। অতিথির সহবৎ যেন বজায় রাখতে পারি। খুব কঠিন পরিবেশে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে চলেছে এখানকার বন্যপ্রাণ। আমরা যেন কোনওভাবেই তাদের বিরক্তি বা ভয়ের কারণ না হই। AECO (the Association of Arctic Expedition Cruise Operators)-এর বেঁধে দেওয়া নিয়মের গন্ডির বাইরে আমরা পা রাখতে পারব না। তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।'

খুবই গম্ভীর আলোচনা চলছে। হঠাৎ এদুয়ার্দো সামনের রো-তে বসা অলিভার আর শার্লট-এর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'তোমরা কি প্রেমবশত একে অপরের কার্ড গলায় ঝুলিয়েছ?' তারপর কৌতুকের হাসি হেসে সকলের উদ্দেশে বলতে লাগলেন, 'স্বামী বা স্ত্রী কেউ যদি দুষ্টুমি করে অন্যজনকে কোনও নির্জন দ্বীপে রেখে আসতে চাও, তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য, তাহলে আমরা কিন্তু নিরুপায়! যার নামের কার্ড পাঞ্চ হবে আমরা তাকেই গণনায় রাখব। যার যার কার্ড নিজের সঙ্গে রাখাই নিরাপদ।' হো হো করে হাসির হররা উঠল লাউঞ্জ জুড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই যে যার নিজের কার্ডে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। বলা তো যায় না, কার মনে কী মতলব আছে! পরিবেশটা নিমেষে হালকা হয়ে উঠল। এদুয়ার্দো, এই ছোটখাটো রসিক মানুষটি সবসময় আমাদের উজ্জীবিত রাখতেন। আদর্শ দলনেতা। মনে দারুণ ভরসা এল এই মানুষগুলির উষ্ণ সান্নিধ্যে।

'গুড ইভনিং ম্যাম। হোয়াট উড ইউ লাইক টু হ্যাভ ইন ইয়োর মেন কোর্স?' মিষ্টি হেসে ঝলমলে পোশাকে সামনে এসে দাঁড়াল অ্যাঞ্জেলা। চার কোর্স ডিনারে স্যুপ, টোম্যাটো-শাকপাতা দেওয়া হ্যাম স্যালাড, কড মাছ/ রোস্টেড পর্ক, আর শেষপাতে ক্র্যানবেরি আর ভ্যানিলা আইসক্রিম দেওয়া তিন স্তরে সাজানো কেক খেয়ে মনটা ফুরফুরে হয়ে গেল। জাহাজে উঠলে এই এক মজা। সকাল থেকে তিন দফায় বিপুল খাওয়াদাওয়া। ফাঁকে ফাঁকে চা-কফি-কুকি-ফল ফ্রি। কিন্তু আয়েস করে খাবার কি জো আছে? খাওয়াদাওয়ার জন্য বরাদ্দ মোটে আধঘণ্টা থেকে ৪৫ মিনিট। কোনওমতে গপগপিয়ে খেয়ে ভরা-পেটে তিন-চার স্তর গরম জামাপ্যান্ট, মোটা পার্কা জ্যাকেট, টুপি, পায়ে হাঁটু-অবধি গাবদা গামবুট চাপিয়ে চলো জোডিয়াক বোটে নামবে! দু'বেলা।

রাতে খাওয়ার পর সবাই দেখি লাউঞ্জে চা-কফি নিয়ে আয়েস করে বসেছে। ঘুমোতে যাওয়ার তাড়না তো নেই! ফটফট করছে দিনের আলো। ঘড়ির দিকে না তাকালেই হল! প্রাথমিক আলাপ-পর্ব সেরে নিচ্ছে। এদুয়ার্দো প্রথমেই বলে দিয়েছেন, অভিযাত্রীরা যেন পরস্পরের প্রতি সহমর্মী হন। এই ধরনের অভিযানে যা একান্ত প্রয়োজন। কয়েকজন ডেকেও ঘোরাঘুরি করছে। হঠাৎ পি এ সিস্টেমে জাহাজের ব্রিজ থেকে ক্যাপ্টেনের গম্ভীর গলা ভেসে এল, 'সিক্স ও'ক্লক ডিরেকশনে ব্লু হোয়েল দেখা যাচ্ছে।' অর্থাৎ জাহাজের পিছন দিকে। এ ক্ষেত্রে জাহাজের ডেককে ঘড়ির ডায়াল হিসেবে কল্পনা করে নিতে হয়। জাহাজে এ ভাবেই দিকনির্দেশ আসে, যাতে কোনও যাত্রী সমুদ্রের প্রাণী দেখা থেকে বঞ্চিত না হয়। ব্লু হোয়েল! পৃথিবীর বিশালতম প্রাণী। জ্যাকেট-টুপি চাপিয়ে হুড়মুড় করে ডেকে বেরোতে না বেরোতে নীল তিমি কত্তা-গিন্নি পগার পার। ডেকে যে ক'জন ভাগ্যবান ঘোরাঘুরি করছিল, তারাই কেবল এক ঝলক দেখতে পেয়েছে! ব্লু হোয়েল ঘণ্টায় ৪৫ কিমি পর্যন্ত গতিবেগে যেতে পারে। যাচ্ছিল জাহাজের উল্টোদিকে। জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে গেলেও কিছুটা সময় হাতে পাওয়া যেত। যারা দেখতে পায়নি, তারা কিছুটা মুষড়ে পড়েছে দেখে বিশেষজ্ঞ দলের সহ অধিনায়ক সারা জেনার মজা করে বললেন, 'আমাদের অভিযান শুরু হল ব্লু হোয়েল দিয়ে। তবেই বোঝো!'

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল দলনেতার ওয়েক আপ কলে। সতেজ গলায় 'সুপ্রভাত' জানিয়ে বাইরের তাপমাত্রা, হাওয়ার গতিবেগ, আমরা কত ডিগ্রি উত্তরে আছি জানিয়ে দিলেন। বললেন, জানলার পর্দা খুলে দেখ, আমাদের জাহাজ লিলিহুকব্রিন গ্লেসিয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে জ্যাকেট চাপিয়ে সোজা ডেকে। কয়েক মিটার দূরেই ঝকঝক করছে অতিকায় এক হিমবাহ। সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে নীলচে রঙের বরফ-জমাট গা থেকে। চোখে ধাঁধা লেগে যায়। মাথা নত হয়ে আসে প্রকৃতির এমন ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপের সামনে। নিজেদের লিলিপুট মনে হয়। পাশ থেকে গ্লেসিয়ার-বিশেষজ্ঞ লরা বলছেন, 'সুমেরুর গ্লেসিয়ার খুব দ্রুত পিছু হাঁটছে। ভূতাত্ত্বিক সময় অনুযায়ী তার মাপ হয়তো কম, আমাদের সাদা চোখে হয়তো ধরা পড়ছে না, কিন্তু তা বড় উদ্বেগের বিষয়। অ্যান্টার্কটিকার হিমবাহ এত ভঙ্গুর নয়।' লরা আরও কিছু তথ্য-পরিসংখ্যান দিচ্ছিলেন, কিন্তু আমার কানে ওসব ঢুকছিল না। একদৃষ্টে তাকিয়েছিলাম ওই বরফ-নদীর দিকে। আশেপাশের পাহাড়গুলোয় ছিটছিটে বরফ। জুন মাসের গোড়ায় এখন এখানে বসন্ত। শীতের বরফ খানিকটা গলে গেছে। জাহাজের কাছাকাছি কিছু নর্দার্ন ফুলমার আর গিলেমট পাখি ওড়াউড়ি করছে। এরা জলের পাখি। হঠাৎ আশেপাশের ক্যামেরাগুলো সচকিত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বাইনোকুলার বাগিয়ে ধরে দেখি, হিমবাহর ঠিক নীচে, জলের ওপর বরফের যে সরু তাক, তার ওপর নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে একটা দাড়িওয়ালা সিল (Bearded Seal)। একতাল মাংস যেন! খুঁটিয়ে লক্ষ করে দেখি মোটেও ওর দাড়ি নেই, আছে ঝাঁটা-গোঁফ। মনে মনে ভাবছিলাম, ওর গোঁফের দরকারটাই বা কী! ও তো আর গোঁফ চোমরাতে পারে না! সারাকে কাছে পেয়ে জিজ্ঞেস করে আমি অবাক! সারা হেসে বললেন, ওর গোঁফ জলের নীচে অ্যান্টেনার কাজ করে। ওর লাঞ্চের জন্য ক্রিল, মাসল, স্টারফিশ, অক্টোপাস শনাক্ত করে ওটা দিয়ে।

আমাদেরও লাঞ্চ সেরে তাড়াতাড়ি তৈরি হতে হবে। দুপুর আড়াইটেয় আমাদের প্রথম ল্যান্ডিং। যাত্রীদের দুটো দলে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে— রেড গ্রুপ আর ব্লু গ্রুপ। লালকমল আর নীলকমল। লালকমলের দল প্রথমে ল্যান্ডিং করবে কিংস ফিয়র্ডের ধারে। আর নীলকমলরা ততক্ষণ জোডিয়াক বোটে ফিয়র্ডে ঘুরে ঘুরে পাখি আর বন্যপ্রাণীর সন্ধান করবে। জাহাজের ডেক থ্রি-তে দুটো শেলফ ডোর। সেখান দিয়ে জোডিয়াকে নামতে হবে। নামার আগে প্রত্যেককে নিজের কার্ড পাঞ্চ করে নামতে হবে। আবার জাহাজে ফিরেও তাই। যাতে কেউ ওই নির্জন নির্বাসনে পড়ে না থাকে, সবাই জাহাজের উষ্ণ আশ্রয়ে ফিরে আসতে পারে। এদুয়ার্দো-র কথা মনে পড়ে হাসি পেয়ে গেল। রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ করতে করতে দেখি আমাদের বিশেষজ্ঞ দল ততক্ষণে জোডিয়াক নিয়ে নেমে পড়েছে ল্যান্ডিং করানোর সুবিধাজনক জায়গা সরজমিনে খুঁজে দেখার জন্য।

এক-একটি বোটে দশজন করে যাত্রী নেওয়া যায়। আমাদের বোটের চালক বিশেষজ্ঞ দলের মিরিয়ম পিটউড। ব্রিটিশ। এঁরা দেখি সবাই বোট চালাতেও জানেন! খোলা সমুদ্রে নৌকো মোচার খোলার মতো দুলছে। জাহাজ থেকে ওই নৃত্যরত নৌকোয় ওঠা বেশ ঝকমারি। বোটে নামা-ওঠার সময় সাহায্যকারী নাবিকদের হাত কনুইয়ের কাছে শক্ত করে ধরতে হয়, একে বলে 'সেলর্স গ্রিপ'। প্রত্যেকের হাতেই মোটা মোটা গ্লাভসে ঢাকা, তাই কনুই আঁকড়ে ধরাটাও অভ্যেস

করে নিতে হয়েছে।

আকাশ আলোয় ভরা। সুনীল সাগরের ওপর দিয়ে রাবারের ভেলা চলেছে। কিংস ফিয়র্ডের ধারে খোঁচা খোঁচা কালো পাহাড়ে বরফের লম্বা লম্বা প্যাচ-এর অদ্ভুত সুন্দর নকশা। মিরিয়ম বললেন, ওই যে দেখছ পাশাপাশি তিনটে চুড়ো, ওরা রাজার তিন কন্যে, সেরা, নোরা আর ডানা। সুইডেন, নরওয়ে আর ডেনমার্ক-এর আদরের ডাকনাম। কিংস ফিয়র্ড, তিনটে পাহাড়ের চুড়ো স্ক্যান্ডিনেভিয়ার তিন দেশের নামে, (এই তিন দেশ তো একই পরিবারের তিন কন্যের মতো)— নাম দিয়েছেন যিনি, তাঁর কল্পনাশক্তির তারিফ করলাম। আমার কী জানি কেন মনে পড়ে গেল কিং লিয়র আর তাঁর তিন কন্যের কথা!

দূরে পাথরের ওপর একটা হারবার সিল রোদ পোয়াচ্ছে। মাথা আর লেজ মাটি থেকে ওপরে তুলে রেখেছে, সিঙ্গাপুরি কলার ভঙ্গিতে! চোখ আধবোজা, মুখে প্রশান্তির হাসি। ঠিক যেন জপতপ সেরে আফিং খেয়ে ঠাকুমা আধশোয়া হয়ে আছেন! নৌকোর গতি একেবারে কমিয়ে মিরিয়ম বললেন, এই ভঙ্গিতে ওরা শরীরের তাপমাত্রা সংরক্ষণ করে। বরফ-ঠান্ডা জল থেকে শরীরটা যতটুকু শূন্যে ভাসিয়ে রাখা যায়। সিলটা মুখ তুলে তুলে জুলজুল করে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। মিরিয়ম নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, ওকে আর বিরক্ত করা ঠিক হবে না, চলো, ওদিকটায় দেখি কী পাওয়া যায়। কাছেই জলে ডুব দিয়ে খেলা করছে লিটল অক পাখি। ওমা, এ তো পেঙ্গুইনের ক্ষুদ্র সংস্করণ! গায়ে কালো কোট, পেটটা সাদা। এরা অ্যান্টার্কটিকার পেঙ্গুইনের জাতভাই। আচার-ব্যবহারে বিস্তর মিল। কুমেরুতে যেমন পেঙ্গুইন, সুমেরুর আইকন বার্ড তেমনি লিটল অক। মিরিয়ম দেখালেন, একটু দূরে কয়েকটা শিকারি আর্কটিক স্কুয়াও বসে আছে জলের ওপর। ওরে বাবা, এরাও এখানে! বেচারা ছোট্ট অক পাখিগুলোকে মারবার তাল করছে নাকি? অ্যান্টার্কটিকায় একটা পেঙ্গুইনের ছানাকে ধারালো ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে মেরে ফেলল দুটো স্কুয়া, চোখের সামনে দেখেছি। মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল!

ক্রুজের শেষে ডাঙায় নেমে দেখি, এবড়োখেবড়ো পাথুরে বিচ পেরিয়ে বরফের ওপর দিয়ে থপথপ করতে করতে চলেছে আমাদের দলবল। মেইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। মেইকের কাঁধে রাইফেল। এঁরা বন্দুক চালাতেও জানেন! ল্যান্ডিং করার পরেই, বিচ থেকে একটু ভেতরের দিকে আমাদের নিয়ে যেতে হলে এঁরা কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে নেন। মেরু ভাল্লুকের ভয়ে। ভাল্লুকের স্বপক্ষে দেশে কড়া আইন আছে। তাদের যখন তখন আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে মারা যায় না। কিন্তু যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে বন্দুক সঙ্গে রাখতে হয়। এদুয়ার্দো আগে থেকেই বলে রেখেছেন, ল্যান্ডিং করার দ্বীপে যদি শ্বেত ভাল্লুকের আভাস কোথাও দেখা যায়, তবে সেখানে যাত্রীদের নামানো যাবে না। আমি মেইকের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ভাবছিলাম, পোলার এক্সপিডিশনের গাইড হতে গেলে আর কী কী পারদর্শিতা থাকতে হয়! দূরে একটা জায়গায় একটু সবুজ সবুজ ঘাস হয়ে আছে। সেখানটায় এক পাল বল্গা হরিণ। সোনা রোদের আলোয় অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে! এদের দেখলেই মনটা এক ছুটে ছোটবেলায় চলে যায়। বল্গা হরিণে টানা স্লেজ গাড়ি চেপে স্যান্টা ক্লজ আসছে উপহারের ঝুলি নিয়ে!

পাখি বিশারদ অ্যান্ড্রু ক্রাউডার বলে দিয়েছেন, যেখানে যে-পাখি দেখতে পাওয়া যাবে, ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে নোট করে রাখতে হবে। জাহাজে ফিরে রিপোর্ট দিতে হবে। বাদামি-সাদায় নকশা করা লং-টেল্‌ড্‌ ডাক, ঠোঁটের ডগায় লাল বিন্দু কিং আইডার ডাক, গোলাপি ঠ্যাং পিংক-ফুটেড গুজ় নোট করা হল, স্কুয়া, লিটল অক আর ফুলমার ছাড়াও।

ম্যাগডালেন ফিয়র্ড দিয়ে খুব ধীরে আমাদের জাহাজ চলেছে। আমরাও ধরাচুড়ো পরে তৈরি হয়ে নিচ্ছি। আকাশের মুখ ভার। ইলশেগুড়ি বৃষ্টি পড়েই চলেছে। কিন্তু তাতে কী! এর মধ্যেই বেরোতে হবে। অভিযানে খুব কড়া রুটিন। কেউ চাইলে একদিন ডুব দিতেই পারে, কিন্তু সে কী হারাবে তা কেউ বলতে পারে না। কারণ প্রকৃতি ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়, আর বন্যপ্রাণ মুহূর্তে স্থান পালটায়। তাই জাহাজের বাইরে উন্মুক্ত মেরু-প্রকৃতির স্বাদ যতটুকু নেওয়া যায়, ততটাই লাভ। শেলফ ডোরে ডাক পড়েছে। আমরা নামব

আর্কটিক মহাসাগরের বরফের প্রান্তরে আমাদের জাহাজ

বরফ-ভেলায় আর্কটিক টার্নের ঝাঁক

জুলিবুকতা-য় (Julibukta, নরওয়েজিয়ান ভাষায় bukta-র অর্থ উপসাগর)। ভাগ্য ভাল, বৃষ্টি কিছুটা ধরেছে। আমাদের আপাদমস্তক ওয়াটারপ্রুফে ঢাকা, তবু এই দু'ডিগ্রি ঠান্ডায় বৃষ্টিতে ভেজার কথা ভাবলেই কাঁপুনি হচ্ছে।

নৌকোয় কিছুটা চক্কর মারতেই পুরস্কার জুটে গেল। পাড়ের কাছেই জলকেলি করছে সিন্ধুঘোটকের দল। উত্তর মেরুর হেভিওয়েট সেলেব্রিটি। ভুস করে জলে ডুব দিচ্ছে, আবার মুখ তুললেই বিরাট দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ছে। কুতকুতে দুই চোখ। আজব দেখতে! আগন্তুকদের দেখে বেশ মজাই পেয়েছে মনে হয়। আমরা নৌকো নিয়ে কিছুটা পিছিয়ে এলেও ওরা দেখছি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এই একবার এখানে মুন্ডু দেখা যায় তো আবার ওখানে। লুকোচুরি খেলছে যেন! এই রে, একটা তো আহ্লাদে আমাদের নৌকোয় উঠে পড়ার চেষ্টা করছে। কী বিপদ! আমাদের উল্টোদিকে বসা ড্যানিয়েল আর জুলিয়ার ফাঁক দিয়ে একটা দাঁত গলিয়ে দিয়েছে। আমরা ভয়ে কাঁটা! জর্জ নৌকোর ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'একেবারে শান্ত থাকো সবাই, কোনওরকম নড়াচড়া কোরো না। নড়লেই ও ভয় পেয়ে আক্রমণ করবে।' দম আটকে চুপ করে বসে আছি। ওদের জামাকাপড় শুঁকল কিছুক্ষণ, ঘোঁত করে পিলে চমকানো এক ডাক ছাড়ল, তারপর ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে টুপ করে জলে ডুব দিল। জর্জ তাড়াতাড়ি নৌকো নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম আমরা। ড্যানিয়েল আর শার্লটের মুখ তখনও বেজায় ফ্যাকাসে। ওই ভয়ঙ্কর দাঁতগুলো বসিয়ে দিলে আর বেঁচে ফিরতে হত না!

পাড়ে উঠে দেখি সেখানেও তাল তাল ওয়ালরাস মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। ভয়ে ভয়ে দূর থেকেই ওদের লক্ষ করছিলাম। একটু আগেই যা কাণ্ড হল! কী বিশাল চেহারা এক-একটার! হাতিকেও হার মানায়। জল থেকে বুঝতে পারিনি। দাঁতগুলো লম্বায় এক হাত তো হবেই। ঝাঁটা ঝাঁটা গোঁফও আছে। এখানে তো এরা দেখি নট নড়নচড়ন। মাঝে মাঝে দু'একটা কিলবিল করে উঠছে বটে। একজন আবার গদাইলশকরি চালে জলের দিকে এগোচ্ছে। এতবড় শরীর নিয়ে পাথুরে জমিতে নড়াচড়া করাই এক বিড়ম্বনা। জলেই বরং এরা অনেক স্বচ্ছন্দ। মিরিয়ম আমাদের দলের সঙ্গে ছিলেন, বললেন, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের এক-একটার ওজন প্রায় ৯০০-১২০০ কিলোগ্রাম। সিল, ওয়ালরাস এরা সবাই পিনিপেড প্রজাতির। অর্থাৎ এদের পাখনা-সদৃশ পা। জলে-ডাঙায় দু'জায়গাতেই থাকার উপযুক্ত। মিরিয়ম বলছিলেন, গত দুই শতাব্দীতে সিল, তিমির মতো প্রচুর সিন্ধুঘোটক শিকার হয়েছে। এদের মাংস, চামড়া, চর্বি, পাখনা সবই নাকি মানুষের কাজে লাগে! এমনকি বৃহদন্ত্রও, তার ছাল দিয়ে মানুষ ওয়াটারপ্রুফ পার্কা জ্যাকেট বানায়। ওয়ালরাসের দাঁত আবার মানুষের নকল দাঁত তৈরিতে কাজে লাগে। একসময় এদের সংখ্যা বিপজ্জনক ভাবে কমে যাওয়ায় আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে শিকার। তবে এস্কিমো অর্থাৎ ইনুইট আর ইউপিক উপজাতির মানুষদের এখনও সিল, সিন্ধুঘোটক শিকার করার অনুমতি আছে, যদিও লাগামছাড়া নয়।

এর মধ্যে দেখি জল ছেড়ে উঠে একটা ওয়ালরাস দাঁত দুটো দিয়ে মাটির ওপর ভর দিয়ে ঘসটে ঘসটে আসছে। কিছুটা উঠেই ওর দলবলের কাছে গিয়ে নিথর হয়ে পড়ে রইল। এরা নাকি যথেষ্ট ভদ্র প্রাণী! তা বটে! অ্যান্টার্কটিকার ফার সিলগুলোর মতো নিজেদের মধ্যে ঘোঁত ঘোঁত, মারামারি, কামড়াকামড়ি করতে দেখছি না একটাকেও। কেবল ওদের এলাকায় আমাদের অনধিকার প্রবেশ ওরা বোধহয় পছন্দ করেনি। তাই সতর্ক করতে এসেছিল।

জোডিয়াক বোটে জাহাজে ফিরছি। পাশে খাড়া পাহাড়ের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে লিটল অক পাখি উড়ছে। জর্জ ভাল করে দেখে বললেন, এখানে ব্ল্যাক গিলেমট পাখিও আছে। এই অঞ্চলে সব পাখিদেরই এখন বাসা বানানোর আর প্রজননের সময়। তাই পাখিরা খুব ব্যস্তসমস্ত। বাইনোকুলার চোখে ঠেকিয়ে ওদের কার্যকলাপ দেখছিলাম। হঠাৎ দেখি ছোট্ট মতন একটা প্রাণী বরফের ঢাল বেয়ে খাড়া পাহাড়ের চুড়োর দিকে উঠে যাচ্ছে টিকটিকির মতো। আমি বলতেই জর্জ দেখে নিয়ে বললেন, আর্কটিক ফক্স। অবাক হয়ে দেখি, কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা গিলেমট পাখি মুখে নিয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নীচে নেমে আসছে। বাইনোকুলার চোখে ঠেকানো না

পাখিদের সমাবেশ—কিং আইডার, পিঙ্ক ফুটেড গুজ়, আর্কটিক টার্ন

থাকলে ওকে অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না, এমন তীব্র গতি। শীতকালে খাদ্যের অভাব হলে শ্বেত ভাল্লুকও নাকি ওই গোদা চেহারা নিয়ে তরতর করে পাহাড়ের চুড়োয় উঠে পড়ে, পাখি শিকার করতে। সবাই বাহবা দিতে লাগল আমি শেয়ালটাকে স্পট করেছি বলে।

উত্তেজনার যথেষ্ট খোরাক জুটেছে আজ। আমাদের ওয়ালরাসে গিলে খায়নি, বেঁচে ফিরেছি বলে সজোরে আমাদের পিঠ চাপড়ে দিতে লাগল সবাই এসে এসে। ইসরায়েলের অ্যাডি আর গাই মহা উৎসাহে আমাদের কাছে এসে বলল, 'এরপর থেকে আমরা তোমাদের নৌকোতেই উঠব। তোমরা দারুণ পয়া।' অ্যাডি এমনিতেই আমাদের দেখলে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। খুব মিষ্টি মেয়ে। ভারত ওর পছন্দের দেশ। তিনবার ভারতে বেড়াতে আসা হয়ে গেছে এর মধ্যে— কাশ্মীর, কেরালা আর দক্ষিণ ভারতের অন্যত্র। আমরা কলকাতায় থাকি শুনে চোখ গোল গোল করে বলল, 'তোমাদের শহরের তো খুব নামডাক! আমার যাওয়ার খুব ইচ্ছে।' আমিও উষ্ণ আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম ওকে। পাশ থেকে বিশাল চেহারার লালমুখো এক জার্মান সাহেব আমাদের কথাবার্তা শুনে এগিয়ে এলেন, 'ইউ মিন কাল্কুত্তা? আই হ্যাড বিন দেয়ার ওয়ানস।' শুনে মনে মনে বেশ রাগ হলেও প্রকাশ করলাম না। কেন 'ক্যালকাটা' উচ্চারণ করতে তোমার জিভে এত জড়তা!

সকাল-বিকেল দু'বেলা ল্যান্ডিং করার পর জাহাজে ফিরে সন্ধেবেলা বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের লেকচার থাকত। জর্জ কেনেডি একদিন আর্কটিক সার্কলের মধ্যে কোন কোন দেশ পড়ে তা নিয়ে আলোচনা করছিলেন— কানাডা, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, রাশিয়া, উত্তর আমেরিকা আর আইসল্যান্ড। মজা করে বললেন, আইসল্যান্ডের এক কুচো অংশ নাকি সুমেরু বৃত্তের (৬৬ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৯০ ডিগ্রি অক্ষাংশ) মধ্যে ছিল, তাও আবার প্রাকৃতিক কারণে সেটুকু ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। তাতে নিয়ম অনুযায়ী এই খুদে দেশটার আর্কটিক কাউন্সিল থেকে বাদ পড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু আইসল্যান্ড সরকার উত্তর মেরুতে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অনেক অর্থ সাহায্য করে। তাই এই দ্বীপ-দেশটাকে বাদ দিতে না পেরে খুঁজে খুঁজে বিন্দুসমান জমি বের করে আর্কটিক সার্কলের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে।

সমুদ্রে বরফ বেড়েছে। আমরা ক্রমশ আরও উত্তরের দিকে এগোচ্ছি। প্রাতরাশ করতে করতে রেস্তোরাঁর জানলা দিয়ে ছোট ছোট হিমশৈল দেখতে পাচ্ছি। আর্কটিকের আইসক্রিম! আকাশে আজ মুঠো মুঠো নীল আবির কে যেন ছড়িয়ে দিয়েছে! এমন উৎফুল্ল আকাশ বাইরে বেরোনোর ডাক দিচ্ছিল, তার ওপর সমুদ্রে এত বরফ! আর তর সইছিল না। আজ আমাদের ফুগলফিয়োর্ডেন-এ (Fuglefjorden, নরওয়েজিয়ান ভাষায় fugle অর্থ পাখি) নামার কথা। এই জায়গাটা নাকি পাখিদের স্বর্গ! ভাগ্য ভাল আমাদের নৌকোয় আজ পাখি বিশেষজ্ঞ অ্যান্ড্রুকে পেয়েছি।

নৌকোয় নামতে না নামতে বরফের রাজ্যে পৌঁছে গেলাম। টুকরো টুকরো বরফে ছেয়ে আছে চারদিক। সাগরের নীল জমিতে সাদা ফুলের ঘন নকশা! ফিয়োর্ডের ধারে ন্যাড়া পাহাড়গুলো বরফের জামা গায়ে দাঁড়িয়ে আছে সার সার। যেন সাদা ইউনিফর্ম পরা স্কুলের ছেলের দল! পাহাড়ের গা বেয়ে বরফ-নদী বেগে নামতে নামতে জলের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি দুটো। পৃথিবীর মাটিতেই তো স্বর্গ!

এই বরফের টুকরোগুলো কি গ্লেসিয়ার ভেঙে এসেছে? আমার প্রশ্ন শুনে অ্যান্ড্রু খুশি, বললেন, 'রেলেভ্যান্ট কোয়েশ্চেন। এগুলো সমুদ্রের জল জমে যে প্যাক আইস তৈরি হয়, তার টুকরো। আরও উত্তরের দিকে গেলে তোমরা জমাট প্যাক আইস দেখতে পাবে। গ্লেসিয়ার ভেঙে যে টুকরোগুলো আসছে সেগুলো আকারে বড়। এরা আইসবার্গ।' বড় বড় আইসবার্গ ভেসে ভেসে যাচ্ছে নৌকোর পাশ দিয়ে। তাদের ভেতর থেকে পাগল করা নীল আলো বেরোচ্ছে। যেন বরফ-বাড়ির ভেতরে কে নীল আলো জ্বালিয়ে রেখেছে! আইসবার্গ যে জায়গাটায় ডুবে আছে সেখানে সমুদ্রের রং ফিরোজা। সুইমিং পুলের মতো।

রক টার্মিগন

সাদা আর নীলের অপরূপ সব শেড প্রকৃতির এই ক্যানভাসে!

একটা চ্যাপ্টা চওড়া মতন আয়তাকার বরফের ভেলার (ice floes) ওপর এক ঝাঁক পাখি কিচিরমিচির করছে। শিকারের সন্ধানে ওরা বরফ-নৌকোয় ভিড় জমিয়েছে। নৌকো থেকে নজর রাখতে সুবিধে। আমি ভাবছিলাম এরা সি গাল। পাশ থেকে সুবীর বলে উঠল, ওগুলো কিটিওয়েক। দেখতে সি গাল-এর মতোই, সাইজে ছোট। গাল প্রজাতিরই এরা। কয়েকটা পাখি তীক্ষ্ণস্বরে 'কিটি....ও...য়েক' ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। ওমা, তাই এদের এমন নাম! খাড়া পাহাড়গুলোর ধার দিয়ে নৌকো চলেছে। এই পাহাড়ের উঁচু ধাপে ধাপে পাখিদের মাল্টিস্টোরিড বাসা। একটা ধাপে দুটো বিশাল সাইজের বার্নাকল গুজ চুপটি করে বসে আছে। এদের দর্শন পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার! আমাদের আশেপাশে অন্য নৌকোগুলোও রয়েছে। কোনও নৌকো আগে থেকে কিছু দেখতে পেলে রেডিয়ো যোগাযোগ ব্যবস্থায় তা বাকিদের জানিয়ে দিচ্ছে। তাছাড়া কোনও নৌকো বিপদে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে বাকিদের কাছে খবর চলে যাবে। গতকালই তো হয়েছিল। জলের নীচে লুকোনো একটা পাথরের টুকরোয় সজোরে ধাক্কা খেয়ে হুয়ানের নৌকোর ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। কিছুতেই আর স্টার্ট নিচ্ছে না। নৌকোয় বসা যাত্রীদের মুখ ভয়ে সাদা। খবর পেয়ে বাকি নৌকোগুলোও জড়ো হয়েছে। সব নৌকো থেকে গাইডরা যাত্রীদের শান্ত থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন। নৌকো ফুটো হয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সকলেই লাইফ জ্যাকেট পরে আছে। তবু বুকে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। শেষে খবর পেয়ে জাহাজ থেকে তৎপরতার সঙ্গে আর একটা জোডিয়াক বোট এসে খুব সাবধানে যাত্রীদের তুলে নিল। দু'-নৌকোয় পা দিয়ে ওঠা সহজ নয় মোটেই, বিশেষত সমুদ্রে! দুর্যোগের ওই দশ-পনেরো মিনিট যেন অসীম কাল! ভয়টা আঠার মতো মনে লেপ্টে রইল অনেকক্ষণ।

'মা, পাফিন না?' আর্য বলে উঠল। খালি চোখেই দেখতে পেয়েছে। একটু দূরে জলে দুটো পাফিন পাশাপাশি সাঁতার কেটে যাচ্ছে। আবার নিজেদের মধ্যে ঝটাপটিও করছে। আমরা দারুণ উত্তেজিত। আমার খুব শখ নিজের চোখে পাফিন দেখার। এতদিন পাখির বইতে, বা ডিসকভারি চ্যানেলে পাফিনের ছবি দেখেছি। গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে প্লাজাস আইল্যান্ডে অনেক দূরে একটা বড় পাখির ঝাঁকের মধ্যে পাফিন দেখেছিলাম। ওদের কাছে যাওয়ার উপায় ছিল না, তাই ভাল করে দেখতে পাইনি। আগের দিন অ্যান্ড্রু বলেছিলেন পাফিন দেখা যেতেও পারে। গরমকালে এরা আর্কটিকের দিকে আসে। পাফিন কর্তা-গিন্নিকে সাঁতার দিতে দেখে অ্যান্ড্রুর মুখের হাবভাব পালটে গেছে, যেন আমাদের এক দুর্লভ জিনিস পাইয়ে দিয়েছেন! 'কী, বলেছিলাম না তোমাদের পাফিন দেখাব? এরা অ্যাটলান্টিক পাফিন। শীতকালটা সমুদ্রেই কাটায়। জলে ভাল সাঁতার দিতে পারে, জলের বেশ কিছুটা নীচে ডাইভ দিয়ে মাছ ধরে আনে। জলে এমনকি ঘুমোয়ও। গ্রীষ্মকাল এলে এরা ডাঙায় উঠে আসে প্রজননের জন্য। এরা অক পাখির প্রজাতির।' অ্যান্ড্রুর কথা কানে ঢুকছে, কিন্তু আমি একবারও পাখিগুলোর দিক থেকে চোখ সরাচ্ছি না। মাথা, ডানা আর ল্যাজ কুচকুচে কালো। পেটটা ধবধবে সাদা। এ সবই এর ক্যামোফ্লেজ। ডাঙার শিকারি পাখিদের হাত থেকে বাঁচতে, আর জলের প্রাণীদের ধোঁকা দিতে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এর তিনকোনা ঠোঁটটা। ক্যাটক্যাটে কমলা, আর কালোর স্ট্রাইপ। চোখজোড়াও তিনকোণা। জোড়াপাতা পা-দুটো উজ্জ্বল কমলা রঙের। সব মিলিয়ে ভারি মজাদার দেখতে, যেন খেলনার দোকানের সফট টয়! আদর করতে শখ যায়। চিত্রবিচিত্র ঠোঁটের জন্য এদের নাম 'সমুদ্রের ভাঁড়'!

পাখি দুটো উড়ে গিয়ে দূরে পাহাড়ের উঁচু ধাপে বসেছে। অ্যান্ড্রু তাড়াতাড়ি ঠিক নীচে নৌকোটা নিয়ে গেলেন। ওপরে ওদের বাসা। পাঁচ-ছ'টা পাফিন একসঙ্গে বসে আছে। দুটো

সিলদের রাজত্বে শলভাসন চর্চা

দৃষ্টিবিভ্রম, এসমারব্রিন গ্লেসিয়ার

পাখি ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে আহ্লাদে গলাগলি বসে আছে। অ্যান্ড্রু বললেন, ওদের ঠোঁটের এই রং নাকি শীতকালে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। বসন্তে এমন উজ্জ্বল রং ধরে, প্রজননের জন্য। ভাগ্যিস আমরা এখন এসেছি! এখনও এদের ছানা হয়নি, তাহলে দেখতে পাওয়া যেত মা পাখি অনেকগুলো মাছ একসঙ্গে মুখে করে নিয়ে বাসায় যাচ্ছে ছানার জন্য। মাছগুলো ঠোঁটের দু'পাশ থেকে লম্বা হয়ে ঝুলছে। দুষ্টু পাখি স্কুয়া বা গাল এদের গলায় সুড়সুড়ি দিয়ে উত্ত্যক্ত করে মাছগুলো ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এই সময়। একেবারে গ্যালাপাগোসের ডাকাতে ফ্রিগেট পাখিগুলোর মতো! এত হাজার হাজার পাখির মধ্যে মনোযোগের আলো কেড়ে নিল পাফিনের দল।

কিছুটা দূরে যেতেই আবার হইচই। পাড়ের কাছে প্রায় কুড়ি-পঁচিশটা হারবার সিল পাথরের টুকরোর ওপর শলভাসনে স্ট্যাচু হয়ে আছে। মাথা আর ল্যাজ শূন্যে ভাসিয়ে রেখেছে। এই ভঙ্গিতে ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকে কী করে ভেবেই আমার ঘাড় ব্যথা করে। শরীরটা মাংসের পিপে হলে কী হয়, পেশি নিশ্চয়ই বেশ নমনীয়! ছোট ছোট সিল ছানারাও এই কঠিন আসন রপ্ত করে ফেলেছে। বেশ একটু দূরেই আমাদের নৌকো। AECO-র নিয়ম মেনে আমাদের নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। দু'তিনটে সিল দেখি ঝুপুস করে জলে ডুব দিল। আমাদের নৌকোর কাছে এসে মুখ তুলেছে। গোঁফের ফাঁকে স্নিগ্ধ হাসি। কৌতূহলী চোখে ইতি উতি চেয়ে দেখছে। বেশ আমুদে আর অতিথিবৎসল। দাঁতালো ওয়ালরাসগুলোর মতো অমন সন্দেহপরায়ণ নয়! আমরা নৌকো ছেড়ে দেবার পরও বেশ কিছুক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে চলল। কিছুদূর এসে আর এগলো না, জল থেকে মাথা তুলে জুলজুল করে চেয়ে রইল। যেন দুঃখই পেল আমাদের চলে যাওয়া দেখে।

নীলকমলদের এবার পাড়ে ওঠার সময়। বিচের ওপর ডাচদের কিছু পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি। তিমি, সিল শিকার করে এখানে তেল বের করা হত। শিকারিদের ১৫-১৬টি পরিবারও থাকত এখানে। এসব দেখতে আমার একেবারেই ভাল লাগে না। মানুষের লোভ আর নিষ্ঠুরতার চিহ্ন। এতক্ষণ এখানকার নিজস্ব বাসিন্দাদের সঙ্গে খুব ভাল সময় কাটিয়েছি। রাইফেলধারী সারাকে অনুসরণ করে বরফের ওপর দিয়ে ভারী রাবার বুট-পরা পা নিয়ে থপথপ করতে করতে চললাম। একটু দূরে একটা লোহালক্কড়ের স্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে। বিশাল হাইড্রোজেন বেলুন এখান থেকে ছাড়া হয়েছিল উত্তর মেরুবিন্দুতে পৌঁছনোর জন্য, ১৮৯৭ সালে। সুইডেনের বিজ্ঞানী সলোমন অগাস্ট আন্দ্রেই ও তাঁর সঙ্গী দুই বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্কেল ও স্ট্রিন্ডবার্গ এখান থেকেই বেলুনে যাত্রা করেছিলেন নর্থ পোল আবিষ্কারের আশায়। যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁরা সফল হতে পারেননি।

সকালবেলায় জাহাজের রেস্তোরাঁয় প্রাতরাশ করতে গিয়েই জসুয়া-র কাছে খবর পেয়েছিলাম আজ জাহাজের পোর্ট সাইডে (বাঁ দিকের ডেকে) সন্ধ্যেবেলা বারবিকিউ হবে। রেস্তোরাঁয় আমাদের যত্ন করে খাবার পরিবেশন করে অ্যাঞ্জেলা, রোজ, আমিহান, গ্যাব্রিয়েল, আলথিয়া। এদের সঙ্গে খুব ভাল আলাপ হয়ে গিয়েছিল। এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী। উজ্জ্বল চোখেমুখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন। খুব সুন্দর ফিটফাট পোশাকে হাসিমুখে এরা রেস্তোরাঁ চালাত। কথা বলে জেনেছিলাম ওরা সবাই ফিলিপিন্স থেকে এসেছে। গ্রীষ্মকালের চারমাস কন্ট্রাক্টে কাজ করে। তারপর দেশে ফিরে যায়। জসুয়া আর গ্যাব্রিয়েল তো পাঁচ বছর এই জাহাজে কাজ করছে। মনে হল ওরা খুশি ওদের বেতনে, সুযোগসুবিধায়। অ্যাঞ্জেলা আর রোজকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, তোমরা কি পড়াশোনার ফাঁকে ছুটিতে কাজ করতে এসেছ? শুনে ওরা হেসে কুটিপাটি। সবাই পড়াশোনা শেষ করেই কাজ করতে এসেছে। রোজ বলল, 'আমাদের সকলের বয়েস তিরিশের ওপরে।' আমি অবাক! এদের দেখে বয়েস আন্দাজ করা কঠিন। জিজ্ঞেস করলাম, দেশ ছেড়ে এত দূরে এসে এই কাজ করতে তোমাদের ভাল লাগে? সজোরে ঘাড় নাড়ল অ্যাঞ্জেলা আর রোজ। মেরু আবহাওয়া ওরা খুব উপভোগ করে! এই জাহাজের সঙ্গে ওরা অ্যান্টার্কটিকাও গেছে। তাছাড়া দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটক আসে, তাদের সঙ্গে কথা বলে ওরা আনন্দ পায়। পর্যটনের চাকরিতে অবশ্য বিস্তর মজা। কাজ করতে করতেই নিখরচায় কত দেশ ঘোরা হয়ে যায়। বছরে চার মাস আর্কটিক, অ্যান্টার্কটিকা, গ্রিনল্যান্ড

বা আইসল্যান্ডে থাকতে পারলে মন্দ কী!

পোর্ট সাইডে আজ মহা উৎসব। বিরাট বিরাট আভেনে চিকেন, পর্ক, বিফ রোস্ট করা হচ্ছে। শেফ, কুকরা গনগনে আঁচে মাংসের টুকরো উল্টেপাল্টে দিচ্ছেন। এই প্রথম চোখে দেখতে পেলাম এঁদের। বিশেষ সব পদ রান্না করে এতদিন আমাদের তিনবেলা খাওয়াচ্ছেন। ডেকে চেয়ার টেবিল পেতে ফেলা হয়েছে। বিরাট টেবিলে ব্যুফে ডিনার সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। রোজকার মতো শাকপাতা আর ঠান্ডা পর্কের স্যালাড, নানারকমের পাউরুটি, রোস্ট করা বিফ, চিকেন, পর্ক সসেজ। সঙ্গে আলু, টোম্যাটো, ক্যাপসিকাম, পনির, নানারকম চিজের রোস্ট। শেষ পাতে জাহাজে তৈরি দু'তিন রকমের কেক তো আছেই। মজার ব্যাপার হল, শুরুতেই গরম গরম ধোঁয়া ওঠা ওয়াইন পরিবেশন করা হচ্ছে। কারণ বাইরের ডেকে তাপমাত্রা প্রায় শূন্য। খাবার টেবিলের আড্ডায় আর্যকে দেখে হল্যান্ডের মারিয়া বলল, 'তোমার খুব ভাগ্য ভাল আরিয়া, এই বয়েসে বাবা-মার সঙ্গে এতদূর বেড়াতে এসেছ। আমাদের ছোটবেলায় দুই ভাইবোনকে দাদু-দিদার কাছে জমা রেখে বাবা-মা টা-টা করে বেড়াতে চলে যেত।' ঠিকই। আমরাও দেখেছি সাহেবরা সবসময় জোড়ায় জোড়ায় বেড়ায়। এ হল পাশ্চাত্যের রীতি। আমাদের দেশে সুধামাসিরা কেদার-বদরিতে তীর্থ করতে গেলেও এন্ডিগেন্ডি সঙ্গে নিয়ে যান। এই আমাদের ভাল। সে কথা মারিয়াকে বললে দুঃখই পাবে বেচারা!

গরম গরম সুস্বাদু রোস্টের টুকরো আভেন থেকে নামতে না নামতে উধাও। কাড়াকাড়ি পড়ে যাচ্ছে। রাত আটটায় তুমুল আলো, কনকনে ঠান্ডা, চারদিকে বরফ আর কাড়াকাড়ি করে গরম গরম রোস্ট খেতে খেতে জমজমাট আমাদের আর্কটিক আড্ডা!

'আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার?'— সকালে চোখ খুলে প্রথম এই পঙ্‌ক্তিই মনে এল। আজ আমরা পৌঁছে গেছি পৃথিবীর একেবারে উত্তর প্রান্তে। গ্লোবের মাথায় চড়ে বসেছি বলা যায়! এতবড় স্পর্ধা! পায়ের তলায় পৃথিবী। সামনে আমাদের দুস্তর বাধা। বরফ-জমাট সুমেরু মহাসাগর, যা পেরোতে পারলে আর মাত্র ১০০০ মাইল উত্তরে ভৌগোলিক উত্তর মেরু। আমরা অবশ্য উত্তর মেরু বিজয়ের কেতন ওড়াতে আসিনি। আমরা এসে পৌঁছেছি আমাদের অভিযানের উত্তরতম বিন্দু, ৮০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে। গ্লোবের মাথায় যে জায়গাটা সাদা টুপির মতো দেখায়। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি সমুদ্র উধাও, শুধু ধু-ধু বরফের প্রান্তর। তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জাহাজ। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না!

গতকাল সন্ধেবেলা নিয়মমাফিক এদুয়ার্দো আমাদের নিয়ে বসেছিলেন। পরের দিনের প্রোগ্রাম জানাতে। তাঁর বলার ভঙ্গিতে কিছু বাড়তি উত্তেজনা ছিল, উদ্বেগও। উত্তেজনা, কারণ তিনি বলছিলেন, পৃথিবীর খুব কম মানুষ বলতে পারবেন, তিনি এই পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পেরেছেন। উদ্বেগ, কারণ এই জমাট সমুদ্র বা প্যাক আইস ভেঙে এগোনো জাহাজের পক্ষে বেশ বিপজ্জনক। যদিও আমাদের হনডিয়াস পোলার ক্লাস ৬ জাহাজ। তার কিছুদূর বরফ কেটে যাওয়ার ক্ষমতা আছে। কিন্তু কোথায় বরফ কতটা পুরু তা বুঝে নিরাপদে এগোতে পারেন একমাত্র দক্ষ নাবিক। আমরা এসেছি অভিযানে, এটুকু ঝুঁকি তো নিতেই হবে।

এদুয়ার্দো অনুরোধ করলেন, জাহাজ যখন প্যাক আইসে এসে পড়বে, তখন থেকে সবাই যেন লম্বা জুম লেন্স বা শক্তিশালী বাইনোকুলার দিয়ে ৩৬০ ডিগ্রি নজরে রাখেন। বলা তো যায় না, খড়ের গাদায় একটা ছোট্ট ছুঁচের মতো বরফের এই বিশাল প্রান্তরে একটা মেরু ভাল্লুকের দেখা পেয়েও যেতে পারি আমরা! কারণ প্যাক আইস ওদের প্রিয় জায়গা। এখানে ওরা সিল শিকার করতে আসে। সিল শিকার খুবই কঠিন কাজ ভাল্লুকের পক্ষে, বেশিরভাগ সময় তা ব্যর্থ হয়। কিন্তু একটা সিল শিকার করতে পারলে ৮০০-১০০০ কিলোগ্রাম মাংসে ওর এক সপ্তাহ নিশ্চিন্তে চলে যায়। সেই লংইয়ারবিয়েন শহর থেকে দেখে আসছি, রাস্তায় রাস্তায় ভাল্লুক-হুঁশিয়ারি। শুনছিলাম, ফিয়োর্ডের ধারে ক্যাম্প করতে আসা দু'জন পর্যটককে ভাল্লুকে টেনে নিয়ে গেছে, এই সেদিনও। পর্যটকদের জন্য সদা সতর্কবার্তা জারি থাকে। জাহাজ থেকে ল্যান্ডিং করার সময় বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যদের কাঁধে সবসময় রাইফেল। অর্থাৎ তার বিচরণ সর্বত্র। শ্বেত ভাল্লুকের নিজস্ব এলাকা এই উত্তর মেরু। সে-ই রাজা। মানুষ নেহাতই ভয়ে ভয়ে থাকা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক এখানে। তবু এখনও পর্যন্ত মহারাজের দর্শন মিলল না।

সবাই জাহাজের ডেকে। সামনে-পিছনে-ডাইনে-বাঁয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। বিশেষ করে ক্যামেরাওয়ালারা। শ্বেত ভাল্লুকের সিল শিকার কোনওমতে যাতে ফাঁকে না পড়ে! আমি চারদিকে তাকিয়ে কেমন মোহাবিষ্ট হয়ে আছি! মুখে ভাষা হারিয়ে গেছে। ঘটাং ঘট শব্দে পুরু প্যাক আইস ভেঙে ভেঙে এগোচ্ছে জাহাজ। খুব ধীর গতিতে। এ ক'দিন ধরে দেখা পাহাড়-সমুদ্র-গ্লেসিয়ারের

জাহাজের যাত্রাপথে সঙ্গ নিয়েছে তিমির দল। তাদের এক সদস্য

দাঁতাল ওয়ালরাস। সন্দেহপরায়ণ!

ল্যান্ডস্কেপটা যেন ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে গেছে! বরফ-শীতল নিস্তব্ধতা চারপাশে। প্রকৃতির আদিম রূপ। কে বলবে এই ধু-ধু বরফ-প্রান্তরের কয়েক মিটার নীচে লুকিয়ে আছে আস্ত একটা মহাসাগর! উদ্ভিদ-প্রাণী সমেত একটা গোটা ইকোসিস্টেম। বোধ যেন তার বাস্তব সীমা ছাড়িয়ে গেছে! বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেচনা কিচ্ছু কাজ করে না এই অতিকায়ের সামনে।

শূন্যের নীচে তাপমাত্রা এই জায়গাটায়। তার সঙ্গে এত ঝোড়ো হাওয়া যে, একটানা বাইরের ডেকে থাকা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে লাউঞ্জে ঢুকে গরম চা-কফি খেয়ে নিতে হচ্ছে। একটা জানলার ধারে বসে বাইরে তাকিয়ে আছে অ্যালেন। চোখে সম্মোহিত দৃষ্টি। অ্যামস্টারডাম থেকে এসেছে। আমি কফি নিয়ে সেখানে বসতে আপনা থেকেই বলে উঠল, 'দেখো, এখানে এলে বোঝা যায় মানুষ কত ক্ষুদ্র। মানুষের হিংসা-ঈর্ষা-লোভ-লালসা কত তুচ্ছ। কী হবে হিংসে করে, অপরের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে? এইজন্যই প্রকৃতির কাছে আসতে হয়, বার বার।' ও বলেই চলেছে। ওকে থামালাম না। হয়তো কারও আচরণে ব্যথা পেয়েছে, মনে ক্ষোভ জমে আছে। এইভাবে কিছুটা তো শোধন হচ্ছে মনের! খানিক পরে নিজেই লজ্জা পেয়ে বলল, 'এ মা, কত কিছু বলে ফেললাম তোমাকে!' আমি বললাম, 'তাতে কিছু মনে কোরো না। জীবনটা খুব সুন্দর, উপভোগ করো।'

কফি শেষ হতেই আবার ডেকে বেরিয়ে এলাম। ক্যারিশম্যাটিক আর্কটিক! প্রকৃতির এমন মহিমময় রূপ এক পরত কাচের আড়াল থেকে দেখতেও মন সায় দেয় না। এই আদিগন্ত বরফ-সমুদ্রই হল প্রকৃত আর্কটিক ল্যান্ডস্কেপ। নাকি সিস্কেপ! বাইনোকুলার দিয়ে নজর করে দেখি দূরে কালো বিন্দুর মতো বরফের ওপর একটা বেয়ার্ডেড সিল। ডানদিকটায় অনেক পাখি ওড়াউড়ি করছে—নর্দার্ন ফুলমার, লিটল অক, গিলেমট। তাদের কলরবে গমগম করছে জায়গাটা। এতক্ষণে এদের সাড়া পেয়ে মনে হচ্ছে এই তো আমার চেনা পৃথিবী, প্রাণের উষ্ণতায় ভরপুর। জাহাজ বরফ ভেঙে যাচ্ছে, তাতে কিছুটা জল বেরিয়ে পড়ছে। সেই জলে নাড়া পড়ায় ছোট ছোট মাছ, কাঁকড়া, ক্রিল, গেঁড়ি, গুগলি ওপরের দিকে উঠে আসছে। এই পাখিরা তার সদ্ব্যবহার করছে। জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে গেলে ওদের লাভ, সহজেই খাবার মেলে।

বরফের প্রান্তরে নানা চিত্রবিচিত্র আকার দেখা দিচ্ছে। গ্রীষ্মকালে প্যাক আইস ভেঙে টুকরো হয়ে যায়। তাই বরফের ফাটলের মধ্যে দিয়ে জলের রেখা দেখা যাচ্ছে। যেন এঁকেবেঁকে বয়ে যাওয়া নদী! একটা বিশাল খণ্ড দেখে আমার মনে হল আস্ত ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান-পাকিস্তান সমেত। এমনকি নীচের দিকে শ্রীলঙ্কাটুকুও জুড়ে রয়েছে। এক জায়গায় মনে হল পুরু বরফে ঘেরা সুইমিং পুল। সেখানে নীল জলের ওপর পাতলা কাঁচের মতো বরফের সর। কোথাও আবার খানিকটা জুড়ে নীল জলে বরফ-মোজাইকের নকশা। যেতে যেতে দেখি, একটা বরফখণ্ডের বেশ খানিকটা জুড়ে লাল ছোপ। রক্তের দাগ নাকি? হতেই পারে, এর ওপর হয়তো ভাল্লুক সিল শিকার করে খেয়েছে। সারাকে কাছাকাছি দেখতে পেয়ে ডাকলাম। সারা ভাল করে দেখে বললেন, 'তুমি ঠিকই দেখেছ। আমি ভেবেছিলাম লাল শৈবাল। কিন্তু এ তো টাটকা রক্তের দাগ! ইস, আর কিছুক্ষণ আগে এলেই হয়তো দেখতে পেতাম!' বন্য পৃথিবী এভাবেই সভ্য মানুষকে সময়ে সময়ে ধোঁকা দেয়।

হঠাৎ অ্যালার্ম বেল বেজে উঠল জাহাজে। অ্যালার্মই তো! যে যেখানে ছিল লাউঞ্জে জড়ো হল। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেছে। জাহাজের কোনও বড়সড় বিপদ হল নাকি? প্যাক আইস ভেঙে যেতে যেতে বরফের ধাক্কায় জাহাজ কি ফুটো হয়ে গেল? এখানে তো লাইফ বোট নামানো অসম্ভব, জল কোথায়? জাহাজে থাকা আরও বিপজ্জনক। জাহাজ আস্তে আস্তে ডুবতে শুরু করবে। ভীষণ রকম গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে লাউঞ্জে। নানা আশঙ্কার টুকরো টুকরো কথা কানে ভেসে আসছে। বিশেষজ্ঞদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না যে, জিজ্ঞেস করব। এই প্যাক আইসে নামতে হলে ঠান্ডায় জমে বরফ হয়ে যেতে হবে। কিংবা মেরু ভাল্লুকের পেটে। আর্য খুব ভয় পেয়ে গেছে। সুবীর ক্যামেরা পাশে নামিয়ে রেখে দাড়ি খুঁটছে। এটা ওর দুশ্চিন্তার বহিঃপ্রকাশ।

এদুয়ার্দো লাউঞ্জে এসে ঢুকলেন। এক্ষুণি জাহাজ খালি করার কিছু জরুরি নির্দেশ দেবেন নিশ্চয়ই! প্রথমেই হা হা করে হেসে উঠলেন। আমরা এই অবস্থায় হাসব কি কাঁদব ভেবে পাচ্ছি না। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন, 'খুব আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাদের জাহাজ কোনও বিপদে পড়েনি। আমরা সবাই সুরক্ষিত আছি। জাহাজের একটা এমার্জেন্সি দরজা কোনওভাবে খুলে গিয়েছিল। তাই অটোম্যাটিক অ্যালার্ম বেজে উঠেছে। আমরাও প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু ভয়ের আর কোনও কারণ নেই। নিশ্চিন্তে আমরা আবার প্যাক আইস

আর্কটিকের কিটিওয়েক, সি গাল-এর জাতভাই

উপভোগ করতে পারি। আবার ভাল্লুক খোঁজা শুরু হোক।' ধড়ে প্রাণ এল। লাউঞ্জ জুড়ে হাততালির ঝড়। এ যেন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নতুন করে জীবন ফিরে পাওয়া! পশ্চিমের দেশগুলোয় সর্বত্র এই স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্যই যত গোলযোগ। অতি সাবধানতা, অতি সুরক্ষা, অতি নিরাপত্তা! পান থেকে চুন খসলেই অ্যালার্ম বেজে ওঠে। তা বলে জাহাজে? যেখানে অ্যালার্ম বেল মানে মৃত্যুঘণ্টা!

জাহাজের পরিবেশ স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় নিল। যেন ঝড় বয়ে গেছে আমাদের ওপর দিয়ে! দুপুর এগারোটায় লাউঞ্জে একটা লেকচার ছিল, লরা-র। প্যাক আইস আর গ্লেসিয়ার আইসের ওপর। পৃথিবীর উষ্ণায়নের কারণে জলবায়ুর যে-বদল ঘটছে, এই বরফের ওপর তার কুপ্রভাব নিয়ে তিনি আলোচনা করলেন। মানুষকে এখনই কতটা সচেতন হতে হবে তা ব্যাখ্যা করে বললেন। মনে দাগ কেটে গেল ওঁর আলোচনা। বিষয়টা সত্যিই ভাববার। বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন, সুমেরু এলাকার উষ্ণতা এত দ্রুত বাড়ছে, অচিরেই উত্তর মেরু গ্রীষ্মকালে বরফহীন হয়ে পড়বে। তাতে মেরু ভাল্লুকের চরম অস্তিত্ব-সংকট। বরফ সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে, শোষণ করে না। বরফহীন সমুদ্র সূর্যের তাপ শোষণ করে পৃথিবীকে আরও উষ্ণ করে তুলবে। তাছাড়া বরফ গলে জলমগ্ন করবে পৃথিবীর বিপুল এলাকা। শেষের সে দিন বোধহয় আর বেশি দূরে নেই। এসব ভাবতে বসলে কূলকিনারা পাওয়া যায় না। দুর্ভাবনা মনে থানা গেড়ে বসে।

ভাবলাম এই বেলা একবার ব্রিজে গিয়ে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ করে আসি। ব্রিজে সবাই স্বাগত, কেবল ক্যামেরার প্রবেশ নিষেধ। গিয়ে দেখি আমাদের বিশেষজ্ঞ দলের প্রায় সবাই উপস্থিত। ভাল্লুক খোঁজা থেকে বিরত থাকা চলবে না। এঁদের যত দেখি অবাক হই। অসম্ভব সক্রিয় সকলেই। আমাদের সব দিক থেকে সাহায্য করা, আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে মেরু দেশের প্রকৃতি চেনানো, প্রাণিকুলের সঙ্গে পরিচয় করানো, যাত্রীদের অবিরাম প্রশ্নের স্রোত সামাল দেওয়া— সবেতেই আন্তরিক প্রচেষ্টা লক্ষ করেছি। এমন বিশেষজ্ঞ দল পেলে অভিযান অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে রয়েছেন জাহাজের দক্ষ পরিচালক আর্তুর ইয়াকভলেভ। ভদ্রলোক রাশিয়ান। যেতেই হাসিমুখে আলাপ করলেন। ভারতে ওঁর যাওয়ার খুব ইচ্ছে। প্রায় দশ বছর এই জাহাজে আছেন। বললেন, যতদূর প্যাক আইস ভেঙে যেতে পারব যাব। ওঁর কথা অনুযায়ী আমাদের জাহাজ ৮০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ পেরিয়ে আরও চার মাইল উত্তরে যাবে। জিজ্ঞেস করলাম, 'প্যাক আইস কোথায় কতটা পুরু তা কি আগে থেকে জানার কোনও উপায় আছে?' আমাকে অবাক করে তিনি উত্তর দিলেন, কতকটা আন্দাজে আর পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে প্যাক আইসে জাহাজ চালাতে হয়। আমার ধারণা ছিল আজকের দিনের উন্নত জাহাজ কম্পিউটারই চালায়, ক্যাপ্টেন কেবল যাত্রাপথ প্রোগ্রাম করে দেন। তা তো নয়! ক্যাপ্টেনকে সদা সজাগ, সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হয়। দুটো বিরাট বিরাট টেলিস্কোপ আর অসংখ্য কম্পিউটার। ছোট ছোট স্ক্রিনে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা, জলের তাপমাত্রা, হাওয়ার গতি এসব দেখা যাচ্ছে। সেকেন্ড অফিসার ক্রিল বুরিয়াচেক আর থার্ড অফিসার ডন বুরেনের সঙ্গেও আলাপ হল। ব্রিজ থেকে আদিগন্ত প্যাক আইসের একটা প্যানোরামিক ভিউ পাওয়া যাচ্ছে। পৃথিবীর মাথার সাদা টুপি! অবর্ণনীয় সৌন্দর্য!

কাল সারা দিনটা ঘোরের মধ্যে কাটল, কিছুক্ষণ প্রাণভয়েও। আবার দক্ষিণের দিকে যাত্রা। কিংস উপসাগরের ধারে নি আলিসুন্ড নামে একটা ছোট্ট দ্বীপ-শহর আজ আমাদের গন্তব্য। বিজ্ঞানীদের শহর। উত্তর মেরুর আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্রগুলি এখানে। নরওয়ে, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স, চিন, ভারতের মতো এগারোটি দেশের উনিশটি গবেষণাকেন্দ্র আছে। সারা বছরে মোট তিরিশ-পঁয়ত্রিশ জন বিজ্ঞানী এই দ্বীপ শহরে থেকে গবেষণা করেন। গ্রীষ্মকালে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১১৪-তে। জেটি থেকে বেশ খানিকটা লম্বা রাস্তা পেরিয়ে উজ্জ্বল রঙের সার সার কটেজ। এগুলিই গবেষণাকেন্দ্র। রাস্তার দু'ধারে ঘাসের ওপর ছোট ছোট বেগুনি ফুলের কার্পেট বিছিয়ে

কঠিন পাথরে ফুটে আছে পার্পল স্যাক্সিফ্রেজ ফুল

নি অ্যালিসুন্ড দ্বীপের বিজ্ঞান-গ্রাম

আছে। পার্পল স্যাক্সিফ্রেজ। কুমেরুর মতো সুমেরুও মরুভূমি। গাছপালা একেবারেই নেই। শীতকালে সবটাই বরফে ঢাকা থাকে। গরমকালটায় বরফ সরে গেলে কিছু কিছু জায়গায় মস, লাইকেন, ঘাস জন্মায়। আশেপাশে কতগুলো বল্গা হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। উপসাগরের ধারে পাহাড়গুলো বরফ ঢাকা। শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ, গবেষণার জন্য আদর্শ।

তবে ১৯৯১ সালের আগে এ জায়গাটা এমন ছিল না। তিনশো বছর আগে মানুষ প্রথম এই দ্বীপে উপস্থিত হয়েছিল কয়লাখনির সন্ধানে। গত শতাব্দীতে চার বার এই দ্বীপ থেকে উত্তর মেরু বিন্দু আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়। তার মধ্যে রোয়াল্ড আমুন্ডসেন জেপেলিন-এ চেপে আকাশপথে প্রথম উত্তর মেরু অতিক্রম করেন— এর আগের প্রতিটি 'সফল' উত্তর মেরু অভিযান নিয়ে সংশয় আছে। এই আমুন্ডসেনই আবার দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের নায়ক।

রোদ ঝলমলে কটেজগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটছিলাম। স্তূপ স্তূপ বরফ জমে আছে এখানে ওখানে। আমাদের সঙ্গে ছিলেন মিরিয়ম। উনি আবার সুইডেনের গবেষণাগারে কিছুদিন সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। একটা কটেজের সামনে দেখি একটা পান্ডার মূর্তি বসানো। বুঝলাম এটি চিনদেশের। অনেকক্ষণ থেকে আমি 'হিমাদ্রি'-র খোঁজ করছি। ভারতের গবেষণাগার। মিরিয়ম রহস্য করে বললেন, চলো, ওই আমুন্ডসেনের মূর্তির কাছে গেলেই তোমার দেশ দেখতে পাবে। অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ হল একথা শুনে। সত্যিই তো, উত্তর মেরুতে এক টুকরো আমার দেশ! কালো ঢালু ছাদ, হালকা পিচ রঙের একতলা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে গর্ব হল বই কি! 'National Centre for Polar and Ocean Research'। ২০০৮ সালে তৈরি হয়েছে। আবওহাওয়াবিদ্যা, জীববিদ্যা আর গ্লেসিয়ারের প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা হয় এখানে। এদুয়ার্দো পই পই করে বলে দিয়েছিলেন, রাস্তায় আমরা স্বচ্ছন্দে হাঁটাহাঁটি করতে পারি, কিন্তু কোনও গবেষণাগারে যেন ঢুকতে না চাই, বা তাঁদের কাজে ব্যাঘাত না ঘটাই। এমনিতেই এই দ্বীপে আসতে যে-কোনও একটা দেশের সরকারি অনুমতি নিতে হয়। আমাদের কেবল মিউজ়িয়ম আর স্যুভেনিরের দোকানে ঢোকার অনুমতি আছে। মিউজ়িয়মের বিভিন্ন ঘরে এই দ্বীপের বিবর্তনের ইতিহাস মডেলের মাধ্যমে দেখানো আছে। একটা কাচের আলমারির কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হল। কয়েকটি ব্যবহার্য জিনিস সাজানো আছে— রঙিন কৌটো একটা, একজোড়া গ্লাভস, চায়ের কাপ-প্লেট ইত্যাদি। তার মধ্যে দেখি এইচ এম ভি-র একটি লং প্লেয়িং রেকর্ড। সামনে ঝুঁকে দেখলাম। কার রেকর্ড ভাল করে পড়াই যাচ্ছে না। তা হোক, খুব চেনা জিনিস। যেন আমার দেশের জিনিস, যদিও আদতে এটি ব্রিটিশ গ্রামোফোন কোম্পানির রেকর্ড লেবেল।

কাল সন্ধ্যের জমায়েতে এদুয়ার্দো খুব উত্তেজক এক প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আর্কটিকে সমুদ্র-স্নান করার দুঃসাহস যারা দেখাতে চায়, তারা যেন সাঁতারের পোশাক আগে থেকেই পরে নেয়। অমনি চারদিক থেকে একটা হো হো আওয়াজ উঠল। অনেকেই হাত তুলল। এদুয়ার্দো জানালেন, তোয়ালে তাঁরা নিয়ে যাবেন। আর্কটিকে সাঁতার! অ্যান্টার্কটিকার ডিসেপশন আইল্যান্ডে কোটা নাকাই, জোসেফাইন, চাও চ্যান-দের চানের দৃশ্য চোখে ভেসে উঠল। নিজেরা ওই দু'ডিগ্রি ঠান্ডা জলে স্নান করার সাহস দেখাতে না পারলে কী হবে, দুঃসাহসিকদের কাঁপতে কাঁপতে স্নান বেশ উপভোগ করেছিলাম! কিন্তু হায়, এখানে তা সম্ভব নয়। স্নান দেখার ইচ্ছে সকলেরই। কিন্তু আমাদের পাড়ে থাকতে দেওয়া যাবে না। কারণ ভাল্লুকের ভয় সর্বত্র। এতজনকে একসঙ্গে নজর রাখা যাবে না পাড়ে। কী আর করা? এবার সেই অসীম সাহসীর দল চলল সুমেরু সমুদ্রে সাঁতার কাটতে।

জোডিয়াক বোটে নামলেই কনকনে ক্যাটাব্যাটিক হাওয়া। মুখ-ঠোঁটের অনেক জায়গা ফেটে গেছে। পুরু করে ক্রিম লাগিয়ে রাখতে হচ্ছে। বরফের ঢেলা ঠেলে ঠেলে চলেছে আমাদের রাবারের ভেলা। এসমারব্রিন গ্লেসিয়ারের (নরওয়েজিয়ান ভাষায় 'breen' মানে গ্লেসিয়ার) কাছাকাছি গিয়ে দেখি আমাদেরই দুটো নৌকো একেবারে কাছে চলে গেছে। এক কিলোমিটার লম্বা অতিকায় এক হিমবাহ। তার সামনে নৌকোগুলোকে ছোট্ট খেলনার মতো লাগছে। আমার বেশ ভয় করতে লাগল। গ্লেসিয়ার থেকে বরফ ভেঙে পড়া (calving) তো যখন তখন ঘটতে পারে! হুয়ানকে সেকথা বলতে বললেন, ওরা গ্লেসিয়ারের সামনে ওই ছোট্ট দ্বীপটা পর্যন্ত গেছে। বরফের চাঁই ভেঙে পড়লে ওদের গায়ে লাগবে না। হুয়ান আশ্বাস

পাহাড়ের ধাপে পাফিনের বাসা

দিলেও আমার ভয় দূর হল না। কী দরকার ওদের অত কাছে যাওয়ার? নিশ্চয়ই ওই নৌকোগুলোয় কিছু নাছোড়বান্দা যাত্রী আছে।

আমাদের সামনেই একটা চ্যাপ্টা মতো এক বরফের ভেলা। তার ওপর দেখি ঝাঁকে ঝাঁকে আর্কটিক টার্ন পাখি কিচিরমিচির করে ওড়াউড়ি করছে। এই সেই আশ্চর্য পাখি যাদের আমরা অ্যান্টার্কটিকায় দেখেছি, তিমি শিকারিদের অর্ধেক ডুবে যাওয়া জাহাজটায় ঝাঁকে ঝাঁকে বসে আছে। এরা আদতে সুমেরুর পাখি। এখানেই বাসা বানায়, প্রজনন হয়। কিন্তু এখানে শীতকাল এলেই এরা দীর্ঘ তিরিশ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে চলে যায় দক্ষিণ মেরুতে। কারণ দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল। কুমেরুতে যখন শীতকাল তখন আবার এখানে ফিরে আসে। এরা আলোর পাখি। সূর্যের আলো যেখানে, এরাও সেখানে। বছরে দু'বার যাওয়া আসায় এই এতটুকু পাখি মোট ষাট হাজার কিলোমিটার পাড়ি দেয়। পরিযায়ী প্রাণীদের জগতে এ এক বিস্ময়! আশ্চর্যের বিষয়, অ্যান্টার্কটিক টার্ন পাখিরা কিন্তু পরিযায়ী নয়।

টার্ন পাখিগুলোর মধ্যে অন্য কিছু পাখিও রয়েছে। এরা রয়েছে খানিকটা নিরাপত্তার কারণে। টার্ন পাখিরা যখন বাসা বানায় বা ডিমে তা দেয়, তখন খুব আক্রমণাত্মক থাকে। শিকারি স্কুয়া বা গাল-কে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। তাই গিলেমট বা লিটল অক-এর মতো ছোট পাখিরা অনেক সময় ওদের ঝাঁকের মধ্যে আশ্রয় নেয়। ওদের ভাবভঙ্গি লক্ষ করছি আর হুয়ানের কথা শুনছি, হঠাৎ বিকট এক মেঘ ডাকার মতো আওয়াজ হল। দেখি অদূরে এসমারব্রিন গ্লেসিয়ারের এক পাশ থেকে হুড়মুড় করে বরফের চাঁই ভেঙে পড়ছে। আমাদের চোখে পলক পড়ে না, মুখে বাক্যি সরে না! পেটের ভেতর আবার ভয়ের গুড়গুড়। বরফের টুকরো ছিটকে পড়ছে এদিক ওদিক। ভাগ্যিস নৌকো দুটো আগেই সরে এসেছিল! সামনের ওই দ্বীপটা থাকায় বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কা খেতে হল না। এসব দুর্গম জায়গায় দুঃসাহস না দেখানোই ভাল। প্রকৃতির মার দুনিয়ার বার।

জাহাজ খোলা সমুদ্রে পড়েছে। সমুদ্র বেশ উত্তাল আজ। জাহাজের দু'পাশ থেকে বড় বড় ঢেউ উঠছে। ভালই রোলিং পিচিং হচ্ছে। ডেকে বা লাউঞ্জে হাঁটাহাঁটি করা মুশকিল হয়ে পড়েছে। অথচ সমুদ্রে এদিকে ওদিকে মিঙ্কি তিমির ল্যাজ দেখা যাচ্ছে। অনেকেই এর মধ্যে সি-সিকনেসে কুপোকাত। লাউঞ্জে সোফায় বসে জানলা দিয়ে একদৃষ্টে দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে আছে। তাতে বমির ভাব কমে। আর্যর শরীরে খুব অস্বস্তি হচ্ছে। বসেই থাকতে পারছে না বেচারা। অ্যাভোমিন দিলাম একটা, কোনও কাজ হল না। কোনওরকমে টলতে টলতে কেবিনে নিয়ে গেলাম ওকে। ডাক্তারবাবুকে ডাকতেই হল। উনি ঘরে এসে সব শুনলেন। শরীরে আর কোনও অসুবিধে আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। ভাবলাম নিশ্চয়ই অ্যাভোমিনের চেয়েও কড়া কোনও ওষুধ দেবেন। ওমা দেখি, ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট গোল স্টিকারের মতো দেখতে জিনিস বের করে আর্যর কানের পিছনে লাগিয়ে দিলেন। আমি ওঁকে বোঝানোর চেষ্টা করছি এ সময়ে ওষুধ না খেলে ছেলে সুস্থ হয় না, মাথায় খুব যন্ত্রণা হয়। উনি বললেন, 'মাথায় বেশি যন্ত্রণা হলে প্যারাসিটামল দিতে পারো। কিন্তু এই প্যাচেই কাজ হবে। এটা মোশন সিকনেস প্যাচ।' অবাক কাণ্ড! ওই একখানা খুদে প্যাচ কানের পিছনে লাগিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আর্যর সব অস্বস্তি গায়েব! তাই দেখি জাহাজে অনেকে প্রথম থেকেই কানের পিছনে প্যাচ লাগিয়ে ঘুরছে। এতদিন ভাবছিলাম, এ জিনিস আমাদের দিচ্ছে না কেন! নিজেদের আহাম্মকিতে নিজেরাই হেসে অস্থির হলাম।

এবার ফেরার পালা। বিদায়ের সুর বাজছে। এ ক'দিনে অনেকের সঙ্গে আলাপ হল। রাকেশ রাঘবনের পরিবার এসেছে আমেরিকার টেক্সাস থেকে। কেরালায় ওদের আদি বাড়ি। দেখা হলেই বাক্য বিনিময় হত। আমি ভ্রমণকাহিনি লিখি শুনে খুব তারিফ করলেন। সেদিন রেস্তোরাঁয় অবাঙালি টানে খোদ বাংলায় কে বলে উঠলেন, 'আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন?' আমি অবাক! পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি মাঝবয়েসি এক ভদ্রমহিলা। বললেন, ওঁর মা বাঙালি ছিলেন, চ্যাটার্জি, বাবা উত্তর প্রদেশের। জয়শ্রী এখন থাকেন ব্রিস্টলে, ওখানে সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার। বিজয়লক্ষ্মীর সঙ্গেও আলাপ হল। ওঁরা থাকেন অ্যামস্টারডামে।

আর্কটিক ফক্স

সুস্থ শরীরে এই স্তরের অভিযান সফল হওয়া খুবই সৌভাগ্যের। মানুষের সাহস, অভিযানপ্রিয় মন আছে বলেই তা সম্ভব। এখন রাত এগারোটা, তা যেন মনে করাই যাচ্ছে না। সূর্যের আলো ঝলমল করছে। হঠাৎ ব্রিজ থেকে ক্যাপটেনের ঘোষণা শোনা গেল। ঝাঁকে ঝাঁকে তিমি চলেছে জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে। অমনি সাড়া পড়ে গেল চারদিকে। ক্যামেরা নিয়ে ডেকে ছুট। হাম্পব্যাক তিমিরা শূন্যে জলের ফোয়ারা ছুড়তে ছুড়তে চলেছে। এ পাশে ও পাশে তিমির ঝাঁক ঘিরে ফেলেছে আমাদের জাহাজটাকে। ক্যাপ্টেন খুব সাবধানে জাহাজ একই জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। তিমিদের গতিপথে চলন্ত জাহাজ এসে পড়লে জাহাজের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ওরা অনেক সময় আহত হয়। তিন রকমের তিমি দেখা গেছে— হাম্পব্যাক, মিঙ্কি আর ফিন। ধারে কাছে জর্জ, হুয়ান, সারা না থাকলে বোঝা সম্ভব হত না কোনটা কোন তিমি। কারণ এই তীব্র ঠান্ডা জলে

তুষার-মরুতে বসন্তের পেলব হাতের ছোঁয়া লেগেছে

ওঁর ঠাকুরদাদা কাজের খোঁজে জাহাজে করে চলে গিয়েছিলেন হল্যান্ডে। বিজয়লক্ষ্মী নিজেকে হিন্দু বলে খুব গর্ব বোধ করেন। আমাকে বললেন, তোমরাও হিন্দু তো? আমি বললাম, কেবল কাগজে কলমে। ধর্মের আচার-আচরণে বা কুসংস্কারে বিশ্বাস নেই। আমাদের জাহাজ যেন এক মিনি পৃথিবী!

জাহাজের বিশাল লাউঞ্জ সকলের খুব প্রিয় জায়গা। যখনই একটু অবসর মেলে, কেবিনে না থেকে এখানে সব আড্ডার আসর বসায়। অফুরন্ত আরামদায়ক বসার জায়গা আর অকৃপণ চা-কফির জোগান। তার ওপর মাঝে মাঝেই বিশেষজ্ঞ দলের লেকচার থাকে, এখানেই। ডেকের কনকনে ঠান্ডায় হাত-পা জমে গেলে লাউঞ্জে এসে উষ্ণ আশ্রয় মেলে। বিশাল বিশাল কাচের জানলা চারিদিকে। কেউ একা প্রকৃতির সঙ্গে থাকতে চাইলে একটা কোণ খুঁজে নিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে বসে থাকলেই হল। বরফখচিত সমুদ্র, সাদা পাহাড় আর হিমবাহ জানলায় এসে ধরা দেবে। লাউঞ্জের লাগোয়া একটি লাইব্রেরি আছে। সুমেরু আর কুমেরুর জলবায়ু, পাখি, প্রাণীদের ওপর খুব ভাল ভাল বই আছে। এ ক'দিন জাহাজে অবসর খুব কমই মিলেছে, কিন্তু যেটুকু মিলেছে, লাইব্রেরির এই কোণটুকু খুব উপভোগ করেছি।

আজ সন্ধ্যের শেষ জমায়েতে বিশেষ ক্যাপ্টেন ককটেলের আয়োজন। পার্টি ড্রেসে মিরিয়ম, মেইকে, লরা, হেজেল, সারা। সবাইকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। এঁরা যাত্রীদের হাতে শ্যাম্পেন তুলে দিচ্ছেন নিজেরাই। এই প্রথম আমাদের সকলের সামনে এলেন জাহাজের কাণ্ডারি। সকলের সঙ্গে আলাপ করলেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানালেন। এদুয়ার্দো এরপর ডেকে নিলেন বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যদের, হোটেল ম্যানেজার আর জাহাজের অফিসারদের। ধন্যবাদ আর হাততালির পালা চলল। ডিনার টেবিলেও আলাপ হল শেফ, কুক এবং ওয়েটারদের সঙ্গে, যাঁরা এতদিন অসাধারণ সব পদ খাইয়ে আমাদের শরীর-মন তাজা রেখেছিলেন।

রাতের খাওয়া হয়ে যাবার পর সবাই লাউঞ্জে। আজই জাহাজে শেষ রাত। কাল আবার লম্বা জার্নি করে সবাইকে যার যার দেশে ফিরতে হবে। এই ক'দিনের অভিজ্ঞতার স্মৃতিরোমন্থন চলছে। কিছুটা ক্লান্তি, কিছুটা বিষণ্ণতা, অনেকটা তৃপ্তি আচ্ছন্ন করে রেখেছে আমাদের। করোনা-পরবর্তী পৃথিবীতে এদের জলে লেজের বাড়ি (tail slapping) বা শূন্যে লাফ (breaching) দেখা যাচ্ছে না। অস্ট্রেলিয়ার সিডনির সমুদ্রে আমাদের হাম্পব্যাকের জাম্প দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন ওরা মাইগ্রেট করে দক্ষিণ সমুদ্র থেকে উত্তরের দিকে যাচ্ছিল। কেউ আর ডেক ছেড়ে নড়ছে না, রাত বারোটা বেজে গেছে, তাও। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। শেষ বেলায় আমাদের ভাগ্য যে এত সুপ্রসন্ন হবে কে জানত! আরে! পিছনে তো আরও একটা দল আসছে তিমির! সারা হেসে বললেন, 'নো ডিয়ার লেডি, দে আর হার্প সিলস।' কী কাণ্ড! এই শেষ বেলায় সুমেরু মহাসাগরের কেউকেটারা কি দলে দলে এসে আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে যাচ্ছে!

তবে, অভিযানও কি কখনও শেষ হয়?